ভারতশিল্পী নন্দলাল

প্রথম খণ্ড

শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল

রাঢ়-গবেষণা-পর্ষদ

১৯৬৮

BHARATSILPI NANDALAL
BY DR. PANCHANAN MANDAL

মূল্য এক শত টাকা

মুদ্রক ও প্রকাশক
রাঢ়-গবেষণা-পর্ষদের পক্ষে শ্রীশিবপ্রসাদ শর্মা
শ্রীদুর্গা প্রেস বোলপুর বীরভূম ৭৩১ ২০৪
প্রাপ্তিস্থান
রাঢ়-গবেষণা-পর্ষদ পল্লীশ্রী গ্রন্থাগার
রতনপল্লী শান্তিনিকেতন বীরভূম ৭৩১ ২৩৫

যাঁহার অঙ্গুলিস্পর্শে এই 'মধু' উৎসারিত হইয়াছে
শিল্পিবন্ধু সেই আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উদ্দেশে
এই জীবন-গাথা
ভারতশিল্পী নন্দলালের জন্মশতবর্ষে
নিবেদিত হইল

নিবেদন

ভারতশিল্পী আচার্য নন্দলাল বসু মহাশয়ের সমগ্র জীবন-গাথা পর পর তিনটি খণ্ডে প্রকাশিত হবে। তার মধ্যে প্রথম খণ্ড ৬৬৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বর্তমানে নন্দলালের জন্মশতবর্ষে প্রকাশ করা হলো। দ্বিতীয় খণ্ড যন্ত্রস্থ।

প্রণাম জানাই গুরু সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে যিনি জোর করে শুরু না করালে এ বই লেখা কোনো দিন শেষ হতো না। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি, তিনি আচার্য নন্দলালের ইঙ্গিতে তাঁর 'সবিতা' মাসিক পত্রিকায় এই মহাগ্রন্থের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ১৩৭১ সাল থেকে ১৩৭৫ সাল পর্যন্ত প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর সেই ধারাবাহিক প্রকাশ অনুসরণ করে এই তিন খণ্ডে সমগ্র গ্রন্থ প্রকাশের বর্তমান পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

আনন্দবাজার পত্রিকা, আচার্য শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন, শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেন, শ্রীযুক্ত অশোকনাথ সেন, শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র কুণ্ডু, প্রাক্তন কৃষিমন্ত্রী প্রয়াত দাশরথি তা, শ্রীগিরীনদেব মণ্ডল প্রমুখ অনেকে আগ্রহবশতঃ এই গ্রন্থের অধ্যায়বিশেষ তাঁদের পত্র-পত্রিকায় পূর্বে প্রকাশ করেছিলেন। আকাশবাণীর কলকাতা-কেন্দ্র থেকেও এই গ্রন্থের কিছু অধ্যায় প্রচারিত হয়েছিল। প্রয়াত অধ্যাপক ডক্টর শ্রীচন্দ্র সেনের সূত্রে অধ্যাপক ডক্টর শিশিরকুমার ঘোষ বিশ্বভারতী কোয়ার্টারলি পত্রিকায় নন্দলাল-সংখ্যায় এর ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। প্রয়াত ব্যারিস্টার তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এবং বিদগ্ধ পণ্ডিত শ্রীসুশীলকুমার চক্রবর্তী মহাশয় বৃহত্তর পাঠক গোষ্ঠীর অনুরোধে এই মূল গ্রন্থের অনেকখানির ইংরাজী অনুবাদ করে রেখেছেন। এই গ্রন্থখানিকে ভিত্তি করে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় অধুনা একটি গবেষণা-কর্ম করিয়েছেন। বিশ্বভারতী সম্প্রতি এই গ্রন্থ অবলম্বন করে ভারতশিল্পী নন্দলালের জীবনী ও চিত্রপঞ্জী প্রকাশ করছেন। বর্তমানে শান্তিনিকেতন-রাঢ়-গবেষণা-পর্ষদ এই বিশাল গ্রন্থখানি সমগ্রভাবে প্রকাশের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

বিশ্বভারতীর গবেষণা-প্রকাশন-সমিতির প্রাক্তন সম্পাদক ডক্টর শ্রীপশুপতি শাশমল এই গ্রন্থের মুদ্রণ ও প্রকাশনা বিষয়ে সমূহ পরামর্শ দিয়েছেন, তাঁকে

ধন্যবাদ জানাই। বীরভূম-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীকিশোরীরঞ্জন দাশ ও কান্দীবান্ধব-পত্রিকার সংকলক শ্রীকল্যাণকুমার মুখোপাধ্যায় এই গ্রন্থ পরিবেশনায় সহায়তা করছেন। শ্রীবিশ্বরূপ বসু, শ্রীনৃত্যগোপাল বারিক, শ্রীঅরুণাচল পেরুমাল, শ্রীগৌরহরি সাহা, শ্রীবুদ্ধদেব আচার্য, ডক্টর শ্রীমতী সুমিত্রা কুণ্ডু ডাক্তার শ্রীমহাপ্রসাদ কুণ্ডু শ্রীমতী ইরাবতী দে, ডাক্তার শ্রীঅমরেশ দে, শ্রীমানসকুমার মণ্ডল, শ্রীমতী শুভ্রা মণ্ডল, শ্রীমতী সরমা মণ্ডল, শ্রীমতী রঞ্জাবতী দে, ডাক্তার শ্রীসর্ববন্ধু দে, শ্রীমতী শ্রীপর্ণা কুণ্ডু ও শ্রীকিঙ্করকুমার কুণ্ডুকে সহযোগিতার জন্যে সাধুবাদ জানাই। শ্রীমতী সরমা মণ্ডলের একটি এক্স্‌পেরিমেন্টের দায় (পৃ ৬১৪) বোধ করি এখনও বাকি রয়ে গেছে। ছবির প্রিন্ট্‌স সংগ্রহকল্পে সহায়তার জন্যে ডক্টর শ্রীঅমলেন্দু মিত্রকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।

শান্তিনিকেতন-বোলপুরের শ্রীদুর্গা প্রেস ও প্রকাশনীর শ্রীশিবপ্রসাদ শর্মা এবং শ্রীসাগর ভাণ্ডারী, শ্রীসত্যগোপাল মণ্ডল, শ্রীনন্দদুলাল শর্মা প্রমুখ নিপুণ সহকর্মিগণ আগ্রহভরে এগিয়ে না এলে পর্ষদের পক্ষে এই গ্রন্থপ্রকাশ সম্ভবপর হতো না। তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো রইলো। কলকাতার কালিকা টাইপ ফাউণ্ড্রী মুদ্রণ-টাইপ সরবরাহের জন্যে এবং ডি-লাক্স প্রিন্টার্স ছবির ব্লক নির্মাণ ও মুদ্রণের ফলে ধন্যবাদার্হ।

রাঢ়-গবেষণা-পর্ষদ
পল্লীশ্রী রতনপল্লী
শান্তিনিকেতন

শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল

ভূমিকা

১৯৪২ সালের কথা। শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল বর্ধমান থেকে দুপুরে আসতেন শান্তিনিকেতনে। আসতেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। বিকেলে চলে যেতেন কাজ সেরে। আসতেন রূপরামের ধর্মমঙ্গলের ছবির জন্যে। অনেকবার এসেছেন। তখন এক দফা ছবি করে দিই।

১৯৪৬ সালে শ্রীমান পঞ্চানন এলেন বিশ্বভারতীর বিদ্যাভবনে রিসার্চ ফেলো হয়ে। ও পদটি ওঁর জন্যেই এখানে প্রবর্তন করা হলো। বাঙ্গালা পুঁথি-বিভাগের কাজে পরম উৎসাহে লেগে গেলেন উনি। বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ছাত্র পঞ্চানন কর্মী হয়ে এখানে ফিরে এলেন। ঠানদির মুখে শুনেছিলুম, যখন পঞ্চানন এখানকার ছাত্র, গুরুদেব নিজে ওঁকে সার্টিফিকেট দিয়ে, এখানে ফিরে এসে গবেষণার কাজ করতে বলেছিলেন।

১৯৪৭ সালে সুহৃদ্বর সুনীতিবাবু এখানে আসেন পুঁথির কাজ দেখে রিপোর্ট দিতে। কলাভবনেও বেড়াতে এলেন সুনীতিবাবু। তখনই তিনি নির্দেশ দিলেন আমাকে অনুরোধ জানিয়ে, ওঁকে লিখতে শান্তিনিকেতন-কলাভবনের কর্মপ্রয়াস সম্পর্কে। সেই থেকেই ওঁর এই কাজের সূচনা। আমি কাজের প্রথম একটা খসড়া করে ওঁকে দিলুম। সুনীতিবাবু তার ওপর কিছু যোগ করলেন। পরে, শ্রীমান পঞ্চানন সেই সব অধ্যায় বিভাগের সঙ্গে আমার জীবনচিত্র ও কর্মধারা জুড়ে বর্তমান গ্রন্থের পরিকল্পনা করেছেন।

আমার শিশুকাল থেকে যাবতীয় স্মৃতিকথার শ্রুতিলিখন চালিয়েছেন পঞ্চানন। আমার অবচেতন মনের ভুলে-যাওয়া, দূরে চলে-যাওয়া স্বপনের মতো কত কথা যে টেনে আনলেন শ্রীমান তার ইয়ত্তা নাই। আমার স্মৃতির পটে উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট দু-রকম ছবিই আঁকা আছে —সে অনেক। নিরেস ছবিগুলো এই শ্রুতিলিখনে আর যোগ করলুম না। দিয়ে লাভও নাই। তাতে সমাজের কোনও কল্যাণ হবে না। আমার জীবনের উজ্জ্বল দিকের কথাই বলেছি, যাতে আমার উপকার হয়েছে, উন্নতি হয়েছে। নানা

ঘাত-প্রতিঘাতের অভিজ্ঞতার কথাও বলেছি; তা থেকে আমার শিক্ষা হয়েছে। আমার সে শিক্ষা অপরেরও কাজে লাগতে পারে। জীবনে ভালো কাজ যা করিনি তার দ্বারা আমার জীবনের পরিচয় পাওয়া যাবে না। অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছি, জীবনে আনন্দের মাপকাঠিতেই জীবনকে বুঝে নেওয়া ঠিক; দুঃখের মাপকাঠিতে নয়। অন্ধকার দিয়ে আলোর পরিমাপ করা যায় না।

শিল্প-বিষয়ে আমার অনুরাগ কিভাবে ছেলেবেলায় আট বছর বয়েস থেকেই বিকাশলাভ করতে শুরু করেছে সে কথা বলেছি। তখন থেকেই ঠিক করে নিয়েছি আমি শিল্পী হব। সেই সে আমার শিল্পরুচি, অনেক বাধা-বিপত্তির মধ্যে দিয়ে এসে সে নিজের বিকাশ ঘটালো।

বাঙ্গালার বাইরে মুঙ্গের-খড়্গপুরে আমার জন্ম। পনেরো বছর বয়েস পর্যন্ত ওখানেই কাটে। ঐখানকার মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে আমার প্রগাঢ় প্রীতির সম্বন্ধ প্রথম স্থাপিত হয়। সেই অকৃত্রিম প্রণয়বন্ধন আমার সারা জীবনের পাথেয় হয়ে চালিয়ে নিয়ে এসেছে আমাকে। কলকাতায় অবনীবাবুর ছাত্র হয়ে শিল্পকর্ম শিক্ষা করেছি। শিল্পকল্পনা ও সৃষ্টির সন্ধান আমি পেয়েছি আমার গুরু অবনীবাবুর কাছ থেকে। কিন্তু শহুরে ইঁট-কাঠের সে পাষাণ-পরিবেশ থেকে মুক্ত হয়ে প্রকৃতির সঙ্গে আবার চাক্ষুষ মিলন হলো শান্তিনিকেতনে এসে। এবং প্রকৃতির সঙ্গে মিলনের মর্মকথার সে নূতন দীক্ষা দিলেন আমাকে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ। অবনীবাবু শিল্পরচনার অনেক উদ্ভাবনার কৌশল ও টেকনিক, গভীর শিল্পদর্শন শিখিয়েছেন আমাকে। কিন্তু প্রকৃতিকে এমন নিজের করে প্রত্যক্ষভাবে ভালোবাসতে শিখিয়েছেন গুরুদেব। তাঁর লেখা গানে, তাঁর লেখা নাটকে রূপ পেয়েছে প্রকৃতি। তার রং ধরেছে আমার জীবনে। সে এক অমূল্য সম্পদ হয়ে রয়েছে আমার ইহজন্ম আর পরজন্মের জন্যে। তা ছাড়া, শান্তিনিকেতনে এসে বিভিন্ন শিল্পিগোষ্ঠী, দেশ-বিদেশ থেকে আগত শিল্পী ও মনীষীদের সাহচর্য পেয়ে আমার শিল্পিজীবন সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে। গুরুদেব আমার কাজে উৎসাহ দিয়েছেন, প্রেরণা দিয়েছেন, আর আমার কাজের

উপযুক্ত মূল্য দিয়েছেন তাঁর অনুপম শিল্পবৈদগ্ধ্যের নিকষে কষে। তিনি আমার কর্তৃপক্ষ ছিলেন, কিন্তু কর্তৃত্ব করেননি কখনও। কেবল পেয়েছি তাঁর অফুরন্ত সহানুভূতি। আর তিনি নিজে একজন বড়ো চিত্রশিল্পী হওয়াতে আমার প্রকৃত ছিলেন শিল্পী-বন্ধু। আমার পরম সৌভাগ্য এমন লোকোত্তর চরিত্রের সাহচর্য পেয়েছিলুম।

শান্তিনিকেতনে এসে এখানকার বড়ো ছোট, উচ্চ নীচ সকলের সঙ্গেই আমার হৃদ্যতা হয়েছে। আশপাশের গ্রামের লোকেদের সঙ্গে, বিশেষ করে সাঁওতালদের সঙ্গে যেন আত্মীয়তা গড়ে উঠেছে। তাদেরই লোক বলে জানে আমাকে সাঁওতালেরা। মানুষকে আপন করার শিক্ষাও অবনীবাবুর আর গুরুদেবের। আমার সঙ্গে ছাত্রদের যে সম্বন্ধ ছিল তাতেও তারা আমাকে তাদের নিজেদের লোক বলেই জানতো। শুধু ছেলে নয়, মেয়েরাও আমাকে তাদের আত্মীয়ের মতো মনে করতো। "মাস্টার মশায়" নাম নিয়ে ভয় খাইয়েছি, কেউ কেউ এই অভিযোগ করে থাকেন। সেটা মোটেই ঠিক নয়। ভয় পাওয়া তো দূরের কথা, বিপদের সময়ে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের মনের কথা অকপটে বলতো আমাকে বাপের মতো, অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো মনে করে। ছাত্রদের স্নেহ কি করে করতে হয় সে শিক্ষাও অবনীবাবুর কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি। কলাভবনেও সে-শিক্ষা প্রবর্তন করেছি। ছাত্র ও শিক্ষকেরা এখানে এখনও সে-ধারা বজায় রেখেছেন। আর ছাত্র শিক্ষক নির্বিশেষে গুণী ব্যক্তিকে কিভাবে মান দিতে হয়, সে শিক্ষাও দিয়েছেন গুরুদেব।

গুরুদেব, অবনীবাবু আর আমার মধ্যে আমাদের একটা পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভাব ছিল। আমি যেমন ওঁদের আদর্শ পুরুষ বলে জানতুম, ওঁরাও আমাকে পেয়ে তেমনি খুবই খুশি হয়েছেন, আর গৌরববোধ করতেন আমার জন্যে। এখানে আসাতে আমার সাংস্কৃতিক উন্নতি যেমন হলো, তার সঙ্গে গুরুদেব আর অবনীবাবু আর্থিক সাহায্যও সমানভাবে করে এসেছেন। যখন আমার যা অভাব পড়েছে, যা দরকার হয়েছে, সব দিয়েছেন অবনীবাবু আর গুরুদেব।

একটি ছোট্ট ঘটনা বলি। একবার অবনীবাবু একটা দিশি পাকুড় গাছকে জাপানী প্রথায় "বামন বৃক্ষ" করবার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু পারেননি। কারণ তার ধর্ম্মই হলো প্রাকৃতিক পরিবেশে বেড়ে ওঠা। তার পাতা ছোট করতে পারেননি কিছুতেই। শেষে তিনি হতাশ হয়ে সেটাকে আর চেষ্টা করেননি বামন করতে। যখন আমি এলুম এখানে, তিনি বললেন, তুমি এটাকে নিয়ে যাও, শান্তিনিকেতনের মাঠের মধ্যিখানে ছেড়ে দাও। আমি সেটাকে নিয়ে এসে এখানে কলাভবনের কেন্দ্রস্থলে বসিয়ে দিলুম। আর সেটা অতি শীঘ্র বেড়ে উঠলো।

রামকৃষ্ণ-মিশনের সঙ্গে আমার যোগাযোগ প্রায় ছেলেবেলা থেকেই। মিশন আমার প্রভূত উপকার করেছেন। আমার ঐহিক ও পারত্রিক জীবন মিশনের মহারাজদের উদার অনুকম্পায় পরিচালিত হয়ে চলেছে। আপদে বিপদে অদ্ভুত সে আনুকূল্য নিরুদ্বেগ করেছে আমার মনকে।

পরিশেষে আমার বক্তব্য, শ্রীমান পঞ্চানন মণ্ডল দীর্ঘ দিন ধরে আমার সাহচর্যে থেকে ধৈর্য আগ্রহ শ্রদ্ধা ও প্রীতির সঙ্গে আমার কথা শুনেছেন, আমার ছবি দেখেছেন, আর আমার সম্পর্কে প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত বহু কাগজপত্র পরীক্ষা করেছেন। আমার জীবন আর আমার ছবি অভিন্ন। মহাকালের দরবারে আমার ছবির যদি কোনও মূল্য থাকে, তাহলে আমার জীবনেরও মূল্য আছে। তার হিসেব-নিকেশেরও প্রয়োজন আছে। শ্রীমান পঞ্চাননের এই গ্রন্থে আমার জীবনের সেই প্রামাণ্য হিসেব-নিকেশ অনেক-কিছু পাওয়া যাবে। বিশ্ববিচারকের কাছে আমার শিল্পকৃতি যদি স্থায়িত্বের আসন পায়, তার রচনার ইতিহাসও সমভাবেই বিদগ্ধ-সমাজের সমাদর লাভ করবে বলেই আমার ধারণা।

শান্তিনিকেতন — **নন্দলাল বসু**

৮ | ৩ | ১৯৫৬

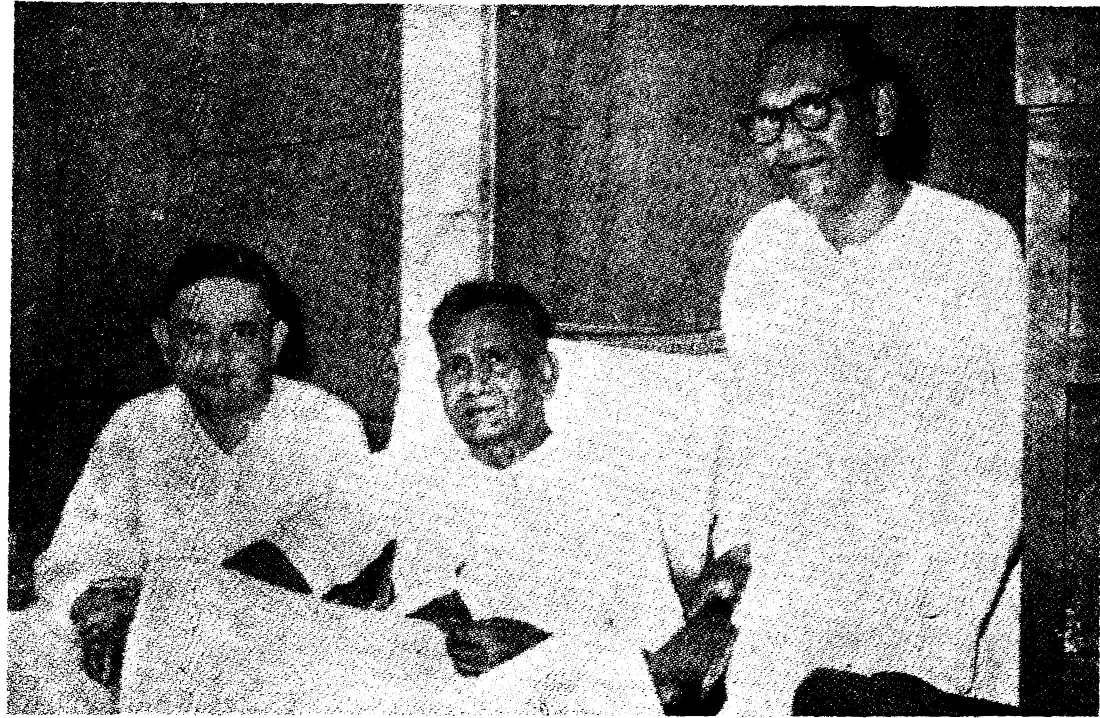
বিষয়সূচী

চিত্রসূচী

এনেছে তব জন্মডালা অজর ফুলরাজি,
রূপের লীলা-লিখন ভরা পারিজাতের সাজি।
অপ্সরীর নৃত্যগুলি
তুলির মুখে এনেছে তুলি',
রেখার বাঁশি লেখায় তব উঠিল সুরে বাজি'।
—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতশিল্পী নন্দলাল

শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল



শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল :: আচার্য নন্দলাল বসু :: শ্রীবিশ্বরূপ বসু

প্রায় আড়াই-শ বছর আগের কথা। এখনকার হুগলী জেলার তারকেশ্বর-হরিপালের কাছেই 'জেজুর' গ্রাম। এই গ্রামেই ছিল শিল্পাচার্য শ্রীনন্দলাল বসুর পূর্বপুরুষের নিবাস। ওখান থেকেই নন্দলালের প্রপিতামহ কৃষ্ণমোহন বসু হাওড়া জেলার রাজগঞ্জ-'বানুপুরে' উঠে এসে বসতি স্থাপন করেন। রাজগঞ্জ 'কাটি-গঙ্গা'র ধারে; বানুপুর মজা-সরস্বতী নদীর তীরে। গ্রামের নাম 'বানুপুর'—মনোমত হয়নি। তাই শিল্পীর পূর্বপুরুষেরই কেউ তাঁদের বসত-গ্রামের নূতন নামকরণ করেছিলেন—'বাণীপুর'। গ্রামটি 'সরস্বতী' নদীর তীরে—সুতরাং নামটি অন্বর্থনামা।

পূর্বপুরুষ ছিলেন জেজুরে। জমি-জেরাৎ ছিল। ক্যাশ টাকাও ছিল। সুখে ছিলেন বনেদী বসু-পরিবার, বৃদ্ধপ্রপিতামহ রাধামোহন বসুর আমল থেকে। সহসা বিধাতা সাধলেন বাদ। জেজুর-বাড়িতে প্রচণ্ড ডাকাতি পড়ল একবার। ফলে, টাকা, গহনা, তৈজসাদি যা ছিল সব তছনছ হ'য়ে গেল। বিপাকে প'ড়ে নন্দলালের প্রপিতামহ কৃষ্ণমোহন বসু তাঁর ছেলে গোবিন্দমোহনকে নিয়ে চলে এলেন পিতৃপুরুষের ভিটে ছেড়ে। গোবিন্দমোহনের ডাকের নাম ছিল 'পুঁটে-কাটা' গোবিন্দমোহন। এ নামের অন্তরালে যে ইতিবৃত্তটুকু আত্মগোপন করে আছে সে বড় অদ্ভুত ঘটনা।—

এক গভীর অন্ধকার রাত্রে আচম্বিতে রে রে করে ঘরে ডাকাতি পড়লো—সে এক ভয়ঙ্কর কাণ্ড। ডাকাত এসেছিল রণ-পা চালিয়ে; ঢুকেছিল দরজা ভেঙ্গে; দরজা ভেঙ্গেছিল ঢেঁকি দুলিয়ে। ঘরে ছিল প্যাছ-সিন্দুক। তাতে ছিল পেতল-কাঁসার বাসন। তা থেকে বগি-থালা সব বের করে, তার কানা ভেঙ্গে ভেঙ্গে, বোঁ বোঁ করে ফিঁকতে লাগল,—গাঁয়ের লোক যারা ডাকাত তাড়াতে এসেছিল তাদের দিকে। ভয়ে আর সেখানে কেউ সাহস করে না এগোতে। ঢেয়ো-ঢাকনা যা ছিল ঘরে, ডাকাতি করে নিয়ে গেল সব। সোনা-রূপোর গহনাগাঁটিও সব নিয়ে গেল ঝেঁটিয়ে।

পিতামহ গোবিন্দমোহন তখন ছ-সাত মাসের শিশু; হামা টেনে টেনে বেড়াচ্ছেন ডাকাতির সময়ে। ডাকাতের মশালের আলোর বাহার দেখে খুব ফূর্তি হয়েছে তাঁর। কেমন করে যেন শোবার ঘর থেকে ছিট্‌কে উঠনে

বেড়িয়ে পড়েছিল ছেলেটি। হামা থামিয়ে হাত তুলে তুলে আলোর ফুলকি ধরবার চেষ্টা করছিল হয়তো। তার কপালের ওপর ঝোঁটনে বিননো ছিল সোনার পুঁটে। ডাকাতেরা কেটে নিলে সেটা। —নন্দলালের ঠাকুরদাদা গোবিন্দমোহনের 'পুঁটে-কাটা গোবিন্দ' খেতাব হলো সেই থেকে।

সেকালের ডাকাত—ডাকাত হলেও তারা মানুষ ছিল। এক ঝিউড়ীর কানে ছিল সোনার মাকড়ি। সে মাকড়ি নিলে কান থেকে ছিঁড়ে। যন্ত্রণায় সে কাঁদতে কাঁদতে বললে,—'খুলে তো দিতুম গো, বললেই; ছিঁড়ে নিলে কেনে, আর গয়না যে এ কানে পরতে পারব নি কখনো'। মেয়ের এই কাতরানি শুনে, ডাকাত বললে,—'আরে যা' যা', বটের আটা দিগে যা', চেঁচাসনি খামকা'। —ঘায়ের ওষুধ বাৎলে দিয়ে গেল ডাকাতে।

সেকালে ডাকাতের যেমন মনুষ্যত্ব ছিল, মানুষেরও তেমনি ইহকাল পরকাল ছিল, ভূত-ভবিষ্যৎ ছিল, মায়া-মমতা ছিল। নতুন গাঁয়ে নতুন বাড়িতে এসে, তাই বোধ হয়, গোবিন্দমোহন গত হয়েও সংসারের মায়া ভুলতে পারেননি। জেজুর ছেড়ে গোবিন্দমোহন বাণীপুরে এসেছিলেন তাঁর বাবার সঙ্গে। গোবিন্দমোহন মারা যাবার পর বাড়িতে অনেকদিন ধরে ভৌতিক উৎপাত হয়েছিল।—জল-ভরতি জালাটা সহসা ফ্যাস্ করে ফেঁসে গেল; উঠনে সিন্দুকটা হঠাৎ আছড়ে পড়লো দুম্ করে; কোথাও কিছু নেই, বোটকা গন্ধ বেরোচ্ছে এদিক্ সেদিক্ থেকে।—সবাই খুব ভীত ও চিন্তিত হয়ে পড়লেন। স্থির হল, গয়ায় পিণ্ডি দেওয়া হোক্। নিবৃত্ত হলো সে-উৎপাত গোবিন্দমোহনের নামে গয়ায় পিণ্ডি দেবার পরেই।

নন্দলালের জেঠতুতো বোন যখন জন্মালেন—সে-সময়েও এক তাজ্জব কাণ্ড। খুব ছোট্ট যখন সে, পুতুল খেল্‌ছে—পুতুলের সাজগোছ করাচ্ছে, আর বিড়বিড় করে কি সব যেন বলছেঃ—'সিন্দুকে সব রেখে এলুম, সিঁদুর-চুব্‌ড়ি, শাঁখা সব ফেলে আসা হয়েছে, পট-টা আনা হলো না'—এই ধরনের। 'কি বলছিস গো'—সবাই যেয়ে হুমড়ে পড়ে জিজ্ঞাসা করলেই, সে-যেন চম্‌কে উঠে সব ভুলে যেতো।

'ফলতার বিল' সেকালে বলা হতো হুগলী-নদীর সঙ্গে সরস্বতী নদী যেখানে যোগ হয়েছিল, এখন মজে গেছে সেই জায়গাটা; এটা এখনকার সাঁকরাইলের কিছু ওপরে। পরে, সেই বিল কেটে গঙ্গাস্রোতের সঙ্গে যোগ করে দেওয়া

হয়। এখনকারের হুগলী-নদীর স্রোত এই 'কাটি-গঙ্গা'র খাতেই বইছে। খাল কেটে গঙ্গার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল—রাজগঞ্জ পর্যন্ত। 'কাটিগঙ্গা'র খাল কাটতেই ওধারের আদিগঙ্গা মজে গেল।

নন্দলালের প্রপিতামহ কৃষ্ণমোহন 'বাণীপুরে' এসে অনেক জমি-জায়গা কিনলেন। ধোপা, নাপিত, বামুন সব এনে এনে বসিয়ে একখানা আস্ত গ্রাম পত্তন করে ফেললেন। তখন ক্লাইভের সময় গড়ের মাঠে ফোর্ট উইলিয়ম আরো বড়ো ক'রে তৈরি হচ্ছে ; অনেক ইঁটের দরকার। কৃষ্ণমোহন এ-সুযোগ ছাড়লেন না।—গঙ্গার দু'পাড়ে পক্-মিল্ বসিয়ে ইঁট, খোলা সব পোড়াতে লাগলেন ;—সরস্বতী নদীর মুখ থেকে শিবপুর পর্যন্ত সে এলাহি কারখানা। ইঁট-টিঁট পুড়িয়ে সে-সব তিনি কোম্পানীকে সরবরাহ করতে লাগলেন। এই করে, প্রভূত টাকা কামালেন তিনি। তাঁর দান-ধ্যানও ছিল খুব। বাড়িতে গুরুদেব এলে, পায়ে মোহর ঢেলে দিয়ে প্রণাম করতেন কৃষ্ণমোহন। কালীঘাটে শিবমন্দির করিয়ে দিয়েছিলেন আদিগঙ্গার ওপর—কালী-মন্দিরের কাছেই। নিত্যসেবার ব্যবস্থা বোধ হয় করেননি। এখন সে-মন্দির কি অবস্থায় আছে, বা আছে কিনা খোঁজ নেওয়া হয়নি।

কৃষ্ণমোহন গত হবার পর সংসারের ভার পড়লো গোবিন্দমোহনের ওপর। ইনি বেশী লেখাপড়া শেখেননি। জমি-জমার আয় থেকেই তিনি তাঁর দু'ছেলেকে মানুষ করেন। ছেলে দু'জনের মধ্যে বড়োর নাম—যোগীন্দ্র, আর ছোট ছেলে হলেন—পূর্ণচন্দ্র। তাঁর মেয়ে ছিল পাঁচজন। তাঁর জীবিতকালেই মেয়েরা বিধবা হলো—বড়ো ছাড়া। বড়োর বিবাহ হয়েছিল নিকটেই আন্দুল-মৌরী গ্রামে। বড়ো ছেলে যোগীন্দ্র বাড়িতেই থাকতেন ; সাহায্য করতেন বাপকে, সাংসারিক কাজে হাত-নুড়কুত হয়ে। বেড়-বাগান সব-কিছুই দেখাশোনা করতেন যোগীন্দ্রনাথ।

গোবিন্দমোহনের ছোট ছেলে—পূর্ণচন্দ্র। ওভারসীয়ারি পাশ করেছিলেন শিবপুর থেকে। সুন্দরবনের ডায়মণ্ডহারবার অঞ্চলে তখন ক্যানেল কাটা হচ্ছিল। সেখানে কাজ নিয়ে গেলেন পূর্ণচন্দ্র। যাতায়াত করতেন বাড়ি থেকেই নৌকো করে। মুঙ্গের জেলার খড়্গপুরেও তখন ক্যানেল কাটা চলছিল। সেখানে কর্তা ছিলেন—উলা-নিবাসী চন্দ্রশেখর বসু। বন্ধুত্বসূত্রে তিনি বিজ্ঞাপন দেখিয়ে, পূর্ণচন্দ্রকে ক্যানেল-ওভারসীয়ার হয়ে যেতে অনুরোধ

করলেন। তাঁর অনুরোধেই পূর্ণচন্দ্র ঐ কাজ নিয়ে গেলেন ওখানে।

গোবিন্দমোহন মাটির মানুষ ছিলেন। ভায়াচারী ঝগড়া, মামলা-মকদ্দমার ঝামেলা তিনি পছন্দ করতেন না। আন্দুল গ্রামে ছিল তাঁর শ্বশুর-বাড়ি। আন্দুলের ক্ষেত্র মিত্রির তখন প্রবল প্রতাপ। ও-অঞ্চলের তখন রাজা তিনি; আর কায়স্থ-সমাজের তখন তিনিই ছিলেন সমাজপতি। কি যেন একটা মামলাতে মিত্রি মশায় সাক্ষী মেনেছিলেন গোবিন্দমোহনকে। আদালত থেকে যথাসময়ে সাক্ষির সমন এলো তাঁর কাছে। সমন পেয়ে তিনি ভীত হয়ে পড়লেন।—সত্যি মিথ্যে কি সব বলতে হবে—তাই নিয়ে তাঁর মহা ভাবনা। 'কোর্টে যাব না'—বললেন তিনি। হাজিরে দেবার দিনে তিনি গা-ঢাকা দিয়ে নৌকায় চড়ে গঙ্গায় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন; দেখাই দিলেন না।

গোবিন্দমোহনকে গঙ্গাযাত্রা করানো হয়েছিল—কাশী মিত্রির ঘাটে। মুখে দুধ-গঙ্গাজল দেওয়া হলো। নন্দলালের সে-সব স্পষ্ট মনে আছে। গোবিন্দ-মোহনের হিন্দুধর্মে ছিল পূর্ণ আস্থা। তাঁর জেঠতুতো ভাইরা ব্রাহ্ম হয়েছিলেন। জ্যাঠামশায় মথুরমোহনের দু'ছেলে বঙ্কুবিহারী আর আশুতোষ ব্রাহ্ম হওয়ায় তাঁদের 'খৃষ্টান' বলতেন তিনি। তাঁর সেই 'খৃষ্টান' ভাইদের সঙ্গে দেখা করেননি কখনো; ক্ষমাও করেননি তাঁদের। ঠাকুরদাদাকে যেমন, ঠাকুরমাকেও তেমনি মনে পড়ে নন্দলালের। সুন্দর চেহারা ছিল ঠাকুরমায়ের। পান ছেঁচে দেওয়া হতো তাঁকে হামানদিস্তে করে; দাঁত মাজতেন তিনি মুখে 'গুল' দিয়ে।

বাড়িতে আসতেন চার পিসেমশাই। বিধবা হয়ে পিসিমারা সবাই এসে উঠলেন বাড়িতে। এতগুলি বোনের তত্ত্ব-তাবাসের খরচা, যোগীন্দ্রের খরচা, তাঁর পাঁচ-ছ' ছেলের খরচা—সবই চলতো সংসারের আয় থেকে। জমি-জমার আয় তখন কমে গিয়েছিল। দিন চলতো কষ্টেসৃষ্টে। নারকল, সুপুরি বিক্রি করে কাপড় হতো সারা বছরের; বাগানের ফলমূল, কলাপাতা বিক্রি করে চলতো হাট-বাজারের খরচা।

নন্দলালের জন্ম হয় বিহারের মুঙ্গের জেলার খড়্গপুর গ্রামে। জন্ম-তারিখ ১৮৮২ সালের ৩রা ডিসেম্বর। তাঁর পিতা পূর্ণচন্দ্র সেখানে দ্বারভাঙ্গা-রাজের জমিদারিতে বন-বিভাগেরও অধিকর্তা ছিলেন। পরে তিনি দ্বারভাঙ্গা-এস্টেটের ম্যানেজার হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন বনেদী ঘরের ছেলে; তাঁর আচার-ব্যবহারেও আভিজাত্যের ছাপ ছিল। প্রায় এক-শ জনের এক বিশাল

একান্নবর্তী পরিবারের তিনি ছিলেন কর্তা। তাঁর বিধি-বিধানে কেউ কখনও খুঁত ধরতে পারেন নি এতটুকুও। পূর্ণচন্দ্র ছিলেন বহু-সন্তানের পিতা। তাঁর ডায়েরী পাওয়া গেছে। তাতে তাঁর গৃহস্থালীর সম্পর্কে বিশেষ বিচক্ষণতার নমুনা দেখা যাচ্ছে।

খড়্গপুরে ক্যানেল-ওভারসীয়র থেকে দ্বারভাঙ্গা-এস্টেটের ম্যানেজার হতে, ওঁদের সংসারের অবস্থা অনেকটা সচ্ছল হল। এক-শ দু-শ করে টাকা মাসে মাসে ঘরে পাঠাতে লাগলেন। নন্দলালের বড় ভাই ও জেঠতুতো ভাইদের লেখাপড়া আর অন্য যাবতীয় খরচার সব ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন। কোলকাতার বেচু চাটুজ্যে স্ট্রীটে নন্দলালের জেঠতুতো ভাইরা সব থাকতেন; ভাইপোরাও সব ছিল। জেঠতুতো ভাইদেরও প্রত্যেকের বিয়ে দিয়েছিলেন পূর্ণচন্দ্র। তাদের পড়াশুনার খরচাও চালাতেন। বড়ো ভাইয়ের ছেলে হরিলাল বোসকে ডাক্তারী পাশ করালেন। ভাইপোরা গেল সব এদিকে-ওদিকে।

॥ বাল্যকাল ॥
(১৮৮২-৯৭)

১৮৮২ সালের ডিসেম্বর মাসে নন্দলাল যখন ভূমিষ্ঠ হলেন তখন তাঁর পিতা যে-বাড়িতে থাকতেন, সে-বাড়ির ছিল খোলার চাল—চক্‌মিলান বাড়ি, ঢুকতেই একটি ছোট্ট ঘর। তার একটিমাত্র জানলা। সে হলো পূর্ণচন্দ্রের বাসা-বাড়ি, এস্টেটের বাড়ি। দ্বারভাঙ্গার মহারাজা তখন রামেশ্বর সিং। তাঁর এস্টেটের ম্যানেজার ছিলেন চন্দ্রশেখর বসু। ইনি হলেন রাজশেখর বসুর ('পরশুরাম') পিতা। চন্দ্রশেখর বসু চলে আসার পরে, ম্যানেজার হয়েছিলেন পূর্ণচন্দ্র। পূর্ণচন্দ্র উচ্চশিক্ষিত ছিলেন না; কিন্তু, দক্ষ ছিলেন খুব। এস্টেট চালাবার মতো প্রখর বুদ্ধি ছিল তাঁর। তাই ম্যানেজারের পদ দেওয়া হল তাঁকেই। ক্যানেল দেখা-শোনার ভারও ছিল তাঁর ওপর; ইঞ্জিনীয়ারের কাজও দেখতেন তিনি।

ছেলেবেলাকার ঘটনা—সাত বছর বয়েসের থেকেই অনেক মনে আছে নন্দলালের। সে-সব স্মৃতি তাঁর এখন এতো দূরে চলে গেছে, যেন স্বপনের মতো মনে হয়। দুঃখের কিংবা সুখের সব ঘটনার যেন তাঁর মনের ওপর

একটা ক'রে আঁচড় কেটে তাদের অস্তিত্বের ছাপ রেখে গেছে। সে-সময়েও দৃশ্য-বস্তু যা-সব দেখেছেন, সেগুলোও সব ঠিক্ ঠিক্ মনে আছে। এদিক্ ওদিক্ হয়নি এতটুকুও। আর এও ঠিক্ যে, এই সকল ঘটনা আর পরিবেশের জল-হাওয়া পেয়েই তাঁর রূপদক্ষ জীবন বিকশিত হয়ে উঠেছে।

ছবি-আঁকা, মূর্তি-গড়া নন্দলাল আরম্ভ করেছিলেন আট বছর বয়স থেকেই। একবার তিনি একটা হাতি আঁকবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর বাবা শ্লেটে হাতী এঁকে দেখিয়ে দিলেন চেহারাটা। ELEPHANT বানানটাও লিখে দিয়েছিলেন। সেই সময়ে নন্দলালের আর একটি 'হবী' ছিল—চ্যাপ্টা পেরেকে ধার দিয়ে ছেনির মতো করা। সেই ছেনি দিয়ে দাগ কাটতে আরম্ভ করলেন। এটা শিখেছিলেন তিনি 'শিল-কাটা'দের কাছে দেখে। তাদের ধরনে শিশু-শিল্পী নন্দলাল ঘরের মেঝেতে নানারকমের ছবি উৎকীর্ণ করতে লাগলেন। সবার অলক্ষ্যে স্নানের ঘরের চৌবাচ্চার তলাতেও ছবি কেটেছিলেন—নিরালা নীচে বসে ; অবশ্য সেই কর্মে বকুনি খাবার ঝুঁকি নিয়েই। ১৯১৭ সালেও ভারতশিল্পীর সেই আদি শিল্পকর্মগুলি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। নন্দলালের সঙ্গে ঐ বছরে শিল্পী শ্রীমুকুল দে খড়্গপুরে গিয়েছিলেন। সেই উৎকীর্ণ ছবিগুলির তিনি তখন রাবিং এনেছিলেন সযত্নে। রাবিংগুলি এখনও রাখা আছে নন্দলালের কাছে। বড়ো বড়ো নাগরী হরপে 'নন্দলাল বসু' নামটিও খোদাই করেছিলেন তিনি তখনই—ভবিষ্যতের ভারতশিল্পী নন্দলাল।

ক্রমশঃ হাতের কাজ করতে লাগলেন নন্দলাল।—দুর্গার প্রতিমা দেখে, আর তাজিয়া-গোঁয়ারা দেখে, তিনি নিজে সেই রকম করার চেষ্টা করতেন। কাগজ কেটে, কাপড় কেটে, মাটি দিয়ে, রং করে ঐরকম বানাবার চেষ্টা চলতো। এই কাজে শিল্পীর সঙ্গীও জুটেছিল পাড়ার সমবয়সী ক'জন ছেলে। তবে, তারা তৈরী করত ধড়টা; খোদ শিল্পী তৈরী করতেন মুণ্ডু। নারদের মুণ্ডু করেছিলেন তিনি।—কাঠি দিয়ে দাগ কেটে, শণ দিয়ে দাড়ি গোঁফ বানিয়েছিলেন। হলদে এলা মাটি দিয়ে রং ফলাতেন। দুর্গাপূজোর সময় আর মহরমের সময় ওঁদের কাজের ধুম লেগে যেত। অবশ্য ঐ সময় ঐ সবই ছিল শিশু-শিল্পী নন্দলালের খেলা। কিন্তু, খেলারও প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হতো।—ঐ সব ঠাকুর-দেবতার মূর্তি বা তাজিয়া-গোঁয়ারা একটা ঘরে রেখে ওঁরা উৎসব করতে লেগে যেতেন।

নন্দলাল মূর্তি তৈরী করতে আরম্ভ করেন একটু বেশী বয়েসে। তখনও তাঁর বিবাহ হয় নি। খড়ি কেটে চিংড়ি মাছ, আর মাটি দিয়ে দিয়ে শাঁক তৈরী করেছিলেন। শিল্প বিষয়ে প্রথমে যে আরম্ভ করলেন সে ঐ মাটি দিয়ে আর খড়ি কেটে-কেটেই পত্তন করেছিলেন। সেই সময়কার করা কিছু শিল্পকর্ম নন্দলালের শ্বশুরবাড়িতে ছিল। খড়ির চিংড়ি মাছ আর মাটির শাঁক তাঁর শ্বশুরমশায় নিয়েছিলেন। বাবার কাছেও ছিল, সে-সব নষ্ট হয়ে গেছে।

চন্দ্রশেখর বাবু যখন ওখানে ছিলেন, তাঁর ছেলেদের লেখাপড়ার জন্যে একটা প্রাইভেট ব্যবস্থা করেছিলেন। সেই ক্লাসে নন্দলালও যেতেন। চন্দ্রশেখর বাবুর ছেলেমেয়েরা পড়তো নিয়মিত; কিন্তু নন্দলালকে বসিয়ে রাখা হতো। তখন রাজশেখর বসু (পরবর্তী কালের 'পরশুরাম') পড়তেন নন্দলালের সঙ্গে। ক্লাসে বসে কি-যে ভাবতেন—সে-কথা মনে নাই আজ শিল্পীর। ক্লাসে চাঁচের চাটাই পাতা থাকতো। বাঁশের চাটাইয়ের সেই চেপ্টা চাঁচড়ি চিরে চিরে ঘোড়া, উট—এই সব তৈরী করতেন তিনি। সে-সব বেশ মনে আছে। ক্লাসে গিয়ে এই রকম খেলা চলতো—শিল্পীর শিল্প-ক্রীড়া।

দেশের বাড়িতে থাকতে পড়তে যেতেন নন্দলাল ঝোড়হাটের মধ্য-বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে। পাততাড়ি-চেহারার নিত্যগোপাল পণ্ডিত পড়াতে আসতেন আন্দুল থেকে ঝোড়হাটে। নন্দলাল ইস্কুলে যেতেন হেঁটে। দু-বগলে থাকতো মাদুর আর বই-দপ্তর। মাটির দোয়াতের গলায় দড়ি-বাঁধা, ঝোলানো থাকতো হাতে। কোঁচড়ে থাকতো মুড়ি মুড়কি; আর লজেন্স নিতেন কিনে। নন্দলাল তখন ছোট্ট শিশু—বয়স আট ন' বছর। হেঁটে যেতেন জেলে-পাড়ার ভেতর দিয়ে দিয়ে। জেলেদের বড়ো বড়ো জাল শুকোতো তেঁতুল গাছে। তার ভেতর দিয়েই পথ গিয়েছে বেঁকে। মাঝে মাঝে সেই জাল বেড়ে চলতো লুকোচুরি খেলা। আজ বিরাশী বছর বয়সে ভারতশিল্পীর নাকে জালের সেই আঁষটে গন্ধ যেন লেগে আছে এখনও।

যেতেন দল বেঁধে। একদিন গেছেন বুনো ফুল তুলতে; হাতে গেল শুঁয়ো লেগে। জেলেদের একটি মেয়ে তাড়াতাড়ি এসে, কচুপাতার ডাঁটা ঘষে তুলে দিলে কাঁটাগুলো। সন্ধ্যার সময় দেখতেন, জেলেরা জাল বুনছে। জেলেরা জাল বুনতো আর গান গাইতো। জাল বুনতো প্রদীপ জ্বেলে।

সে-প্রদীপ জ্বালতো ইলিশ মাছের তেল দিয়ে।

বুড়ো জেলে, নাম তার নফর ধাড়া। বয়স আশির কোঠা পেরিয়েছে। কিন্তু দাঁত ছিল তার ছেলে-মানুষের দাঁতের মতো শক্ত। চাল-কলাই ভাজা চিবিয়ে খেতে পারতো নফর ধাড়া সেই বয়সেও। নন্দলাল জিজ্ঞেস করলেন,—'দাঁতে তোমার এত ধার, দাঁত তোমার এতো শক্ত হ'লো কি করে?' 'তোমাদের মতন আমরা মাজন তো পাই না বাবু,—ঘুঁটের ছাই দিয়ে দাঁত মাজি'—বললে নফর ধাড়া।

গরু-মানুষের হাড়-উঠলে বা খিল সরে গেলে 'সেট্' করতে পারতো নফর ধাড়া। এ-গাঁ, সে-গাঁ থেকে 'ডাক' আসতো তার। লোকেরা খাতির করে পালকি পাঠাতে চাইতো তাকে নিয়ে যেতে। সে বলতো,—'জেলের ছেলে, পালকিতে চড়বো না'। বলতো,—'বরং দু-জন লোক নিয়ে এসো'। সেই লোকের কাঁধে চড়ে, কুবেরের মতন নরবাহন হয়ে নফর ধাড়া চলতো—'কল'-এ।

শিশু নন্দলালের একবার কুঁচকির ওপর ফোড়া উঠেছিল। নফর ধাড়া বললে,—ওটা সে কাটবে না। ওষুধ দেবে। ওষুধ দিলে। ফোড়াটার একটা মুখ বের হল। কড়াই-এর মতো গর্ত দিয়ে পুঁজ বেরোতে লাগল। তখন সে ওষুধ দিলে—গাছগাছড়া আর কই মাছের কান্‌কো। এ ওষুধগুলো ছিল ধাড়া-বুড়ীর সম্পত্তি।

নন্দলালদের বাণীপুরের বাড়ি দ্বিতীয় দফায় যেখানে উঠেছিল, সেখানে আগে ছিল চালাঘর। সেই চালাঘরের পাশের বাড়িতে একটা পাঠশালা বসতো। সন্ধ্যাবেলায় ক্লাসের শেষে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামতা পড়ানো হ'তো সেখানে। শুভঙ্করীর 'আর্যা' পড়ানো হ'তো সুর ক'রে। সকালে ছেলেরা তালপাতার ওপর লিখতো রোদে বসে বসে। লেখার সেই কালি তৈরী করতো চাল-চুঁইয়ে, ভুসো দিয়ে সে কালি মেড়ে। সে পাঠশালায় শাস্তিও হ'তো হরেক রকমের। হাতে, ঘাড়ে, কানে ধরে আনা হতো ছেলেদের। চ্যাং-দোলা করেও তুলে আনা হ'তো। দাঁড়-করানো, নীল-ডাউন, হাতে ইঁট, পেন্সিল গলিয়ে আঙ্গুল টেপা—এই সব শাস্তির দৃশ্য পাঠশালায় দেখেছিলেন নন্দলাল। ওখানে পড়েছিলেন তিনি।

দেশের প্রথম বাড়ি থেকে নন্দলালের দুই বোন নীলনলিনী আর



কুবেরের মতন নরবাহন হয়ে নফর ধাড়া চলতো—'কল'-এ-নন্দলাল

কিরণবালার বিয়ে হলো এক রাত্রে। নীলনলিনীর বর এলো আমতার ছোটময়রা থেকে। সরাসরি এলো শালতিতে চেপে। সাঁকরাইলের ঘোষেদের বাড়ি হ'য়ে এলো। সঙ্গে একশো-দেড়শো জন লেঠেল। এলো মশাল জ্বেলে। বাজি পোড়ালো ধুমধাম করে। দেউলপুর থেকে বর এলো জেঠতুতো বোন কিরণবালার। তারাও বাজি এনেছিল বহুত। মাথায় খাটো নন্দলাল বাজি ভালো করে দেখতে পাবেন বলে, উঠেছেন একটা কল্‌কে ফুলের গাছের ওপর। এদিকে, একটা বোমা যেই-না ছুঁড়েছে, অমনি সে-গাছটা ফেড়ে গেল ; আর ধপ্‌ করে মাটিতে পড়ে গেলেন নন্দলাল। বিয়ে-বাড়ি চুকলো। এই সময়ে খড়্গপুর থেকে ঘি, চাল, ডাল সব পাঠিয়ে দিয়েছিলেন নন্দলালের বাবা পূর্ণচন্দ্র।

নন্দলালের মা ক্ষেত্রমণি খয়েরের পুতুল গড়তেন। পলি-এঁটেল মাটি পেলেই তিনি বসে বসে নরুণ দিয়ে ছাঁচ কাটতেন। সে ছাঁচগুলো এখনও বোধ হয় বাণীপুরের বাড়িতে সিন্দুকের মধ্যে পড়ে আছে। নন্দলালের ভাই রমানাথের সঙ্গে যোগাযোগ করলে এখনও সেগুলো পাওয়া যেতে পারে।

রাজশেখর বাবুরা খড়্গপুরে যে-বাড়িতে থাকতেন, ওঁরা চলে গেলে, নন্দলালেরা উঠে এলেন সেই বাড়িতেই। পূর্ণচন্দ্র তখন ম্যানেজার। ঐ বাড়িতেই নন্দলালের মা মারা গিয়েছিলেন। মা মারা যাবার সময়ে নন্দলালের বয়েস—তের। মাকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হলো। নন্দলালের দাদা গোকুলচন্দ্র মুখাগ্নি করলেন। তাঁকে দাহ করা হয়েছিল খড়্গপুরের মণি নদীর তীরে। মণি নদীর দুই কূলের প্রাকৃতিক পরিবেশ আর নানা মানুষের জীবনচিত্র নানা ধরনে আঁকা আছে নন্দলালের কাছে। মণি নদীর এই শ্মশানে নন্দলালের শ্বশুরমশায়, দাদা-শ্বশুর, দিদি-শাশুড়ী সবাই আছেন। নন্দলালের মা মারা গেলেন প্রসব করার সময়। একটি মেয়ে প্রসব করে তাঁর মা মারা গেলেন। তখন নন্দলালের পিসিমায়েরা সকলেই জীবিত। মেজো, সেজো, ন', নতুন—প্রায় সবাই তখন বেঁচে আছেন। নন্দলালের ছোট-পিসিমা মোক্ষদা দেবী হলেন শিল্পী শ্রীসুরেন্দ্রনাথ করের মা। এই ছোট-পিসিমাকে আঁতুড় থেকেই পালন করতে লাগলেন নন্দলালের ন' পিসিমা বরদা দেবী। ন' পিসিমার বিয়ে হয়েছিল হরিপালের মিত্রি-বাড়িতে। তিনি নন্দলালকেও মানুষ করেছিলেন ; খুব ভালবাসতেন। হিন্দুস্থানী একজন

ধাইও নিযুক্ত করা হয়েছিল। সে-ও সেবা-যত্ন করতো খুব। তখন ওঁদের সংসারে খুব বিপদের সময় যাচ্ছে।

নন্দলালের মা দেখতে ছিলেন ঠিক্ নন্দলালের কন্যা যমুনাদেবীর মতো। নাক চোখ মুখ চুল খুব ভালো ছিল দেখতে। শেষে মোটা হয়ে গেলেন। মোটা ছিলেন বলে তিনি একজায়গাতেই বসে থাকতেন। নন্দলালের মা ছিলেন খুব ভালমানুষ; সাতে-পাঁচে কথা কইতেন না। তিনি সুন্দরভাবে হাতের কাজ-সব করতে পারতেন—কাঁথা-সেলাই, কাঁথায় কাজ, খয়েরের পুতুল, ছাঁচ-কাটা—এই রকম সব নানা শিল্পকাজ তিনি করতেন। শান্তি-নিকেতন-কলাভবনে 'খ'-লেখা ছাঁচ একটা রাখা আছে। তাঁর আরও ছাঁচ ছিল—ক্ষীরের ছাঁচ, পদ্মের ছাঁচ—এই রকম সব। ছাঁচ তৈরী করে নিজেরাই তুঁষের আগুনে ঘরেই পুড়িয়ে নিতেন তখন। সে-কালের গেরস্থ-ঘরে এই রকম ছাঁচ-পোড়ানোর রেওয়াজ ছিল।

মা বসে বসে ছাঁচ কাটছেন—শিল্পী নন্দলালের আজও মনে আঁকা আছে সে ছবি। তখন ফটো তোলানোর চলন ছিল না। সাধারণ গৃহস্থ-লোকের শিল্প-রুচিও সেকালে এতো প্রখর হয়নি যে, স্ত্রীর ছবি করিয়ে রেখে দেবে। সুতরাং, তাঁর আলোকচিত্র, তৈলচিত্র বা স্কেচ্ কিছুই এখন আর পাওয়া সম্ভব নয়।

সংসার-ধর্মেই মগ্ন ছিলেন নন্দলালের মা। গঙ্গাস্নান, গয়া কাশী,—এই সব তীর্থ করার শখ ছিল না তাঁর মোটেই। ঘরের কর্ত্রী ছিলেন তাঁর পিসিমা। হাট-বাজার করতেন নন্দলালের বাবা। সে-সব তোলা-পাড়া, থেতনো-পেতনোর কাজও ছিল পিসিমায়েরই।

মা মারা গেলে পিসিমা চেষ্টা করলেন বাবার বিয়ে দিতে। তাতে পূর্ণচন্দ্রের রাগ হয়েছিল খুব। 'ছেলেগুলোর গলায় পা দিয়ে মারবে'—বলেছিলেন তিনি। আন্দুলেই সম্বন্ধ করেছিলেন পিসিমা।

সে সময়ে নন্দলালের মামাবাড়ি স্বস্ত্যানগাছি (আধুনিক 'সিপাইগাছি') থেকে সম্পত্তির আয় বাবদ টাকা-কড়ি আসতো। সে গ্রাম ছিল জেজুরের কাছেই। স্বস্ত্যানগাছির রামগোপাল মজুমদার ছিলেন নন্দলালের বৃদ্ধপ্রমাতামহ। তাঁর ছিল পাঁচ পুত্র। জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণমোহনের ছেলে বেণীমাধব হলেন নন্দলালের মাতামহ। মামাবাড়ির দেশে খেজুরগাছের আয় ছিল বিস্তর। নন্দলালের বাবা

সে-সব পেয়েছিলেন শ্বশুরবাড়ির সূত্রে। তার উপস্বত্ব বাবদ বছর বছর আসতো খেজুরের গুড় দু'তিন নাগরি করে, নগদ টাকাও আসতো। সহসা সে-সব আসা বন্ধ হয়ে গেল। নন্দলালের বাবা বলতেন,—'ওরা ওসব দেক্-না-দেক্, ওদের চর্চা করো না ; ওদেশে কখনো যেয়ো না। মামাবাড়ি গেলে মরবে ; মেরে দেবে ওরা'। কিন্তু মামাদের ঐ উপস্বত্ব ফাঁকি দেবার অভিসন্ধি টেকেনি। এঁদের স্বত্বের জমি যখন ওঁরা বিক্রি করতে গেলেন তখনই ওঁরা মুশকিলে পড়লেন। এঁদের বিনা স্বাক্ষরে সে-সম্পত্তি বিক্রি হতে পারে না ;—ফলে, ফাঁদে পড়লেন ওঁরা ; সুযোগ বুঝে এঁরা ধরলেন চেপে। সেকালের অভিজাত্যের দস্তুর মতো মামারা ডাকাত পুষতেন, ডাকাতি করাতেন, হয়তো করতেনও ; মোদ্দা কথা, ডাকাতদলের সর্দার ছিলেন তাঁরা—এ-কথা বলা যেতে পারে।

নন্দলালের মা জীবিত থাকতেই নন্দলালের ভাবী স্ত্রীর জন্ম হলো। ওঁর মা ওঁদের বলেছিলেন, ওঁদের মেয়ে হলে নন্দলালের সঙ্গে বিয়ে দেবেন। জন্মের আগে থেকেই সে-কন্যা বাগ্‌দত্তা। বিবাহের সম্বন্ধ নন্দলালের মা-ই করেছিলেন। সে-সময়ের কথা শিল্পাচার্যের বেশ মনে আছে। তাঁর ভবিষ্যৎ পত্নীর বয়স যখন চার-পাঁচ, তখনও নন্দলালের মা জীবিত। তখন ভাবী বধূকে ওঁদের বাড়ী বেড়াতে নিয়ে আসা হতো। নন্দলালের মা সেই টুকটুকে একরত্তি কন্যাটিকে খুব আদর করতেন, কোলে বসিয়ে খাওয়াতেন। নন্দলালও যেতেন প্রায়ই তাঁর ভাবী শ্বশুরবাড়িতে বেড়াতে—মণি নদীর ওপারে। নানা প্রকারের তত্ত্ব আসতো সব—যখনকার যে পাল-পার্বণ সেই রকমে ; অর্থাৎ তখনই মণি নদীর এপারে-ওপারে দুই সংসারে বৈবাহিক সম্বন্ধের একটা পাকা সেতু বাঁধবার চেষ্টা চলছিল।

এবারে নদীর ওপারের সংসারটির প্রসঙ্গ করা হচ্ছে।—নন্দলালের পিতা পূর্ণচন্দ্র যখন রাজ-এষ্টেটের ম্যানেজার সেই সময় এক ভদ্রলোক প্রসন্নকুমার পাল ওখানে জমি কিনলেন বিস্তর। সে জমির বেশীর ভাগই হলো খেজুর বন। ক্যানেল হবার আগে এই সব জমি অনাবাদী পড়ে থাকতো। তখনকার ই. আই. রেলওয়ের জামালপুর-ষ্টেশনের আগে বরিয়ারপুর ষ্টেশনের নিকটে পালমশায়ের এই সব খরিদা জমি। সে সময়ে একটি খালের ওপর 'সাত ভোমরা' সেতু তৈরী হচ্ছিল। সেই পুল-বাঁধার ঠিকাদারি নিয়ে প্রসন্নবাবু গিয়েছিলেন ওখানে। থাকতেন তিনি ভাগলপুরে। ওঁদের আদি-বাড়ি হলো

হুগলী মগরার কাছে বাগাটি গ্রামে। ওপারে চব্বিশ-পরগণার হালিসহরের মিত্রিদের সঙ্গে মামাবাড়ির সম্পর্ক ছিল ওঁদের। ভাগলপুরে প্রসন্নবাবুর বড়-ভাই বড়ো উকীল ছিলেন। পুল তৈরীর সময়ে ইনি খড়্গপুরে অনেক জায়গা জমি কিনে ফেললেন।—সে প্রায় একটা ছোট-খাটো জমিদারির মতো—পরিমাণ হবে প্রায় চার-পাঁচশো বিঘে। রাজ-এষ্টেটের ম্যানেজার পূর্ণচন্দ্রের সঙ্গে সহজেই পালমহাশয়ের বন্ধুত্ব জমে উঠলো। বিশেষ করে তাঁদের বন্ধুত্ব ঘনিষ্ঠতর হ'ল বৈষয়িক সম্পর্কে। পরে, এই প্রসন্নকুমার পালমশায়ই হ'য়েছিলেন নন্দলালের দাদাশ্বশুর। প্রসন্নকুমারের পুত্র প্রকাশচন্দ্র ছিলেন নন্দলালের স্ত্রী শ্রীমতী সুধীরা দেবীর পিতা।

খড়্গপুরের অনেক স্মৃতি শিল্পাচার্যের মনে আঁকা আছে এখনও। সেখানকার মস্ত এক জমিদার ছিলেন—হাজী-জী। ঘনঘন ভেট আনতেন তিনি খড়্গপুরের বাড়িতে। প্রায়ই আসত লাড্ডু আর আমসত্ত্ব। নন্দলালের পিসিমা ছুঁতেন না সে সব ; ওঁরা খেতেন। ভৃত্য হরিয়া খেতো। আন্দুল-বাড়িতে যারা কাজ করতো তারা ওখানে গেলে, পিসিমা বলতেন,—'ওদের এক তাড়া আমসত্ত্ব দিয়ে দাও'। হাজী-জী আসতেন মস্ত একটা গরুর গাড়ীতে চেপে। গরুর গলায় কড়ি-বসানো চামাতির সঙ্গে ঘণ্টা বাঁধা। প্রকাণ্ড বড়ো সে গরুর গাড়ী।

নন্দলালের জেঠতুতো ভাইয়েরা—হরিলাল, কেশবলাল, রঙ্গলাল, অমৃতলাল সবাই যেতেন খড়্গপুরের বাড়ীতে—শরীর সারাতে। থাকতেন সেখানে এক-নাগাড়ে প্রায় দু'তিন মাস ধরে। ফলে, তখন এঁরা থাকতেন কোণঠাসা হয়ে। মাছ-মাংস খাওয়া হতো খুব। ছাগল-টাগল কিনে এনে একজন সাঁওতালকে 'পুষ্যি' দেওয়া হতো।

খড়্গপুরের বাড়িতে যখন আত্মীয়-অতিথি আসার ধুম তখন পূর্ণচন্দ্রের বেতন তিনশো টাকার বেশী ছিল না। ওখান থেকে যখন দ্বারভাঙ্গায় গেলেন তখন তাঁর নাম-ডাক খুব। চারদিকেই ওঁর নামে কানাঘোষা চলছে। চন্দ্রশেখর বসুর পরে উনি তখন ম্যানেজার মহারাজ তখন লছমনেশ্বর সিং। তিনি পূর্ণচন্দ্রকে ভালবাসতেন খুব।

সেই সময়ে খড়্গপুরে একবার বাঘের উৎপাত হলো। মানুষ গরু সব ধরে ধরে মারে, আর নিয়ে যায় ; আড্ডা ছিল গাঁয়ের ধারে-কাছেই। বলতে

লাগল সবাই,—এ তো বাঘ নয়, দেবতার উৎপাত ; বাঘের পুজো দিতে হবে। এস্টেটে খবর গেল।—উত্তর এলো 'খরচ দেওয়া হচ্ছে, সার্চ করো'। রাজা ঠাট্টা করে লিখলেন,—'পুজোর বন্দোবস্ত করা হবে'। কিন্তু আশ্চর্য হচ্ছে এই,—পুজো করার পর থেকে সত্যিই বাঘের উৎপাত কমে গেল। সবাই 'ফিষ্টি' করলে। সাঁওতালরাও উৎসব করলে। জিব-ফোঁড়া, ভূত-নামানো, কোড়া-মারা হলো—ফড়াং ফড়াং করে তালে-বেতালে মাথা চালতে থাকে, আর তাতেই ভূত নেমে আসে। ওজার শরীরে 'ভর' করে ভূতে। তখন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হয় 'দেওতা'কে। এই সব অনুষ্ঠান হলো ঐ সময় ওখানে—বিহারের একটি অজ পাড়াগাঁয়ে :

পরে, শান্তিনিকেতনে এসে, সুরুলগ্রামে নন্দলাল ঐ রকম 'ভর' হওয়া দেখেছিলেন। সুরুলে বাগদীদের একটি মেয়েকে ঐ রকম 'ভর' হয়েছিল। গুম্ হয়ে বসেছিল সে ; আর তাকে ঘিরে লোকের ভিড়। নানা লোকে নানা প্রশ্ন করছে মেয়েটিকে। আর 'ভর'-গ্রস্তা সেই মেয়েটির মাধ্যমে প্রত্যেকের প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর আর উচিত আদেশ দিয়ে যাচ্ছে ভূতে।

খড়্গপুরে লেকের ধারে একটি মহুয়া বন। এক সাঁওতাল তার কামিনীকে নিয়ে গেছে সে-বনে মহুয়া কুড়ুতে। একটি মহুয়া গাছে ছিল একটা প্রকাণ্ড ভালুক। এদের দেখতে পেয়ে সেই ভালুকটা গাছ থেকে তরতর করে নেমে এসে আক্রমণ করলে পুরুষটিকে। এই-না দেখে, কামিনীটা করলে কি, সঙ্গে সঙ্গে টাঙ্গি দিয়ে ভালুকটার মাথায় মারলে প্রচণ্ড এক কোপ। আর সেই এক ঘায়েই ভালুক পড়লো কাৎ হয়ে ; পালালো টল্‌তে টল্‌তে। এরা বাঁচলো প্রাণে। বেঁচে গেল বটে, তবে হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল অনেক দিন। নন্দলালদের বাড়ির কাছেই ছিল সে হাসপাতাল। ওঁরা দেখতে যেতেন।

বাঘ-শিকারের কথা মনে আছে নন্দলালের। এক গ্রামে একটা বাঘ একটি গরীব চাষীর কুঁড়ে-ঘরে ঢুকে পড়েছিল। চাষীটির ছিল উপস্থিত-বুদ্ধি। ঘরের মধ্যে বাঘ-ঢোকা দেখেই, সে চট্ করে শেকল তুলে দিয়েছে। বাঘটাকে শেকল-আঁটা ঘরে পূরে, সে খবর দিলে পাড়ায়, খবর দিলে পূর্ণচন্দ্রকেও। তিনি তখন তাঁর সিপাই, পালোয়ান আর কুস্তিগিরদের সব পাঠিয়ে দিলেন। আখড়াতে তখন কুস্তিগিররা কুস্তি করতো নিয়মিত। কাছারিতে হতো খাজনা

আদায় ; সেখানে থাকতো পাহারাওয়ালারা। ঢং ঢং করে ঘণ্টা হলো ; আর ওদিকে সঙ্গে সঙ্গে 'পাকড়ো' 'পাকড়ো' রব উঠলো। চললো সবাই বাঘ মারতে। সিপাইরা সঙ্গে নিয়ে চললো 'গাদা-বন্দুক'।

এদিকে, বাঘ ঘরের ভেতর ঢুকে বসে আছে। ঘরের ছোট্ট চাল। চালের উলুখড় সরিয়ে, গুলির পর গুলি চালালে। কিন্তু এমন তাক্, দশ-বারোটা গুলির লাগলো না একটাও। সিপাইদের পাঁচ-ছ জন তখন উঠে পড়েছে চালে। এদিকে, বাঘটা করেছে কি, একটা সিপাইকে ধরে, চাল ফুঁড়ে নীচে লাফিয়ে পড়েছে। নীচে ছিল বিস্তর লোক। লাঠি-সোঁটা বাগিয়েই ছিল তারা। ঠেঙ্গিয়েই মেরে ফেললে বাঘটাকে। বন্দুক কোনও কাজেই লাগলো না।

বাঘ তো মারা হ'লো। মরা বাঘটাকে তুলে নিয়ে এলো পূর্ণচন্দ্রের কাছারিবাড়িতে। ছালটা ছাড়ানো হলো। মাথাটাও তার বাঁধানো ছিল অনেক দিন ধরে। বেশ বড়ো একটা হরিণের শিং-ও বাঁধানো ছিল। সে-হরিণটা ছিল বারো-শিং-এর। মাথা সমেত শিং-গুলো বাঁধানো হয়েছিল।

বয়েস হলে হরিণের শিং আপনি খসে যায়। লড়াই করেও অনেক সময় তারা শিং খোয়ায়। সে শিং পড়ে থাকে বনে বাদাড়ে। সাঁওতালরা কুড়িয়ে এনে বিক্রি করে।

পরে, নন্দলাল দেখেছিলেন, অবনীবাবুর কাছেও কয়েকটা হরিণের শিং ছিল, আর ছিল দুটো হাড়—এটার চেয়েও পুরাতন। নন্দলাল গণেন মহারাজকে একটা হরিণের শিং দিয়েছিলেন—সিষ্টার নিবেদিতার ইস্কুলে রাখবার জন্যে। শম্বর হরিণের ডাল-ওয়ালা শিং ঘষে ওষুধ হয়। এই ওষুধে কুচকুচে চুল গজায় মাথার মসৃণ টাকে।

বাবার ছিল হুলো বেড়াল। থাকতো সে খাটের তলায়। একদিন একটা গোখরো সাপ উঠছিল সে ঘরের ভেতর। থাবা দিয়ে হুলো তখন মেরে দিলে গোখরোটাকে। সেই থেকে পূর্ণচন্দ্র হুলোর জন্যে, ভঁইষা দুধের স্পেশ্যাল-ভাবে ব্যবস্থা করেন।

এক ছিলেন ব্রাহ্মণ, নাম তাঁর মতিবাবু। তিনিও ঠিকেদারি নিয়ে এলেন নন্দলালের দাদাশ্বশুরের মতো। মতিবাবুও আগে ওখানে অনেক জায়গা-জমি কিনে ফেলেছিলেন—পালমশায়ের দেখাদেখি। পূর্ণচন্দ্রের সংসার, পালমশায়ের

সংসার, আর মতিবাবুরা —এই তিন সংসারের খুবই মাখামাখি ছিল। নন্দলালের, মতিবাবুর ছেলের আর চন্দ্রশেখরবাবুর বড় ছেলে রাজশেখরের ইস্কুলে যাবার মতো বয়স হতেই বাড়ীতে পড়বার ব্যবস্থা করে ফেললেন কর্তারা। নন্দলালদের বাড়ীতেই একটা ছোট ইস্কুলের মতো বসে গেল। বাঙ্গালী শিক্ষক রাখা হলো একজন। বাঙ্গালী ডাক্তারও পাশে ছিলেন এক ঘর। এতে প্রবাসে ওঁরা বেশ অনেক ঘর বাঙ্গালী হ'য়ে, একটা বাঙ্গালী সমাজের পরিবেশ গড়ে তুলেছিলেন। পূর্ণচন্দ্র বাঙ্গালী মাষ্টার আনিয়ে নিলেন খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন বের করে। মাষ্টার থাকতেন, খেতেন পূর্ণচন্দ্রের বাড়ীতে। কিছুদিন পর মাষ্টার আর দরকার হল না।

নন্দলালের ছোট পিসেমশায় দীননাথ করও থাকতেন পূর্ণচন্দ্রের বাড়ীতে। দীননাথ হচ্ছেন শিল্পী শ্রীসুরেন্দ্রনাথ করের বাবা। হুগলী জেলার ভাণ্ডারদহে ছিল এঁদের দেশের বাড়ী। তিনিও ঠিকেদারি নিয়ে গিয়েছিলেন ওখানে। নন্দলালের মনে পড়ে —বড়ো বড়ো খাতা নিয়ে তিনি কুলীদের হিসেব লিখছেন আর পয়সা-কড়ি মেটাচ্ছেন। রাত্রেও খেতেন ওখানে। খাবার ঢেকে রাখতো হরিয়া। তখন মেয়েরা থাকতো না ওখানে।

চৌদ্দ বছর বয়েস থেকেই ওখানে ছিলেন দীননাথ। পূর্ণচন্দ্র ছেলের মতো স্নেহ করতেন তাঁকে। কাছছাড়া করতেন না কখনও। সে-কথা দীননাথ মৃত্যুশয্যাতেও ভুলতে পারেননি। সুরেনবাবুর বড় ভাই বনোয়ারীলাল বাড়ীর গার্জেনের মতো ছিলেন নন্দলালদের ঘরে। তাঁদের সংসারের তত্ত্ব-তদবির সব করতেন তিনি।

খড়্গপুরের মিডল ভার্ণাকুলার স্কুলে ভরতি হলেন নন্দলাল। ওখানে হিন্দীতেই পাঠ পড়ানো হতো সব। ইংরেজী তেমন পড়ানো হতো না। এই স্কুলে চার বছর পড়ে, পরীক্ষায় পাশ করেছিলেন নন্দলাল। নন্দলালের জীবনে এই প্রথম পরীক্ষায় পাশ ক'রে সার্টিফিকেট পাওয়া। পরীক্ষা হয়েছিল হিন্দীতে। তাঁর বাঙ্গালা পাঠ শুরু হয়েছিল কলকাতায় আসার পরে। ওখানে থাকতে তিনি যেন পাকা হিন্দুস্থানী বনে যাচ্ছিলেন।

স্কুল ছিল কাছেই। পথের দু'ধারে ছিল দুটি ঠাকুরবাড়ী। একটি হচ্ছে রামসীতার মন্দির। আর একটি হল বিষ্ণুর। স্কুলের কাছাকাছি

ছিল রামসীতার মন্দির। রামসীতার মন্দিরে থাকতেন নন্দলালের এক শিক্ষক। তিনি প্রায়ই এই বাঙ্গালী ছাত্রটিকে ভোজ খাওয়াতেন। শিক্ষকটি জাতে ছিলেন রাজপুত। তিনি ইংরেজী পড়াতেন নন্দলালকে; বাড়ীতে এসে পড়িয়ে যেতেন। পড়াতেন এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা ধরে। তাঁর ছিল পেন্‌শনের পাকা ব্যবস্থা। হেতু, তিনি বাঘ মেরেছিলেন। বাঘ-মারার চিহ্ন ছিল তাঁর কাঁধে। কাঁধটা তাঁর প্যারালাইজ্‌ড্‌ হ'য়ে গিয়েছিল। বাড়ীতে বসে থাকতেন তিনি, আর বসে বসে সিদ্ধি ঘুঁটতেন। তাঁর সিদ্ধি-ঘোঁটার কায়দা ছিল নানা বক্কাল দিয়ে। সে বক্কাল হ'ল —বাদাম, পেস্তা —এই সব। নন্দলাল খেতেন নীরটুকু বাদ দিয়ে কেবল ক্ষীরটুকু, অর্থাৎ সিদ্ধি বাদ দিয়ে কেবল বাদাম আর পেস্তা।

দুপুরে টিফিন হতো। বাড়ী থেকে লুচি দুধ নিয়ে যেতো গৃহভৃত্য; স্কুলে বসে খাইয়ে-টাইয়ে তবে সে ফিরতো। স্কুলের হেডমাষ্টার ছিলেন একজন মুসলমান। পাটনায় ছিল তাঁর বাড়ী। নাম তাঁর গণি —তাঁর বাবার নাম —মহম্মদ হোসেন। আরও চারজন শিক্ষক ছিলেন। নন্দলালের গৃহশিক্ষকও এখানে শিক্ষকতা করতেন। ইংরেজীর ক্লাস হতো একটা। অঙ্ক শেখানো হতো খুব ভালভাবে। অ্যারিথ্‌মেটিক্‌, অ্যালজেবরা, জিয়মেট্রি, হিন্দী আর ইংরেজী কিছু —এই সব শেখানো হতো।

স্কুল-ঘর ছিল উঁচু টিলার ওপর। স্কেচ্‌ আছে তার নন্দলালের কাছে। ওখান থেকে দেখা যেতো মণি নদী। নদীতে চান করতে আসত কতো লোক। মেয়েরা আসতো ঘাগরা পরে। স্কুল-ঘর থেকে দেখা যেতো খড়্গপুরের পাহাড়, দূরে মেঘের মতো হয়ে আছে। নন্দলালের শিশুমনে ভারী ভালো লাগতো সেই দৃশ্য। বেঞ্চিতে বসে জানালা দিয়ে সেই দৃশ্যেই নন্দলালের মন মগ্ন হয়ে থাকতো। একবার নন্দলালের এক সহপাঠী ওঁকে বললে,— 'পাহাড়ে মেঘগুলো চলছে; ওখানে ওরা চ'রে চ'রে পাতা খায়, আর নীচে কালো কালো ময়লা করে'। শিশু-শিল্পীর মনে এই কথায় আদৌ অবিশ্বাস হয়নি। তিনি বসে বসে ভাবতেন,—মেঘগুলো কি পরম আনন্দেই না পাহাড়ের বুকে চ'রে চ'রে বেড়াচ্ছে।

খড়্গপুরে থাকতে একবার একটা খুব মজার ঘটনা হ'য়েছিল। মাঝ রাতে সহসা দেখা গেল, একটা আলেয়ার আলো। আলোর শিখাটা চলছে।

পাড়ার ফটিকবাবু তখন ছিলেন ওখানে। আলেয়া তো চলছে। ফটিক দৌড়লেন বন্দুক নিয়ে। বলে দেওয়া হল, 'মানুষ হ'লে, ফাঁকা আওয়াজ কর; তামাসা করে গুলি চালাও'। তারপর দেখা গেল কি, সেই আলেয়াটা আলের ধারে জল ছিঁটছে। গ্রামের বেড়, বাগান, রাস্তা, তা'র পরে, দূরে পুকুর-ধারে শ্মশান। সেখানে ভূত থাকা স্বাভাবিক। আর এটা যেন একটা প্রকাণ্ড ভূত। যাই হোক্, তাকে ধরা হবে, দেখা হবে। শেষে দেখা গেল কি, আলেয়াটা যেন মাটির সঙ্গে মিশে গেল। —আরে, না, না, ওসব কিছু নয়, শ্মশান খুঁজে কিছু পাওয়া গেল না। একটা ধুনোর মালসা মাত্র। বদমাসি করতে গেছে একটা মেয়ে। মাথায় সেই ধুনোর মালসা রেখে, মাঝে মাঝে তাতে ধুনো ছিটিয়ে আগুনের শিখা বের করে আলেয়া বানাচ্ছে লোক ঠকাতে।

বাড়ীতেও আলেয়া বানানো যায়। চিংড়ি মাছ-টাচ্ পচলে গ্যাস হয় —ফস্ফরাস্ জলো-জায়গায় হয়, সেটা জ্বলে আর চলেও।

পুলিশ-ফাঁড়িও ছিল কাছে। ফাঁড়ির কাছেই ছিল শিবের মন্দির। শিশু নন্দলাল দেখতে যেতেন মন্দির। ফাঁড়িতে ডাকাত-টাকাত ধরে নিয়ে এলে, খুব মজা লাগতো ওদের দেখতে। এষ্টেটের ম্যানেজারের ছেলে নন্দলাল; ফলে, ফাঁড়িতে খাতির ছিল খুব। ওঁরা গেলে খাতির করে কুরসী দিত বসতে। তিনি চেয়ারে বসে বসে চোরের উপর পুলিশের শাস্তির বহর দেখতেন —সে বোধ হয় একশো আট রকমের।

ছট্-পরবে ধুম লেগে যেতো ওখানে। হ'ত কালীপূজার পরে, শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে। মেয়েরা নতুন কাপড় পরে, বাজনা-বাদ্যি নিয়ে সারি বেঁধে আসতো। ডালায় করে হরেক রকম ফল-মূল, মিষ্টান্ন আর হলুদগাছের উপচার এনে সূর্যার্ঘ্য দিতো। নদীর ঘাটে কলাগাছ পুঁতে, বেদীতে ডালা রেখে সূর্যার্ঘ্য দিত ছড়া কাটতে কাটতে। আটা, সুজি, গুড়, পাক করে দলা করতো —তার নাম ছিল 'ঠেকুয়া'। ছাঁচ আছে তার নানা রকমের। ডিজাইনও থাকতো ঠেকুয়াতে। চালগুঁড়ির লাড্ডু, চীনা-বাদাম, পেস্তা— এই সব থাকতো এই সব অর্ঘ্যে। পুরুষ ব্রতীরা আসতো 'দণ্ডী' খাটতে খাটতে। ছট্-পরব আসলে হলো সূর্য-পূজা।

ম্যানেজারের নতুন বাঙ্গলো-বাড়ীতে যখন গেলেন ওঁরা, তখনও সেই

গৃহশিক্ষক ওঁকে ছুটির দিনে দুপুরবেলাতে পড়াতে আসতেন। এক এক দিন দুপুরে মাস্টার যেদিন আসতেন না, বা, বড়োরা শুয়ে থাকতেন, তখন ছোটরা জানালা টপ্‌কিয়ে পালিয়ে যেতো —নদীর ওপারে অড়র-ক্ষেতের ভেতর যে-ঘোড়া চরতে আসতো তাকে ধরতে। ওদেশে ঐ ঘোড়াকে বলতো 'লাদনা' ঘোড়া —মাল-বওয়া ঘোড়া। কূয়োর দড়ি সঙ্গে নিয়ে গিয়ে সে-ঘোড়াকে ধরে তারা বেঁধে ফেলতো। সে-ঘোড়া বাগিয়ে ধরে, মুখে দড়ির লাগাম এঁটে, পিঠে থলের জিন চড়িয়ে, চড়া হ'তো ঘোড়ার ওপর—সন্ধ্যার আগে পর্যন্ত —সেই মণি নদীর তীরে। বাড়ীর পিছনের আমবাগানেও এই ঘোড়ায়-চড়া খেলা চলতো। দড়ি না পেলে, চাকররা বলতো, সুরেনের দাদা বনোয়ারীলালকে,—'বাবাকে বলোগে'। একবার পেয়ারা গাছের খোঁচা খেয়ে নন্দলালের গায়ে ঘা হয়ে গেল। মলম দিয়ে সারানো হ'লো। বাবা বকলেন কতো।

রোজ রোজই ঘোড়া ধরা হয়। মন্দিরের পিছনের ঘরে বেঁধে রেখে দেওয়া হয় ঘোড়াটাকে। সেখানে ভুট্টা গাছের ডাল ভেঙ্গে খাওয়ানো হতো তাকে। বিকেলেও চড়া হতো সে-ঘোড়ায়। একদিন চড়া হয়নি, ঘোড়াটাকে খাবারও দেওয়া হয়নি, জলও দিতে মনে ছিল না। তার পর-দিন দেখা গেল কি, ঘোড়াটা টলছে আধমরা হয়ে। ভীষণ ভয় পেল ছেলের দল। ভয়ে সেই থেকে সে অভ্যাস ছেড়ে দিলেন। ঘরে ছিল ভুটিয়া ঘোড়া। খুব দুর্দান্ত ছিল সেটা। বনোয়ারীর দাদা চড়তেন সেটাতে। বাবা কিন্তু বারণ করতেন।

ম্যানেজারের বাড়ীতে থাকার সময় শনিবার-রবিবার ভিখারী আসতো সকাল ন'টা-দশটার সময়ে। একটা করে পয়সা দেওয়া হতো প্রত্যেককে। ভিখারী আসতো অন্ততঃ পঞ্চাশ-ষাট জন ক'রে।

গেষ্ট এলে তাঁদের থাকার ব্যবস্থা হ'তো বৈঠকখানা-ঘরে। ওখানে সব রকম গেষ্ট আসতো। মুসলমান গেষ্ট একজন আসতেন মুঙ্গের থেকে। তাঁর আবার খাওয়ার ব্যবস্থা করা হ'তো ঐ ঘরেই। আলাদা কাঁচের পিরিচ, গেলাস,—এসব থাকতো সাজানো —লাল-নীল-সবুজ রং-এর। ভাবী শিল্পী নন্দলালের ভারী উৎসাহ হতো সেগুলো দেখবার জন্যে। খুব ইন্‌টারেস্‌টিং লাগতো। মুসলমান অতিথি আসতেন, মুখে প্রকাণ্ড চাপদাড়ি। চাকর

ছরিয়া কলার ডাঁটার হুঁকো তৈরী করে তাঁদের দিকে এগিয়ে দিতো।

নন্দলালের বাবা শুয়ে থাকতেন; শুতেন বালাপোশ গায়ে দিয়ে। অতিথি অভ্যাগতদের সঙ্গে কথা কইতেন শুয়ে শুয়েই। সকাল ন'টা-দশটার সময় জলখাবার-টলখাবার খেয়ে আপিসে যেতেন। নন্দলাল রান্নাঘরে খাওয়া-দাওয়া সেরে এসে শুয়ে পড়তেন। এই ফাঁকে টানতেন বাবার গড়গড়া। হুঁকোর মুখে উল্টোদিকে ফুঁ দিলে জল ছড়িয়ে পড়তো ঘরময়। খুব বকুনি দিত তাতে হরি মাহাতো।

পিতা পূর্ণচন্দ্রের লাইব্রেরীতে ইঞ্জিনীয়ারিং-এর অনেক বই থাকতো রেফারেন্সের জন্যে। বালক নন্দলালের হঠাৎ খেয়াল গেলে, সে-সব বই নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতেন। তাতে থাকতো রেলগাড়ী, ঘরবাড়ী —এ সবের নানা রকমের ছবি। সে ছবি দেখে, অস্ফুট শিল্পীর চিত্তপটে পূর্তশিল্পী জেগে উঠতো। আর তা' দেখে দেখে নন্দলাল নানা প্রকার আর্কিটেক্চার বানাতেন নানা আকারের। সে-সব বানিয়ে তাঁর মনে হতো তাঁর বাবা খুব খুশি হবেন। কিন্তু ফল হয়েছিল উল্টো। খুব বকুনি খেলেন। পিতা বললেন,—'সব নষ্ট করে দিয়েছে'।

বারাণ্ডার উঠোনে ম্যানেজারের ঘোড়া দানা খেতো। পূর্ণচন্দ্র নিজে বসে সে-খাওয়া দেখতেন। ঘোড়ার দানা মাঝে মাঝে আবার চুরিও যেতো।

ওখানে হাতী খাবার খেতো কালীমন্দিরের সামনে। বড় রাস্তার দিকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা ছিল। হাতীকে যখন খাওয়ানো হতো, নন্দলালের ভাই-বোন যাঁরা থাকতেন, সকলে মিলে সামনে দাঁড়িয়ে হাতীর দানা খাওয়া দেখতেন।

প্রকাণ্ড হাওদায় ম্যানেজার নিজে বসতেন। মাহুতের জন্যে আলাদা বসার ব্যবস্থা। হু হু করে যাতায়াত করতেন তদারকে।

ঐ সময়কার একটা ঘটনা। পূর্ণচন্দ্র যে-হাতীতে চড়তেন তাঁর সে হাতীটা ছিল ছোট। চলতো খুব। কিন্তু চোখে দেখতো না মোটেই। চলতো শুঁড় ঠুকে ঠুকে! কানা বুড়ো মানুষ যেমন লাঠি ঠুকে ঠুকে চলে। সেই হাতীতে চড়ে ম্যানেজারবাবু সফরে যেতেন। অড়র-ক্ষেতের ভেতর দিয়ে চলতে চলতে সেই হাতীটার পায়ে একবার অড়র-কাঠি ফুটে গিয়েছিল। ভারী যন্ত্রণা। বাড়ীতে ফেরত এলেন হাতীকে নিয়ে। হাতী পড়ল শুয়ে।

হাসপাতাল থেকে ফর্‌শেপ এনে টেনে তুললে সে কাঠি। হাতী নিরাময় হল। ওষুধ দিতে হাতী সেরে গেল।

ছোট হাতীটার মুসলমান মাহুত ছিল খুব বুড়ো। মাহুত যখন মারা গেল, তখন তার ছেলেটি খুব ছোট্ট। মাহুত মারা গেল হঠাৎ। তার ঐ একটিই ছিল সন্তান। নন্দলালেরা দেখতে গেলেন। সেই শিশুটিকে হাতীর শুঁড়ের কাছে শুইয়ে মাহুতের স্ত্রী কাঁদছে। আর হাতীকে বলছে—'ওগো, একেও পা দিয়ে মেরে দাও গো'। ওদিকে হাতীটা ক্রমাগত শুঁড় দোলাচ্ছে ; আর তার দু-চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।

তারপর, ওখানে একটা খুব বড়ো আর বুড়ো হাতী এলো। তার দাঁত পড়ে গেছে। তার পিঠে একবার একটা কারবঙ্কল হলো। অপারেশন দরকার। হাতীর ডাক্তার এলো দ্বারভাঙ্গা থেকে —একজন পাঞ্জাবী। হাতীটাকে আশুথ গাছের তলায় পায়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখলে। আর স্বয়ং ডাক্তার সেই আশুথ গাছের ওপরে উঠে, ছুরি চালিয়ে পিঠে অপারেশন করলে। তখন হাতীটার সে কী ভীষণ চীৎকার। ছেলেরা সব দৌড়ে নদীর ধারে পালিয়ে গেল। নদীতেই হাতীটাকে জলে শুইয়ে ড্রেস করা হল।

কিছুদিন বাদ এই হাতীটা মরে গেল। মরা হাতীকে তুলে পোঁতা বিপদ্। পীলখানা থেকে মরেছিল দূরে। মরা হাতীর পিঠের পাশে, পুকুরের মতো একটা গর্ত করে, বস্তা বস্তা নুন ঢেলে দিল। আর তার দুটো পায়ে দড়ি বেঁধে বহু লোক মিলে টান মারতেই, হাতীটা উল্টে সেই গর্তে পড়ে গেল। হাতীর গোর দেওয়া হলো।

চাঁপা মুদির কথা স্পষ্ট মনে আছে নন্দলালের। চাঁপা মুদি জাতে ছিল বেনে, সেকালের শ্রেষ্ঠী বা মহাজন যেমন। চাঁপা মুদি পূর্ণচন্দ্রকে শ্রদ্ধাভক্তি করতো আর ভালবাসতো খুব। চাঁপা মুদির বাড়ী ছিল পূর্ববঙ্গে। পূর্ণচন্দ্রকে সে গোলদারী মাল সরবরাহ করতো —ধারে। যখন যা দরকার হতো, দিত। নন্দলালের বোনেদের যখন বিয়ে হলো, বিশেষ করে নীলনলিনীর, তখন চাঁপা মুদি অনেক টাকার জিনিষ ধারে দিয়েছিল। পূর্ণচন্দ্রকে তার এতো বিশ্বাস ছিল, তাঁর নামে যে-সব মালপত্র ধারে আসতো তার সে হিসাবই রাখতো না। পূর্ণচন্দ্র যা দিতেন তাই সে নিতো খুশি হয়ে। এই রকম প্রগাঢ় ছিল তার প্রত্যয়। তার কাছে বহু টাকা যেমন ধার হতো, আবার শোধও হতো

সব এক সঙ্গে।

তার গোলদারী দোকান ছিল খড়্গপুর-বাজারে। নন্দলালদের বাসা থেকে প্রায় এক মাইল দেড় মাইল পথ। রোজ আসতো সে এঁদের ঘরে বেড়াতে। প্রকাণ্ড লম্বা একটা লাঠি ঠুক্‌ঠুক্‌ করতে করতে প্রত্যহ আসতো সে —সেই আশী বছরের বৃদ্ধ। তার আসার সময়ও যেমন নির্দিষ্ট ছিল তেমনই ওঁদের সদর বৈঠকখানায় তার বসবার আসনটিও ছিল নির্দিষ্ট। পূর্ণচন্দ্র বাড়ীতে থাকুন বা নাই থাকুন, সেই বৃদ্ধ নিয়মিত এসে নির্দিষ্ট আসনে বসেই ফরমাশ করতো,—'হরি মাহাতো, তামাকু দেও'। তার হুঁকো ঝোলানো থাকতো কাঁথে,—সে হুঁকোয় ছিল একটা কড়ি বাঁধা। দেওয়ালে কড়ি-বাঁধা হুঁকোর সারি থাকতো —সে এক দেখবার মতো জিনিষ। হুঁকোর সেই এক পঙ্‌ক্তিতেই ভিন্ন ভিন্ন জাতের মার্কা থাকতো মারা। জাতিভেদ লোপ করে একাকার হওয়ার সুযোগ ঘটতো না কোনও মতেই। চাঁপা মুদি অনেকক্ষণ ধরে তার হুঁকোয় তামাক টানতো, আর বসে বসে রাজ্যের গল্প করতো।

চাঁপা মুদি বলতো, তার একটি গাড়ী আছে। নাম তার 'সাম্পুনি'। সে-গাড়ী হলো গরুর গাড়ী, দেখতে কিন্তু পাল্কীর মতো। নন্দলালদের সে বলতো, সেই গাড়ীতে করে আনাগোনা করতে।

চাঁপা মুদিকে দেখতেন নন্দলাল—সে তার দোকানে বসে আছে। ঢালা গদির ওপর বসে আছে, বালিশ ঠেসান দিয়ে। এঁরা গেলে বসতে চেয়ার দিতো। তার খদ্দের আসতো সব গাঁয়ের লোক —গরীব-গুরবা, সাঁওতাল-টাঁওতাল —এই রকম সব। আর তার দোকানে যেই আসুক না কেন তাকে তামাক খেয়ে যেতে হবে। তার দোকানেও দেওয়ালে হুঁকো ঝোলানো থাকতো, সে প্রায় পঞ্চাশটা। আর প্রত্যেকটি হুঁকোয় ছিল টিকিট লাগানো। 'রায়তার' বলতো সবাই তাকে। আর সে হুকুম করতো—'তামাকু দেও'।

চাঁপা মুদি লেনদেন করতো; মহাজনীও করতো। 'না' করতো না কাকেও। তার লেনদেনে দলিল-দস্তাবেজের দরকার হতো না। টাকা নিয়ে ফেরত দিত অবশ্য সবাই। আবার ফেরত না-দিলেও সে কিছু বলতো না, বা কিছু করতো না। চাঁপা মুদির দোকানে তামাক যারা খেতো তারা নিজেরাই সেজে নিতো। টাকা ধার নিয়ে, তামাক খেয়ে, তারা চাঁপা মুদিকে প্রণাম করে চলে যেতো।

নন্দলালেরা তার ওখানে গেলে, মুদি খুব খুশি হতো। ওঁদের ফেরবার সময়, সে মাথায় সাদা টুপি পরে, সাম্পুনিতে হাত দিয়ে, ঝুড়ি ঝুড়ি খাবার লাড্ডু, খাজা-গজা—এই সব তুলে দিতো গাড়ীতে। নন্দলালেরা যেতেন বিশেষ সাজ-গোজ করে। সে-সময় তাঁদের পোষাক ছিল —গায়ে সার্টিনের জামা, মাথায় জরির টুপি —এই রকম। ওঁরা ম্যানেজারের নতুন বাড়ীতে এসে ঐভাবে মুদির ওখানে যেতেন।

খড়্গপুরের পুরাতন বাড়ীতে থাকতে, চাঁপা মুদির বিয়ে দেখেছিলেন নন্দলাল। প্রতি বছরে সে একবার করে, মক্ (mock) বিয়ে করতো। অবশ্য, সে নকল বিয়ে রীতিমত আসল বিয়ের মতোই হতো। জরির পোষাক পরে, হাতীর পিঠে জরির হাওদায় চড়ে, মশাল জ্বেলে চাঁপা মুদি বিয়ে করতে যেতো। আশপাশের গ্রাম থেকে চাঁপা মুদির বিয়ের প্রোসেশন আসতো। চাঁপা মুদির চৌদোলা চাপানো হতো গরুর গাড়ীতে। মুদির মাথায় জরির টোপর ;— রাজবেশে বর এসে প্রণাম করতো পূর্ণচন্দ্রকে। শুরু হয়ে যেতো ঘোড়ার নাচ। চাঁপা মুদির বিয়ে—সেকালে খড়্গপুরের এক হৈ-চৈ ব্যাপার। চাঁপা মুদির বিয়েতে লোক খাওয়ানো হতো বিস্তর। কতো ছড়া-গান, বাজনা-বাদ্যি, বাজি রোশনাই। এই রকম সমারোহে —ধুমধামে চাঁপা মুদির হতো বার্ষিক বিবাহ উৎসব।

চাঁপা মুদির বিয়েতে গাঁয়ের লোকেরা সবাই খুব মদভাঙ্ খেতো আর হৈ-হল্লা করতো। সেকালের স্থিতিশীল শান্ত সমাজের লেনা-দেনায় সে-যেন একটা মস্তো রকমের এক-গেরস্থালীর ব্যাপার বলে মনে হতো।

বহুদিন পরে, নন্দলাল শান্তিনিকেতনে চাঁপা মুদির নকল বিয়ের নকল করে একবার একটা সঙ্ বের করেছিলেন। সেই সঙের শোভাযাত্রায় স্বয়ং রথীন্দ্রনাথ ও আরও অনেকে যোগ দিয়েছিলেন। সাঁওতাল-নাচ হয়েছিল ; গরবা-নাচ হয়েছিল।

প্রসন্নবাবুও আসতেন সে সদর-মজলিসে। তিনি এসে বসে বসে মহাভারত পাঠ করতেন—নিবিষ্ট মনে। তাঁর মাথায় থাকতো কমফর্টার বাঁধা। যাবার সময় তাঁর লণ্ঠনে নারকেল কিংবা কেরোসিন তেল দিয়ে দেওয়া হতো। লণ্ঠনে ছিল লাল নীল কাঁচ। তার ভেতর দিয়ে নানা রঙের আলোর ছটা বালক-শিল্পীর মনকে আকর্ষণ করতো। প্রসন্নবাবু সেই রঙিন



চাঁপা মুদির বিয়ে সেকালের খড়্গপুরের এক হৈ চৈ ব্যাপার—নন্দলাল

আলোর লণ্ঠন জ্বেলে, গার্ড-সাহেবের মতো, মনি নদী পার হয়ে, ক্যানেলের কাছে তাঁর বাড়ি চলে যেতেন, মসজিদের পাশ দিয়ে দিয়ে। ক্যানেলের বাঁধ ধরে ধরে তিনি আসতেন, ছেলেদেরও সঙ্গে নিয়ে আসতেন মাঝে মাঝে।

আর একজন আসতো পূর্ণচন্দ্রের দরবারে। নাম তার গোলাপ সাহু। সে বিয়ে করেছিল ভাগলপুরে। বাঙ্গালা ভালো বলতো সে। তার স্ত্রীও বাঙ্গালা জানতো। ওদের ছিল একটা বাগান, লেকের ধারে। বাগানে ছিল সিন্দূরে আমের গাছ। সেই বাগানে নন্দলালেরা প্রায়ই বেড়াতে যেতেন। ওখানে সাঁওতাল-টাঁওতালদের সঙ্গেও ওঁদের আলাপ বেশ জমে উঠেছিল।

দুর্গাপূজায় সময় নন্দলালেরা যেতেন ঠাকুর দেখতে। বাজারে আসতো বারোয়ারী পূজো। সে পূজো করতো বেনেরা মিলে। প্রায় মাথা-উঁচু দুর্গাঠাকুর হিন্দুস্থানীদের। এ দুর্গার মূল হাত ছিল দুটো। সেই হাত থেকে আবার ফেঁকড়া হাত তৈরী করা হতো —ঠিক্ গাছের ডালপালা যেমন। দুর্গাঠাকুরের বড়ো বড়ো চোখ। ধুনো পুড়িয়ে পূজো হতো। 'ঝাঁপ'-বাজনায় গম গম করতো পূজামণ্ডপ। নন্দলালের মনে জাগতো একটা 'অ' (awe)।

ওখানকার শুঁড়ীদের বলতো —'কালাল'। ঐ কালালরা মদ চোলাই করতো। সেই সময়কার একজন কালালের ছেলে পড়াশুনা করতো নন্দলালের সঙ্গে। তার নাম ছিল — চন্দ্র। নন্দলালদের বাড়িতে সে আসতো। অবশ্য সে আসতো 'ডাক'-পডাবার জন্যে। টেণ্ডার পাবার আশায় সে পূর্ণচন্দ্রকে খাতির করতো খুব। ওদের ঘরে মদ-চোয়ানো হতো। পূর্ণচন্দ্রকেও পাঠাতো মদ —বেলের মদ, জামের মদ, মহুয়ার মদ সব আসতো। খড়্গপুরে পূর্ণচন্দ্র খেতেন না সে-সব। কিন্তু দ্বারভাঙ্গায় গিয়ে ভোল বদলেছিলেন। প্রসন্নবাবু, পূর্ণচন্দ্র আরও দু-চারজন মিলে আসর জমাতেন। হরি মাহাতোর তাঁবেতে থাকতো সে সব মজুত। সিন্দুকের ভেতর থাকতো বোতলে বোতলে। তবে তার বেশীর ভাগই যেত হরিয়ার পেটে।

একবার নন্দলাল দেখলেন, জঙ্গল থেকে ভেলা এনেছে। ভেলা এনেছিল তাঁর মামাতো ভাই। তার প্রায়ই দরকার পড়তো। কাপড়ে দাগ দেওয়া হয় ভেলা দিয়ে। একবার বালক নন্দলাল করেছেন কি, সেই

ভেলা নিয়ে তাঁর সর্বাঙ্গে চিত্র-বিচিত্র করেছেন ; মনোমত নানা নক্শা এঁকেছেন, উলকির মতো করে। ফলে, হলো কি, সর্বাঙ্গে ফোস্কা হ'য়ে গেল। এতে তাঁর পিসিমা খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কি হয় কি হয় অবস্থা, এমন সময় কে যেন ওষুধ বাতলালে, টেংরা মাছের তেল লাগালে, ভেলার ফোস্কা ভালো হয়। তাই লাগানো হলো ; আর তাতেই ফোস্কার ঘা সেরে গেল।

ভেলা গাছের তলার মাটিটাও রোগ-প্রতিষেধক হয়। শান্তিনিকেতনে এসে নন্দলাল ইলামবাজার থেকে ভেলা আনিয়েছিলেন —ল্যাকার করাবার জন্যে। ভেলা কেটে, তার সঙ্গে সোহাগা (Borax) মিশিয়ে মিছরীর টুকরোর সঙ্গে ফেটালে, তরল (Liquid) হয়। সেই লিকুইড্ যাতেই লাগানো হোক্, সেটা দেখতে হবে ঠিক্ জাপানী বার্ণিশের মতো।

শান্তিনিকেতনে ভেলা আনত নব চাকর। ভেলা গাছের তলার মাটিও যে ওষুধ —সে-কথা নন্দলাল তার কাছ থেকেই শুনেছিলেন। ভেলা দিয়ে উলকি কেটে গায়ে চিত্র-বিচিত্র করা —নন্দলালের অভিজ্ঞতায় মনে হয় —কুসংস্কার ও কুবুদ্ধি।

আর একটা ঘটনা মনে আছে নন্দলালের। একটা হাতী এসে পড়েছিল গাংটার জঙ্গল থেকে। বরিয়ারপুর থেকে জামুই যাবার রাস্তা চলে গেছে পাহাড়ের ভেতর দিয়ে। বরিয়ারপুরের রাস্তা যখন তৈরী হচ্ছিল, তার কনট্রাকট্ নিয়েছিলেন নন্দলালের ছোট পিশেমশায় দীননাথ কর। তিনি থাকতেন ডাকবাঙ্গলোয়। ঐ পাহাড়ী রাস্তা দিয়ে গরুর গাড়ী আনাগোনা করতো। একবার একজন গাড়োয়ান এসে বললে,—'পাহাড়ের ধারে প্রকাণ্ড একটা অজগর সাপ দেখে এলুম,—ফুঁস্ ফুঁস্ করছে।' লোক পাঠানো হলো দেখতে। কাছারীর লোকেরা এসে খবর দিলে, সেটা সাপ নয়, একটা হাতীর শুঁড়। গাড়োয়ানরা শুঁড়ে সর্পভ্রম করেছিল —পাহাড়ী জঙ্গলের পরিবেশে।

সেই প্রকাণ্ড হাতীটা নানা অত্যাচার করতে আরম্ভ করলে ;—আখের খেত ভাঙ্গে, কলাগাছ ভাঙ্গে, লোকের ঘর ভাঙ্গে —এই সব। ডাকবাঙ্গলো থেকে পত্র নিয়ে লণ্ঠন জ্বেলে রাত্রেই লোক এলো। পূর্ণচন্দ্র তখন খেতে বসেছেন। লোকটি বললে,—'সে হাতীটা একটা প্রকাণ্ড অর্জুন গাছের মতো।'

যাই হোক্, হাতী এসেছে। তাড়াতাড়ি সবাই ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেবার হুকুম হলো। একটা গাছের তলায় বাঁধা হলো একটা মাদী হাতী। শেষরাত্রে বড়ো হাতীটা এসেছে। এসে খোদ খেয়ালে গাছতলা থেকে আর নড়তে চায় না। মাদী হাতীর মাহুতটা তখন নিচে শুয়েছিল। মাহুতটাকে কম্বল-সমেত জড়িয়ে ধরে আছড়ে ফেলল। মাহুতটা কিন্তু ছিট্‌কে গেছে; গিয়ে ধানখেতে পড়েছে। বড়ো হাতীটাকে তখন আর দেখতে পাওয়া গেল না; মাহুতটা কাদায় লেপ্টে পড়ে আছে,—খবর এলো পূর্ণচন্দ্রের কাছে।

রাজা ছিল গইধরের। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খয়রা অধ্যাপক পদের জন্যে এঁরাই টাকা দিয়েছিলেন। ওঁদেরও কাছারী ছিল এইখানে। ওটা হলো তাঁদের হাতী —খুব বড়ো হাতী। হাতীর মদ জমে। সে মদ ক্ষরণ হয়। তখন হাতী মাতাল হয়ে যায়। তখনই হাতীশালা থেকে ফট্‌কে বেরিয়ে ঐ রকম করে ঘুরে বেড়ায়। এই হাতীটারও ঐরকম হয়েছিল।

চাপরাসী, পাইকরা যেয়ে হাতীটাকে গুলি করলে। পেছনের দাব্‌নার দিকে মারলে; তাতে কিছু হলো না। ওরা নানাভাবে চেষ্টা করলে মারতে। কিন্তু, কিছুতেই কিছু হলো না। অবশেষে, 'কীলক' করতে বলা হলো। লোহার কাঁটা তৈরী করলে। লোহার তে-কোণা কাঁটাগুলো রাস্তায় ছড়িয়ে দিলে। সেই কাঁটা-ছড়ানো পথ দিয়ে হাতী চলতে লাগলো। চল্‌তে চল্‌তে ঐ কাঁটাগুলো পায়ে ফুটতেই হাতী দাঁড়িয়ে গেল। তখন মাথায় গুলি করে হাতীটাকে মেরে ফেললে।

গইধরের রাজাকে সংবাদ দেওয়া মাত্রই ওঁরা হাতীটাকে মেরে ফেলতে হুকুম দিয়েছিলেন। সেই হাতীর কঙ্কালটা আছে কোলকাতার যাদুঘরে। অত বড়ো উঁচু হাতী ভারতবর্ষে দেখা যায় না।

প্রকাণ্ড বড়ো দাঁত ছিলো তার। সেই দাঁত দিয়ে বাড়ির দেওয়াল ফুটো করতো, দাঁত গেঁথেও যেতো দেওয়ালে; ফুঁড়ে বেরোতো দেওয়ালের ওদিকে। একবার হয়েছে কি, হাতীটা একজন বুড়ী সাঁওতালের ঘরে এক কাণ্ড বাধিয়ে বসেছিল। দাঁত ঢুকে গেছে দেওয়ালে; অনেক চেষ্টা করেও হাতীটা সে-দাঁত বের করতে পারছে না। সেই বুড়ীর ঘরে ছিল উখরি-শামোট। ওটা হলো আমাদের দেশের ঢেঁকির মুষুলির মতো। সেই বুড়ী শামোটের ঘা মারলো হাতীর দাঁতে। মারতেই, দাঁতের খানিকটা চোক্‌লা

উঠে পড়েছিল। রাজা বুড়ীর সাহস দেখে তাকে বকশিশ দিয়েছিলেন।

লেকের ধারে ছিল টোপা-কুলের জঙ্গল। ঝুড়ি ঝুড়ি টোপা-কুল আনা হতো সেখান থেকে। নন্দলালের পিসিমায়েরা তৈরী করতেন কুলের আচার। ওদিকে খুব বড়ো বড়ো ভালুকও আসতো সে-বাগানে। বড়ো বড়ো ভালুক —তিন-চার হাত লম্বা, কালো ভালুক, বুকে তার সাদা সাদা দাগ।

একবার এক শিকারী তার বন্দুক নিয়ে ভালুক মারতে গেল। শিকারী ভালুকের দিকে বন্দুক উঁচিয়ে যেই তাগ করেছে, অমনি ভালুকটা দৌড়ে এসে বন্দুকের নলটা জোর্‌সে ধরেছে চেপে। নলটা চেপে ধরে গায়ের জোরে দিয়েছে মুচড়ে। আর শিকারীর মুখে মেরেছে গোটা কতক প্রচণ্ড থাপ্পড়। সে-থাপ্পড়ের ধাক্কায় গাল থেকে গলা দিয়ে টাকরা বেরিয়ে এসেছে। —শেষে, শিকারীকে তুলে আনতে হলো 'খাটালি'তে করে। লোকটি ছিল অচেনা; হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে যখন ড্রেস করে দিচ্ছিল, তখন সে যন্ত্রণায় চীৎকার করছে। নন্দলালেরা গেলেন দেখতে। ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা শিকারীকে ওঁরা দেখে এলেন।

ঘরের কাছেই হাসপাতাল। প্রায়ই রোগী আসতো সেখানে। রোগী দেখতে যেতেন নন্দলালেরা মজা করে। একবার গিয়ে দেখলেন একটা রোগী এসেছে —তার সমস্ত শরীরটা ফুলে উঠেছে, ঠিক্ তাকিয়া বালিশের মতো। ব্যাপার কি? —তাকে ষড়্‌বিন্ধা কামড়েছে। চিকিৎসা হলো, সেরে গেল।

খড়্গপুরের বাড়িতে বেদেরা আসতো। তারা নানারকম খেলা দেখাতো। দলে স্ত্রীলোকও ছিল। ডিগ্‌ ডিগ্‌ করে ডুগডুগি বাজাচ্ছে, আর নানারকম ফাঁদ কসরত দেখাচ্ছে। তলোয়ারের ওপর দিয়ে আনাগোনা, দড়ির ওপর দিয়ে চলা, শিঙের ওপর দাঁড়ানো, তলোয়ারের ওপর দিয়ে চ'লে মেয়েটি উল্‌টে পড়ে, ধুলো মুছে, চোখের কোণায় ছুঁচ নিয়ে উঠে আসছে —এই সব দৃশ্য এখনও নন্দলালের স্পষ্ট মনে আছে। শান্তিনিকেতনে এসে নন্দলাল বর্ধমানের 'বনকাটি' থেকে রথের পুতলোর যে-সব রাবিং এনেছেন, তাতেও ঐরকম সেকেলে বাজিকরের ছবি আছে।

মনি নদীর এপারের চেয়ে ওপারে বাজির ঘটা হতো বেশী।

প্রসন্নবাবু আর মতিবাবু দুই জমিদার —ওপারের। দু'জনেই ছিলেন কনট্রাক্টর। প্রসন্নবাবু রাস্তা আর পুল করতেন; মতিবাবু করতেন কেবল রাস্তা। এখনও চলে সে-কাজ। মতিবাবুর বাড়িতে বাজনা বাজতো ডিগ্‌ডিগ্‌ করে। আর শব্দ পেলেই নন্দলালেরা ছুটতেন খেলা দেখতে। হরিয়া নিয়ে যেতো কাঁধে করে নদী পার ক'রে। মতিবাবু ছিলেন শৌখিন লোক। তিনি দিতেন সে বাজির খেলা প্রায়ই।

মতিবাবুর বাড়ির সামনে দিয়ে চলতো মহরমের তাজিয়া-গোঁয়ারা। আসতো তারা হাসান-হোসেনের মাটি নিয়ে। নন্দলালেরা দেখতে যেতেন। ওরা বলতো. হোসেনের মাটি যেখান থেকে নিয়ে আসে, সেখানে সত্যি সত্যি রক্ত দেখা যায়। —এ-কথা তখন বিশ্বাস হ'ত ঠিক্‌ই; পরে নন্দলাল জেনেছিলেন, হলুদ-ছোবানো নেকড়া ওরা একটা গর্তে রাখতো, আর তার নিচে দিত চুন। তাতেই তৈরী হয়ে যেতো হোসেনের রক্তে রাঙা সত্যিকারের লাল মাটি। সেই রক্তমাখা মাটি নিয়ে এসে ওরা দেখাতো ওঁদের। সে স্থানটা ছিল নদীর ধারেই রাস্তার ডান দিকে।

শিশুগাছের তলায় কারবালা তৈরী করতো মহরমের পর্ব শেষ হলে, তাজিয়া-গোঁয়ারা সেখানের নদীতেই সে সব ভাসিয়ে দিত। সে সময় আবার মারামারিও লেগে যেতো খুব।

ওখানকার রাজারও গোঁয়ারা বেরতো। সে রাজা কোন্ বাদশাহী আমলের হিন্দু রাজপুত থেকে হওয়া মুসলমান। ওঁদের যে মসজিদ সেটা গোড়ায় ছিল —দেবমন্দির। বড়ো বড়ো বাড়ি সব পড়ো হয়ে পড়ে আছে। এ রাজবংশ আগে ছিল গয়ায়। ওঁরা আসতেন পূর্ণচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে। এষ্টেট থেকে ওঁদের পেনশনের ব্যবস্থা ছিল। সেই সূত্রেই আনাগোনা।

মহরমের গোঁয়ারার ছিল শ্রেণীভেদ। রাজার গোঁয়ারা আগে চল্‌বে। তার পরে মর্যাদা মাফিক ওমুক জমিদারের, ওমুক জায়গীরদারের, ওমুক লোকের —এই ক্রমে চল্‌বে গোঁয়ারা। কিন্তু ফেরার সময় তাড়াহুড়া পড়ে যেতো। এলোমেলো হয়ে, যে যেমন পারে, গায়ের জোরে ছুটে চল্‌তো। হাতীর প্রোসেশন্ চল্‌তো এই সঙ্গে। লাঠির খেল্‌ খেলাতে খেলাতে, 'বাব়' বাজাতে বাজাতে চলতো শোভাযাত্রা। বলা বাহুল্য,—এ-সব দেখায়

বালক শিল্পীর মনকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করতো। —গোঁয়ারা ভাসাতো যেখানে, সেই স্থানটা নন্দলালেরা দেখতে যেতেন —সাম্পুনিতে চেপে। ওপার থেকে মতিবাবুদের আর প্রসন্নবাবুদের বাড়ির সকলেও আসতেন গাড়ীতে চেপে।

পূর্ণচন্দ্রের সদর মজলিসে নিত্য-হাজিরাদার পাক্কা 'হিন্দুস্থানী' বেনে চাঁপা মুদি। সেই বাহাত্তুরে রহস্যপ্রিয় বয়স্যটির বছরে বছরে বিয়ের সং বের হ'ত 'ফাগুয়া'র সময়ে। বীরের বেশে বুড়ো বরের হাসি-হাসি মুখখানি নন্দলালের মনে কৌতুক জাগায় আজও। জমানো তার দেহাতী গল্পের জের টেনে টেনে, ওদিকে প্রসন্নবাবু আসর গরম করতেন। তাঁর 'গোপাল সাপে'র গল্পটা অতি অদ্ভুত। জন্মান্তরবাদের গল্প এটা। জাতিস্মর ছিল 'গোপাল সাপ'।

—তাঁদের দেশে সেকালের এক পুরাতন বিরাট বাড়ি। দেওয়ালের এখানে-সেখানে পলস্তারা খসা। তখনও একান্নবর্তী বিশাল পরিবার। বাড়িরই একটি ছোট ছেলে ; নাম তার গোপাল। 'গোপাল', 'গোপাল',—দিনে রাতে তার নাম ধরে সবাই ডাকে।

হঠাৎ একজন একদিন লক্ষ্য করলে, গোপালের নাম ধরে ডাকতেই, মোটা একটা সাপের ক্রুদ্ধ মুখ পলস্তারা-খসা ইঁটের ফাঁক দিয়ে বের হয়ে এলো। প্রথম দু-চার দিন কেউ তেমন আমল দেয় না। একদিন দেখা গেল কি, গোপাল সেখানে থাক্, না-থাক, 'গোপাল' বলে ডাকলেই সেই মুখটা বেরিয়ে আসে ম্যাজিকের মতন।

বাড়ির সকলে ভীত ও চিন্তিত হয়ে পড়লো।—শেষে, সাপ মারবার ব্যবস্থা করা হল, লগার ডগে শক্ত ফাঁস বেঁধে। সবাই শঙ্কিত ও উৎসুক হ'য়ে সাপ-মারা দেখতে গেছে। বাড়ির গোপালও দলে দাঁড়িয়ে দেখছে। পিছন থেকে একজন ভয়ে ভয়ে যেই 'গোপাল' বলে ডেকেছে, অমনি সেই মুখটা যথারীতি বের হয়ে এলো ; আর একজন তৎক্ষণাৎ ফাঁসটা সেই মুখে লাগিয়ে, হেঁচ্‌কা টান মারতেই সাপের মাথাটা কেটে গেল। আর আশ্চর্য, সেই কাটা মুণ্ডুটা তড়াক্ করে লাফিয়ে এসে, সেই শিশু গোপালের গায়ে লেগে গেল চুম্বুকের মতন। শেষ বিষ ঢেলে সাপ মরলো ; আর মরলো গোপালও। তারপর, দেওয়ালের ইঁট সরিয়ে দেখা গেল কি, বিরাট

একটা চন্দ্রবোড়া।

—এটা কি রকম যোগাযোগ হল। পূর্বজন্মের কোনও জাতক্রোধ নয় কি? জাতিস্মর ছিল ঐ সাপটা। এ-জন্মে সেই শোধ নিলে। —এই গল্প বলেছিলেন নন্দলালের ভাবী দাদাশ্বশুর প্রসন্নবাবু। অবশ্য এই বিষয়ে নন্দলালের নিজ অভিজ্ঞতাও কম নয়। সে কথা পরে হবে।

একদিন প্রসন্নবাবু আসছেন। পথে দেখলেন, একজন কসাই বাজারে নিয়ে যাচ্ছে একটি গরুকে। বুড়ী গরু, লাল রং। লক্ষ্মী-আশ্রয়। দশ-পনেরো টাকা দাম চাইছে। প্রসন্নবাবু পূর্ণচন্দ্রকে বললেন,—'দশটা টাকার বদলে একে আশ্রয় দিন।' বাবা গরুটাকে কিনে নিলেন।

একটা কালো ষাঁড় ছিল ওঁদের —চমৎকার দেখতে। এখন এই গাইটি আসাতে, গোয়াল ভরতি হল। এই গরুটিকে মনে রেখে, পরে দেশের বাড়িতে থাকতে নন্দলাল আঁকলেন এক গো-পার্বণের সময় তাঁর বিখ্যাত ছবি 'গোকাল ব্রত'।—লাল গরু, মাথার শিং নড়তো তার ঢক্ ঢক্ করে।

বাবার কেরানী জিতুবাবুর বাড়ি ছিল পাশেই। তখন টাইপ-রাইটারের ব্যবহার এমন তো ছিল না। জিতুবাবুর হাতের লেখা ছিল মুক্তোর মতো। তিনিও বসতেন মাঝে মাঝে সেই মজলিসে এসে।

খড়্গপুরের আদি-বাড়ি থেকে, খড়্গপুর-তহসিলের ম্যানেজার হয়ে, পূর্ণচন্দ্র উঠে গেলেন, জেনারেল ম্যানেজার চন্দ্রশেখরবাবু যে-বাড়িতে ছিলেন, সেখানে। ম্যানেজারের এই বাড়িটা হল এস্টেটের কাছারীর কাছেই; খাপরার ছাউনি, বড়ো বাঙ্গলো বাড়ি। উপযুক্ত এই বাড়িতেই উঠে এলেন পূর্ণচন্দ্র সুবিধে হবে বলে; ম্যানেজারের মর্যাদার প্রশ্ন তো ছিলই। ঐ বাড়িতে ওঁরা ছিলেন কয়েক বছর।

খড়্গপুরে খাপরার ঘর ছিল সাধারণ গরীবদের। আর ম্যানেজারের বাঙ্গলো বাড়ির চালও ছিল ঐ খাপরার। বামুন-শূদ্রে ভেদ ছিল না কিছু মাত্র। পরে, দেশের বাড়িতে নন্দলাল একবার কাঁচা টালির ওপর ডিজাইন করেছিলেন। ইট টালি খোলা তৈরী করার জায়গা ছিল বাড়ির পাশেই। জল আনা হ'ত সরস্বতী থেকে নালা কেটে। কলাভবনে নমুনা রাখা আছে সে-টালির। আর্ট-স্কুলে এগ্‌জিবিশন করেছিলেন সেই টালির ডিজাইনের। সিস্টার নিবেদিতার ইস্কুলেও নমুনা কিছু রাখা হয়েছিল।

ম্যানেজারের বাড়িতে জ্বালন-কাঠের গুদামে, থাকতো একটা দিশী কুকুর, থাকতো সেথায় আরামে। একবার একটা বাঘ এসে, ধরলে কুকুরটাকে ঠেসে। হাসপাতালে সেলাই করে সেরে গেল শেষটায়।

ছেলেবেলায় খড়্গাপুরে থাকতে মন্দিরের চেয়ে মসজিদ বেশী ভালো' লাগতো নন্দলালের। সেটা বিশেষ করে আর্কিটেক্চারের দিক্ থেকে। কতো স্পেস্, কতো বড়ো উঠোন —মসজিদে। তখন মনে হতো, মন্দির জবড়জঙ্গী ; ভালো লাগে কেবল ভক্তির জোরে। মসজিদের পীরসাহেব হাফীজীর সঙ্গে দোস্তালি জন্মেছিল নন্দলালের। হাফীজী ওখানে হাজির না-থাকলেও, তিনি একা-একাই গিয়ে বসতেন মসজিদে। সেখান থেকে দেখা যেতো মনী নদীর দৃশ্য আর চল্‌তি জীবনচিত্র।

বড়ো মসজিদের হাফীজী। নন্দলাল ছবি করেছিলেন তখন হাফীজীর, আর মসজিদের। —হাফীজী বসে আছেন, মাথায় পাগড়ি, সাদা দাড়ি, হাতে কোরান। আর, হাফীজী ক্যাপশনে নিজের হাতে কলমা লিখে দিয়েছিলেন ফারসী অক্ষরে ; কোরানের কঠোর নিষেধ মানেন নি। —সে হ'ল ১৯১৭ সালের কথা।

মিড্‌ল ভার্ণাকুলার স্কুলের হেড্‌মৌলবী মহম্মদ হোসেন। বড়ো ভালো লোক ছিলেন তিনি। শুধু ভালো লোক নন ; তিনি শুদ্ধাচারীও ছিলেন।

একবার পঙ্গপাল এসেছিল ওখানে। দেখা গেল, হেড্‌মৌলবী তাঁর ছেলেদের দল নিয়ে পঙ্গপাল ধরায় ব্যস্ত। 'কী হবে'? 'আমরা খাই এগুলো'—বললেন তিনি উত্তরে। দোষ কি এতে?—আরবে খুব খায় পঙ্গপাল। দক্ষিণী হিন্দুরা পঙ্গপাল খায়, উইপোকা খায়। বিহারে মুষহররা ইঁদুর ধরে, ইঁদুর খায়। আমরা খাই ঘুসো-চিংড়ি। খাদ্য-অখাদ্যের তফাৎ —সে কেবল রুচিবৈচিত্র্য মাত্র।

খড়্গাপুরে ছিল এক মুসলমান রাজবংশ। রাজপুত থেকে ওঁদের মুসলমান করা হয়েছিল সাজাহানের আমলে। তখন ওঁরা ছিলেন রাজপুত দস্যুসর্দার। গঙ্গায় খাজনা লুট করতেন পূর্বপুরুষ। সেই করেই বড়লোক। বাদশা সৈন্য পাঠিয়ে ওঁদের এস্টেট্ দখল করে নিলেন, আর ওঁদের সবাইকে মুসলমান করা হল।

ওঁদের বাড়ীর পাঁচজন কুমারী মেয়ে ঐ সময়ে পালিয়ে গিয়েছিল।

পালিয়ে, তারা খড়্গপুরের পাহাড়ে গিয়ে বেঁচেছিল। এখনও খড়্গপুরের পাহাড়ে সেই পঞ্চ কুমারীর শিবের মন্দির আছে। শেষে, কিন্তু বাঁচতে পারেনি কুমারীরা। সেখানকার ঝরণায় পড়ে তারা জহরী হয়েছিল। রাজার সেই পাঁচ কুমারীর নামে আজও খড়্গপুরের ঝরণা —'পঞ্চকুমারী'। পাঁচটি ধাপে পাঁচটি কুণ্ড, একটি ঝরণা —'পাঁচকুমারী'।

ওঁরা বহুবার দেখেছেন সেই পাঁচকুমারী। পাহাড়ের ওপরে কেল্লা। তার গেটে ঢোকবার রাস্তা। সেই রাস্তা বেয়ে প্রায়ই উঠতেন ওঁরা। পিক্‌নিক্ করতেন সেখানে গিয়ে। ভাইরা গেলে ওখানে যাওয়া হতো; নৌকোয় করে লেকেও ঘোরা হতো। তারই কাছে আছে হট্-স্প্রীং; এখন নাম হয়েছে —'রামেশ্বরকুণ্ড'। গরম জল বেরুচ্ছে অনবরত। আরো বড়ো হট্ স্প্রীং 'বড়কা গরম পানিয়া' কিছু দূরে। জঙ্গলে সে-সব দেখতে যেতেন ওঁরা দল বেঁধে।

একবার বর্ষাকাল। খড়্গপুরে ইস্কুলের তখন উনি ছাত্র। ইস্কুল থেকে ক'জন ছেলে নৌকোয় করে লেকে গিয়েছিল বেড়াতে। সঙ্গে শিক্ষকও একজন ছিলেন নৌকোয়। নৌকো থেকে যেখানটায় সবাই নামবে, —সেখানটায় ঘূর্ণী হয়েছে। পাহাড়ের জলটা যেখানে লেকে ঢুকছে, হঠাৎ সেখানে সেই নৌকোটা উল্টে গেল। পাঁচ ছ জন ছেলে আর মাস্টার সবাই গেল ডুবে। অনেক আরো মালপত্তরও গেল। হৈ হৈ ব্যাপার। দু-জনকে শেষ পর্যন্ত পাওয়াই গেল না।

মনী নদী। ওদেশের লোকের মুখে —'মঈন'। মনী নদীতে যখন বান আসতো, ওঁরা সব যেতেন স্নান করতে। নদীর চরের ওপরের যেখানটা জলে ডুবে যেতো, সেই মানার ওপর ওঁরা মাতামাতি করতেন মনের আনন্দে। ওখানে যেতে হত খুব সাবধানে, কারণ, কিছু দূরেই দ'-এ ঘূর্ণী ঘুরছে। অবশ্য সঙ্গে লোক থাকতো, আর থাকতো নৌকোও।

বানের সময় 'কানওয়া' (Anicut) দেখবার মতন হ'ত। বর্ষা বেশী হ'লে, জল বের হয়ে যেত 'কানওয়া' দিয়ে। সেখান দিয়েই লেকের সারপ্লাস জলটা ভাঙতো। জলটা যেখান দিয়ে পড়ছে, বড়ো বড়ো মাছ সেখানকার মানা নদীর ঢাল থেকে লেকে গিয়ে ঢুকছে। মাছ উব্‌জে উঠে সরাৎ সরাৎ

করে লাফিয়ে লেকে পড়ে। ওদিকে জেলেরা জাল পেতেই রেখে দিয়েছে। —ওঁরা দেখতে যেতেন। রুই কাতলা মাছ সার বেঁধে কানওয়ার ঢালের ধারা বেয়ে লাফিয়ে ওপরের লেকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে নিচে থেকে। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। 'উল্টা জলে মছলি চলে, ভাসি যায় গজরাজ'—এই তো। এই দৃশ্য নন্দলালের কালি-তুলিতে রূপ নিয়েছে ১৯৫৯ সালে আঁকা 'জলপ্রপাত' ছবিতে। সেই দূর কালের এই মধুর ছবি।

লেকে যখন নতুন জল ঢুকতো তখন লেকের সাবেক বড়ো বড়ো মাছগুলো মরে ভেসে উঠতো। চারদিকের পাহাড়ের পাতা-পচা জল বিষাক্ত হয়ে মাছ মরে যেত। ঐ সময়ে ওখানে নানা স্থান থেকে ভিঁড় ক'রে লোক এসে গাদা-গাদা মাছ ধরে নিয়ে যেত। সে-রকম পুরাতন পাকা মাছ খেয়ে হজম করা শক্ত —মাংসের মতো হয়ে গেছে। এই রকম হলে, পূর্ণচন্দ্র তখন অর্ডার দিয়ে মাছধরা বন্ধ করে দিতেন —কলেরার ভয়ে। লেকের ধারে গর্ত করে সে-সব মাছ পুঁতে ফেলা হ'ত। সেই মাছ পুঁতে রেখে তাতে সারও হ'ত।

এক সময় ওঁদের একজন চাপরাসী বাজারে গিয়ে একটু দুষ্টুমি করেছিল বাজারের লোকেদের সঙ্গে। তাতে বাজারের লোকেরা মিলে তার গায়ে কেরোসিন ঢেলে কাপড়-চোপড়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। পূর্ণচন্দ্রের কাছে নালিশ জানালে, ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি হুকুম দিলেন,— বাজারের যত লোক মনী নদীতে স্নান করতে আসবে, সব ধরে ধরে, ধোলাই করে করে, জলে চুবিয়ে দাও'। মাত্র মেয়েদের দিলেন ছাড়্।

সুরেনবাবুর মেজদাদা শৈলবাবু ওখানে গাংটায় ঠিকেদারি করতেন; জমিজমাও কিনেছিলেন কিছু। জমির সীমানা নিয়ে আথজে খুন ক'রে দিলে তাঁকে। হোমিওপ্যাথি দাতব্য ওষুধও দিতেন তিনি গাঁয়ের গরীব-গুরবাদের। একদিন রাত্রে ডাক্‌বাঙ্গলোয় বিশ্রাম করছেন শৈলবাবু। গাঁয়ে 'হায়জা' (কলেরা) হয়েছে বলে মিথ্যে খবর দিয়ে, ডেকে নিয়ে গিয়ে, ফেরার পথে মারলে টাঙ্গির ঘা। ছিট্‌কে গিয়ে পড়েছিলেন ধানক্ষেতে। তুলে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা হল মুঙ্গেরে। মারা গেলেন। কেস্‌ হল। কিছু হ'ল না পোস্ট-মর্টেমে। সেই রাজপুত জমিদারের তরফ থেকে গুণ্ডা লাগিয়ে মেরে ফেললে। —ওঁদের সেই জমির মামলা মিটলো এতো দিনে।

সেকালে জমির সীমানা নিয়ে ছোট বড়ো লড়াই ওখানে হতো হামেশাই।

আগে একবার এই নিয়ে খুব লড়াই চলেছিল দু'জন রাজার মধ্যে। একদিকে, দ্বারভাঙ্গার মহারাজা, অপর দিকে পূর্ণিয়ার বানাইলীর রাজা। গিধৌড়ের রাজা জাতে হল খয়রা। ও'দের এস্টেটের কাছে বানাইলীর রাজারও অনেক এস্টেট্। লড়াই বেধেছিল দ্বারভাঙ্গা আর বানাইলীর জমির সীমানা নিয়ে।

ও পক্ষ এসে খানিকটা এন্‌ক্রোচ করে যায় তো, এরাও আবার তেড়ে গিয়ে দখল করে আসে পো-খানেক। শেষবারে কথা হ'লো,—'ঠেকাতে হবে'। একদিন খবর এলো—এই বানাইলী এসেছে। তখনই পূর্ণচন্দ্র সিপাই, বরকন্দাজ. পাইক, পালোয়ান—পাঠিয়ে দিলেন বিলকুল। এরা যেয়ে পোঁছতেই দু'দলে ঘোরতর লড়াই লেগে গেল। ম্যানেজার পূর্ণচন্দ্র বড়ো বড়ো কুস্তিগীর পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তারা কুঁদতে কুঁদতে গিয়ে পোঁছলো।

এঁদের তোড়জোড় দেখে বানাইলী একটা ফন্দী আঁটলে। দ্বারভাঙ্গার দল যতদূর পর্যন্ত তেড়ে যাবে, সেই সীমানায় বসিয়ে রেখে দিলে দেহাত থেকে ধরে এনে একজন বুড়ীকে। আর তাতেই তাদের কাজ হাসিল হল। দ্বারভাঙ্গা তেড়ে গিয়েই বুড়ীকে গুম্ করে দিলে। আর এই জো পেয়ে, বানাইলী ফাইল করে দিলে খড়ে-বড়ে জড়িয়ে বড়ো একটা মার্ডার কেস্। নালিশ হলো, দ্বারভাঙ্গা-দলের সিপাইরা দু-তিনটে লাস কেটে কুঁচি করে দিয়েছে।

—মার্ডার কেস্—মুঙ্গের থেকে পুলিশ-ইনস্‌পেকটার এলো। ম্যানেজারের নামে চার্জ হলো। মকদ্দমা চলতে লাগলো—ভাগলপুর কোর্টে। ধরপাকড় চললো। ম্যানেজারকে ধরে ছেড়ে দেওয়া হল জামিনে। অনেকদিন পর্যন্ত মামলা চললো। ম্যানেজারের চাপরাসীদেরও ধরা হলো। প্রভুভক্ত চাপরাসীরা ম্যানেজারকে শিখিয়ে দিয়ে গেল, কখনও যেন তিনি কেস্ কবুল না-করেন। খুবই খাতির করতো তারা ম্যানেজারকে। খুনের মামলা চলছে, এমন সময় কমিশনার মারা গেলেন। এদিকে ঘুষও লাগানো হয়েছিল খুব,—ম্যানেজারকে বাঁচাতেই হবে। যাই হোক্, কমিশনার মারা যেতেই কেস্‌টা খারিজ হয়ে গেল।

তখন সদর থেকে হুকুম এলো,—পূর্ণচন্দ্রকে খড়্গপুর-তহসিল থেকে দ্বারভাঙ্গার সদরে যেতে হবে। সেই থেকেই ও'দের খড়্গপুরের পাট উঠে গেল। দ্বারভাঙ্গার পর্ব শুরু হলো। তখন নন্দলালের বিবাহ হয়নি।

খড়্গপুর থেকে বাণীপুর। বাণীপুর থেকে খড়্গপুর আনাগোনা করা হতো ওঁদের প্রায় বছর বছর। তারপরে, পিসিমা আর ওঁরা এলেন কলকাতায়। পিসিমা দেশ থেকে আনাগোনা করতেন কলকাতায়। বাবা দ্বারভাঙ্গা-এষ্টেটের সদরে। নন্দলালের বয়স তখন সবে পনেরো। নন্দলাল খড়্গপুর থেকে এলেন কলকাতায়।

শান্তিনিকেতন থেকে বহুবার নন্দলাল খড়্গপুরে গিয়েছিলেন। সেই মনী নদী। সেই সুন্দর পাহাড়ী নদী; সেই নদীর তীরে তীরে কতো সকাল-বিকেল ওঁরা কাটিয়েছিলেন। সেই মসজিদ তখনও ছিল সেখানে। টিলার ওপরে সেই মিড্‌ল ভার্ণাকুলার ইস্কুলটিও ছিল —আগের মতোই। সেই খড়্গপুরের পাহাড়;—জীবনের প্রথম পনেরো বছর এই মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যেই মগ্ন হয়েছিল নন্দলালের মন। বাল্যকালের এই তন্ময়তাই যেন তাঁর সারা জীবনে প্রগাঢ় প্রকৃতি-প্রেমে পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছিল। আর তাঁর শিল্পী-জীবনের বনেদ রচনায় অনুকূল ভূমিকা-স্বরূপে কতো মজার মজার ঘটনা, বিচিত্র কতো চরিত্র সব তাঁর মনে দাগ কেটে কেটে বসে আছে অপরূপ মহিমায়।

তাঁদের সেকালের সেই খোলার বাড়ি তখনও টিকে ছিল প্রায় সেই রকমেই। সম্পত্তি এষ্টেটের, এখন কি হাল হয়েছে জানা নাই। তাঁর ছেলেবেলাকার সেই বাড়ির পিছনে ছোট ছোট গাছগুলো তখন অনেক বড়ো হয়েছে। বাড়িটা এখন বোধ হয় আর নাই; কেবল স্মৃতি আছে তার, নন্দলালের কাছে – নানা ফটোয় আর নানা স্কেচে। কলাভবনের তখন ভিজিটিং আর্টিষ্ট বান্দ্‌রে সঙ্গে গিয়ে ওপেক ওয়াটার কালারে ছবি করেছিলেন সেই বাড়িটার। ছবিটা আছে নন্দলালের কাছে।

নন্দলালের মা মারা যাবার সময় তাঁর ছোট বোন কমলাকে রেখে গেলেন। কমলাকে মানুষ করতে লাগলেন তাঁর পিসিমা। ওখানেই ওদেশের ঝি পাওয়া গেল একজন। 'খুকী'কে সে যত্ন করতো খুব। নন্দলালেরা যখন কলকাতায় এলেন, তখন সেই 'খুকীর ধাই'মাকেও সঙ্গে আনলেন। তখন সে খুবই বুড়ী হয়ে গেছে। তার ইচ্ছে হ'ল শেষ বয়সটায় সে দেশে গিয়েই থাকবে। তার সেই সঙ্কল্পে এঁরা রাজী হ'য়ে গেলেন। কথা দিলেন, সে অভাবে পড়ে লিখলে, খরচা পাঠানো হবে।

কিছুদিন পরে। কলকাতার হাতীবাগানের বাড়ির দক্ষিণ দিকের দোতলা বারাণ্ডায় বসে তখন ছবি অাঁকতেন নন্দলাল। বারাণ্ডার কোনাটা ছিল ভাঙ্গা। বাড়ির পেছনে খানিকটা অপরের জায়গার ওপর এন্‌ক্রোচ্‌ করেছিল বলে, করপোরেশন থেকে বাড়ির কোনাটা ভেঙ্গে দিয়ে গেছলো। স্বামী অভেদানন্দের অদ্বৈত-বেদান্তমঠ হয়েছে এখন সেই এলাকায়। বারাণ্ডার সেই ভাঙ্গা ধারটা বাঁধা থাকতো রেঁাধ দিয়ে ; ছেলেরা পাছে পড়ে যায়, এই ভয়ে।

একদিন নন্দলাল ওখানে বসে ছবি অাঁকছেন ; বুদ্ধের ছবি। আর্টস্কুলে যাবার আগে। আচম্বিতে দেখলেন কি, সেই বুড়ী ধাইয়ের মতো একটা মূর্তি বারাণ্ডার নিচে থেকে ওপরে উঠে এলো। উঠে এলো ঝিলমিল মিরাঝের মতন। গরমের সময় যেমন করে ঈথার ওঠে, উঠে এলো ঠিক্ সেই রকম আবেশে। দেখে, নন্দলালের মনে হল, বুড়ী বুঝি এসে তাঁকে দেখা দিয়ে গেল। —এই ঘটনার দু-চার দিন বাদেই তিনি খবর পেলেন —বুড়ী মারা গেছে। মনে দাগ কেটে রেখে গেছে বলে নন্দলাল আজও সে ঘটনাটা ভোলেন নি।

বাবার চাকর হরি মাহাতো। বাণীপুরে গিয়েছিল একবার নন্দলালের সঙ্গে। ছিল ওখানে কিছুদিন। হরি মাহাতো বাবার পেয়ারের পুরানো চাকর। বাড়ির সব মহলেই তার সমান খাতির। ছেলেরা চলতো হরিয়াকে সমীহ ক'রে। ওঁদের খড়্গপুর-বাড়ির সব পুরানো গল্প বলতো সে বসে বসে। নন্দলালের জন্মের আগে, তাঁর বড়ো ভাই বোনেদের জন্ম-মৃত্যুর নানা কাহিনী অনর্গল বলে যেত সে দাওয়ায় বসে বসে,—বড় বোনের জন্ম, তার আগে যমজ বোনেদের কলেরায় মৃত্যু, আর একবার মায়ের যমজ সন্তান-প্রসব, প্রথম বাড়ির পুকুরে ডুবে ভাই মানিকের মৃত্যু, ম্যানেজারের বাড়িতে আসার পরে নীলনলিনীর সেই বাড়িতে জন্ম —এ-সবের বিবরণ তার নখদর্পণে।

হরিয়া দেশে চলে গেল যখন, তার ছেলে বেচুয়াকে রেখে গেল নন্দলালের কাছে। নন্দলাল তাকে মোটর-ড্রাইভিং শেখালেন। রথীবাবুদের মোটর-ব্যবসায়ে লেগেছিল সে। তার কাছ থেকে ওঁরা ওদেশের খবর সব পেতেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

একদিন সহসা নন্দলাল দেখলেন, শান্তিনিকেতনে তাঁর খড়ের দ্বিতীয়

বাড়িতে আমকাঠের দরজার ওপর খড়ি দিয়ে লেখা —অমুক দিন হরি মাহাতো মারা গেছে দেশে। কে যে লিখে দিয়ে গিয়েছিল, তার খোঁজ পাওয়া গেল না। খবর নিয়ে জানলেন,—ঘটনাটা সত্যি। হরি মাহাতোর বুড়ী স্ত্রী ছিল তার দেশ মজঃফরপুরে। তাকে টাকা পাঠাতে লাগলেন তিনি নিয়মিত।

জেঠতুতো ছোট ভাই অমৃত। তিনি ছিলেন নন্দলালের সমবয়সী বন্ধুর মতন। অমৃত মারা গেলেন অকালে। মৃত্যুকালে দোষও পেয়েছিলেন বোধ হয় তিন পোয়া। তখন, তিন মাসও হয়নি, একদিন রাত্রে জানালার ওপাশ থেকে নন্দলাল স্পষ্ট শুনলেন তিন ডাক —'নন্দ', 'নন্দ', 'নন্দ'। স্পিরিট-লোকের ব্যাপার কিছু একটা আছে, সেটা তো মানতেই হবে; গা ছমছম্ করতে লাগল।

বউদির অভ্যেস ছিল, দরজায় শিকলের সুর্শোয় হাত দিয়ে দাঁড়ানো। মৃত্যুর পরেও তেমনি দাঁড়িয়ে থাকেন। দেখলেন ছোট ভাই রমানাথ। জেঠতুতো ভগ্নী কিরণও দেখতেন ঐ রকম। 'ঐ যে গো'—বললেই, বউদির মূর্তি তরতর করে দোতলায় উঠে যেত সিঁড়ি দিয়ে। আবার দোতলার লোক বলছে,—'দেখলে না, ছোট বউদি সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল নিচে'। সুর্শো ধরে তিনি দাঁড়িয়েই সব দেখতেন প্রায়। পরে, বারে বারে এমন হতে, ওঁরা করলেন কি, 'রাম'-নাম সারা ঘরময় দেওয়ালে লিখে রেখে দিলেন। তাতেই উপদ্রব গেল।

ছাতে যাবার সিঁড়ি। ছাতের দু-টি ঘরেও যাওয়া যেত ঐ সিঁড়ি দিয়ে। সিঁড়িতে আলো দেওয়া হতো। দেওয়াল-গিরি জ্বলতো সারা রাত। আর শরাতে থাকতো সরষের পুঁটুলি।

বালীপুরের কাছেই আন্দুল। আন্দুল ছিল তান্ত্রিকদের আড্ডা। অনেক তান্ত্রিক সাধক ছিলেন ওখানে। ওখানে যেতেন ওঁরা দুর্গাপূজার সময় নিত্যগোপাল পণ্ডিতের ঘরে নেমন্তন্ন খেতে। যেতেন ডাউলে চেপে আন্দুল পর্যন্ত সরস্বতী নদী দিয়ে। দুর্গাপূজায় গেলে, 'প্রসাদ'—মাংস আর ভাত খাওয়া হতো। ছোলা আর কাঁচকলা থাকতো পাঁঠার ঝোলে। সে রান্না-ঝোলের রং খুলতো ঝিয়ানি কালির মতো।

মা মারা যাবার দু-বছর পরে, নন্দলাল কলকাতায় এলেন পনেরো

বছর বয়সে। পিসিমা কমলাকে নিয়ে রইলেন দেশে; কলকাতাতেও আনাগোনা করতেন। বয়সকালে কমলার বিয়ে হয়েছিল মেদিনীপুরে জমিদার অপূর্ব দত্তের সঙ্গে। কমলা ন-পিসিমার হাতে মানুষ হয়েছিল। পিসির ছিল সে বড়ো আদরের। তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই থাকতো মা-মরা নেওটো এই মেয়েটি।

শেষ দিকে, ন-পিসিমা যখন কাশী গেলেন, কমলা তখন বিধবা। কমলাও তাঁর সঙ্গে কাশী গেলেন। কাশীতে বাসও হবে, আর পিসিমার সেবাও হবে। ন-পিসিমা যখন কাশী গেলেন তখন তাঁর বয়স প্রায় আশি। কাশী যাবার আগে দেশে তাঁর উদরীর মতো হ'য়েছিল। হঠাৎ কলেরা হ'য়ে মরণাপন্ন হলেন। এর দিনকয়েক আগে, মেজো পিসিমা মারা গেলেন কলেরায়।

ন-পিসিমাকে দেখে গ্রামের ডাক্তার বললেন,—'দুধ-গঙ্গাজল দাও'। তাঁকে তীরস্থ করা হল। তীরস্থ করা হলো সরস্বতী নদীর ধারে। ওদেশে কাটিগঙ্গায় তীরস্থ করার নিয়ম নয়। নদীর ধারে ঘর করা হলো —হোগলা দিয়ে। হরিনাম-সংকীর্তন হতে লাগলো। ডাক্তারবাবু নাড়ী টিপে বললেন,—'রাত্রি কাটবে না'।

কিন্তু সকাল বেলায় এসে দেখেন, মোড় ঘুরেছে। এ-কথা শুনে, ন-পিসিমা কাঁদতে লাগলেন। বাড়িতে তিনি আর ঢুকবেন না। তখন যুক্তি হ'লো, তাঁকে এনে দালানে রাখা হোক্। তীর থেকে যখন দালানে এলেন, নামে নামে কুটো ছিঁড়ে ছিঁড়ে সবার সঙ্গে তিনি সম্পর্ক ত্যাগ করলেন। দিনকতক দালানে থেকে, ওখান থেকেই তিনি কাশী গেলেন। তাঁর সঙ্গে গেলেন কমলা। বিধবা কমলার বয়স তখন ষোল কি সতেরো।

কাশীতে গিয়ে ও'রা ছিলেন বাঙ্গালীটোলায়। নন্দলাল খরচা পাঠাতেন নিয়মিত। ন-পিসিমার নব্বই বছর বয়স যখন, তখনও দশাশ্বমেধ-ঘাটে গিয়ে স্নান করতেন রোজ, বিশ্বনাথ দর্শন করতেন। বছরখানেক বাদ, আর চলবার ক্ষমতা ছিল না। তিনি অশক্ত হ'য়ে নন্দলালকে লিখে পাঠালেন, যাবার জন্যে।

সকলে গেলেন ও'রা। যেতেই বললেন,—'এসো, চোখে দেখি না। তোমাদের দেখবো বলে চোখ রাখছি গোলাপ-জল দিয়ে। এর পর আর দেখতেই পাবো না'। কিন্তু তখনও তিনি চোখে কিছু কম দেখতেন না।

নাতনী গৌরীর কানের মাকড়ি দেখে বললেন,—'সোনাটা বড়ো ম্যাজমেজে।' শুনে, হেসে উঠলেন সবাই। এটা তো চোখে কম দেখার লক্ষণ নয়! পরম আত্মীয়রা দূরে আছে বলে এটা যেন অভিমানের ছল। দালানে সেই কুটো ছিঁড়ে ছিঁড়ে, দেখতে-মানার দিব্যিও তো মানতে হবে। আসলে কুটোগুলো মন থেকে ছিঁড়ে যায়নি। আশঙ্কা যেন তারই।

অবশেষে, ন-পিসিমা বিছানা নিলেন। কমলা সেবা করতে লাগলেন। পাশের বাড়ির একটি অল্পবয়সী বাঙ্গালী মেয়েও সেবা করতো তাঁর। নন্দলাল খরচ পাঠাতেন।

১৯৩০ সালে কমলার অসুখ শুনে নন্দলাল কাশী গেলেন। বেরিবেরিতে ভুগে কমলা অকালে মারা গেলেন। এতে ওঁরা আথান্তরে পড়লেন। কমলা সহসা মারা গেলেন। পিসিমা জানতে পারলেন ; কিন্তু, খবরটা তাঁকে দেওয়া হয়নি। কমলাকে দাহ করা হল মণিকর্ণিকায়। পিসিমা রইলেন একলাই।

সেই বাঙ্গালী বিধবা মেয়েটিই সেবা করতো। পিসিমায়ের তখন বিরেনব্বই-তিরেনব্বই বছর বয়স হয়ে গেছে। কমলার মৃত্যুর পর পিসিমা বছর দুই বেঁচে ছিলেন। নন্দলাল ওঁকে বললেন,—'রামকৃষ্ণ মিশনে চল'। 'সেবাশ্রমে যাব না, বাবা'—জেদ তাঁর। নিয়ে যাওয়া গেল না তাঁকে। তবে, মিশনের সাধুরা এসে দেখে যেতেন। খবর দিতেন নন্দলালদের। ওঁদের মারফৎ কাজ হতো।

তারপর, একদিন পিসিমা মারা গেলেন। যখন মারা গেলেন, নন্দলালেরা পৌঁছতে পারেন নি। সাধুরাই দাহ করেছেন। পিসিমার জিনিষপত্র, বাসন-কোষন, কাপড়-চোপড় যা ওখানে ছিল, সব দিয়ে দিলেন সেবাশ্রমে। কমলারও যা ছিল, সে-সবও দিলেন সেবাশ্রমে। নন্দলাল তখন শান্তিনিকেতনে থাকেন। হীরেন ঘোষ তখন তাঁর ছাত্র। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে গেছলেন।

বাণীপুরের বাড়িতে পার্টিশনের আগে বাকুলেই ছিল গোয়ালঘর। গোয়াল কাড়তেন পিসিমায়েরা। পাশেই ছিল ঢেঁকিশাল আর ধানের হামার। রান্নাঘর ছিল দু প্রস্থ —আমিষ আর নিরামিষ। জলের ঘরে জালার সারি। খাবার জল গঙ্গা থেকে এনে রাখা হত তাতে। খিড়কি পুকুরে গঙ্গার জল ঢুকতো সরস্বতীর জোয়ার বেয়ে এসে। কোটাল হাঁকলে উঠোন জলে ভরতি হয়ে যেত।

তখনও জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে সম্পত্তির ভাগ হয়নি। নন্দলালের দাদা গোকুলচন্দ্র জীবিত —সেই সময়কার ঘটনা। এ্যাণ্ড্রুল কোম্পানীর জুটমিলের সাহেবরা অত্যাচার করেছিল একবার।

বাড়ির পূব দিকে অন্দরের খিড়কি ; ঘাট ছিল তার দুটি। ওদিকের ঘাটে বাইরের লোক আসার রাস্তা ছিল। দীননাথ করের বাড়ি যাবারও ঐ রাস্তা। এদিকে ছিল বাড়ির লোকের চানের ঘাট। জুটমিল কিছু দূরেই। কুলিরা আসতো ঐ ঘাটে জল তুলতে। এ-ঘাটে মেয়েরা চান করতো, কাপড় কাচতো। ও ঘাটে কুলিরা জল তুলতে আসতে লাগলো ক্রমাগত। এঁরা বাইরের রাস্তা বন্ধ করে নোটিশ দিলেন। জল পরীক্ষা করার ব্যবস্থা করা হল।

একদিন অসময়ে কুলিরা এসে জল তুলছে, মাথায় গামছা দিয়ে মেয়ে সেজে। মেয়েরা তখন চান করছিলেন। ব্যাপারটা পুরুষদের গোচরে আসতেই তাঁরা বকাবকি করলেন। কিন্তু, মিলের কুলিরা বাড়ি এ্যাটাক্ করলে। ধমাধম ইঁট ফেলতে লাগলো। জেঠতুতো মেজো ভাই কেশবলাল জিম্‌ন্যাস্‌টিক্ করতেন ; —দু-তিন জনকে ঘায়েল করলেন। লড়লো বাড়ির নফর পাইক। রঙ্গলাল বেরলেন খাঁড়া নিয়ে। তাঁর সেই মূর্তি দেখে ওরা পালাগলো। বাড়ি সেভ্‌ড হয়ে গেল।

কেশবলাল চেয়ারে পিকক্ হতেন। ছাপরায় জিম্‌ন্যাস্‌টিক্-মাস্টার হয়ে গেলেন। শেষে গেলেন পাগল হয়ে। ঐ সময় স্বয়ং নন্দলালও বাণীপুরের বাড়িতে ডাম্বেল ভাঁজতেন।

একবার 'দক্ষিণে পুকুরে'র জল অনেক শুকিয়ে নৈভাঁড়ারে পড়ে গেছে। সাহেবদের আদেশে লস্কররা করলে কি, হোসে করে বয়লারের গরম জল সেই পুকুরে ছেড়ে দিচ্ছিল। এঁরা গিয়ে বকাবকি করতে ওরা চলে গেল।

মাছ ছিল সেই পুকুরে। একবার লস্কররা জোর করে মাছ ধরে নিচ্ছে। নন্দলাল, সুরেনবাবু, অতুল মিত্র সবাই গিয়ে দেখলেন, ব্যাপারটা সত্যি। এঁরা মাছ ধরতে নিষেধ করলেন। যা ধরেছে, সেই বমাল সমেত তাদের এঁরা বাড়িতে ধরে নিয়ে এলেন। ধরে এনে পেটা হলো। পেটা হ'লো বেধড়ক রকমেই।

মার খেয়ে ওরা চলে তো গেল। কিন্তু, গিয়েই পুলিসে নালিশ রুজু করে দিলে। সরস্বতীর ফেরীঘাটের একজন লঙ্কর মুসলমান টোল আদায় করতো। সেই জগাত তাদের সঙ্গে জোট বেঁধে গেল। বে-আইনী আটক আর মারের নালিশ ঠুকে দিলে। —হৈচৈ বেধে গেল।

পাণ্ডা মুসলমানটিকে ডেকে শান্তিপ্রিয় নন্দলাল তাকে বুঝিয়ে বললেন,—'মামলা তুলে নাও'। বাবা এখানে নাই। দাদা গোকুলচন্দ্রও মারা গেছেন। ঝামেলা না-বাধানোই ভালো, ভেবে।

এদিকে, ঐ মুসলমান খাঁ সাহেব অত্যন্ত অত্যাচার করতো জেলেদের ওপর। কাজেই নন্দলাল তার সঙ্গে আপোসের চেষ্টা করতে, সবাই চটে গেল। ওদিকে, খাঁ-এর দৃষ্টি জেলেদের অন্দরমহলেও পড়েছিল। ফলে, জেলেরা একেবারে খাপ্পা হয়ে উঠলো। তারা ছিল তক্কেতক্কে। একদিন সন্ধ্যাবেলা বাগে পেয়ে, খাঁকে ওরা খতম্ করে দিলে।

পুলিস এলো। জেলেদের ধরলে। খুনে জেলেটা রাতারাতি পালিয়ে গেল। দায়রা নালিশ হলো। সকলে মিলে মোটা টাকা ঢালতে কেস্‌টা শেষে 'হাশ্‌আপ্‌' হয়ে গেল।

নন্দলালের বিবাহ হয়েছিল কলকাতার ২নং রাজাবাগানের বাড়ি থেকে ১৯০৩ সালে, ১৩১০ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে। তখন বরের বয়স বিশ, আর কনের এগারো। কন্যা সুধীরা দেবী জন্মের আগে থেকেই এই বরের সঙ্গে বাগ্‌দত্তা। তাঁর আট বছর বয়সে ভাবী শাশুড়ী স্বর্গতা। কন্যার বয়স বারো বছর হয় দেখেই চিন্তিত হয়ে ঠাকুরদাদা প্রসন্নবাবু কথাটা স্মরণ করিয়ে লিখলেন পূর্ণচন্দ্রকে। উত্তরে পূর্ণচন্দ্র লিখলেন,—'নন্দলালের স্বর্গীয়া গর্ভধারিণীর ইচ্ছানুসারে' তিনি এই প্রস্তাবে সম্মত তো আছেনই, উপরন্তু, 'আমি মনে করি, আমার বধূমাতা আপনাদের বাড়িতেই বৃদ্ধি লাভ করিতেছেন। আপনারা যখনই বলিবেন, তখনই শুভকর্ম সম্পন্ন হইবে। আগামী বৈশাখ মাসে ছুটি লইয়া ইহা সম্পন্ন করা যাইতে পারে'।

—সুতরাং, সব ঠিক্‌ঠাক্ হয়ে গেল। কলকাতায় তখন প্লেগের মহামারী চলছে। বাধ্য হয়ে, দিন আরও একমাস পেছিয়ে দিয়ে, ধার্য হল —১৮ই জ্যৈষ্ঠ।

সুধীরা দেবীর পিসতুতো ভাই হেমেন্দ্র মিত্র ছিলেন বড়ো উকীল। বাড়ি

ছিল তাঁর ভবানীপুরে ৬নং পদ্মপুকুর রোডে। সেই বাড়িতেই বিবাহ হবে, স্থির হল। খড়্গপুর থেকে বাবা ও ঠাকুরদাদা কনেকে নিয়ে ঐ বাড়িতেই এসে উঠলেন।

চৌদোলায় চেপে যথাসময়ে বর এলো রাজবেশে। লাল ভেল্‌ভেটের ওপর জরির সাজে সেজে বর এলো বিবাহসভায়। বাবা পূর্ণচন্দ্র জ্যৈষ্ঠ মাসে ছুটি পেলেন না রাজকার্য থেকে। তাঁর আসা হল না। আসরে বরকর্তা এলেন জ্যাঠামশায় যোগীন্দ্রনাথ আর দাদা গোকুলচন্দ্র।

বাড়ির কর্তা বর্তমান থাকতে, পাত্রী-নির্বাচনে অন্দরের কর্তৃত্ব জ্যাঠামশায় যোগীন্দ্রনাথ প্রসন্ন মনে মেনে নিতে চাননি; অথচ, পদস্থ ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্রের প্রতিকূলতা করতেও তাঁর বাধে,—কন্যাপক্ষ যে তাঁর অন্তরঙ্গ। কিন্তু, কন্যার মতামত? সেকালের বিবাহে এগারো বছরের পাত্রীর অভিমত?—সে অবান্তর প্রশ্ন কারও মনে সেদিন জাগবার কথা নয়।

বিবাহসভায় কুলমর্যাদা দাবি করলেন, জ্যাঠামশায়ের নাম করে, দাদা গোকুলচন্দ্র। গৌতম-গোত্রের দশরথ বসুর বংশ, দক্ষিণ-রাঢ়ের মাইনগর-সমাজের আদি কুলীন কায়স্থ তাঁরা। সুতরাং, সেকালে তাঁদের কুলমর্যাদার দাবি ছিল সঙ্গত। কিন্তু, কনের ঠাকুরদাদা প্রসন্নবাবুই বা, মানে খাটো হতে যাবেন কেন। তাঁরাও তো কাশ্যপ গোত্রের বাহাত্তরে সাধ্য মৌলিক কায়স্থ —'পাল'। তিনি বললেন, তোমাদের সঙ্গে আমাদের সে-সম্পর্ক নয়; তোমার বাবা চাইলে, কুলমর্যাদা দেবো নিশ্চয়ই। সুতরাং, বাজে ঝামেলা বাদ দিয়ে, শুভকর্ম নির্বিঘ্নে নিষ্পন্ন হয়ে গেল। সংক্ষেপেই সব সারা হল।

বিবাহের পরে কলকাতা থেকে বর-কনে লটবহর নিয়ে দেশে ফিরলেন নৌকায় করে। স্টীম্‌ লঞ্চের আনাগোনায় 'কাটিগঙ্গায়' সেদিন কী ঢেউ! ওদিকে, দাদাশ্বশুর প্রসন্নবাবুও টাল খাচ্ছিলেন। যোগীন্দ্রনাথ ধরে ফেললেন। দাদাশ্বশুর বললেন, —'আমি কি ডাঙ্গায় আছি? আমাকে সামলাচ্ছেন'! —বললেন তিনি হাসতে হাসতে —আনমনা হ'য়ে।

সরস্বতীর খাল বেয়ে, নৌকা নিজঘাটে এলো অবশেষে। বউভাত হল রাণীপুরের বাড়িতে। দই মিষ্টির হাঁড়ি রাখা হয়েছিল খাটের তলায়, য-ঘরে ফুলশয্যা হলো। —একটি ছোট্ট ঘর। তার একটি দরজা, আর একটি মাত্র জানলা। মুক্ত মনী নদীর দুই কূল এসে আশ্রয় নিলে মজা সরস্বতী-

তীরে বিশাল বসু-পরিবারের একটি বদ্ধ প্রকোষ্ঠে।

বিবাহের পরে কলকাতা থেকে একবার শ্বশুর-বাড়ি গেছেন নন্দলাল খড়্গপুরে। শ্বশুর-বাড়ি গিয়ে মনের আনন্দে স্কেচ্‌ করে বেড়াচ্ছেন চারদিকে। শান্তিনিকেতন-কলাভবনে রাখা আছে তার সব নমুনা। প্রকৃতি আর সমাজ যা দেখেছেন সামনে, সে-সবেরই স্কেচ্‌ করেছেন। ইঙ্কের কাজ সে-সব। তাঁর 'শিল্পচর্চা' গ্রন্থে তার কিছু কিছু নমুনা ছাপা হয়েছে।

ঐ সময়ে নন্দলাল খবর পেলেন, ওখানে আর্টিস্ট্‌ আছেন একজন।—জানা শোনা হল ; আর্টিস্ট্‌ জাতিতে হলেন —হিন্দুস্থানী লালা কায়স্থ ; ছিলেন কোনো অফিসের মুহরী। কিন্তু, পেশা তাঁর মতি বিগড়ে দিয়েছে ; নেশা ধরেছে ছবি আঁকায়। আর্টিস্ট্‌ বললেন,—তিনি ছবি আঁকেন গরীব লোকের বাড়িতে, তারাই খাওয়ায় তাঁকে। উত্তরে নন্দলাল বললেন,—গরীবদের ঘরে যেমন আঁকেন, ওঁদের ঘরেও তেমনি করে ছবি এঁকে দিন। রং বা কালি —আঁকুন যা' দিয়ে খুশি। আর্টিস্ট্‌ জিজ্ঞেস করলেন,—কিসের ব্যবস্থা আছে। এঁদের রং তুলি সবই ছিল। কিন্তু তাতে তাঁর মন উঠলো না।

তাঁর সম্বল ছিল ছোট্ট একটি লোহার কটোরা। ভুষো কালির দলা তার তলায়। আর তিনি তুলি বানান —ন্যাকড়া ভাঁজ ক'রে। কটোরায় জল ঢেলে গুলে, ন্যাকড়া-ভাঁজের তুলি, সেই কালো রং-এ চুবিয়ে ছবি আঁকেন তিনি।

আর্টিস্ট্‌ বললেন,—ছবি তিনি কাগজে আঁকেন না ; আঁকেন দেওয়ালে।

পরের দিন এসে, দেওয়ালে ছবি আঁকবার জন্যে নন্দলাল তাঁকে অনুরোধ করলেন। এর মধ্যে তিনি বুদ্ধি ক'রে, বাজার থেকে কিছু কাগজ কিনে এনে, দেওয়ালে সেঁটে দিলেন। কাগজগুলো লেপ্টে লেগে রইলো।

আর্টিস্ট্‌ বললেন,—'ছবি আঁকছি, আমার নগদা পয়সা চাই'। একটা ছবি শেষ করে, নগদ একটা পয়সা হাতে নিয়ে, তবে আর একটা ছবি ধরলেন। একটা মুখ খানিকটা এঁকে, খানিকটা বাকি রাখলেন। বললেন, —'এটার দাম দু-পয়সা। আচ্ছা, তুমি এটার জন্যে দেড় পয়সা দাও। আর একটাতে উশুল করা যাবে'।

ভেতরের কথা হল, ঠকিয়ে নিয়েছে তাঁকে নানা লোকে। সেই জন্যেই

নগদ দক্ষিণা না-পেলে নতুন কাজে হাত দিতে তাঁর এই অনাসক্তি।

নন্দলালের জন্যে তিনি খান আষ্টেক ছবি করে দিলেন। তার একখানা এখনও আছে নন্দলালের কাছে; বাকিগুলো আছে কলাভবনে। —রেলগাড়ী, ঘোড়সওয়ার, বাজপাখী, বন্দুকধারী সেপাই —এই সবের ছবি এঁকে দিয়েছিলেন তিনি। আঁকতেন তিনি শৌখিন গরীব মানুষের রুচিমতো।

যাই হোক্, তাঁর আঁকবার সেই পদ্ধতিটি নন্দলাল পরে কাজে লাগিয়েছিলেন। শান্তিনিকেতনের 'চীনাভবনে' 'নটীর পূজা'র যে প্যানেল নন্দলাল এঁকেছিলেন, তাতে তুলির বদলে ন্যাকড়া ভাঁজ করে কাজ চালিয়েছিলেন,—সেকালের সেই আর্টিস্টের অনুকরণে। ন্যাকড়া ভাঁজ করে নিয়েই ফ্ল্যাট্ ব্রাশ্, সরু ব্রাশ্ তৈরী ক'রে ব্যবহার করা হয়েছিল। —যাই হোক্, সেই সেকালের হিন্দুস্থানী এক খেয়ালী শিল্পীর পদ্ধতিটি দেখে, নন্দলালের একদা যেমন মজা লেগেছিল, আবার পরবর্তী কালে কাজেও লাগলো সেটি।

চীনা শিল্পীরা অনেকে ছবি আঁকতেন নখ দিয়ে। তাঁরা ছবি আঁকবার জন্যে আঙুলে বিশেষ করে বড়ো বড়ো নখ রাখতেন। সেই নখ দিয়েই ছবি করা হতো। মোদ্দা কথা, শিল্পী তুলি দিয়ে, বা নখ দিয়ে ছবি আঁকেন না; আঁকেন মন দিয়ে। শিল্পীর আসল কাজ হাত বা তুলি দিয়ে হয় না; খোদ কর্তা হচ্ছে মন।

নন্দলালের দুই মেয়ে গৌরী আর যমুনা জন্মেছিলেন খড়্গপুরে। দুই ছেলে কলকাতায়। —বিশ্বরূপ আর গোরা। গোরা হল বিশ্বম্ভর। নন্দলালের বাবা ছিলেন গোঁড়া বৈষ্ণব। তাই, চৈতন্যলীলার অনুসরণে ছেলেমেয়েদের এই নামকরণ তাঁরই।

নন্দলাল যখন আর্টস্কুলের ছাত্র, তখন ছোট ভাই নিমাই মারা গেলেন। দেশে টাইফয়েডে ভুগে মারা গেলেন। চিকিৎসা হয়েছিল রেমিটেণ্ট্ ফীভারের। যখন রোগ ধরা পড়লো তখন সময় নাই। চিকিৎসা-বিভ্রাটেই মারা গেলেন নিমাই। এক মাস ভুগে মারা গেলেন। সুরেন সরকার —নন্দলালের আমতা-ছাটময়রার ভগ্নীপতি সেবা করলেন নিমাইয়ের।

নিমাই ছবি আঁকতেন। দুই ভাইয়ে ছবি আঁকতেন —পাল্লা দিয়ে। নন্দলালের স্কেচ্-বইয়ে আছে নিমাইয়ের আঁকা ছবি। ছবি ভালোও বাসতেন [খু]ব। মরবার পাঁচ-ছ দিন আগে, নন্দলালের ছবি দেখতে চাইলেন নিমাই।

ছবির মধ্যে তখন কাছে ছিল 'কর্ণের সূর্যপূজা'। ছবি টাঙ্গিয়ে দিয়েছেন নন্দলাল। দেখতে পান না নিমাই। কাছে নিয়ে যেতে, দেখলেন চশমা দিয়ে। —'আপনার ছবির একসময় খুব নাম হবে নতুন-দা, যে সুন্দর এঁকেছেন'। তাঁর অন্তিমকালের এই কথাটা নন্দলালের কানে যেন ভবিষ্যদ্বাণীর মতো শোনালো।

বাবাকে টেলিগ্রাম করলেন। তাঁর দুর্ভোগ অনেক। নিমাইয়ের অসুখ পরপর বাড়তে লাগলো। একদিন মৃত ব্যক্তিদের সব নাম করতে লাগলেন। ও‍ঁরা বুঝতে পারলেন —তিনি আর বাঁচবেন না।

নন্দলালের প্রথমা কন্যা গৌরী দেবী তখন হয়েছেন। নিমাই যখন মারা গেলেন, নন্দলালের স্ত্রী তখন খড়্গপুরে। গৌরী সবে সেই হয়েছেন। ওখানেই ও‍ঁরা আছেন।—

নন্দলালের স্ত্রী ওখানে স্বপ্নে দেখছেন,—নিমাই বলছেন,—'খুকী হয়েছে, বৌদি, কই দেখি, কেমন হোল'। উনি তখন খাটের ওপাশ থেকে এপাশে ফিরে শুয়েছেন কিনার ঘেঁষে; প'ড়ে যেতেন আর একটু হ'লে। —ওদিকে নিমাই মারা গেছেন।

ছিপছিপে চেহারার আদুরে দেওর নিমাই। আনুনি ব্যঞ্জনও অমৃত বলে যে খেয়ে যেত —ঘাড় গু‍ঁজে। না, এ তো সে নিমাই নয়। ন্যাড়া-মাথা, কোটরে-চোখ, দেখা দিয়ে গেল —এ যে তার কঙ্কাল!

বাণীপুরে গোবিন্দমোহনের আমলের আদিবাড়িতে। বাবা পূর্ণচন্দ্র বাস করতেন ওখানে প্রথমে। ডান পাশেই সরস্বতী নদী। গ্রামে যাবার আর ঝোড়হাট যাবার চলৎ-রাস্তা —সয়রান। সামনেই বাগান —ফুলের আর সব্জীর। একটা ঘটনা হয়েছিল ওখানে। —এই ব্যাপার দেখে, বাগানেই পুরুত চাটুজ্যে মশায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। পিসেমশাই ফকির মিত্র ও আরও সবাই মিলে, ধরে ধরে তাঁকে এনে তোলা হলো বৈঠকখানায়। জ্ঞান ফিরে আসতে ধীরে ধীরে তিনি বললেন এই ঘটনা —আগাগোড়া।

—চণ্ডীমণ্ডপে শুতেন ঠাকুরদা। দাওয়ার কোনে চাঁপাফুলের গাছ। সে গাছটায় ব্রহ্মদৈত্য আছে —বলতো লোকে। —চণ্ডীমণ্ডপে থাকতেন এক আশ্রিত ব্রাহ্মণ পুরোহিত। তিনি মারা যান সেখানেই; মারা গিয়ে তিনিই ব্রহ্মদৈত্য হয়ে ছিলেন সেই গাছে। খুব ভোরে উঠে রোজ ফুল তুলতেন

তিনি। —জ্যোৎস্না রাত্রে তাঁর দেখা পাওয়া যেত না।

হঠাৎ একদিন ওঁদের পুরুত চাটুজ্যে মশায় দেখেন, চাঁপাগাছ থেকে নেমে, তিনি খড়ম পায়ে দিয়ে, পশ্চিমে জোয়ার জলের ওপর দিয়ে হেঁটে চলে গেলেন। সরু লম্বা এক-ঠ্যাং ফেলে সরস্বতীর ওপারে ঘোষেদের শিবমন্দির ডিঙ্গিয়ে চলে গেলেন।

নন্দলালের জ্যেষ্ঠ প্রপিতামহ মথুরমোহনের দুই ছেলে—বঙ্কুবিহারী আর আশুতোষ। বঙ্কুবিহারী ব্রাহ্ম হয়েছিলেন। তিনি ব্রাহ্মই রইলেন। তাঁর :য়েদের ড্রইং শেখাতেন নন্দলাল। তাঁর ছেলেরা এখনও আছেন। মাঝে মাঝে আসেন—নন্দলালের সঙ্গে দেখা করতে। আর এক খুড়ো খৃস্টান হয়েছিলেন। শিবপুরে ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের প্রোফেসর ছিলেন তিনি। তিনিও আসতেন নন্দলালের কাছে। আশুতোষ ব্রাহ্ম হয়ে, শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মই ছিলেন। তাঁর ছেলে দেবব্রত আর ফণী। ফণিভূষণ ব্রাহ্ম ছিলেন। কিন্তু তিনি বিবাহ করেছিলেন হিন্দুমতে।

দেবব্রত ব্রাহ্ম থেকে হিন্দু হলেন। তিনি ছিলেন স্বদেশীযুগে শ্রীঅরবিন্দের সহকর্মী। 'আত্মশক্তি'র নিয়মিত লেখক ছিলেন তিনি। জেল হয়েছিল তাঁর। খালাস পেয়ে এসে, হলেন রামকৃষ্ণমিশনের আদিপর্বের প্রতিভাধর স্বামী প্রজ্ঞানন্দ। —স্বদেশী ভাবের যুক্তিযুক্ত ও মনোজ্ঞ ব্যাখ্যাকার, 'ভারতের সাধনা' গ্রন্থের রচয়িতা স্বামী প্রজ্ঞানন্দ।

। কলকাতায় স্কুল-কলেজে ॥

(১৮৯৭-১৯০৫)

পনেরো বছর বয়স পার হতে-না-হতে নন্দলাল কলকাতায় গিয়ে স্কুলে ভরতি হয়েছিলেন। ওখানে বাড়ি ভাড়া করা হয়েছিল —বেচু চাটুয্যে স্ট্রিটে। অতি রদ্দি বাড়ি ; চারখানি ঘর। নন্দলালের জেঠতুতো ভাইয়েরা ওখানে থাকতেন আগে থেকেই। নন্দলালের বড়ো ভাই গোকুলচন্দ্র পড়তেন তখন জামালপুরে। খড়্গপুর থেকে কলকাতায় এসে নন্দলাল ভরতি হলেন ক্ষুদিরাম বোসের সেন্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুলে। ভরতি হলেন ফিফ্‌থ ক্লাসে। এন্ট্রান্স পর্যন্ত ওখানেই একনাগাড়ে পড়ে (১৮৯৭-১৯০২) পাশ করলেন ১৯০২ সালের ৩রা মার্চ। পাশ করে, এখানেই ভরতি হলেন কলেজ-বিভাগে। তখন তাঁর প্রকৃত বয়স উনিশ বছর তিন মাস। কলেজে সেকেণ্ড ইয়ারে প্রোমোশন পেলেন না। ওখান থেকে গেলেন জেনারেল এ্যাসেম্‌ব্লিস্‌ ইন্‌স্‌টিটুশনে (১৯০৩-৪)। ওখানেও সেকেণ্ড ইয়ারে এ্যালাও না হয়ে, গেলেন মেট্রোপলিটনে (১৯০৪)। মেট্রোপলিটন থেকে এফ্‌-এ পরীক্ষা দিয়ে, ফেল করে, কলেজ ছেড়ে দিলেন।

স্কুল-কলেজের অনেক স্মৃতি জ্বল-জ্বল করছে নন্দলালের মনে আজও। কলেজিয়েট্‌ স্কুলে ফিফ্‌থ ক্লাসের কথা স্পষ্ট মনে পড়ে তাঁর। সতীর্থ ছিলেন ওমরখৈয়মের কবি কান্তিচন্দ্র ঘোষ। বিশেষ অন্তরঙ্গতা ছিল তাঁর সঙ্গে। ক্লাসে দুষ্টুমিতে আগবাড়িয়ে যোগ দিতেন না নন্দলাল ; কিন্তু, তাঁর উৎসাহ ছিল বেজায়।

—নাটের গুরু ছিলেন কান্তিবাবু। শিক্ষকদের উত্যক্ত করে তুলতেন তিনি। ক্লাস-এগজামিনেশন বছরে হতো ক-বারই। ফাইন্যাল-পরীক্ষা বলে কিছু ছিল না তখন। ফুঁকো-শিশির দোয়াতভরা কালি আর খাগের কলম দিয়ে কাগজে উত্তর লিখতে হতো ক্লাস-পরীক্ষায়।

স্কুল ছিল ওঁদের কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটের ওপর। একবার পরীক্ষা চলছে, কান্তিচন্দ্র করলেন কি, রাস্তায় টুপিওয়ালা একজনকে যেতে দেখেই, কালি-ভরা সেই দোয়াতটা নিয়ে ধাঁ করে ছুঁড়ে মারলেন মস্তক লক্ষ্য করে। অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ

হওয়া মাত্র টুপিধারী তো রেগেই টং। তাঁর গা-ময় কালি। নালিশ করলেন অধ্যক্ষ ক্ষুদিরাম বোসের কাছে। বসু এলেন ক্লাসে। 'কে করেছ'? কিন্তু, রা-টি নাই কারও মুখে। সবাই নিরীহ গো-বেচারা!

নতুন শিক্ষক এলে, কাগজ কেটে, পিঠে লেবেল এঁটে দেওয়া হতো —তাঁর অভিজ্ঞান-পত্র। আরও চলতো নানা রকম উপদ্রব। জানলা দরজা বন্ধ করে, সিগারেট খেয়ে, ক্লাস-রুমে একঘর ধোঁয়া জমা করে রাখা হয়েছিল একবার। মাস্টার এসে, দরজা ঠেলে ঢুকতেই, সে কী বিষম কাণ্ড। চোখে মুখে ধোঁয়া লেগে বিব্রত হ'য়ে, চটে গিয়ে মাস্টার নালিশ করলেন অধ্যক্ষের কাছে। ওঁরা সকলে তখন মার-মূর্তি হ'য়ে এলেন ক্লাসে। এসে, দেখেন কি, ক্লাসের ছেলেরা সবাই বসে আছে —সখী সেজে। কাকে তখন ধরা হয়, বেছে। সবাই তো 'সতী-সাধ'। সুতরাং, মামলা খারিজ। এই দলের পাণ্ডা ছিলেন কান্তিচন্দ্র। বুদ্ধি ছিল তাঁর অতি তীক্ষ্ম।

আর একটি ছেলে। গায়ে ছিল তার ভীষণ জোর। সে ইস্কুলের দোতলা-বারাণ্ডা থেকে লাফিয়ে পড়তে পারতো নিচে —রাস্তায়। একদিন মাস্টার একটিবার তাকে গাঁট্টা মেরেছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে সে তাঁর হাত দুটো ধরেছে —মুটিয়ে। ছাড়ে না। 'আঃ, ছাড়, ছাড়,'—ছেলে ততক্ষণে কষ্ছে 'রোঘো-টিপ্নি'!

তখন নিয়ম ছিল, —নিচে-ক্লাসের ভালো ছাত্ররা উপর-ক্লাসে পড়াবেন। ক্লাসের মাস্টারমশায়রা ছাত্রদের বুদ্ধি বিড়ে-কষে দেখে, এটা ঠিক্ করতেন। কান্তিচন্দ্র যখন সেকেণ্ড ক্লাসে পড়তেন, তখন তাঁকে পড়াতে দেওয়া হতো ফার্স্ট ক্লাসে।

এণ্ট্রান্স ক্লাসে ওঁদের সংস্কৃত পড়াতেন কলেজিয়েট স্কুলের উমাচরণ বেদান্তবাগীশ। ওঁরা ক্লাসে পড়াশুনা কিছুই করতেন না। একদিন নন্দলাল আর কান্তিচন্দ্র দু-জনে ক্লাসে গল্প জমিয়েছেন। দেখে, বেদান্তবাগীশ মশায় বেজায় চটেছেন। তিনি চট্লে, চশমা খুলে টেবিলের ওপর রাখতেন। সে-দিনও তাই করলেন। খালি-চোখে কট্মট্ করে ওঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন,—'বেশ, বেশ, বাবারা গল্পই কর। জামাই করতুম বাবাদের, আমার দুটি মেয়ে থাকলে'। তিনি বোধ হয় ছিলেন নিঃসন্তান।

নন্দলালের এক বন্ধু ছিলেন—উলোর মুস্তফী। বন্ধু সৃজন মুস্তফী। কলকাতা-কলেজের বন্ধু। ইনি আম আর কাঁঠালবিচি পাঠাতেন নন্দলালকে হাতীবাগানের বাড়িতে। তাঁর সঙ্গে নন্দলাল গিয়েছিলেন তাঁর উলোর বাড়িতে। বিশাল বাড়ি। বড়ো বড়ো মন্দির। মন্দিরের মাথায় সোনার কলস, আর গায়ে তার হরেক-রকমের টেরাকোটা। দেখে, খুব ভালো লেগেছিল তখন। সেই ভালোলাগার জের তিরাশী বছর বয়সের শিল্পী নন্দলালের মনে আজও অম্লান। 'সৃজন কি আর আছে? চিঠি লিখে খোঁজ নাও,' —বলেন তিনি আগ্রহভরে। চোখ তাঁর উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে।

সেন্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুলের এণ্ট্রান্স ক্লাসে আর কলেজেও পড়াতেন উমাচরণ পণ্ডিত মশায়। সে-ক্লাসেও ওঁরা গল্প করতেন খুব। একদিন মুস্তফী আর নন্দলাল গল্প জমিয়েছেন, এদিকে পণ্ডিত মশায় 'রঘুবংশ' পড়াচ্ছেন। ওঁরা গল্প জমিয়েছেন, আর পণ্ডিত মশায় আদিরসের শ্লোক অনর্গল পড়িয়ে চলেছেন। সেই আদিরসের খেই ধরেই ওঁদের হাসাহাসি। পণ্ডিত মশায় ধমক দিয়ে বললেন, —'তোমরা জন্তু-জানোয়ারের চেয়েও অধম। তারা উলঙ্গ হয়ে ঘোরে, তবুও তাদের মনে কোনো বিকার হয় না। আর তোমরা এই নিয়ে হাসাহাসি করছো'।

মাঝে মাঝে খেউরি হতো পণ্ডিতমশায়ের। গঙ্গাস্নানাদি বোধহয় করতেন নিয়মিত। এক এক দিন হয়ে আসতেন যেন আদাড়ের ওল; আবার যেই জঙ্গল সেই জঙ্গল। হাতীবাগানে টোল ছিল তাঁর নিজের বাড়িতেই।

পরে আর্টস্কুলে পড়বার সময় 'অগ্নিদেবতার' ছবি করবার জন্যে নন্দলাল সংস্কৃত-ধ্যান লিখে নিয়ে গিয়েছিলেন —বেদান্তবাগীশ মশায়ের কাছ থেকে। প্রবীণ পণ্ডিতমশায় তখন পরম স্নেহভরে নিজে লিখে, অগ্নির স্বরূপ সব বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। 'অগ্নির' সে-ধ্যান বেদান্তবাগীশ মশায় রচনা করে দিয়েছিলেন নতুন করে।

জেনারেল এ্যাসেম্ব্লিতে ম্যাথ্‌মেটিক্স্‌ পড়াতেন —গৌরীশঙ্কর দে। খুব ভালোমানুষ ছিলেন তিনি। বাসা ছিল তাঁর হাতীবাগানে। ওখান থেকে হেঁটে যাতায়াত করতেন কলেজে। তিনি ছিলেন বেঁটে আর কালো। পরতেন চোগা-চাপকান। রাস্তা দিয়ে চলবার সময় চলতেন ঘাড় গুঁজে—কোনোদিকে তাকাতেন না। লোক ছিলেন দেবতুল্য। ক্লাসে এসেই প্ল্যাটফরমে

উঠতেন তিনি —বোর্ডের সামনে। ক্লাসে চাইতেন না কারও দিকে। মাঝে মাঝে ক্লাসে প্রশ্ন দিয়ে, উত্তর লিখতে বলতেন। কোনো আঁক দিয়ে, ছেলেরা সেটা করতে না-পারলে, তিনি নিজেই কষে ফেলতেন। কষে বলতেন,—'তুলে নাও'। ভালো ছেলেরা বসতো প্রথম বেঞ্চিতে ; পিছনে চলতো হল্লা। পিছনে হল্লার দিকে তিনি চেয়েও দেখতেন না। মাত্র বলতেন, —'প্রোসেসটা তুলে নাও, টুকে নাও'। কনিক্স-সেকশনের প্রোব্লেম দিতেন। দিয়ে বলতেন,—'এ্যাস্ট্রনমি পড়তে গেলে, বি-এ, এম-এ ক্লাসে এ-সব কাজে লাগবে। রাস্তায় যদি কেউ ধরতো তাঁকে,—'স্যার, এই অঙ্কটা হচ্ছে না', —তিনি তক্ষুনিই পথে দাঁড়িয়েই সে-অঙ্কটা কষে দিতেন ; কষে দিয়ে, ভালোভাবে বুঝিয়ে দিয়ে, তবে আবার পথ চলতে শুরু করতেন —সেই ঘাড় গুঁজে।

অধর মুখার্জী মশায় পড়াতেন —গ্রীক-ইতিহাস। তাঁর ক্লাসেও বই পড়তে হতো না। ভালোছেলে না হয়েও, তাঁর পড়ানোর গুণে নন্দলাল গ্রীক্-ইতিহাসের অনেক কিছু শিখে নিয়েছিলেন। সমস্ত বইটাই যেন ছিল তাঁর মুখে। ব'লে যেতেন ঠিক্ গল্পের মতো ক'রে। সমস্ত বলার পরে, শেষে বলতেন,—'এইবার বইটা পড়ে নিও'। লম্বা চওড়া সুন্দর ছিলেন তিনি দেখতে, মোটাও ছিলেন মানানসই। গ্রীক-শিল্পকলা বোঝবার ব্যাপারে অধরবাবুর সেই শিক্ষা শীঘ্রই নন্দলালের কাজে লেগেছিল।

নিত্যগোপালবাবু ছিলেন এখানকার সংস্কৃতের একজন বড়ো অধ্যাপক। নন্দলালদের সংস্কৃত পড়াতেন তিনি। হাতীবাগানে ওঁদের বাড়ির কাছে স্টার থিয়েটারের পাশেই তিনি থাকতেন। নন্দলালের পিসিমাকে তিনি 'মা' বলে ডাকতেন। চিকিৎসা করতেন। তিনি দিতেন কবিরাজী ওষুধ ; সে ছিল দাতব্য ব্যাপার। নন্দলালের ভাগ্নী-জামাইয়ের ছেলের গ্রহণী আমাশয় হয়েছিল একবার। অসুখ কিছুতেই সারছে না। সংস্কৃতের অধ্যাপক নিত্যগোপালবাবু ইড়া পিঙ্গলা নাড়ী ধরেই প্রাণ অপান বায়ুর চলাচল বলে দিলেন, রোগের আদি অন্ত সমস্ত অরিষ্টলক্ষণ। হাতও দেখতে পারতেন তিনি।

অধ্যক্ষ মরিসন সাহেব। একদিন ক্লাসে বসে নন্দলালেরা ফষ্টিনাষ্টি করছেন, সিগারেট খাওয়া চলছে। নন্দলালেরা সবাই অন্যমনস্ক হয়ে বসে আছেন। হঠাৎ ক্লাসে এসে হাজির হলেন অধ্যক্ষ সাহেব। —'স্ট্যাণ্ড আপ্

এ্যাণ্ড স্পেল্‌ cigarette'। —সিগারেট খাওয়া যতো সোজা, নন্দলালদের পক্ষে তার ইংরেজী বানানটা বলা কিন্তু ততো সোজা ছিল না। ওঁরা কেউ পারলেন না, সে বানান। শেষে, সাহেব নিজেই লিখে দিলেন —বোর্ডে। —সেকেণ্ড ইয়ারে নন্দলাল ফেল করলেন —ইংরেজীতে। ওখানে ফেল করে তিনি ভরতি হলেন —মেট্রোপলিটনে।

এই টানা-হেঁচড়ার তলে তলে কিন্তু নন্দলাল শিল্প-সৃষ্টির প্রতিই অন্তর্নিবিষ্ট হচ্ছিলেন। ফলতঃ, স্কুল-কলেজের পাঠ্যপুস্তক তাঁর যথাযথ উপজীব্য যোগাবার কোনো উপায়ই বের করতে পারেনি। স্কুলের ড্রয়িং-ক্লাসে প্রথম উৎসাহ পেয়েছিলেন তিনি ছবি আঁকবার। মূর্তি-গড়ার পরে এলো তাঁর অঙ্কন-প্রীতির এই প্রেরণা। স্কুলের সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তকে তিনি পড়েছিলেন হিতোপদেশের 'মিত্রলাভ' প্রসঙ্গে 'সন্ন্যাসী বীণাকর্ণ চূড়াকর্ণ আর মূষিকের কথা'। দেশের বাড়িতে বসে সেই গল্পের তিনি ছবি এঁকে ফেললেন। ছবিটি ছিল জেঠতুত ভাই রঙ্গলালের কাছে। তাঁর স্কেচ্‌বুক-বিবরণে দেখা যায়, এই কাহিনী তাঁর কল্পলোকে উজ্জ্বল হয়ে রূপ-রেখায় আত্মপ্রকাশ করেছিল ১৯০০ সালে। এটা তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রথম আঁকা এক অরিজিন্যাল্‌ ছোট্ট রঙ্গীন ছবি। 'কনে'-ভাই নিমাইও এই সময়ে চিত্রাঙ্কনে তাঁর বিশিষ্ট দোসর ছিলেন। এর পাঁচ বছর বাদে নন্দলাল আর্টস্কুলে ভরতি হয়েছিলেন। নিমাই মারা গেলেন ১৯০৬ সালের অক্টোবর মাসে।

১৯০৩-৪ সালে জেনারেল এ্যাসেম্ব্লিতে পড়বার সময় বার্ডস্বার্থের বইয়ের মার্জিনে ছবি আঁকতেন নন্দলাল। ড্যাফোডিল্‌স্‌, ডোরা, লুসি গ্রে, হরিণ লাফিয়ে পড়া —এই রকম আট দশখানা রঙ্গীন ছবি এঁকেছিলেন তিনি পাঠ্যপুস্তকের মার্জিনে। সে ছবিগুলি পাশ্চাত্য শিল্পী ও শিল্পরসিক রথেনস্টাইনকে দেখানো হবে বলে, বিলাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, কিন্তু সেগুলি আর ফিরে আসেনি। নন্দলাল বলেন, —'ছবিগুলির পরিণাম কি হোল, সব জানতেন শিল্পী শ্রীমুকুল দে'।

মেট্রোপলিটনে পড়াতেন সেকালের সব বড়ো বড়ো পণ্ডিত। কালীচরণ পণ্ডিতমশায় সংস্কৃত পড়াতেন। তাঁর পড়াবার ধরণ ছিল অদ্ভুত। ক্লাসে কখনও তিনি বই খুলতেন না; মুখে-মুখেই পাঠ দিতেন তিনি। এখানে

ক্ষীরোদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ও সংস্কৃত পড়াতেন ; বিজ্ঞানও পড়াতেন তিনি। পাতলা ছিপছিপে চেহারা ছিল তাঁর।

ওদিকে, খড়্গপুরে শ্বশুর-বাড়ির এবং জামাতা নন্দলালের নিজেরও কর্তা ছিলেন তাঁর দাদাশ্বশুর —প্রসন্নকুমার পাল মহাশয়। বাবা তখন দ্বারভাঙ্গায়। তিনি ওঁদের সম্পর্কে 'বিশেষ কিছু দেখতেন না'। মানসিক টাল-বাহনায় পড়ে, নন্দলাল দাদাশ্বশুরকে চিঠি লিখলেন, তিনি আর্ট শিখবেন —আর্টস্কুলে ভরতি হয়ে। দাদাশ্বশুর কড়া সুরে লিখলেন, —'না'। নন্দলাল তখন ছলনা করে লিখলেন,—'তবে ডাক্তারী শিখতে চাই'। যোগাযোগ করে, কলকাতা এসে, আর. জি. কর মেডিকেল-স্কুলে, সঙ্গে নিয়ে গেলেন, স্বয়ং শ্বশুর প্রকাশচন্দ্র পাল মশায়। কিন্তু, এফ্-এ পাশ না-হলে ওখানে ভরতি হওয়া চলে না। ফলে, তিনি ভরতি হলেন না। কিন্তু, রেহাই পেতে না-পেতেই, আবার পাকড়াও।

নন্দলালকে ভরতি হতে হল —প্রেসিডেন্সী কলেজে কমার্শ্যল্ ক্লাসে (১৯০৫)। তবে, ভরতি হলে কি হবে, ক্লাসের পাঠে 'মন তো দিল না সাড়া' ; বেতনও দেওয়া হত না —অনাবশ্যক ভেবে। সেই টাকায় প্রায়ই তিনি কিনতেন ছবিওয়ালা বই। কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন —চ্যাপম্যান্। খুব ভালোমানুষ ছিলেন সাহেব। কিচ্ছু বলতেন না তিনি। কমার্শ্যল্ জিওগ্রাফি, প্রোসেস্ রাইটিং, টাইপ রাইটিং, কমার্শ্যল্ ম্যাথ্মেটিক্স —এই সব শেখানো হতো ক্লাসে। জাতশিল্পী নন্দলালের ছ'মাস দেখতে দেখতে কেটে গেল ওখানে, সওদাগরী শিক্ষানবিসীর এই ছকে-বাঁধা পরিবেশে।

ইস্কুল-কলেজের ইঁট-কাঠের খাঁচায় যেখানে বিলিতী দানা বাঙ্গালী 'মুনিয়া'দের দেওয়া হচ্ছিল ধরে ধরে, তার লোহার দাঁড়ে বসে বসে নন্দলালের প্রাণপাখী মরছিল ডানা ঝটপটিয়ে। মন দিলেও, পাঠ এগোয় না ; কিন্তু প্রাণ এগোয়। খড়্গপুরের বিশ্বপ্রকৃতি কলকাতায় নাই। মানুষগুলোও কেমন যেন ছকে বাঁধা। ফলে, প্রাণিজগতে তখন শিল্পীর মমতা প্রসারিত হতে লাগলো।—

সেন্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুল থেকে একদিন বাড়ি ফিরতে ফিরতে দেখলেন, একটা শঙ্খচিল ট্রামে কাটা পড়লো। ভাগ্যিস্ একটি ডানার ওপর দিয়ে চাকা গেল! 'রাঙ্গা'-ভাই সুরেন্দ্রনাথ আর নন্দলাল মিলে চিলটাকে তুলে বাড়ি

আনলেন। সেই ডানা-ভাঙ্গা শঙ্খচিল পোষা হল। থাকতো সে বাড়ির ছাদে। খায় দায়, থাকে সে মনের আনন্দে —আকাশী পরিবেশে। ভবিষ্যৎ ভারতশিল্পীর ভাগ্যাকাশের শঙ্খচিল।

দেশেও আনলেন তাকে গ্রামের বাড়িতে। সেখানেও থাকে সে খেয়ে-দেয়ে মুক্ত আঙ্গিনায়। মাঝে মাঝে কাঠের গোলায় যেত সে, পোকা খেয়ে আসতে। সেই হ'ল তার কাল। একদিন তাক্ বুঝে, আকাশের শঙ্করীকে নিয়ে গেল ঝোপের শেয়ালে।

দুটো মেনী বাঁদরও পোষা হয়েছিল। কিনে এনেছিলেন টেরেটিবাজার থেকে। তারা থাকতো চেনে বাঁধা। মাঝে মাঝে ছেড়ে দিতেন। তখন ভারী উৎপাত করতো। আধা মানুষ তো। মুক্তি হজম হতো না।

দেশের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন তাদের। একদিন ছেড়ে দিয়েছেন। ছাড়া পেয়ে তারা বাজারে গিয়ে, কোন্ দোকানির কলার ছড়া ধরে যেন টান মেরেছে। দোকান-সর্বস্ব দোকানির মমতা কিসের। মাথায় মারলে জোর-সে এক ঠেঙ্গার বাড়ি। তালু ফেটে ঘিলু রাস্তায় ছিটিয়ে পড়লো। মানুষের হাতে বাঁদর মরলো। বাঁদরের শোকে বাঁদরীও গেল।

তারপরে পোষা হলো খরগোশ। খয়েরী রঙের তুলতুলে একজোড়া খরগোশ। থাকতো তারা কাঠের বাক্সে। তুড়ুক তুড়ুক ক'রে ঘুরে বেড়াতো শশকযুগল স্বচ্ছন্দে, গণ্ডীর ভেতরেই। কান খাড়া ক'রে ক'রে টুঙে টুঙে খেতো শাক-সব্জী —এই সব খাবার। হতো ভারী আনন্দ, দেখতে তাদের চলার ছন্দ। কিশোর শিল্পীর মনও ঘুরঘুর করতো সেই কাঠের খাঁচার চারপাশে।

তারপরে পোষা হল বেজি। সাপের শত্রু বনের বেজিকে পোষ মানানো হলো ভালোবাসার জাদুতে। খেতো সে রান্নাঘরের দুধ মাছ। নন্দলালের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বরূপ তখন দু-বছরের শিশু। চলি-চলি পা-পা করে হেঁটে বেড়ায় সে। দাঁতুড়ে স্বভাব বেজি কি ভেবে যেন কামড় মারতে লাগলো অবশেষে ছোট্ট শিশু, বিশুর পায়ে পায়ে। খাদ্য-অখাদ্য চেনার বালাই ছিল না তার।

পিসিমা ভয় পেয়ে বললেন, —'তাড়াও ওটাকে'। একদিন সত্যি-সত্যিই মারধর করে তাড়িয়ে দেওয়া হলো সে নকুলটাকে। কিন্তু, ঘরের মায়ায় তবুও আসে সে। রান্নাঘরে অনাহুত ঢুকে দুধ মাছ খেয়ে যেতে

থাকে অভ্যাসবশে। তখন তেড়ে দেওয়া হতে লাগলো তাকে দেখা মাত্র। দিনের পর দিন এই রকম অনাদর পেয়ে পেয়ে, পোষা বেজিটা পর পর বুনো হয়ে গেল। অতঃপর, একদিন সত্যিই সে নিরুদ্দেশ হল; আর ঘরে ফিরে এলো না। বনের বেজি বনে চলে গেল।

তারপর পুষলেন 'মুনিয়া' পাখী। ঘরে ছিল দেওয়াল-আলমারি। ছিল ওঁদের দাওয়ার কাঁথে। তাতে দিলেন তারের জাল। তৈরী হলো মুনিয়ার বাড়ি। বাহারী রঙের ক্ষুদে ক্ষুদে মুনিয়ারা ছিল বড়ো আদরে। শিস্ দিতে শিখেছিল তারা। তাদের দেখে মনে হ'তো —কতো কথা —কতো গান।

তারপর পোষেন মাছ। কৈ, মাগুর, পোনাছানা —নানা মাছ। তখন গ্লাস-কেস তো সহজ ছিল না। থাকতো তারা চৌবাচ্চায়। পাখনা দুলিয়ে, লেজ ঘুরিয়ে খেলতো তারা। শিল্পী-মনেও ঢেউ খেলাতো —দেখতে দেখতে।

শেষে পোষেন সাদা ঘুঘু। ঘুঘু আনতেই পিসিমা ভীষণ চটে গিয়ে বললেন, —'নন্দ, এ কিন্তু ভালো হচ্ছে না বাপু।' কিন্তু, বরাবর যিনি জীবনের কারবারী, ভিঁটে-উচ্ছন্নের ভয়ে, জীবনকে তিনি ভয় পাবেন কেন। ঘুঘুই টিকে ছিল শেষ পর্যন্ত হাতীবাগানের বাড়িতে।

সেকালের কলকাতায় ট্রাম ছিল ঘোড়ায় টানা। ফোর্ট উইলিয়মের ভালো ঘোড়া বুড়ো হয়ে গেলে, কিনে নিতো ট্রাম-কোম্পানী। ধর্মতলা থেকে শ্যামবাজারের মোড় পর্যন্ত চলতো ট্রামগাড়ী। ট্রামের ড্রাইভার চামড়ার বেতে শব্দ করতো —ছড়াৎ ছড়াৎ।

রাস্তার মোড়ে মোড়ে স্টাউট্ ঘোড়া মোতায়েন রাখা হতো। মোড় ঘোরবার সময়ে সেই স্টাউট্ ঘোড়াগুলো গাড়ীখানাকে তুলে দিতো, দুটো হেঁচ্‌কা টান মেরেই। গরমের সময় ট্রাম টানতে টানতে বুড়ো ঘোড়াগুলো অজ্ঞান হয়ে পড়তো। তখন হোস-এ করে জল দিয়ে দিয়ে তাদের আবার চাঙ্গা করে তোলা হতো। সেকালে ট্রামে ক্লাস ছিল একটাই। তখনও ইলেক্‌ট্রিক্ হয়নি; রাস্তায় রাস্তায় টিম্‌টিম্ করে জ্বলতো গ্যাসের আলো।

শান্তিনিকেতনে নন্দলাল একবার দেখলেন, —শ্রীনিকেতনে একজন ঝানু অধ্যাপক আমদানি করা হয়েছে —থুড়্‌থুড়ে বুড়ো। গুরুদেবকে রহস্য

ক'রে বললেন নন্দলাল, —'ফোর্টউইলিয়ম থেকে আমদানি নাকি।' শুনে, গুরুদেব তো হেসেই অস্থির।

নন্দলালেরা তখন কলকাতা থেকে দেশে যাতায়াত করতেন নৌকোয়। ভাউলে-নৌকো চাঁদপাল ঘাট থেকে ছেড়ে যেতো রাজগঞ্জ পর্যন্ত। সরস্বতী নদী তখন চালু। ভাউলে চলে যেতো বাণীপুরে —ওঁদের বাড়ির ঘাট পর্যন্ত।

'বাণীপুর' —নন্দলালদেরই পূর্বপুরুষের দেওয়া আর লেখা নাম। উনি ঐ নামটিই ব্যবহার করেন। ও-গাঁয়ের সাবেক নাম —'বানুপুর', 'বেনাবন' কথা থেকে হতে পারে বলে মনে করেন তিনি। ওখানে বেনাবন ছিল খুব —মজা নদীর মোহানা জুড়ে। তিনি বলেন, —'বেনা' থেকে 'বানু' —উপভাষায়। যাই হোক্, আমাদের সরকার কিন্তু নন্দলালদের দেওয়া, এই গাঁয়ের এই নতুন নামটি আজও মেনে নেননি। স্বদেশী সরকারী রেকর্ডে আজও —'বানুপুর', 'বাণীপুর' হবার সৌভাগ্যলাভে বঞ্চিত।

ও-গাঁয়ে জেলেদের বাস ছিল অনেক। তাদের বলতো —'তেওড়'। আর ছিল বাগদী। 'সাঁতরা', 'মাল' —এই সব ছিল বাগদীদের পদবী। নন্দলাল বলেন, —কণারকের মন্দির যখন তৈরী হয়, তার শিল্পকর্মের জন্যে হেড্-মিস্ত্রী গিয়েছিল —'শিবু সাঁতরা'। সে গিয়েছিল তমলুক থেকে। জাতে সে ছিল জেলে।

আন্দুল-মৌরি থেকে কলকাতা পর্যন্ত তখন ধান-চালের ব্যবসা চলতো ঢালাও। সে আমদানি-রপ্তানি চলতো নৌকোয় করে। তারপরে হলো, স্টীমার-সার্ভিস। সে-সার্ভিস ছিল —হোরমিল কোম্পানীর। চাঁদপাল ঘাট থেকে শিবপুর —মেটেবুরুজ —সাঁখরাইল থেকে রাজগঞ্জ। জাহাজ চলতো জল কেটে কেটে, —সে-জাহাজের কী বাহার, —পাখনাওয়ালা ময়ূরপঙ্খী জাহাজ।

প্রেসিডেন্সী কলেজের কমার্শ্যল্-ক্লাস থেকে স্বভাব-শিল্পী নন্দলালের মন যখন উড়ু-উড়ু করছে, সেই সময় তাঁর পিসতুত ভাই অতুল মিত্র কলকাতার গভর্ণমেণ্ট আর্টস্কুলে নক্শা-বিদ্যায় (draftsmanship) পাঠ গ্রহণ করছিলেন। পিসেমশাই ফকির মিত্রের পুত্র তিনি। থাকতেন ওঁদের বাড়িতেই। দেখাশোনা করতেন গার্জেনের মতন।

নন্দলালের পিতা দ্বারভাঙ্গা-রাজের হাবেলী-খড়্গপুর-তহসিলের ম্যানেজার থাকার সময়ে এঞ্জিনীয়ারদের কাজও দেখাশোনা করতেন। পূর্তশিল্পে পূর্ণচন্দ্রের ছিল সহজ প্রবণতা। নব নব নক্‌শা-নির্মাণে ছিল তাঁর বিশেষ দক্ষতা। এই বিষয়ে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন তিনি।

পিতার এই ধাত পুত্রেও বর্তিয়েছিল। এদিকে, সামনেই দেখলেন আদর্শ অতুল মিত্রকে। ফলতঃ, রূপকার নন্দলালের প্রাণের 'বেদনা', পাথর ভেঙ্গে পথ-কাটার যেন একটা পন্থা পেয়ে গেল। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' হয় আর-কি।

নন্দলাল অতুল মিত্রের কাছে পাঠ নিতে লাগলেন মডেল ড্রয়িং, স্টিল লাইফ্ পেন্টিং আর সস্-পেন্টিং-এর। এই হলো তাঁর সরকারী আর্টস্কুলে যাবার আগে, এ্যাকাডেমিক শিল্পচর্চার হাতে খড়ি। এদিকে, কলেজ-ক্লাসের খুঙ্গি-পুঁথি 'সুবন্ত-টীকা গড়াগড়ি যান'; মাস মাস মাইনে দেওয়ার কথাও চিন্তা করা হয়নি। হ্যারিসন রোডের মোড়ে পুরাতন বইয়ের দোকান থেকে ছবির ম্যাগাজিন, বিখ্যাত বিলিতী ছবির প্রিণ্ট্ আর বিলিতী রং তুলি কিনতেই মাসিক বরাদ্দ টাকা ফুরিয়ে যেতো।

রাফেয়েলের অাঁকা ম্যাডোনার মূর্তি নন্দলালের কল্পনাকে বিমোহিত করেছিল; তিনি ম্যাডোনার ছবির কপিও করে ফেললেন। এই সময়ে অর্থাৎ ১৯০১ সালে, বা ১৩০৮ বঙ্গাব্দে এলাহাবাদ থেকে 'প্রবাসী' পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হলো। সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পত্রিকাখানির সর্বভারতীয়, এমন-কি, সারা বিশ্বের সার্বজনীন রূপ দেবার চেষ্টা করলেন। ১৩০৮ সালের প্রথম বর্ষের প্রবাসীতে প্রকাশ হলো অজন্তা গুহার চিত্রাবলী; রাজা রবিবর্মার 'অশোক-তরুতলে রাক্ষসী-পরিবৃতা সীতা', 'রাজা রুক্মাঙ্গদ ও মোহিনী', 'বিরাট-রাজসভায় পাঞ্চালী', 'দময়ন্তী ও হংস', 'সীতার পরীক্ষা', 'দ্রৌপদী ও সিংহিকা' আর 'তদ্‌গতচিত্তা'; গণপত কাশীনাথ ম্হাত্রে-নির্মিত ময়ূরবাহনা সরস্বতী-মূর্তির প্রতিচিত্র; আর কয়েকটি ব্যঙ্গচিত্র। রবিবর্মার মহাভারতীয় চিত্রাবলীতে ভারতের জাতীয়তাবোধ আর একজাতি হিসাবে পারস্পরিক আত্মীয়তাবোধ জাগরণের শুভসূচনা সেই প্রথম দেখা গেল।

১৩০৯ সালের প্রবাসীতে বের হলো, রাজা রবিবর্মার আঁকা 'মালতী', 'কৃষ্ণবিরহিনী রাধা', 'সীতা ও স্বর্ণমৃগ', 'মোহিনী', 'স্বরবৎ-বাদিনী তামিল মহিলা', 'অর্জুন ও সুভদ্রা'; ম্মাত্রে-নির্মিত মূর্তি থেকে 'শবরীর বেশে পার্বতী'; এম্. ভি. ধুরন্ধরের আঁকা 'বিশ্বামিত্রেব রামযাচনা'; অবনীন্দ্রনাথের আঁকা 'বজ্রমুকুট ও পদ্মাবতী', 'সুজাতা ও বুদ্ধ'। এছাড়া, এই সালের প্রবাসীতে যথাক্রমে রাফেয়েলের সিস্টিন ম্যাডোনা, আত্মপ্রতিকৃতি, নাইটের স্বপ্ন, পূতশীলা সিসীলিয়া, ম্যাডোনা ডিলাসেডিয়া, ঈশার ক্রুশবহন, পূতশীলা কাথারিন, গুইডো রেনীর বীয়াট্রীস্ চেঞ্চী, ম্যুরিলোর তরমুজ-ভক্ষক, জি. এস্. নিউটনের পোর্ষিয়া ও বাসানিয়ো, শাইলক ও জেসিকা —এই ছবিগুলিও প্রকাশিত হয়।

১৩১০ সালের প্রবাসীতে মহাদেব বিশ্বনাথ ধুরন্ধরের আঁকা চারখানি, রাজা রবিবর্মার দু-খানি, বিসেঁার দু-খানি এবং হফ্‌ম্যান, ওপি, লেস্‌লি, ওয়েস্ট ও রাজবর্মার একখানি করে ছবি, আর প্রখ্যাত বহু গ্রীক-মূর্তির প্রতিচিত্র ছাপা হয়েছিল। ধুরন্ধর ও রবিবর্মার প্রধান ছবিগুলি আঁকা হয়েছিল 'শকুন্তলা' আর 'রঘুবংশ' অবলম্বন করে। জেনারেল এ্যাসেমব্লিতে অধর মুখার্জীমশায়ের পড়ানোর গুণে, গ্রীক-মূর্তিগুলির ইতিহাস জেনে নিয়েছিলেন নন্দলাল সহজেই। এছাড়া, এই বছরে জাপানী শিল্পী ইয়োকোয়ামা তাইকানের আঁকা 'কালী'র ছবি আর ষুন্সো হিষিডার আঁকা সরস্বতীর একখানি ছবি ছাপা হয়। অবনীবাবুর আঁকা 'শাহজাহানের অন্তিমকাল' চিত্রখানি এই বৎসরের প্রবাসীতেই বের হয়েছিল।

এছাড়া, বিলাতী স্টুডিও-ম্যাগাজিনে নানা ছবির পসরা প্রায়ই নন্দলালের সামনে এসে পৌঁছতে লাগলো। সে সব প্রিণ্ট্ দেখে দেখে নন্দলাল মূল ম্যাডোনার ছবির কয়েকটি কপি করে ফেললেন। 'তখন তো ঐ সবই ছিল' —বললেন নন্দলাল। ভারতীয় চিত্রকরদের মধ্যে রাজা রবিবর্মার চিত্রাবলী বিশেষ করে নন্দলালের মন টেনে নিয়েছিল।

প্রবাসীতে প্রকাশিত রাজা রবিবর্মার এই ছবিগুলির প্রিণ্ট্ নতুন করে দেখালুম নন্দলালকে গত ৩০-এ ডিসেম্বর (১৯৬৪)। তিনি আগ্রহভরে ছবি-গুলি দেখতে দেখতে বললেন, —'রাজা রবিবর্মার এই সব ছবিই তো ছেলে-বেলায় দেখতুম তখন। রবিবর্মা এসেছিলেন কলকাতায় অবনীবাবুর সঙ্গে দেখা করতে। অবনীবাবু রাজার কাজের খুব প্রশংসা করেছিলেন, —সে-



বজ্রমুকুট ও পদ্মাবতী - অবনীন্দ্রনাথ

গল্প আর্টস্কুলে আমাদের কাছে বলেছিলেন তিনি।' ক্ষাত্রে-নির্মিত ময়ূরবাহনা সরস্বতী-মূর্তির প্রিন্ট্ দেখে নন্দলাল বললেন, —'ক্ষাত্রের এই ছবি আমি দেখেছিলুম ; কিন্তু, আমার সরস্বতী আরও সিম্প্ল্।'

রবিবর্মাকে আধুনিক যুগে ভারতশিল্পের 'জন্মদাতা' বলা হয়। রাজা রবিবর্মার অনুসরণে নন্দলাল প্রায়-পাকা হাতে অাঁকলেন তাঁর বড়ো ছবি —'মহাশ্বেতা' ১৩১১ বঙ্গাব্দে বা ১৯০৪ সালে। এর মধ্যে 'কাদম্বরীর' পাঠ নেওয়া হয়েছিল দেবব্রতর কাছে। মহাশ্বেতার সে-ছবিখানির, পরে আর্টস্কুলে প্রদর্শনী করেছিলেন অধ্যক্ষ রমেন চক্রবর্তী। ছবিটি ছিল দেশের বাড়িতে ভাইপো নিরঞ্জন বসুর কাছে।

নন্দলালের শিল্প-নির্ঝর তখনও দিশী বিলেতীর দ্বন্দ-কন্দরে দিশেহারা হয়ে তার প্রকৃত পথের সন্ধান পায়নি। কিন্তু, তাঁর শিল্পপ্রীতি অটল পদক্ষেপেই এগিয়ে চলছিল। ক্রমশঃ কলেজী উচ্চশিক্ষার মোহগ্রন্থি তাঁর একেবারে শিথিল হয়ে গেল। তিনি মনস্থির করে ফেললেন, গভর্ণমেণ্ট আর্টস্কুলে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য হবেন।

অবনীন্দ্রনাথের বজ্রমুকুট ও পদ্মাবতী' আর সুজাতা ও বুদ্ধ' কুন্তলীন-প্রেসে প্রিন্ট্ হয়ে 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়েছিল ১৩০৯ বঙ্গাব্দের দশম-একাদশ সংখ্যায়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'বেতালপঞ্চবিংশতি'র প্রথম উপাখ্যান অবলম্বন করে অবনীবাবুর এই প্রথম ছবিটি অাঁকা হয়েছিল। দ্বিতীয় ছবিটি এঁকেছিলেন তিনি—এডুইন আর্ণল্ডের 'লাইট অব্ এশিয়া' গ্রন্থের ষষ্ঠ সর্গ অবলম্বনে। এই ছবি দুটি নানা বর্ণে রঞ্জিত।

অবনীবাবুর এই ছবিগুলির উৎকর্ষ সম্পর্কে তখন গুঞ্জন চারদিকে। ১৯০৩ সালের অক্টোবর মাসে বিলাতী Studio-ম্যাগাজিনে অবনীবাবুর চিত্র সম্বন্ধে হ্যাভেল সাহেব লিখেছিলেন, —অবনীন্দ্রবাবু মোগল আমলের ভারতীয় চিত্রকরগণের শিল্পকর্মে নিজ প্রতিভা বিকাশের উপযোগী উপকরণ পেয়েছেন ; কিন্তু তা' বলে তিনি বিলুপ্ত বিশেষ চিত্রাঙ্কন-রীতির অনুকরণ করেন নি। তাঁর প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। হ্যাভেল সাহেব আরও লিখেছিলেন— 'While he is as yet far from achieving the marvellous certainty of line and the daintiness of finish found in the best Mogul work, there are a poetic charm and sentiment in the treatment

of the old-world stories he delights to illustrate which are peculiarly his own. 'Studio'-ম্যাগাজিনে প্রকাশিত অবনীবাবুর ছবিগুলি দেখে ১৯০৩ সালের ৩রা জানুয়ারী Pioneer মন্তব্য করেছিলেন ঃ 'The reproductions given in the Studio of this artists' work are very fascinating. They reveal not a trace of English influence……In their naive grace of line, they suggest the art of Japan ; but there is no mistaking their Indian origin'

—এহেন প্রতিভাধর চিত্রকরের এই মৌলিক ছবিগুলি দেখে দেখে নন্দলাল অবনীন্দ্রনাথকেই মনে মনে গুরু বলে বরণ করে নিয়েছিলেন। এর মধ্যে, আর্টস্কুলের এন্‌গ্রেভিং-ক্লাসের ছাত্র. পাড়ার ছেলে বন্ধু সত্যেন বটব্যালের কাছে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মজলিসী মেজাজের অনেক কথা তিনি শুনেছিলেন। অতঃপর. এক শুভদিনে সব ঠিক্‌ঠাক্ ক'রে, সত্যেন বটব্যালের সঙ্গে নন্দলাল অবনীন্দ্রনাথ সকাশে গিয়ে হাজির হলেন।

পরিচয় করিয়ে দিলেন বটব্যাল। অবনীন্দ্রনাথ সকৌতুকে দেখলেন,— কাঁচুমাচু মুখে 'কালোপানা' একটি ছেলে। হাসি চেপে মুখ গোমরা করে অবনীবাবু বললেন, —'লেখাপড়া হল না বুঝি, তাই স্কুল-পালিয়ে ছবি অাঁকতে আসা হয়েছে।' নন্দলাল 'স্কুল-পালিয়ে' আসেননি ; এসেছিলেন কলেজ পালিয়ে। তিনি বললেন. —'আজ্ঞে, আমি এফ-এ পর্যন্ত পড়েছি।' অবনীবাবু বললেন, —'বিশ্বাস হয় না. সার্টিফিকেট্ দেখতে চাই।'

সার্টিফিকেট পাওয়া মুশ্‌কিল। কলেজের বেতন বাকী ছ-মাসের। সেটা না-মিট্‌লে সরকারী কলেজের সার্টিফিকেট্ মিলবে না। অনেক বলে-কয়ে, নিরুপায় হয়ে, কৌতুকের কাহিনী ভাব-গম্ভীর ভাবে সাজিয়ে, কেরানীবাবুর মন ভিজিয়ে অবশেষে সার্টিফিকেট্ মিলে গেল।

প্রেসিডেন্সী কলেজের অতি বুড়ো কেরানী, নাম তার মনে নাই। কিন্তু বড়ো জরুরী ; সার্টিফিকেট চাই-ই চাই। ফাঁদলেন গল্প আষাঢ়ে, —দেখতে তিনি চাষাঢ়ে। কিন্তু, তাঁর শ্বশুরকুল মস্ত ধনী, মস্ত মানী। বিয়ের কথা ফাঁসবে এখন-না-দেখালে সার্টিফিকেটখানি। ছাত্র-যে ছেলের মতন, সহজেই ভিজলো মন ; আর এক বিয়ের ঘটকালিতে, মিলে গেল প্রার্থিত ধন।



সুজাতা ও বুদ্ধ - অবনীন্দ্রনাথ

॥ কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট আর্টস্কুলে ॥

(১৯০৫-১২)

সার্টিফিকেট্ আর ছবির তাড়া নিয়ে নন্দলাল আর্টস্কুলে গেলেন একদিন —সঙ্গে সেই সত্যেন বটব্যাল। নন্দলালের বগলে ছবির তাড়া। তাতে ছিল তাঁর আঁকা ঃ রাফেয়েলের ম্যাডোনার কপি, সস্ পেণ্টিং, গ্রীক্-মূর্তির কপি. স্টিল্ লাইফ্ পেণ্টিং আর কাদম্বরীর চিত্রাবলী।

অস্থায়ী অধ্যক্ষ (১৯০৪-৮) অবনীন্দ্রনাথের কাছ হয়ে, নন্দলাল স্থায়ী অধ্যক্ষ (১৮৯৬-১৯০৭) হ্যাভেল সাহেবের সমীপে এলেন। হ্যাভেল সাহেব ছবির তাড়া থেকে নন্দলালের আঁকা মৌলিক ছবি পছন্দ করলেন— 'মহাশ্বেতা'। বিদেশী ছবির নকলগুলি টেবিল থেকে মেঝেয় ফেলে দিলেন।

নন্দলালের কাজ খুঁটিয়ে দেখে হ্যাভেল সাহেব খুশী হলেন। হুকুম ও নিয়ম মোতাবেক নানা পরীক্ষা হলো। পরীক্ষা নিলেন টীচার ঈশ্বরীপ্রসাদ আর হরিনারায়ণবাবু। ঈশ্বরীপ্রসাদ ছিলেন পাটনার লোক। ছোকরা-বয়সী, সুন্দর মতো দেখতে, আর গোঁফদাড়ি কামানো। ঈশ্বরীপ্রসাদ মন থেকে কিছু একটা আঁকতে বললেন। নন্দলাল আঁকলেন গণেশের ছবি। —'সিদ্ধিদাতা গণেশ' (১৯০৫)। অবনীবাবু পরীক্ষকের মতামত জানতে চাইলে, ঈশ্বরীপ্রসাদ বললেন, —'হাথ্ পুখ্‌তা হৈ'। কে জানে. সেই দিনেই সেই শিক্ষাগুরুটি ভেবে নিয়েছিলেন কিনা. —এই কালো ছেলেটিই ভবিষ্যতে হবে ভারতশিল্প-জগতে আলো-করা একজন 'সিদ্ধশিল্পী'। যাই হোক্. পুরানো পরম্পরামতো 'গণেশ-বন্দনা' দিয়েই নন্দলালের এ্যাকাডেমিক শিল্পি-জীবনের কাব্য গাথা শুরু হলো। 'শঙ্খচিলের' ভূমিকা সারা হয়ে গেছে স্কুলের ক্লাসেই।

হরিনারায়ণ বাবু পরীক্ষা নিলেন মডেল ড্রয়িংয়ের। তিনি ছিলেন কলকাতার লোক। চাপদাড়ি ছিল তাঁর মুখে। টেবিলের ওপর ঘটি, বাটি, কুঁজো, পিরামিড আর ইজেলের ওপর বড়ো একফালি কাগজ রেখে বললেন, —'পনেরো মিনিটের ভেতর সব এঁকে ফেলতে হবে'। নন্দলাল বুদ্ধি খাটিয়ে কাগজের কোনাটিতে ছোট্ট একটু জায়গা ঘিরে, দু-ইঞ্চির ভেতর, পাঁচ মিনিটের মধ্যে এঁকে ফেললেন সব। উত্তর-পত্র পেয়েই.

পরীক্ষক অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, —'তুমি ফাঁকি দিয়েছো হে, এ-সব চলবে না'। শেষ-বিচারের জন্যে নন্দলালকে নিয়ে গেলেন উপাধ্যক্ষের কাছে। ওদিকে, নিরীখে যাচাই ক'রে, সাফ্ রায় হলো, —'ঠিক হয়েছে, সবই তো রয়েছে; তাছাড়া উপস্থিত-বুদ্ধিও তো বেশ খাটিয়েছে'।

এতো করে বিড়ে-কষে দেখে, পরে, অবনীবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, —'কি শিখবে তুমি। —দিশী, বিলাতী, সৌখিন, ব্যবহারিক, জল-রং, তেল-রং, —অনেক কিছু আছে শেখবার, একটা বেছে নাও'। নন্দলাল বললেন, —'আপনার কাছে এসেছি, যা শেখাবেন তাই শিখবো'। রূপশিল্পের জগতে এইভাবেই পূর্ণ আনুগত্য-স্বীকারে প্রথম গুরুবরণ ও গুরুকরণ হয়েছিল নন্দলালের। আর্টস্কুলে নন্দলাল যথারীতি ভরতি হয়ে গেলেন ১৯০৫ সালে।

১৮৭২ সাল থেকে আর্টস্কুলে সিলেবাস্ ছিল, —ডিজাইন, মডেলিং, লিথোগ্রাফী, এন্‌গ্রেভিং, ফটোগ্রাফী, স্কাল্প্‌চার, উড্-এন্‌গ্রেভিং ইত্যাদি। নন্দলাল প্রথমে ভরতি হলেন ঈশ্বরীপ্রসাদের ডিজাইনের ক্লাসে। হিন্দুস্থানী কায়স্থ কারিগরের বংশে জন্মেছিলেন ঈশ্বরীপ্রসাদ। হাত পাকিয়েছিলেন তিনি পাটনা-কলমের জন্মসূত্রগত ঘরোয়া চিত্ররীতিতে। ছবি আঁকা আর আঁকানোর পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্যে হ্যাভেল সাহেব নির্বাচন করে তাঁকে আর্টস্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন।

নন্দলাল হলেন ডিজাইনের ক্লাসের প্রথম ছাত্র। ডিজাইন মানে হচ্ছে, নিজের মন থেকে চিত্র-কল্পনা করে ছবি আঁকা। এই সঙ্গে কারিগরি কাজও করতে লাগলেন তিনি। বিশেষ করে, জেসো আর রঙীন কাঁচ কেটে কেটে নক্সা-তৈরী, —এই সব শিখতে লাগলেন।

কিছুদিন পরে, অবনীবাবু নন্দলালকে নিলেন নিজের ক্লাসে। অবনীবাবুর ক্লাস সেই থেকে শুরু হলো, আর নন্দলাল হলেন তাঁর ক্লাসের প্রথম ছাত্র। কাশী থেকে তাঁত শিখে এসে, এই ক্লাসের দ্বিতীয় ছাত্র হয়েছিলেন সুরেন গাঙ্গুলী। অবনীবাবু ওঁদের দেখিয়ে বলতেন, —'এই আমার ডান হাত আর বাঁ হাত'। সুরেন গাঙ্গুলীর বাড়ি ছিল বরিশালের গুত্তাগড়ে।

ওদিকে, নন্দলালের শ্বশুরকুল যেন সত্যিই এবারে 'ডাঙ্গা' থেকে 'জলে' পড়লেন। স্বয়ং শ্বশুর প্রকাশচন্দ্র খড়্গপুর থেকে সোজা এলেন কলকাতায়, 'বওয়াটে' জামাতা সম্পর্কে সরজমিনে তদন্ত করতে। অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে

দেখা করলেন। অনেক আলোচনার পরে অবনীবাবু বললেন, —'আমি নন্দলালের সব ভার নিলেম'। শুনে, শ্বশুরমশায় ফিরে গেলেন —সম্ভবতঃ নিশ্চিন্ত মনেই। অতঃপর, নন্দলাল সাহস করে দাদাশ্বশুর প্রসন্নবাবুকে চিঠি লিখলেন, —দফায় দফায় কৈফিয়ৎ রচনা করে। কলেজের ক্লাস ভালো লাগা না-লাগা; ক্লার্ক হলে, আর আর্টের লাইনে বেতনের ঘাট থেকে একশো টাকার ফারাক দেখিয়ে, যুক্তিপূর্ণ সে চিঠি। যাই হোক্, দাদাশ্বশুরের সম্মতি-পত্র আসবার আগেই, নন্দলাল আর্টস্কুলে ভরতি হয়ে পুরাদস্তুর পাঠ নিতে শুরু করে দিয়েছিলেন। ফলতঃ শ্বশুরকুল হতাশ হয়ে নন্দলালের আশা বোধ হয় ছেড়েই দিলেন। ডাক্তার, এঞ্জিনীয়ার বা কলেজের অধ্যাপক হওয়া তাঁর ললাট-লিখন ছিল না।

নন্দলাল আর্টস্কুলে ছিলেন প্রায় পাঁচ-ছ বছর। তাঁকে বেতন দিতে হ'ত না। বরং, বছর দুই পরে, বৃত্তি পেতে লাগলেন মাস মাস বারো-তেরো টাকা করে।

আর্টস্কুলে নন্দলালের প্রথম ছবি —'সিদ্ধার্থ ও আহত হংস'। এই ছবির আদরা করা হয়েছিল একটু আগেই। নন্দলাল সিদ্ধার্থের পা এঁকেছিলেন গোল করে। অবনীবাবু সেটা শুদ্ধ করে দিতে চেয়েছিলেন। তাতে হ্যাভেল সাহেব বললেন, —'না, থাক্, বেশ অর্নামেণ্টাল্ ছবি হয়েছে, এ্যানাটমির দরকার নাই।'

আর্টস্কুলে যে-ঘরে বসে নন্দলাল কাজ করতেন, সেটা হ'ল মৃ্যজিয়মে —এখন যেখানে মোগল, রাজপুত, কাঙ্গড়া, পার্শিয়ান ছবি সব টাঙ্গানো আছে - সেই ঘর। হ্যাভেল সাহেব বললেন, —'ওদের সামনে সব ভালো ভালো ছবি টাঙ্গিয়ে দাও'। সেই মতো ওঁদের সামনে পুরাতন traditional বহু বিশিষ্ট ছবির আদর্শ টাঙ্গিয়ে দেওয়া হলো; সেই সব উৎকৃষ্ট ছবি দেখে দেখে আবিষ্ট হয়ে কাজ করতেন ছাত্রেরা।

নন্দলাল আর্টস্কুলে প্রথম গিয়ে দেখেন, হ্যাভেল সাহেব ওখানে তখন নানা ক্রাফ্ট্স প্রবর্তন করেছেন। সব আর্টিস্টকেই সেই ক্রাফ্ট্সের কাজ করতে হতো। ক্রাফ্ট্সম্যানরা মাইনে পেতো না; স্টাইপেণ্ড্ পেতো পনেরো-কুড়ি টাকা ক'রে ক'রে।

স্টেণ্ড্গ্লাস্ করা হতো কাঁচ কেটে কেটে; তার থেকে ছবি হতো।

সেই ছবি লাগানো হতো চার্চের কুলুঙ্গিতে (niche)। সীসের পাত দিয়ে মাউণ্ট্ করা হতো সে-সব ছবি। তার ভেতর দিয়ে আলো এলে, নানা রংয়ের নানা ছবি ঝল্‌কে উঠতে থাকে।

নন্দলালের আগে চার-পাঁচজন কারিগর মিলে ঐ কাজ করতেন। নন্দলালও ওঁদের একজন হলেন। কাঁচ কাটা হতো চোখের চারদিকে তার-বাঁধা কাঁচের ঠুলি লাগিয়ে। কাঁচ কাটা হতো হীরে দিয়ে। কেটে কেটে সাইজ করা হতো। জানলার ফ্রেমেও এই কাঁচের ডিজাইন লাগানো হতো।

জেসোর কাজ। সফেদা আর তিসির তেলে বার্নিশ মেশালে, ঠিক্ পুডিং-এর মতো দেখতে হয়। বাটিতে রেখে সেটা গরম করে, বাটি থেকে তুলি দিয়ে তুলে তুলে, কাঠের ওপর ছবি অাঁকলে রিলিফের কাজ হয়। এটা শুকিয়ে গেলে, মিহি সিরিশ-কাগজ দিয়ে ঘষে, ফিনিশ্ করা হতো। তারপরে, সে-গুলোকে পেণ্ট্ করা হতো নানাভাবে। হ্যাভেল সাহেব দরজার স্ক্রীনে, টেবিলের ঢাকনিতে এসব ব্যবহার করতেন।

স্টেন্‌সিলের কাজ। কাগজের ওপর কিছু এঁকে, সেটা কেটে নিয়ে, মোটা ধ্যাবড়া তুলি দিয়ে কালি বুলিয়ে, ছবি করা হতো। এভাবেও ওঁরা নানা রকম ছবি করতেন। জন্তু-জানোয়ারের হরেক রকমের ছবি করা হতো। দেওয়ালের ফ্রীজে বা কার্নিশে ডিজাইন্ করা হতো।

জয়পুরী আর্টিস্ট্ একদল এসে ফ্রেস্‌কো করতে লাগলেন। নন্দলাল আর্টস্কুলে থাকার সময়েই জয়পুরী আর্টিস্টে্র কাজ আরম্ভ হলো। সিঁড়ির দু'পাশে কাজ আরম্ভ হলো; আরো কিছু কিছু হলো। হেড্ আর্টিস্ট্ নরসিংলাল কাজ করতেন, আর ছাত্রদের ইন্‌স্ট্রাক্‌শন দিতেন। হ্যাভেল সাহেবের নির্দেশে প্যানেল তৈরী করলেন আর্টিস্ট্। পরে, শান্তিনিকেতনেও ফ্রেস্‌কো করতে এসেছিলেন তিনি।

আর্টস্কুলে তখনকার করা সেই ফ্রেস্‌কোর কাজ নন্দলাল শেষের দিকেও শান্তিনিকেতন-কলাভবনে করাচ্ছিলেন। জয়পুরী আর্টিস্টের সেই প্রোসেসের সঙ্গে আরো কিছু মিলিয়ে-মিশিয়ে, শান্তিনিকেতন-কলাভবনের ক্লাসে প্রবর্তন করা হয়েছিল।

নন্দলালেরা সবাই আর্টস্কুলে ঐ ধরনের কাজ করেছিলেন। অবনীবাবুও

করলেন দু-খানা। কৃষ্ণ-রাধার মুখ —বাঁশি বাজাচ্ছেন আর কচ ও দেবযানী। শান্তিনিকেতনে শিশুবিভাগে পরে আলাদা করে, ভিন্ন টেকনিকে করা হয়েছিল সেই ছবি। অবনীবাবুর মূল ছবির প্রিন্ট্ দু-খানি আছে শান্তিনিকেতন-কলাভবনে।

আর্টস্কুলে অবনীবাবু নিজের ছোট্ট স্টুডিওটিতে চৌকির ওপর বসে, ইজেলের সামনে ঝুঁকে পড়ে, ধ্যাননিবিষ্ট হয়ে ছবি আঁকতেন। প্রায়ই নন্দলালেরা গিয়ে দেখতেন তাঁর কাজ। ছাত্রদের কাছে অবারিত দ্বার ছিল তাঁর। বাইরের লোকের জন্যে দরজায় লেখা ছিল —'তাজিম মাফ'। ওখানে অবনীবাবুর ফিনিশ-করা প্রথম বিখ্যাত ছবি 'বঙ্গমাতা' (১৯০২)। এই 'বঙ্গমাতা'ই 'ভারতমাতা' হলেন ১৯০৫ সালে। নাম দিলেন সিস্টার নিবেদিতা। সে স্বদেশীযুগের 'বঙ্গভঙ্গ'-আন্দোলনের সময়ে। 'ভারতমাতা' নাম দিয়ে সেই ছবি তখন স্বদেশী পতাকাতে ব্যবহার করা হতো। অবনীবাবু বললেন, —'আমি আঁকলুম ভারতমাতার ছবি, হাতে অন্ন বস্ত্র বরাভয় —একজন জাপানী আর্টিস্ট [—সম্ভবতঃ ইয়োকোহামা টাইকোয়ান] সেটিকে বড়ো করে একটা পতাকা বানিয়ে দিলেন। কোথায় যে গেল পরে পতাকাটা, জানিনে'। এই 'বঙ্গমাতা'র ছবিখানির রেখাচিত্র আর্টস্কুলের শিক্ষক লালা ঈশ্বরীপ্রসাদ জগদীশচন্দ্র বসুর বৈঠকখানায় এঁকে দিয়েছিলেন।

অবনীবাবু 'বঙ্গমাতা' শেষ করে, 'ওমর খৈয়মে'র ছবি আরম্ভ করলেন। অর্ডার পেয়েছিলেন Studio ম্যাগাজিন থেকে। সেই ছবি তখন করছেন আর নন্দলালেরা দেখছেন। খুব মজা লাগতো ওঁদের দেখতে; সে রং-ভেজানো আর তুলির মুভ্মেন্ট্।

নন্দলালদের উৎসাহ দিতেন অবনীবাবু অরিজিন্যাল্ ছবি করবার জন্যে। ইন্স্ট্রাক্শন দিতেন কমই। ছাত্রেরা ছবি আঁকার 'লড়াই ফতে' করতে না পারলে, আখেরে তিনি আছেন, এই ছিল তাঁর কথা। ক্লাসে বসে বসে মজার মজার গল্প বলতেন; যেন আড্ডা। কিন্তু আসলে তিনি যে শেখাচ্ছেন —সেটা ছাত্রেরা বুঝতে পারতেন না। এই রকম ছিল ক্লাসে তাঁর শিল্পবিদ্যা শেখানোর পদ্ধতি। নন্দলালের মৌলিক শিল্পচিন্তার খোদকারি করতে চাইতেন না তিনি পারতপক্ষে। হাতে ধরে ধরে দেখিয়ে

দেখিয়ে কখনও শেখাননি তাঁকে। ওদিকে রজনী পণ্ডিতমশায় রামায়ণ-মহাভারত শোনাতেন নিয়মিত আর তাই থেকে ছবির আইডিয়া পেতেন ওঁরা —মাস্টার-ছাত্র সবাই।

নন্দলাল আর্টস্কুলে আসার কিছুকাল পরে হ্যাভেল সাহেবের মাথা খারাপ হয়ে গেল। লম্বা চওড়া চেহারা ছিল হ্যাভেল সাহেবের। দোহারা গড়নের। কটা গোঁফ। মাথায় টাক। বাঙ্গলা জানতেন কিছু কিছু। লোক ছিলেন সোজাসুজি। ঘরোয়া ব্যবহার করতেন ছাত্রদের সঙ্গে। ক্লাসে আসতেন পা টিপে টিপে। এসে কাজ দেখতেন —সহজ মানুষ। —এ হেন হ্যাভেল সাহেব পাকেচক্রে পাগল হয়ে গেলেন। ওঁরা তিন জনে, বোধ হয়, হ্যাভেল, উড্‌রোফ্‌ আর বন্ধু ব্লান্ট্‌ কোণারকে গিয়ে সাধনা করতেন —তান্ত্রিক সাধনা। তিব্বতী থঙ্‌কা থেকে দেখে, প্রকৃতি-পুরুষের মিলন ইত্যাদি সব গুহ্য সাধনা চলতো তাঁদের। বীজমন্ত্র লেখা থাকে 'ধরম-থঙ্‌কার' পিছনে আর তার ব্যাখ্যাও থাকে। সম্ভবতঃ, গুরু অটল বাবুকে দিয়ে ওঁরা বীজ ভেদ করাবার চেষ্টা করতেন। দিনরাত কেবল ঐ ষট্‌চক্র ভেদের চিন্তা। সন্ন্যাসীও জুটেছিলেন একজন। সাঁঝ সকালে হ্যাভেল সাহেবের ফ্ল্যাটে গিয়ে তাঁকে তিনি যোগ-ধ্যান শেখাতেন, তুক্‌-তাকেও ভজিয়েছিলেন। সারাক্ষণ ঐ করেন। হ্যাভেলের মেমসাহেবও অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন কাণ্ডকারখানা দেখে। সকলেরই মন খারাপ।

আর্টস্কুলের সিঁড়িতে বুদ্ধের একটি তিব্বতী মূর্তি গ্লাস-কেসে রাখা ছিল। সিঁড়ি দিয়ে আসতে-যেতে সে-মূর্তি দেখলেই, হ্যাভেলসাহেব আসন-পিঁড়ি হয়ে বসে পড়ে, ধ্যানমগ্ন হয়ে যেতেন। পরে পরে, আরো বিহ্বল আর উদ্দাম হয়ে উঠলেন।

—কোনও উপায় না-দেখে, অবনীবাবু অবশেষে ফোর্টে চিঠি লিখলেন। তিনজন শিখ-সৈন্য এসে হ্যাভেলসাহেবকে আটকে নিয়ে গেল। —ভারতশিল্প-প্রেমী হ্যাভেল সাহেবের ব্যর্থ তান্ত্রিক সাধনার ফল বড়ো মারাত্মক হলো। তাঁর বিলাতের বাড়িতে আর গভর্ণমেণ্টকে লিখে, তাঁকে তাঁর দেশের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। শিল্পজগতে 'দিব্যচক্ষু'-দাতা, নব্যভারত-শিল্পিগুরু হ্যাভেল সাহেবের আদরের 'চেলা' অবনীন্দ্রনাথ বড়ো দুঃখে অগত্যা এইভাবে একজন খাঁটি সদ্‌গুরু'র তখনকার মতো শেষকৃত্য করতে বাধ্য হলেন।

হ্যাভেলসাহেব ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল-হলের প্ল্যান করেন। প্ল্যান আর মডেল সব আর্টস্কুলে বসে বসেই করেছিলেন। তাঁরই দূরদর্শিতার ফলে, ১৯০৬ সালের জানুয়ারী মাসে কলকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টস্-ফ্যাকাল্টির অধিবেশনে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, —ছাত্রগণের বিদ্যানুশীলন সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ করবার জন্যে সাহিত্য-দর্শনাদির সঙ্গে সুকুমার-শিল্পের চর্চা হওয়া বাঞ্ছনীয়। —অর্থাৎ আমাদের তখনকার বিকৃত শিল্প-রুচির মোড় ঘুরিয়ে আধুনিক কালে ভারতীয় ললিতকলাকে তিনিই জাতে উঠিয়েছিলেন। কিন্তু, এই বিষয়ে অগ্রণী হয়েছিল পাঞ্জাব-বিশ্ববিদ্যালয়; কলকাতা নয়। —সে আলোচনা পরে করা যাবে।

এই সময়ে অবনীন্দ্রনাথ হ্যাভেল সাহেবের জায়গায় চার বছর 'কার্যকারী অধ্যক্ষ' (Officiating Principal) হলেন। অবশ্য, ঐ সময়ে কোনও দিশী লোককে এই পদ দেওয়া ছিল নিয়মবিরুদ্ধ। অবনীবাবুর জায়গায় ভাইস্-প্রিন্সিপ্যাল হলেন হরিনারায়ণ বসু। সেকেণ্ড মাস্টার বরদাকান্ত দত্ত।

আর্টস্কুলে কার্যকারী অধ্যক্ষ হলেন অবনীবাবু। আগের রুটিন মতোই আর্টস্কুল চলতে লাগলো। পেন্টিং আর মডেলিংয়ের ক্লাসও হতো আগের মতোই।

ক্লাসে মডেল আনা হতো পূর্ববৎ। পুরুষ আর মেয়ে দুইই আনা হতো। মডেল হবার জন্যে রাস্তার 'সাধু' ধরে আনা হতো। মেয়ে মডেল আনা হতো চিৎপুর থেকে। প্রতিদিন ছাত্রেরা যখন কাজ করতেন, অবনীবাবু তাঁদের কাছে বসে থাকতেন আর গল্প করতেন। মাঝে মাঝে দেখিয়ে দিতেন ভুল হলে। ওদিকে, সিঁড়ি দিয়ে মলের আওয়াজ করতে করতে মডেল আসতো। ঝমাঝম আওয়াজ হলেই ওঁরা বুঝতে পারতেন, —মডেল আসছে।

নন্দলাল বললেন, —'দুর্গা বলে একটি ছেলে মডেলের সঙ্গে ঠাট্টা তামাসা করতো। একদিন দুর্গা মডেলকে ইশারা করছে। অবনীবাবু ব্যাপারটা দেখতে পেয়ে বলে উঠলেন, —'ও, এই, বাহা আমার দুর্গা রে'। বলেই, দুর্গার হাত ধরে মডেলের কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে বললেন, —'ওগো মা লক্ষ্মী, আমাদের দুর্গা তোমাকে দেখতে এসেছে'।

'তখন আর্টস্কুলে এগজিবিশন হ'লে, বা ড্রামা হ'লে অবনীবাবু ছাত্রদের ন্ভাইট করতেন'। নন্দলাল বললেন, —''একবার আমি গেছি নিমন্ত্রণ

পেয়ে। সেই সময়ে অয়েল-পেন্টিং-ক্লাসের একটি ছেলে একটি nude মূর্তি করেছে। অবনীবাবু দেখলেন; দেখে, গম্ভীর হয়ে বললেন, —'সেই মেয়ে মডেলটি যদি এসে দেখে ফেলতো নিজের এই চেহারা'! যে করছে এটা, তাড়াতাড়ি তার কাছে এগিয়ে এসে তাকে খানিক প্রশংসা করলেন; হিসেব করে দেখালেন, এটা তেল-রংয়ে আঁকতে খরচ হয়েছে পঞ্চাশ টাকা, আর এটা বিক্রী হ'লে লাভ হবে পঞ্চাশ টাকা। এই একশো টাকা সাকুল্যে আসবে এটা থেকে। তারপর তাকে বলতে লাগলেন, —'Nude মূর্তি করেছ; এটা ক'রে তুমি কি সুখ পেলে? এই টাকা খরচ করলে, এই মেয়েটির ওখানে এই এতো বার তুমি যেতে পারতে। বাপের কি টাকা পয়সা রাখবার জায়গা নাই বাবা? এই টাকা এভাবে নষ্ট করতে গেলে কেন? যদি ইচ্ছেই আছে, ওর কাছে গিয়ে একা একা উপভোগ করলে না কেন? নিজের বদ-মতলব এভাবে ছড়িয়ে দিয়ে, সমজাকে দূষিত করার কি অধিকার আছে তোমার'? —বললেন অবনীবাবু বেশ মিঠে-কড়া সুরেই"।

১৯০৯ সালে আর্টস্কুলে পূজার ছুটি আরম্ভ উপলক্ষ্যে ছাত্রদের প্রতি অবনীবাবু 'শিল্পের দেবতা' নামে যে অভিভাষণ দিয়েছিলেন তাতে দেখা যাচ্ছে, —সে-সময় আর্টস্কুলে ছাত্রসংখ্যা প্রায় ৩০০ জন। তার মধ্যে প্রায় ২৯৯ জনই 'চাপা হাসি' আর 'গোপন টিট্‌কারির' সঙ্গে ভারতশিল্পদেবতাকে অবহেলা করছেন। জানবার জন্যে ব্যাকুলতা নাই, সাধ্য সাধনা নাই, আশা নাই, মনোভিমত ধ্যানে কারও চিত্ত সমাহিত হয় না। শিল্পজ্ঞান স্বতঃই কারও মনে উদিত হয় না। সকলেই যেন দ্বিধাগ্রস্ত, শঙ্কিত, অশান্ত। লোকভয়, হাসি-টিট্‌কারি, সমালোচকের সমালোচনা পদে পদে বাধার সৃষ্টি করছে। কারও হৃদয়ে শিল্পদেবতার আগমনের পথ নাই। ছাত্ররা কেবল গড়তে শিখছেন, ধরতে পারছেন না। খাঁচা গড়তে পাখী পালাচ্ছে। তাঁর কথা: আগে পাখী ধর, পরে খাঁচার চেষ্টা কর। খাঁচা না-মিললে হৃদয়-পিঞ্জরে শিল্প-পাখীকে সযত্নে রাখ। অবনীবাবু বলেছেন, —'আমি দেখিয়াছি তোমরা অনেক সময়ে কোন একটা সুন্দর দৃশ্য লিখিতে হইলে বাগানে কিম্বা নদীতীরে গিয়া, গাছ-পালা ফলফুল জীব-জন্তু দেখিয়া দেখিয়া লিখিতে থাক। এই সহজ ফাঁদে সৌন্দর্যকে ধরিবার চেষ্টা দেখিয়া অবাক

হইয়াছি। তোমরা কি জান না সৌন্দর্য বাহিরের বস্তু নয় কিন্তু অন্তরের?' —সৌন্দর্যের অপূর্ব আলোক চোখে পড়লে তুলি ধরতে আর হাত কাঁপবে না ; পথের সন্ধান আপনিই মিলে যাবে। আর্যভূমির মহান্ শিল্পতরুর আশ্রয় লাভ করতে পারলে 'জন্মতরুক্রোড়ে' 'শিকল-কাটা টিয়া'র মতো নির্ভয় হতে পারবে। 'অবাক', 'স্পন্দহীন' আর 'সংজ্ঞা-শূন্য' হয়ে 'রূপসাগরে নিমগ্ন' হ'লে, তার আর আদি অন্ত পাবে না। —এই হচ্ছে ভারতশিল্পী হওয়ার গোড়ার কথা।

সরকারী আর্টস্কুলে ভারতশিল্পের বিভাগ খোলবার সময়ে দিশী ছাত্রেরা ভেবেছিল, তাদের বিলিতী চারুকলা শিক্ষা না-দেবার এটা একটা ছলনা মাত্র। ফলে, একটি ছাড়া, বিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্র নাকি ধর্মঘট করে এক সময়ে শিল্পবিদ্যালয় ত্যাগ করে গিয়েছিল। ভারতশিল্প সম্পর্কে সেকালের এই ধরনের প্রতিকূল মনোভাব অনুভব ক'রেই অবনীন্দ্রনাথের মর্মস্পর্শী অভিমত ছিল এই রকম। অবনীবাবুর এই সকল অভিমতকে ভবিষ্যতে সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তা হোক্, তবু তখনকার দিনে এ তাঁর নিজের উপলব্ধিগত ও শাস্ত্রসম্মত সত্য।

অবনীন্দ্রনাথের ছাত্রধারায় আমরা পরে পরে দেখতে পাবো, —লাখে মিলল মাত্র 'এক'; তিনশোর পাদপূরণে, দু'শো নিরেনব্বইয়ের ওপর —মাত্র একজন। —চরিত্রে ঋজু, আচরণে নির্ভীক, ধ্যানগম্ভীর, শান্ত, স্বল্পভাষী ভারতশিল্পের 'স্বজন্মবিটপিক্রোড়ে' আজন্ম-আশ্রিত শিকল-কাটা সত্যিকারের একটি 'রঙছুট' 'টিয়া'।

আর্টস্কুলে নন্দলাল যখন পাঠগ্রহণ করছেন সেই সময় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নানা মনীষীর আগমন হতো যাদুঘর দেখতে ; আর সেই সঙ্গে ভারতশিল্পের ছাত্রদের হাতের কাজও দেখতেন তাঁরা। এই সূত্রে সেকালের পৃথিবীর বহু শ্রেষ্ঠ মনীষীর সাহচর্যে এসেছিলেন নন্দলাল। —সেই সব ঘটনার আর তাঁদের সঙ্গে আলোচনার বিবরণ ও তাৎপর্য যথাসময় দেওয়া হচ্ছে।

নন্দলাল আর্টস্কুল ছাড়ার সময় পার্সী ব্রাউন এলেন হ্যাভেলের স্থানে অধ্যক্ষ হয়ে। হ্যাভেলের মতো মাদ্রাজ-আর্টস্কুল থেকে তিনিও এলেন এখানকার অধ্যক্ষ হয়ে। এসে, সব চার্জ নিলেন। কিন্তু, অবনীবাবুর সঙ্গে তাঁর মতের গরমিল হতে লাগলো। ঠিকিমিকি চলতেই লাগলো। ক্রিক্শনের ব্যাপার ছাত্রেরাও বুঝতে

পারতেন। ছুটি চেয়েও পাননি। তখন 'থোড়াই কেয়ার করি' বলে অবনীবাবু চাকরী ছেড়ে দিলেন। অবনীবাবু রিজাইন দিলেন পেন্‌শন্‌ পাবার আগেই। 'মেজ মা' জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে বলে-কয়ে, হ্যাভেল সাহেব অবনীবাবুকে রাজী করিয়ে আর্টস্কুলে এনে ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল করেছিলেন। মাসিক তাঁর বেতন বরাদ্দ করেছিলেন তিনশো টাকা করে। কিন্তু, জাতশিল্পীর ধাতে সে অলীক মায়া মাত্র। —গড়গড়ার ধোঁয়ার মতো সে-ও অলীক বায়বীয়।

অধ্যক্ষ পার্সী ব্রাউনের স্ত্রীর ইচ্ছে ছিল, অবনীবাবুর কাছে, অবনীবাবুর পদ্ধতিতে ওয়াশের কাজ শিখবেন। নন্দলালেরা যেমন করে শিখতেন, তেমনি উৎসাহ ক'রে কাছে বসেই শিখতে লাগলেন মেমসাহেব। কিন্তু, ছাত্রদের সেটা বেশ মনঃপূত হল না। এঁরা তখন ফিকির ভেঁজে একটু বেশী যত্ন ক'রেই রং ফলাতে লাগলেন। এঁদের রং ফলাবার সেই জটিল কায়দা দেখে, হতাশ হয়ে মিসেস্ ব্রাউন শেষ-মেস কেটে পড়লেন।

অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষের ফ্রিক্‌শন বাড়তে, অবনীবাবু রিজাইন ক'রে চলেই গেলেন। এই সময় তিনি নন্দলালকে বললেন, —'তুমি বাড়ি যাও, কিংবা আমার কাছে এসো'। নন্দলাল গুরু অবনীবাবুর ডাকেই সাড়া দিয়ে, তাঁরই বাড়িতে গিয়ে কাজ করবার স্থির করলেন। এদিকে, আর্টস্কুলের অধ্যক্ষ ব্রাউন সাহেবও বললেন, —'তোমাকে মাইনে দেবো, তুমি এখানেই কাজ কর'। তাতে নন্দলাল উত্তর দিয়েছিলেন, —'গুরুকে জিজ্ঞাসা করি'। নন্দলাল শেষ পর্যন্ত সরকারী আর্টস্কুলের অধ্যক্ষ পার্সী ব্রাউনের আহ্বান উপেক্ষা করে, গুরু অবনীন্দ্রনাথের কাছেই চলে এলেন।

অবনীবাবু নন্দলালকে তখন ষাট্ টাকা ক'রে বৃত্তি দিয়েছিলেন তিন বছর (১৯১২-১৪)। এই সময়ে নন্দলাল সিস্টার নিবেদিতার Indian Myths of Hindoos and Buddhists বইয়ের জন্যে ছবি আঁকেন। তখন আনন্দ কে. কুমারস্বামীও এসেছিলেন অবনীন্দ্রনাথের ওখানে। প্রাচীন চিত্রের তালিকা আর কপি করতেন কুমারস্বামী; নন্দলাল সাহায্য করতেন তাঁকে। এদিকে, ১৯০৭ সালে অবনীন্দ্রনাথ-গগনেন্দ্রনাথের সহায়তায় লর্ড কিচ্‌নারের সভাপতিত্বে 'দ্য ইণ্ডিয়ান সোসাইটী অব্ ওরিয়েন্টাল আর্ট' স্থাপিত হয়েছিল পার্কস্ট্রীটে। আর্টস্কুলে আর অবনীবাবুর ওখানে কাজ করতে করতে নন্দলাল দেশের

বাড়ি রাজগঞ্জ-বাণীপুরে প্রায়ই আনাগোনা করতেন। উত্তরভারত, দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করেন ১৯০৭ ও ১৯০৮ সালে; অজন্তা যান ১৯০৯-১০ সালে। সোসাইটীর কাজেও যোগ দিলেন পরে।

আচার্য নন্দলালের ১৯০৭ সালের কড়চা-সংগ্রহে (সংখ্যা ৮) ১৯০৬ ও ৭ সালে তাঁর অাঁকা ছবির একটি তালিকা আছে। তালিকার সঙ্গে ছবির তখনকারের নির্দিষ্ট মূল্য আর কিছু কিছু বিবরণও দেওয়া আছে।—

১৯০৬ সরস্বতী—২০৲

১৯০৭ দশরথবিলাপ (মঠে আছে, সিস্টার নিয়েছিলেন)—৭৫৲

ঐ কর্ণ—৭৫৲

ঐ ধৃতরাষ্ট্র—৭৫৲

ঐ সত্যভামা কৃষ্ণ—২৫৲

ঐ স্বামী বিবেকানন্দ—২৫৲

ঐ কুতুব মিনার থেকে (? হুমায়ুনের মৃত্যু সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে)

ঐ নিদ্রিতা

ঐ বুদ্ধ and dead sawn (হ্যাভেল অবনীবাবু ঃ বুদ্ধের হাঁটু নিয়ে তর্ক)

ঐ বুদ্ধ going out

ঐ ঊর্মিলা

ঐ বঙ্গমাতা (এক হাতে কৃপাণ, অন্য হাতে অন্নবস্ত্র)

ঐ কৈকেয়ী ও মন্থরা (সিস্টার বললেন, অনেক কাপড়ের মোট জড়ানো কেন? নগ্ন হবে আরও)—১৫০৲

ঐ বেহুলা-লখিন্দর (প্রবাসী)—২৫৲

ঐ সতী—৬০৲ Important Plate

ঐ রত্নচূড়—হাতের গহনা (স্কেচ্)

Art সম্পর্কে লেখা-সংগ্রহ কিছু আছে On Teaching and Learning. অতঃপর, ১৫ সংখ্যক কড়চায় দেখা যাচ্ছে ঃ

১৯০৬-৭ ॥ থর্নটনের অাঁকা স্কেচ্-খাতা থেকে নকল করা। আম্বার ফোর্টের স্কেচ্। অবনীবাবু কপি করতে দিলেন। 'পদ্মিনী ও ভীমসিং' নামে যে ছবি নন্দলাল করলেন তার খসড়া আছে। ছবিখানি Calcutta Musium-এ আছে।

পদ্মিনীর কাহিনী নিয়ে অবনীবাবু একটি গল্প লেখেন। সেই গল্পটি চিত্রভূষিত করবার জন্যে তাঁর উপদেশে নন্দলাল এই ছবিখানি আঁকেন। এই ছবিটি দেখামাত্র বঙ্গদেশের ভূতপূর্ব শিক্ষাকর্মাধ্যক্ষ আর্লসাহেব দখল করে বসেন।

কিন্তু, ছবিটি কেনেন থর্নটন সাহেব নিজেই। তিনি ছিলেন মার্টিন কোম্পানীর এঞ্জিনীয়ার। আঁকার হাত ছিল তাঁর চমৎকার। উদয়পুর জয়পুরের অনেক স্কেচ্ করেছিলেন তিনি। আর্ট সোসাইটীরও তিনি উৎসাহী সভ্য ছিলেন।

নন্দলালের অনেক ছবি কিনেছিলেন থর্নটন। 'সতী' তিনিই প্রথম কেনেন। ছবিখানি জাপানে পাঠানো হয়েছিল প্রিণ্ট্ করানোর জন্যে। কিন্তু প্রিণ্ট্ হয়ে ফিরে আসার পরে, 'সতী'র রং বদলে গিয়েছিল। সাহেব মনের দুঃখে ছবিখানি অবনীবাবুকে দিয়ে দিলেন। খোলা হাওয়া আর আলোয় রাখলে কতকগুলো রঙের জলুস ফিরে আসে। জাপান থেকে জিঙ্ক্ দিয়ে মুড়ে ছবি পাঠিয়েছিল। জিঙ্কের গরমে আর জাহাজের গুমোটে কেমিক্যাল-ক্রিয়ায় রং বদলেছিল। অবনীবাবু শোবার ঘরে জানলার পাশে ছবিখানি টাঙিয়ে রেখেছিলেন। প্রতিদিন সকালে রোদ পেয়ে পেয়ে 'সতী'র রং সহসা আবার ফিরে এলো। তখন থর্নটন, উড্রোফ্ সবাই এসে দেখে অবাক। ছবিখানি ছিল অবনীবাবুর কাছেই। ১৩১৫ সালের (১৯০৮-৯) প্রবাসীর অষ্টম ভাগ, দ্বিতীয় সংখ্যায় এই ছবিখানি প্রথম প্রকাশিত হয়। ছবিখানি সম্পর্কে সম্পাদকীয় মন্তব্য করা হয়েছে, —'অতি সুন্দর' ও 'সাত্ত্বিকতাপূর্ণ'।

স্বর্গত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। আর্টস্কুলে নন্দলালের অনুগত বন্ধু সুরেন গাঙ্গুলী। বয়স তাঁর নন্দলালের চেয়ে বছর তিনেক কম। অবনীবাবুর ক্লাসে নন্দলাল যখন ছবি আঁকা শুরু করলেন, সুরেন গাঙ্গুলী তখনও আসেননি। সুরেন গাঙ্গুলী অতি নেওটো ছিলেন নন্দলালের।

নন্দলাল শিখছেন অবনীবাবুর কাছে। মাঝে মাঝে তিনি দেখতে পেতেন অল্পবয়সী ছেলে একটি অবনীবাবুর ক্লাসে উঁকি-ঝুঁকি মারতো। গায়ে জড়ানো তার বোম্বাই চাদর, আর পরনে আট-হাতী ধুতি। বয়সে আঠারো-উনিশ, বেঁটে। আলাপ ক'রে নন্দলাল জানলেন, হ্যাভেল সাহেবের ড্রাফ্টের

ক্লাসে শেখে সে। স্বদেশী-যুগের আগেই হ্যাভেল সাহেবের এই তাঁতের ক্লাস। এই ক্লাসে তাঁত বুনতো সে। শিখতো। দেশের শিক্ষাও ছিল তার কিছু।

ফ্লাই শাট্‌ল্‌ ক'রে, হ্যাভেল সাহেব দিশী তাঁতের ওপর মেকানিক উন্নতি করেছিলেন। মাকু-ঠেলার সে যন্ত্র-কৌশল তাঁর নতুন আবিষ্কার। একদল বলেছিলেন, —মহাত্মার খাদি দেশের শিল্প নষ্ট করবে। হ্যাভেল সাহেব বললেন, —খদ্দর থাকলে তবেই বেনারসী বাঁচবে। আগে বাঁচুক দেশ, সস্তায় নিজের কাপড় প'রে। চরকায় ছিল হ্যাভেল সাহেবের অশেষ উৎসাহ। অবনীবাবুর মাকে হ্যাভেল সাহেব তাঁর দেশ থেকে একটা চরকা আনিয়ে উপহার দিয়েছিলেন।

তাঁতের ক্লাসে সুরেন্দ্রনাথের মন ঠিক বসতো না। নন্দলালের ছবি আঁকা দেখে তিনি বলতেন, —'ইচ্ছে হয় ছবি আঁকি'। আঠারো-উনিশ বছরের ছেলে। শক্ত শরীর। নন্দলাল অবনীবাবুকে বললেন তাঁর কথা। তিনি বললেন, —'বেশ তো'। ভরতি হলেন তিনি। অল্পদিনেই নজরে পড়ে গেলেন তাঁর। অবনীবাবু তাঁকে সাহায্য করতে লাগলেন, —'ছবি আঁকা থেকে, পরনের কাপড়, শীতের জামা, খাওয়া-দাওয়া সব-কিছুতেই। অবনীবাবুর ক্লাস এ্যাটেণ্ড্‌ করতেন তিনি নন্দলালের সঙ্গে। 'প্রবাসী'তে অনেক ছবি ছাপা হয়েছিল সুরেন গাঙ্গুলীর। অনেক ছবিও এঁকেছিলেন তিনি।

নন্দলাল আর সুরেন গাঙ্গুলী ইণ্ডিয়ান আর্টের যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় ছাত্র। পরে, অপর অনেকে এসেছিলেন, —শৈলেন্দ্রনাথ দে, অসিতকুমার হালদার, হিরণ্ময় চৌধুরী, ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, দুর্গেশচন্দ্র সিংহ, মহিসুরী বেঙ্কটাপ্পা সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, লখ্‌নৌ-এর হাকিম মহম্মদ, শমিউজ্জমা —এঁরা সবাই এলেন। ক্ষিতীন্দ্রনাথ আর শৈলেন্দ্রনাথ জয়েন করলেন নন্দলাল সোসাইটিতে যাবার পরে। 'জোড়াসাঁকোর ধারে' (১৩৬৯, পৃ. ১৩৫) গ্রন্থে নন্দলাল সম্পর্কে অবনীবাবুর শ্রুতিলিখনের ছোট্ট প্রেক্ষাপটে, বহু স্মৃতির রেখা একসঙ্গে টানতে গিয়ে, তথ্যচিত্রে বেশ-কিছু হেরফের ঘটে গেছে। পক্ষান্তরে, ইণ্ডিয়ান আর্টের প্রথম ছাত্র ছিলেন কে, এই বিষয়ে সচিত্র সাক্ষ্য-প্রমাণও রয়ে গেছে

১৩১৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের 'ভারতী' পত্রিকায়। এযাবৎ তার কোনো প্রতিবাদও করা হয়নি। গত ৩০-১-১৯৬৫ তারিখে এই বিষয়ে আচার্য নন্দলালের দৃষ্টি আর্কষণ করায় তিনি বললেন, —'অবনীবাবুর 'শ্রুতিধরী' আমাদেরও ছাত্রী। তাঁর একটু দেখে শুনে লেখা উচিত ছিল।'

১৯০৮ সালে সোসাইটীর প্রথম এগ্‌জিবিশনে নন্দলাল আর সুরেন গাঙ্গুলী পাঁচশো টাকা করে পুরস্কার পেলেন। সুরেন গাঙ্গুলী পেলেন তাঁর 'লক্ষ্মণ সেনের পলায়ন' আর 'বত্রিশ সিংহাসন' ছবির ওপর। নন্দলাল পেলেন 'শিব-সতী' আর 'সতী'র জন্যে।

সেই পাঁচশো টাকা পেয়ে নন্দলাল তাঁর শিল্পিবন্ধু প্রিয়নাথ সিংহের সঙ্গে উত্তরভারতের নানা শিল্পস্থানে বেড়াতে বের হলেন। দু'জনে ও'রা বেরলেন শিল্পতীর্থ-পর্যটনে। পাটনা, রাজগৃহ, গয়া, বুদ্ধগয়া, মথুরা, বৃন্দাবন আগ্রা —এইসব দেখে এলেন তাঁরা। দ্বিতীয়বারে নন্দলাল গিয়েছিলেন শ্রীঅর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে —দক্ষিণভারতের দিকে। এতেই ওঁর ভারতপরিক্রমা সমাপ্ত হয়েছিল।

ওদিকে, পাঁচশো টাকা পেয়ে সুরেন্দ্রনাথের চিন্তা হলো —কি করবেন তিনি। শেষে, অবনীবাবু ঠিক ক'রে দিলেন, দেশে ধান-জমি কেনা হবে। সব ঠিক করে কিনিয়েও দিলেন তিনি। কিন্তু, সুরেন গাঙ্গুলীর ভাগ্যে শেষরক্ষা হলো না। লুটে খেলে তাঁর ভাই। ঠকিয়ে নিলে তাঁকে।

'বড়ো গরীব ছিলেন সুরেন'। নন্দলাল বললেন, —"থাকতেন তিনি ও. সি. গাঙ্গুলীমশায়ের ঘরে। গাঙ্গুলীমশায় তাঁকে বাড়িতেই রেখেছিলেন। দেখা করতে যেতুম আমরা মাঝে মাঝে। খাপ খেতোনা সুরেনের, যে-পরিবেশে তিনি থাকতেন। ভালো লাগতো না তাঁর সে-আশ্রয়। বললুম, —'এসো. আমাদের বাড়িতে'। এই কথায় রাজী হলেন তিনি সহজেই। তারপরে একদিন সহসা এসে গেলেন সুরেন। ফলে, অনেক ছবি তাঁর, গাঙ্গুলীমশায়ের কাছেই রয়ে গেল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তিব্বতী দে-দেবতার ছোট ছোট বহু ছবি এনেছিলেন সংগ্রহ করে। সুরেন সেগুলোর নকল করেছিলেন অনেক। সেগুলো সব রয়ে গেল গাঙ্গুলীমশায়ের কাছে। তাঁর নাম-করা ছবি 'নারদ বীণা বাজাচ্ছেন', —এই রকম আরো অনেক সব প্রথম দফার ছবি ওখানেই থেকে গেল। 'বেতালপঞ্চবিংশতি', 'নহুষ' —এমনি সব ছবি তাঁর পাওয়াই গেল



সহমরণের সতী - নন্দলাল

না। সুরেন গাঙ্গুলীর বিখ্যাত ছবি 'মেঘদূত'। ছিল বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদের মঞ্জিলে —দার্জিলিং-এ'।

তারপর গেলেন তিনি বরিশালে —তাঁর দেশের বাড়ি শুক্তাগড়ে। সেখান থেকে নন্দলালকে জানিয়েছিলেন, তাঁর বিয়ের খবর। দেশে গিয়ে তাঁর অবস্থা খারাপ হলো ক্রমেক্রমে আরও। অবনীবাবু নিয়মিত সাহায্য পাঠাতেন তাঁকে বরিশালে। চাকরীও ছিল না তখন। অবনীবাবু লিখেছিলেন, —বৌমাকে নিয়ে চলে আসবার জন্যে। সুরেন গাঙ্গুলী তখন এলেন না। তারপরে, দেশে ম্যালেরিয়া ধরলো, ধরলো যক্ষ্মা।

নিরুপায় হয়ে, অবশেষে সুরেন এলেন কলকাতায়। চেতলায় বাড়ি ভাড়া ক'রে এসে উঠলেন। স্ত্রীও তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন। অবনীবাবু চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিলেন। কিন্তু রোগ যে দুরারোগ্য। বন্ধু সুরেন গাঙ্গুলীকে নন্দলাল দেখতে যেতেন নিয়মিত। কিন্তু, দিন ঘনিয়ে আসছিল তাঁর। তবুও কী আশা তাঁর চোখে মুখে, তাঁর মনে। চাকরী করবেন তিনি —এলাহাবাদে। অবনীবাবু যোগাযোগ ক'রে, শুভসংবাদটি পাঠিয়েছিলেন তাঁকে, তাঁর দেশের বাড়িতে —একখানি চিঠি লিখে।

বালিশের তলায় অতি সন্তর্পণে রেখেছিলেন তিনি তাঁর সেই 'রাজার চিঠি'খানি। নন্দলালকে দেখাতেন। আর এলাহাবাদে তাঁর নতুন গেরস্থালীর রঙীন কল্পনার জাল বুনতেন।

আর দু-চারদিন বাকী। নন্দলাল গেলেন দেখা করতে। উৎফুল্ল খুব। বললেন, —'ক্লান্ত লাগছিল দেহটা। শ্রান্তি ছিল ঘরে ; খেয়েছি অনেকটা। দেহটা এখন হালকা বোধ হচ্ছে, বেশ। আর সেরে উঠলুম বলে। চাকরীও তো ঠিক'। নন্দলাল বাড়ি ফিরলেন বিমর্ষ হয়ে। অস্বাভাবিক উজ্জ্বল চোখ আর তাঁর পাণ্ডুর মুখের ছবি ভাসতে লাগলো মনে।

ভোর-রাতে তিনি মারা গেলেন। তাঁর বাড়িতে খবর পেয়েই, নন্দলাল দৌড়লেন কেওড়াতলার শ্মশানে। শবদাহ তখন শেষ হয়ে এসেছে। চিতার আগুনে তখনও জল দেওয়া হয়নি। আগুন? আগুন তো নয় ; দেখলেন, —আগুনের সুবাসিত ফুল যেন। তাঁর মনে হলো, —মৃতদেহ দেখার চেয়ে এই আগুন দেখা ঢের ভালো। বিকারে আগুনটাকে ফুল

বলে মনে হচ্ছিল। বিকার কাটলো। মনটা শুদ্ধ হয়ে গেল।

সুরেন গাঙ্গুলীর মৃত্যু-সংবাদ ১৩১৬ সালের পৌষ-সংখ্যার প্রবাসীতে সচিত্র প্রকাশিত হয় এইভাবে : 'যুবক চিত্রশিল্পী শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় গত ২০শে নবেম্বর [১৯০৯] তারিখে ক্ষয়রোগে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ১২৯২ সালে বাখরগঞ্জ জেলার অন্তঃপাতী শুক্তাগড় গ্রামে সুরেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ২৪ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। তিনি দরিদ্রসন্তান ছিলেন। গত এপ্রিল মাসে তিনি একটি ১০০ টাকার চাকরী পান, কিন্তু তাহাতে তাঁহার স্বাধীনতার হানি হইবে বলিয়া তিনি উহা গ্রহণ করেন নাই। চিত্রবিদ্যা ব্যতিরেকে তিনি হ্যাটারর্স্লি তাঁতের কাজও বেশ জানিতেন, এবং সকলকে বিনা পারিশ্রমিকে উহা শিখাইতে প্রস্তুত ছিলেন। তাঁহার অনেকগুলি চিত্র প্রবাসী ও ভারতীতে এবং হ্যাভেল সাহেবের ভারতীয় ভাস্কর্য ও চিত্রবিষয়ক সাধনার বলে পুস্তকে বাহির হইয়াছে। তিনি নকলনবীস্ চিত্রকর ছিলেন না, এই অল্প বয়সেই বিশ্বশিল্পীর সৌন্দর্যরহস্যের আভাস পাইয়াছিলেন। তাঁহার চিত্রগুলি তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে।

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর একখানি পত্রে আমাদিগকে লিখিয়াছেন :— 'সুরেনের একান্ত দীন ও দরিদ্র অবস্থা হইলেও সে পয়সা উপায়ের অন্য পন্থা ছাড়িয়া এই কার্যে লাগিয়াছিল। তাহার এমন দুরবস্থা যে আমি কম্বল কিনিয়া দিলে তবে সে শীত কাটাইয়াছে, নচেৎ শীতের দিনে সে একখানি চাদর মাত্র গায়ে দিয়া স্কুলে আসিত। এত দরিদ্র, তাহার পক্ষে ছবি আঁকা (তাও আবার দেশী ছবি) লইয়া পড়িয়া থাকা কতটা মনের তেজ আবশ্যক। তাছাড়া সুরেন আমাদের প্রাচীন শিল্পের সঙ্গে নিজের যতটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিল আমার আর কোন ছাত্র (নন্দলালও নয়) সেরূপ পারে নাই। আর্টিস্ট্ মাত্রেই দুই পথ অবলম্বন করে ; এক প্রাচীন শিল্পের মধ্যে নিবিষ্ট হওয়া আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে প্রাচীনের সঙ্গে যোগ রাখিয়া নূতন নূতন সৃষ্টির দিকে অগ্রসর হওয়া। সুরেন্দ্রের জীবন প্রথম পথে গিয়াছে, নন্দলাল দ্বিতীয় পথে চলিতেছে।'

আমরা তাঁহার বিধবা মাতাঠাকুরাণী, বিধবাপত্নী, ভগিনীত্রয় ও ছোট ভাইকে, তাঁহার গুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে এবং শ্রীমান্



সতীর দেহত্যাগ - নন্দলাল

নন্দলাল বসু প্রমুখ তাঁহার অনুরক্ত সতীর্থগণকে আমাদের গভীর সমবেদনা জানাইতেছি।'

—তারপর সুরেন গাঙ্গুলীর স্ত্রী দেশে ফিরে গেলেন। সুন্দরী ছেলেমানুষ বউ, তাঁর দেওর দেবেনের সঙ্গে দেশে ফিরে গেলেন। অবনীবাবু দেশে তাঁকে সাহায্য পাঠাতেন। তিনি চেয়েছিলেন, বউমা তাঁর বাড়িতে এসে থাকুন। তখন তাঁর কন্যা, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের স্ত্রী মারা গেছেন। থাকুন তা'র সেই কন্যার সামিল হয়ে। বলেছিলেন তিনি সহজ অপত্যস্নেহেই। কিন্তু লোকে যখন এর কদর্থ করলো, তখন তিনি কঠিন হ'য়ে বললেন, —'না থাক্' ।

আর্টস্কুলের একজন ছাত্র বীরেশ গাঙ্গুলী ১৯৩৮ সালে থাকতেন ভবানীপুরে। সুরেন গাঙ্গুলীর বাড়িতে ছিল তাঁর আনাগোনা। নন্দলালের ফটো সেখানে চোখে পড়লো তাঁর। উত্তরে, গৃহকর্ত্রী বললেন, তাঁর স্বামীর বন্ধুর। বীরেশ গাঙ্গুলীর বাড়িতে নন্দলালের উপহার-দেওয়া ছবি দেখে, পরে একদিন সুরেন গাঙ্গুলীর স্ত্রী কেঁদে ফেলেছেন। চেতলায় যে-বাড়িতে সুরেন গাঙ্গুলী মারা গেলেন, তার পাশের বাড়িতেই এঁরা থাকতেন। বাবা এসেছে, দেওর এসেছে, ননদেরা এসেছে; দেওরের ছেলেদের মানুষ করছেন তিনি। তারাই তো বিধবার ভরসা। তবে দেওর করে অযত্ন। তবুও চলে সংসার-চক্র।

ছাত্রটি সব খবর এনে দিলেন নন্দলালকে। দেখা করতে গেলেন নন্দলাল। তিনি বলেছিলেন, —'শান্তিনিকেতনে চল। বাড়ি ক'রে দেবো, থাকবে সেখানে'। —এদিকে, তিনি একা তো নন; বাবা, দেওর, ননদ, ছেলেরা সবাই যাবে। বাবা এদিকে পঙ্গু, দূষিত অসুখ।

'তা'হলে কাশী যাও', —যুক্তি দিলেন নন্দলাল। তারপরে, নন্দলাল চলে গেলেন বরোদাতে ফ্রেস্কো করতে। সাহায্য করতেন তিনি তাঁকে কালীঘাটে। তখন অতি দুঃস্থ অবস্থা তাঁর। থাকতেন কালীঘাটের ধর্মশালায়। দিন চলতো মাতৃমন্দিরযাত্রীদের মুষ্টিভিক্ষায়।

নন্দলাল বরোদা যাবার সময় তাঁর বন্ধু শ্রীনির্মলকুমার বসু মহাশয়কে বলে গেলেন, —খোঁজ নিয়ে নিয়ে খবর পাঠাতে। নির্মলবাবু একদিন টেলিগ্রাম ক'রে জানিয়ে দিলেন, তিনি মারা গেছেন নিউমোনিয়া হয়ে। সে ১৯৪১ সালের কথা। নন্দলাল খরচা পাঠিয়ে দিলেন তাঁর শেষকৃত্যের

জন্যে। এইখানে সুরেন গাঙ্গুলীর পাট শেষ হয়ে গেল। এইরকম যবনিকা হলো একটা করুণ জীবন-নাটকের।

কাঁথার ওপর ডিজাইনের স্কেচ্ আছে নন্দলালের কাছে, সুরেন গাঙ্গুলীর স্ত্রীর হাতের 'জিরী' কাজের নমুনা। সুরেন গাঙ্গুলীর আঁকা 'সমুদ্রশাসন' ছাপা আছে ১৩৩৮-৩৯ সালের 'প্রবর্তকে'। তাঁর আঁকা 'কার্ত্তিক' ও অন্য অনেক ছবি ছাপা হয়েছিল প্রবাসীতে, The Modern Review ও ভারতীতে।

প্রসঙ্গতঃ দেখছি, ১৩১৪ সালের (১৯০৭-৮) প্রবাসীতে প্রকাশিত ছবির আসরে রবিবর্মারই প্রাধান্য। এই বছরে অবনীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি প্রকাশ হয়েছিল চারখানি; রবিবর্মার সাতখানি। রবিবর্মা কলকাতায় গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কাছে আসেন। তখন তাঁর পুত্র অবনীন্দ্রনাথের স্টুডিয়োতে তাঁর কাজ দেখে খুব খুশী হয়ে ছবির দিকে তাঁর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা বলে গিয়েছিলেন। মৃত্যুর কিছুকাল আগে, অবনীবাবুর আঁকা 'সাহজাহানের অন্তিমশয্যা' ছবি দেখে অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছিলেন রাজা। পক্ষান্তরে, রবিবর্মার মৃত্যুর পরে, অবনীন্দ্রনাথ ১৩১৩ সালের পৌষ-সংখ্যার প্রবাসীতে 'স্বর্গীয় রবিবর্মা' সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখে, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছিলেন। এই সময়কার চিত্রালোচনায় দেখা যায়, রবিবর্মার ছবির চেয়ে অবনীবাবুর ছবির শ্রেষ্ঠত্ব মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে গেছেন স্বয়ং হ্যাভেল সাহেব তাঁর Indian Sculpture and Painting গ্রন্থে। ডক্টর কুমারস্বামীরও অনুরূপ অভিমত, আমরা পরে যথাসময়ে সে-সব দেখবো।

১৩১৫ সাল (১৯০৮-৯) থেকেই প্রবাসীতে ছবি ছাপানোর মোড় ঘোরে। এই বছরে দেখা যাচ্ছে, আর্টস্কুলের শিক্ষক লালা ঈশ্বরীপ্রসাদের একখানি, সুরেন গাঙ্গুলীর চারখানি, যোশিও কাৎসুতার একখানি আর নন্দলালের দু'খানি ছবি প্রথম প্রকাশিত হয়েছে: ঈশ্বরীপ্রসাদের 'অন্তঃপুরিকা'; সুরেন গাঙ্গুলীর 'কারাগারে শিশু কৃষ্ণ', 'ভোজরাজা ও পুত্তলিকা', 'মহাভারত লিখন —ব্যাস বক্তা, গণেশ লেখক' —আর 'লক্ষ্মণ সেনের পলায়ন'; যোশিও কাৎসুতার 'বুদ্ধদেবের সংসার-ত্যাগ'; নন্দলালের 'সতী' আর 'গান্ধারী'।

সুরেন গাঙ্গুলী 'লক্ষ্মণ সেনের পলায়ন' ছবি এঁকে সোসাইটির পুরস্কার পেয়েছিলেন; কিন্তু সুন্দর হলেও ছবিটির যে ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই,

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় তা দেখিয়ে দেন। মৈত্রেয় মহাশয় সুরেন গাঙ্গুলীর আঁকা চিত্রপট ('লক্ষ্মণ সেনের পলায়ন') দেখে, সমালোচনা ক'রে প্রবন্ধ লিখে, রাজসাহী-শাখা-সাহিত্য-পরিষদের তৃতীয় বার্ষিক চতুর্থ অধিবেশনে পাঠ করেন। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ১৩১৫ সালের পৌষ-সংখ্যার বঙ্গদর্শনে ও ১৩১৫ সালের মাঘ মাসের প্রবাসীতে। সুরেন গাঙ্গুলীর এই চিত্রপট সম্পর্কে মৈত্রেয় মহাশয়ের বক্তব্য ছিল এই :—'একজন সুনিপুণ চিত্রকর তাহা লইয়া একখানি চিত্রপট রচনা করিয়া, লক্ষ্মণসেনের পলায়ন-কলঙ্ক চিরস্মরণীয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন'।

তাঁর উত্তরে, ১৩১৫ সালের ২রা চৈত্র স্বয়ং অবনীন্দ্রনাথ শিল্পীর 'কলঙ্কভঞ্জন' ক'রে একখানি পত্র লেখেন।—'প্রিয় সুরেন্দ্রের অভিযুক্ত চিত্রকর্মে অবনীবাবুর সমর্থন ছিল এই যুক্তিতে : ইতিহাসের রাজ্য আর শিল্পের রাজ্য এক নয় ; History আর Story-র মতো পৃথক। ইতিহাস চায় প্রমাণ, শিল্প চায় প্রকাশ। History নীরস, Painting সরস ও মনোহর। Art-এর পদতলে fact। শিল্প, সঙ্গীত ও কবিতার মূলে অসত্য ও অযথার পঙ্করাশি কিন্তু যেখানটায় তাদের প্রকাশ বা বিকাশ সেখানে আলোক আর অকলঙ্ক মাধুরী। 'পলায়ন-কলঙ্করূপ অসহ্য পঙ্ককে আশ্রয় করিয়া তোমার মনোমৃণাল অবাধে সিধা গিয়া ঠিক জায়গায় বিকাশলাভ করিয়াছে, বঙ্গরাজশ্রীর একটি নিষ্কলঙ্ক করুণ বিদায়চ্ছবিতে। তোমার এ লক্ষ্মণসেন ইতিহাসের ছায়া নয় কিন্তু কালচক্রের মর্মভেদী ঝনঝনার সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি মাত্র'।

এ ছাড়া ১৩১৬ সালের বৈশাখ মাসের 'বঙ্গদর্শনে' 'নামকরণ-রহস্য' প্রবন্ধ লিখে শিল্পকলার দিক্ থেকে প্রিয়শিষ্য-লিখিত চিত্রপটখানির নামকরণ সমর্থন করেছিলেন শিল্পিগুরু অবনীন্দ্রনাথ। আর একটা আশ্চর্যের বিষয় আমরা লক্ষ্য করি, এই ঘটনার দশ বছর আগে, দ্রষ্টা কবি রবীন্দ্রনাথ যেন এর ছায়া দেখেছিলেন। তাঁর 'কথা'-গ্রন্থের 'মৈত্র মহাশয়' 'মাসি'র কোল থেকে 'রাখাল'কে ছুঁড়ে দিয়েছিলেন 'দেবতার গ্রাসে' ; আখেরে অবশ্য মনের খেদে 'মৈত্র মহাশয়'ও মজেছিলেন। যাই হোক, 'কালচক্র' সকৌতুকে আজও প্রধাবিত 'আর —আর —সেই সুনিপুণ চিত্রকর —একজন 'বাঙ্গালী'। —এই ব'লে।

বিধির বিপাকে আধুনিক বাঙ্গালার স্বনামধন্য প্রবীণ ঐতিহাসিক মহাশয় এই স্বল্প সময়ের ব্যবধানেই নব্যভারতশিল্পের প্রথম যুগের 'উদীয়মান' সাধক শিল্পী সুরেন গাঙ্গুলীর নামটি বিস্মৃত হয়েছেন। ভুলের মাশুলে, তাঁর সেই তথাকথিত 'কলঙ্কে'র যূপকাষ্ঠে অন্য একজনকে অতর্কিতে বসিয়ে দিয়ে, মা কালীর 'কাত্তানে'র কোপ মারা হয়েছে এইভাবে : Poets like Nabin Chandra Sen and D. L. Roy and artists like Nandalal Bose have given wide currency to this baseless slander among the people of Bengal ('p. 246 f. n., The History of Bengal, Vol. I, R. C. Majumdar, D. U. 1943)।

যাই হোক, আচার্য নন্দলালের নামে এই কল্পিত 'কলঙ্ক'-রেখা অবিলম্বে নিশ্চিহ্ন হওয়া আবশ্যক। অন্যথায়, কালবিলম্বে বাঙ্গালীর প্রামাণ্য ইতিহাস গ্রন্থে অসত্য সত্যের মর্যাদা লাভ করা বিচিত্র নয়।

[এই ঐতিহাসিক ভ্রমটির প্রতি গত ১লা ফেব্রুয়ারী শ্রদ্ধেয় ডক্টর মজুমদার মহাশয়ের দৃষ্টি আর্কষণ করা হলে, তিনি যে সহৃদয় উত্তর দিয়েছেন, আচার্য শ্রীনন্দলালের নির্দেশ মতো সেটিও এইসঙ্গে প্রকাশিত হল।—

R. C. Majumder

4, Bepin Pal Road,
P. O. Kalighat, Calcutta, 26
3. 2. 65

প্রিয় পঞ্চাননবাবু

আপনার ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখের পত্র পাইলাম। লক্ষ্মণ সেনের পলায়নের ছবিটি যে শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু আঁকেন নাই —সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এঁকেছেন —তাহা আমারও স্মরণ আছে। অনবধানতাবশতঃ —নন্দলাল বাবুর নামই বেশী পরিচিত —বোধ হয় এই কারণে —নন্দলাল বাবুর নাম উল্লিখিত হওয়ায় আমি অত্যন্ত দুঃখিত ও লজ্জিত —এবং এই ভুলের জন্য নন্দলালবাবুর প্রতি যে অবিচার করা হইয়াছে তাহার জন্য তাঁহার ক্ষমা প্রার্থনা করি। ২০।২৫ বৎসর আগের বইতে কি করিয়া এই ভুল হইল তাহা আজ নির্ণয় করিবার উপায় নাই। তবে ইহার জন্য যে কোন প্রকারে নন্দলালবাবুর নির্দেশ মত আমি ত্রুটি স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। শ্রীযুক্ত



লক্ষ্মণ সেনের পলায়ন - সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী

নন্দলালবাবুকে এই পত্র দেখাইবেন এবং তাঁহাকে আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করিবেন।

আশা করি কুশলে আছেন।

ইতি

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

পুঃ History of Bengal এখন পাকিস্থানের কর্তৃত্বাধীনে—সুতরাং উহার ভবিষ্যৎ সংস্করণে ভুলটি সংশোধন করার উপায় নাই। বাংলায় রচিত আমার বাংলার ইতিহাসের চতুর্থ সংস্করণ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। তাহাতে আমি এই বিষয়টি উল্লেখ করিয়া আমার ত্রুটি স্বীকার করিব। ইতি

র. চ. ম.]

সেকালে গাঙ্গুলী-মৈত্রেয় এই বিরোধকে আমরা কমল-করী-সংঘর্ষের মতো অসম ও অস্বাভাবিক বলে মনে করি। প্রকারান্তরে, এ যেন নব্যভারত-চিত্রকলার জয়যাত্রারই ডঙ্কা-নিনাদ। বিদেশী সরকারের স্নেহরসে পুষ্ট হয়ে নব্যভারতশিল্পের নবপ্রতিষ্ঠা দর্শনে. আর নিপুণ চিত্রশিল্পিগণের কৃতিত্বের অচিরস্বীকৃতিলাভে আশঙ্কিত হয়েই যেন নব্যস্বাদেশিকতার এই প্রকাশ্য যুদ্ধ-ঘোষণা। পক্ষান্তরে, ভারতবর্ষের বিধাতাপুরুষ জানিনে কি গূঢ় কারণে, ভারতের প্রাচীন শিল্পকলার মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট উদীয়মান ছাত্রটিকে অকালে নিজের কোলে টেনে নিলেন। ভারতবর্ষ সুদীর্ঘকাল ধ'রে পেলে নন্দলালকে, যিনি প্রাচীনের সঙ্গে যোগ রেখে নব নব সৃষ্টির আকাশে তাঁর তুলির পাখা তখনই মেলে দিয়েছিলেন।

॥ শিল্পিজীবনে শিল্পচর্চার পরিমণ্ডলী ॥

(১৯০৫-১৯১৫)

পুণ্যদর্শন মহেন্দ্রনাথ। মহেন্দ্রনাথ দত্ত —স্বামী বিবেকানন্দের মেজো ভাই। তাঁর কাছে খুব আনাগোনা ছিল নন্দলালের। মহিমবাবুর গৌরমোহন মুখার্জী স্ট্রীটের বাড়িতে বিশেষ করে যেতেন নন্দলাল আর শৈলেন্দ্রনাথ দে। আর্টস্কুল থেকে ফেরবার সময় এবং পরেও যেতেন ওঁরা সন্ধ্যেবেলায়। ছুটীর দিনে সকালেও গিয়ে বসতেন। মহিমবাবুও প্রত্যাশা করতেন ওঁদের সব সময়ে। আর একজন আসতেন সে-বৈঠকে। তিনি হলেন চিরঞ্জীব বোলিয়ার। মার্চেন্ট-অফিসে কাজ করতেন তিনি। তিনি আসতেন অফিস-ফেরতা। আসতেন তিনি নিত্য-নিয়মিত। মহিমবাবু তাঁকেও স্নেহ করতেন খুব। তিনি নন্দলালদের আলোচনায় যোগ দিতেন না, কিন্তু শুনতেন সব মনোযোগ দিয়ে। বোলিয়ার মশায় এসেই পাঁচ-ছ ছিলিম তামাক সেজে রাখতেন বড়ো বড়ো তাওয়ায়। মহিমবাবু হাঁটু মুড়ে বসে, একটা খেয়ে শেষ করতেন, আর শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আগুন ধরানো হ'তো আর একটায়। চিরঞ্জীববাবুও তামাক খেতেন —সে তাঁর নিজের হুঁকোতে। ঘড়িক-ঘড়িক চা-ও তৈরী করতেন তিনি। মহিমবাবু 'র' (raw) চা খেতেন —চিনি ছাড়া।

স্বামীজীর আমলের পুরাতন একটি সোফায় উবু হয়ে বসে থাকতেন তিনি ঠেস দিয়ে। নন্দলালেরা বসতেন পাশে —টুলের ওপর। বৈঠকখানায় চাতালের দু'পাশে দুটি ঘর ; তার একটিতে থাকতেন মহিমবাবু, আর একটিতে থাকতেন ভূপেনবাবু —স্বামীজীর ছোট ভাই।

মহিমবাবু অনেক গল্প করতেন চা খেতে খেতে। তখন শরীর তাঁর ছিল খুবই ভালো। কতো কথা-যে তিনি বলতেন, আর তাতে নন্দলালের যে কতো শিক্ষা হতো তার পরিমাপ হয় না। সব কথা বলতেও আবার নিষেধ ছিল। মহিমবাবুর আসরে নন্দলাল আর শৈলেনবাবু তো থাকতেনই ; প্রাণেশবাবু, বসন্তবাবু ও আরো অনেকে সব আসতেন। তাঁরা মহিমবাবুর ঠিঁয়ে শুনে শুনে তাঁর কথা সব নোট করতেন —বই লেখবার জন্যে।

নোট করতেন তাঁর ভ্রমণ-বিষয়ে —তিনি ভারতবর্ষের যেখানে যেখানে গেছেন তার বিবরণ। নানা কথা টুকে রাখতেন শিল্প-বিষয়েরও।

শীতকালে মহিমবাবুর গায়ে থাকতো —তুলো-ভরা জামা, আর মাথায় পরতেন তুলোভরা কান-ঢাকা টুপি। কথার ফাঁকে ফাঁকে মহিমবাবু সুর ভাঁজতেন গুন্‌গুন্ ক'রে। গান আর কলী প্রায়ই আবৃত্তি করতেন তিনি গিরিশবাবুর নাটক থেকে। গিরিশবাবুর সঙ্গে মহিমবাবুর হৃদ্যতাও ছিল খুব।

১৮৯৭ সালের দিকে স্বামী বিবেকানন্দ তখন বিলেতে। মহিমবাবু সেই সময়ে ব্যারিস্টারী পড়বার জন্যে বিলেতে গিয়ে পৌঁছলেন জাহাজে করে। স্বামীজী খুশি হননি তাতে।—সে সম্ভবতঃ পয়সা-কড়ির অভাবের জন্যে। মহিমবাবু লণ্ডনে বছর দেড় দুই ছিলেন ; সঙ্গে সঙ্গে ফেরেননি। ঐ সময়ে নিয়মিত পড়াশুনা করতেন তিনি বৃটিশ ম্যুজিয়মে গিয়ে। সে নানা বই —বিশেষ ক'রে দর্শনের ওপর। খানিকটা অভিমান ক'রে আর হাতে বেশী পয়সা না-থাকার জন্যে মহিমবাবু বিলেত থেকে সোজা হেঁটে এদেশে ফিরে আসার মনস্থ করলেন।

বিলেত থেকে মহিমবাবু ফিরলেন যখন —সে সব রাস্তাটাই পায়ে হেঁটে হেঁটে। ফিরলেন য়ুরোপের নানান দেশের ভেতর দিয়ে দিয়ে উত্তর আফ্রিকা, পশ্চিম এশিয়া, গ্রীস, ইরান, সিরিয়া, রাশিয়া, বুলগেরিয়া হয়ে, সব দেশে থেকে থেকে, সব দেশ দেখতে দেখতে ফিরে এলেন এদেশে। পাঁচ বছর ধরে দেশ পর্যটন ক'রে ১৯০২ সালে তিনি কলকাতায় পৌঁছলেন। তখন স্বামীজী মারা গেছেন। ভারতবর্ষেও তিনি বহুস্থান পর্যটন করেছিলেন।

পারশিয়ার মরুভূমিতে একবার একটা ঘটনা ঘটেছিল। পারশিয়াতে এসে উনি তখন আরবী ভাষাটা শিখে ফেলেছেন।—মরুভূমির ভেতর দিয়ে আসতে আসতে মহিমবাবু ডাকাতদলের পাল্লায় পড়লেন।—ডাকাতরা ওঁকে ঘিরে ধরেছে ; ঝুলিঝালা উট্‌কে-পাট্‌কে দেখছে, ওঁকে চিৎপাত ক'রে পেড়ে ফেলেছে। বুকের ওপর চেপে বসে, ঠারে কি-যেন ব'লে ছোরা তুলে মুরগি-হালালের মতো খুন করতে যায় আর কি। আর ঠিক সেই সময়ে তিনি হো-হো ক'রে উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলেন। তাঁর সেই উচ্চ হাসির রোল শুনে, তখন কি-যেন ভেবে, ডাকাতরা তাঁকে ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে চলে

গেল। এরকম ডাকাতদলের পাল্লায় প্রায়ই পড়তেন মহিমবাবু, —সেটা একরকম যেন গা-সওয়া হ'য়ে গিয়েছিল তাঁর।

—এই প্রসঙ্গের জের টেনে নন্দলালদের তিনি বললেন, —'দেখ, অপোজিট্ এনার্জীর চেয়ে বেশী এনার্জী বের করতে হবে —সবক্ষেত্রে; তবেই জয়ী হ'তে পারবে —সকল কাজে। সমান সমান হলেও পারবে না।'

ইজিপ্টে অনেক লোক আসতো মহিমবাবুর কাছে। ওখানে কথা বলতেন ইংরেজী ভাষায়। ইজিপ্শিয়ান ভাষাটা রপ্ত করা হয়নি। ইজিপ্শিয়ানরা আসতো তাঁর কথা শোনবার জন্যে। তিনি নানা বিষয়ে আলোচনা ক'রে ক'রে বোঝাতেন তাদের। তাঁকে খুব ভক্তিও করতো তারা। ইস্পাহানে অনেকদিন ছিলেন মহিমবাবু। পোশ্তু ভাষা জানতেন অল্প-স্বল্প। বহু দেশ ভ্রমণ ক'রেছেন তিনি, আর বহু ভাষা শিখেছিলেন। সিরিয়াতে 'বাহাই'-সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল।

উজবেকিস্তানে পৌঁছলেন। ওখানকার লোকেরা খুব চর্বি খায়। দুম্বার লেজের চর্বি খায় আর খুব মোটা হয় —ঢ্যাপ্সা মোটা; আর নেশা ক'রে বুঁদ হয়ে থাকে —সব সময়ে। 'উজবুক' কথাটা বোধ হয় ওদের দেখেই হয়েছে —হাসতে হাসতে বলতেন মহিমবাবু। যাই হোক্, তিনি এমনি ক'রে বিলেত থেকে বরাবর হেঁটেই এদেশে পৌঁছেছিলেন।

নন্দলাল, শৈলেন্দ্রনাথ শিল্প বিষয়ে কোনো শাস্ত্র বা রস-শাস্ত্র তখনও পড়েননি। মহিমবাবুর মুখ থেকেই তাঁরা আর্টের গোড়ার কথাগুলো জেনে ফেলেছিলেন। পরে, তাঁরা যখন শিল্পের ওপর বই দেখলেন, বা শিল্প আর রস-শাস্ত্রের বিষয়ে নানা আলোচনার বই পড়লেন, তখন বুঝতে পারলেন, তাঁরা শিল্প-চেতনার মূল কথাগুলো প্রায় সবই আগে জেনে ফেলেছেন। শিল্পের মর্মকথা মহিমবাবু বুঝিয়ে দিয়েছিলেন; ফলে, ওঁরা শিল্পশাস্ত্রের গূঢ় কথা সব বুঝে নিতে পারতেন তৎক্ষণাৎ। আর্টিস্ট্ না-হয়েও আর্টে তাঁর অতো দখল হলো কি ক'রে ভেবে নন্দলালেরা অবাক হ'য়ে যেতেন। তারপর থেকে তাঁদের অনেক শঙ্কা, অনেক প্রশ্ন যখন যা' মনে জাগতো, তাঁকে জানানো মাত্র সে-সবের সমাধান তিনি লিখে লিখে পাঠিয়ে দিতেন।

গুরুকরণ পছন্দ করতেন না মহিমবাবু। অধ্যাত্ম বিষয়ের গুরুগম্ভীর বিষয় সব অতি সরল ভাষায় বলে যেতেন তিনি। স্বামীজীর মতো জোরালো আর তেজোদীপ্ত অভিমত ছিল তাঁর। 'ভ্যাদভেদে' বৈষ্ণব-ভাব পছন্দ করতেন না তিনি! বৈষ্ণব-শাস্ত্র বিষয়ে কিছু বইও লেখা আছে তাঁর। বৈষ্ণব-শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল মহিমবাবুর। ইংরেজীতে ছিল বিশেষ দখল। শেক্সপীয়রের ম্যাক্‌বেথ, বা এইরকম সব ইংরেজী বই থেকে পদ সব মুখে মুখে শোনাতেন আবৃত্তি ক'রে।

অনেক তথ্য আর অনেক জ্ঞান পেয়েছেন নন্দলাল তাঁর কাছ থেকে। শিল্প, নন্দলালদের হাতে-নাতে শিখিয়েছিলেন অবনীবাবু। কিন্তু শিল্পতত্ত্ব তাঁদের প্রথম শেখা হয়েছে মহিমবাবুর কাছ থেকে। অবনীবাবু পণ্ডিত রেখে অলঙ্কার-শাস্ত্র শেখাতেন ছাত্রদের। কিন্তু, মহিমবাবুর কাছ থেকে তার হদিসগুলো নন্দলাল আগেই জেনেছিলেন। দে-দেবতার ধ্যান সব অবনীবাবু পণ্ডিত রেখে তাঁদের কাছে ব্যাখ্যা করিয়ে দিতেন। বিশ্বভারতীর কলাভবনে রাখা আছে সে-সব সংস্কৃত ধ্যানমন্ত্র আর তার সব ব্যাখ্যা। তা দেখে দেখে, তখন সেগুলো আবার ইংরেজীতে তর্জমা করেছিলেন উড্‌রোফ্‌ সাহেব। মহিমবাবু আর্ট আর অধ্যাত্ম বিষয়ে অনেক তত্ত্বের ব্যাখ্যা করতেন, জ্ঞান আর সাধনার কথা বলতেন ওঁদের কাছে। আর্ট-স্কুল আর ওরিয়েণ্টাল আর্ট সোসাইটিতে থাকার সময় সব মিলিয়ে প্রায় পাঁচ ছ'বছর নিয়মিত যাতায়াত করেছিলেন নন্দলাল, মহিমবাবুর কাছে।

বাগগুহা থেকে ফিরে এসে, সেখানকার ছবির কপি তাঁকে দেখিয়েছিলেন নন্দলাল। দু-একখানা ছবি দেখেই মহিমবাবু বললেন, —'ব্যস, বুঝতে পেরেছি, আর দেখবার দরকার নাই।' ছবি আর দেখলেন না। বললেন, —'দু-এক মাত্রা খেলেই যদি নেশা ধরে, তা' হ'লে সবটা খাবার আর দরকার কি।' শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন-কাহিনী-চর্চায় ছিল তাঁর অশেষ উৎসাহ।

অবনীবাবুর ওপর মহিমবাবুর শ্রদ্ধা ছিল অগাধ। মাঝে মাঝে নন্দলালদের জিজ্ঞাসা করতেন, —অবনীবাবু কি ক'রে শেখান, কি ক'রে বোঝান, —এই সব। একটা কথা স্পষ্ট মনে আছে নন্দলালের।—হাতীর ছবি আঁকতে হবে। অবনীবাবু নিজে চলে চলে হাতীর বিভিন্ন পোজ্‌-পস্‌চার্‌ দেখালেন। 'ঠিক হাতীর মতো চলতে লাগলেন' —বললেন

শৈলেন্দ্রনাথ॥ শৈলেন দে-য়ের এই কথা শোনা মাত্র মহিমবাবু বলে উঠলেন, —'ঠিক গুরু পেয়েছো। নিজে উপলব্ধি করলে বা অনুভূতি হ'লে কেবল শরীরটা বদলায় না; বাদ বাকী, ভাবভঙ্গী সব বদল হ'য়ে যায়; অর্থাৎ, শিল্পীর মনটা অভিন্ন হ'য়ে প'ড়ে বিষয়ের সঙ্গে। আর এইটিই হলো শিল্প-সৃষ্টির নিগূঢ় রহস্য।' পরে, শিল্পশাস্ত্র পড়ে, শিল্প-সৃষ্টির এই মূল কথাটা নন্দলাল আরো ভাল ক'রে বুঝতে পেরেছিলেন।

মহিমবাবু ধ্যান করতে শিখিয়েছিলেন নন্দলালদের। তিনি বলতেন,—'মনটাই সব। যত বস্তু দেখা যায় চোখের সামনে, আর আমাদের এই মন —এ-দুটো একই পদার্থ। মন না-থাকলে বস্তুর অস্তিত্বই থাকে না। মন থাকলে তবে বস্তু। আবার কিন্তু, বস্তু না-থাকলে মনও থাকবে না'।

একদিন বলেছিলেন —'তোমরা মনঃসংযোগ কর। এই যেমন ধরো, —এই ঘরের ভেতরে তিনটে জিনিস আছে —গড়গড়া, গাড়ু আর গামছা। এখন এই বস্তু ক'টার মধ্যে, একটা একটা ক'রে বস্তুর আদল মন থেকে বার করে দাও দিকি। ধরো, গড়গড়াটা বার করে দিলে; রইল গাড়ু আর গামছা। গামছাটা বার করে দিলে; রইল কেবল গাড়ু। শেষকালে, গাড়ুটাও বার করে দিলে; তখন আর ঐ তিনটে বস্তুর অনুভূতি কেমন করে হবে? তখন অনুভূতি আর থাকবে না ও-গুলোর। অর্থাৎ, বস্তু না-থাকলে, মন থাকে না। আবার, মন না-থাকলে বস্তুও থাকে না। তবে অবশ্য, ধ্যানের এটাই চরম কথা নয়; এ হচ্ছে ধ্যানের গোড়া-পত্তনের (base) কথা। চিন্তা আরম্ভ হবে এর ওপর থেকে। তার পরে, আর্টের কাজ চলতে থাকবে আপনা-আপনিই, —এর নাম হ'লো বোরিং (boring) করা, অর্থাৎ মনকে অনন্ত সত্তার মূল উৎসে লাগিয়ে দেওয়া'।

মহিমবাবুর ওখানে খাওয়া-দাওয়া, ছোট-খাটো ফীস্টি ওঁদের হ'তো প্রায়ই। নন্দলাল মাংস রাঁধতে পারতেন খুব ভালো ক'রে; ক'দিন রেঁধেও ছিলেন। হিং দিয়ে রান্না মাংস মহিমবাবু খুব পছন্দ করতেন। মাংসের 'হাঁড়ি-কাবাব' রাঁধতেন নন্দলাল, —সেটা তিনি শিখে নিয়েছিলেন তাঁর বাবার চাকর —হরিয়ার কাছ থেকে। বাজার থেকে হিং-এর কচুরি-টচুরি কিনে আনা হতো। মাঝে মাঝে খিচুড়িও রাঁধা হতো। বাইরে থেকে যেখানে যা ভালো খাবার পাওয়া যেতো, কিনে নিয়ে আসতেন

ওঁরা। কিন্তু, মহিমবাবু ফল-টল খেতে পছন্দ করতেন না।

তাঁর ওখানে গেলে, তিনি ওঁদের পিতার মতো স্নেহ করতেন, আর বন্ধুর মতো মিশতেন। তাঁর মুটে মজুরদের সঙ্গেও রাস্তার মোড়ে বসে বসে নন্দলাল নানা গল্প জমাতেন —খোলা মনে। বাইরের চাকচিক্য না-থাকলে সাধারণ লোকে সহজে চিনতে পারে না। নন্দলালের চেহারায় জৌলুস ছিল না; নিজের পোশাকে-আশাকেও কোনও ভড়ং দেখাননি তিনি কোনও দিন। সেই জন্যে রাস্তার কুলীরাও দিল খুলে কথা কইতো সহজ মানুষ নন্দলালের সঙ্গে, সুখ-দুঃখের ঘরোয়া নানা কথা সহজভাবেই। মহিমবাবুকে তারা 'সাধুবাবা' বলেই মনে করতো।

মহিমবাবুর বিখ্যাত বই Dissertation on Painting—নন্দলালদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা অবলম্বন করেই লেখা।

এই গ্রন্থখানি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২২ সালে; দ্বিতীয় সংস্করণ হয়েছে ১৯৮০ সালের ১৩ই অগাস্ট। বইটি উৎসর্গিত 'রামকৃষ্ণ-মিশনের' প্রথম প্রেসিডেন্ট স্বর্গত স্বামী ব্রহ্মানন্দের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে। ২২৫ পৃষ্ঠার এই বইখানির Contents-এ এগারোটি অধ্যায়: What is painting, Pose, Colour, Cadence, Back-Ground, Tone, Statue, Different origins of statues, Different classes of Painting, Vehicle, The tendency of Future Paintng.

গ্রন্থ-'পরিচয়ে' ১৯২১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর অবনীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: 'আজকাল আমাদের দেশে শিল্পচর্চার উৎসাহ সবার মধ্যেই দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ভারতশিল্প সম্বন্ধে গ্রন্থাদির অভাব এত বেশি যে ভারতবাসী হয়েও নিজেদের শিল্পকে জানতে হলে বিদেশের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় নাই। আজকাল এদেশের দু-চারজন যাঁরা ভারত-শিল্প সম্বন্ধে লিখছেন প্রায়ই তাঁরা প্রত্ন তত্ত্বের রাস্তা ধরেই জিনিসটি বুঝতে ও বোঝাতে চলেছেন, কিন্তু কেবল ঐ এক রাস্তায় গেলে তো কোন শিল্পকে কোনোদিন পরিপূর্ণরূপে বোঝা কিম্বা বোঝানো যাবে না। শিল্পের কয়টা প্রধান জিনিস রস এবং প্রয়োগ বিনা শিল্প-সাধনরহস্য সমস্তই বাদ পড়ে যায় শুধু নিরস প্রত্নতত্ত্বালোচনার পথ ধরে গেলে। এইজন্য আমার বন্ধুপ্রবর শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দত্ত এবং আমার পরম স্নেহাস্পদ শিল্পী শ্রীমান নন্দলাল বসু ও শ্রীমান

শৈলেন্দ্রনাথ দে এঁরা তিনজনে মিলিত হয়ে বহুদিন ধরে শিল্প সম্বন্ধে যে সব আলোচনা ও গবেষণা করেছেন, গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দত্ত এই পুস্তকে সেই সমস্ত চিন্তা ও তর্ক বিতর্ক একত্র করে আমাদের ও বিদেশের শিল্পার্থিগণকে অর্পণ করেছেন। গ্রন্থকার বহুদিন ধরে সারা পৃথিবী পর্য্যটন, নানাদেশের শিল্প-সভ্যতা ইত্যাদির প্রাচীন ও আধুনিক হালচাল লক্ষ্য করে এবং স্বয়ং নিজের সাধন বলে শিল্প সম্বন্ধে ভূয়োদর্শন লাভ করেছেন, সুতরাং এই পুস্তক সর্ব্বজনে সর্ব্বদেশে আদর পাবে জেনেই আমি বৃথা একটা নিষ্প্রয়োজন ভূমিকা লিখতে অগ্রসর হলেম না।

আমার একান্ত কামনা এরি মতো আরো অনেক অনেক গ্রন্থ নিজের শিল্প সম্বন্ধে আমরা নিজেরাই লিখে চলি।'

১৯৬০ সালে বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণের সময় শ্রীনন্দলাল শান্তিনিকেতন থেকে ২৯-এ জুলাই লিখেছিলেন: 'পুণ্যদর্শন মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় Dessertation on Painting গ্রন্থে যা লিখেছেন তা আমার ও শৈলেন্দ্রনাথ দে মহাশয়ের সঙ্গে যখন শিল্পালোচনা করতেন সেই সময়কার লেখা। গ্রন্থের লেখা সবই পুণ্যদর্শন মহেন্দ্রনাথের। এইরূপ শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা খুব কমই হয়েছে। ইহাতে খুব গভীর চিন্তাপূর্ণ লেখা আছে। ভারতবর্ষে শিল্প বিষয়ে এরূপ গ্রন্থ বিরল। ইহা পাঠ করিলে শিল্প সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে।'

মহিমবাবুর আলোচনা করার পদ্ধতিটা ছিল বেশ অদ্ভুত ধরনের। তিনি আগে নন্দলালদের বিদ্যের বহর জানার চেষ্টা করতেন। তিনি ওঁদের বলতেন, —'আর্ট-সম্পর্কে তোমরা যে যা জানো আগে বল'। —এ-কথায় স্বভাবতঃই অর্বাচীন এঁরা খুবই সঙ্কোচ বোধ করতেন। এঁদের মনের ভাব জানতে পেরে তিনি বলতেন, —'কিছু না, এলোমেলো যা মনে আসে, বলে যাও'। সাহস পেয়ে এঁরা বলে যেতেন —বে-পরোয়া। কথার খেইও হারাতো মাঝে মাঝে; এ-রকম ঘটলে, মহিমবাবুই আবার ভাবের খেইটা ধরিয়ে দিতেন। এমনি করে চলেছিল অনেক দিন। পরে, তাঁর এই বইখানা যখন লেখা শেষ হলো, একদিন বললেন, —'এই বইখানা তোমাদের কথা শুনেই লেখা'। নন্দলাল বললেন, —'আসলে ভাবতেন তিনিই, আর তাঁর চিন্তাগুলো বের করে নিতেন আমাদের মুখ

দিয়ে। আর বলতেন, —'মানুষের অজানা কিছুই নাই ; গভীরভাবে চিন্তা করতে থাকলেই জানার কথা সব জেগে উঠবে পর্দা ছিঁড়ে ছিঁড়ে ; মানুষই তো সবজান্তা ; অজ্ঞতা হচ্ছে ভ্রম মাত্র'।

একদিন কথা হলো, —ভালো ছবি কোন্‌টাকে বলা হবে। নন্দলাল বললেন, —'ভালো ছবি সিন্‌সীয়ার্‌ হবে ; তাতে ভাবনা প্রকাশ হবে ঠিক ঠিক ; তবে, ছবিতে ভাবনা ঠিক মতো প্রকাশ হওয়াটাই অবশ্য শেষ কথা নয়'। নন্দলালের এই কথা শুনে, মহিমবাবু বলেছিলেন, —'ঠিক বলেছ, কেবল সিন্‌সীয়ার্‌ হলেই ভালো ছবি হলো না ; ভালো ছবি সেক্রেড্‌ বা পবিত্র হওয়া চাই। তিনি আরও বললেন. —'শুধু সৌন্দর্য সিন্‌সীয়ার্‌ হতে পারে ; কিন্তু, আর্টে সেটা চরম কথা নয়। অর্থাৎ সিন্‌সীয়ারিটি শিল্প-কর্মের শেষ-কথা নয় ; সেক্রেড্‌ হলে, তবে তাতে শিল্পীর মনের উৎকর্ষ প্রকাশ পাবে ; আর সে-ছবি দেখে দর্শকেরও লাভ হবে তো বটেই। আর দেখ. শিল্পীর শিল্পকর্ম মৌলিক হওয়া চাই। মৌলিক মানে হলো, আগে যা' জানা ছিল না ; পরে যা' জানা গেল। নতুন ব'লে, পরে যা জানা যায় সেই হলো মৌলিক। তবে. সিন্‌সীয়ারিটি হচ্ছে বড়ো আর্টের একটা বিশেষ লক্ষণ ; আর সৌন্দর্যের লক্ষণ হলো পবিত্রতা। পবিত্রতার লক্ষণ শিল্পে ফুটে উঠলে, তখনই সেটা হবে উঁচু-দরের আর্ট। পবিত্র হলেই, চরম সৌন্দর্যের প্রকাশ হবে। পবিত্রতায় মনের প্রফুল্লতা, শান্তি, সমতা, নির্ভরতা, বিশ্বাস —এই সব আসবে। —তা' না হ'লে আর্ট হলো না। আর এই রকম হলেই, লিরিক্‌ আর্ট থেকে হবে এপিক্‌ আর্ট। স্তবগানটাই হয়ে উঠতে থাকবে মহাকাব্য।

আর্টিস্ট্‌ যা-তা বিষয় নিয়ে ছবি করতে পারে ; কিন্তু শিল্পীর মন উঁচু-পর্দায় বাঁধা থাকলে, তবেই সে-ছবি উত্তীর্ণ হবে ; আর আর্টের ভাব তাতে ঠিক ঠিক প্রকাশ হবে। ভাব প্রকাশ হবে, অর্থাৎ আর্টের চরম কথা তাতে থাকবে। সেইজন্যে বিষয়বস্তুর তারতম্য শিল্প-রচনার ক্ষেত্রে ধর্তব্যের মধ্যে নয় ; সে তারতম্যে বরং কিছুই এসে যায় না। এই কারণেই অ্যাব্‌স্ট্রাক্ট্‌-এর সাধনার মধ্যে চিত্তশুদ্ধির এতো প্রয়োজন।

আর্টিস্টের মন তিন ভাগে বিভক্ত। আর্ট বলতে —দৃশ্য, দ্রষ্টা আর

সৃষ্টি বোঝায়। আর্টিস্ট্ দ্রষ্টা, —দৃশ্যের সঙ্গে অভিন্ন, আর সৃষ্টি হচ্ছে —দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সমন্বয়। আসল কথাটা এই, —দৃশ্য, দ্রষ্টা আর সৃষ্টি —একাধারে শিল্পীই তিন। শিল্পী বিষয়ের রূপ আর ভাবের সঙ্গে এক হয়ে নিজেকে দেখে একবার। তারপর, নিজেকে আলাদা করে, অর্থাৎ ঐ বিষয় থেকে আলাদা ক'রে, বিষয়কে দেখে একবার। তারপরে, বিষয় থেকে নিজে বিচ্ছিন্ন হয়ে, নিজেরই ভাবটাকে দেখতে থাকে। শিল্পী যখন সৃষ্টি করে, তখন এ-সব অবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই করে। কেন-না, সৃষ্টি করবার সময়ে, বিষয়ের রূপ ও ভাবকে স্থির হয়ে ধরতে হয়। তখন কিন্তু বিষয়ের রূপের খুঁটিনাটি আর ভাবের আবেগ শিল্পীর মনকে চঞ্চল করতে পারে না। বিষয় ও শিল্পীর অস্তিত্ব এক হয়ে যায়।' —শিল্প সম্পর্কে এই রকম সব মৌলিক তত্ত্ব আলোচনা ক'রে, মহিমবাবু নন্দলালের মনকে গড়ে দিয়েছিলেন, —মনের আর শিল্পের ফিলসপি বুঝিয়ে। —মহিমবাবুর সঙ্গে নন্দলালের যোগাযোগ ছিল বরাবর —সে ১৯৫৬ সালে মহিমবাবুর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত।

১৯১৩ সালের ৩রা এপ্রিল নন্দলালেরা তমলুকে 'বর্গভীমার' মন্দির দেখতে গিয়েছিলেন মহিমবাবুর সঙ্গে। বর্গভীমার দেবী-মূর্তি। মূর্তিটি মন্দিরের এক কোনাতে আছে। এতে ও'রা মনে করেন, মন্দিরটি পরে তৈরী করা হয়েছিল। বর্গভীমার ভোগে রোজ শোল-মাছ দিতে হয়। শোল-মাছ নিত্যভোগে লাগে বলে, একটি পুকুরে অনেক মাছ জীয়ানো ছিল। মন্দিরটি রূপনারায়ণের ধারে। এই ভ্রমণের বিবরণ লেখা খাতা আছে, নানা স্কেচ্ আছে —কাঁচা-হাতের করা, শৈলেন দে বা আর-কেউ বোধ হয় কিছু কিছু স্কেচ্ করেছিলেন।

'পুণ্যদর্শন' মহিমবাবুর সম্পর্কে এই রচনাটি স্বয়ং মহিমবাবু দেখতে চেয়েছিলেন। তাঁকে দেখাতে পাঠানো হয়েছিল। ১৯৫৬ সালের ২৫-এ জানুয়ারী অনুগ্রহ ক'রে ও'রা জানিয়েছিলেন, —'লেখাটি পড়ে উনি খুশী হয়েছেন। আমাদেরও বেশ ভালো লেগেছে। লেখাটী philosophical হয়েছে। অল্প কথায় অনেক ভাব প্রকাশিত হয়েছে'।—১৯৫৬ সালের ১৫ই অক্টোবর তারিখে স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা জ্ঞানতপস্বী পুণ্যদর্শন শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্তের পরলোক হয়েছে। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল অষ্টআশী।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ ॥ গিরিশচন্দ্রকে দেখতে গিয়েছিলেন নন্দলাল প্রিয়নাথ সিংহের সঙ্গে তাঁর বাগবাজারের বাড়িতে। তাঁর সঙ্গে অনেক কথা হয়েছিল নন্দলালের। তখন গিরিশবাবুর বয়স ষাট ছাড়িয়ে গেছে। নন্দলাল তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, —'আর্ট কি'। গিরিশবাবু বলেছিলেন, —'বিষয়বস্তুর সঙ্গে এক হয়ে, তাকে প্রকাশ করা। সাহিত্যে আমি যা করেছি, সেও তো আর্ট। সে হলো সাহিত্যের শিল্প-কর্ম। যেমন ধরো, তুমি যদি বেড়াল আঁকতে চাও, তোমাকে একেবারে বেড়ালের মতো হ'য়ে যেতে হবে'। উদাহরণ দিয়ে বললেন, —'আমার একবার সখ হলো —বেড়াল হবার। সত্যিই তখন বেড়ালের মতোই সাজতাম ; খাটের তলায় ঢুকে 'মিউ' 'মিউ' করতাম। সমস্ত ব্যবহার করতাম ঠিক বেড়ালের মতন। আর দেখ, আশ্চর্য, দিন কতক পরে, বুঝতে পারলাম, যেন সত্যিই আমি বেড়াল হয়ে গেছি। এই অনুভূতি যদি তুমি আর্টে ফোটাতে পারো, তা' হলে সেই সব হবে সত্যিকারের শিল্পকর্ম। নন্দলাল বললেন, —'আর দেখ, অদ্ভুত ব্যাপার ঃ আমি চীনে বই-এ অনেক পরে দেখলুম, সত্যিই এই রকম কথা লেখা রয়েছে'। ১৯১২ সালে গিরিশবাবুর দেহান্ত হয়।

নিজের কথা বলতে শিল্পী নন্দলালের সঙ্কোচবোধ হয় খুব। কিন্তু, তাঁর মনের গভীরে ডুব দিয়ে দিয়ে রত্ন তোলার লোভ আমাদের প্রচণ্ড। ফলতঃ, যা উদ্ধার করা গেল ঃ—

আর্টস্কুলে থাকতে একবার বাঁশবেড়েতে হংসেশ্বরী-মন্দিরের আর বাসুদেব-মন্দিরের টেরাকটা দেখতে গিয়েছিলেন নন্দলাল। ঠাকুরের মুখের গড়ন দেখে ভারী ভালো লেগেছিল তাঁর। ঠাকুর বাসুদেবের মুখের কাস্ট্ (cast) নেবেন, বলতে, পুরুতেরা তেড়ে এলেন। কিন্তু, তিনি ছাড়েননি। ঠাকুরকে প্রণাম করে —ছাঁচ তুলেছিলেন।

'তারপর জানো,' —বললেন শিল্পাচার্য —'ওখানে রাত্রে ঘুমের ঘোরে একটা ভিশ্‌ন্ (vision) দেখলুম। ঠিক কি রকম মনে নাই। স্বপ্নে ঠাকুর যেন আমাকে বলছেন, —'আমি তোমাতে থাকবো'। আমি বলি, —'আমি একটা ভাঙ্গা মন্দিরের মতো, আমাতে আপনার স্থান কি করে হবে'। ঠাকুর বললেন, —'তা হোক্, ভাঙ্গা মন্দিরেই আমার স্থান'। জানিনে, এ কি ক'রে সম্ভব হ'ল। এখনও রোমাঞ্চ হয় এই ঘটনা স্মরণ

করলে।’

বাণীপুরের বসুবংশ পুরুষপরম্পরায় বৈষ্ণব। কুলদেবতা ওঁদের —বিষ্ণু] তবে, নন্দলাল রামকৃষ্ণ-মিশনে গেছেন, তাতে কুলদেবতার অমান্য কিছু হয় না। ‘পরমহংসদেব আলাদা তো কিছু বলতেন না। মনের গড়ন অনুযায়ী সবই সত্য; যার যা’ বিশ্বাস, এগুলো ধাপমাত্র। কতো-যে বিভিন্ন মতের সমন্বয় হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণে’।

স্বামী বিবেকানন্দকে দেখতে পারতেন নন্দলাল, কলেজিয়েট্ স্কুলে পড়বার সময়ে; কিন্তু দেখা হয়নি। তখন তাঁর নামই জানতেন মাত্র। আনাগোনা করতেন ব্রাহ্ম-সমাজে। মহেন্দ্রচন্দ্র হোমরায় ছিলেন নন্দলালদের গৃহশিক্ষক। গান করতেন তিনি ব্রাহ্ম-সমাজে। সমাজের সঙ্গে মহেন্দ্রবাবুর যোগাযোগে, নন্দলালও ওখানে যাবার আকর্ষণ অনুভব করতেন। গিয়েছিলেন কয়েকবার। বেশী যাননি। দু-একবার মাত্র।

মহেন্দ্রবাবুর বাড়ি ছিল ময়মনসিংহ জেলার সহিলা গ্রামে। ১৯০৫ সালের আগে নন্দলাল কলেজিয়েট্ স্কুলে পড়বার সময়ে তিনি তাঁকে পড়াতেন। পড়াশুনা করতে কলকাতায় এসে থাকতেন তিনি অমল হোমের পিতা, তাঁর দাদা গগনচন্দ্র হোম মহাশয়ের বাড়িতে। তিনি ময়মনসিংহের স্বদেশী-আন্দোলনের সঙ্গে যোগযুক্ত ছিলেন। মহেন্দ্রবাবু নন্দলালের গৃহশিক্ষক ছিলেন, এ-কথা বরাবরই গর্বের সঙ্গে বলতেন; তিনি পড়াতেন সব বিষয়ই। নন্দলালের জেঠতুতো দাদা কেশবলালের সঙ্গে তাঁর দোস্তালি ছিল —সম্ভবতঃ কুস্তির সূত্রে। কেশবলালের ছাপরার বাড়িতেও মহেন্দ্রবাবুর আনাগোনা ছিল। মহেন্দ্রবাবুর মনটা ছিল সঙ্গীতরসে ভরপুর। বাছাবাছা ব্রাহ্মসঙ্গীত, রবীন্দ্রসঙ্গীত আর দাশরথি রায়ের ‘তোরা ফিরে যা ভাই তিনু রে’ গানের কথাগুলি প্রায়ই শোনা যেত তাঁর মুখে মুখে। মহেন্দ্রবাবু মাঝে মাঝে পুত্র শ্রীসুধেন্দুরঞ্জন ও শ্রীনীহাররঞ্জনকে নিয়ে যেতেন ব্রাহ্মসমাজে, কিন্তু ওঁরা নিজেরা ব্রাহ্ম ছিলেন না। মহেন্দ্রবাবু ১৮৭২ সালে জন্মগ্রহণ করেন; মারা যান ১৯৬২ সালে। সর্ববিধ সৎকাজে উৎসাহ, সততা ও স্বাধীনচিত্ততার জন্যে ময়মনসিংহের সকল শ্রেণীর লোকের কাছে তাঁর সমাদর ও প্রতিষ্ঠা ছিল। শান্তিনিকেতনে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীসুধেন্দুরঞ্জন রায় মহাশয়ের বাড়িতে দু’তিন বার তিনি এসেছেন। ঐ সময়ে আচার্য নন্দলালের সঙ্গে প্রায়ই দেখা করতে যেতেন।

—সেকালের দুই গুরুশিষ্য-সংবাদের সে-বৈঠক তখন বেশ জমে উঠতো।

'শিবনাথ শাস্ত্রীকে দেখি ট্রামে। চুপ ক'রে বসে আছেন। টিকিট কণ্ডাক্টর্ পয়সা চাইলো। তাড়াতাড়ি পকেট হাতড়ে দেখলেন, পয়সা নাই। কণ্ডাক্টর্ পয়সা নিলে না। বললে, —'উনি মশাই ঐ রকমই, ভোলা মন। থাকে না কাছে পয়সা-টয়সা'।

কথায় কথায় নন্দলালকে জিজ্ঞাসা করলুম একদিন, —'শুনেছি, আপনি হাজার বার, না কতবার জপ করেন ভোরে উঠে'। তিনি বললেন, —'না, না, ওসব কিছু নয়। তবে কি জানো, মনটাকে স্থির করা, একটু চিন্তা করা, একে যদি জপ বলো তো আপত্তি নাই। জপ' মানে —সায়েন্টিফিক্-ভাবে চিন্তা। তার যে নামই দাও'।

'আপনার গুরু কে'। তিনি বললেন, —'দেশে আমি দীক্ষা নিয়েছিলুম কুলগুরুর কাছে, উনিশ-কুড়ি বছর বয়সে। মিশনে মন্ত্র নিয়েছি কিনা, বা কি মন্ত্র নিয়েছি, সে-কথা বলতে নাই। মন্ত্রগুপ্তিতে মনে একটা জোর থাকে। তবে জেনে রেখো, মিশনে আমার মন্ত্র-পাওয়া সেও একটা ভিশন্ (vision) দেখার মতো। ঠাকুরকে স্বপ্নে দেখলুম। ঠাকুর কিছু বলে আশীর্বাদ করলেন। তাতেই মন্ত্র পাওয়ার কাজ হলো। ঠাকুর খালি আমার বাঁ কাঁধটা হাত দিয়ে ছুঁয়ে দিলেন। তাতে, আমার মনে যে-ভয়টা ছিল সেটা চলে গেল'।

'আর কতো স্বপন-যে দেখতুম তখন। এখন মনে হয়, সে-সব স্বপনের যেন একটা ক'রে মানে পাওয়া যায় খুঁজলে। তখন কিছুই বুঝতে পারতুম না। একবার দেখলুম, —'একটা দোতলা ঘরের নিচে দাওয়ায় আমি বসে আছি। পাশে একটা কাঠের সিঁড়ি। একটা কুকুর আমার পাশে বসে।

কুকুরের স্বপন কলকাতায় দেখতুম খুব। কুকুর আনাগোনা করছে, সিঁড়ির নিচে বসে আছে। সাদা কুকুর —মুখ-থ্যাবড়া। একটা কুকুরকে ধরে আমি যেন তার হাঁড়ি-মুখটা চিরে দিয়েছি। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে চাইছিল সে। আমিও যে ওপরে যেতে চাই। কুকুরটা কামড়ালো আমাকে। আমি ঠাকুরের নাম করছি। ঠাকুর হাত দিলেন আমার গায়ে। আমি বলি, —'কুকুরটার মুখ চিরে দিয়েছি, তবুও কামড়াতে আসে, কি করবো'। 'নাম স্মরণ করতে করতে ওঠো', —শুনে, খুব ভরসা পেয়ে

গেলুম মনে।

ঠাকুরের নাম করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে উঠছি। দেখি না, কালো গনগনে বিরাট একটা কেঁউটে সাপ রয়েছে সিঁড়িতে। সাপটা তেড়ে এলো। ঠাকুরের নাম করতে করতে, সাপটা আর দেখা গেল না। নামে সাপ পালালো।—যখনই একমনে উদ্যোগ ক'রে কিছু ভালো কাজ করতে গেছি, সাপ আর কুকুর দেখতুম সব সময় তখন স্বপনে। আর ওঁকে স্মরণ করলেই সব ভালো হয়ে যেতো। সে-সব স্বপনের আমি স্কেচ্ করেছিলুম মন থেকে ; কোথায় আছে জানিনা।' ওঁর প্রত্যক্ষ বর্ণনা শুনে, আঁকতে বলা মাত্র, নন্দলাল ১৯৬৫ সালের ১৬ই মার্চ সকালবেলায় পুনরায় ক'রে দিলেন সেই স্কেচ্।

পণ্ডিতেরা বলেন, —মিস্টিসিজম হচ্ছে ঈশ্বরানুভূতির একটা দশা মাত্র। এই অবস্থাটা আবার মূলতঃ আত্মবোধেরই ক্রমবিকাশ। এই বিকশিত স্তরগুলোকে জ্ঞানযোগে শুদ্ধ করে নিতে হয় ; চেতনার গভীরে এগুলোকে ডুবিয়ে দিতে হয়। আমাদের শিল্প, কাব্য, দর্শন, বিজ্ঞান —সবই যেন এই রহস্যকেই প্রকাশ করতে চাচ্ছে।

নন্দলাল বললেন, —'দেবস্বপ্ন মিথ্যে নয়, মিস্টিক্। মডার্নরা ভারত-ধর্মের আত্মার অমরত্ব, জন্মান্তরবাদ —এ-সব মানতে চায় না ; কিন্তু, আমার তা মানতেই হবে। পরমহংসদেবের সম্পর্কে যত স্বপ্ন দেখেছি —অতি সত্য হয়েছে সে-সব স্বপ্ন আমার জীবনে। আত্মচিন্তা করতে করতে সে-সব সম্ভব হয়েছে। বার পাঁচ-ছয় দেখেছি তাঁকে স্বপ্নে। তখন দর্শন হতো তিন চার বছর অন্তর অন্তর। দর্শন হতো, নির্দেশ পেতুম। এখন আর হয় না। শ্রীমাকে চোখে দেখেছি। আমার দেহে মনে কোনও পাপ থাকলে স্খলন হয়ে গেছে। শ্রীমাকে স্বপ্নে দেখিনি কখনও। আর ভাব ছেড়ে, এখন হয়েছে শরীরগত প্রাণ, আর কাকেও দেখি না'। —এ হল তাঁর তিরাশী বছর বয়সের অভিজ্ঞতার কথা।

ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার মহাশয় তখন পাটনা কলেজের অধ্যাপক। তিনি খুদাবক্স খাঁ বাহাদুরের লাইব্রেরী সম্বন্ধে দুটি অদ্ভুত দেব-স্বপ্নের কাহিনী লিখে রেখে গেছেন। স্বপ্ন হলো, পুরাতন পুঁথি-সংগ্রহ সম্পর্কে। খুদাবক্স সাহেব স্বপ্নে দেখেছিলেন মহাপুরুষ —মুহম্মদ আর তাঁর সঙ্গী

—আস্‌হাবগণকে। লক্ষ্ণৌয়ের ইমামবাড়ার মতো একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকায় ব'সে, স্বয়ং মুহম্মদ সঙ্গীদের বলেছিলেন, খুদাবক্সকে পুরাতন পুঁথি দেবার জন্যে। আর আশ্চর্যের ব্যাপার, এই স্বপ্ন দেখার পর থেকেই খুদাবক্সের লাইব্রেরীতে নানা দিক থেকে হস্তলিপি এসে জুটতে লাগলো। দ্বিতীয় স্বপ্নে, তিনি দেখেছিলেন, ঈশ্বরের প্রেরিতপুরুষ তাঁর লাইব্রেরীতে এসে, দু'খানি 'হদীসের' হস্তলিপি পাঠ ক'রে গেছেন। এই পুঁথি দু-খানি কখনও তাঁর লাইব্রেরীর বাইরে ইশ্যু করা হবে না ব'লে, খুদাবক্সের নির্দেশ আছে। প্রাচ্য-চিত্রবিদ্যার আদর্শ ওখানে এতো সংগ্রহ হয়েছিল যে, সে-সব দেখে, হ্যাভেল সাহেব মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

অতি-প্রাকৃতে বিশ্বাসের ওপরেই জগতে আজও বড়ো বড়ো ধর্মমত দাঁড়িয়ে আছে। অতি-প্রাকৃতে বিশ্বাসটাই মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক; অবিশ্বাসটা উপার্জন করতে হয়। জাগ্রতের পক্ষে তদানীং অনুভূত জগৎ যেমন সত্য, সুপ্তের পক্ষে স্বপ্নদৃষ্ট জগৎ তেমনই সত্য। —এসব হলো মনীষীদের কথা। 'তবে কি জানো, মনের শক্তি, ভাবগত গড়ন আর অনুকূল-প্রতিকূল অবস্থার ওপর এসব নির্ভর করে' —বললেন নন্দলাল।

শ্রীমায়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন নন্দলাল বাগবাজারের মঠে। কিন্তু, দেখা হয়নি। শরৎ মহারাজকে বলতে, 'মায়ের বাড়ির' ওপর তলায় নিয়ে গেলেন ওঁকে গণেন মহারাজ। নন্দলালের বয়স তখন চব্বিশ-পঁচিশ হবে। শ্রীমাকে নন্দলাল প্রণাম করলেন। শ্রীমা সর্বাঙ্গে কাপড়-মুড়ে জড়সড় হ'য়ে ঘোমটা টেনে বসেছিলেন। পা-দুখানি রেখেছিলেন বের করে। পরপুরুষের কাছে তাঁর ছিল এই রকম সঙ্কোচ। নন্দলাল শ্রীমায়ের মুখ দেখতে পেলেন না; কেবল পায়ে প্রণাম ক'রে চলে এলেন। 'মায়ের মুখ দেখতে পেলে বোধহয় আপনি স্কেচ্ করতেন'? 'নিশ্চয়', —তৎক্ষণাৎ বললেন নন্দলাল বেশ একটু জোর দিয়েই —১৯৬৫ সালের ২৪-এ ফেব্রুয়ারী সকাল বেলার বৈঠকে।

নন্দলালের স্ত্রীও গিয়েছিলেন শ্রীমায়ের কাছে একবার। সে বোধ হয় ১৯১৫-১৬ সালের কথা। 'বউদি'কে নিয়ে গেছলেন ননদ সুধীরা বসু, নিবেদিতা-বালিকা-বিদ্যালয়ের গাড়ীতে ক'রে। সেদিন ছিল সরস্বতীপূজা। স্কুলে প্রসাদ পেয়ে, মেয়েদের দল নিয়ে চপলা, মীরা, প্রফুল্ল, সরলা সবাই

গিয়েছিলেন। উদ্বোধন-মঠে শ্রীমা ঠাকুরের দিকে পা মেলে বসে মালা জপ করছিলেন তখন। সুধীরাকে জিজ্ঞাসা করলেন, —'বউটি কে গা ?' সুধীরা বললেন. —'নন্দলালের স্ত্রী'। উনি প্রণাম করলেন। 'প্রণাম ক'রে উঠতেই শ্রীমা আমার মাথায় জপের মালাটা ঠেকিয়ে দিলেন। আর মালাটা মাথায় ঠেকাতেই আমার সারা গায়ে কেমন যেন একটা শক্ (shock) লাগলো।' —বললেন নন্দলালের স্ত্রী শ্রীমতী সুধীরা দেবী।

শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্বিকল্প-সমাধি হচ্ছিল না। বারে বারে মা-কালীর রূপ মনে আসছিল। তখন তোতাপুরী কাঁচের টুকরো দিয়ে ঠাকুরের কপাল ফুটিয়ে দিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে নির্বিকল্প-সমাধি হলো। আজ্ঞাচক্র ছেড়ে মন উঠে গেল। এর পরে. একদিনে চেতনা হয়। কিন্তু, ঠাকুর তিন দিন জড়বৎ অচেতন থাকলেন। দেখে তো সবাই অবাক। তোতা বললেন, —ঐসা কভী নহী হোতা। মেরী জড়-সমাধি তো একদিন মেঁ হী টুটী থী। ইনকী সমাধি তীন দিনোঁ মেঁ ভী নহীঁ টুটী! বড়ে অচরজ কী বাত। যহ 'দৈবীমায়া' হৈ। —এই ঘটনায় ঠাকুর মারা যেতে পারেন ব'লে, মাঝে মাঝে গিয়ে তাঁকে দেখে আসতেন তোতাপুরী। অবশেষে, তোতা গিয়ে ঠাকুরের ধ্যান ভাঙ্গালেন নানারকম প্রক্রিয়া ক'রে। —এই সময়ের পরেও ন্যাংটা সাধু তোতাপুরী অনেক দিন ছিলেন দক্ষিণেশ্বরে।

নন্দলালের স্কেচ্‌বুকে (সংখ্যা ৭) দেখছি, তিনি স্কেচ্ করছেন —দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটী। পঞ্চবটী —ঠাকুর যেখানে বসে ধ্যান করতেন। —কুটীর —ঠাকুরের অদ্বৈত-সাধনার স্থান ; যেখানে তোতাপুরী বললেন, —তিন দিনে জড়-সমাধি ভাঙ্গতে হবে ; কপাল-ফুটনোর প্রক্রিয়া করা হয়েছিল জড়-সমাধি হবার জন্যে ; আর চেতনা ফেরাবার জন্যে —ঘি-মালিশ ইত্যাদি করা হয়েছিল। এতেই ঠাকুরের সমাধি ভাঙ্গলো। —এসব স্কেচ্ ওখানে একবার বেড়াতে গিয়ে প্রথম খসড়ায় এবং অনেক পরে —পূর্ণ-আকারে ১৯২১ সালের দিকে এঁকেছেন নন্দলাল।

শরৎ মহারাজ প্রসঙ্গে ॥ ইনি সারদানন্দ। আলাপ করিয়ে দিলেন গণেন মহারাজ। নন্দলাল তাঁকে দু'টি প্রশ্ন করেছিলেন, —'চেরী ফুল হ'তে চেয়েছে একজন চীনে শিল্পী' আর 'পার্থসারথির' মর্মকথা। চেরী ফুলের কথায় মহারাজ বললেন, —'আশ্চর্য তো ; ভেবে বলছি'। 'ওঁরা



শ্রীশ্রীঠাকুরের পঞ্চবটী - নন্দলাল

সব কথাই শ্রীশ্রীঠাকুরের কথার সঙ্গে মিলিয়ে, প'ড়ে, তবে বলতেন'।

এক থেমে স্বামীজী বললেন, —'মানুষের চেয়ে বড়ো আর সত্য কিছুই নাই। মানুষ চেরীফুল হতে চেয়েছে —চেরীফুল ভালোবাসে বলে। চেরীফুল তো কখনও মানুষ হ'তে চায় না। এই-যে জাগ্রত ঐক্যবোধ, এই তো আর্টের গোড়ার কথা।'

নন্দলাল তখন 'পার্থসারথি' আঁকছেন। সেই প্রসঙ্গে ছবি দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, —'আমি তো এই-সব আঁকছি, কিন্তু মানে তো কিছুই বুঝি না। আমাকে বলুন'। তিনি বললেন, —'মানুষের জীবনটা একটা চাকার মতো। যতক্ষণ বেগ, ততক্ষণ গড়াবে। সে-বেগ কমে গেলেই চাকা থামবে। তারপরে, আবার ঠেলে দিলে, আবার গড়াতে থাকবে। তেমনি, তোমার প্রাক্তন তো তোমাকেই ভোগ করতে হবে। আর, এই প্রাক্তনের বেগ আমরাই সৃষ্টি করছি বারে বারে —প্রতি জন্মে। যাতে, নতুন বেগ নিজে যোগ না-করি, সেইজন্যে সব সমর্পণ করতে হবে শ্রীকৃষ্ণে। তবেই কর্ম হবে অকর্ম। যেহেতু, অর্জুন প্রতিজ্ঞা করেছে যুদ্ধ করবে, তাকে সেই সব যুদ্ধ করতেই হবে। কিন্তু তাঁর সারথিকে এর ফলাফল সমস্ত সমর্পণ ক'রে দিতে হবে। সেইরকম প্রাক্তনের নিয়মে কাজ করে যেতে হবে সংসারে। কিন্তু, এই জীবনের সব কাজ তোমার সারথির হাতে সঁপে দিয়ে নিরাসক্ত হয়ে থাকতে হবে, —এই হলো 'পার্থসারথি'র মূল কথা।

একটা ভুল ছিল ছবিতে। শ্রীকৃষ্ণের শিথিল মুঠিতে হেলায় ধরা ছিল ঘোড়ার রাস। স্বামীজী বললেন, —'ওটা শক্ত করে ধরিয়ে দাও। এই কাঠিন্যের মানে হলো —সংযম।'

রাখাল মহারাজ প্রসঙ্গে।। ইনি ব্রহ্মানন্দ। শিল্পী প্রিয়নাথ সিংহ স্বামী বিবেকানন্দের বন্ধু ছিলেন। প্রাচ্য-চিত্রকলার শিল্পী হিসাবে নন্দলালের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। তিনি নিয়ে গেলেন নন্দলালকে ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে দেখা করাতে, বাগবাজারের বলরাম বসুর বাড়িতে। নন্দলাল সঙ্গে নিয়ে গেছলেন 'রাধিকার' ছবি। প্রিয়নাথবাবু রাখাল মহারাজের হাতে নন্দলালের ছবিটি দিয়ে পরিচয় করিয়ে দিলেন তাঁর সঙ্গে। স্বামীজী ছবিটি দেখেই, আগে নিজের মাথায় ঠেকালেন। তখন নন্দলালের বয়স বাইশ-চব্বিশ। স্বামীজী ছবিটা দেখতে

দেখতে বললেন, —'এ হয়নি 'রাধিকা'র ছবি। রাধিকা তো উন্মাদিনী —সেই ভাব তো কই ফোটেনি এতে। তবে, তোমরা এই সব করছো, ঠাকুর-দেবতার ছবি, এ-সব ভালোই। তবে. এ-রাস্তা বড়ো কঠিন। মাথা ঠিক রেখো। একটু বেচাল হলেই···ফেটে যাবে।' 'এখন আছে সে-ছবিটি বোধ হয় শ্রী ও. সি. গাঙ্গুলীমশায়ের কাছে'।

'বিয়ের কনে কোলে ক'রে নিয়ে যাচ্ছে শাশুড়ী' —ছবিটা খুব ভালো হয়েছিল —আমেরিকা পাঠানোর নাম ক'রে আর দিলেন না ও. সি. গাঙ্গুলী। পাঁচ-ছ-বার ওঁর বাড়ি গিয়ে তাগাদা করেও ছবিটা ফিরে পেলুম না ; খুব ভোগালেন।'

দেবব্রত বসু ॥ ইনি রামকৃষ্ণ-মিশনের স্বামী প্রজ্ঞানন্দ। নন্দলালের জ্ঞাতি দাদা ; বয়সে তাঁর চেয়ে দু-তিন বছরের বড়ো। ইনি ছিলেন অদ্ভুত পণ্ডিত। নন্দলালকে সংস্কৃত পড়াতেন ; 'কাদম্বরী' পড়িয়েছিলেন খুব ভালো করে। 'কাদম্বরী'-চিত্রাবলী আঁকার পরিকল্পনা নন্দলাল দেবব্রতের কাছ থেকেও পেয়েছিলেন। 'কাদম্বরী'র নানা চিত্রাংশ দেবব্রত নন্দলালকে বুঝিয়ে দিতেন বিশ্লেষণ ক'রে ক'রে। অধ্যক্ষ হ্যাভেল সাহেব নন্দলালের আঁকা 'বীণাবাদিনী মহাশ্বেতা' দেখেই তাঁকে আর্টস্কুলে ভরতি করার মনস্থ করেছিলেন। সাহেব বোধহয় তাঁর তৃতীয় নয়ন দিয়ে তখনই দেখে ফেলেছিলেন, নব্যভারত-চিত্রকলার বীজ এই ছবিটিতেই উপ্ত হয়ে রয়েছে।

স্টার-থিয়েটারের পিছনে, দেবব্রতর পিতা ব্রাহ্ম আশুতোষের কেয়ারি-ঘেরা বাড়িতে, সেকালের স্বাধীনতাবাদী বা বিপ্লববাদীদের একটি প্রধান 'আড্ডাস্থল' ছিল। স্বামী বিবেকানন্দের ছোট ভাই ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ অনেকে তখন সেই বাড়িতে গিয়ে, দেবব্রতর সঙ্গে ইতিহাস, ধর্ম ও দর্শনতত্ত্ব আলোচনা করতেন নিবিষ্ট হয়ে। ওদিকে শরীরচর্চায় আর ঘোড়ায় চড়তেও দেবব্রত ছিলেন বিশেষ পটু। তিনি বি-এ পাশ করে আইন পড়তে পড়তে, সে-সব ছেড়ে ছুড়ে 'যুগান্তর'-পত্রিকার সম্পাদনায় লেগেছিলেন। সিস্টার নিবেদিতার বাড়িতে দেবব্রতের আনাগোনা ছিল ; কিন্তু গুপ্ত-আন্দোলনের সঙ্গে নিবেদিতার সক্রিয় যোগ ছিল না। সুধীরার প্রসঙ্গে সিস্টারও দেবব্রতের বাড়ি যেতেন।

এনার্কিস্ট্-গোষ্ঠীর 'যুগান্তর'-দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল দেবব্রতের।



পার্থসারথি - নন্দলাল

তাঁর দেহ ছিল বিরাট। তিনি নন্দলালকে এনার্কিস্ট্‌দের পৃষ্ঠপোষক নেতা পি. মিত্রের কাছে নিয়ে যাবেন বলেছিলেন অনেকবার। কিন্তু, কি বুঝে যেন, শেষ পর্যন্ত নিয়ে যাননি। তবে, নন্দলালের আত্মিক যোগাযোগ ছিল ওঁদের সঙ্গে বরাবর।—'আমি ওদের চলাফেরা, কাজকর্ম সব জানতুম' —বললেন নন্দলাল হাসতে হাসতে।

প্রেসিডেন্সী কলেজে নন্দলালের সওদাগরী-ক্লাসের পাঠ এগোয়নি। মেডিকেল কলেজেও তাঁর ঢোকা হলো না। দেবব্রতর ঔদাসীন্যে এনার্কিস্ট্‌-গোষ্ঠীতেও তাঁর নাম লেখানো হয়নি। নানা কানা-গলির পাশ কেটে কেটে অদম্য জিজ্ঞাসার বলে, তিনি যেন সত্যিই পৌঁছে গেলেন —'নন্দনের কুঞ্জতলে রঞ্জনার ধারা-তীর্থে। কারণ তিনি যে ভারতশিল্প-সাগরসঙ্গমে 'জন্ম-আগে'র স্নাতক। তাঁর 'অস্তিত্বের' 'পার্থসারথি' তাঁর 'নিরবচ্ছিন্ন আমি'-কে জন্ম-জন্মান্তরের বল্গা ধরে, বহু রণক্ষেত্র পার ক'রে নিয়ে চলেছেন —কবে থেকে সে কে জানে।

দেবব্রত ছিলেন ঘোরতর এনার্কিস্ট্‌। দেশ-সেবার পুরস্কারে দেবব্রতর জেল হয়েছিল। পরে, ছাড়া পেয়ে গেলেন দোসর শচীন সেন আর তিনি —'নট্‌-গিল্‌টি' প্রমাণ হওয়ায়। মানিকতলা-বোমা-কেসের আসামী ছিলেন তিনি।

জেল থেকে ফিরে এসে, বৃটিশ-সিংহকে বিতাড়িত করবার ভিন্ন পথ ধরলেন দেবব্রত। বেলুড়মঠে ঢুকে স্বামী সারদানন্দজীর আশ্রয় পেলেন ১৯০৯ সালে। শ্রীমা সারদামণির মন্ত্র-শিষ্য হয়ে নাম নিলেন —'প্রজ্ঞানন্দ'। বৃটিশ-পুলিশের শ্যেনদৃষ্টি সত্ত্বেও স্বামী প্রজ্ঞানন্দ তাঁর নূতন ব্রতে অটল ছিলেন আমরণ।

স্বামী প্রজ্ঞানন্দ রামকৃষ্ণ-মিশনে প্রজ্ঞার আলোকবর্তিকা অনেক ঊর্ধ্বে উন্নীত ক'রে গিয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের প্রবর্তিত 'উদ্বোধন'-পত্রের এক বছর সম্পাদনা করেছিলেন —১৯১২-১৩ সালে। 'মায়াবতী-অদ্বৈত-আশ্রমে'র প্রেসিডেন্ট্‌ হয়েছিলেন তিনি। ইংরেজী পত্রিকা 'প্রবুদ্ধ-ভারতে'র সম্পাদক ছিলেন চার বছর —১৯১৮ সালে তাঁর ৩৯ বৎসর বয়সে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত। দেবব্রত-প্রজ্ঞানন্দের গ্রন্থ 'ভারতের সাধনা' (১৯১৮) বিশেষ প্রশংসা লাভ করেছিল। ভারতের জাতীয় সমস্যাগুলির গভীর

অন্তর্দৃষ্টিমূলক বিচার-বিশ্লেষণ আর ধর্মের ভিত্তিতে সে-গুলির সহজ সমাধানের সোজা পথ দেখানো হয়েছে এই বইটিতে। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শ আর কর্মপন্থা তিনি ফুটিয়ে তুলেছিলেন কায়মনোবাক্যে আর তাঁর সকল কর্মে।

মায়াবতীতে থাকবার সময় ১৯১৮ সালের দিকে তাঁর যখন হার্ট খারাপ হলো, তিনি কলকাতায় ফিরে এলেন। 'উদ্বোধন-কার্যালয়ে' রোগশয্যায় তখন তিনি খুব ভুগছেন ; নন্দলাল দেখা করতে যেতেন। নন্দলালের বড়ো দাদা গোকুলচন্দ্র মারা যাওয়ায়, নন্দলাল এই সময় স্বভাবতই খুব কাতর হয়ে পড়েছিলেন। নন্দলালের বিহ্বলতা দেখে, অনেক সাহস দিয়েছিলেন দেবব্রত-প্রজ্ঞানন্দ।—'এতে ভয় খেলে চলবে না, ভাগ্যে যা' আছে তা হবেই' —এই ব'লে তিনি ভাই নন্দলালকে ভরসা দিতেন খুব।

সুধীরা বসু ॥ প্রজ্ঞানন্দ-দেবব্রত বসুর ভগ্নী সুধীরা বসু হলেন নন্দলালের জেঠতুতো ভগ্নী। সিস্টার নিবেদিতার বিদ্যালয়ের তিনি প্রধানা (১৯১১-২০) ছিলেন। বাগবাজারের বোসপাড়া লেনের একটি ছোট্ট বাড়িতে থাকতেন সিস্টার নিবেদিতা। এই বাড়িতে মেয়েদের পাঠশালাও বসতো। নিবেদিতার বিদ্যালয় সাধারণ বিদ্যালয় নয়। স্বামী বিবেকানন্দ ব্রহ্মচারিণীদের জন্যে একটি মঠ-প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করেছিলেন। সেই সঙ্কল্পের আদর্শেই সিস্টার নিবেদিতার এই বিদ্যালয়। সিস্টার ক্রিস্টিনও তখন তাঁর সঙ্গে বিদ্যালয়ের কাজে লাগলেন। এখানে শিশু বালিকা, বয়স্কা বধূ, গৃহিণী ও বিধবা —সবাই যে যেমন শিক্ষালাভ করতে চাইতেন, তাঁকে সেই রকম শিক্ষা দেবারই ব্যবস্থা ছিল। ভাষা, অঙ্ক, শিল্পকার্য, সেলাই আর চিত্রবিদ্যাও শিক্ষা দেওয়া হতো। ছবি-আঁকা, আলপনা, পাথরে ও মাটিতে নরুন দিয়ে ছাঁচ-কাটা, পুতুল-গড়া —এই সব শিক্ষাবিধির অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন সিস্টার।

নন্দলাল ওখানে শিক্ষকতা করেছেন দিনকতক। চিত্রবিদ্যা শেখাতেন তিনি সিস্টারের বালিকা-বিদ্যালয়ে। সিস্টারের মৃত্যুর পরে, সুধীরা বললেন, ওদের স্কুলে ছবি-টবি আঁকা শেখাবার জন্যে। কিছুদিনে পাঁচ-ছটা ক্লাস নিয়েছি ওখানে। ক্লাসে আট-দশজন মেয়েকে ছবি-আঁকা শেখাতুম তখন। সম্বর হরিণের শিং, জাফরি-কাটা টালির নমুনা দিয়েছিলুম ওখানে রাখবার জন্যে। জাফরি-কাটা টালির নমুনা গণেনও তাঁর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে

লাগিয়েছিলেন। সিস্টারের স্কুলে আর-একটা জিনিস দিয়েছি, বড়ো বেলের মালার ওপর ডিজাইন ক'রে। মালার ধারটাতে বেত দিয়ে 'মুড়ি'র কাজ ক'রে দিয়েছিলুম —তাতে ক'রে ওঁরা খাবেন-টাবেন বলে। আমার কন্যারা অনেক কথা বলতে পারবেন। ওঁরা পড়তে যেতেন ওখানে'। —সেই বেলের মালার কিনারে 'মুড়ি'-কাজের নমুনা তিনি এঁকে দেখালেন ১৬ই মার্চ (১৯৬৫)।

নিচু-ক্লাসের মেয়েদের পড়াতেন উঁচু-ক্লাসের মেয়েরা। উঁচু-ক্লাসের মেয়েদের মধ্যে তিন চার জন বিধবাও ছিলেন। ওঁরা বিদ্যালয়ের কাজেই জীবন সঁপে দেবেন বলে সংকল্প করেছিলেন। নন্দলালের জেঠতুতো ভগ্নী সুধীরা বসু এই উঁচু-ক্লাসের মেয়েদের শিক্ষয়িত্রী আর সমস্ত বিদ্যালয়ের পরিচালিকা ছিলেন। সুধীরা দেবী চিরকুমারী-ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। বিদ্যালয়ের কাজের ভার গ্রহণ করেন তিনি স্বেচ্ছায়। তাঁর প্রেরণার উৎস ছিলেন —বড়ো দাদা দেবব্রত। তাঁর মতো 'উন্নতমনা' আর 'ধর্মপরায়ণা' মহিলা সেকালে খুব কমই ছিলেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের কল্যাণের জন্যে তাঁর চেষ্টা ছিল ঐকান্তিক। আর তাঁর ছাত্রীরাও তাঁকে ভালোবাসতো আন্তরিকভাবে। তাঁর নির্ভীক স্বাধীনচিন্তা, তাঁর দেশাত্মবোধ আর আধ্যাত্মিক জীবন ছিল তাদের আদর্শ। তাঁর আদেশ পালন করতো মেয়েরা যথাসাধ্য। বিদ্যালয়-পরিচালনায় সুধীরা দেবীই ছিলেন নিবেদিতার দক্ষিণ হস্ত।

সুধীরা দেবীর সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের স্ত্রী মৃণালিনী দেবীর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাঁরা দু-জনে শ্রীমা সারদামণির নিকট প্রায়ই যাতায়াত করতেন। ১৯২০ সালে কাশী থেকে ফেরবার সময় ট্রেন-এ্যাক্সিডেন্টে ভগিনী শ্রীসুধীরা বসুর মৃত্যু হয় ৩১ বৎসর বয়সে।

কৃষ্ণমোহন বসুর ধারায় বিভিন্ন পরিণতি বড়ো অদ্ভুত রকমের। এক ধারা, খৃস্টান হয়ে ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের অধ্যাপক পর্যন্ত হয়েছিলেন। দ্বিতীয় ধারা, ব্রাহ্ম থেকে হিন্দু ও সন্ন্যাসী হয়ে দেশসেবায়, সমাজ-সংস্কারে আর অধ্যাত্ম সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু, যে-ধারা পুরাপুরি হিন্দু-সংস্কার বজায় রেখে, সনাতন হিন্দু-ধর্মেরই পুরাতন ঐতিহ্য আঁকড়ে ছিলেন, সেই ধারাতেই ভারত-কলালক্ষ্মীর পূর্ণ আর্বিভাব ঘটলো —শ্রীনন্দলালকে আশ্রয় ক'রে। ভাই নিমাইও অকালে ঝ'রে না-গেলে, কি সুবাস

যে ছড়াতেন,' তাই-বা কে জানে।

এই সময়কার আর একজন লোকের কথা একটু না-বললে প্রত্যবায় ঘটবে। শ্রীনন্দলালের দীর্ঘ দিনের সহচর বন্ধু গণেন মহারাজ। কলকাতার সমাজে ছোট বড়ো নানা জনের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় ছিল তাঁর। নন্দলালকে তিনি সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়ে, সেকালের নানা বিশিষ্ট লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। আর নানা প্রসঙ্গে নানা ভাবে তিনি সাহায্য করতেন বন্ধু নন্দলালকে। আজ তিরাশী বছর বয়সেও নন্দলাল তাঁর কথা মনে রেখেছেন অতি অন্তরঙ্গভাবে। গণেন মহারাজ সম্পর্কে স্বয়ং নন্দলালের সঙ্গে আলাপে (১৯-২-১৯৬৫) যেটুকু জানতে পারা গেল তা সংক্ষেপে এই।—

গণেন মহারাজ ঃ ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ॥ কৌলিক পদবী —বন্দ্যোপাধ্যায়। নন্দলালের সঙ্গে যখন প্রথম আলাপ তখন থাকতেন তিনি বাগবাজারের মঠে। তিনি তখন 'উদ্বোধনের কার্যাধ্যক্ষ'। গণেন্দ্রনাথ বেশী লেখাপড়া জানতেন না। কিন্তু, 'উদ্বোধনে'র লেখা দেখে দিতেন। ওখানে দেবব্রত-প্রজ্ঞানন্দের কাছে নন্দলাল তাঁকে প্রথম দেখেন। ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথের বিশেষ হৃদ্যতা ছিল নন্দলালের দাদা দেবব্রত-প্রজ্ঞানন্দের সঙ্গে। সেই সূত্রেই গণেন ব্রহ্মচারীর সঙ্গে নন্দলালের মুখচেনা হয়। পরে, সিস্টার নিবেদিতাকে গণেন যখন একবার ম্যুজিয়াম্ দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন, আর্টস্কুলের ক্লাসও গিয়েছিলেন তখন। সেই থেকে গণেন ব্রহ্মচারীর সঙ্গে নন্দলালের আরো চেনা হলো; তারপরে, ক্রমে ক্রমে বন্ধুত্ব হলো। এ-সব হলো ১৯০৯-১০ সালে শ্রীনন্দলালদের অজন্তা যাবার আগের ঘটনা।

শ্রীনন্দলালের চেয়ে বয়সে গণেন মহারাজ বড়ো ছিলেন দু-তিন বছরের। গণেন মহারাজের সঙ্গে বন্ধুত্বসূত্রে নন্দলাল বাগবাজার-মঠে গিয়ে থাকতেন মাঝে মাঝে। গণেন মঠের ঘর দুয়ার সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতেন পছন্দসই করে। মঠের বাথরুম মার্বেল পাথর দিয়ে বাঁধিয়ে পরিপাটী করেছিলেন। তিনি বলতেন, একটা জাতের সভ্যতার মাপকাঠি বোঝা যায় তার পায়খানা-বাথরুমের সন্নিবেশ দেখে। তখনকার মঠের সাধুদের তিনি খুব বকতেন, তাঁরা ঝরঝরে-তকতকে, ভবিষ্যযুক্ত হয়ে থাকতেন না ব'লে। স্বামীজীর দৃষ্টান্ত দিয়ে বলতেন, 'সন্ন্যাস তো মনে; বাইরে গেরুয়া নিলেই-বা; ধড়ে যতক্ষণ প্রাণ আছে, আর লোকসমাজে বাস করতে হচ্ছে ততক্ষণ

সাধারণ ক্যালিবারের সাধুদের কেতাদুরস্ত হয়ে থাকাই উচিত'।

একবার নন্দলাল বাগবাজারের 'উদ্বোধন'-মঠে থাকতে থাকতেই, অস্ট্রিয়ান্ শিল্পী ফ্রাঙ্ক্ ডোরাকের আঁকা শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবি মঠে এসে পৌঁছলো। শ্রীনন্দলাল প্যাকেট দেখলেন। 'প্যাকেট খোলার পরে ফ্রাঙ্ক্ ডোরাকের আঁকা ছবি দেখেই শ্রীমা লজ্জায় মাথায় ঘোমটা দিয়েছিলেন। এতো যথাযথ আঁকা হয়েছিল ছবিখানি। এই তো শিল্পীর বড়ো পুরস্কার।'

শ্রীমায়ের ইচ্ছা হলো, ছবিটি নন্দলাল দেখেন। শ্রীমা গণেনকে কথাটা বললেন। শ্রীমা বলতেই, গণেন ছবিখানি নিয়ে এলেন নন্দলালের কাছে। তেল-রং-এ আঁকা সেই ছবিখানি দেখে নন্দলালের খুব ভালো লেগেছিল। এই প্রসঙ্গে নন্দলাল সেদিন একটি কাহিনী বললেন, —'শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখ দুটি এঁকে শিল্পীর মনে হয়েছিল, —এ ঠিক হয়নি। তখন শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে তাঁকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন, —'এই ঠিক হয়েছে'। শুনে, শিল্পীর মন শান্ত ও উৎফুল্ল হলো। ফ্রাঙ্ক্ ডোরাকের আঁকা মূল ছবিখানি বোধ হয় গণেন নিয়ে গিয়েছিলেন।'

'গণেন শ্রীমায়ের খুব স্নেহভাজন ছিলেন। শ্রীমায়ের তিনি মন্ত্র-শিষ্য ছিলেন না; কিন্তু, শ্রীমা তাঁকে বিশেষ স্নেহ করতেন। শ্রীমা বলতেন, —'আমার সব ভার খালি নিতে পারে —শরৎ আর গণু'। এরা হলেন —স্বামী সারদানন্দ আর ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ। অল্পবয়সে মঠে আসার পর থেকে, গণেন সব সময়ে শ্রীমায়ের কাছে কাছে থাকতেন। শ্রীমা উদ্বোধন-মঠে থাকার সময়ে গণেন তাঁর সব বিষয়েই ফাই-ফরমাশ খাটতেন।

'শ্রীশ্রীঠাকুর গত হবার পরে, শ্রীমা অনেকবার নানাতীর্থ-দর্শনে গিয়েছিলেন। সঙ্গে যেতেন গোলাপ-মা। একবার গণেনকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। আরও দু-জন্ ভক্ত সেবারে সঙ্গে যান। সেবারে ওঁরা কাশী গিয়েছিলেন বোধহয় ১৯১২ সালের দিকে।

'গণেন বাগবাজারের মঠেই থাকতেন। তাঁর জন্যে মঠে আলাদা ঘর ছিল। মঠে অন্য সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনীরাও ছিলেন। গণেন বেশীর ভাগ সময় মঠেই থাকতেন। থাকতেন তিনি ওপর তলায়। একদিন সকালে আমি গিয়ে শুনলুম, —শ্রীমা বলছেন, —'গণুর বিছানায় বেড়ালে বাহ্যে ক'রে দিয়েছে।' শ্রীমা সহজ মাতৃস্নেহে নিজের হাতে সে-সব ফেলে, বিছানা

কেচে দিলেন। শ্রীমা ছিলেন আদর্শ সেবাপরায়ণা। একবার দাঁতে 'পেন্' হলো গণেনের। শ্রীমা সেবা করলেন —ওষুধ খাওয়ানো, খাবার খাওয়ানো —সব। গোলাপ-মা থাকতেন শ্রীমায়ের কাছে কাছেই। খুব দজ্জাল আর শক্ত মেয়ে ছিলেন গোলাপ-মা। খুব স্ট্রিক্ট্ ডিসিপ্লিনে রাখতেন তিনি সবাইকে। শ্রীমায়ের সেবা-যত্নের জন্যে তিনি অনেক-কিছু করেছিলেন।

'জয়রামবাটীতে শ্রীমায়ের থাকার জন্যে মাটির ঘর যখন তৈরী হয়, তার তত্ত্বাবধান করেছিলেন গণেন। শ্রীমা যখন জয়রামবাটীতে থাকতেন, গণেন মহারাজ আর শরৎ মহারাজ মাঝে মাঝে তাঁকে দেখতে যেতেন। জয়রামবাটীতে শ্রীমায়ের পৈতৃক বিষয়-সম্পত্তি ভাইদের মধ্যে ভাগ হয়েছিল, গণেন আর শরৎ মহারাজ তখন জয়রামবাটী গিয়েছিলেন। শরৎ মহারাজ আইন-কানুন ভালো বুঝতেন। জয়রামবাটীতে শ্রীমায়ের একবার অসুখ করেছিল; গণেন কলকাতা থেকে ডাক্তার নিয়ে গিয়েছিলেন। জয়রামবাটীতে আর একবার ম্যালেরিয়ায় শ্রীমায়ের শরীর খারাপ হলো। শরৎ মহারাজ আর গণেন উদ্যোগ ক'রে তাঁকে আবার বাগবাজারের মঠে এনে রাখলেন —১৯২০ সালের দিকে। এর কয়েক মাস পরেই শ্রীমা দেহত্যাগ করেন।'

সুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের প্রকাশিত ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্যের 'শ্রীশ্রী সারদাদেবী' গ্রন্থে (১৮ই ভাদ্র, ১৩৪৪) গণেন মহারাজ সম্পর্কে এই সংবাদ পাওয়া যায়: 'ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ —যিনি দীর্ঘ সপ্তদশ বৎসর শ্রীশ্রীমাকে দেখিবার, বুঝিবার ও সেবা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, আদর করিয়া মা যাঁহাকে অনেক সময় 'গণেশ' বলিয়া ডাকিতেন ও অকুণ্ঠিতচিত্তে যাঁহার সকল আব্দারই পূর্ণ করিতেন, মার লৌকিক জীবন-যাত্রা সম্বন্ধে যাঁহার মত অভিজ্ঞ ব্যক্তি বর্তমানে বিরল...তিনি মার সম্বন্ধে নানাকথার সংগ্রহ একখানি খাতা হইতে প্রয়োজনানুরূপ বিবরণ গ্রহণ করিতে দেন এবং লেখা সম্পূর্ণ হইলে, পুস্তকখানিকে সর্বাঙ্গসুন্দর ও বহুচিত্রমণ্ডিত করিবার জন্য প্রভূত শ্রম স্বীকার করেন। তাঁহার সহায়তায় অনেক ঘটনার সময়-নিরূপণ সম্ভবপর হইয়াছে।' —এই গ্রন্থে গণেন্দ্রনাথের ১৩১১, ১৩১৬ আর ১৩১৯ সালে যথাক্রমে তোলা শ্রীমায়ের ১৩ খানি এবং অন্য আলোকচিত্র প্রকাশিত হয়েছে। ১৩৩১ সালের বৈশাখ মাসের প্রবাসীতে রামানন্দবাবু 'সারদামণি দেবী' প্রবন্ধ লেখবার সময়ে তথ্য ও চিত্র সাহায্য পেয়ে ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথের নিকট ঋণ

ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন।

'শ্রীমা গত হবার পরে, গণেন মঠ ছেড়ে চলে এলেন। গণেন বুদ্ধিবলে তাসের খেলা দেখাতে পারতেন। তাঁর হাতের খেল্ সম্ভবতঃ মঠেও দেখিয়েছিলেন। গণেনকে মঠের সাধুরা পছন্দ করতেন না। মঠের টাকা-কড়ি নিয়ে কি-সব যেন গোলমাল হয়েছিল। বাগবাজারের জমিদার নন্দলাল বসুর গোলমেলে একটা সম্পত্তির মামলাতে সাক্ষী দিয়ে নিষ্পত্তি করে, গণেন প্রায় এক লক্ষ টাকা পেয়েছিলেন। সেই টাকার সূত্রেই বোধহয় গোল বেধেছিল। নিবেদিতা-বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী চপলা দেয়ের সঙ্গে গণেনের বিশেষ জানাশোনা ছিল। সে সময়েও সিস্টারের বালিকা-বিদ্যালয়ে রাখবার জন্যে আমি অনেক শিল্প-বস্তু দিয়েছিলুম।'

সিষ্টার নিবেদিতার সঙ্গে নন্দলালের প্রথম দেখা হয় গণেন মহারাজের মাধ্যমে। নন্দলালের আঁকা 'কালী'র ছবি আর 'দশরথের মৃত্যু' ছবি দুটি আর্টস্কুলে সিস্টারকে দেখানো হয়েছিল। সিস্টার নিবেদিতা নন্দলালের 'কালী'র ছবিখানি সংশোধন করতে বলেছিলেন —স্বামীজীর বই পড়ে; আর 'দশরথের মৃত্যু' ছবিটি সিস্টার ও'র কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে মঠে রেখেছিলেন। সিস্টারের সঙ্গে গণেন ভারতের অনেক স্থানে ভ্রমণ ক'রে এসেছিলেন।

অবনীবাবুর বাড়িতে গণেন সিস্টারকে নিয়ে গিয়েছিলেন একবার। সিস্টার নিবেদিতা সম্পর্কে অবনীবাবুর অনেক লেখা আছে। তখন একটা সাদা সিল্কের ক্লোক্ —'ঝোলা' গায়ে দিয়ে থাকতেন সিস্টার। অবনীবাবু বলেছিলেন, —'সিস্টার দেখতে ঠিক পার্বতীর মতো।'

নন্দলালদের কাজে সাহায্য করবার জন্যে অজন্তাতে গিয়েছিলেন গণেন, সিস্টার আর জগদীশবাবুর সঙ্গে ১৯০৯-১০ সালে। ফোটোগ্রাফি জানতেন তিনি ভালো রকম। তাঁর নেওয়া 'অজন্তা'র নানা ফোটো-প্রিন্ট্ অসিতকুমার হালদারের 'অজন্তা' বই-এ ছাপানো হয়েছে। ১৯১১ সালের ১৩ই অক্টোবর দার্জিলিঙে সিস্টার নিবেদিতার মুখাগ্নি করেছিলেন ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণ-মিশন থেকে গিয়ে।

গণেন মহারাজ নন্দলালের জন্যে অনেক-কিছু করেছিলেন। কলকাতার

বাড়িতে নন্দলালের অসুখের সময়ে নিয়মিত দেখতে যেতেন তিনি। ঐ সময়ে গণেনের যোগাযোগে কাশীর ডাক্তার দুর্গাপদ ঘোষ নন্দলালকে দেখেছিলেন। তারপর থেকে ডাক্তার কলকাতায় এলে নন্দলালের সঙ্গে প্রায়ই দেখা ক'রে যেতেন। শেষে, ডাক্তার কাশী ছেড়ে বাড়ি করেন কলকাতায় এসে। তিনি মেডিক্যাল কলেজের হাউস-সার্জেন ছিলেন। ডাক্তার ঘোষের সঙ্গে নন্দলালের পরম বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল। এবং সে-যোগাযোগ গণেনের মাধ্যমেই হয়েছিল।

গণেন নন্দলালকে বরাবর বন্ধুভাবে ভালোবাসতেন; আর সাহায্য করতেন। অসুখে-বিসুখে, আপদে-বিপদে তাঁর সাহায্য সবসময় পেয়েছেন নন্দলাল। কলকাতায় নন্দলালদের বাড়িতে এসেও মাঝে মাঝে থাকতেন গণেন।

নন্দলাল শান্তিনিকেতনে আসার পরে, গণেন্দ্রনাথ এখানে এসেছিলেন নন্দলালের টায়ফয়েডের সময় দেখতে। বন্ধু তো। প্রায়ই আসতেন শান্তিনিকেতনে নন্দলালের সঙ্গে দেখা করতে। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ একবার ভেবেছিলেন, গণেন্দ্রনাথকে শান্তিনিকেতনে আনবার কথা। 'খুব চালাক-চতুর লোক গণেন। আমাদের স্কুলটাকে ম্যানেজ করতে পারবেন' —বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু গণেন আসতে চাইলেন না। কন্‌গ্রেসের লক্ষ্ণৌ-অধিবেশনে মণ্ডপ-সজ্জা করেছিলেন নন্দলাল। সেই সময়ে গণেন্দ্রনাথ গিয়েছিলেন নন্দলালের সঙ্গে লক্ষ্ণৌ।

শ্যামবাজারে চারতলা বিরাট বাড়ি করেছিলেন গণেন্দ্রনাথ। তখনও নন্দলালের কলকাতার বাড়ি তৈরী হয়নি। গণেন নিজেই হিন্দু কন্‌ট্রাক্টর দিয়ে নন্দলালের বালীগঞ্জে মনোহরপুকুর-রোডের বাড়ি তৈরী করিয়ে দিয়েছিলেন। নন্দলালকে কোনো ঝামেলা পোয়াতে হয়নি। বাণীপুরে নন্দলালদের দেশে পৈতৃক সম্পত্তির ভাগ-বাটোয়ারা সব গণেন্দ্রনাথই সুশৃঙ্খলে ক'রে দিয়েছিলেন। প্রখর বৈষয়িক বুদ্ধি ছিল তাঁর। নিবেদিতা-বালিকা বিদ্যালয়ের বাড়িও তিনি করিয়ে দিয়েছিলেন।

আনন্দবাজার-প্রেসের জন্যেও গণেন্দ্রনাথ অনেক কাজ করেছিলেন। প্রেস-বসানো, ঘর-গোছানো অফিস-সাজানো ইত্যাদি কাজে সুরেশ মজুমদার মহাশয় গণেনের অনেক সাহায্য পেয়েছিলেন। সুরেশ মজুমদারের সঙ্গে

গণেনের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। সুরেশবাবু প্রায়ই যেতেন গণেন্দ্রনাথের শ্যামবাজারের বাড়িতে। নন্দলালও যেতেন ওখানে। তিন জনে বসে তখন নানা আলোচনা হ'তো।

মঠের কোনো বই-এ গণেনের কাজের বিশেষ উল্লেখ নাই। মঠের সাধুরা প্রসন্ন ছিলেন না গণেনের ওপর। কিন্তু, মিশনের বই-ছাপানোর ব্যাপারে গণেন মহারাজের হাত ছিল অনেক। ভারতবর্ষের বাইরে রামকৃষ্ণ-মিশনের শাখা-প্রতিষ্ঠায় গণেনের চেষ্টা ছিল যথেষ্ট। শরৎ মহারাজের —স্বামী সারদানন্দজীর খুব প্রিয় ছিলেন ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ। গণেন নিজে সন্ন্যাস নেননি। মিশনের সঙ্গে নন্দলালের বিশেষ যোগাযোগ গণেন মহারাজের মাধ্যমেই।

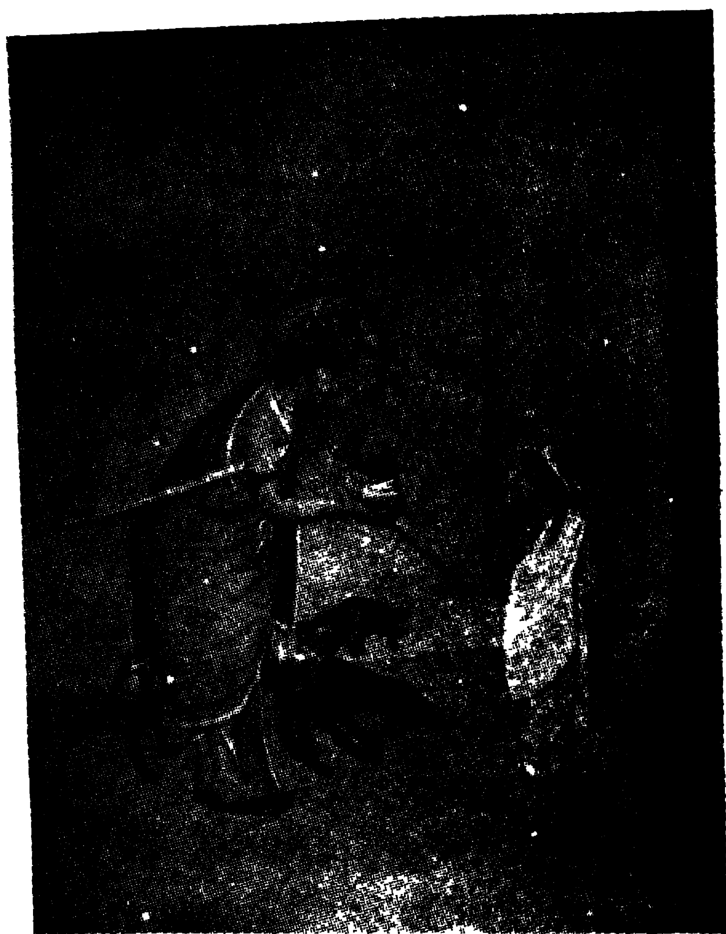
গণেন্দ্রনাথ মারা গেলেন থ্রম্বোসিস্ হয়ে। তাঁর উইল-এ নন্দলালের স্বাক্ষর আছে। উইল যখন করালেন তখন গণেনের জ্ঞান ছিল। তিনি নিজে উইলের বয়ান ডিক্‌টেট্ করেছিলেন। খুব চট্‌পটে আর মাঝারী গোছের প্রখর চেহারা ছিল গণেনের। তাঁর ফোটো আছে নন্দলালের কাছে। গণেনের বুদ্ধি ছিল ক্ষুরধার। কিন্তু, নাম সই করতেন ছেলেমানুষের মতন।

গণেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরেও, প্ল্যাঁশেতের ভৌতিকতায় দু-বার আশ্চর্যভাবে শ্রীনন্দলালের যোগাযোগ হয়েছিল গণেন্দ্রনাথের সঙ্গে। সে-প্রসঙ্গ যথাসময়ে বলা হবে। এখনও গণেন্দ্রনাথের ভাইপো দেবু —দেবেন্দ্রনাথ বেঁচে। থাকেন বাঁকুড়ায়। মাঝে মাঝে আসেন তিনি নন্দলালের সঙ্গে দেখা করতে।

॥ উত্তরভারত ভ্রমণ (১৯০৮) ॥

উত্তরভারত ভ্রমণে বের হলেন ভারতশিল্পী নন্দলাল ১৯০৭-এর শেষ, ৮ সালের গোড়ার দিকে —শীতকালে। আর্টস্কুলে তখন তিন বছরের পাঠ সাঙ্গ; সোসাইটির প্রথম এগজিবিশনে সহমরণের 'সতী' (প্রবাসী ১৩১৫ জ্যৈষ্ঠ) আর 'শিবসতী' ছবি দেখিয়ে, 'কালো' 'ধলো' নানা জনের বাহবা কুড়িয়ে, পুরস্কারের নগদ পাঁচশো টাকা পকেটে। পাঁচশো টাকা পেয়েছিলেন সুরেন গাঙ্গুলীও তাঁর 'লক্ষ্মণসেনের পলায়ন' আর 'ভোজরাজা ও দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা' (প্রবাসী ১৩১৫ অগ্রহায়ণ) ছবি এঁকে। পুরো পাঁচশো পেয়ে গাঙ্গুলী গেলেন বরিশালের বাড়িতে, পেটের জন্যে স্থায়ী অন্নসংস্থানের আশায়, ধানের জমি কিনতে, আর নন্দলাল বের হলেন তখনই উত্তরভারতের শিল্পতীর্থে ঘুরে বেড়াতে, মনের অন্ন-আহরণের উন্মাদনায়। এই ভ্রমণে নন্দলালের দোসর ছিলেন শিল্পী প্রিয়নাথ সিংহ।

প্রিয়নাথ সিংহ ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের ক্লাসফ্রেণ্ড্। বয়সে নন্দলালের চেয়ে কিছু বড়ো, 'রোগা মতো দেখতে, টিকলো নাক, রং ফর্সা'ই বলা যায়।' বিলিতী অয়েল-পেন্টিং করতেন প্রিয়নাথ সিংহ। স্বামীজীর আর শ্রীশ্রীঠাকুরের অনেক পোর্ট্রেট্ করেছেন তিনি। পোর্ট্রেট্ ক'রে তিনি বাজারে ছেড়ে বিক্রী করতেন। হাতীবাগানের বাড়িতে এসে নন্দলালের সঙ্গে আলাপ করেছিলেন প্রিয়বাবু। তাঁর অনুরোধে নন্দলালও যেতেন ওঁদের বাড়ি। আনাগোনায় ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠতা বাড়লো —'এলে গেলেই কুটুম' —এই নীতিতে। শুধু কুটুম্বিতা নয়, প্রিয়নাথবাবু 'অনেক সময় গাইড্ করতেন আমাকে —এটা কর, ওটা ক'রো না —বলে'। প্রিয়বাবুই নিয়ে গিয়েছিলেন নন্দলালকে গিরিশবাবুর সঙ্গে আর রাখাল মহারাজের সঙ্গে আলাপ করাবার জন্যে। প্রিয়বাবুর থ্রু দিয়েই কাঞ্জিলাল ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ হয় নন্দলালের। তিনি ছিলেন ওঁদের ফ্যামিলি-ডাক্তার। নন্দলালের স্ত্রীর অসুখের সময় তিনি দেখেছিলেন। এ্যালোপ্যাথির সঙ্গে হোমিওপ্যাথিও চালাতেন তিনি, পরে। ডাক্তার দুর্গাপদ ঘোষের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল গণেনের মাধ্যমে।



যম ও নচিকেতা - প্রিয়নাথ সিংহ

'আমার দিশী-পদ্ধতিতে ছবি করা দেখে প্রিয়বাবুরও ইচ্ছে হলো ঐ রকম আঁকতে। দিশী-পদ্ধতিতে অনেক ছবি তিনি এঁকেও ছিলেন আমার দেখাদেখি। প্রিয়বাবুর বিখ্যাত ছবি 'যম ও নচিকেতা' —এই সব। ছাপা হয়েছিল 'প্রবাসী'তে। থাকতেন তিনি শ্যামবাজারে। শেষের দিকে, তাঁর অবস্থা খারাপ হয়ে এলো। আগে ভালোই ছিল। পোট্রেট্ করেই দিন গুজরান করতে লাগলেন। ক্রমশঃ তাঁর শরীর ভেঙ্গে পড়লো। শেষে, ভাইয়ের বিষয়ে ছিলেন। মারা গেলেন। তাঁর ছেলে এসেছিল আমার সঙ্গে দেখা করতে। সেই খবর দিলে, বাবা মারা গেছেন ব্লাড্‌প্রেশারে। প্রিয়বাবু স্বামীজীর বন্ধু ছিলেন, কিন্তু, মঠের শিষ্য ছিলেন কিনা, জানি না'।

প্রিয়নাথ সিংহের সঙ্গে কলকাতা থেকে উত্তরভারত ভ্রমণে বের হয়ে ওঁরা প্রথমেই গেলেন পাটনা। পাটনা থেকে কাশী, সারনাথ, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন, দিল্লী, ফতেপুরসিক্রী, গয়া, বুদ্ধগয়া, সাসারাম —এইসব হয়ে গিয়েছিলেন শ্বশুরবাড়ি —মুঙ্গের খড়্গপুরে।

পাটনায় গিয়ে উঠেছিলেন ওঁরা প্রিয়বাবুর এক উকীল-বন্ধুর বাড়িতে। প্রিয়বাবুর সে-বন্ধু মঠের বন্ধু, মঠেরই শিষ্য। পাঁচ-ছ দিন বেশ চর্ব্য-চোষ্য ক'রে খাওয়া-দাওয়া হয়েছিল ওঁর বাড়িতে। যত্ন-আত্তি খুব। 'খাবার মধ্যে একটা জিনিসের নাম মনে আছে —'টাকার বরফি' ;—তার ওপরটা টাকার লেপ্, আর তার ভেতরে চিনির রস ভরা'।

বন্ধুটি হিন্দুস্থানী ; নাম বোধহয় —জালান। পুরাতন ছবি-সংগ্রহের শখ ছিল তাঁর। ধনী লোক, সংগ্রহও করেছিলেন অনেক। তাঁর অনেক ছবি দেখলেন। তবে ছবি-টবি দেখবার আগে, গঙ্গার ঘাট দিয়ে ঘুরে বেড়িয়ে এসেছিলেন। নন্দলালের স্কেচবুকে (সংখ্যা ২০) দেখছি, ১৯২২ সালে তিনি স্কেচ করেছেন —পাটনায় গঙ্গার ঘাট —প্রিয়বাবুর সঙ্গে গিয়ে যখন দেখেছিলেন তখনকার স্মৃতি থেকে করা।

'খুদাবক্স লাইব্রেরী'র পুরাতন ছবির কালেক্‌শন দেখলেন। দিশী ছবির সংগ্রহ। বেশীর ভাগ রাজপুত-পেন্‌টিংএর। মোগল-পেন্‌টিংও ছিল —তবে সে সংখ্যায় কম। হাতে-লেখা একখানা পুরো কোরাণ দেখলেন। এতো মিহি লেখা তার, মাইক্রস্‌কোপ্ দিয়ে দেখতে হলো। খুব মিহি ছোট্ট ছোট্ট লেখা। —সেবারে পুরাতন পাটলীপুত্রেরও অনেক জায়গা ঘুরে দেখেছিলেন,

মনে আছে।

পাটনা ছেড়ে ওঁরা রওনা হলেন কাশীর দিকে। ঐ একই স্কেচবুকে স্কেচ রয়েছে —গঙ্গার পুলের ওপর থেকে প্রথম কাশী-দর্শন; —বেণী-মাধবের ধ্বজা ইত্যাদি দেখা যাচ্ছে।

কাশী গিয়ে ওঁরা উঠতে চেষ্টা ক'রেছিলেন প্রিয়বাবুরই এক বন্ধুর বাড়িতে। এই বন্ধুটি বাঙ্গালী; পোস্ট্যাল অফিসার; গরীব লোক। এঁরা সহসা দুই মূর্তি একা থেকে নামছেন, তাঁরই বাড়ির সীমানায় —এই দৃশ্য দেখামাত্র বোধহয় ভদ্রলোকের মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে উঠেছিল। তিনি ঝাঁপিয়ে পড়ে, ঝিকে মেরে বউকে শেখাতে লাগলেন। তেড়েমেড়ে গিয়েই, তিনি হুজমক্কা গাড়ীভাড়া নিয়ে, গাড়োয়ানের সঙ্গে অনাবশ্যক চেঁচামেচি শুরু ক'রে দিলেন। কিন্তু, তাঁর এই অতিথি-বিদায়ের ছলনা এঁদের কাছে তক্ষুণি ধরা পড়তেই, উভয়ের শিল্পিমনে লজ্জা এলো —বেগতিক দেখে, ওঁরা একা ঘুরিয়ে লাকসায় রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রমে চলে গেলেন।

১৯০০ সাল থেকেই কাশীতে রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রমের কর্মসূচী আরম্ভ হয়েছিল। ১৯০৮-এর গোড়ায় সেবাশ্রম-তৈরীর কাজ অল্পই এগিয়েছে। এই ১৯০৮ সালেই মিশনের প্রথম প্রেসিডেণ্ট স্বামী ব্রহ্মানন্দ এর ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। ওঁরা যখন যান, শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দির তখন তৈরী হচ্ছিল। বারাণ্ডাগুলো ফিনিশ হয়ে গেছে। চন্দ্র মহারাজ তখন ওখানকার কর্তা। বাতে পড়েছিলেন তিনি। তখন তাঁর পা ফুলেছিল। তিনি প্রিয়বাবুকে দেখেই খুব খুশী হয়ে উঠলেন।

খাওয়া-দাওয়ার পরে, ওঁরা সহর বেড়াতে গেলেন। বিশ্বনাথ দর্শন করলেন। দশাশ্বমেধ-ঘাট দেখলেন। বেণীমাধবের ধ্বজায় চড়লেন। তখন ধ্বজা ছিল দুটোই। —এ-সবের স্কেচ্ আছে।

গঙ্গার ধারে নাগোয়ার দিকে একজন সাধুকে দেখলেন। —তৈলঙ্গ স্বামীর মতো পড়েছিলেন বালির ওপর। পুণ্যির লোভে কারা যেন ছাউনি ক'রে দিয়েছিল তাঁর ওপরে একটা। নৌকায় তুলে নিয়ে তাঁকে গঙ্গার বুকে বেড়িয়ে আনা হতো। একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন ওঁরা। 'আমি বললুম, —'মহারাজ, কুছ উপদেশ দীজিয়ে'। সাধু বললেন, —'ক্যা উপদেশ দুঙ্গা, রাম নাম করো'।

কাশী থেকে গঙ্গার ওপারে দেখতে গেলেন ওঁরা চৈৎসিংহের রামনগর। তারও স্কেচ্ আছে অনেক। পুরানো আমলের অনেক বাড়ি-টাড়ি সব দেখা হলো ওখানে।

সারনাথ দেখতে গেলেন টাঙ্গায় চেপে। সারনাথের স্কেচ্ করা আছে অনেক। ধামেকা স্তূপ, চৌখণ্ডি স্তূপ দেখলেন; দেখলেন মূলগন্ধকুটী বিহার। মূলগন্ধকুটীর তখনও নবরূপ হয়নি। তখন ওতে ফ্রেস্কো-পেন্টিং হয়নি। সারনাথে হিন্দু আর বৌদ্ধ দেবদেবী-মূর্তির বিপুল সংগ্রহ দেখলেন। চুণারের আর মির্জাপুরের বেলে পাথরের ওপর খোদাই-করা মূর্তি প্রায় সবই; আর ঐ একই পাথরের তৈরী সারনাথে অশোকের সিংহস্তম্ভটিও দেখলেন। কণিষ্কের অনুশাসনটি তখন দেখা হয়নি।

এদিকে, ঘুরে ঘুরে এঁদের শরীর তখন 'পড়ে' গেল। প্রস্রাব লাল। খুব কষ্ট হচ্ছিল। সেবাশ্রমে ফিরে এলেন। চন্দ্র মহারাজ অবস্থা বুঝে ওষুধের ব্যবস্থা করলেন। মহারাজের প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন মতো পাঁচ-ছটা আমলকী ভিজিয়ে সেই লাল জলটা ওঁরা খেয়ে নিলেন। আর সেই খেয়েই সঙ্গে সঙ্গে উপকার হলো।—এই সব টোট্‌কায় অটুট বিশ্বাস দেখেছি নন্দলালের বরাবর।

কাশীতে একজন আর্টিস্টের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল ওঁদের। তাঁর কাছ থেকে রং আর-তুলি তৈরীর পদ্ধতি নোট্ ক'রে নিলেন নন্দলাল। আচার্য নন্দলালের 'শিল্পচর্চা' বই-এ সেই আর্টিস্টের পরীক্ষিত পদ্ধতিগুলো প্রকাশ ক'রে দেওয়া হয়েছে। সে-সব পদ্ধতি হাতে-কলমে করে দেখা হয়েছে। উড়ো-কথা বা মাত্র শোনা-কথা নয় কোনওটাই।

কাশী থেকে গেলেন ওঁরা লক্ষ্ণৌ। উঠেছিলেন এক বাঙ্গালী ভদ্রলোকের বাড়িতে —প্রিয়বাবুর জানাশোনা। মাছ ভাত খাওয়া হলো তাঁর বাড়িতে; ভালো ঘর দিয়েছিলেন থাকতে।

লক্ষ্ণৌয়ের ইমামবাড়া দেখা হলো—সে তাজের অনুকরণে করা। মসজিদ দেখলেন, —কাঁচ-বসানো, মোজেয়ক্ করা। লক্ষ্ণৌয়ের বাজার সে দেখবার মতো। নবাবী আমলের রেশ ওখানে লেগে ছিল ওঁদের সেকালেও। দোকানে দোকানে ফুল আর ফুলের গোড়ে-মালা বিক্রী হচ্ছে। ইম্‌ব্রয়ডারির কাজই-বা কতো রকমের। লক্ষ্ণৌয়ের চিকনের কাজেরই তো নাম।

ইন্যামেলের কাজ-করা ছিলিম-কলকে সব বিক্রী হচ্ছিল। চীনেমাটির বার-কোশের ওপর কলাই বা মিনার কাজে সে কতো রকমের ছবি-আঁকা। রেকাবী-শরার মতোও বহু জিনিস ছিল। শরাগুলোকে আবার টাঙ্গিয়ে রাখা যায়। চুণারীর কাজ-করা তার ওপর। মোগল-আমলে এই সব শিল্পের উন্নতি হয়েছিল যথেষ্ট।

লক্ষ্ণৌয়ের ঠ্‌ংরি-ট্‌ংরি করিয়েছিলেন যিনি সেই নবাবের প্রাসাদ দেখা হলো। প্রাসাদের ভেতরে পাথরের একটা বাড়ি ছিল। সেটাতে আবার চোর-কুঠ্‌রি। গোলোকধাম, বাঘবন্দী খেলতেন নবাব সেখানে তাঁর বেগমদের সঙ্গে। বেড়ানো হতো গোমতী নদীর ধার দিয়েও।

ফৈজাবাদের ফোর্ট খুব বিখ্যাত। পাথরের দুর্গ। আর্কিটেক্‌চার সে অবাক হয়ে দেখবার মতো। ফোর্টের চারদিকে পরিখা। পরিখা বানিয়েছিল পাথর কেটে কেটে। পরিখার ধারে একটা উঁচু টিলার ওপর কামান ছিল একটা। সে-কামান তৈরী করেছিল দিশী মিস্ত্রীরা। প্রকাণ্ড কামান। বসানো ছিল চাকার ওপর। চাকা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কামান দাগতো। হিন্দু আমলের তৈরী সে-কামান। শত্রু আক্রমণ হলে রক্ষে করতো বহুদূর পর্যন্ত। নাম ছিল তার —'জয়দুর্গা'। সে কামানের স্কেচ করে দেখালেন নন্দলাল ১৯৬৫ সালের ২১এ এপ্রিল। লক্ষ্ণৌ পরে অনেকবার গিয়েছিলেন তিনি। সে-সব কথা যথাসময়ে বলা হবে।

লক্ষ্ণৌ থেকে ও'রা গেলেন আগ্রা। আগ্রার ফোর্ট তখনই দেখা হয়নি। পাশ-টাশের হাঙ্গামা সে তখন ছিল অনেক। সে-হাঙ্গামা দেখে প্রিয়বাবু প্রথমটা চটে গিয়েছিলেন ভীষণ। ফলে, তখন ফোর্টটাই দেখা হলো না। দিল্লীর ফোর্টও দেখা হয়নি; ফতেপুরসিক্রীতেও তাই হলো।

আগ্রায় গিয়ে উঠেছিলেন এক বাঙ্গালী ভদ্রলোকের বাড়িতে। প্রিয়বাবু কি ক'রে যে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করলেন, মনে নাই। তাঁর অতিথি-শালায় ছিলেন ও'রা। বাঙ্গালাদেশের বাইরে সেকালে সঙ্গতিপন্ন যত বাঙ্গালী দেখেছিলেন, তাঁদের প্রত্যেকের ঘরেই একটা ক'রে অতিথিশালা ছিল। আর দুর্গোৎসব করতো প্রায় সব জায়গাতেই। আর তারা করে স্থায়ী কালীবাড়ির প্রতিষ্ঠা। শহরে ক'ঘর বাঙ্গালী থাকলেই প্রায় কালীবাড়ি করবেই। এগুলো প্রবাসী বাঙ্গালীর বারউয়ারি চণ্ডীমণ্ডপ আর কি

বাইরের অতিথিরা গিয়ে ঠাকুরের পুজো দিলে ঐ কালীবাড়িতেই থাকতে খেতে পায়। কিন্তু, প্রিয়বাবু পুজো দিলেন না। তবু বোধহয় ক'দিন ওখানে থাকা খাওয়া হয়েছিল। কিভাবে প্রিয়বাবু যেন ম্যানেজ করেছিলেন।

আগ্রার তাজমহল দেখা হলো। পরে ফোর্টও দেখেছিলেন। ফোর্ট খুব ইন্‌টারেস্‌টিং লাগলো ওঁদের। ওখানেই প্রতাপাদিত্যকে বন্দী ক'রে রাখা হয়েছিল। কিন্তু, ওপরতলা থেকে তিনি নিচে লাফিয়ে পড়েছিলেন। মানসিংহ বাঙ্গালা মুলুক থেকে ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন সেই মহাবীর দেশভক্ত ভুঁইয়া রাজাকে। ফোর্টের প্রাচীর থেকে তিনি তাঁর ঘোড়াশুদ্ধ নিচে লাফিয়ে পড়েছিলেন। ঘোড়া মরলো ; প্রতাপ নিজে বেঁচে পালিয়ে গেলেন।

সাহজাহানকে বন্দী ক'রে যে-ঘরে রাখা হয়েছিল, সে-ঘর ওঁরা দেখলেন। সে ঘরখানা যমুনার দিকে মুখ-করা। বারাণ্ডায় বের হয়ে পায়চারী করতে করতে তাজ দেখতেন সাহজাহান —যমুনার ওপারে। বয়েসকালে বৃদ্ধ বাদশাহ দেখতে পেতেন না দূরের জিনিস। সেইজন্যে কাঁচ বসানো হয়েছিল দেওয়ালে। তাতে ছায়া পড়তো তাজের। সেই ছায়া দেখতেন শিল্পী সাহজাহান অপলক চোখে।

অবনীবাবু 'সাহজাহানের অন্তিমশয্যা' ছবিতে যে-দৃশ্য এঁকেছিলেন, তারই অনুসরণ করে করে ওঁরা গেলেন জাহানারার ঘরে। জাহানারা সাহজাহানের কন্যা। জাহানারার ঘর থেকে একটি সুড়ঙ্গ-পথ চলে গেছে যমুনার দিকে। সহসা কোনও বিপদের আশঙ্কা ঘটলে পালিয়ে বাঁচার জন্যে। পরে, ঐ পথটা ব্যবহার হ'তো গুম্‌ খুন করার কাজে। কালচক্রের পরিবর্তনে বদলে গেল উদ্দেশ্য আর বিধেয়।

হাতীর লড়াই হতো নিচে। দুর্গপ্রাচীর থেকে দেখতেন বাদশাহ। যেখানে বসে দেখতেন সাহজাহান, সেটা একটা কালো কষ্টিপাথরের চৌকী, ঘষে ফিট্‌ করা ছিল। সে-রকম পাথর বড়ো একটা দেখা যায় না। পরে, রাজনগরে নন্দলাল ঐ রকম দুটো পাথর দেখেছিলেন। কেয়ারি করা ছিল সে পাথর দুটোতে। পরে, নন্দলাল শান্তিনিকেতনে আনতে চেয়ে পারেন নি আনতে সে পাথর দুটো। এখন সেগুলো এগ্‌ঝস্‌টেড্‌ হয়ে গেছে।

ঐ সময়ে ওঁদের শিল্পীচোখে সব চেয়ে ভালো লেগেছিল, অবনীবাবুর আঁকা 'সাহজাহানের অন্তিমশয্যা' ছবির বারাণ্ডাটি। ছবি আঁকার সময়ে অবনীবাবু কিন্তু এই বারাণ্ডাটি দেখেননি। তবুও আর্টিস্ট মনে মনে চলে এসেছিলেন এখানে। আর তাঁর সেই দেখায়, আবার তখন শিল্পী অবনীবাবু যা দেখেছিলেন, এঁরা ঠিক সেটা দেখতে পেলেন না। সে মনের মাধুরীর নাগাল এঁরা পেলেন না। সে-দেখা খোদ শিল্পিগুরুর নিজস্ব। ঐ বারাণ্ডায় স্বয়ং সাহজাহান বসুন, না-বসুন, অবনীবাবুর দেখা এঁরা দেখতে পেলেন না। সে-চোখ এঁদের ফোটেনি তখনও।

আর একটা তাজ-নির্মাণের স্বপ্ন দেখেছিলেন সাহজাহান। সে-স্বপ্ন রূপ পাবার আগেই আটক করা হয়েছিল সম্রাটকে। শাহজাদী জাহানারার জন্যে স্বতন্ত্র 'তাজ' আর হলো না। বড়ো স্থপতি ছিলেন বাদশাহ সাহজাহান। অন্তিমশয্যাতেও বোধকরি সেই অতৃপ্ত তৃষ্ণা নিয়েই তিনি চোখের শেষ পলক ফেলেছিলেন।

প্রিয়বাবু আর নন্দলাল তাজমহল ভালো ক'রেই দেখেছিলেন। তাজমহল সম্পর্কে একটা কথা বেশ মনে আছে নন্দলালের। উত্তরভারত ভ্রমণ সেরে, প্রিয়বাবুকে নিয়ে নন্দলাল গিয়েছিলেন মুঙ্গের-খড়্গপুরে শ্বশুরবাড়িতে। শ্বশুর প্রকাশবাবু জিজ্ঞাসা করলেন,—'তাজমহল কেমন লাগলো?' নন্দলাল উত্তরে বললেন —'ভালো লাগলো না। আমি যা ভেবেছিলুম তার চেয়ে মাপে খাটো পড়লো। কিন্তু সাসারামের টুম্ব্ দেখে এমন তো মনে হয়নি। তাজমহল হলো মোগলাই, আর সাসারামের টুম্ব্ হলো ভারতীয়। তাজমহল হলো লিরিক; আর সাসারামের টুম্ব্ হলো এপিক্। তখন আমি মহিমবাবুর টাটকা শিষ্য। বলেছিলুম ঠিকই। ইদানীং দেখি, হ্যাভেল সাহেবও ঐ কথাই বলেছেন তাঁর Indian Architecture বই-এ। সাসারামের টুম্ব্কে তিনি তাজমহলের চেয়ে বড়ো করে দিয়ে গেছেন। পরে, কোণারক দেখেও আমার মনে হয়েছিল,—এ তাজমহলের চেয়ে বড়ো।

গৌড়ের চামকাটি মসজিদের গম্বুজের খিলান-করা ছাদ (vault) পাঠান-আর্কিটেক্‌চারের সব চেয়ে বড়ো দান। বৌদ্ধযুগের নালন্দাতেও একটা ঘর আছে —এমনি খিলান-করা ছাদের। প্রকাণ্ড vault —ইঁট দিয়ে গাঁথা। বিদেশীরা রটিয়েছিল, ভারতীয়েরা vault তৈরী করার কৌশল

জানতো না। কিন্তু, সেটা যে ডাহা মিথ্যে কথা, তা প্রমাণ হয়ে গেল। এদেশে পাঠান-আর্কিটেক্চারের ওপর বৌদ্ধ-আর্কিটেক্চারের যথেষ্ট প্রভাব পড়েছিল। পাঠান-আর্কিটেক্চার ঠিক স্যারাসেনিক বা প্রাচীন আরবের নয়; ওটা ভারতবর্ষেরই জিনিস। 'কালবুথ' (arch) শব্দটা সংস্কৃত-মূল 'কীলক' শব্দ থেকে এসেছে। খিলানের মাঝখানে যে সাপোর্ট্ থাকে, তার ওপরে ভার চাপিয়ে চাপিয়ে সব গাঁথা হয়।'

আগ্রা থেকে ওঁরা মথুরা গেলেন। ওখানে পুরাতন শহর দেখলেন। দাঁড়ানো বুদ্ধমূর্তি দেখেছিলেন। মথুরায় দুটো মজার ব্যাপার ছবির মতো মনে আছে নন্দলালের।—যমুনার জলে বড়ো বড়ো কচ্ছপ ভাসছে। আর গাছের বাঁদর নিশ্চিন্তে বসে আছে জলের সেই কচ্ছপের পিঠের ওপর। কাছিমের পিঠে বসে বসে বাঁদরে খাবার খাচ্ছে—নির্ভাবনায়, মনের আনন্দে। এই ছবির স্কেচ্ তিনি ক'রে দিলেন ১৯৬৫ সালের ১৩ই এপ্রিল।

মথুরায় ধর্মশালায় উঠেছিলেন ওঁরা। রান্না-বান্না করতেন নিজেরাই। একদিন সকালে নন্দলাল বাজার থেকে আনাজ-টানাজ কিনে নিয়ে ডেরায় ফিরছেন, হঠাৎ একটা বাঁদর গাছ থেকে ধপাস্ ক'রে তাঁর কাঁধের ওপর পড়ে, মুলো-টুলো কতকগুলো থলে থেকে কেড়ে নিয়ে লাফিয়ে পালিয়ে, আবার গাছের ডালে ঝুলে পড়লো।

মথুরা থেকে ওঁরা গেলেন বৃন্দাবন। বৃন্দাবন গিয়ে কৃষ্ণদর্শন করা হলো। বাঙ্গালী অনেক বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী তখন ওঁরা দেখেছিলেন ওখানে। যমুনা-পুলিন দেখলেন, বেড়ালেন। রাধাগোপীজনবল্লভের মন্দির দেখলেন। গোবিন্দজীর পুরাতন মন্দির দেখলেন, অতি চমৎকার। মদনমোহনজীর পুরাতন মন্দির দেখা হলো। লালাবাবুর মন্দিরেও ঘুরে এলেন। শেঠের ঠাকুরবাড়ি দেখলেন। সাহাজীর মন্দিরে শ্বেতপাথরের পাকানো থামগুলো খুব ভালো লেগেছিল। শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, গিরিগোবর্ধন, বংশীবট—কিছুই দেখতে বাদ দেননি। এ ছাড়া, ভরতপুরের রাজার সমাধিমন্দির, চৈতন্যদেবের সাধন-কুটির, অদ্বৈতবট, রঘুনাথ দাস গোস্বামীর সমাধি, নরোত্তমদাসের সমাধি, জীব গোস্বামী আর কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর সমাধি, গোপাল ভট্টের সমাধিস্থান, চৌষট্টি মহন্তের সমাজ—সবই সেবারে দেখেছিলেন ওঁরা। গোবিন্দজীর পুরানো মন্দির মীরাবাঈএর আমলের তৈরী—ভারী ভালো লেগেছিল

ওঁদের।

বৃন্দাবন থেকে ওঁরা গেলেন দিল্লী। পুরাতন দিল্লী—ইন্দ্রপ্রস্থ। একটা সরাইয়ে উঠলেন গিয়ে। —সে খানিকটা হোটেলের মতন। দু'একদিন ছিলেন সেখানে। প্রিয়বাবুর খরচপত্র অবশ্য প্রথম থেকে সবই চালাচ্ছিলেন —নন্দলাল নিজেই। দিল্লীতে গিয়ে যমুনা নদীর ধার দিয়ে বেড়াতেন ওঁরা প্রায়ই। কুতুবমিনার দেখলেন। লালপাথরের আটকোনা প্রাসাদ—'সেরমণ্ডল'। এরই সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে হুমায়ুনের মৃত্যু হয়েছিল। —সে-ছবি নন্দলাল এঁকেছিলেন কলকাতায় ফিরে এসে আর্টস্কুলে।

জয়পুররাজ জয়সিংহের পুরাতন অব্‌জারভ্যাটরি দেখলেন। সে 'যন্তর মন্তর' অতি অদ্ভুত ব্যাপার। সূর্যঘড়ি দেখলেন। প্রকাণ্ড পাথরের একটা হাফ্‌-সার্কেল - দাগ টানা আছে তাতে নানারকম—দিন, মাস, বৎসর, রাশি-চক্র সব টের পাওয়া যায় তা' থেকে। সেই মানমন্দির দেখা হলো। দিল্লীর ফোর্টও দেখা হয়েছিল সেবারে। প্রিয়বাবু শেষ মেষ পাস্‌ যোগাড় করতে পেরেছিলেন কিভাবে যেন।

দিল্লী থেকে ফেরবার পথে ওঁরা এলাহাবাদে নেমেছিলেন। প্রয়াগের ত্রিবেণী-সঙ্গমে স্নান করেননি নন্দলাল। দৃশ্য দেখেছেন। ওখানে মাথা মুড়োবারও কল্পনা জাগেনি মনে। গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমটা অদ্ভুত লাগলো —বিশেষতঃ রঙ্গের ঘটা। ফোর্টের ভেতর সরস্বতীর মুখটা দেখা হয়নি।

এলাহাবাদ থেকে সাসারামের টুম্ব্‌ দেখে ওঁরা এলেন গয়ায়। গয়ায় এসে উঠলেন এক জমিদার-বাড়িতে। দেউড়িওয়ালা বাড়ি। প্রিয়বাবু আর নন্দলাল উভয়ে মিলে রান্নাবাড়া করে খেতেন। মাছ-টাছ বাজার থেকে কিনে এনে রান্না করতেন। জলখাবারের জন্যে নিম্‌কি-টিম্‌কি বানিয়ে নিতেন। এই বিষয়ে নন্দলালের হাতে-কলমে জ্ঞান ছিল যথেষ্ট। কিন্তু একদিন তাঁর পাটে ভুল হয়ে গেল। করেছেন কি, ময়দার সঙ্গে ময়েন ঘি না-দিয়ে, দিয়েছেন পাতিনেবুর রস। ফলে, হলো কি, ময়দার টুকরোগুলো সব জড়ো হয়ে আবার পুনর্মূষিক অর্থাৎ সেই লেচির মতনই হয়ে গেল। নিম্‌কি খাওয়া সেদিন ললাটে আর ঘটলো না।

বিষ্ণুপাদপদ্মে পিণ্ড দিলেন নন্দলাল। মা, নিমাই, অমৃত, অমৃতের স্ত্রী, দিদিশাশুড়ী যাঁরা তখন স্বর্গত হয়েও তাঁর স্মরণে ছিলেন, সবারই নামে নামে

পিণ্ডি দিয়ে দিলেন। এদিকে, পিণ্ডি দিতে গিয়ে বিষ্ণুপাদপদ্মে হাত দিয়ে নন্দলাল দেখলেন, সেখানে দুটো দাগের মতো রয়েছে। —গয়াসুরের মাথায় পাথরের ওপর পায়ের দাগ। নন্দলালের মনে হলো, বিষ্ণুর মূর্তি উৎকীর্ণ করা ছিল ; কিংবা, সত্যিই দুটো প্রাগৈতিহাসিক পায়ের ছাপ।

এই বিষ্ণু-মন্দিরে বাঙ্গালার রঘুনাথ শিরোমণি পিণ্ড দিতে গিয়ে পিণ্ডদান করেননি। পাণ্ডাদের সঙ্গে গোলযোগ হওয়ায় বলেছিলেন, —'এখানে পুজো করবো না'। মন্দিরের বাইরে গিয়ে পুজো করেছিলেন। রঘুনাথ এদিকে ভাবলেন, গয়াসুরের মাথার পরিধি সে অনেক, —প্রায় কয়েক মাইল জুড়ে হবে। কাজেই মন্দিরের বাইরে পুজো করাই ঠিক করেছিলেন তিনি। ন্যায়শাস্ত্রমতে তাঁর আচরণে ভুল হয়নি। শ্রীচৈতন্যদেব ঐ বিষ্ণুপদ পুজো করেছিলেন। পরমহংসদেবের বাবাও পুজো করেছিলেন। সেইজন্যেই শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম হয়েছিল —গদাধর।

গয়া থেকে রামনগর পাহাড় দেখতে গেলেন ও'রা। সেই পাহাড়ে সীতাদেবী দশরথকে পিণ্ড দিয়েছিলেন। বালির পিণ্ড তৈরী ক'রে দান করেছিলেন সীতাদেবী।

মৃত দশরথ পরলোক থেকে হাত বাড়িয়ে পুত্রবধূর দেওয়া সে-পিণ্ড গ্রহণ করেছিলেন। সীতা নিজেও কিছু নিলেন, শিবকেও দিলেন। কিন্তু, তুলসীবিহীন পিণ্ড অচল। রামশিলায় তুলসী-চন্দন পাওয়া যায় না। শিব অহিংস তুলসীর খোঁজে কুরুক্ষেত্র পৌঁছলেন। তুলসী না-পেয়ে বৃথা ঘোরাঘুরি করেন। —এই সময়ে লিঙ্গ-মাহাত্ম্যবিষয়ক পুরাণ 'লিঙ্গখণ্ড'টা নন্দলালের ভালোভাবে পড়া ছিল। সেইজন্যে খুব ভালো লাগলো এ্যাসোশিয়েশন্‌টা। পুরাতন কাহিনীর স্থানপরিবেশে সব মিলিয়ে ভারতশিল্পী নন্দলালের হিন্দুমনে গভীর দাগ কেটে গেল। তাঁর স্কেচবুকে (সংখ্যা ১৮) দেখছি, আঁকা রয়েছে —'গয়ার উপরে রামনগরে'র স্কেচ্‌।

গয়ায় একটা মজার ঘটনা ঘটলো। একদিন রাস্তায় যেতে যেতে ও'রা দেখলেন, —জনাকয়েক কন্‌স্টেব্‌ল্‌ মিলে একটা ছেলেকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে —কোমরে দড়ি দিয়ে বেঁধে। এই দৃশ্য দেখে ও'রা জিজ্ঞাসা করলেন —'ক্যা হুয়া'? পুলিশ ঘটনাটা বললে। প্রিয়বাবু তাদের বিবরণ শুনে বললেন, —'তুম্ শুনা হৈ, য়া, দেখা হৈ'? তারা কথাটা গ্রাহ্য করলে

না। বললে, —'যাইয়ে আপলোগ'। উত্তর শুনে প্রিয়বাবু চটেছেন। গম্ভীর হয়ে বললেন, —'আচ্ছা, যাও'। পুলিশের দল এগিয়ে এগিয়ে চলেছে, আর এঁরা যাচ্ছেন পিছুপিছু। হঠাৎ পিছন থেকে দড়াম্ ক'রে এক লাথি মেরে দিলেন একটা কনস্টেবলের পায়ে —আমাদের এই কাঠি-সাহেব প্রিয়বাবু। বচসা লেগে গেল এই সহসা আক্রমণে। কিন্তু প্রিয়বাবুকে যুক্তিতে অঁাটতে পারলো না :—'তুম্‌লোগ্ দেখা নাহী, শুনা ভী নেহী, কোন্ মারা'। —ফলে, তর্কে হেরে তারা ছেড়ে দিলে ছেলেটাকে। ছেড়ে দিয়ে, চেঁচামেচি করতে করতে ভেগে গেল।

বুদ্ধগয়ায় গিয়ে বুদ্ধমন্দির দেখলেন। বোধিদ্রুম দেখলেন। সে-অশ্বত্থ বৃক্ষের বয়েস অনেক। অশোক এখানে বিহার নির্মাণ করে, পাথরের রেলিং দিয়ে ঘিরে দিয়েছিলেন। পাথরের এই রেলিং খুব পুরানো। ভারতবর্ষের সব চেয়ে পুরাতন শিল্পকলার নিদর্শন বুদ্ধগয়ার এই রেলিং-এর ওপর রয়েছে। —নানা মানুষের মূর্তি, পশুমূর্তি, জাতকের গল্প, গাছ-গাছড়া আর প্রাচীনতম সর্পপুজার ইতিহাস —এই রেলিং-এ খোদাই করা আছে।

উত্তরভারতের শিল্পতীর্থ ঘুরে গয়া থেকে গেলেন ওঁরা শ্বশুরবাড়ি মুঙ্গের-খড়্গপুরে। নন্দলালের শ্বশুর প্রকাশবাবু জামাতার আগমনের খবর পেয়ে খাতির ক'রে টম্‌টম্ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন বরিয়ারপুর স্টেশনে। জামালপুর থেকে টানেল্ পার হয়ে বরিয়ারপুর আসতে হয়। স্টেশনে নেমেই ওঁরা দেখলেন, টম্‌টম্ হাজির। দু'জনে উঠে পড়ে, পৌঁছে গেলেন যথাস্থানে। সেবারে শ্বশুরবাড়িতে খাওয়া-দাওয়া, খাতির হয়েছিল যথেষ্ট। সরকারী পুরস্কারপ্রাপ্ত জামাতার খাতির হয়েছিল যথাযোগ্যই।

প্রিয়বাবুকে নিয়ে ওখানে নানান জায়গা ঘুরে দেখালেন নন্দলাল। লেকে ঘোরা হলো বোটে ক'রে। হট্-স্প্রীং-ও দেখে এলেন। মনী নদীর ওপারে সাহজাহানের আমলের মসজিদটিও দেখিয়ে আনলেন। চমৎকার মসজিদ। মন্দিরের ভিতের ওপর বোধহয় তখন মসজিদ বানানো হয়েছিল। এখন আর পয়সা নাই চুনকাম করে রাখার।

নন্দলালের ১৯০৭-৮ সালের ডায়েরি (সংখ্যা ৪০) থেকে দেখছি, —প্রিয়নাথ সিংহের সঙ্গে উত্তরাপথ, খড়্গপুর, গাংটা নিয়ে স্কেচ্ অনেক করা হয়েছে। গাংটার জঙ্গলের পথে জঙ্গলে দেবতার স্থান —যেখানটায়

পুজো দিতে হয়; নইলে, বাঘে খাবার ভয় আছে। বাতাসা, দুধ, যা-হয়-কিছু দিতে হয়; নইলে, ভয় থেকেই যায়।

কথায় কথায় নন্দলাল বললেন, —ওঁদের দেশে জেলেরা যখন সমুদ্রে সেলেমাছ ধরতে যায় তখন দক্ষিণরায়ের পুজো ক'রে তবে যায়। সুন্দরবনে সুন্দরী-কাঠ কাটতে গেলে, হোগলা কাটতে গেলে, দক্ষিণরায়ের পুজো ক'রে তবে নৌকো ছাড়ে। সেলেমাছ হলো খুব বড়ো ভোলা বা তপসে মাছের মতো। সেলেমাছ ধরে আনতে আনতে প্রায় সব পচে যায়। হোলা নৌকোয় ক'রে, —নৌকোয় বেঁধে সেই সব মাছ আনতো। —মাল চাপিয়ে যখন নৌকো ছাড়তো তখন বলতো, —'দরিয়ার সাত পীর বদর বদর'। ব্যস্, ওতেই নির্ঝঞ্ঝাটে তীরে এসে তরী ভিড়তো বরাবর।

বাঘের দেবতা দক্ষিণরায়ের ছবি এঁকেছেন নন্দলাল ১৯৫৯ সালে। দক্ষিণরায়ের সহচর দেবতা ঘোড়ায়-চাপা কালুরায়ের ছবিও এঁকেছেন তিনি। দক্ষিণরায়ের সহচরী দেবী শীতলাও রূপ পেয়েছেন নন্দলালের হাতে অপরূপ ভঙ্গীতে। রাসভবাহনা শীতলা বসে আছেন বসন্তের ঝুড়ি নিয়ে। অর্ধ-অঙ্গে তাঁর অগ্নিশিখা, অর্ধ-অঙ্গে সোম-বর্ষণ ধারা। এক হাতে স্বর্ণসম্মার্জনী, অপর হাতে বরাভয়। মস্তকে তাঁর অর্ধচন্দ্র —কুলোর আকারে।

—এই সব দেবদেবীর রূপ কল্পনা করেছিলেন ১৭২৩ খৃস্টাব্দে কবি হরিদেব চক্রবর্তী। বাড়ি ছিল তাঁর ঝোড়হাটে। নবরূপে নন্দলালের আঁকা এই ছবিগুলি সব প্রকাশ করা হয়েছে বিশ্বভারতী থেকে ১৯৬০ সালের এপ্রিল মাসে। হরিদেবের রচনাবলীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছে এই ছবিগুলি। হরিদেবের রায়মঙ্গল আর শীতলামঙ্গলের গান আজও গেয়ে থাকে ঝোড়হাট-অঞ্চলের লোকেরা। নন্দলাল বললেন, —'এখনও রোমাঞ্চ হয় এই সব দেব-দেবীর কীর্তিকলাপ স্মরণ হ'লে'। ঝোড়হাটে নিত্যগোপাল পণ্ডিতের পাঠশালায় পড়তে যেতেন নন্দলাল তাঁর ছেলেবেলায়, সে-কথা আগেই বলা হয়েছে।

উত্তরভারত ভ্রমণের সময়ে কতকগুলি বাসন-পত্রের ডিজাইনের অরিজিন্যাল্ সোর্স্ খোঁজা হয়েছে নেচার্ থেকে। তারও সব স্কেচ্ রয়েছে নন্দলালের কাছে। সেগুলির স্টাডি স্বতন্ত্রভাবে হওয়া দরকার।

মুঙ্গের-খড়্গপুরের দক্ষিণে গাংটায় বেড়াতে এলেন একদিন। ওখানকার শিব —উঁচেনাথ। উঁচু পাহাড়ের গুহার ভেতর মন্দির। ওটা আগে ছিল বৌদ্ধদের। পরে, হিন্দুরা দখল ক'রে, শিব বসিয়েছিলেন। আগে ওপরে ওঠা যেতো। তখন ওঁরা উঠতে পারেননি। পাহাড়ের নিচেতলায় দু'তিনটে গুহা। সেখানে সাধুরা বসে ধ্যান-ধারণা করতেন।

নিচে শিবের মন্দিরে যখন ঘুরছেন, দেখতে পেলেন, শালগ্রাম-শিলা রাখা আছে ওখানে অনেক। প্রিয়বাবু চট্ ক'রে তার একটা তুলে নিয়ে পকেটে পুরলেন। পকেটে পুরে, হাসতে হাসতে নন্দলালকে বললেন, —'নাও না একটা, ও-সব কি আর হবে ; ভালো 'বেদামীক' পাথর'। স্বামীজীর ভক্ত প্রিয়বাবু ও-সব সংস্কার মানতেন না কিছু। কিন্তু, গোঁড়া হিন্দু-সন্তান নন্দলালের খুব আঘাত লাগলো মনে।

ইংরেজ আর মুসলমানদের ওপর খুব চটা ছিলেন প্রিয়বাবু। সেইজন্যে উত্তরাপথের ঐতিহাসিক অনেক জায়গা তিনি দেখেছিলেন অরুচির সঙ্গে —'তিতো'। ভালো খাওয়া-দাওয়ার মতো গান-টান গাওয়ারও অভ্যেস ছিল প্রিয়বাবুর। গলাও ছিল ভালো। তাঁর দরাজ গলার শ্যামাসঙ্গীত সবাই শুনতেন আগ্রহভরে। সেতারেও হাত ছিল তাঁর চমৎকার।

প্রায় একমাস ধ'রে পর্যটনের পালা শেষ করে, খড়্গপুর থেকে প্রিয়নাথ সিংহ চলে গেলেন কলকাতায়। নন্দলাল কিছুদিন রয়ে গেলেন শ্বশুরবাড়িতেই।

দক্ষিণভারত ভ্রমণ (১৯০৮) ॥

দক্ষিণভারত ভ্রমণের পার্টি হলো পাঁচজনকে নিয়ে। —শ্রীঅর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, তাঁর সহোদর অলীন্দ্রবাবু, ওঁদের এক ভগ্নীপতি প্রমোদবাবু, অর্ধেন্দ্রবাবুর পিসতুতো ভাই রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় আর ওঁদের সহযাত্রী নন্দলাল। এবারকার খরচপত্র সবই অর্ধেন্দ্রবাবুর। ওঁরই দাক্ষিণ্যে নন্দলালের এই দক্ষিণভ্রমণ। শিল্পী নন্দলালকে ভারতদর্শনে নিয়ে চলেছেন শিল্পরসিক অর্ধেন্দ্রকুমার। তিনি পেশায় ছিলেন হাইকোর্টের এ্যাড্ভোকেট। বড়ো এ্যাটর্ণী ছিলেন। দহরম-মহরম খুব। পরে, তাঁর ও-পেশা ছিল না।

কলকাতা থেকে রওনা হয়ে প্রথমেই গিয়ে উঠলেন ওঁরা পুরীতে। উঠলেন অর্ধেন্দ্রবাবুরই এক মক্কেলের ঘরে। উঠলেন এক বাড়িতে বটে, তবে ভিন্ন গোঠের ব্যবধান পীড়া দিতে লাগলো নন্দলালকে। খাবার আসন হলো ভিন্ন ঘরে, বাসন দেওয়া হলো খেলো। খটকা লাগলো মনে। কারণটা পরে বুঝতে পারলেন, উনি হিন্দু হলেও —শূদ্র ; আর বাকী ওঁরা হলেন বর্ণশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ। নন্দলাল মনে ভাবলেন, বুঝি লোকের বাড়িতে উঠে, সামাজিকতার জন্যে ঐরকম ব্যবহার করছেন। কিন্তু, না। ট্রেনেও ঐ। ওঁর খাবার বা কুঁজোর জল সবই অনাচরণীয় হয়ে রয়েছে। এমন-কি, ম্লেচ্ছ-স্পৃষ্ট বিস্কুট-টিস্কুটও কিছুমাত্র 'দাস কায়স্থের' হাত দিয়েও চলছে না। —মনটা বড়ো দমে গেল।

পুরী বহুবার গেছেন নন্দলাল। প্রথম গিয়েছিলেন স্কুলে পড়বার সময়ে তাঁর শিবপুরের এক বন্ধুর সঙ্গে। উঠেছিলেন তখন পাণ্ডাদের ঘরে। জগন্নাথের প্রসাদ-ভাত ওঁরা তখন রোজ আনতেন না। একদিন এনে, রেখে দিতেন। আর প্রত্যেক দিন নিজেরা ভাত রান্না ক'রে, তাতে মহাপ্রসাদ কিঞ্চিৎ ছেড়ে দিয়ে, হাঁড়ির সব ভাতটাই মহাপ্রসাদ ক'রে নিতেন। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে, ওঁরা হাঁড়ি তুলে রাখতেন শিকেয়। কিছু ভাত কোনওদিন হয়তো থাকতো ও-বেলার জন্যে। একদিন হয়েছে কি, কিছু ভাত শিকের হাঁড়িতে তুলে রেখে ওঁরা বেড়াতে গেছেন। ফিরে

এসে, খেতে গিয়ে দেখেন যে, ভাতের হাঁড়ি চাঁচপোঁছ। ওড়িয়া ঝি হাঁড়ি খেয়ে নিয়েছে। অথচ, ঝি-টি ছিল খুবই নিষ্ঠাবতী; জাতেও বোধ হয় উঁচু। কিন্তু, ক্ষেত্রস্থানে জাতিভেদের কথাটা তার মনে আসেনি। সম্ভবতঃ পেটের জ্বালাতেই-বা। কিংবা, বিনা কম্‌প্লেক্সে, জাতিভেদটাকে সে বিত্ত ও চিত্তবানের বিলাসিতা বলেই ভেবে নিয়েছিল।—

এঁদের সঙ্গে গিয়ে এঁদের পিছুপিছু পুরীতে এবারেও নানা দ্রষ্টব্য স্থান দেখলেন নন্দলাল। জগন্নাথদেবের মন্দির, যাজপুরের সপ্তমাতৃকা-মন্দির, ওখানকার সভাস্তম্ভ সব দেখা হলো। ওখানে বরাহাবতার রয়েছেন —একখানি পাথর কুঁদে করা। তাঁর গায়ে দে-দেবতার মূর্তি কতো। কিন্তু, ব্যাপার হলো এই, ওঁরা নিজেদের মধ্যে ওখানকার পুরাতত্ত্ব নিয়ে খুব ডিস্‌কাশ্‌ন্‌ করছেন মশগুল হয়ে; মাঝে মাঝে ছিটেফোঁটা বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন নন্দলালকে।

পুরী থেকে ওঁরা গেলেন ভুবনেশ্বর। ভুবনেশ্বরের মন্দির দেখলেন। প্রধান মন্দির দেখা হলো। গৌরী-মন্দির, সিদ্ধেশ্বরী-মন্দিরও দেখলেন। বিন্দুসাগর দেখা হলো। বেতাল-দেউল অতি অপূর্ব। স্থাপত্য অতি সুন্দর। অলঙ্করণের প্রাচুর্য।

খণ্ডগিরি উদয়গিরি দেখা হলো। দু'দিকে পাহাড়, মাঝখান দিয়ে রাস্তা। দক্ষিণের পাহাড় উদয়গিরি। ব্যাঘ্রগুম্ফা, হস্তিগুম্ফা, রাণীগুম্ফা দেখলেন। খণ্ডগিরির খাড়া পাহাড়। এখানে বৌদ্ধযুগের নানা মূর্তি রয়েছে। পাহাড়-চূড়ায় মন্দির —একটা জৈন-মন্দির খণ্ডগিরি-উদয়গিরিতে করা হয়েছে —সে-সব ওঁরা বোঝালেন। ওখানে পাথরের একটি রিলীফ্‌-ওয়ার্ক্‌ ছিল; তার রেপ্লিকা আর্টস্কুলে আনা হয়েছিল। তার ফোটো আছে শান্তিনিকেতন-কলাভবনে। —সে পদ্মের একটি স্ক্রোল্‌।

পুরী থেকে খুর্দা জংশনে মাদ্রাজের গাড়ী ধরে ওঁরা সোজা মাদ্রাজ গিয়ে পৌঁছলেন। ওঠা হলো এক চেট্টির বাড়িতে। তিনি ব্রাহ্মণ নন; কিন্তু খুব ধনী। পেশায় সড়ক-বিশেষজ্ঞ; দোতলা বাড়ি। যত্ন-আত্তি করলেন যথেষ্ট। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করলেন জোর। কিন্তু, বাড়িতে পায়খানার ব্যবস্থা বড়ো শোচনীয়। পায়খানা বলতে আলাদা কোনও ঘরের ব্যবস্থা নাই; মূল বাড়িরই একখানা ভালো ঘর ঐ-কর্মে ব্যবহার হয়।

'সে একটা কাণ্ড। যে যেখানে পেয়েছে কর্ম করেছে। সে-ঘরে সবার আগে গিয়ে ঢুকতে না-পারলে বিপদ। কারণ যত্রতত্র ময়লা স্তূপ করা আছে। অতি বিসদৃশ ব্যাপার। বড়ো দুঃখে গণেন মহারাজের কথা মনে পড়তো : একটা জাতকে চেনা যায় তার পায়খানার সংস্থান দেখে। মিশনে তিনি উন্নত ধরনের পায়খানার ব্যবস্থা করেছিলেন। মার্বেল-পাথর দিয়ে বাঁধাই ক'রে প্রশস্ত জায়গায় পায়খানা-ঘর করিয়েছিলেন তিনিই। —দক্ষিণে কিন্তু দেখলুম, একই ব্যাপার প্রায় সব জায়গাতেই। কঠোর জাতিভেদের সম্মান দেখা গেল না কোনোখানে। মার্বেল-পাথরে বাঁধানো পায়খানার কল্পনাও করা যায় না। ওখানকার দুঃখের স্মৃতি পায়খানার এই বিশ্রী নোংরামি জীবনে আজও ভুলতে পারিনি। অথচ, এদিকে তাঁরা শুদ্ধাচারী কঠোর উচ্চবর্ণ। বেশ-ভূষো, আদব-কায়দা বেশ সুন্দর। সেইজন্যে তুলনায় ওদেশে পায়খানার এই দুরবস্থা খুব বেশী করেই চোখে পড়লো।' —বললেন নন্দলাল ১৯৬৫ সালের ১০ই মার্চ।

মাদ্রাজে খাবার ব্যবস্থা হলো আমাদের দেশের মতো আঙ্গোট-কলাপাতায়। তবে, সে অবশ্য ছুৎমার্গ বাঁচিয়েই। নন্দলাল আর একবার মাদ্রাজ গিয়েছিলেন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সিংহল থেকে ফেরবার সময়ে। সে-কথা যথাসময়ে বলা হবে। সেবারে গিয়ে ওদেশে পায়খানার ব্যবস্থার কিছু উন্নতি দেখেছিলেন। —একটা লম্বা পাঁচিল; তাতে ধাপ বাঁধা। দেখে দেখে কাজ সারতে হয়। চীনেও ঐ ব্যাপার। ভোরবেলা কোথাও গিয়ে প্রাতঃকৃত্য সেরে আসতেন। মাদুরাতেও একই অবস্থা। প্রকাণ্ড একটা জায়গায়, প্রেসিং-ডোর দিয়ে দিয়ে বিরাট একটা লাইন। অবশ্য এটা হলো ওখানকার সরাইখানার কথা। সরাইয়েই উঠেছিলেন মাদুরায়। সে-কথা পরে বলছি।

মাদ্রাজে 'পার্থসারথি'র মন্দির দেখলেন। এই বিষ্ণুমন্দির দ্রাবিড়-স্থাপত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। দক্ষিণ দেশের মন্দির-পরিকল্পনায় একটা সাধারণ ছাঁদ আছে। —খুব উঁচু গোপুরম্ অর্থাৎ তোরণ; প্রাঙ্গণে খুব বড়ো টেপাকুলম্ বা সরোবর আর তার মধ্যে বিহার-মন্দির; আর সোনা-মোড়া ধ্বজস্তম্ভ বা সোনার তালগাছ —এ-সব যেন প্রত্যেক মন্দিরে থাকবেই। অন্ধকার গম্ভীরায় পার্থসারথির চতুর্ভুজ নারায়ণ-মূর্তি অতি

মনোহর। নন্দলাল 'পার্থসারথি'র যে-সব ছবি এঁকেছেন তার প্রেক্ষাপটে এই সব মূর্তির আদল আছে। মন্দির-প্রাঙ্গণের এক চাতালে বহু ভক্ত সাধকের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা রয়েছে। মণ্ডপের একধারে নবগ্রহের প্রতিমূর্তি দেখা গেল। গর্ভ-মন্দিরে পার্থসারথি, রুক্মিণী, বলরাম, সাত্যকি, সঙ্কর্ষণ আর অনিরুদ্ধের বিগ্রহগুলির গঠন-পারিপাট্য অতি সুন্দর আর প্রাচীন। পার্থসারথির মূর্তিটি কালো পঞ্চ-ধাতুর তৈরী। এই মন্দির-প্রাঙ্গণে শ্রীরঙ্গনাথম্, শ্রীরামচন্দ্র আর বরদরাজ স্বামীর মন্দিরগুলোও খুব পুরাতন।

ময়লাপুর পল্লীতে কপালেশ্বরম্ শিবমন্দির দেখলেন। এটা স্মার্তদের মন্দির। ওখানে বেদপাঠ শুনেছিলেন। দক্ষিণী বৈদিক ব্রাহ্মণকে বলা হয় 'শ্রোত্রিয়ন্দার'। বেদপাঠের জন্যে এঁদের পূর্বপুরুষেরা হিন্দুরাজাদের কাছ থেকে নিষ্কর ভূসম্পত্তি পেয়েছিলেন।

মাদ্রাজ থেকে ওঁরা চিঙ্গলীপুট-পক্ষিতীর্থ আর মহাবলিপুরম্, কাঞ্জিভরম্-, ভেলুপুরম্, চিদম্বরম্, মায়াভরম্, কুম্ভকোণম্, তাঞ্জোর, ত্রিচিনাপল্লী, মাদুরা, টিনিভ্যালী, কেপ-কমরিন্, রামনাদ, রামেশ্বরম্, ধনুষ্কোটী, পদুকোটাই, শ্রীরঙ্গম্ বৃদ্ধাচলম্ ঘুরে, ফের মাদ্রাজে ফিরে কলকাতা এসেছিলেন।

সেবারে মাদ্রাজ থেকে ওঁরা গেলেন মহাবলিপুরম্। নৌকোয় ক'রে গেলেন ক্যানেল দিয়ে। নন্দলাল মহাবলিপুরম্ গেছেন দুবার। সেবারে মাদ্রাজ শহর থেকে সাত মাইল দূরে পাপঞ্চৌরী-ঘাটে নৌকোয় চেপে খাল বেয়ে তিরিশ মাইল গিয়েছিলেন। নৌকো তীরে লাগলো না। একহাঁটু জলের ওপরেই ওঁরা নেমে পড়লেন। ওখানে ডাব খাওয়া হলো —নাম 'সোনামুখী' —দাম এক পয়সায় একটা। বালির ওপর দিয়ে কিছু-দূর গিয়েই মহাবলিপুরমের রথ-মন্দির দেখতে পেলেন।

হাজার হাজার বছরের পুরাতন সব বিশাল ও বিরাট ভাস্কর্য আছে ওখানে। অর্জুনের তপস্যা আর সেই সংক্রান্ত ছবি সব রিলীফে উৎকীর্ণ করা আছে পাহাড়ের গায়ে। সমতল চটানের ওপর চল্লিশ-পঞ্চাশ ফিট্ পর্যন্ত উচু নানা আকারের পাহাড় —সব খোদাই করা। উচু (deep) রিলীফ্-ওয়ার্কও করা হয়েছে all-round মূর্তির মতো। উৎকীর্ণ করা হয়েছে অতি গভীর ভাবে। সে-সব অতি অপূর্ব খোদাই শিল্প।

সমুদ্রের ধারে কিছু মন্দির আরও আছে। এক-পাহাড়ে তৈরী —

এক-শিলা বা monolithic মন্দির ; —'রথ' বলে ওখানকার লোকে। যুধিষ্ঠির অর্জুন, সহদেব, দ্রৌপদী. গণেশ, ধর্মরাজ —এঁদের নামে সব রথ রয়েছে। দ্রৌপদীর রথটি ঠিক্ বাঙ্গালা দেশের খড়ের ঘরের চালের মতো দেখতে। ভীমের রথ বিরাট 'দো-চালা ছতরির মতো'। ধর্মরাজের রথের আদল কোণারকের সূর্যমন্দিরের অনুরূপ।

একটি বৃষ শুয়ে আছে —প্রকাণ্ড সে প্রায় দশ বারো ফিট্ উচুঁ। —সেটিও তৈরী এক-পাথরে। কিরাত-অর্জুনের পাশেই রয়েছে বাঁদরের মূর্তি। একটা বাঁদর আর একটা বাঁদরের গা থেকে উকুন বেছে দিচ্ছে। সেই বাঁদর দুটোও উচুঁ হবে আট দশ ফিট্। —এই সব মূর্তি দেখে, নন্দলালের ধারণা হলো. সেকালে যেখানে যেমন যেমন পাথর পেয়েছিল, সেইরকম পরিমাপের মূর্তি সব কুঁদে কুঁদে চারদিক থেকে বের করেছিল।

অর্জুনের তপস্যার নিচেই রয়েছে ক'টা বড়ো বড়ো হাতী। বিরাট আকার সেগুলোর। সত্যিকারের হাতী যেমন সেই রকমের সাইজ সব। গভীরভাবে উৎকীর্ণ প্রকাণ্ড ব্যাপার। সেখানে বর্ষাকালে ঝর্ণার জল ঝরে। আর তলাতেই একটা প্রকাণ্ড চৌবাচ্চা। হাতীর পা বর্ষাকালে ডুবে যায়। মনে হয়, হাতীগুলো যেন জলে দাঁড়িয়ে আছে।

একটি পাহাড়ের চুড়োয় মন্দিরের একটি গোপুরম্ আছে। কাছেই ধর্মরাজের বিশাল সিংহাসন। পাহাড়ের গায়ে অনেকগুলি গুহাগৃহ রয়েছে। তার মধ্যে মহিষমর্দিনী-গুহা, কৃষ্ণলীলা-মণ্ডপ-গুহা, পঞ্চপাণ্ডব-গুহা. বরাহস্বামী-গুহা দেখলেন। এ-ছাড়া, গণপতি-মন্দির ও সাতটি প্যাগোডা দেখবার মতো।

মন্দিরগুলি রয়েছে একেবারে সমুদ্রের কিনার ঘেঁষে। কিন্তু, তখন ভেঙ্গে যাচ্ছিল সে-সব মন্দির। সমুদ্রের ঢেউ তার ওপর এসে আছড়ে পড়ছিল। খানিকটা চলেও গিয়েছিল সমুদ্রের মধ্যে। —অতো উঁচু জায়গায় অতো সব বড়ো বড়ো মূর্তি দেখে নন্দলালের খুব অদ্ভুত লেগেছিল। সেই প্রথম অভিজ্ঞতার স্মৃতি তাঁর শিল্পি-জীবনের ভূমিকায় বরাবরই যেন একটি সুদৃঢ় ভিত্তিভূমি রচনা ক'রে রেখেছিল।

মহাবলিপুরম্ থেকে প্রথমবার এলেন পক্ষিতীর্থে। সমতল ভূমি থেকে একটি পাহাড় খাড়া দাঁড়িয়ে। তার চুড়োয় 'বৈদ্যলিঙ্গেশ্বর' মহাদেবের মন্দির। ওখানেই পক্ষিতীর্থ। সেবারে ওঁরা পক্ষিতীর্থে যাননি। সিংহল থেকে

ফেরার পথে পক্ষিতীর্থ দেখেছিলেন নন্দলাল —সে-প্রসঙ্গ যথাসময়ে বলা হবে। সেবারে পক্ষিতীর্থের নিচে ও‍ঁরা রাত্রি কাটালেন। পাহাড়ের ঠিক নিচেই একজনের একটা দোতলা বাড়িতে রাত্রিবাস করা হলো।

মাদ্রাজী কনসার্ট শোনা হলো সেখানে। ও‍ঁদের অনুরোধে ঐক্যতান বাজালে তারা। —তবলা, ঢোল, বাঁশী, বেহালা সব মিলিয়ে বাজালে। খুব ভালো লেগেছিল —বললেন নন্দলাল। 'বাজালে সবাই মাথা নেড়ে নেড়ে —শুধু-গায়ে, লুঙ্গি-পরা লোকগুলি'।

চিঙ্গলীপুট জংশন স্টেশন থেকে ব্রাঞ্চ-লাইনে ও‍ঁরা গেলেন অতঃপর প্রাচীন তীর্থ কাঞ্চী বা কঞ্জীভেরাম্। উত্তরভারতের কাশীর মতো দক্ষিণ-ভারতের পুণ্যতীর্থ কাঞ্চী। শৈব ও বৈষ্ণবদের বহু মন্দিরে নগরটি পূর্ণ। কাঞ্চিপুরের দুটি ভাগ। —একটি শিবকাঞ্চি, অপরটি বিষ্ণুকাঞ্চি। শিব-কাঞ্চিতে শঙ্কারাচার্য বহুদিন বাস ক'রে বৌদ্ধ ও জৈন মতবাদ খণ্ডন ক'রে অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

শিবকাঞ্চিতে একাম্রেশ্বর আর শ্রীকামাক্ষী আম্মানের মন্দির দুটি প্রধান। দ্রাবিড় সংস্কৃতির প্রাচীনতম আভাস কাঞ্চিপুর নগরের ঐশ্বর্যের মধ্যে প্রকাশ হয়ে আছে। কাঞ্চিভরমের তাঁতীদের হাতযশ খুব। বাঙ্গালাদেশের শান্তিপুরের মতো এখানেও নানা রঙ্গের সুতো, কাপড় তৈরীর কেন্দ্র। আর যুগে যুগে তার খ্যাতি চলে আসছে।

একাম্রেশ্বর-মন্দিরটি একটি চারকোনা উঁচু পাথরের প্রাচীরের মধ্যে আছে। প্রাচীরের চারদিকে চারটি গোপুরম্; তোরণ খুব উঁচু ক্রমসূক্ষ্ম হয়ে তেরো তলা উঠেছে। তার গায়ে নানা দেব-দেবীর মূর্তি খোদাই করা রয়েছে। মন্দিরের ভিতর-দেওয়ালে 'মদনভস্মে'র একটি অপূর্ব মূর্তি করা হয়েছে। গোপুরম্ পেরিয়ে একটি বিশাল প্রাঙ্গণ, তার মধ্যে বিরাট সভামণ্ডপ। মণ্ডপের থামে নানা সূক্ষ্ম কাজ আর নানা মূর্তি করা। গর্ভীরায় মৃত্তিকার লিঙ্গমূর্তি। এখানে জল দিয়ে পূজা হয়না; হয় ফুল দিয়ে। দক্ষিণভারতে শিবের পাঞ্চভৌতিক লিঙ্গ পূজা হয়। এই শিবকাঞ্চিতে ক্ষিতিমূর্তি, জম্বুকেশ্বরে অপ-মূর্তি, তিরুবন্নমলয়ে তেজোমূর্তি. কালহস্তীতে বায়ুমূর্তি আর চিদম্বরণে ব্যোমমূর্তি

একাম্রেশ্বর মন্দির-প্রাঙ্গণে একটি পুরানো আমগাছ আছে; তার চারটি শাখায় কটু, তিক্ত, অম্ল ও মিষ্ট —এই চার রকম স্বাদের আম হয়। প্রবাদ

এই গাছে প্রত্যহ একটি ক'রে আম পাকতো, আর তাই দিয়ে শিবের ভোগ হতো। সেইজন্যেই এই শিবের নাম —'একাম্র'।

কামাক্ষী দেবীর মন্দিরে বৈদিক যন্ত্রের আকৃতিতে দেবীকে মূর্ত করা হয়েছে। প্রবাদ, শঙ্করাচার্য এই কামাক্ষী দেবীর পাদপীঠে অষ্ট-লক্ষ্মী-যন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মন্দির-প্রাঙ্গণে একটী ঘরে শঙ্করাচার্যের একটি প্রস্তরমূর্তি আছে। শঙ্করমূর্তির পদতলে ছ'জন দণ্ডীর করজোড়ে দাঁড়ানো মূর্তি।

শিবকাঞ্চীর আর একটি উল্লেখযোগ্য মন্দির কৈলাসনাথের। এখানে একটি অর্ধনারীশ্বর মূর্তি অভিনব আকৃতির। মূর্তির অর্ধাংশ নারীর আকৃতি —বীণাহস্তে বসে আছেন, আর অপর অংশ শিবের —বৃষের ওপর চেপে আছেন। —এই সব মূর্তি, বলা বাহুল্য, নন্দলালের মনে গভীরভাবে দাগ কেটে বসেছিল, এবং যথাসময়ে তাঁর তুলিতে অপরূপ রূপ নিয়েছিল। কচ্ছপেশ্বর মন্দিরটি শিবকাঞ্চীর মধ্যে। বিষ্ণু কূর্ম-অবতাররূপে শিবকে পুজো করছেন। কাঞ্চীতে চিত্রগুপ্তের মন্দির আছে ; দক্ষিণে আর কোথাও নাই। চিত্রগুপ্তের এক হাতে পুঁথি, আর অপর হাতে লৌহশলাকা। বৈশাখী পূর্ণিমাকে ও-দেশে 'চিত্র-পূর্ণিমা' বলে। এই সময়ে চিত্রগুপ্তের পূজা হয় সমারোহের সঙ্গে।

কাঞ্চীপুরমের পশ্চিম অংশে বিষ্ণুকাঞ্চী। বরদরাজ, বৈকুণ্ঠপেরুমাল, পাণ্ডারদূতর, অষ্টভুজা —এই সব নামে মন্দির আছে। শিবকাঞ্চীর তুলনায় বিষ্ণুকাঞ্চীতে মন্দিরসংখ্যা খুবই কম আর আয়তনে ছোট। এইজন্যে শিবকাঞ্চীকে 'বড় কাঞ্চী' আর বিষ্ণুকাঞ্চীকে 'ছোট কাঞ্চী' বলা হয়।

কাঞ্জিভরমে বিষ্ণুমন্দির ওঁরা সেবারে ভালোভাবে দেখেননি। একটি মন্দিরে চামড়ার একজোড়া প্রকাণ্ড জুতো রাখা ছিল। একবার ঠাকুরের আদেশ হয়েছিল, তিনি খালি-পায়ে থাকবেন না। পাণ্ডারা বললেন, —ঠাকুর জুতো চেয়েছেন। জুতো দেওয়া হলো ঠাকুরকে, সে চার-পাঁচ হাত লম্বা, শুঁড়-তোলা ওড়িয়া জুতোর মতন। আমাদের তালতলার চটির পূর্ব-রূপ আর-কি। ওতে আছে চামড়ার ওপর টোপের কাজ।

কাঞ্জিভরমে রাত কাটানো হয়েছিল। রাত্রে একটি বিষ্ণুমন্দিরে পুজো দেখতে গেলেন। দেবদাসীদের নৃত্য দেখা ছিল ওঁদের প্রধান উদ্দেশ্য। মন্দিরে পুজো আরম্ভ হলো। নানা উপচারে সে-পুজোর সমারোহ।

ধুপ-ধুনো পোড়ানো হচ্ছে অজস্র। পাশে দাঁড়িয়ে তন্ত্রধারক। শুধু আদেশ করছেন —সূত্রধার যেন সংস্কৃত নাটকের। নানা মন্ত্রে পুজো করা হচ্ছে। তন্ত্রধারক নির্দেশ দিচ্ছেন —'ধুপম্'। অমনি ধুপ দিয়ে পুজো শুরু হলো। আদেশ হলো —'প্রদীপম্'। অমনি শুরু হলো প্রদীপ নিয়ে পুজো। —'নৃত্যম্' অমনি নৃত্য শুরু। দেবদাসী নৃত্য শুরু করলে।

'খুব নৃত্য হলো। সে-নৃত্য দেখে আর সবাই যে-ভাবে উপভোগ করলেন, আমি তা পারলুম না। আমার প্রায় ভালোই লাগলো না বলা চলে। আমার মনে হতে লাগলো, এদেশে এসে শ্রীচৈতন্যদেব সর্বপ্রথম বন্ধ করতে চেয়েছিলেন —এই প্রথা। দেবদাসীদের এই পেশা বন্ধ ক'রে দিয়ে, তাদের বিয়ে-থা দেবার পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। বাঙ্গালী-সমাজ-সংস্কারক তো। কতদিন আগে থেকে ঐ চেষ্টা শুরু হয়েছিল।' —নাচের তালে তালে এই সব বেখাপ্পা কথাই নন্দলালের মনে আসছিল।

ওখানকার মন্দিরের টেপাকুলমে অর্থাৎ সরোবরে শঙ্খ পাওয়া যায়। বলে প্রবাদ। গোপুরম্ পেরিয়ে প্রাঙ্গণে পৌঁছে দেখলেন অনেক হাতী। সে-সব মন্দিরের সম্পত্তি। এদের খাবার দিচ্ছে যাত্রীরা। বুড়ো ঘোড়া, উট —এ-সবও ছিল।

ওখানে মন্দিরের ভেতরে ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কেউ ঢুকতে পারে না। আর মন্দিরের ভেতর ঢুকতে হয় আদুড়-গায়ে। নন্দলালের পৈতে না-থাকায় প্রথম প্রথম মন্দিরে ঢুকতে পেতেন না। শেষকালে একটা পৈতে পরে নিয়েছিলেন। পৈতে নেবার স্বপক্ষে যুক্তি হলো, কায়স্থ শূদ্র নয়, —ক্ষত্রিয়। এর আগে, 'বঙ্গীয়-কায়স্থ-সভা' কায়স্থদের যখন ক্ষত্রিয় বলে ঘোষণা করেন, তখন ওঁরা সবাই পৈতে নিয়েছিলেন। পরে, নন্দলালের সেটা আর রাখার খেয়াল হয়নি। দক্ষিণভারতে গিয়ে সেটার পুনরুদ্বোধনের প্রয়োজন ঘটলো। পৈতে নিয়ে, ত্রিপুণ্ড্রও কাটতে হলো, আর বাজারে-কেনা বিভূতিও মাখতে লাগলেন —দায়ে পড়ে। বৈষ্ণব তো ওঁরা ; তিলক-কাটার অধিকার অবশ্য ছিল আগে থেকেই। উপবীত আর ত্রিপুণ্ড্রের বহর দেখে, ওখানে মন্দিরের দ্বার আর কেউ আগলাতো না ; প্রায় সর্বত্র অবারিত হয়ে উঠলো। মন্দিরে ঢোকার সময়ে খালি-গা ভালোই লাগতো। মন্দিরে ঢুকে ওঁরা জল ছড়িয়ে নানা উপচারে পূজা করতে লাগলেন।

বিষ্ণুকাঞ্চি থেকে ও'রা শঙ্করাচার্যের বাড়ি দেখতে গেলেন। তাঁর জন্মস্থান কেরলের আলোয়াই নদীর উত্তর তীরে কালাড়ি গ্রামে। স্টেশন থেকে গরুর গাড়ি চেপে গিয়েছিলেন, মনে আছে। শঙ্করাচার্যের পাথরের লাইফ-সাইজ মূর্তি; বুদ্ধের মতন বসা; খুব পুরাতন। খোলার বাড়ি সব —একতলা দোতলা।

এর পরে, শ্রীরঙ্গমে গিয়ে অপ্‌মূর্তি জম্বুকেশ্বর মহাদেবের বিরাট মন্দির দেখলেন। মন্দিরটি পুরাতন নয়। স্থাপত্য আর গঠনপ্রণালী উত্তম। পাথরের পর পর চারটি প্রাচীর-ঘেরা মন্দিরটি দেখতে একটি দুর্গের মতন। প্রাঙ্গণে সহস্রস্তম্ভ মণ্ডপ। প্রত্যেকটি স্তম্ভ সূক্ষ্মকারুকার্যমণ্ডিত আর নানা দেবদেবীর, সিংহ, হাতী, ঘোড়া ইত্যাদির আর নানা ভক্তের মূর্তিতে শোভিত। চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে এসেছিলেন। কাবেরীতে স্নান ক'রে তিনি রঙ্গনাথ দর্শন করেছিলেন। সে-কথা মনে পড়ে নন্দলালের মনটা বেশ মশগুল হয়ে উঠলো।

ওখান থেকে গেলেন চিদম্বরম্। ওখানে শিবের ব্যোমমূর্তি —নটরাজের মন্দির। মন্দির যেমন প্রকাণ্ড তেমনি পুরাতন। এর স্থাপত্য, ভাস্কর্য, শিল্প-নৈপুণ্য, মূর্তির সজীব ভঙ্গিমা, ভাবের অভিব্যক্তি দ্রবিড়-শিল্পের মহান নিদর্শন। নৃত্যকলার বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গিমা, দেহের সাবলীল গতি, পাথরে ফুটে উঠে যেন নৃত্যশাস্ত্রের অনুশাসন জীবন্ত ক'রে প্রকাশ করছে। এ-গুলো সব যেন নৃত্যবিজ্ঞানের এক্সপেরিমেণ্ট্। নটরাজের মন্দিরে মহাদেবের মূর্তি আর অন্য মূর্তিগুলি বিশ্বের সকল কলানুরাগীর অতি প্রিয় বস্তু।

এক-শো সতেরো বিঘে জমির ওপর নটরাজের বিশাল মন্দির। উত্তরে 'ভেলার' নদী —পুরাণে নাম 'শ্বেতনন্দী'। পূবে সমুদ্র, দক্ষিণে 'কুলেরুণ' নদী আর পশ্চিমে 'বীরনাম' সরোবর। এখানকার নটরাজ-মূর্তি ভুবনবিখ্যাত, সচ্চিদানন্দের পূর্ণ আনন্দময়, ষড়ৈশ্বর্যশালী মূর্তি। নটরাজের পিছনের ঘরের দরজায় একটা মোটা পর্দায় দেবনাগরী অক্ষরে আকাশ-লিঙ্গ লেখা। সেটা সরিয়ে ফেললে, শূন্যঘর দেখা যায়। এখানে শিব তাণ্ডবনৃত্য করতে করতে আকাশে বিলীন হয়ে যান। সেইজন্যে এখানে শিবের 'ব্যোম'লিঙ্গ পীঠরূপে পুজো হয়। এই মন্দিরে 'চিৎসভা'-দালানে যাবার পাঁচটি ধাপ রূপোর

পাতে মোড়া। এতে ‘পঞ্চাক্ষর’ মন্ত্র উৎকীর্ণ আছে। ‘চিৎসভা’ মন্দিরটি এমনভাবে করা, যেন মানবদেহের অন্তরের হৃৎপদ্ম। এই মন্দিরে আর একটি দালান আছে, তার নাম —‘নৃত্যসভা’। চিদম্বরম্-মন্দিরে পাথরের চারটি প্রাঙ্গণ। তৃতীয় প্রাঙ্গণে হাজার-থামের দালান বা নাটমন্দির। গোপুরমের কারুকার্য মনোমুগ্ধকর। উৎসবের সময়ে খোলা মণ্ডপে নৃত্যগীত হয়। ‘কনকসভা’—এটি নটরাজের নৃত্য করবার দালান। একটি কুণ্ডের নাম —‘শিবগঙ্গা’। চারদিকটায় পাথরের সিঁড়ি আর চাঁদনি। কুণ্ডের পশ্চিমে কালিকাদেবীর মন্দির। সুব্রহ্মণীয় বা কার্ত্তিকের মন্দির স্থাপনা করেছিলেন কোনও এক পাণ্ড্যরাজা। এই মন্দিরের গায়েও হরেক কারুকার্য। শিবকামী আম্মনের মন্দিরে সীলিং-এর কাজ অপূর্ব, নানা পৌরাণিক লীলা চিত্রিত। এক কোণে প্রকাণ্ড এক গণপতি-মূর্তি আর গোবিন্দরাজ পেরুমাল-মূর্তি রয়েছে। গোপুরমের পুব আর পশ্চিম গায়ে ১০৮টি বিভিন্ন ভঙ্গীর নৃত্যরতা রমণী-মূর্তি। ‘ভরতনাট্য শাস্ত্র’-গ্রন্থের নৃত্যানুশাসন, পদ্ধতি আর ভঙ্গিমার যথাযথ ভাব এই মূর্তিগুলিতে প্রকাশ পেয়েছে।

সমগ্র মণ্ডপের মধ্যস্থলে নটরাজ শিবের ব্যোমলিঙ্গ-মন্দিরটি রুপোর পাহাড়ের মতন দেখতে। চুড়োয় আর ছাদে সোনা-রুপোর পাত-মোড়া। রোদ পড়লে অপূর্ব শোভা হয়। নটরাজের মূর্তি নৃত্যকলার এক শ্রেষ্ঠ ভঙ্গিমা। এক পায়ের ওপর ভর দিয়ে, সমস্ত শরীর নানা গতিতে অবনত, অপর পদ ঊর্ধ্বে উত্থিত। ‘কনক-সভা’-মণ্ডপের বড়ো পিতলের ঘণ্টা দুটির শব্দ অতি মধুর। দক্ষ বায়েনরা নৃত্যের ছন্দে তালে এ-সব বাজিয়ে থাকেন।

চিদম্বরমের মন্দিরে পাথরের মূর্তির বদলে ধাতুমূর্তিই বেশী। অপূর্ব ভঙ্গিমায় গড়া। চার-পা-যুক্ত ব্যাঘ্রপদ আর সাপের আকারে পতঞ্জলি-মুনির মূর্তি সুন্দর। যোদ্ধার বেশে শিবের মূর্তিটি অপূর্ব। শিব ত্রিপুরাসুর বধ করবার জন্যে পুষ্পকরথে মর্ত্যে আসছেন। পৃথিবী তাঁর রথের মণ্ডপ, সূর্য চন্দ্র রথের চাকা, বেদ উপনিষৎ ঘোড়ার রাস, মেরুপর্বত ধনুক, সমুদ্র তূণ আর তীরের ফলা হয়েছেন বিষ্ণু।

একটি সূর্যমূর্তিও দেখবার মতো। সূর্যের তিনটে মুণ্ড;—তিন মুখ — ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। অরুণ রথ চালাচ্ছেন —সাতটি ঘোড়া জোতা। নন্দলাল

বরোদার কীর্তিমন্দিরে অনেক পরে এঁকেছিলেন এই মূর্তি —বললেন ১৯৬৫ সালের ২৮-এ এপ্রিল। মন্দিরের আট দিকে অষ্ট-দিক্‌পালের মূর্তি।

ব্যোমরূপী লিঙ্গ মানুষের অগোচর। সেইজন্যে এই স্থান চিদম্বর। চিৎ মানে জ্ঞান আর অম্বর মানে আকাশ। এই লিঙ্গ স্থাপন সম্পর্কে 'স্থল পুরাণে' একটি কাহিনী আছে। —'এখানে চিদাকাশের পুজো হচ্ছে; অথচ, ব্রাহ্মণ শূদ্র —এই সব জাতিভেদের কড়াকড়ি রয়েছে। —সেটা বড়ো লাগলো আমার মনে।'

চিদম্বরম্ মন্দির-প্রাঙ্গণে একটি অনন্তশায়ী নারায়ণ-মন্দির। এই শিব-ঠাকুরের দেশে শেষশায়ী এই বিষ্ণুমূর্তিটিও বেশ দর্শনী পেয়ে থাকেন। তবে, দক্ষিণ দেশে শৈব ও বৈষ্ণবদের মধ্যে বিবাদ বাধলে, তখন ভক্তদের আসুরিক ব্যবহারে অনেক ক্ষতি হয়ে থাকে। এখানকার বিষ্ণুকে জুতো দানের কাহিনী বিষ্ণুকাঞ্চি প্রসঙ্গে আগেই বলা হয়েছে। তবে, আবার শিব, বিষ্ণু অনেক মন্দিরে একত্রেও পুজো পেয়ে থাকেন।

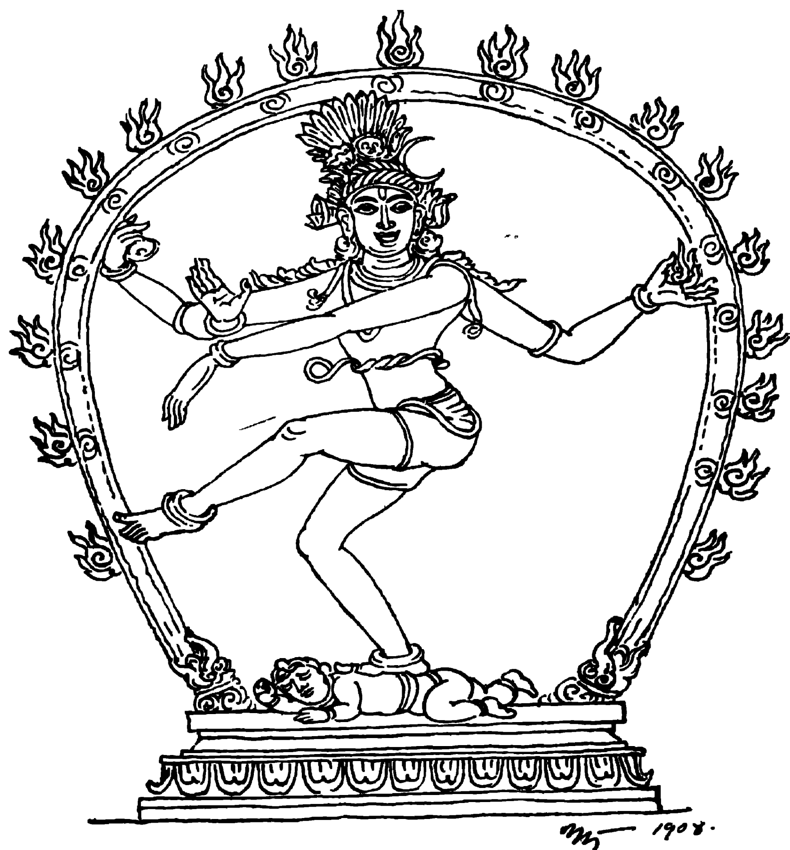
চিদম্বরম্ থেকে ওঁরা গেলেন তাঞ্জোরে। তাঞ্জোরের বৃহদীশ্বরের মন্দিরের স্থাপত্য, বিরাট নন্দী-মূর্তি আর পুঁথি-সংগ্রহ-শালা অপূর্ব। তাঞ্জোরের ধাতু-শিল্পের খ্যাতি জগৎ-জোড়া। বৃহদীশ্বরের মন্দিরটি দুর্গের মধ্যে রয়েছে। মন্দিরটি পাহাড়ের চুড়োর মতো আকাশ-ছোঁওয়া। প্রাঙ্গণে পাঁচীরের ভেতর ছোট বড়ো নানা কামরাগুলি তখন প'ড়ো হয়েছিল। প্রাঙ্গণের পশ্চিম দিক ঘেঁসে মূল মন্দির; সামনে রেলিং-দেওয়া পাথরের উঁচু বেদীর ওপর প্রকাণ্ড একটি 'নন্দী'-মূর্তি বসা —সে বিশাল বৃষের ওপর। এই ষাঁড়টি একখণ্ড কালো গ্র্যানাইট্ পাথরে তৈরী। গঠনভঙ্গিমায় বৃষটিকে জীয়ন্ত বলে মনে হয়। বৃষের ওপর আটটি থামের ওপরে একটি ছাদ। রামেশ্বর আর মহীশূরের চামুণ্ডী পর্বতের ওপরে বৃষমূর্তিগুলিও বিরাট্। কিন্তু, তাঞ্জোরের নন্দী-মূর্তি সবচেয়ে বড়ো আর অদ্ভুত।

নন্দীমূর্তির সামনেই বৃহদীশ্বর মহাদেবের মন্দির দু-শো ফিট্ উঁচু। এখানে কিন্তু কোনও তীর্থমহিমা নাই। কাঞ্চিপুরমের এক ভাস্কর এই দেউল নির্মাণ করেছিলেন —নাম সোমবর্ণ। মূল মন্দিরের ভেতরে একটি বিরাট্ শিবলিঙ্গ —প্রায় তিরিশ ফিট্ উঁচু, পঞ্চাশ ফিট্ পরিধি। গ্যালারীর মতন দোতলার বারাণ্ডা দিয়ে প্রদক্ষিণ-পথ, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয়। দেওয়ালে

খোদাই শিল্পসম্ভার চমৎকার। গোপুরমের বাইরে বিরাট আকারের দ্বারপাল-মূর্তি —অপূর্ব সৃষ্টি। দাক্ষিণাত্যের মধ্যে এই মন্দিরটিই সবচেয়ে পুরাতন, বড়ো আর বিখ্যাত। এর বিমানে বা চুড়োয় তাঞ্জোরের রাজাদের মূর্তি, চোল, নায়ক, মারাঠা আর সাহেবদের পর্যন্ত প্রতিমূর্তি করা হয়েছে। এখানে নটরাজের স্নানের জল সুগন্ধ করার জন্যে যে মশলা ব্যবহার হ'তো তার বিবরণ লেখা আছে। নটরাজ ব্রোঞ্জে তৈরী। একটা ঘর জুড়ে আছেন বিরাট নটরাজ। নন্দলালের ৩৪ সংখ্যক স্কেচ্‌বুকে দেখছি,—তিনি নটরাজের বড়ো মূর্তির ড্রয়িং করেছেন। আর নটরাজের মুখ এঁকেছেন আলাদা ক'রে। ভারতশিল্পের অনন্য অবদান 'নটরাজ'।

আসল মন্দিরের গম্বুজটি সোনার। ছোট মন্দির, চারদিকে গোপুরম্। বড়ো বড়ো গোপুরম্। সাধারণতঃ থাকে চারটি ক'রে। এখানে গোপুরমের সাতটি দেউল। মন্দিরে ঢুকতে গেলে, পার হতে হয় সাত দেউড়ি। প্রত্যেকটা দেউডি আর-একটার উল্টোদিকে। সাত থাকে সাত রকম জাতের বাস। রীতিমতো ঘর বেঁধে বাস করে তারা। শেষ দেউড়িতে থাকবে —ব্রাহ্মণ। মন্দিরের সামনে সরোবর, সেখানে সিঁড়ি। লোকে স্নান করে নেমে। নন্দলাল কিন্তু সে-সরোবরে স্নান করেননি; ওঁরা সবাই স্নান করতেন। মন্দিরের দেওয়ালে ফ্রেস্কো অনেক। তার নমুনা আনা আছে কিছু শান্তিনিকেতন-কলাভবনে। নানা রকমের পটের ধরনে আঁকা দেব-দেবীর ছবি সব।

তাঞ্জোর থেকে গেলেন ওঁরা কুম্ভকোণম্। এখানেও শঙ্করাচার্যের পীঠ আছে। শহরটি খুব পুরানো। মন্দিরে মন্দিরে শিল্পসম্ভার অজস্র। কুম্ভেশ্বরের মন্দির; তার চারদিকের স্থানের নাম কুম্ভকোর্ণম্। শহরের মাঝখানে পুণ্যতীর্থ সরোবর 'মহামাঘম্'। কাবেরী-গোদাবরীর দেশে ভাগীরথী মাঘী-পূর্ণিমার দিনে এই সরোবরে এসে থাকেন। ঐ সময়ে এই সরোবরে স্নান করলে মহাপুণ্য হয়। এ ঠিক্ উত্তরভারতের কুম্ভমেলার মতো পবিত্র। এখানেও বারো বছরে একবার গঙ্গা-কাবেরীর সঙ্গমযোগ হয়ে থাকে। এই সময়ে দেবতাদের মিছিল বের হয়;—কুম্ভেশ্বর, সোমেশ্বর, নাগেশ্বর, কাশী-বিশ্বনাথ, গৌতমেশ্বর আর বাণেশ্বর—সবারই মিছিল চলে। মহামাঘম্ সরোবরের চারদিকেই বাঁধানো সিঁড়ি। সরোবরের তলায় নবকন্যিকার ন'টি



নটরাজ - নন্দলাল

কূপ বা কুণ্ড। নব কন্যা হচ্ছেন—কাবেরী, গোদাবরী, কন্যা, সরযূ, নর্মদা, সরস্বতী, পয়স্বিনী, যমুনা আর গঙ্গা। দুটি মন্দির প্রসিদ্ধ—শৈব কুম্ভেশ্বর আর বৈষ্ণব সারেঙ্গপাণীশ্বর। এখানে শিল্পচর্চা যথেষ্ট হয়েছে। সে-সব দেখলেন নন্দলাল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

কুম্ভকোণমের পশ্চিম অঞ্চলে রামস্বামীর মন্দির। এখানে রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক-মূর্তি। দুই কন্যার সঙ্গে চোলরাজার মূর্তিও দেখলেন। মণ্ডপে বহু মূর্তি আর স্থাপত্য-নিদর্শন রয়েছে। তিরুবিক্রম হলেন বামন অবতার, তাঁর প্রকাণ্ড এক পা উঁচুতে তোলা। শ্রীদেবী আর ভূদেবীর সঙ্গে বিষ্ণুমূর্তিটি দেখতে অপূর্ব। মণ্ডপের থামগুলি এক-একটা পাথর কেটে করা। বিষ্ণু আর রামচন্দ্রের নানা লীলার চিত্র। মন্দিরটি ছোট। কিন্তু, সোনার তালগাছটি খুব উঁচু। চক্রপাণি-মন্দিরের বিষ্ণুমূর্তিটি নতুন ধরনের। সূর্যের গর্ব খর্ব করবার জন্যে সুদর্শনচক্র হাতে নিয়ে বিষ্ণু দাঁড়িয়ে আছেন।

কুম্ভকোণম্ থেকে ওঁরা গেলেন ত্রিচিনাপল্লী। এটা হলো—ত্রিশিরাসুরের দেশ। ত্রিচিনাপল্লীর পাহাড়-চুড়োয় সিদ্ধিদাতা গণেশের মূর্তিটি মনোরম। পথে. হরপার্বতীর পুজো ক'রে তবে গণপতি দেখতে যেতে হয়। হনুমান এখানে এসেছিলেন সেতুবন্ধের সময়ে।

কাবেরীর ঘাটে নারায়ণ-শিলা বিস্তর বিক্রী হয়। এখানে ছুৎমার্গের বিকটতা প্রচণ্ড। শহরের উত্তরে আর দক্ষিণে দুটি পাহাড় রয়েছে। দক্ষিণের পাহাড়টির নাম সুমেরুপর্বত বা গোল্ডেন্ রক্। পাহাড়ের গা খোদাই ক'রে রক্-টেম্পল। 'এখানে শিবের মাথায় শরায় আগুন জ্বলে। মন্দিরের মাথায় আগুন জ্বলে লাইট্ হাউসের মতন।'

শ্রীরঙ্গম্ ত্রিচিনাপল্লীর উত্তরে কাবেরীনদী-ঘেরা একটি দ্বীপ। উত্তরে আর দক্ষিণে শ্রীরঙ্গম্-দ্বীপটিকে বেড়ে আছে কাবেরী। দক্ষিণ-কাবেরীর তীরে পাথর-বাঁধানো গজমোক্ষ-ঘাটের চাঁদনির আলসেতে অনন্তশয্যায় শোওয়া বিষ্ণুর বিরাট মূর্তি রয়েছে। শ্রীরঙ্গমের মন্দিরটি বোধহয় পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড়ো মন্দির। পর পর সাতটি পাথরের বেড়, পরিক্রমা-পথ, গোপুরম্, মণ্ডপ আর অঙ্গন পার হয়ে গম্ভীরায় পৌঁছতে হয়। মন্দিরের ঐশ্বর্য, পাথরের ওপর কারুকার্য-করা থামের সারি, মন্দির-গায়ের

নানা দেবদেবীর মূর্তি আর শ্রীরঙ্গজীর বহুমূল্য অলঙ্কার সে দেখবার মতো। নন্দলালের ২৫ সংখ্যক স্কেচ্-বুকে দেখছি, তিনি দক্ষিণভারতে ত্রিচিনাপল্লীর শ্রীরঙ্গম্ মন্দিরে গিয়ে হাতীর দাঁতের কাজ-করা একটি বাক্সের ছাপ তুলেছেন রাবিং ক'রে।

এই মন্দিরের প্রথম প্রাচীরটি প্রায় এক মাইল জুড়ে। এর আবার সাতটি প্রাচীর। প্রতি প্রাচীরের পরে পরিক্রমাপথ, তার দু'পাশে অতিথিশালা, দোকান, বসতবাটী, বাজার, হাট সব রয়েছে। বহু ব্রাহ্মণ আর অনেক ব্যবসায়ীও তখন ছিল। প্রাচীরের মধ্যে শতস্তম্ভের মণ্ডপে মাঘ মাসে বৈকুণ্ঠ-একাদশীর দিনে খুব ধুমধামে উৎসব হয়। পঞ্চম প্রাকারের পরে আর অহিন্দুকে ঢুকতে দেওয়া হয় না। গোপুরম্ এখানে একুশটি। সপ্তম দ্বার আর প্রাঙ্গণ পার হ'য়ে শ্রীরঙ্গনাথজীর মূল মন্দিরের বিমান দেখা যায়। সামনে বৃহৎ গরুড়ের মূর্তি আর মন্দির। গরুড় বদ্ধাঞ্জলি হয়ে আছেন। অতি সুন্দর সে-মূর্তি। মন্দিরের ভেতরে অনন্তশয্যায় শ্রীরঙ্গনাথজী নাগকুণ্ডলীর ওপরে শুয়ে আছেন। মাথায় বহু ফণা বিস্তার করে রয়েছে অনন্তনাগ। বিরাট্ মানুষের মতো মূর্তি কালো পাথরের। দেবতার অলঙ্কার হীরা, পান্না আর চুনির। মনে হলো,—ঠিক্ যেন বিষ্ণুর বৈকুণ্ঠপুরী। এখানে কর্পূর-আরতি দেখলেন।

রঘুনাথ, লক্ষ্মী, রামচন্দ্র, নবগ্রহ, বৈকুণ্ঠেশ্বর আর তাঁদের মন্দির সবই কারুকার্যময়। লক্ষ্মীর মন্দির আছে, বড়ো মন্দিরের সামনে। অসংখ্য ঘণ্টা লাগানো আছে প্রত্যেক ঘরের দরজায়। অতি সুন্দর কারুকার্য। খুব নিচু দরজা। ঢুকতে হয় মাথা নিচু ক'রে। পুরীর মন্দিরেও ঐরকম। সেখানেও ঢুকতে হয় মাথা নিচু ক'রে। মন্দিরের ভেতরের থামগুলির শিল্পচাতুর্য চমৎকার। থামের গায়ে অশ্বারোহী বল্গা ধ'রে রয়েছেন। —মনে হয় যেন আমাদের ষড়্-রিপুর গতি ফেরাতে চাইছেন।

আমাদের দেশে মানুষের আকৃতি গড়তে পারতো না বলে, বিদেশী শিল্পসমালোচকগণ মনে করতেন। আমরা নাকি এ্যানাটমি জানতাম না। কিন্তু, এখানকার মূর্তিগুলির, বিশেষ ক'রে দু'জন রাজ-ভ্রাতার মনোরম অবয়ব দেখলেই তাঁদের এই ভুল ধারণা ভেঙ্গে যেত। বরং বলা যায়, মূর্তিশিল্পে ব্যক্তির আত্মপ্রকাশের চেষ্টা এই দাক্ষিণাত্যের শিল্পেই বেশী

হয়েছে। শ্রীরঙ্গম্ মন্দিরে শতস্তম্ভ-মণ্ডপের কারুকার্য অতুলনীয়। এখানে এক-একটি অশ্বারোহী যোদ্ধার মূর্তির ওপর, এক একটি প্রকাণ্ড উঁচু স্তম্ভ, একটি ক'রে পাথর কেটে তৈরী ক'রে, খাড়া দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার ওপরে মণ্ডপের ছাত। এখানকার শিল্পকাজ এতো বেশী, ভালো ক'রে দেখতে গেলে এক সপ্তাহ লেগে যায়। অতো সময় ওঁরা দেননি। গোপুরম্, টেপাকুলম্, সোনার ধ্বজস্তম্ভ সবই এখানে রয়েছে। —একুশটি গোপুরম্, পাথরে-বাঁধানো সরোবর আর সোনার তালগাছ। দক্ষিণাপথের এই সব বিশাল মন্দির, পার্থিব ঐশ্বর্যে, হিন্দুর মূর্তিপূজার আর সাধনার কেন্দ্রস্থল হয়ে আছে আজও ; —এখনও হিন্দুধর্ম যেন ওখানে সজীব। গোঁড়ামি আর শুচিবাই-এর চাপে হিন্দুসমাজের বিকৃত রূপ এখানে প্রকট। বামুনদের শূদ্র-ঘৃণা মনে ব্যথা দেয়। তবুও, ওঁরাই যেন যুগেযুগে হিন্দু-শাস্ত্রের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখবার চেষ্টা করছেন —প্রচণ্ড প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে।

গরুড়-মূর্তির সামনে রামানুজের মূর্তি রয়েছে। রামানুজ ছিলেন বিষ্ণুর ভক্ত। মনে হয়, এতে যেন শ্রীরঙ্গমে বৈষ্ণব-সাধনার প্রদীপটি অনির্বাণ-শিখায় জ্বেলে রাখা হয়েছে। দ্রবিড় আর আর্যেতর অধিবাসীদের দেশে ইষ্টদেব হচ্ছেন সাধারণতঃ শিব। রামানুজ বৈষ্ণব-ধর্ম প্রচার করায় অনেকে বৈষ্ণব হয়েছিলেন আর বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রামানুজের প্রধান লীলাক্ষেত্র ছিল শ্রীরঙ্গম্।

এখান থেকে মাদুরা যাবার পথে সুব্রহ্মণ্যদেব বা কার্ত্তিকের মন্দির দেখলেন। 'পথে রাধাকুমুদবাবু আমার-ছোঁওয়া কুঁজোর জল খেতে লাগলেন। বিস্কুটও খেতেন —অবশ্য সে খিদে-তেষ্টা সামলাতে না পারলে। তবে, সমাজে বা ওঁদের সাক্ষাতে খেতে ভয় পেতেন। আমারই গেলাসে আমার কুঁজোর জল খেতেন। আমার ছোঁওয়া খাবারও খেতেন। অসীন্দ্রকুমার খেতেন 'ইডলী'। একদিন পাতার ঠোঙ্গায় 'ইডলী' কিনে খেলেন। আমি বললুম, —'কি মশায়, 'ইডলী' খাচ্ছেন, ও তো আমাদের দেশের পিঠে। চালগুঁড়ি কিংবা ভাত দিয়ে তৈরী। সকড়ি তো বটেই ; আর কি জাতেই-বা দিলে! ঐ খাচ্ছেন, আপনাদের জাত তো গেল। অসীন্দ্রকুমার যুক্তি দেখালেন, —'আপনি শূদ্র ; আপনার কুঁজোর জল

খাব না ; কিন্তু, বাজারের খাবার খাব। কারণ, ও হলো দাম দিয়ে কেনা। মূল্য দিলে, খাবার দোষমুক্ত হয়। —কিন্তু, ঐ দুর্বল যুক্তি, বৃথা তর্ক, আসলে হচ্ছে গোঁড়া হিন্দুয়ানির —আমার মাথায় ওঁদের যুক্তি ঢোকেনি। ব্রাহ্মণে বললেন, শূদ্রে বুঝতে পারলো না —এ-সব বর্ণভেদরহস্য। তখন তো বুঝিইনি ; এখনও এর হদিস পাইনি।'

'ওঁদের আত্মীয় প্রমথনাথ গাঙ্গুলী ফোটোগ্রাফী জানতেন ভালো। আর কারিগর লোক ছিলেন। মাঝপথে আমার ঘড়ির স্প্রীং কেটে গেল। তিনি তক্ষুণি একটা বাঁশের চিয়াড়ির স্প্রীং তৈরী ক'রে, সঙ্গে সঙ্গে লাগিয়ে ঘড়ি চালিয়ে দিলেন। বাঁশের ছিলেতে স্প্রীং হলো ; তাতে কাজও চলতে লাগলো।'

দক্ষিণদেশে যজ্ঞপতির আরাধনা কার্ত্তিকের মূর্তিতে করা হয়। এখানে কার্ত্তিকের ছ'রকমের মূর্তি আছে। মন্দিরের চুড়ো উঁচু আর গোল। গায়ে নানা দেব-দেবীর লীলা, কার্ত্তিকের যুদ্ধলীলা খোদাই করা আছে। নিকটেই 'বরাহগিরি'। এখানে শিবের 'সুন্দরেশ'-মূর্তি। শিবের পঞ্চাক্ষর আর কার্ত্তিকের ষড়ক্ষর মন্ত্রে এখানে পুজো হয়।

কোদাই-ক্যানাল স্টেশন থেকে পাহাড়ের ভেতর দিয়ে খানিক গেলেই সমতলভূমিতে মাদুরা। উঠলেন গিয়ে একটি ছত্রে বা সরাইখানায়। এখানকার পায়খানার ব্যবস্থার কথা আগেই বলা হয়েছে। বাইরের একটা ঘর নিয়ে ছিলেন ও'রা। ঘরটা বারাণ্ডার দিকের। সকালে উঠেই দেখলেন, দক্ষিণী মেয়েরা হাঁক পাড়ছে —'পালু' বিক্রী করতে এসেছে। 'পালু' হলো দুধ, —সের তিন পয়সা। নেওয়ার ব্যবস্থা হলো। সে-ব্যবস্থা খুব ভালো। এবং সে সুখের স্মৃতি নন্দলালের মনেও আছে এখনও ভালোভাবেই।

মাদুরা দ্রবিড়-সংস্কৃতির কেন্দ্র। তামিল-শাস্ত্রমতে, মাদুরা না-দেখলে পরজন্মে গাধা হ'য়ে জন্মাতে হয়। খৃষ্টের জন্মের আগে থেকে মাদুরা সমৃদ্ধ আর সুসভ্য রাজার রাজধানী ছিল। 'পাণ্ড্য'-রাজবংশ এখানে বহুদিন রাজত্ব করেছিলেন। পরে, রাজা হয় 'নায়ক' বংশ। সেই সময়ে মাদুরার উন্নতি হয়েছিল সবচেয়ে। মোগল আমলে প্রায় সব ধ্বংস করা হয়। কিন্তু, মীনাক্ষী দেবীর মন্দিরের কোনও ক্ষতি হয়নি।

এখানে নদীর নাম 'ভাগৈ' ; রাস্তা সোজা আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

পথে যেতে যেতেও দেখা হতো নানা জায়গা। শহরের মাঝখানে মীনাক্ষী দেবীর মন্দির। মাদুরার গোপুরম্ বোধহয় পৃথিবীর যে-কোনও মন্দির, মসজিদ বা গির্জের তোরণদ্বারের চেয়ে উঁচু। মীনাক্ষীর মন্দিরটি একাই একটি সুরক্ষিত শহরের মতো। চারদিকের চারটি গোপুরম্ দেখে অবাক হ'তে হয়। দক্ষিণভারতের মন্দির-শিল্পের যেন পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে এখানে। পুবদিকের গোপুরম্‌টি কুড়ি-তলা উঁচু —পাহাড়ের চুড়োর মতো দেখতে। খানিকটা গ্র্যানাইট্ পাথরে, পরের অংশটা ইঁট, পাথর আর পলস্তরা মিশিয়ে তৈরী। সমস্ত গায়ে লাইফ্ সাইজের দেবদেবী, যক্ষ-রক্ষ দানবের নানা মূর্তি, নানা দৃশ্য খোদাই করা। এই খোদাই-কাজ সূক্ষ্ম ধরনের নয়, কিন্তু যেন জীবন্ত। তোরণের চুড়োর গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত পেতলের ঘণ্টার মালা টাঙ্গানো। আলো সাজাবার ব্যবস্থা চমৎকার। —এমন সুন্দর আর বিশাল মন্দির পৃথিবীতে আর কোথাও বোধহয় নাই।

গোপুরমের ভেতর দিয়ে মন্দির-প্রাঙ্গণে যেতে হয়। সমস্ত চত্বরটাই ঝামা-পাথরে তৈরী। পূবদিকের গোপুরম্ পেরিয়েই প্রথমে সিদ্ধিদাতা গণপতির বিশাল মূর্তি দেখলেন। —একখণ্ড পাথরে তৈরী। কারুকার্য-করা স্তম্ভের ওপর ছাদ। ছাদের নিচে আর দেওয়ালে নানা দেবদেবীর মূর্তি নানা রঙে আঁকা। অলিন্দের পাশে একটি বৃহৎ কুণ্ড। কুণ্ডের চারদিক বাঁধানো।

মাদুরার শাড়ি খুব বিখ্যাত। নানা রঙের সূক্ষ্ম জড়িদার ধুতি, চাদর আর শাড়ি দক্ষিণভারতের লোকের খুব প্রিয়। এখানেও তখন অনেক তাঁতীর বাস —দেখেছিলেন।

প্রাঙ্গণের মধ্যে দুটি প্রধান মন্দির —একটি মীনাক্ষী দেবীর, অপরটি তাঁর স্বামী সুন্দরেশ্বর শিবের। মীনাক্ষী দেবীর বিগ্রহ সাড়ে চার ফিট্ উঁচু নীল শতদলপদ্মের পাদপীঠের ওপর দাঁড়ানো। পাদপীঠটি একটি দামী নীলা পাথর কেটে করা। দেবীর চোখ দুটি ঠিক মাছের চোখের মতো উজ্জ্বল। —তাই দেবীর এই নাম।

বসন্ত-মণ্ডপটিও দেখলেন। অনেক থামের ছাদের তলা দিয়ে গেলেন। সুন্দরেশ্বর মহাদেবের গ্রীষ্মকালে বিহারের জন্যে রাজা তিরুমল নায়ক এই মণ্ডপ নির্মাণ করিয়েছিলেন। রাজার আর মহিষীদের চিত্র করা রয়েছে।

ঠাকুরের দর্শনী —এখানে একটি নারকেল বা কলা আর দু'পয়সার কর্পূর লাগে মাত্র।

মীনাক্ষী-দেবীর মূল মন্দিরটি খুব উঁচু নয়; সোনার পাত দিয়ে মোড়া। প্রহরে প্রহরে মধুর দক্ষিণী ঐক্যতান বাজানো হয়। দেবদাসীর নাচ হতো তখন। আরতিও অপূর্ব। ছন্দে সুরে মন্ত্রপাঠ, শঙ্খধ্বনি আর জয়ঢাকের বাদ্যি খুব ভালো লাগলো। বিশেষ ক'রে চিদম্বর আর মাদুরায় এ-সব বেশী শুনেছিলেন। প্রকাণ্ড হাতী রুপোর তৈরী, সোনার পাতে-মোড়া রথ, পাল্কী, মহাপায়া —এই সবে দেবভাণ্ডার ভরতি; রুপোর রাজহংস আর বৃষ দেখতে অতি চমৎকার। মাদুরায় তখন দেবীর হাতী, ঘোড়া আর অনেক গাই-গরু ছিল।

সুন্দরেশ্বর-মন্দিরের বাইরের গায়ে ক'টি বড়ো বড়ো হাতী খোদাই করা। প্রধান তোরণের সামনে একটি মণ্ডপের নিচে সুদৃশ্য পাথরের বৃষমূর্তি। মণ্ডপের থামে হর-পার্বতী, লক্ষ্মী-সরস্বতী, বিষ্ণু, মার্কণ্ডেয়-মূর্তিগুলিতে অতি সূক্ষ্ম আর যথাযথ কাজ দেখলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। নন্দলালের ২২সংখ্যক স্কেচ্‌বুকে দেখছি, তিনি ব্রোঞ্জের 'সুন্দর'-মূর্তির স্কেচ্ করেছেন; গল্পটিও লিখে রেখেছেন।

মণ্ডপের তোরণের দু'-পাশে নটরাজ আর পার্বতীর নাচের দুটি মূর্তি অতি মনোরম। প্রায় বারো ফিট্ করে উঁচু হবে। দক্ষিণভারতের শৈব সাধকগণ শিবের বিভিন্ন ধরনের ধ্যান বর্ণনা করেছেন। সেইসব ধ্যান-মন্ত্রের অনুসরণ ক'রে দ্রবিড়-শিল্পিগণ নানাভাবে নটরাজ-মূর্তি গড়তে পেরেছিলেন। চিদম্বরমের নটরাজ মূর্তিটি পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিল্পসম্পদ।

মন্দিরের আর-একটি প্রাঙ্গণে হাজার থামের একটি বিরাট্ মণ্ডপ —সভাগৃহ বা নাটমন্দির। মণ্ডপটি এমনভাবে সাজানো, যিনি বেদীতে বসে ভাষণ দেবেন, তাঁর মুখ দেখা যাবে সব দিক্ থেকেই। দশ-বারো হাজারের মতো লোক বসতে পারবে সে-নাটমন্দিরে। মন্দিরে ঢোকবার দিকে সামনের দুয়ারের দেওয়ালে দুটো সিংহমূর্তি। সে-সিংহের মুখের ভেতর বল রাখা আছে। সে বলগুলো নড়ে। তাতে হাত দিলে গড়গড় শব্দ করে। ওস্তাদী দেখিয়েছে মিস্ত্রী। সেখানে রিং লাগানো আছে। উঠনে ক'টা থাম আছে পর পর। থামগুলো খুব অদ্ভুত।

প্রত্যেকটা থাম এক-একটা সুরে বাঁধা। এক ফুট্ থেকে বিশ-পঁচিশ ফিট্ উঁচু। এমনভাবে সরু মোটা ক'রে কেটেছে, যে তাতেই সা-রে-গা-মা —এই সপ্তসুর বাঁধা পড়ে গেছে। শ্মশানে হরিশ্চন্দ্র, বীণাবাদিনী সরস্বতী, পদ্মের ওপরে লক্ষ্মী, ঐরাবতে ইন্দ্র, তাণ্ডবনৃত্যে মহাদেব আর পার্বতীর মূর্তিগুলি জীয়ন্তের মতো খোদাই করা আছে। এগুলি দেখে মনে হলো যেন এ্যানাটমিতে ধুরন্ধর সব কারিগর এই সব মডেল তৈরী ক'রে রেখেছেন।

মাত্রা থেকে ওঁরা কেপ্‌কমরীণ গেলেন ত্রিবেন্দ্রাম্ হয়ে। তিন্নিভেল্লী দিয়েও যাওয়া যায়: তিন্নিভেলীর কাঠের কাজ অতি উত্তম। এখানকার প্রধান দেবতা বৃহীবৃত্তেশ্বর —বেড়া আর ছাতের আকার। এ সম্পর্কে গল্প আছে। এখানে বাঁশ হয় খুব সোজা আর লম্বা। বৃহীবৃত্তেশ্বরের মন্দির-এলাকায় নটরাজের একটি মন্দির আছে —নাম 'তাম্রসভা'। এখানে কাঠের কারুকার্য অনেক। হর-পার্বতীর বিবাহসভার চিত্র কাষ্ঠফলকে খোদাই করা রয়েছে। —সে অতি অপূর্ব কল্পনা।

কেপ্‌কমরীণ বা কন্যাকুমারী অন্তরীপ তিন সাগরের মোহানায় পশ্চিম-পর্বতমালার প্রান্তসীমায়। ত্রিবাঙ্কুর-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। তিন্নিভেলী থেকে কন্যাকুমারী চৌষট্টি মাইল লম্বা পথ পরিচ্ছন্ন আর মনোহর। এই কেরল —ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন আর মালাবার নিয়ে ছিল তখন। কেরল হ'লো পুরাণের 'পরশুরাম ক্ষেত্র'। হিন্দুস্থানের দক্ষিণদিকের শেষ স্থলবিন্দু হচ্ছে কন্যাকুমারিকা। ভারতমহাসাগর কন্যাকুমারিকার যেন পা ধুইয়ে দিচ্ছে। বিশাল তীর্থক্ষেত্র। কেপ্‌কমরীণের আট মাইল উত্তরে সুচীন্দ্রাম-শিবের মন্দির। এখানেও শিবের নটরাজ-মূর্তি। মন্দিরের কারুকার্য অতি সূক্ষ্ম।

কন্যাকুমারীতে দেবীর কুমারী-মূর্তি রয়েছে। আট-ন-বছরের কুমারীর মতন। মন্দিরটি পাথরের। দেবীমূর্তি গ্র্যানাইট্ পাথরে গড়া। মাথায় রত্নের মুকুট, দেবীর নীল চক্ষু দুটির দৃষ্টি সমুদ্রের নীল জলের দিকে প্রসারিত। দেবী যেন তুষারের মতো স্বচ্ছ আর পবিত্র। সন্ধ্যাবেলায় দীপদান আর পুজোর সময়ে অতি অপূর্ব শ্রী ধারণ করে সমগ্র পরিমণ্ডলটি। মন্দিরের তিনদিকে নানা তীর্থ-ঘাট আছে। মাতৃ আর পিতৃতীর্থ দুটি সকল তীর্থের সেরা। মন্দির থেকে সামান্য দূরে চক্রতীর্থ। এখানকার সমুদ্রজল নোনা নয়, মিষ্টি।

ওখান থেকে এলেন ওঁরা রামেশ্বর। রামেশ্বর হিন্দুর মহাতীর্থ। উত্তরে কেদার, পূবে পুরী, পশ্চিমে দ্বারকা আর দক্ষিণে রামেশ্বর। এটি একটি সুন্দর ছোট্ট দ্বীপ। সেতুর ওপর দিয়ে যেতে হয়। রামেশ্বর থেকে ধনুষ্কোটী যেতে হয় নৌকোয়।

রামেশ্বর মন্দিরটি বিরাট্। স্থাপত্যও অপূর্ব। খুব পুরাতন মন্দির। কেল্লার মতন। সমুদ্রের কূলে মন্দির। পূর্বে আর পশ্চিমে দুটি তোরণের ওপর পাহাড়ের চূড়োর মতো গোপুরম্। তোরণের পরেই দু'পাশে একদিকে কার্ত্তিক ; অপর দিকে গণপতির মূর্তি। গোপুরমের ভেতর দিয়ে মন্দিরে যাবার চওড়া রাস্তা। দু'পাশে নানা দোকান। —ছবি, সমুদ্রের শাঁখ, শামুক, কড়ি, ঝুড়ি —এইসব বিক্রী হচ্ছে। সারিসারি থামের ওপর ছাতওয়ালা রাস্তা। রামেশ্বরম্-মন্দিরের এই প্রদক্ষিণ-পথটি (করিডর) বিরাট্। সেরকম আর কোথাও বোধহয় নাই। একটা হাতীর ওপর একটা মানুষ চ'ড়ে ধ্বজা হাতে নিয়ে অক্লেশে যেতে পারে। ছাতের ওপর অদ্ভূত কারু-কার্য রয়েছে। বিষ্ণুর রং দেখবার মতো। গম্ভীরায় যাবার ছাতওয়ালা বারান্দায় থামে রামনাদের রাজাদের প্রমাণ-সাইজের মূর্তি আছে ; বৃষ আর নন্দীর মূর্তি আছে। চৈতন্যদেব এই মন্দির দেখেছিলেন। শঙ্করাচার্য এখানে মঠ স্থাপনা করেন। রামেশ্বর-শিবের পাশেই হনুমানের বিশ্বেশ্বর-মন্দির। পাশে একটি কুণ্ড।

'সেই কুণ্ডে চন্দন-গোলা জল এসে পড়ছে। অনেকেই সেই জল মাথায় মুখে ঠেকাচ্ছে। ঘি, চন্দন, দুধ এই সব স্পর্শ করছে। কিন্তু আমি পারলুম না। প্রণাম ক'রে চলে এলুম। গন্ধ বের হচ্ছে। ফুল পাতা পচার দুর্গন্ধ। সেইজন্যেই ঈস্থেটিক দিক থেকে হিন্দু-মন্দিরের চেয়ে মুসলমানদের মসজিদ আমার বেশী ভালো লাগে। কাশীর অন্নপূর্ণার মন্দিরেও এই ব্যাপার দেখেছিলুম। ভক্তির জোরে লোকসমাজে এই সব নোংরামি উতুরে যায়। ঘি দুধের অপব্যবহার করে। জল ফুল এই সবের আবর্জনা জমে ওঠে। তবে একটা কথা, আমাদের দেবতা —মানুষ। তাই মানুষের আবর্জনা আমরা মন্দিরে জমাতেও দ্বিধা বোধ করি না। আর মুসলমানদের এদিশী ভাবটা নাই। তাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এই দুটো ভাব মিললে তবে উন্নতি হতে পারে। এই মিলন-চেষ্টা

লাচ্ছেন রামকৃষ্ণ-মিশন।' —এ হলো নন্দলালের কথা। নন্দলাল এই পর্কে বর্তমানে যে মত পোষণ করেন: 'হিন্দুর নোংরামি-বিযুক্ত ভক্তি ার মুসলমানদের গোঁড়ামি-বিযুক্ত পরিচ্ছন্নতার আদর্শ একত্র মিললে প্রকৃত চধর্মের সৃষ্টি হবে। এরই গোড়াপত্তন করেছেন রামকৃষ্ণ মিশন।'

মন্দিরের মধ্যে একুশটি কুয়া আছে। তার জল নানা তীর্থবারির প্রতীক। মেশ্বরের মন্দিরে গন্ধ জল দিয়ে পুজো হয়। গঙ্গোত্রী থেকে, বদ্রীনাথ কে তীর্থবারি সব নিয়ে আসে। জল বয়ে আনে কুঁজোতে ক'রে। ই জল এনে রামেশ্বর-শিবের মাথায় ঢালে। রামেশ্বর বসানো শিব। রাম বপূজার সংকল্প করলে. হনুমান বেলগাছ, গঙ্গাজল আর শিবলিঙ্গ আনতে কাশী ালেন। এদিকে, পুজোর সময় উত্তীর্ণ হয় দেখে, রাম বালির শিবলিঙ্গ গ'ড়ে, াখের জলে পুজো করছেন, এমন সময় হনুমান সব নিয়ে ফিরলেন; মচন্দ্রকে শিবপুজো করতে দেখে খুব চটে গেলেন। রাম বললেন, -এই বালির লিঙ্গ আমি আর পুজো করব না। তুমি ওটা উপড়ে ফেলে ামার আনা শিবলিঙ্গ বসিয়ে দাও। হনুমানের একহাতে শিবলিঙ্গ, আর তে গঙ্গাজল থাকায়, লেজে জড়িয়ে বালির শিবলিঙ্গ উপড়তে লাগলেন। জের টানে বালির লিঙ্গ পাথরের লিঙ্গ হ'য়ে উঠে আসতে লাগলো।

হনুমানের অহঙ্কার ঘুচলো। তিনি রামের পায়ে লুটিয়ে পড়লেন। বললেন. – তোমার আনা লিঙ্গ পাশে প্রতিষ্ঠা কর। আমি আগে ামার শিব পুজো ক'রে, পরে আমার প্রতিষ্ঠিত শিবের পুজো করবো। এই রীতি যুগে যুগে চলবে। তোমার শিব পুজো না-ক'রে কেউ রামেশ্বর াবকে পুজো করবে না। আজও লোকে হনুমানের শিব পুজো না-করে মেশ্বর দর্শন করে না।

'উত্তরভারতের গঙ্গার জল এনে রামেশ্বরে শিবের মাথায় ঢালতে হলে, াই পবিত্র গঙ্গাজলের জন্যে অনেক ট্যাক্স দিতে হয়। জল বিক্রী হয়। ানতে পাওয়া যায়। অনেক দাম। এই সুযোগে মন্দিরে ব্যবসা চলে।

মন্দিরে এই রকমের ব্যবসা বন্ধ করেছিলেন যীশু। জেরুজেলমের মন্দির াঙ্গণে ব্যবসা চলতো; যাত্রীদের ওপর জুলুমের সে খুব দুঃখের ব্যবসা। শু ক্রুদ্ধ হয়ে চাবুক মেরে সে ব্যবসা বন্ধ করে দেন। Rath of Christ

বা যীশুর রাগ-এর ওপর রোমান ছবি করা আছে। পুরীর মন্দিরে, আরও অনেক মন্দিরে প্রসাদ সব বিক্রী হয়। পুরীতে তো রীতিমতো ব্যবসা চলছে।'

মন্দিরের গম্ভীরা অন্ধকার। কর্পূর-আরতি হ'লে তবে ঠাকুর দেখা যায়। রামেশ্বর-মন্দিরের দক্ষিণ পাশে রামেশ্বরী-পার্বতীর মন্দির। মন্দিরের দামী আসবাব অনেক। কাছেই শান্ত সমুদ্র। বেলাভূমি রমণীয়। রামনাদের রাজারাই সেতুপতি। তাঁরাই বরাবর রামেশ্বর শিবের আর সেতুর সমস্ত দেবদেবীর পুজোর ব্যবস্থা ক'রে আসছেন। রামনাদে সেতুপতি-রাজাদের চিত্র করা রয়েছে।

রামেশ্বর-মন্দির থেকে ভারতমহাসাগর আর বঙ্গোপসাগর-সঙ্গমে ভারত-ভূমির শেষ স্থলবিন্দু হচ্ছে ধনুষ্কোটী। রামেশ্বর থেকে গেলেন ওঁরা সমুদ্রের কূলে কূলে নৌকোয় ক'রে। খালি পায়ে বালির ওপর দিয়ে চ'লে ধনুষ্কোটী স্নানের ঘাটে পৌঁছলেন। সাগর বেঁধে রামচন্দ্র যে-সেতু তৈরী করেছিলেন ধনুষ্কোটী তারই গোড়া। এখান থেকে সিংহল মাত্র ষাট মাইল। রামেশ্বর-দ্বীপের শেষ অংশে ধনুষ্কোটী। 'রামঝড়কা'-স্তম্ভ দেখলেন। রামচন্দ্রের সেতুর ওপর দিয়ে আগে লোকজন যাতায়াত করতো। এখন আর যায় না। রামচন্দ্র সাগরের খাতিরে লক্ষ্মণকে সেতুর তিন স্থান ভেঙ্গে দিতে বলেন। লক্ষ্মণ ধনুর অগ্রভাগ দিয়ে সেতুর গোড়া কেটে দেন — তাই ধনুষ্কোটী। 'ধনুষ্কোটীর' স্নান-ক্ষেত্রের তিন-চার মাইলের মধ্যে কোনও লোকের বসবাস নাই; একটি কেবল ছোট মন্দির আছে। ধনুষ্কোটি সেতুবন্ধের শেষ সীমা। সেখানে গিয়ে পাণ্ডাদের দোতলা বাড়িতে উঠলেন। খুবই যত্ন-আত্তি করলে। ছিলেন এক রাত্রি। চারদিক সমুদ্রঘেরা। ওখান থেকে সেতুবন্ধে গিয়ে দেখলেন, একটি ব্রিজ গাঁথা রয়েছে। মাঝে মাঝে চরা। এই বোধহয় সমুদ্রে পাথুরে পথ —সেতুবন্ধ। পাথর গেঁথে গেঁথে করেছিল।

'রামায়ণের ছবি করি যখন, সমুদ্রশাসন বা সেতুবন্ধের ছবিও আঁকা আছে। সে-সব এখানকার আইডিয়া নিয়ে করা।' —বললেন নন্দলাল। —ধনুষ্কোটীতে 'সমুদ্রশাসন' - এ-সব ছবি সুরেন গাঙ্গুলীও তখন করেছিলেন। আর সমুদ্রের ধারে রামচন্দ্রের হত্যা দেওয়ার স্থান। যখন তিনি বাণবিদ্ধ

হচ্ছিলেন, তখন সমুদ্র উঠে এলেন সশরীরে'।

দক্ষিণভারত দেখার পালা শেষ ক'রে, আবার মাদ্রাজ হ'য়ে ওঁরা সোজা সেবারে কলকাতায় ফিরে এলেন। —১৯০৮ সালের সে বোধহয় সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস হবে। তীর্থভ্রমণের পুণ্য-সঞ্চয়ের যদি কোনও বাস্তব মূল্য থাকে, তা'হলে বলতে হয়, ভারত-মন্দির-অঙ্গনে ঘুরে ঘুরে নন্দলালের তৈর্থিক ও শিল্পী মন স্বদেশের শিল্প-ঐতিহ্যের মহিমময় রূপ দেখে দেখে, শিল্পচেতনার বিকাশে কানায় কানায় ভরে উঠেছিল।

নন্দলালের এই উত্তর ও দক্ষিণভারত ভ্রমণের নানা স্মৃতি তাঁর সারা জীবনের চিত্রসাধনায় বিচিত্র রূপ পেয়ে এসেছে। দুঃখের স্মৃতিগুলি তিনি ভুলতে চেয়েছেন। ভালো লাগার স্মৃতি-সম্ভার শিলালিপির মতন, তাঁর মনে দাগ কেটে কেটে ব'সে আছে। সহজ সুখের সেই স্মৃতির রেখা সব রয়ে গেছে, ফুটে উঠেছে তাঁর প্রখ্যাত চিত্রমালায়। —এই বিষয়ে সেদিন (২৮-৪-১৯৬৫) তিনি একটি গল্প বললেন। —'আর্টিস্টদের জীবনে কোনও ঘটনা কি ক'রে মনে থাকে. জানো? Flight of Dragon বই থেকে একটা গল্প বলি. শোন। —একজন খুব বড়ো আর্টিস্ট। থাকেন তিনি গ্রামে। গ্রামের জমিদার একবার তাঁকে ফরমাশ করলেন, তাঁর পোর্ট্রেট ক'রে দিতে হবে। সেজন্যে তিনি আর্টিস্টকে অনেক টাকাও অগ্রিম দাদন দিয়ে দিলেন। কিন্তু, দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়, ছবি আর হয় না। টাকা দিয়ে ছবি না-পেয়ে, জমিদার বিরক্ত হন, কিন্তু, তবুও ছবি তিনি আর পান না। মাঝে মাঝে খবর নেন, তাগাদা দেন।

জমিদারের ছিল একটি ছোট্ট চাকর। খুবই ছেলেমানুষ সে। সেই ছেলেটাকে পাঠাতেন জমিদার সেই আর্টিস্টের কাছে ছবি চাইতে। ছেলেটি গিয়ে আর্টিস্টের কাছে চুপচাপ বসে থাকতো প্রায়ই। —ছবি-আঁকা দেখতো। ছেলেটির দিকেও মাঝে মাঝে চেয়ে দেখতেন আর্টিস্ট —প্রীতি-ভরা চোখে।

সহসা শিল্পী একদিন বললেন, তাঁর ছবি আঁকা হয়ে গেছে। ছবি ক'রে, কাগজে মুড়ে, সেই চাকর-ছেলেটির মার্ফৎ জমিদারবাবুকে পাঠিয়ে দিলেন। জমিদারবাবু ছবি পেয়ে তো মহাখুশি। কিন্তু, বন্ধু-বান্ধবের সামনে প্যাকেটটা খুলে একেবারে বেকুব। দেখেন কি, সেই পোর্ট্রেট তাঁর নয়; সেই বালক-

ভৃত্যটির।

—তাই বলি, তেমন মনোমত না হ'লে কিছুই মনে ধরে না তো শিল্পীর। বিশেষ ক'রে ছবি হয় ইন্‌টারেস্ট্ থেকে। তা না-হ'লে, ভালো ছবিই হয় না। মনের স্মৃতি থেকে ইন্‌টারেস্ট্ জন্মায়; আর, ইন্‌টারেস্টিং কিছু হ'লে সাধারণতঃ সেটা আর ভুল হয় না। গুরুদেবের 'জীবনস্মৃতি' এই রকম সব মজার ঘটনা দিয়েই ভরা। কিন্তু, পণ্ডিতী চাল অন্যরকম। সেখানে তথ্য আর তত্ত্বের ছড়াছড়ি। তাই দিয়েই তাঁদের জীবন ঠাসা।

আমার ভারতভ্রমণ আমার জীবনে যেন একটি অক্ষয় চিত্রশালার রূপ ধ'রে আঁকা ছিল বরাবর। বিচার নয়, বিশ্লেষণ নয়, যুগ-যুগান্তর ধ'রে ফুটিয়ে তোলা, ভারতবর্ষের শিল্পদেবতার মোহন 'রূপাবলী'র দিকে ভালো-লাগার কাজল প'রে, কেবল অবাক্ হ'য়ে, আমার সেই চেয়ে-দেখার দিনগুলি মনে পড়ে আজও।'

ফিরে এসে আবার আর্টস্কুলে; নানা লোকের সঙ্গে পরিচয়।—

শ্রীমাকে সিস্টার বলেছিলেন, —'মা, আমরা আর-জন্মে 'হিঁদু' ছিলুম। ঠাকুরের কথা ওদেশে প্রচার হবে বলেই আমরা ওদেশে জন্মেছি।'—তাঁর এই 'হিন্দুত্বের' অর্থ হলো —ভারতবর্ষকে চেনা ; ভারতবর্ষের পুরাতন ঐতিহ্যকে সুন্দর ক'রে তুলে ধরা। সেকালের বাঙ্গালার বিশিষ্ট শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, স্বদেশপ্রেমী প্রত্যেকের সঙ্গেই তাঁর অল্প-বিস্তর যোগাযোগ ছিল। তাঁরা সিস্টারের কাছে এসে যেন নিজেদের জীবনের আদর্শ প্রত্যক্ষ করতে পারতেন। বিশেষতঃ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্পকলা ছিল যেন তাঁর নখদর্পণে। বিচার ক'রে দিতেন চুল-চেরা।

সিস্টারের শিল্পরুচি ছিল অত্যন্ত প্রখর। ভারতশিল্পের নবজাগরণকল্পে তাঁর দান অসামান্য। তিনি বলতেন, —জাতীয় শিল্পের পুনরুদ্বোধনের ওপরেই ভারতবর্ষের ভবিষ্যতের অশেষ সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে ; বিশেষ ক'রে, জাতীয় শিল্পকলা, জাতীয় চেতনা আর জাতীয় ইতিহাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া অবশ্যই দরকার। নইলে বনেদ পোক্ত কিছুতেই হ'তে পারে না।

সিস্টার কলকাতায় আসার পরেই, আর্টস্কুলের অধ্যক্ষ হ্যাভেল সাহেবের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। এই সময়ে অবনীবাবুর বাড়িতে শিল্পী আর শিল্পরসিকগণের যে সভা বসতো, সিস্টার সেখানে আসতেন মাঝে মাঝে। হ্যাভেল সাহেব, সিস্টার আর অবনীবাবুর যোগাযোগে ভারতচিত্রকলায় নবজীবন এসেছিল। হ্যাভেল সাহেব বলতেন, —'আমি ছাত্রদের তুলি ধরতে আর রং দেওয়া শেখাতে পারি ; কিন্তু, কাউকে শিল্পী বা গুণী ক'রে তুলতে পারিনা। সিস্টার ভাবতেন, —'এ-কাজ কঠিন নয়। দেশপ্রেম, স্বজাতি-প্রীতি, বংশগৌরব, উচ্চাভিলাষ আর ভারতীয় আদর্শকে বোঝবার জন্যে অসীম ব্যাকুলতা —এই গুণগুলোর সমাবেশ হ'লেই, শিল্পে, বিজ্ঞানে আর ধর্মে শক্তির এমন জোয়ার আসবে যা ঠেকানো যাবে না। সুতরাং, তুলি ধরতে শেখবার সময়ে ছাত্রদের ঐভাবে অনুপ্রাণিত করতে পারলে যথার্থ

শিল্পী গ'ড়ে তোলা সম্ভব হবে। পরানুকরণের হাল্‌কা হাওয়ায় ভাসলে, আখেরে উপকার হয় না।

ভারতশিল্প সম্পর্কে সিস্টার প্রথম শিক্ষা পেয়েছিলেন তাঁর গুরু স্বামী বিবেকানন্দের কাছে। এই বিষয়ে তাঁর গুরুর সঙ্গে বহু আলোচনা তাঁর হয়েছিল ; আর নিজের অন্তর্দৃষ্টি বলে, ভারতশিল্পের সূক্ষ্ম কারুকার্য আর গম্ভীর ভাবব্যঞ্জনা অতি সহজেই তিনি উপলব্ধি করতে পারতেন যেন তৃতীয় নয়ন দিয়ে।

১৯০৭ সালে 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকার জন্মক্ষণ থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত সিস্টার সম্পাদকীয় মন্তব্য লেখার আংশিক ভার নিয়েছিলেন। রামানন্দবাবু তাঁর 'প্রবাসী', 'মডার্ণ-রিভিউ'তে প্রথমদিকে কেবল রবিবর্মার বা ঐ ধরনের ছবি ছাপতেন। তাতে সিস্টার রামানন্দবাবুর সঙ্গে রীতিমতো তর্ক ক'রে তাঁকে বুঝিয়ে ছিলেন যে, ওঁদের চিত্রকর্ম ভারতীয় পদ্ধতিতে আঁকা নয় ; আর চিত্র হিসেবেও ওগুলো উৎকৃষ্ট নয়। আসলে ওগুলো না-ঘাট্‌কা না-ঘরকা।

চিত্রকলার সৌন্দর্য উপলব্ধি ক'রে ব্যাখ্যা করার সহজাত ক্ষমতা ছিল সিস্টারের। অবনীবাবুর আর অন্য শিল্পীদের 'প্রবাসী', 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশিত বহু চিত্রের পরিচয় তিনি লিখেছিলেন। ঐ সব সমালোচনায় চিত্রকলা সম্পর্কে সিস্টারের সুচিন্তিত সব মন্তব্য অশেষ মূল্যবান্। পাশ্চাত্য শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের আঁকা বহু ছবি তিনি আনিয়ে 'মডার্ণ রিভিউ'তে ছাপাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। চিত্রপরিচয় অবশ্য লিখতেন নিজেই। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, পাশ্চাত্য চিত্রকলার নিকৃষ্ট অনুকরণ না-ক'রে, তার মধ্যে যা-কিছু উত্তম, এদেশের শিল্পীরা সেটা ভালোভাবে উপলব্ধি ক'রে, ভারতশিল্পের শৈলীতে স্বকীয় ধারায় তা' প্রকাশ করবেন। তবেই সে ছবিতে প্রাণ উছলে উঠবে।

আর্টস্কুলে সিস্টার অনেক বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সেগুলি এখনও সংগ্রহ ক'রে ছাপানো হয়নি। হ্যাভেল সাহেব Indian Sculpture and Painting বইয়ের সমালোচনা ক'রে, এই বইয়ে হ্যাভেল সাহেবের অর্থাৎ একজন ইউরোপীয়ের ভারতশিল্প-সম্পর্কে অটুট ভালোবাসা আর শ্রদ্ধার পরিচয় প্রথম প্রকাশ পেয়েছে, —এই কথা লিখেছেন সিস্টার। সিস্টার আর হ্যাভেল দু'জনেই সেকালে ভারতশিল্পকে রক্ষা ক'রে, বিশ্বের দরবারে যথাযোগ্য

মর্যাদা দেবার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছিলেন। তাঁদের সক্রিয় সাহায্যে ভারত-শিল্পের প্রাণপ্রতিষ্ঠার আর রূপদানের ভার নিয়েছিলেন অবনীবাবু। সিস্টারের অনুপ্রেরণার কথা অবনীবাবু অকপটে স্বীকার ক'রে গেছেন। অবনীবাবু নিজে প্রথমে পাশ্চাত্য শৈলীতে হাত-মক্স করতেন। সিস্টার তাঁকে ভারতীয় পদ্ধতি যথাযথভাবে অনুসরণ করবার জন্যে প্রভূত প্রেরণা দিয়েছিলেন। সিস্টার আর অবনীবাবু পরস্পরের গুণমুগ্ধ ছিলেন। অবনীবাবুর বহু ছবির পরিচয় লিখেছিলেন সিস্টার। তাঁর 'ভারতমাতা' ছবির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতেন তিনি। 'সাহজাহানের অন্তিমশয্যা' ছবিখানির জন্যে সবার কাছে গর্ব করতেন খুব। বলতেন, —এই হচ্ছে প্রকৃত ভারত-কথা।

স্বদেশী চিত্রশিল্পের প্রচারের ভার নিয়েছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। তিনি সিস্টারকে দিয়ে চিত্রকলা-সম্পর্কে প্রবন্ধ লেখাতেন, আর চিত্রপরিচয় লিখিয়ে, নিজে অনুবাদ ক'রে 'প্রবাসী'তেও ছাপতেন। আর অজন্তা-গুহার চৈত্য ও বিহারগুলি সম্পর্কে সিস্টার 'মডার্ণ রিভিউ'তে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রের স্বদেশী-শিল্প আর চিত্রকলার প্রতি যে অনুরাগ, তারও পিছনে অনেকখানি ছিল সিস্টারের প্রভাব। জগদীশবাবুর বৈঠকখানায় 'ভারতমাতা'র চিত্র সম্ভবতঃ সিস্টারের ইচ্ছাতেই ঈশ্বরীপ্রসাদ এঁকেছিলেন। সিস্টারের আর সশিষ্য অবনীন্দ্রনাথের শিল্পসাধনায় পরে যোগ দিলেন কুমারস্বামী। এই সূত্রে ওঁদের মধ্যে নিবিড় সহযোগিতা আর প্রীতির সম্পর্ক গ'ড়ে উঠেছিল।

তখনকার আর্টস্কুলে ছাত্র নন্দলাল, সুরেন গাঙ্গুলী, অসিত হালদার ও আরো অনেকে সিস্টারের কাছে যেতেন উৎসাহ, প্রেরণা আর ভারতীয় পদ্ধতি অবলম্বন ক'রে ছবি আঁকবার জ্ঞান লাভ করবার জন্যে।

অবনীবাবু সিস্টার নিবেদিতাকে দেখে বলেছিলেন, —ইনি যেন সাক্ষাৎ পার্ব্বতী। অন্যত্র দেখি, অবনীবাবুর উক্তি, —'চন্দ্রমণি দিয়ে গড়া কাদম্বরীর মহাশ্বেতা।' রবীন্দ্রনাথ সিস্টার নিবেদিতার জীবনকে 'সতীর তপস্যা'র সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। সিস্টার আত্ম-পরিচয় দিতে গিয়ে প্রথমে লিখতেন 'Sister Nivedita of RKV'; তারপরে লিখতেন 'Sister Nivedita of Ramakrishna Vivekananda।' নন্দলাল 'সতী' বা 'উমার তপস্যা' ছবিগুলির জীবন্ত আদর্শ হয়েছিলেন সিস্টার। 'স্ফটিক আর রুদ্রাক্ষের মালা প'রে

থাকতেন সিস্টার সাদা সিল্কের ক্লোকের ওপর। ধপধপে বরফের মতো সাদা চেহারা। অপূর্ব সুন্দরী। —তাঁকে দেখেছি বেশ ক'বার। আমার 'সতী' বা 'উমার তপস্যা' ছবির খানিকটা আদল তাঁর চেহারায় ছিল বৈকি' —বললেন নন্দলাল ১৯৬৫ সালের ২৬-এ ফেব্রুয়ারী। 'আর পাণ্ডিত্যপূর্ণ কতো লেখা তাঁর নানা বিষয়ে। বেদ সম্পর্কেও বই লেখবার ইচ্ছা ছিল সিস্টারের'।

সুরেন গাঙ্গুলীর 'যশোদা ও কৃষ্ণ' ছবিটি সিস্টার নিবেদিতার Cradle Tales of Hinduism' বই-এর বর্ণনা অনুযায়ী অাঁকা। নন্দলাল সিস্টার নিবেদিতার Myths of Hindus and Buddhists বইটির জন্যে অনেক ছবি এঁকে বইটিকে চিত্রভূষিত করেছিলেন। সিস্টারের মৃত্যুর পরে, ১৯১৪ সালে বইখানি কুমারস্বামীরও নামযুক্ত হ'য়ে প্রকাশিত হয়। কুমারস্বামী বোধহয় সিস্টারের এই বইখানিকে রিভাইজ ক'রে দিয়েছিলেন। এই বইটি বের হয় with 32 illustrations in colour by Indian Artists under the supervision of Abanindranath Tagore। বইখানিতে অসিত হালদারের অাঁকা একখানি, সুরেন করের দু-খানি, অবনীবাবুর পাঁচখানি, বেঙ্কটাপ্পার আর ক্ষিতীন মজুমদারের সাতখানি ক'রে, মোট বাইশখানি আর নন্দলালের দশখানি রঙিন ছবি ছাপা হ'য়েছে। নন্দলালের ছবির মধ্যে গরুড়, একলব্য, অস্ত্রপরীক্ষা, জতুগৃহদাহ, কিরাত-অর্জুন, যুধিষ্ঠির, জন্মাষ্টমী, উমার তপস্যা, শিবের বিষপান আর যম ও নচিকেতা ছবিগুলি র'য়েছে। 'এর মধ্যে 'গরুড়' অাঁকা স্টোন কালার টেম্পেরায়, বাকী ছবিগুলি অাঁকা ওয়াটার কালারে।'

নন্দলালের অাঁকা 'হিমালয়ের শিব' (Siva of the Himalayas) ছবির ক্যাপশনে রামানন্দবাবু সিস্টার নিবেদিতার উচ্ছ্বসিত বাণী উদ্ধৃত করেছিলেন : 'The Aryans fell in love with India and became Hindus. And what was their thought about the Snow-Mountains ? Lifted above the world in silence, terrible in their cold and their distance, yet beautiful beyond all worlds, what are they like ? Why, they are like—a great monk, clothed in ashes, lost in meditation, silent and alone ! They are like,-like,—the Great God Himself, Siva, Mahadev'—

'এই মন্তব্য আমার ছবি দেখে সিস্টারের লেখা' —বললেন নন্দলাল ১৯৬৫ সালের ২৪-এ ফেব্রুয়ারী।

ভারতচিত্র-কলার বিচার-বিশ্লেষণে সিস্টার নিবেদিতা ছিলেন সদা-তৎপর। ভারতীয় মহাজাতি গড়তে শিল্পের শক্তিমত্তা আর প্রাণপ্রাচুর্য যে কতো কার্যকর, তা' তিনি বিশেষভাবে ব্যাখ্যা ক'রে সবাইকে বুঝিয়ে দিয়েছেন তাঁর নানা প্রবন্ধে, নানা গ্রন্থে আর নানা আলোচনায়। নন্দলালের ছবি সম্পর্কে সিস্টার লিখে ও মুখে নানা মন্তব্য করেছিলেন নানা স্থানে।

সিস্টার নিবেদিতার সঙ্গে নন্দলালের প্রথম দেখা হয়েছিল আর্টস্কুলে। নিয়ে গিয়েছিলেন ব্রহ্মচারী গণেন মহারাজ। সিস্টার তখন নন্দলালের দু'খানি ছবি দেখেছিলেন —'কালী' আর 'সত্যভামার মান'। কালীমূর্তির গায়ে কাপড় জড়িয়ে দিয়েছিলেন নন্দলাল। কালী কাপড়-পরা দেখে সিস্টার বললেন, —'এ কী, কালী যে উলঙ্গিনী, কোনো আবরণ নেই তাঁর গায়ে ; কাপড়-চোপড় দিয়ে এমন জবর-জং করেছো কেন। স্বামীজীর লেখাটা প'ড়ে দেখো।'

'সত্যভামা'র ছবিতে শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামার পায়ে হাত দিয়ে মান সাধছেন। সিস্টার দেখে বললেন, —'তুমি তো পুরুষ মানুষ ; তবে, স্ত্রীলোকের পায়ে হাত দেওয়া পুরুষের ছবি করেছো কেন? এতে-যে তোমাদের মন খাটো হয়ে যাবে। তোমরা আঁকবে মহাভারতের কৃষ্ণকে ; তোমাদের মন সতেজ হ'য়ে উঠবে তাতে'। বললেন সিস্টার ওজস্বিনী ভাষায়।

বোসপাড়া লেনে সিস্টারের বাড়িতে দেখা করতে গিয়ে অনেক ছবি দেখিয়েছিলেন নন্দলাল।

'দশরথ ও কৌশল্যা'র ছবিতে কৌশল্যার হাতে নন্দলাল তালপাতার পাখা দিয়েছিলেন। মাত্রাজ্ঞানের অভাব দেখে, সিস্টার তক্ষুণি বললেন, —'এ কী, রাজরাণীর হাতে তালপাতার পাখা দিয়েছো যে। তবে, তোমরা আইডিয়াই বা পাবে কোথা থেকে, বলো। রাণীর হাতে থাকবে আইভরীর পাখা'। 'আইভরীর পাখা ?' —এঁরা জিজ্ঞাসা করলেন হ'য়ে। সিস্টার বললেন, —'ম্যুজিয়ামে গিয়ে দেখে এসো, আইভরীর

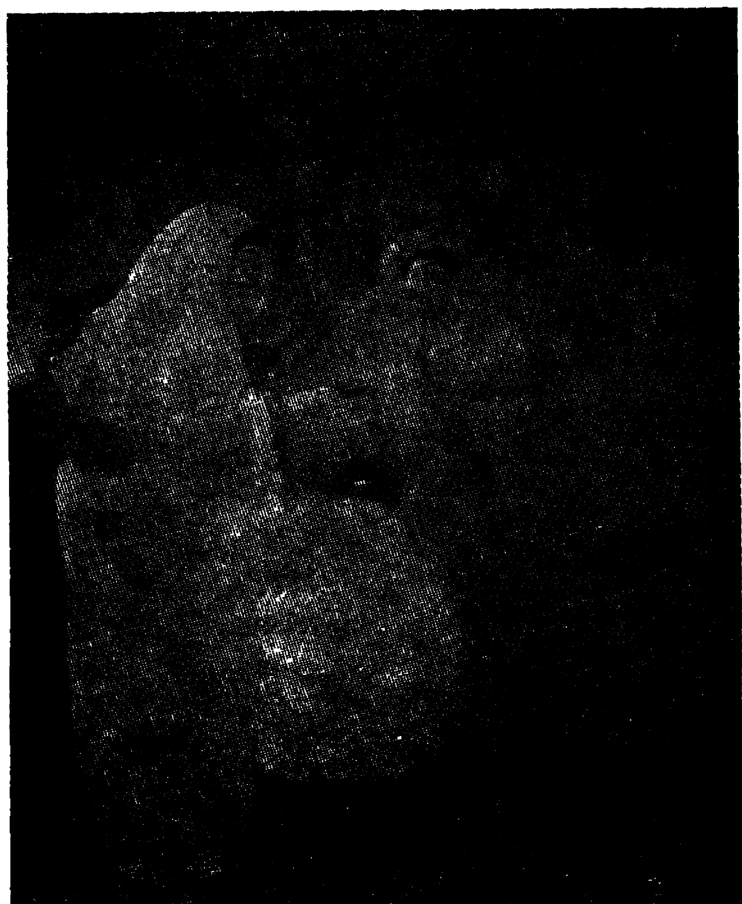
পাখা দেখতে কেমন'।

'জগাই-মাধাই'-এর ছবি করেছিলেন নন্দলাল। সিস্টার দেখে বললেন, —'ভালো হয়েছে। আচ্ছা, মুখের এই টাইপটা তুমি পেলে কোথা থেকে?' নন্দলাল মুখে হাসি চেপে বললেন, —'গিরিশ ঘোষ মশায়ের চেহারা থেকে নিয়েছি'। জগাই-মাধাই-এর কোমরে থেলো হুঁকো দেখে সিস্টার বললেন, —'থেলো হুঁকো কিন্তু শহুরে বাবুরা খায় না এখন।'

স্বামীজীর ছবি করেছিলেন নন্দলাল। গায়ে ছিল কাপড়-জড়ানো। সিস্টার দেখে বললেন, —'এ হয়নি। এতো কাপড় জড়িয়েছো কেন স্বামীজীর গায়ে। তিনি এতো কাপড় জড়াতেন না। তোমাদের দেশের ক্লাইমেটে বেশী কাপড় গায়ে জড়ানো যায় না। বুদ্ধকে দেখ, তাঁর গায়ে কি কাপড় জড়ানো আছে? স্বামীজী ছিলেন বুদ্ধদেবের মতো,' —এই ব'লে, সিস্টার তাঁর ঘরে কাঠের তাকের ওপর রাখা ব্রোঞ্জের একটি মূর্তি দেখিয়ে বললেন, —'কার ছবি বল দেখি'? নন্দলাল বললেন, —'বুদ্ধের'। 'না, বুদ্ধের নয়, —স্বামীজীর। তিনিই যে বুদ্ধ'।

সিস্টার নন্দলালকে স্বামীজীর ছবি অাঁকবার স্কীম দিয়েছিলেন। —হিমালয় : গঙ্গার ধারা নেমে আসছে : পাশে স্বামীজী বসে আছেন ধ্যানমগ্ন হয়ে।

একদিন নন্দলাল আর সুরেন গাঙ্গুলী গিয়েছিলেন সিস্টারের ঘরে দেখা করতে। বাগবাজারের বোসপাড়া লেনের সেই ছোট্ট দোতলা বাড়ির বসবার কামরা। সিস্টার ওঁদের বসতে বললেন। ওঁরা বসলেন একটা সোফাতে। নিচে মেঝেয় কার্পেট পাতা ছিল। সিস্টার বললেন, —'তোমরা নেমে বসো'। এই কথা শুনে, নন্দলালদের মনে খুব রাগ হলো। মেম সাহেব তাঁদের অপমান করলে। সিস্টার কিন্তু তখনই বললেন, ওঁদের মনের ভাব বুঝে, —'তোমরা হচ্ছ বুদ্ধের দেশের লোক। তোমাদের সোফায় বসা দেখতে আমার ভালো লাগে না। এই দেখ, তোমরা যে মেঝেতে এইভাবে বসেছো, —ঠিক বুদ্ধের মতন বসা হয়েছে। ভারী ভালো লাগছে আমার দেখতে'। —এই ঘটনাটিকে নিয়ে ১৯০৮ বা ১৯০৯ সালের স্মৃতি থেকে অাঁকা নন্দলালের মূল্যবান স্কেচ্ দু-খানি ছাপা হয়েছে প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণার 'ভগিনী নিবেদিতা' (১৯৫৯) গ্রন্থে ২৭২



ষষ্ঠীপূজা - নন্দলাল

আর ৪৩১ পৃষ্ঠায়।

ছবি নিয়ে গিয়েছিলেন নন্দলাল —'দশরথের মৃত্যু'। দেখে সিস্টার বললেন, —'আমার খুব ভালো লাগছে। এই যে ঘরটা করেছ, এটা খুব কাম এ্যাণ্ড কোয়ায়েট মনে হচ্ছে —ঠিক্ শ্রীমায়ের ঘরের মতো। তাই বোধহয়, এতো ভালো লাগছে আমার'।

সিস্টার বলতেন, —রামায়ণ মহাভারত থেকে বীরত্বপূর্ণ সব কাহিনী নিয়ে ছবি অঁাকতে। তারপরে প্রায়ই যেতেন নন্দলাল তাঁর কাছে। নানা উপদেশ দিতেন তিনি. ঘরের লোকের মতো হ'য়ে গিয়েছিলেন যেন। স্নেহভরা ঘরোয়া কথাও কইতেন। একদিন সুরেন গাঙ্গুলীকে সিস্টার বললেন, —'এঃ. তোমার গায়ের জামাটা বড়ো পাতলা, ঠাণ্ডা লাগবে যে'। নন্দলালকে বললেন, —'তোমারটা বেশ পুরু'।

সিস্টারকে নন্দলাল শেষ ছবি দেখিয়েছিলেন —'ষষ্ঠীপূজা'। "আমি ছবি নিয়ে গেলুম। সিস্টার ছিলেন বোধহয় পুজোর ঘরে। বেরিয়ে এসে সামান্য দু'একটা প্রশ্নের পরে, ছবিখানি দেখলেন। দেখেই, সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন. —'তোমার বিয়ে হয়েছে ?' আমি বললুম, —আজ্ঞে হ্যাঁ. আমার এক ছেলে, এক মেয়ে। গৌরী আর বিশু তখন হয়েছে। কোলে ছেলে, আর মেয়েটির হাত ধ'রে তাদের মা গাঁয়ের ষষ্ঠীতলায় গেছেন পুজো দিতে। গৌরী আর বিশুর আদল ছিল ছবিতে —মায়ের খোকা আর খুকীর অবয়বে। ছবির পরিবেশটি দেখে খুব প্রশংসা করলেন সিস্টার। সেই শেষ দেখা আমার সিস্টারের সঙ্গে।

বোসপাড়া লেনে সিস্টারের বাড়ির ground plan-এর যে স্কেচ্ করেছেন নন্দলাল তাতে দেখা যাচ্ছে —'উত্তরে বসি সেনের বাড়ি ১ —সিস্টারের দোতলার ঘর, এই ঘরে আমি ও ৺সুরেন গাঙ্গুলী গিয়ে ওঁর সঙ্গে দেখা করেছিলাম ২ সিস্টার কৃস্টিনের ঘর। ৩—বাড়ির পিছনের উঠনে সিস্টারের সকালের পূজা ও ধ্যান করার মাটির বারান্দা। ৪—গোপালের মা যখন পীড়িত হয়েছিলেন ঐ ঘরে সিস্টার তাঁর সেবা করতেন। ৫—বাড়ির পিছনের উঠান ও বাগান—। ৬—শিউলি ফুলের গাছ —সিস্টার অজন্তা থেকে এনে রোপণ করেছিলেন।'

এই সময়ে নন্দলালের 'সতী', আর 'গান্ধারী' প্রবাসীতে প্রথম ছাপা

হয়েছিল ১৩১৫ সালে। সেকালেই 'প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী' (১৯০৯) নন্দলালের বিখ্যাত 'শিবতাণ্ডব'-চিত্রের প্রতিলিপি 'মহাদেবের তাণ্ডবনৃত্য' নামে ১৩১৬ সালের বৈশাখ সংখ্যার প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়েছিল। চিত্রপরিচয় (প্রবাসী ১৩১৬, বৈশাখ, পৃ ৬৭) দেওয়া হয়েছে এইভাবে: 'এই চিত্র শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর অঙ্কিত। বিশ্বজগতের মঙ্গলে যে আনন্দ, সেই আনন্দরসপানে বিভোর নৃত্যপরায়ণ শিবের মূর্তি চিত্রকরের কবিসুলভ কল্পনাশক্তি ও শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক। সত্য বটে শিব প্রলয়জনিত ধ্বংসের মধ্যে নৃত্য করিতেছেন, তাঁহার পার্শ্বে ও পদতলে প্রলয়াগ্নি শিখারও রক্তিম আভা দৃষ্ট হইতেছে কিন্তু প্রলয়ের মধ্যেই সৃষ্টির বীজ নিহিত, মৃত্যুই উচ্চতর জীবনের দ্বার, নাশ স্থিতিরই রূপান্তর।' এই চিত্রখানির উৎকর্ষ সম্পর্কে ১৯০৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকাতে সিস্টারের আর কুমারস্বামীর সুচিন্তিত মন্তব্য ছাপা হয়েছিল।

নন্দলালকে ১৯০৯ সালে প্রথম অজন্তা পাঠাবার ব্যাপারে সিস্টার ছিলেন প্রধান প্রয়োজিকা। পাঠিয়েও স্বস্তি ছিল না। শিল্পীদের তদ্বিরের জন্যে নিজেও দৌড়েছিলেন অজন্তায়। ১৯১১ সালের শরৎকালে (১৩ই অক্টোবর) চুয়াল্লিশ বছর বয়সে সিস্টারের দেহান্ত হয়েছে। তাঁর বোসপাড়া লেনের বাড়িতে প্রতি শারদপ্রাতে শিউলি ফুলের গাছটিতে বোধহয় এখনও ফুল ফোটে —অজন্তা থেকে চারা এনে, অসীম মমতায়, নিজের হাতে রোপণ করেছিলেন যাকে নিজেরই আঙিনায়।

॥ অজন্তায় শিল্পতীর্থ প্রসঙ্গে ॥

(১৯০৯-১০)

'ভারতচিত্র-শিল্পের শেষ দীপাবলী যেখানে আজও বিচিত্রচ্ছটা বিস্তার করিতেছে —বৌদ্ধ-যুগের সেই অজন্তা গিরিগুহায় আর বৈদ্যুতিক আলোকপ্রখর এই নব্য বাঙ্গালায় ব্যবধান বিস্তর —পথের ব্যবধান, কালের ব্যবধান, সভ্যতা ভব্যতা উভয়েরই ব্যবধান ; সুতরাং অজন্তার চিত্রশিল্পের সঙ্গে আমাদের সম্পূর্ণ পরিচয় ঘটাইতে হইলে শুধু শুনিয়া নয় সেটা দেখিয়া বোঝাও প্রয়োজন এবং এই উদ্দেশ্যেই শ্রীমান্ নন্দলাল ও অসিতকুমার প্রমুখ বাঙ্গালার তরুণ শিল্পিগণ অজন্তার তীর্থমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা সেই তীর্থযাত্রারই ইতিহাস। এই ইতিহাস পাঠ করিতে করিতে হয়তো প্রাচীন ভারতের নির্বাপিত-প্রায় সেই প্রদীপের দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়িবে --যে প্রদীপের শিখা স্নিগ্ধ উজ্জ্বল প্রশান্ত এবং যাহার আলোক বিদ্যুতের মত তীব্রও নয় —নয়নের পীড়াও দেয় না।' —এই কথা অবনীবাবু লিখেছিলেন ১৩২০ সালে প্রকাশিত অসিতকুমার হালদারের 'অজন্তা' বইয়ের ভূমিকায়।

এ-যুগে ১৮১৯ সালে অজন্তার শিল্পৈশ্বর্য প্রথম আবিষ্কৃত হয়, আর প্রথম কপি করেন Major Robert Gill কুড়ি বছর ধ'রে। কিন্তু ১৮৬০ সালে তাঁর কপিগুলি পুড়ে যায়। এঁর পরে, বোম্বে আর্টস্কুলের অধ্যক্ষ Griffiths সাহেব ১৮৭৫ সালে অজন্তায় গিয়ে, ছবির দ্বিতীয়বার নকল করেছিলেন দশ বছর ধ'রে। ছিল সেগুলি সাউথ কেনসিংটন ম্যুজিয়মে। কিন্তু, এখানেও আগুন লেগে তার অনেকগুলি পুড়ে যায়। তাঁর দু'খণ্ড The Paintings in the Buddhist Cave-Temples of Ajanta (১৮৯৬, ১৮৯৭) নামে বিশাল গ্রন্থের রঙিন ছবিগুলিও ঠিক ঠিক হয়নি। কিন্তু অজন্তার ওপর একটা গভীর শ্রদ্ধা ওদেশে জেগেছিল ওঁদের মনে —সেই কোম্পানীর আমল থেকেই।

হ্যাভেল সাহেবের বন্ধু Dr. W. Herringham। তাঁর স্ত্রী Mrs. C. J. Herringham ছিলেন নাম-করা চিত্রশিল্পী। অজন্তাগুহার ছবি তৃতীয় দফায় নকল করবার জন্যে ১৯০৯ সালের ডিসেম্বর মাসে বিলেত থেকে আসেন তিনি। তাঁর সঙ্গে আর একজন মহিলা-শিল্পী এসেছিলেন Miss Davis। সিস্টার নিবেদিতার যোগাযোগে, অবনীবাবুর আদেশ মতো, নন্দলাল আর অসিতকুমারকে সোসাইটির তরফ থেকে পাঠানো হলো Herringham-কে কপিতে সাহায্য করবার জন্যে। সিস্টার শেষপর্যন্ত জেদ না-ধরলে, ওঁদের যাওয়া হতো কিনা সন্দেহ। কলকাতা থেকে অজন্তা আনাগোনার খরচ-খরচা সব বহন করেছিলেন অবনীবাবু আর তাঁর বড়ো দু'ভাই গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ। অবশেষে, শীতের এক সন্ধ্যায় অসিতকুমার আর নন্দলাল রওনা হয়ে গেলেন অজন্তার পথে।

জগদীশচন্দ্র, তাঁর স্ত্রী, সিস্টার নিবেদিতা আর ক্রিস্টিয়ানার সঙ্গে মিসেস হ্যারিংহামের আগে থেকেই জানাশোনা ছিল। ১৯০৯ সালের বড়দিনের বন্ধে নিমন্ত্রণ পেয়ে ওঁরাও বেড়াতে গেলেন অজন্তায়। আনন্দ ও উৎসাহ দিতে আর গিয়েছিলেন আলোকচিত্রশিল্পী ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ। জগদীশবাবু আর সিস্টারের পরামর্শে হ্যারিংহাম কলকাতা থেকে বেঙ্কটাপ্পা আর সমেরন্দ্রনাথ গুপ্তকে আনিয়ে নিলেন।

প্রথমবারে তিন মাস ধ'রে ওঁরা কপির কাজ করেছিলেন। আবার, ১৯১০ সালের ডিসেম্বরে হ্যারিংহাম অজন্তায় আসেন। এবারে, প্রতিলিপির জন্যে যান অসিতকুমার আর সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত। ১৯১১ সালে হ্যারিংহাম কপির কাজ শেষ করেন। নন্দলাল যাননি দ্বিতীয়বারে। হ্যারিংহাম দু'বারেই ঔরঙ্গাবাদ থেকে দু'জন শিল্পী সৈয়দ আহম্মদ আর কজলুদ্দীন কাজিকে আনিয়েছিলেন সাহায্য করবার জন্যে। দ্বিতীয়বারে হ্যারিংহামের সঙ্গে বিলেত থেকে এসেছিলেন দু'জন শিল্পী Miss Larcher আর Miss Luke। নিজাম সরকার ওঁদের তাঁবু রক্ষের জন্যে দু'বারই পুলিশ-পাহারার সুবন্দোবস্ত করেছিলেন।

দাক্ষিণাত্যে নিজাম রাজ্য আর মহারাষ্ট্রের খান্দেশ জেলার ঠিক সীমান্তে —তাপ্তী নদীর উপত্যকায় 'ইন্দ্রয়াদ্রি', 'সহ্যাদ্রি' বা 'অজন্তা' নামে গুরুত্বপূর্ণ সুপরিকল্পিত পার্বত্য পথ। সেই পাহাড়ের গায়ে খোদা গুহায় আঁকা ছবি।

অজন্তা যাবার পথে সেকালের জি. আই. পি. রেলের জালগাঁও স্টেশন। পাহুড়-পাচোড়া-জামনেড় রেলপথে তেরো মাইলে অজন্তা যাওয়া যায়। ওঁরা ও-পথে যাননি। জালগাঁও থেকে অগ্নিকোণে ৩৭ মাইল মরুপথ। পথের দু'দিকে পুরানো-কালের বৌদ্ধস্তূপ আর স্তম্ভ। তাতেও শিল্পকলা। ওখানকার প্রতি গাঁয়ে জমিদার 'প্যাটেল' সাহেবদের 'প্রাসাদ' আর হনুমানজীর মন্দির। মন্দিরগুলো বৌদ্ধস্তূপের মতো দেখতে। জালগাঁও স্টেশন থেকে ১২ মাইল গেলে একটি নদী, নাম —নেড়ী। গ্রামের নামও নেড়ী। ওখানকার ঘরের চাল খড়ে ছাওয়া নয় —মাটীর ছাদ। 'আর তার ওপর ক্ষেতি।' —এর স্কেচ্ ক'রে দিলেন নন্দলাল ১৯৬৫ সালের ১২ই মে।

ওখানকার 'এ্যাবরিজিন্যাল বান্‌জারা' মেয়েরা কাঁচুলী আর ঘাগরা-পরা। বডিসে আয়না বসানো। সোজা সিঁথি, অলকে ঝুমকো ঝোলানো। উঁচু-করা মাথার খোঁপায় ওড়না-আটকানো যেন বিয়ের টোপর। তাদের বর্ণ গৌর, গড়ন সুন্দর, পায়ে ঘুঙুর। অজন্তার ছবিতেও এর আদল আছে ১৭ নং গুহায় যশোধারার মূর্তিতে।

প্রথমবার ১৯০৯ সালে ওঁরা অজন্তা গিয়ে, গুহার কাছাকাছি যে গাঁয়ে ছিলেন তার নাম ফর্‌দাপুর। এখানে প্রায় দু'শো বছরের পুরানো একটি বাদশাহী সরাইখানা। চক্‌মিলান ঘর, মধ্যিখানে একটা প্রকাণ্ড চৌকো মাঠ। উঠনে একটি মসজিদ। উত্তরে দক্ষিণে গেট দুটি —দুর্গদ্বারের মতো বড়ো। ছাদের ওপরে চার কোণে চারটে উঁচু মানমন্দির।

ফর্‌দাপুর গাঁ থেকে আট মাইল দূরে 'ইন্দ্রয়াদ্রির' ওপর একটি প্রাচীন শহর, —নাম তার 'অজন্তা'। ফর্‌দাপুর থেকে সেখানে যাবার বাদশাহী রাস্তা আগে থেকেই আছে। ওখানেও একটি সরাই। অজন্তা-গুহা, অজন্তা-গ্রাম, ফর্‌দাপুর সবই তখন ছিল নিজাম-রাজ্যে। পূর্ব-খান্দেশের অজন্তা-গ্রামই নিজামরাজ্যের সদর বা শহর। ওখানকার তহশীলদার হলেন ম্যাজিস্ট্রেট্; ওখানকার দ্রষ্টব্য জায়গা সব ওঁদের দেখালেন তিনি। পথগুলি খুব চওড়া। দশ বারোটা হাতী পাশাপাশি একসঙ্গে চলতে পারে।

জালগাঁও স্টেশন থেকে ফর্‌দাপুরের রাস্তা ভালো। কিন্তু, ফর্‌দাপুর থেকে 'ইন্দ্রয়াদ্রি'র গুহার তিন মাইল পথ খুব খারাপ। নন্দলালের ভাষায় —হ্যাঁটাল বন দিয়ে হ্যাচ্‌ড়াতে হ্যাচ্‌ড়াতে' কোনো গতিকে গুহায় গিয়ে

পৌঁছতেন ওঁরা —গরুর গাড়ীতে চেপে। এই পথ চলায় ওঁরা আমোদ পেতেন খুব। অজন্তার পথে পাহাড়ের গায়ে বড়ো বড়ো গাছ নাই। আছে শিউলী ফুলের বন। হলদে পদ্মফুলের গাছও অনেক। পাহাড়ের কোনো কোনো জায়গা পাঁচীরের মতো খাড়া, আর মসৃণ। এখানকার পাহাড়গুলো যেন এক একটা আস্ত পাথরের স্তূপ। পাহাড়ের ভেতরটা মাটিভরা নয়; —ফাঁপা পাহাড়। অজন্তার গুহাগুলো এইরকম একটা পাহাড়ের ভেতরেই খোদাই করা। দুটো পাহাড়ের মধ্যিখানে নিচু স্থানে পাঁচীরের মতন দেখতে প্রায় আড়াইশো ফিট্ উঁচু একটা পাহাড়ের গায়ে, গুহাগুলো খোদাই করা হয়েছে। দেখতে ঘোড়ার নালের মতো। অজন্তার এই বহির্দৃশ্যের নতুন ক'রে স্কেচ্ করলেন নন্দলাল ১৯৬৫ সালের ১২ই মে।

গুহায় ঢোকার পথটি গেছে এঁকে-বেঁকে। অজন্তা-পাহাড়ের গায়ে আঁকা-বাঁকা একটি নদী। নাম তার 'অঘোরা' (Waghora) বা বঘ্‌রা। ঝকঝকে তার জল। গুহায় যাবার রাস্তায়, সেই নদীটিকে চার-পাঁচবার পেরুতে হতো। গুহাগুলির পরিবেশ অতি সুন্দর। সত্যিই যেন বৌদ্ধভিক্ষুদের তপস্যার মনোমত স্থান। সারিবন্দী বিহার-গুহা-ঘরের বারান্দাগুলির থাম আর গোল গোল, বড়ো বড়ো চৈত্যগুহার খিলানের দৃশ্য অপূর্ব। গুহাগুলি পাহাড়ের গায়ে ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় খোদাই করা। গুহার কাছাকাছি কোনো রাস্তা নাই। ওখানে যেতে হলে, গুহার সামনে এক জায়গায় গাড়ী থেকে নামতে হয়। সেখানে দাঁড়িয়ে দেখলে মনে হবে, —দূর পাহাড়ের মাঝখানে সারিবন্দী গুহাগুলি যেন ছোট ছোট পায়রা-খোপ। ওখান থেকে পাহাড়ী ঝরণার নদীর ওপর দিয়ে, গুহা পর্যন্ত দশ-পনেরো মিনিটের হাঁটা পথ। বর্ষায় যাওয়া শক্ত। গুহাগুলোর মুখ প্রবাহের দিকে ফেরানো। এই প্রবাহের একদিকেই সারিবন্দী অজন্তা-গুহা। অদূরে একটি জলপ্রপাত, সাতটি ধাপে লাফ দিয়ে দিয়ে যেন সাতটি সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামছে। প্রত্যেক সিঁড়ির নিচে সাতটি পুকুর —নাম 'সাতকুণ্ড'। সবার নিচের কুণ্ডটিতে বারো মাস জল থাকে। গুহাবাসী ভিক্ষুগণ বোধহয় এখান থেকেই খাবার জল নিয়ে যেতেন।

প্রতি মকর-সংক্রান্তিতে এখানে একটি মেলা বসে। মারাঠী মেয়ে-

পুরুষে নানা রঙের পোষাক প'রে মেলায় আসে। দোকান পসার বসে কুণ্ডের ধারে। অজন্তা-গুহার মূর্তিগুলি সম্পর্কে ওদেশের লোকের সব অদ্ভুত ধারণা। গুহাঘরের ভেতরের বুদ্ধমূর্তিগুলিকে তারা 'রাম'-'লছমন' ব'লে মনে করে। পাণ্ডারাও মূর্তিগুলিকে নানা সাজে সাজিয়ে সিঁদুর লেপে তীর্থযাত্রীদের কাছে আসর জমিয়ে ছিল। ২৬ নম্বরের গুহায় বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণের প্রকাণ্ড মূর্তিটিকে তারা জানে সীতাদেবীর মরা মা ব'লে।

জটাধারী, ছাইমাখা, গেরুয়া-পরা সাধু-সন্ন্যাসীর আনাগোনাও এই তীর্থক্ষেত্রে সম্বছরে কম হয় না। আসেন অনেকে লাঠি-হাতে; লাঠিতে আবার ঘুঙুর বাঁধা। কেউ কেউ কিছুদিন এখানে বাসও ক'রে থাকেন ধুনি জ্বালিয়ে। এই গুহার গায়ে ছবির ওপর আবার তাঁরা আঁকেন সিঁদুর দিয়ে ত্রিশূল-চিহ্ন। রান্নাবান্না করেন এখানেই। উনুনের আর ধুনির ধোঁয়ায় আর সিঁদুর লেপায় অনেক চিত্র নষ্ট হয়ে যায় বছর বছর। —তবে যাই হোক্, এঁরা শৈব-নাথযোগী। এক কালের বৌদ্ধ চৈত্য বিহারগুলির শিল্পমূল্য তাঁদের কাছে থাক্-না-থাক্, এই সুপ্রাচীন বৌদ্ধসংস্কৃতি-কেন্দ্রটিকে একদা তাঁদের পূর্বগোত্রীয়দের তৈরী বলে চিনে নিতে ভুল হয়নি আজও।

আর আছে পাহাড়ী মৌমাছির ঝাঁক। তারাও এই নির্জন গিরিকন্দরে যুগ যুগ ধ'রে মধু সঞ্চয় ক'রে আসছে। হঠাৎ তারা চমকে উঠে, তেড়ে আসে নতুন যুগের নতুন মানুষের পায়ের সাড়া পেয়ে; বহু যুগ আগে বহু স্থপতি, বহু ভাস্কর আর বহু চিত্রকর মিলে এইসব গুহা যাঁরা অলঙ্কৃত করেছিলেন, যাঁদের এই কীর্তিকলাপ আজও জগতে অতুলনীয় —তাঁদেরই যেন যুগযুগান্তরের রাতজাগা প্রহরী হয়ে। ওদেশের গাঁয়ের লোকে এই গুহাগুলোকে মানুষের তৈরী ব'লে মনে করে না। আমাদের দেশে পাণ্ডুয়া-ত্রিবেণীর মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ গড়ার যে পুরানো গল্প শোনা যায়, সেই রকম কাহিনী অজন্তা-গুহার সঙ্গেও জড়িয়ে রয়েছে। এখানে হিন্দু থেকে ইসলামি আর ওখানে বৌদ্ধ থেকে হিন্দু রূপান্তরের এই মজার গুপ্ত ইতিহাস।—

—বহু যুগ আগে, বিষ্ণু 'ইন্দ্রয়াদ্রি' খোদাই ক'রে গুহাগুলি গড়িয়ে, রাতারাতি বৈকুণ্ঠে নিয়ে যাবেন, স্থির করলেন। বিষ্ণুর আদেশে বিশ্বকর্মা

গুহা নির্মাণ করতে লেগে গেলেন। এদিকে, দৈবচক্রে গ্ুহাগ্ুলি সম্পূর্ণ তৈরী হ'তে-না-হ'তেই সকাল হবার জো হলো। পাহাড়ের শেষ-প্রান্তে ধূম্রজালের মধ্যে অরুণ আভা ফুটে উঠলো। সবাই জেগে উঠবে দেখে, বিষ্ণু তাঁর বাহন গরুড়কে আদেশ করলেন, গিরিগ্ুহাগ্ুলো সত্বর বৈকুণ্ঠে নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দিতে। বিষ্ণুর আদেশে গরুড় সাত-তাড়াতাড়ি অসমাপ্ত গ্ুহাগ্ুলো-সমেত গোটা পাহাড়টাকেই তাঁর ডানা-সাপটে নিয়ে, যেই আকাশে উড়বেন, অমনি মুরগী ডেকে উঠলো। সকাল হয়, —এই ভেবে, গরুড় গ্ুহাগ্ুলোকে এখানে ফেলে রেখেই সরে পড়তে বাধ্য হলেন।

অজন্তার ছবিগ্ুলির নকল করতে হলেও শিল্পীর বিশেষ দক্ষ হওয়া দরকার। বিলেতের বড়ো শিল্পীরাও তার দ্ু'একটা ছবির সামান্য নকলও করতে পারেননি। তার মানে, ছবির আসল ভাবটি তাতে ফোটেনি। এ-ছবি ভাবের ব্যঞ্জনায় পৃথিবীর মধ্যে সেরা।

প্রথম দেখলে মনে হবে, বহু শিল্পী বহু যুগ ধ'রে এ-সব ছবি এঁকেছেন। ঝরণার জলের মতন সহজভাবে যেন শিল্পীদের অন্তর থেকে এগ্ুলি বের হয়ে এসে, তুলির ডগে ঝ'রে ঝ'রে পড়েছে; মাথা ঘামিয়ে অনেক খেটে আঁকা নয় এ-সব ছবি। Griffiths সাহেব তাঁর বিখ্যাত The Paintings in the Buddhist Cave Temples of Ajanta বইয়ে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে লিখেছেন, —অজন্তায় যাঁরা ছবি এঁকেছিলেন তাঁরা ছিলেন দেব-শিল্পী। এ তো ছবি নয়, যেন ছবির ইন্দ্রজাল। সুললিত সুদীর্ঘ সুবিন্যস্ত সূক্ষ্ম রেখার যাদ্ু।

গুহার দেওয়ালে ছবিগ্ুলির ওপর সূর্যের আলো পড়লে সব যেন জীবন্ত বলে বোধ হয়। দ্ু-চারটে সরু মোটা রেখার টানে অতি সহজে ভাব আর সূক্ষ্ম চারুতা আশ্চর্যভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। আর রঙের সে কী জেল্লা; সমাবেশ কী মনোরম। রঙের জলুস দেখলে মনে হবে, এইমাত্র যেন কেউ ছবিতে রং লাগিয়ে উঠে গেল। সাদা আর নীল রঙের ব্যবহারই বেশী ওখানে। আর কী অসীম ধৈর্যের পরিচয় রয়েছে এই সব শিল্পকর্মে। গ্ুহার অন্ধকারে, বিশেষ ক'রে, ছাদের নিচে কি ক'রে যে শিল্পীরা এতো ছবি আঁকলেন, তা বলা মুশকিল। সীলিং-এর

ওপর আলো ফেলা নিয়েও পরে নানা গবেষণা হয়েছে।

অজন্তার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে decorative art-এ বা মণ্ডনশিল্পে। গুহার সীলিং-এর দিকে তাকালে হঠাৎ মনে হবে, মাথার ওপর যেন কিংখাবের একটা দামী চাঁদোয়া টাঙ্গানো ; আর প্রত্যেকটি চাঁদোয়ার মধ্যিখানে একটি ক'রে প্রকাণ্ড শ্বেতপদ্ম ফুটে রয়েছে। পদ্মের চার ধারে গোল-সারিতে হাঁস, ময়ূর, হাতীর পাল আর লতা-পাতা আঁকা। গাছপালার ছবিগুলিও নিখুঁত। নক্সাগুলি আমাদের আলপনা যেন! Perspective বা প্রেক্ষাপট সম্পর্কেও ওঁরা ছিলেন বিশেষজ্ঞ। Light and shade বা আলো-ছায়ার খেলা দেখলে চোখ জুড়োয়। Anatomy-তে অজন্তার শিল্পীদের ছিল টনটনে জ্ঞান। —মিসেস হ্যারিংহাম এ-সব দেখে খুবই প্রশংসা করতেন নন্দলালের কাছে।

অজন্তার চিত্রে জীবজন্তু, গাছপালা, প্রাসাদ, কুটীর, দোকানদানি, —এই সবের ছবিও নিখুঁতভাবে ফোটানো হয়েছে। ছবির কোথাও কোথাও রং উঠে গেছে। ফলে, অদল-বদল করা অংশগুলির কিছু কিছু বের হয়ে পড়েছিল। তা' দেখে পরিষ্কার বোঝা যায়, ছবি আঁকবার জমি তৈরী করা হতো গোবর-মাটী তুঁষ লেপা এক ইঞ্চির মতন পুরু দেওয়ালের ওপর শামুকের চুনের সাদা আস্তরণ দিয়ে। তার ওপর মনোমতো রং বুলিয়ে অদল-বদল করতেন। মনে হয়, অজন্তার আর্টিস্টরা পারতপক্ষে ছবিতে সংশোধন করতেন না ; সেইজন্যে যা' আঁকতেন তার রূপ-ধ্যান সম্পূর্ণ ক'রে তারপরে তুলি ধরতেন। মনে মনে আগে দেওয়ালে ছবি ফুটিয়ে নিয়ে, পরে তুলি চালাতেন। সাদা জমির ওপর গেরুয়া রঙের রেখা দিয়ে ছবি শুরু করা হতো।

অজন্তাগুহার প্রত্যেকটি দেওয়ালে ভিন্ন ভিন্ন স্টাইলের ছবি। দেখে মনে হয়, এই গুহাশ্রমগুলি মূলতঃ যেন শিল্পাশ্রম ছিল ; আর এক-একটা দেওয়ালে ছবি এঁকেছেন গুরুশিষ্যে মিলে। কোনো কোনো গুহায় অসম্পূর্ণ ছবিও আছে ; কাঁচা-হাতের কাজও আছে। খোদাই করা মূর্তিতেও রং দেওয়া হয়েছে। High Light দিয়ে থামের গড়ন ফোটানো হয়েছে। ওখানে যেমন বড়ো ছবি রয়েছে তেমনি আবার টুকরো চার-পাঁচ ইঞ্চির অনেক ছোট ছবিও আছে। Profile-এ আঁকা ছবিগুলি

অতি উৎকৃষ্ট।

অজন্তার ছবির মধ্যে বাঙ্গালাদেশের দৃশ্যের সাদৃশ্য হুবহু। দূরে বা কাছের গাঁয়ের বাড়িতে মাটির ছাদ; কিন্তু গুহায়-আঁকা ছবিতে বাঙ্গালাদেশের মতো খড়ে-ছাওয়া আটচালা। নারকেলগাছ প্রচুর। ষাঁড়ের ছবিতেও মিল অনেক। পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ করে মেদিনীপুর, বর্ধমান, বীরভূমে পুরানো পুঁথির কাঠের পাটার ওপর যে-সব ছবি আঁকা দেখা যায়, অজন্তার ছবির সঙ্গে তার টেকনিক, রং আর রেখার অদ্ভুত মিল রয়েছে। এদেশে দুর্গা-প্রতিমার চাল-চিত্র এখন যে-ভাবে গোবর-মাটির জমির ওপর, পাতলা ন্যাকড়া জমিয়ে, সফেদার সাদা রং দিয়ে আঁকা হয়, অজন্তাতেও যেন সেই নিয়মই চলতো। কালীঘাটের পটের আর অজন্তার ছবির রেখার টানেও মিল রয়েছে। অজন্তার বুদ্ধমূর্তির সঙ্গে তিব্বত, চীন, জাপানের বুদ্ধমূর্তির সাদৃশ্য বিস্ময়কর। এদেশ থেকেই সব ওদেশে গেছে —এ-কথা ওকাকুরাও স্বীকার ক'রে গেছেন। অজন্তার শিল্পকীর্তিতে গ্রীস বা রোমের প্রভাব আছে, —পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের এই অভিমত স্বয়ং হ্যাভেলসাহেব খণ্ডন করেছেন। অজন্তায় চ্যাপ্টা-মুখো লোকের ছবি চীনেশিল্পীরা এসে বসে আঁকেননি; থ্যাবরা-মুখো লোক এদেশেও কম চোখে পড়ে না। অসম্পূর্ণ খোদাইয়ের কাজও ওখানে রয়েছে। ছেনি-বাটালির দাগ এতো টাট্‌কা দেখলেই মনে হবে, আর্টিস্ট যেন এইমাত্র সেটি কাটতে কাটতে আলা হয়ে বাড়ি চলে গেল।

অজন্তার এক-একটা গুহা যেন এক-একটা প্রকাণ্ড অট্টালিকার সমান। গুহা আছে মোট উনত্রিশটি। দোতলা গুহাও আছে। এই গুহাচিত্র-গুলির বয়েস J Fergusson, J. Griffiths সাহেবদের মতে, খৃষ্টপূর্ব প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দ সাতবাহনদের রাজত্বকাল থেকে, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দে হর্ষবর্ধন ও দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজ্যকালের মধ্যে। গুহাগুলিতে দরজা-জানালায় কপাট লাগানো ছিল। ২৯ নং গুহায় আলো টাঙ্গাবার জন্যে লোহার কড়া ঝোলানো রয়েছে এখনও।

১নং গুহায় আছে বুদ্ধদেবকে প্রলোভিত করার কাহিনী আঁকা। প্রকাণ্ড একটা ভয়ঙ্কর সাপের ছবি, —সে দেখলে ভয় হয়। যক্ষ, রক্ষ,

গন্ধর্ব, কিন্নরের ছবিও অজন্তায় আছে। যাঁরা বুদ্ধের উপাসনা করছে তাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব ছবিতে স্বতন্ত্রভাবে ফুটে উঠেছে। পটলচেরা চোখ, পীন পয়োধর, গুরু নিতম্ব —এতে ভালোভাবেই দেখানো হয়েছে। আঙ্গুলের ভঙ্গিতে মুদ্রা যে কতো রকমের হ'তে পারে, তা অজন্তার ছবি না-দেখলে বোঝা যায় না। মেয়েরা প্রায়ই বিবসনা বা অর্ধনগ্না। দাসীদের বস্ত্র চিত্রিত করা হয়েছে, কিন্তু রাণী বা বড়ো ঘরের মেয়েরা এতো সূক্ষ্ম কাপড় পরতেন যে, অনেক ছবিতে সেটা যেন লক্ষ্যই হয় না। তবুও কিন্তু ভাবের দিক্ থেকে অজন্তার ছবি অশ্লীল নয়। শিল্পীরা বুঝেছিলেন, সবার জীবন যেমন সমান; তেমনি সকল সৌন্দর্যই তুল্যমূল্য। দৈহিক আর নৈতিক সৌন্দর্যের মধ্যে সেইজন্যে ওখানে বিশেষ সীমারেখা টানা হয়নি। আর সেই কারণেই বোধহয়, শিল্পীরা স্ত্রীমূর্তিগুলিকে বুদ্ধের কাছ থেকে দূরে রাখার কল্পনা করেননি। উপরন্তু, ছবি অলঙ্করণের ব্যাপারে তাঁরা স্ত্রীমূর্তির যথাযথ সন্নিবেশ অপরিহার্য মনে করতেন।

পুরুষেরা মালকোঁচা-মেরে ধুতি পরতো, মেয়েরাও তাই। কেউ কেউ শাড়ী-পরা। ধুতি ও শাড়ী প্রায়ই ডুরে-কাটা। মেয়ে-পুরুষে অনেকে ছোট্ গুঁজে কাপড় পরেছে। তাদের কাপড় কিন্তু দাবনার নিচে নামেনি। মেয়েদের চুল বাঁধার রীতিই-বা কতো। প্রসাধন-দ্রব্যও হরেক রকমের। জংলী মেয়েদের মাথার খোঁপায় নানা ধরনের ফিতে বাঁধা আর ময়ূর-পালক গোঁজা। পুরুষদের কানে গহনা; ফলে, কানের লতি লম্বা দেখা যায়। জঙ্গলবাসী লোকেদের মুখের অবয়ব, অস্ত্রশস্ত্র আর পরিচ্ছদ এখানকার গোণ্ড, ভীলদের মতো। প্রাচীন পারস্যবাসীদের, গৃহী, শ্রমণ, সৈন্য, ব্যাধ, বা উচ্চশ্রেণীর নরনারীর অবয়বের বৈশিষ্ট্য অপূর্বভাবে আঁকা রয়েছে। নাগ-নাগিনীদের মাথায় ফণা, আর জলে সাপের মতো লেজ। নাগ-কন্যার প্রেম-নিবেদনের ছবি অতুলনীয়। রাক্ষস-রাক্ষসী, গন্ধর্ব-কিন্নরের মধ্যে, গন্ধর্বগণের হাত মুখ মানুষের মতো, আর নিচেটা পাখীর মতো। কিন্নরদের আকার মানুষের, আর মুখ ঘোড়ার। রাক্ষস-রাক্ষসীদের মুখে শুয়োরের মতন দু'দিকে দু'টো বড়ো বড়ো দাঁত।

তারা শূন্যে উড়তে পারে।

বৌদ্ধমতে জীবাত্মা ভিন্ন ভিন্ন জন্মে নানা জীবের দেহ অবলম্বন করে। সেইজন্যে বৌদ্ধশিল্পীরা বনের প্রাণীদেরও ছবি এঁকেছেন প্রাণভরা দরদ দিয়ে; যেন তাদের মনের কথা ওঁরা জেনে ফেলেছিলেন। বৌদ্ধধর্মে হাতীর আদর খুব —এ বোধহয় মায়াদেবীর হাতীর স্বপ্ন দেখার ফলে। মহিষ, ঘোড়া, হরিণ, কুকুর, ভেড়া, বানর, সিংহ, ভালুক, উট, হাঁস, মুরগী, ময়ুর, চিল, শকুনি, কাক, হাড়গিলা, পায়রা, শুকপাখি, পেঁচা, সাপ, বৃষ, গাভী, এমন-কি, পিঁপড়ে —এ সবেরও ছবি রয়েছে। এ-সব ছবির বেশীর ভাগই বুদ্ধের জীবনের জ্ঞাত-অজ্ঞাত নানা ঘটনা, বিভিন্ন বৌদ্ধ 'জাতকে'র গল্প (গুহা নং ১৬ ইত্যাদি), আর চল্‌তি জীবন-চিত্র (গুহা নং ১০) থেকে নেওয়া। অজন্তার শিল্পীরা খোলা-চোখে জীবনকে দেখেছিলেন; বৈচিত্র্যকে তাঁরা ছকে বাঁধতে চাননি।

ঢাল, তরোয়াল, বর্শা, বড়শি, পরশু ইত্যাদি নানা অস্ত্রশস্ত্র আঁকা আছে এখানে। পতাকার ব্যবহার খুব হতো, বিশেষ ক'রে যুদ্ধের সময়ে। ছাতাগুলো ছিল বাঁশের। পাখা দেখা যায় তিন রকমের। বাদ্যযন্ত্রের ভেতর শাঁখ, বাঁশী, বীণা, একতারা, খোল, করতাল, মন্দিরা আর খঞ্জনি।

একটি প্যানেলে রাজা দ্বিতীয় পুলকেশীর (৬২৫ খৃষ্টাব্দ) ছবি আছে। পারস্যসম্রাট্ দ্বিতীয় খসরুর দূতগণের কাছ থেকে পুলকেশী রাজকীয় নিদর্শন-পত্র গ্রহণ করছেন। রাজা মালকোঁচা ধুতি-পরা; হাঁটু ঢাকেনি, খালি গা। অথচ, চাকরের গায়ে জ্যাকেট। মেয়েদের গায়ে চোলী। সে কাঁচুলির ওপর নানা ছবি আঁকা। কারো স্তন আটকানো মাত্র ফিতে দিয়ে। কোমর পর্যন্ত ঝোলানো আস্তিনওয়ালা জ্যাকেট-পরা স্ত্রীলোকের ছবিও আছে। চাদরেরও ব্যবহার ছিল। ৯ আর ১০ সংখ্যক গুহাই সবচেয়ে পুরানো। এতে আঁকা রাজা বা বড়লোকের মাথায় পাগড়ী বা মুকুট নানা ধরনের। মেয়েদের মাথাতেও বিস্তর ফুল আর গয়না। বৌদ্ধভিক্ষু আর সৈন্যদের মাথা খালি। বিদেশী মানুষ, সৈনিক আর ভিখারীদের মাথায় নানা ধরনের টুপী। অলঙ্কারের

ছড়াছড়ি সর্বত্রই। গহনার মধ্যে দুল, ইয়ারিং, হার, চিক, কণ্ঠমালা, সাতনরী, বাজু, তাবিজ, বালা, কঙ্কণ, চুড়ি, মল, আংটি —মেয়ে-পুরুষ সবাই পরেছেন। গয়না সব ভারী ভারী। ঘরের আসবাবের মধ্যে চার-পায়া, তাকিয়া, বালিশ, পা-দান, চৌকী, বেত আর বাঁশের গোল ধরনের মোড়া আর পর্দা। ঘরের কাজে আর ধর্মকর্মে ফুল-তোলার সাজি, মাটির পাত্র, কুঁজো, ফুলদান এখনকার মতোই। শিকে, পিকদান, দোলানো ধুনচি ছিল। সেকালে সমুদ্রপথে বাণিজ্যে যাবার বহু রকমের নৌকো বা অর্ণবপোতের ছবি ২নং গুহাচিত্রে ইতিহাসের একটি ঘটনার সাক্ষ্য দিচ্ছে। গাছ-পালার মধ্যে কলা, সুপুরি, খেজুর, অশোক, পলাশ, বট, অশ্বত্থ, আম, আতা, দাড়িম, লাউ, নীল, শ্বেত ও রক্তপদ্ম ইত্যাদির ছবি।

নর্তকীর নাচের ছবি —তার ভাবভঙ্গি যেন চিরনূতন। রাজার অভিষেকের চিত্র সবিস্তর আঁকা ; তাতে নরবলি দিয়ে অভিচার-ক্রিয়া করা হয়েছে। ১ নম্বরের গুহায় শাক্যসিংহকে প্রলুব্ধ করার ছবিটি অপূর্ব। শান্তিনিকেতন-চীনাভবন-হলের দেওয়ালে নন্দলাল এর থেকেই হুবহু প্রতিলিপি করেছেন। অতুলনীয় সে ভিত্তিচিত্র ; শান্তিনিকেতনের একটি বিশিষ্ট আকর্ষণ।

ভিক্ষু বুদ্ধদেবের সামনে মাতৃ-মূর্তিটি অতুলনীয়। ১নং গুহার রাজা শিবি আর শ্যেন-কপোতের উপাখ্যান হয়েছে। পালি 'মহাবংশ' বা 'সিংহল-অবদান' মতে, বিজয়সিংহের লঙ্কা বিজয়ের কাহিনী-চিত্রটি বাঙ্গালীর গর্বের বস্তু। নানা উৎসব, মিছিলের শোভাযাত্রা হাতী-ধরা, মৃগয়া সবই সুসমঞ্জস। এ-ছাড়া রাজমিস্ত্রীর কাজের হুবহু প্রতিচ্ছবি রয়েছে। বামন দাস দাসী আর ফুলবাবুর ছবি কৌতুককর। ফুলবাবুর কাছা মাটিতে লোটানো। মিহি মসলিনের ব্যবহারও দেখা যায়। ছেলেদের লাঠিমখেলা, লাঠির ঘোড়ায় চাপা, কুলোয় ক'রে মেয়েদের চাল-পাছড়ানো —এ সবও রয়েছে। সব মিলিয়ে আমরা অজন্তা-চিত্রে পাই, বুদ্ধের জীবনের পরিবেশে সেকালের যথাযথ সমাজচিত্র।

এবারে অজন্তার মূর্তিশিল্পের কথা কিছু বলা যাক। ওখানে গুহা-গুলো দু-রকমের —চৈত্য-গুহা আর বিহার-গুহা। চৈত্যগুহা ছিল

যজন-যাজন, ভজন-পুজনের জন্যে ; আর বিহারগুলিতে ভিক্ষুরা বাস করতেন। ৯, ১০, ১৯ আর ২৬ নম্বরের গুহাগুলো চৈত্য ; বাদবাকী সব বিহার। বিহার-গুহার সামনে পাহাড়ের গায়ে সারিবন্দী থাম-ওয়ালা বারান্দা। বারান্দায় ঢুকলে সাম্‌নের দেওয়ালে একটা বড়ো দরজা, আর তার দু-দিকে ছোট ছোট দু'টি ক'রে জান্‌লা ; জান্‌লার দু'ধারে ছোট ছোট আবার দু'টি ক'রে দরজা। সাম্‌নের বড়ো দরজা দিয়ে ঢুকলে একটা বড়ো চারকোণা হলঘর। হলের চার পাশের দেওয়ালে খোদাই-করা আর আঁকা ছবি-ভরতি থামের সারি। এতে মনে হয়, হলটার চার ধারটা যেন একটা স্বতন্ত্র বারান্দা ; ডান আর বাঁ দিকের দেওয়ালের ভেতর ভিক্ষুদের বাস করবার জন্যে সারিসারি কামরায় ছোট ছোট দরজা। প্রথম ঢুকেই দেখা যাবে, ভেতরের দেওয়ালের মাঝখানটিতে কুলুঙ্গীর মতো ক'রে খোদাই করা ; আর প্রকাণ্ড বারান্দা আর কুঠুরি। সেই ঘরে প্রকাণ্ড বুদ্ধমূর্তি রাজাসনে ব'সে ধর্মপ্রচার করছেন। বিহার-গুহার থামগুলি অতি উৎকৃষ্ট শিল্পকলামণ্ডিত ; পৃথিবীতে তার তুলনা মেলে না। চৈত্য-গুহার ঘরগুলি গীর্জের মতন অর্ধবৃত্তে খিলান করা। শেষপ্রান্তে প্রকাণ্ড একটা সুন্দর স্তূপ। ডান দিকে আর বাঁ-দিকে সারিসারি থাম, স্তূপটিকে পিছন থেকে অর্ধবৃত্তে ঘিরে আছে।

যে পাহাড়ের গায়ে গুহাগুলো খোদাই করা, তাতে ওঠবার একটি সুন্দর সিঁড়ি। সিঁড়িটি পাহাড়ের গায়ে অনেক আগে থেকেই কুঁদে বের করা। ধাপগুলি এমনভাবে সাজানো, উঠতে কোনো কষ্ট হয় না।

সিঁড়ি দিয়ে উঠেই প্রথম ৭ নম্বর গুহা। এটি দেখতে মন্দিরের মণ্ডপের মতন। অন্য গুহায় যাবার পথ, আলাদাভাবে পাহাড়ের গায়েই আছে ৭নং গুহার বাঁ-দিকে, প্রথম থেকে ৬নং গুহা আরম্ভ হয়ে. আবার ডানদিকে ৮নং গুহা থেকে পর পর ২৮টি গুহা খোদাই করা। গুহাগুলি কিন্তু অন্ধকার নয় ; যেন এক-একটা রাজপ্রাসাদ। বিহার-গুহার মধ্যে ৪নং গুহাটি সব চেয়ে বড়ো। আর চৈত্য-গুহার মধ্যে সবচেয়ে বড়ো ১০নং-টি। প্রত্যেক চৈত্য-গুহায় এক-একটি স্তূপ আর গম্ভীরায় একটি ক'রে ধ্যানী বুদ্ধের মূর্তি। ৪নং গুহায় 'পদ্মপাণি' বুদ্ধের মূর্তি আছে। উৎকৃষ্ট তার নির্মাণকৌশল। ১৫নং বিহার-গুহার

বুদ্ধমূর্তিটি সবচেয়ে ভাবপূর্ণ। ১০ নম্বরের চৈত্যগুহার মধ্যে একটি প্রকাণ্ড স্তূপ। গুহাটি সবচেয়ে গভীর আর উঁচু ; যেন অনন্ত ও মহান একটি মুক্ত-দ্বার। ৬ নম্বরের দো-তলা গুহার নিচের তলায় থামগুলি ধসে গেছে, কিন্তু এক-পাথরের গায়ে খোদাই ব'লে, ওপর-হলের থামের কোনো ক্ষতি হয়নি। ৬ নম্বরের দোতলা-গুহাটি সবচেয়ে ভালো। ২৯টি গুহার মধ্যে মাত্র একটিতে ঢোকা যেত না। ২৬নং গুহাটিতে ভাস্কর্যের সংখ্যা আর সৌন্দর্য সবচেয়ে বেশী। ১নং গুহার থামে খোদাই করা অলঙ্করণ-কাজের নমুনা অপূর্ব। এ-ছাড়া ২. ৬. ১৭, ২৩ আর ২৪ এবং আর ক'টি গুহায় স্তম্ভের উৎকৃষ্ট আদর্শ রয়েছে। ২নং গুহায় পিতার পাশে বসা, মাতৃ-ক্রোড়ে শিশুবুদ্ধের মূর্তিটি গঠন-পারিপাট্যে বিশিষ্ট শিল্পজ্ঞানের পরিচায়ক। ৩নং গুহাটি অসম্পূর্ণ। ৪নং-টি আকারে সবচেয়ে বড়ো —প্রায় ১০০ হাত চওড়া ; তবে অসম্পূর্ণ। ৫নং গুহাটিতে নির্মাণের সূচনা করা হয়েছিল মাত্র। ৬নং গুহার দোতলায় দুটি বুদ্ধমূর্তি আর বারান্দায় ওপর হাতীর মূর্তি রয়েছে। ৮নং গুহাটি জীর্ণ আর খুব ছোট। ৯নং-টি চৈত্য। গুহায় আলো ঢোকবার জন্যে sky light এর ব্যবস্থা আশ্চর্য। ৯নং গুহায় মূর্তির চেয়ে ছবির ভাগ বেশী। এই গুহাটি প্রাচীনতম। সমকালীন ১০নম্বরের চৈত্যটি মন্দিরের মতন। লিপি পড়ে জানা যায়, —এই 'ঘর-মুখ' দান করেছিলেন —'বসথিপুত্র' 'কঠদিত্তো'। —সে প্রায় তিনশো খৃষ্টপূর্বাব্দের কথা। এর খোদাই এতো সুন্দর, যেন অলৌকিক বলে মনে হয়। এই গুহা-মন্দিরের গায়ে 'ছ-দন্ত'-হস্তী-জাতকের কাহিনী আঁকা রয়েছে। এর প্রধান খিলান-হলের বরগাগুলি কাঠের তৈরী। কাঠ থেকে পাথর-ব্যবহারের রূপান্তরের নিদর্শন। কাঠের ওপর কতো নক্সা। ৯, ১০ নম্বরের গুহা থেকে ১৯ বা ২৬ নম্বরের গুহার গঠন-পারিপাট্যের দিকে তাকালে, প্রায় অশোকের সময়, পুরানো হীনযান থেকে মহাযানের পরিবর্তনের ধারাটি লক্ষ্য করা যাবে। ১১ বা ১২ নম্বরের বিহার থেকে ১৭ একদিকে, বা ১, ২ অন্যদিকে দেখলেও এই রূপান্তর লক্ষ্য হবে।

গুহাগুলির গঠন-ব্যাপারে কোনো বৈজ্ঞানিক ভ্রম বা ব্যতিক্রম দেখা যায় না। সীমা, কোণ, সমতা বা আকার সবই পরিমিত। ১০ ১১

১৪, ২১, ২৩, ২৪, ২৫ ইত্যাদি গুহাগুলির স্থানেস্থানে উৎকৃষ্ট ভাস্কর্য রয়েছে। ১২ নম্বরের বিহারটি খুব পুরাতন। ৩নং গুহাটি ভিক্ষুদের শোবার ঘর। ঘরের কুঠুরিতে তিনটে ক'রে খোদাই-করা পাথরের বিছানা, মায় বালিশ। কিন্তু, শুলে অস্বস্তি তো লাগেই না ; বরং আরাম হয়। ১৬নং গুহামন্দিরে বুদ্ধের মূর্তি ছাড়া, বারান্দার সামনে, প্রবাহের নিচে যাবার একটা সুড়ঙ্গ আছে। সেই পথে একটি কুঠুরিতে 'নাগেশ'এর মূর্তি আর দুটি হাতীর মূর্তি খোদাই করা। স্থাপত্যকৌশলের দিক্ থেকে গুহাটি সর্বোৎকৃষ্ট। ১৭নং গুহাতে রয়েছে ষাটটির বেশী উৎকৃষ্ট দৃশ্য-চিত্রাবলী। দক্ষিণ দেওয়ালের মধ্যিখানে আগে রাজা বিজয়ের লঙ্কা-জয়ের ও রাজ্যাভিষেকের মনোরম চিত্র আছে। এ-ছাড়া বিরাট বুদ্ধমূর্তির সামনে যশোধারা ও রাহুল। এটি ভিক্ষুদের একটি জল রাখবার ঘর। এই গুহায় 'গঙ্গার' মূর্তি। —মকরের মুখে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। —মকরের মুখটি অপূর্ব। যমুনাও আছেন দরজা আগুলে। —১৬ আর ১৭ নম্বরের গুহা দুটি হলো পঞ্চম শতাব্দের বিক্রমাদিত্য-কালিদাসের কালের শিল্পকীর্তি। ১৮নং গুহাটি মাঝারী রকমের। ১৯নং গুহার বাইরে অনেক মূর্তি। তার মধ্যে সস্ত্রীক নাগরাজের মূর্তিটি সুন্দর। হ্যাভেল সাহেবের মতে, —এই গুহার স্তূপের গম্বুজটি হিন্দু-মন্দিরের 'বিমানের' মতন। মোগলেরা পরে এই টাইপের অনুকরণ করেছিল। ১৭নং গুহার চিত্রের মতন, ভিক্ষাপাত্র-হাতে বুদ্ধের সামনে মাতা ও পুত্রের উৎকীর্ণ মূর্তি। ২০নং গুহায় ঢোকবার সিঁড়িটি অপূর্ব। অলঙ্করণে নদীর সাপ রয়েছে, —নাম 'মহারাস'। প্রত্যেক চৌকাঠের সামনে অর্ধবৃত্তের ওপর পদ্ম-আঁকা, একটি করে পা-পোশ। ২২নং গুহার সামনে গেলে, বাঙ্গালাদেশের গ্রামের বাড়ির কথা মনে পড়ে। গুহাটিতে আমাদের দেশের মতন 'দাওয়া' বা উঁচু বারান্দা। ২৬নং গুহার চৈত্য-মন্দিরটি ভাস্কর্যে ভরতি। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের ২৩ ফিটের বেশী লম্বা বিরাট্ মূর্তি। এতো বড়ো মূর্তি অজন্তায় আর কোনো গুহায় নাই। ঐ গুহাতেই ১ নম্বরের গুহার মতন বুদ্ধদেবকে প্রলোভিত করার খোদাই চিত্র রয়েছে। এই গুহার দরজায় উৎকীর্ণ ফলকচিত্রগুলি দেখলে বাঙ্গলাদেশের মন্দিরের তেরাকোটা মনে পড়ে। হিউয়েনৎ সাঙ ৬৪০ খৃষ্টাব্দে এই গুহাটি দেখে থাকবেন।

১নং গ্নুহায় এই রকম চিত্র একটি আছে, কিন্তু ঠিক এ ধরনের নয়। এই গ্নুহাটি সবচেয়ে সুন্দর।

অজন্তায় ভাস্কর্য দেখে মনে হয়, শিল্পীরা শুধু চিত্রকলার জন্যেই সাধুবাদ পাবার যোগ্য নন, মূর্তিশিল্পবিশারদরূপেও তাঁরা জগতের গৌরবস্বরূপ। আবার খোদাই মূর্তির গঠন ও সজ্জার সঙ্গে চিত্রাঙ্কনের অদ্ভুত মিল। তাঁরা স্থাপত্য-বিদ্যাতেও পারঙ্গম ছিলেন।

বিশুদ্ধ ভারতশিল্প উন্নতির যে চরম শিখরে উঠেছিল, অজন্তার শিল্পকলা তারই প্রতিনিধি। এই চিত্রধারায় প্রত্যেকটি রেখা যেন গভীর অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে সফলতম পদ্ধতি প্রয়োগ ক'রে সৃষ্টি করা হয়েছে। অজন্তার শিল্পকলা পৃথিবীর প্রিয়তম ও মহত্তম সকল শিল্পকলার সমবয়সী ; প্রেরণার উৎস। এই পার্বত্য শিল্পবিটপী সজীব ; প্রাণের ধর্মে গতিশীল। সেই জন্যেই এর আবেদন সার্বজনীন আর শাশ্বত। সব মিলিয়ে বলা যায়, অজন্তার বৌদ্ধ চৈত্য-বিহারের শিল্পাশ্রম পৃথিবীর মধ্যে অদ্বিতীয় শিল্পমহাতীর্থ, আজও বিশ্বের বিস্ময়, —'One thousand years ahead of all other paintings we know'.

অজন্তা প্রসঙ্গে নন্দলালের সহযাত্রী অসিতকুমার হালদার মহাশয়ের 'অজন্তা' বই থেকে নন্দলালের বিশ্লেষণ মতে আমরা এই বিবরণ অংশতঃ সঙ্কলন ক'রে দিলুম। এ-ছাড়া, ১৩০৮ সালের (১৯০১) 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত, গ্রিফিথ্স্ সাহেবের মহাগ্রন্থ নিষ্কাশিত 'অজন্তা-গ্নুহা-চিত্রাবলী প্রবন্ধেরও সারসংক্ষেপ করে অজন্তা-শিল্প-তীর্থ-পরিক্রমা সম্পূর্ণ করা গেল। লেডী হ্যারিংহামের বই Ajanta Frescoes / being reproductions in colour and monochrome of / Frescoes in some of the caves at Ajanta / after copies taken in the years / 1909-1911 / by Lady Herringham and her assistants / with introductory essays by various members of the India Society —লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১৫ সালে। লেডী হ্যারিংহাম ১৯০৬-৭ সালে ভারতে প্রথম এসে অজন্তা ইলোরা ঘুরে যান। এর পর ১৯০৯ সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁর দ্বিতীয়বার আসা হয়। এই সময়ে ভারতীয় শিল্পী নন্দলালদের সহযোগে এবং ১৯১০ সালে তৃতীয়বার এসে, ১৯১১ সালের মধ্যে যে-সব ছবি কপি করেন তার মোট সংখ্যা ৪৩।

এর মধ্যে রয়েছে: রঙ্গিন ছবি—লেডী হ্যারিংহামের স্বকৃত কপি ১, ৬, ৭, ৮, ১০, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২৩, ২৫, ২৬, ৩০, ৩১, ৩৩, ৩৭, ৪১ ; মিস্ ডরোথি লার্কেরের ২, ২৪, ২৭, ৩৫—৪১ ; নন্দলাল বসুর ৩, ৬ ; হ্যারিংহাম ও লার্কেরের ৪, ৫, ১৬ ; অসিতকুমার হালদারের ৯, ১২, ১৩। গ্রন্থে এই ১৩ সংখ্যক কপিটি লেডী হ্যারিংহামের করা বলে ছাপা আছে। কিন্তু অসিত হালদার মহাশয় হ্যারিংহামের নামটি কেটে নিজের নাম বসিয়ে স্বাক্ষর করেছেন। স্বয়ং শ্রীনন্দলালকে ২৯ ৫-১৯৬৫ তারিখে জিজ্ঞাসা করলুম, —ব্যাপারটা কি? তিনি বললেন, —'না না, তা কি করতে পারে? অসিতের যা, তাই ওতে ছাপা আছে। বরং হ্যারিংহামের কপি থেকে আমরা সবাই কপি করেছিলুম। আমার সে কপির roll-টা চুরি হয়ে গেল। অবনীবাবুর ঘরে রাখা ছেল। নবু নিয়ে সম্ভব পু…বাবুকে ঝেড়ে দিলে। শেষে ট্রাকে ক'রে সব এদিকে ওদিকে চালান হয়ে গেল।'

এ-ছাড়া সৈয়দ আহম্মদ ও মুহাম্মদ ফজলউদ্দীনের ১১, ৩২ ; সমরেন্দ্রনাথ গুপ্তের ১৪, ১৫ ; সৈয়দ আহম্মদের ২২, ২৮, ২৯। এ-ছাড়া, T. H. Hendley সাহেবের তোলা ফোটোগ্রাফ রয়েছে ৪২ সংখ্যায়। —মূল কপিগুলি South Kensington-এর Indian Musium-এ রক্ষিত আছে।

এর মধ্যে নন্দলালের কপি (৩) ১৭ নম্বর গুহার Royal love Scene: a palace, pavilion with prince, princess and attendants আর ঐ ১৭ নম্বর গুহা থেকেই কপি (৬) Adoration Group: mother and child before Buddha.

ঐ সময়ে অজন্তাভিত্তি-চিত্র থেকে নন্দলাল রঙ্গিন ছবি আর যা' কপি করেছিলেন: (১নং গুহা) শ্বেতবোধিসত্ত্ব ; একটি বিচ্ছিন্ন অংশ ; একটি সৈনিকের মুখ ; এ-ছাড়া করেছেন পদ্মপাণি বোধিসত্ত্ব বা জাতক-কাহিনীর প্রেক্ষাপটে নীলপদ্ম-হাতে গৌতম ও যশোধারা, মালব-প্রধানের মূর্তি ইত্যাদি। কিছু কপি তাঁর চুরিও হ'য়ে গেছে, বললেন ১৪-৫-১৯৬৫ তারিখে।

নন্দলালের ৪৪ সংখ্যক ডায়ারিতে দেখছি, —অজন্তা থেকে বহু বাসন-পত্রের নক্সা সংগ্রহ করেছেন তিনি। তাঁর স্কেচ্-বুক-সংখ্যা



জাতক কাহিনীর প্রেক্ষাপটে নীলপদ্ম-হাতে গৌতম - নন্দলাল

২২, ২৩, ২৭ ও ২৮-এ অজন্তার প্রসঙ্গ রয়েছে। ২২সংখ্যক স্কেচ্‌বুকে আছে, অজন্তা-cave-এর painting থেকে figure-এর drawing —ভালো figure-এর drawing সংগ্রহ। এতে আছে ২০০ খানা স্কেচ্‌ ২০০ নং নকল। —এইসব স্কেচ্‌ নন্দলাল কালিতে করেছেন। —এক দফা দেওয়া আছে শান্তিনিকেতন-কলাভবনে। স্কেচ্‌বুক সংখ্যা ২৩ঃ ঐ সব স্কেচ্‌ও কালিতে করেছেন। এতে মোট ১৯৯ খানি স্কেচ্‌ আছে। নন্দলাল বলেন, —'এই স্কেচ্‌-বইটি ছাপাবার জন্যে বিশ্বভারতীকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। কিছু ছাপা হয়েছে 'রূপাবলী'তে। ৫১—৫৪ ঃ চার দফা করা হয়েছে। দু'দফা পেন্‌সিলে আর এক প্রস্থ ইঙ্কের কাজ নন্দলালের কাছে আছে; আর এক দফা ইঙ্কে-করা কাজ কলাভবনে দিয়েছেন। ২৭সংখ্যক স্কেচ্‌-বইয়ে রয়েছে, —অজন্তা-painting-এর সংগ্রহ। —নানা ম্যাগাজিন ইত্যাদি থেকে কেটে কেটে লাগানো। ৫৩খানা আছে। বুদ্ধের মগধ মুখ; ফুলবাবু; সিংহল-বিজয়ের সৈন্য। মেদিনীপুরের পট, পাটা আর দক্ষিণী কিছু কাটিংস্‌। ২৮সংখ্যক স্কেচ্‌বুকে দেখছি, —তিনি অজন্তায় tour করেছেন দু-বার। তাঁর স্কেচ্‌বুকে স্কেচের হিসাব এই রকম ঃ No. A (৩) ৫২ (১৯৪৭-৪৮), (৪) ৫৬ (১৯৪৮), (৫) ৩ (১৯৩৫-৩৬), (৬) ৬ (১৯৩০) (৭) ৩৩ (১৯৪০), (৮) ৩৫ (১৯৩৬-৪১)। —এ-ছাড়া, অজন্তা তাঁর চোখের সামনে আজও (১৪-৫-১৯৬৫) উজ্জ্বল আগের মতোই। অজন্তার সঙ্গে সৌহার্দ্য যেন তাঁর জন্ম-জন্মান্তরের।

রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের 'প্রাচীন ভারতীয় শিল্পে অর্ণবপোত' প্রবন্ধ লেখার জন্যে নন্দলাল অজন্তা থেকে ঘুরে এসে নৌকোর ছবি এঁকে দিয়েছিলেন ১৩১৭ বঙ্গাব্দে। নন্দলালের চিত্রকর্মে অজন্তা অনেকখানি জায়গা দখল করে আছে। ১৩২০ সালের প্রবাসীতে নন্দলালের সতীর্থ ও সহযাত্রী সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত পাঁচ আঙুলের খেলা, আর ১৯১৩-১৫ সালের Modern Review পত্রিকায় The classic Art of Ajanta নামে ধারাবাহিক সচিত্র প্রবন্ধ লিখে অজন্তা-গুহার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করেছিলেন। 'অজন্তা'-ভিত্তিচিত্র প্রকরণে ছবি আঁকার জমি তৈরী

সম্পর্কে আচার্য নন্দলালের, 'শিল্পচর্চা'-গ্রন্থে (১৩৬৩) 'মশলা'-তৈরীর পদ্ধতি লেখা আছে ৫৪-৫৬ পৃষ্ঠায়। অজন্তা, বাগ, সিগিরিয়াদির পদ্ধতিতে, দক্ষিণরাঢ়ে শৌখিন লোকেরা এখনও মাটির দেওয়ালের ওপর 'উলুটি' করিয়ে, মূর্তি করান ও ছবি আঁকিয়ে থাকেন। —এই বিষয়ে আচার্য শ্রীনন্দলালের নির্দেশে বর্তমান লেখক অনুসন্ধান ক'রে একটি তুলনামূলক প্রবন্ধ লেখেন। সেই প্রবন্ধটি স্বয়ং নন্দলাল তাঁর এই সুপ্রসিদ্ধ 'শিল্পচর্চা' গ্রন্থের ১৮৪—৯০ পৃষ্ঠায় সংকলিত করেছেন।

দ্বিতীয়বারের অজন্তা 'Expedition'-এর অভিজ্ঞতা সম্পর্কে লেডী হ্যারিংহামের স্বামী Sir Wilmot Herringham লিখেছিলেন : She loved the freedom and the simple country surroundings of the life, and she much appreciated country surroundings of the life, and she much appreciated the open and friendly intercourse with the young Indian gentlemen who were her assistants. She was, moreover deeply interested in the work before her ; for she felt that she was face to face with the remain of a great civilization and a great art, of which little is left but tradition. স্বয়ং লেডী হ্যারিংহামও বিলেতে ফিরে গিয়ে, 'The English-woman'-পত্রিকায় The caves at Ajanta নাম দিয়ে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তাতে তিনি অজন্তা-শিল্পকে বলেছেন —জগতের শিল্পকলার ইতিহাসে 'অপ্রতিদ্বন্দ্বী'। বৈশিষ্ট্যের কথায় লিখেছেন, অতি সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ আর জাতিবর্ণগত পার্থক্য পরিস্ফুটনে একক। —'They occupy a nearly unique place in the history of art.'

এবার প্রথম অজন্তা তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে স্বয়ং আচার্য শ্রীনন্দলালের মুখের কথা শোনা যাক্। তাঁদের সে-যুগের অজন্তায় বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা যা তাঁর মনে আছে সে এই :—

'অজন্তা যাই আমি আর অসিত। বয়সে অসিত আমার চেয়ে ছোট প্রায় আট দশ বছরের। প্রথমটায় ও একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিল। আমাকে যেন ওর গার্জেন হ'তে হলো।

'মিসেস্ হ্যারিংহামকে তাঁর কপি করার কাজে সাহায্য করতে আমরা অজন্তায় যাই। অজন্তা আসবার আগে হ্যারিংহাম ইজিপ্টে, ইটালীতে ওরিয়েন্টাল ছবির কপি করেছিলেন বৃটিশ মিউজিয়মের জন্যে। খুব ভালো কপিস্ট ছিলেন তিনি। রোগা লিকলিকে বুড়ী মেমসাহেব। কেভেই থাকতেন। কাগজ, তুলি সবই আমরা নিয়ে গিয়েছিলুম। তিনি নিজে কপি করতেন, আমরাও করতুম।

'সিস্টার নিবেদিতার যোগাযোগে তিনি আমাদের অবশেষে নিয়ে গেলেন অজন্তায়। প্রথমটায় মেমসাহেব বেঁকে বসেছিলেন। ওখানে খাবার অসুবিধে হতে লাগলো আমাদের। পাওয়া যেত কেবল বেগুন আর অড়হর দাল। জাঁতা-ভাঙ্গা গমের রুটি বানানো হতো আর ঐ বেগুনের চচ্চড়ি। মাঝে মাঝে টাট্‌কা মাখন আসতো গ্রাম থেকে। ব্যস্, এই হলো আমাদের তখনকার দিনের খাদ্য-তালিকা। একদিন 'ছানা' বেচতে এসেছে। হাঁক পাড়ছে রাস্তায়। আমরা উৎসাহ ক'রে কিনতে গিয়ে যে-ঠকা ঠকেছিলুম, তা' আজও মনে পড়লে হাসি পায়। ঝুড়িতে ক'রে 'ছানা' বেচতে এসেছে; 'ছানা' সে-হলো আমাদের চনা-ঘুঁটে। 'মাস্কা' এলে, বটে-সে আমাদের মাখন।

'কপির কাজ চালাচ্ছি আমরা তিন জন। কিছুদিন বাদে আরও আর্টিস্ট আনিয়ে নিলেন হ্যারিংহাম। ভেঙ্কটাপ্পা আর সমরেন্দ্র গুপ্ত নতুন গেল। আমরা চার জনেই হলুম অবনীবাবুর শিষ্য।

'সস্ত্রীক জগদীশবাবু, সিস্টার আর গণেন কেভে গেলেন দেখতে বড়োদিনের ছুটিতে। গলার রুদ্রাক্ষ মালায় হাত দিয়ে 'দুর্গা' 'দুর্গা' বলতে বলতে টাঙ্গা থেকে নামলেন সিস্টার। কেভে কাজ চালাচ্ছি আমরা তন্ময় হয়ে। বাইরের জগৎ ঝাপসা হ'য়ে আসছিল। খাবার সময় বয়ে যেত। এই সব দেখে ওঁরা ভাবলেন, শরীর খারাপ হয়ে যাবে। জগদীশবাবুর সঙ্গে ছিল তাঁর মগ-বাবুর্চি। সে লেগে গেল রান্না করতে। আমি তখন জাত মানতুম খুব। মুরগী খেতুম না; মুসলমানের হাতে তো নয়ই। লেডী বোস, সিস্টার অনুরোধ করলেন, একসঙ্গে খেতে। তবুও চেষ্টা করতুম, জল আর ভাত বাঁচিয়ে খাবার। ক্রমে সব সয়ে গেল। ভালো লাগে না নিজেদের ঝামেলা নিজেদের বইতে,

বললুম সিস্টারকে। সিস্টার বললেন, —'গণেনকে রাখছি এখানে, তোমাদের তত্ত্বাবধানের জন্যে'।

'গণেন ব্রহ্মচারী রয়ে গেলেন কেভে আমাদের কাছে। গণেনদা ছিলেন শ্রীমায়ের অনুগত সেবক। ভারি মজলিসী লোক ছিলেন তিনি। হৈ হৈ চলতো খুব, আর কাজ। যা খেতুম সব আনতেন গণেনদা শহর থেকে। পাঁউরুটি আনতেন জালগাঁও স্টেশন থেকে। দিনের পর দিন শুকিয়ে, পাঁউরুটি হয়ে যেতো কাঠের চোক্‌লার মতন। গণেনদা নরম করতেন সেগুলো চায়ের ভেপার দিয়ে। অনেক সরবরাহ করতেন তিনি একা। অবনীবাবু আলু আর চাল পাঠাতেন বাই-পোস্ট। মুরগী, মাছ সব শুরু হয়ে গেল। আমাদের কাজ চলতো সকাল আটটা-নটা থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত সারাদিন। ডিনার খাওয়া হতো ওখানেই।

'শেষের দিকে একবার একটা ঘটনা হলো। —গণেনদার সঙ্গে সিগারেট থাকতো। দেবব্রতর সাকরেদ তিনিও ছিলেন একজন এনার্কিস্ট। সিগারেট আনাতেন কলকাতা থেকে; সেই টিনে আসতো 'ধর্ম' কাগজ আর 'যুগান্তর'। টেররিস্ট্ পার্টির সঙ্গে যোগ ছিল তাঁর; অরবিন্দের পার্টি। অরবিন্দের, দেবব্রতর লেখা থাকতো 'ধর্ম' কাগজে।—

'একদিন শুনলুম, বোম্বের গভর্ণর আসবেন কেভ্ দেখতে। বোম্বে থেকে লিখেছে। খান্দেশ জেলার ম্যাজিস্ট্রেট এলো কেভ্ দেখতে। গেরুয়া-পরা সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট। ম্যাজিস্ট্রেট তো এলো। আমাদিকে লক্ষ্য ক'রে হ্যারিংহামকে বললে, 'ওরা এনার্কিস্ট পার্টির লোক। ওদের সরিয়ে দিতে হবে।' তখন নাসিক-মার্ডার-কেস্ হয়ে গেছে কিনা। সুতরাং যে-ক'জন ইয়ংম্যান আছে ফ্রম ক্যালকাটা, তাদের সরাতেই হবে, গভর্ণর আসার আগেই।

'হ্যারিংহাম বললেন আমাদের, —'তোমাদের সাস্‌পেক্ট্ করছে। সরিয়ে দিতে হবে তোমাদের। দূরে পাহাড়ে টেণ্ট্ ফেলবে যতক্ষণ থাকবেন গভর্ণর'।

'সমরেন্দ্র গুপ্ত বললে, —'একেবারেই চলে যাব আমরা'। —উত্তেজনা শুরু হলো, গণেন-দা চিন্তিত হলেন। হ্যারিংহাম আমাদের বিমতি দেখে বললেন, —'আমি তোমাদের গার্জেন; ছেলেমানুষী ক'রো না; যা

বলছি, 'আমার কথা শুনতে হবে।' তবুও কাজ হয় না দেখে, অবশেষে ইংরেজ-মূর্তি ধরলেন। বললেন, —'অর্ডার করছি আমি। তোমাদের যেতে হবে'; আমরা রেস্‌পেক্ট করতুম তাঁকে; অর্ডারের আর প্রয়োজন হলো না। এক মাইল দূরে যাবো, ঠিক হলো। ওঁরা বললেন, —'যাও টাঙ্গায় চড়ে'। —'না, যাবো আমরা গরুর গাড়ীতে ক'রে'। আমাদের জেদটাই বজায় হলো।

'তবে যাবো আমরা, কিন্তু আপনাকেও যেতে হবে আমাদের সঙ্গে —বললুম মিসেস হ্যারিংহামকে। তিনি বললেন, —'যাবো'। তিনিও গেলেন। খানিকক্ষণ আমাদের সঙ্গে থেকে চলে গেলেন। আমরাও ধরি-ধক্কা আর কিছু করিনি।

'জিনিস-পত্তর আমাদের তোলা হলো একখানা গরুর গাড়ীতে। সেগুলোকে চাদর জড়িয়ে কফিনের মতো ক'রে নিলুম। তারপর 'হরিবোল' আর স্বদেশী 'বন্দেমাতরম্' স্লোগান ছাড়তে ছাড়তে রওনা হলুম আমরা।—আর সেদিন তখন, হ'বি তো হ, 'গুড়ুম্' ক'রে এক বন্দুকের আওয়াজ। হৈ চৈ পড়ে গেল; কে ফায়ার করলে; আমরা কিনা। শেষে জানা গেল, —পুলিশের বন্দুকে মিস্-ফায়ার হয়েছে —এ্যাক্‌সিডেণ্টালী। কিন্তু এই ব্যাপারটা ওঁদের শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস হয়নি।

'পাহাড়ের গায়ে তিনটে তাঁবু পড়লো। রাত্রে রইলুম চমৎকার সে পাহাড়ী পরিবেশে। ঘুম থেকে সব চেয়ে আগে উঠতুম আমি। সেদিন উঠেই দেখি কি, সিপাই-এর দল আমাদের তাঁবু পাহারা দিচ্ছে। সারা রাত্রিই পাহারা দিচ্ছে। টেণ্ট্-ভরতি সিপাই। 'তুম লোগ কাহে হিঁয়া রতা হৈ?' —জিজ্ঞাসা করলুম আমি। আপ-লোগোঁকা হেপাজতকে ওয়াস্তে হৈ'। হিংস্র জন্তু সব আছে পাহাড়ে; পাছে আমাদের আক্রমণ করে, সেই দরদে নাকি ওরা সরকারী নির্দেশে আমাদের হেপাজত করছে। আমি বললুম, —'জানোয়ার কী সাথ হামলোগোঁকা দোস্তী হৈ; তুমলোগ চলা জা শকতা হৈ।' কিন্তু তারা তো জল-পড়ার ভূত নয়, ফুঁক দিলেই উড়ে যাবে। বললে, —'ক্যা করে বাবু, হুকুম হৈ'।

'একদিন পরেই চলে এলুম। কিন্তু, গভর্ণরের আর আসা হলো না কেভ্‌ দেখতে। কেন জানো? ঐ সেই আওয়াজের ভয়ে। তার ওপর নাসিক-মার্ডার-কেস্‌ সেই তখন হয়ে গেছে টাট্‌কা।

'তিন মাস পরে. ফিরে আসার সময়ে বেগ পেতে হলো। 'ধর্ম'-কাগজ আর 'যুগান্তর' পাওয়া গেল গণেন-দার সেই সিগারেটের টিন থেকে। পেলে পুলিশে। জালগাঁও থেকে ম্যাজিস্ট্রেট বললে, —'তোমরা কাস্‌টডি আমাদের। তোমরা কলকাতা থেকে এসেছো'।

'তখন হ্যারিংহামকে বললুম, —'আপনার সঙ্গে যাবো আমরা'। তিনি বললেন. —'বেশ তো, চলো হায়দরাবাদ'। সেকেণ্ড ক্লাসে চড়ে বসলুম সবাই। কিন্তু, এ কী, সঙ্গে পুলিশ! হেতু, আমরা মার্কড্‌ এ্যানার্কিস্ট। আর. টিপিক্যাল চেহারা আমাদের সবার। এই গণেনকেই ধরো, টিক্‌লি নাক, লম্বা চওড়া, ফরসা; দেখলেই মনে হতো, বুদ্ধির জাহাজ। সমরের ছিল কটা চুল, কটা চোখ। অসিত হলো ফরসা, লম্বা, ডিগডিগে, টিকল চেহারার। আর আমাকে তো দেখতেই পাচ্ছো, গায়ে একপোঁচ কালি, কোঁকড়া চুল. দ্রাবিড়ী মার্কা।—

'হায়দরাবাদে এসে উঠলুম ডাকবাঙ্গলোতে। ভোরে ঘুম থেকে উঠেই দেখি —পুলিশ। আমাদের হাজিরি-রিপোর্ট চায়। দিনই এই রকম হয়। গণেনদা শেষে একটা ফন্দী আঁটলেন। একদিন বললুম পুলিশকে, —'মেমসাহেব অর্ডার না-দিলে আমাদের হাজিরি-রিপোর্ট দেওয়া হবে না। মোটাবুদ্ধির পুলিশ বুঝেও গেল ঠিক তাই।

'মেমসাহেবের দরজায় টোকা মারি সেই ভোর-রাতে। ঘুম-জড়ানো অত্যন্ত বিরক্ত গলায় জানতে চাইলেন তিনি. —'ব্যাপার কি'। আমরা বললুম. —পুলিশ এসে ডিস্‌টার্ব করছে সেই সন্ধ্যা-রাত থেকে; বলছে, —রিপোর্ট চাই। ভয়ানক চটে গিয়ে মেমসাহেব বললেন, —'আন রিপোর্ট বই'। মেমসাহেবের হাতে সেটা এনে দিতেই, টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলে দিলেন খাতাখানাকে। আর অর্ডার দিলেন, —Let him go. ব্যস্‌, সাতখুন মাফ্‌, —মেমসাহেব যে

'হায়দরাবাদ দেখা হলো। হায়দরাবাদ থেকে বললুম, —পথ বদলে যাবো। কিন্তু, সে কি আর স্বস্তি আছে। গাড়ীর পেছনে সেই

কনেস্টবল্।

'হায়দরাবাদে একটা স্টেশনে উড্রফ সাহেব যাচ্ছেন —দেখা হলো। বেঞ্চে বসে আছেন। প্রণাম করলুম আমরা। প্রণাম করতেই, উঠে দাঁড়ালেন তিনি সশ্রদ্ধভাবে। বললেন, —'লিখে দিয়েছি ওদের, পথে আর কোনও গোলমাল হবে না'। তবুও গোলমাল হলো কেন; জাস্টিস্ টেলিগ্রাম করলেন, তবুও? ওরা জবাব দিলে ন্যাকামি ক'রে, মানে বুঝতে পারেনি টেলির, —'ইয়ং মেন ফ্রম্ ক্যালকাটা —স্টপ্'। গোল বাধিয়েছিল না কি এই 'স্টপ্'-টা। ভাষার ছেদ না-হয়ে, ঐটেই আমাদের চলার ছেদ ঘটাবার জো হয়েছিল।

'অবশেষে সোসাইটিতে এসে গেলুম। তবুও পিচনে পুলিশ। অবনীবাবু ফোন করলেন যথাস্থানে, —এঁরা আমাদের লোক, আমরা এঁদের জামিন থাকছি'।

উত্তরভারত, দক্ষিণভারতের মন্দির-প্রাঙ্গণ ঘুরে ঘুরে প্রত্যক্ষ দেবলোকের সন্ধান পেয়েছিলেন নন্দলাল। এবার অজন্তার গিরিকন্দরে তিন মাস বসে, পেলেন প্রাণপ্রকৃতি আর বিশ্বপ্রকৃতিকে ভালোবাসার 'স্বপ্নলোকের চাবি'। আর পেয়েছিলেন মহত্তর শিল্পদৃষ্টি। তাঁর এই সময়কার নানা চিত্রকর্মেও দেখা যায় অজন্তার প্রত্যক্ষ প্রভাব। তাঁর 'দময়ন্তীর স্বয়ংবর' (প্রবাসী আষাঢ়, ১৩১৬) ছবির ওপর রামানন্দবাবু মন্তব্য করেছিলেন —'এই চিত্রখানি শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর অঙ্কিত। ইহার উৎকর্ষ হেতু ইহা কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট আর্টস্কুলের চিত্রশালার জন্য ক্রয় করা হইয়াছে। এই ছবিখানি দেখিলে অজণ্টা-গুহা-চিত্রাবলীর কোন কোন চিত্র মনে পড়ে। যেমন গ্রিফিথ্স্ সাহেবের অজণ্টা-গুহাচিত্রাবলীর বহিতে একজন রাজার অভিষেকের ছবি। পুরাকালে বামন দাসদাসী রাখা হইত। স্বয়ম্বর-সভার ছবিখানি দেখিলে মনে হয় যেন স্বয়ম্বরসভায় সকলে চন্দনচর্চিত দেহে উপস্থিত হইয়াছেন, এবং চন্দনের স্নিগ্ধ সৌরভ বায়ুমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হইতেছে। এই চিত্রের অঙ্কনপারিপাট্য চমৎকার হইয়াছে'।

—এই আবেশ নিয়েই নন্দলাল আসনপিঁড়ি হ'য়ে বসলেন এসে আবার আর্টস্কুলের সেই স্টুডিও-ঘরে। আবার সেই বাইরের লোকের আনাগোনা, আর শিল্পবিষয়ে গভীরতর নানা আলাপ-আলোচনা।—

॥ **ওকাকুরা কাকুজো** ॥ ১৯০১ সালে জাপান থেকে ধর্মমহাসভার আমন্ত্রণ নিয়ে ওকাকুরা এদেশে প্রথম এসেছিলেন —স্বামী বিবেকানন্দকে জাপানে নিয়ে যাবার জন্যে। নিয়ে যাবার চেষ্টা চলছে, এমন সময়ে স্বামীজী মারা গেলেন।

এদেশে এসে ওকাকুরা থাকতেন সুরেন ঠাকুরমহাশয়ের বাড়িতে। এসেছিলেন তিনি দু'-বার। প্রথমবার এসেই এদেশে স্বদেশী-আন্দোলনের গোড়াপত্তন ক'রে গেলেন। বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের সমর্থন ছিল তাঁর আলোচনায়। ওকাকুরার সঙ্গে সুরেন ঠাকুর আর সিস্টার এনার্কিস্ট মুভ্‌মেণ্টে যোগ দিলেন। নন্দলালের সঙ্গে তাঁর দেখা সাক্ষাৎ হয়নি সেবার। অবনীবাবুর সঙ্গেই তখন বেশী আলাপ জমেনি।

ওকাকুরা সুরেন ঠাকুরের বাড়ি থেকে জোড়াসাঁকো যেতেন। প্রথম যে-বছর এলেন ওকাকুরা, তখন নেপালের সঙ্গে তিব্বতের যুদ্ধ হচ্ছে। যুদ্ধ হচ্ছিল তিব্বতে। নেপালের ভেতর দিয়ে এসে এদেশেও তিব্বতী আক্রমণের ভয় ছিল। রাশিয়ানদেরও আসার ভয় ছিল বেশ। গগনবাবু একদিন জিজ্ঞেস করলেন ওকাকুরাকে —'রাশিয়ানরা এদেশে এলে কেমন হয়?' ওকাকুরা বললেন, —'তা' হ'লে ভারতের দুর্ভাগ্য'। 'জাপান যদি আসে'? —জিজ্ঞেস করলেন গগনবাবু। ওকাকুরা বললেন, —'সে-ও ভালো হবে না।' 'কেন?' —সকৌতুকে প্রশ্ন করলেন গগনবাবু। 'তোমরা তো ভালো'। —ওকাকুরা বললেন, —'জাপান এখন আপ্‌স্টার্ট, কোনো ট্রাডিশন নাই আমাদের ভারতকে দেবার মতো। আর যদি ওরা আসেই, তোমাদের দুর্ভাগ্য এইজন্যে যে, ওরা তোমাদের সবকাজে হাত দেবে। তোমরা পাল্লা দিয়ে পারবে না। তোমাদের যা কিছু ভালো সব শেষ ক'রে দেবে'।

গগনবাবু নিজে একজন আর্টিস্ট। তিনি জাপানী আর্টিস্টদের কথা পাড়লেন। ওঁদের ছবি সম্পর্কে তাঁর কি ধারণা, জিজ্ঞেস করলেন। ওকাকুরা বললেন, —'তাইকান আর হিষিডার ছবি খুব ভালো। কালি-তুলি আর রঙেও ওস্তাদ। তবে ওঁদের মধ্যে হিষিডার ছবিই বেশী পছন্দ করলেন। ১৯০২ সালে ওকাকুরা ফিরে গেলেন জাপানে।



সরস্বতী - জাপানী শিল্পী হিসিদার ধ্যানে

এদেশ থেকে জাপানে ফিরে গিয়ে ওকাকুরা জাপানী আর্টিস্ট কলকাতায় পাঠাতে লাগলেন। এতে দু'-দেশেরই আর্টিস্টদের উপকার হবে, ভেবেছিলেন। প্রথমেই পাঠালেন তিনি ইয়োকোয়ামা তাইকাম আর য়ুন্সো হিষিডাকে। সে হলো ১৯০৩ সালের কথা। তাঁরা দু'-জনেই এসে উঠলেন সুরেন ঠাকুরের বাড়িতে। ওঁদের বাড়িতে থাকতে লাগলেন। ওখানে বসেই ছবি আঁকেন, আর স্কেচ্ করেন। অবনীবাবুর স্টুডিয়োতে বসেও অনেক ছবি আঁকলেন। তাইকান আঁকলেন—'পার্থ-সারথি'; 'কালী' (প্রবাসী ১৩১০, আশ্বিন), 'কৃষ্ণের রাসলীলা' —এই সব। আর একটা ছবি আঁকলেন —'হিমালয় পর্বতে শিবের মূর্তি' ইঙ্কে।.. ছবি তিনটে তিনি বিক্রি করলেন। সেগুলো কিনলেন আম্বালাল সারাভাই। Miss Ghoshal পরে, 'সরলার মা' কিনেছিলেন 'কালী-মূর্তি'র ছবিখানি। তাইকান কালি-তুলিতে, ওয়াশে আঁকতেন ভালোই। অবনীবাবু ওয়াশের ছবি-করা প্রথম শিখলেন তাইকানের কাছ থেকে।

হিষিডা আঁকতেন রঙে। বুদ্ধের নানা পোজ্ এঁকেছিলেম তিনি। 'সরস্বতী' (প্রবাসী ১৩১০, কার্তিক), 'রাজগৃহে বুদ্ধ', 'বুদ্ধের মহানির্বাণ' —এই সব ছবি তাঁর। হিষিডার 'সরস্বতী'র ছবিটিও ছিল Miss Ghoshal-এর অধিকারে। এই ছবির সেট্‌টিও অবনীবাবুর মারফতে কিনলেন আম্বালাল। এই ছবিগুলো আবার জাপানী সরকার কিনে নিলেন আম্বালালের কাছ থেকে।

'তাইকানের 'কৃষ্ণের রাসলীলা' ছবির ফিনিশ নিয়ে চমৎকার একটা ঘটনা হয়েছিল। তাইকান রাসলীলার ছবি এঁকেছিলেন জোড়া-সাঁকোয় অবনীবাবুর বাড়িতে ব'সে। সে-ছবিটা আঁকা হ'য়ে গেছে; কিন্তু, তবু কিছুতেই যেন সেটা শেষ হচ্ছে না —পছন্দ হচ্ছে না শিল্পীর। তখন বিকাল। দুঃখিত হয়ে, ছবিটাতে কাপড় ঢাকা দিয়ে বাগানে অন্যমনস্কভাবে পায়চারি করছেন তাইকান। এর মধ্যে অবনীবাবুর ভগ্নী সে-ঘরে এসে, ছবিটা খুলে দেখে, এক-মুঠো চামেলী ফুল এনে ছবিটার ওপর ছড়িয়ে দিয়ে গেলেন। তাইকান ফিরে এসে, এই ব্যাপার দেখে, খুব উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। কদমগাছের তলায় ফুল-হাতে কৃষ্ণ আর গোপীগণ নৃত্যপর।

চামেলী ফুল ছড়িয়ে দিতেই সে-গুলো যেন তারার মতো ফুটে উঠেছে। তখন শিল্পী করলেন কি, একটি ক'রে চামেলী ফুল তুলে নেন, আর সেই জায়গায় একটি ক'রে চামেলী ফুল এঁকে দেন। এতে হলো কি, অন্ধকার-ভরা রাতের আকাশে যেন অজস্র তারা একসঙ্গে ঝলমলিয়ে উঠলো। ছবি ফিনিশ হয়ে গেল।'

সিন্দা কোম্পানী শেষে সব ছবি কিনে নিয়ে গেলেন। জাপানী কোম্পানী এদেশে জাপানী আর্টিস্টদের আঁকা ছবিগুলো স্বদেশের জন্যে কিনে নিয়ে গেল।

কিরিতান এলেন। —অবনীবাবুর বাড়িতে বসে বসে ছবি আঁকতেন তিনি। তিনি আঁকলেন —'রামায়ণের সিরিজ'। সে প্রায় আট-দশ-খানা ছবি। —'রাবণের রথে রাম ফিরে আসছেন', 'কৈকেয়ী', 'কৌশল্যা' —এই সব সীন্ এঁকেছিলেন তিনি বড়ো বড়ো সিল্কের ওপর রং দিয়ে দিয়ে।

খাটসুতা এসে আঁকলেন বুদ্ধ-জীবন নিয়ে। 'সুজাতা', 'বুদ্ধ' —এই সব নিয়ে পাঁচ-ছ-খানা ছবি। নন্দলাল দেখেছিলেন সেগুলো। নন্দলাল দেখতেন তাঁকে প্রায়ই অবনীবাবুর বাড়িতে বসে থাকতে।

আরাই-সান এসে ছবি আঁকতেন সোসাইটিতে, বিচিত্রায়। নন্দলালকে শেখাতেন তিনি ইঙ্কের কাজ। নন্দলাল, প্রতিমা দেবী সবাই শিখতেন তাঁর কাছে। এঁর কথা পরে আরও বলা যাবে। 'বিচিত্রা'য় ওঁকে বেতন দিতেন অবনীবাবু।

ওকাকুরা সুরেন ঠাকুরের পরম বন্ধু ছিলেন। দ্বিতীয়বার (১৯১১) এসেও ওঠেন ওঁরই বাড়িতে। খুব ভালবাসতেন সুরেনবাবুকে। একদিন কথা-প্রসঙ্গে বললেন, —'ইণ্ডিয়া স্বাধীন তো হবেই। যেদিন ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে, তুমি হবে সেই মুক্ত ভারতের রাষ্ট্রপতি; আর আমি হবো রাষ্ট্রদূত'। রাজা হবার মতোই লোক ছিলেন সুরেনঠাকুর মশায়।

আর্ট সম্বন্ধে ওকাকুরার সঙ্গে যে-সব কথা হয়েছিল নন্দলালের, সে কলকাতার আর্টস্কুলে। দ্বিতীয়বারে, আর্টস্কুলে অবনীবাবু ওকাকুরার সঙ্গে নন্দলালের পরিচয় করিয়ে দিলেন। সে ১৯১১-১২ সালের কথা। শুরুতেই, অবনীবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, —'ওদের বয়েস কত'? 'আঠারো', 'কুড়ি', 'বাইশ', 'চব্বিশ' ইত্যাদি —এই সব স্বাভাবিক উত্তর



শ্যামা-কালী - জাপানী শিল্পী ওকোয়ামার কল্পনায়

দিলেন অবনীবাবু। এই সোজা উত্তরের প্রতিবাদ জানিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তিনি বললেন, —'না, না, ও বয়েস নয়; কে ক'-বছর ক'রে শিখছে, তাই জিজ্ঞেস করছি'। তখন ঠিক ঠিক উত্তর মিললো, —'দুই', 'তিন', 'চার' —এই রকম। শুনে, ওকাকুরা বললেন, —'এদের এখন কিছু বলবো। সাত বছর বাদে আবার আসবো; তখন আবার বলবো। এখন ছবি আনতে বলুন ওদের, কম্পোজিশন্ দেখবো। রিজেক্‌টেড্ ছবি, নষ্টছবি —সব আনতে বলুন'। বঙ্কিমবাবুর বই থেকে করা নন্দলালের নষ্ট-ছবি 'ইন্দিরা' —কালাদীঘির পাড়ে ডুলিতে ব'সে পর্দা ফাঁক ক'রে দেখছে —এই ছবিটি দেখালেন অবনীবাবু। ওকাকুরা বললেন, —'এক্সপ্রেশন খুব ভালো। কিন্তু, কালারটা খুব ডার্টি হয়েছে; ফ্রেস্ হয়নি। অর্থাৎ রঙের জেল্লা হয়নি, ঘোলাটে হয়েছে। 'অগ্নি'র ছবি দেখে বললেন, —ভালো হয়েছে, দিশী কায়দায় হয়েছে। তবে, আগুনের ভাবটা তো ফোটেনি। হাতে আগুনের আঁচ তো লাগছে না। আগে সেই ভাবটা ফোটাও; পরে, তার বর্ণনা।

'রামায়ণে'র ছবি তখন নন্দলালের আঁকা হয়েছে তাঁকে দেখানো হলো। সে-ও পছন্দ হলো না তাঁর। বললেন, —'বড়ো ক্রুড্ হয়েছে। আরও ডেলিকেট্ হ'লে ভালো হতো'।

সুরেন গাঙ্গুলীর 'কৃষ্ণ-যশোদা', 'বলরাম' ইত্যাদি টুকিটাকি ছবি দেখানো হলো। সুরেন গাঙ্গুলীর ছবি দেখে ওকাকুরা বললেন, —'এটা রেপ্‌টাইল ছবি হয়েছে। আদিম যুগের জীবগুলো টুকরো টুকরো অর্থাৎ খণ্ড খণ্ড অংশেও প্রাণ পায়, সেই রকম হয়েছে এই ছবিটা। এর দুই অর্ধই ছবি হয়েছে, কিন্তু এদের কেন্দ্র হয়েছে ভিন্ন। সেইজন্যে এটা হিউম্যান্ ছবি হয়নি; হয়েছে রেপ্‌টাইল ছবি। মানুষের শরীর থেকে কোনো অংশ বিচ্ছিন্ন করা যায় না; প্রবেশও করানো যায় না; সে নিজেই সুসম্পূর্ণ। যার কোনো অংশ বাদ দেওয়া যায় না, সেই হলো ভালো ছবি' । —এইভাবে তিনি ছবির লক্ষণ সম্পর্কে অনেক কথা বললেন, আর দোষ দেখাতে লাগলেন।

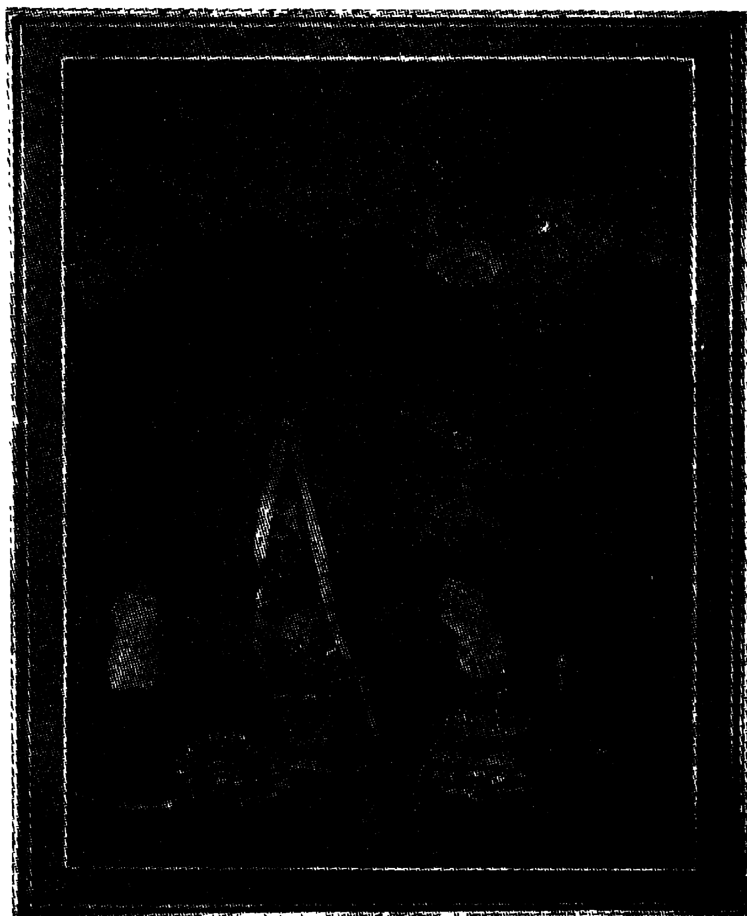
'অবনীবাবু তখন বাদশার ছবি এঁকেছেন —এই ইঞ্চি ছয়ের মতো পরিসর। খুব ডেলিকেট্ ক'রে ভালোভাবে এঁকেছেন। যে-টেবিলে অবনীবাবু

কাজ করতেন, সেই টেবিলেই রাখা ছিল বাদশাহের ছবিখানি। ওকাকুরা একেবারে সোজাসুজি টেবিলের ধারে গিয়ে, সেই বাদশাকে কুর্নিশ করতে লাগলেন। বললেন, —'এ ছবি প্রাণ পেয়েছে, উত্‌রেছে। তখনো তিনি হাঁটু-গেড়ে বসে কুর্নিশ করছেন।

'ওকাকুরা বললেন, —'ছবি খারাপ হলে ছাত্রদের কাকেও কিছু বলবে না। যিনি এঁকেছেন সে ছবি, সেটা তিনি তাঁর মতো করেই এঁকেছেন। তাঁর যত দরদ সব আছে ঐ ছবিতে। সেইজন্যে সহজে ছবির সমালোচনা করতে নেই।'

'ছবির স্তরভেদের কথায় তিনি বলতেন, —'প্রথম পর্যায়ের ভালো ছবি হলো —'Nice'। তারপরের ধাপ হলো —'Skillful', তারপর হলো —'Wonderful', আর সবশেষে হলো —'Divine'। 'আমাকে তিনি আর্টের tradition, observation আর originality বোঝাতেন তিনটি দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে।' এটা কি ব্যাপার, জিজ্ঞাসা করায়, ২৯-৫-১৯৬৫ তারিখে নন্দলাল তিনটি দেশলাই-কাঠির স্কেচ্‌ ক'রে ত্রিভুজ এঁকে বুঝিয়ে দিলেন, —'ত্রিভুজের তিন কোণের ক্ষেত্রে এই কটা থাকা চাই। ঐতিহ্যের জ্ঞান না থাকলে আর্ট হয় কাঁচা আর খোঁড়া; প্রকৃতিপাঠ না-করলে হয় দুর্বল আর মেকী; আর মৌলিকতা না-মিললে সে হলো প্রায় মৃত। আবার, কেবল ঐতিহ্যে দখল —সে হলো কারিগরি; শুধু প্রকৃতিপাঠ ক'রে কাজ সারলে —সে হয় নকল; আর অনর্গল মৌলিকতা —সে হলো স্রেফ পাগলামি। —আমার 'শিল্পকথা' (১৩৫১) বই-এ এই কথাগুলো ভালো ক'রে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলুম।'

'ওকাকুরা বলতেন, —ভারতবর্ষ পেনটিং-এর দেশ নয়। এ হলো স্কাল্‌চারের দেশ। পুরী, কোণারক ঘুরে এসে তাঁর এই মত পাকা হয়েছিল। পেনটিং-এ সরেস হলো চীন। ভারতবর্ষের ভাস্কর্য যে-স্তরে উঠেছিল, চিত্রশিল্প সে-স্তরে ওঠেনি। ভারতীয় ছাত্রদের ভাস্কর্য শিখতে বলতেন তিনি। অবনীবাবুকে বলতেন, —'আপনারা ছবি আঁকছেন আঁকুন। সমরবাবু স্কাল্‌চার করুন; আপনি, গগনবাবু তো ছবি আঁকছেন। ভারতীয় ভাস্কর্যের রিভ্‌াইভাল হওয়া দরকার, আর্টের রিভ্‌াইভালের মতোই।



বঙ্কিমচন্দ্রের ইন্দিরা - নন্দলাল

'তখন ওকাকুরার শরীর অসুস্থ খুব। বয়েস হবে বোধহয় পঞ্চান্ন-ছাপান্ন। বেঁটেখাটো লোকটি। সুন্দর চেহারা। টানা টানা চোখ। বসতেন হাঁটু গেড়ে। আর খুবই অল্পভাষী ছিলেন তিনি। পঞ্চাশটা কথা বললে তার উত্তর দিতেন একটা। শুনতেন বেশী, বলতেন কম। আর যতটুকু বলতেন, তাতেই তাঁর সবটা বলা হয়ে যেত।

'তখন ওঁর লিভারের অসুখ। মাতাল ছিলেন খুবই। মদ খাওয়া ছিল ওঁর এ্যাব্‌নর্‌ম্যাল। সিপ্‌ ক'রে খেতেন। জলও খেতেন সিপ্‌ করে। আর সিগারেট্‌ খেতেন কৌটার পর কৌটা। মুখের আগুন নিভছে না। ঘন ঘন বাথরুমে যাচ্ছেন। অনেক বই লিখেছেন তিনি। সুবিখ্যাত বই সে সব।

'দ্বিতীয়বার ১৯১১ সালে ওকাকুরা যখন ভারতবর্ষে এলেন তখন তিনি বোস্টন-ম্যুজিয়মে কিউরেটর হ'য়ে যাচ্ছেন। কুমারস্বামী যে-পদে পরে ছিলেন, সেই পদ পেয়ে যাচ্ছেন। যাচ্ছেন ছবি-টবি সব গুছিয়ে রাখতে আর তাদের ক্যাটালোগ্‌ করতে। ভারতবর্ষে নামলেন ওখানে যাবার পথে।

'সামামুরাকে ওকাকুরা পাঠিয়েছিলেন ইংলণ্ডে, আর তাইকানকে পাঠিয়েছিলেন ইটালীতে। ওকাকুরা দেশে-বিদেশে এই সব স্বদেশী শিল্পীদের পাঠিয়ে, জগতের যাবতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে যোগ রাখতে চেয়েছিলেন। তখন জাপান তার পুরাতন ঐতিহ্য ভুলে গেছে। মানুষ ইত্যাদি বড়ো বড়ো বস্তু চিত্রশিল্পে আঁকবার ধারা তখন ভুলে গিয়ে, জাপানী শিল্পীরা প্রজাপতি, ফুল —এই সব বিষয়ে আঁকতেই ব্যস্ত। কিন্তু, এই সব জিনিস সুন্দর হলেও তুচ্ছ। মানুষের সৌন্দর্যতৃষ্ণা কেবল মেটেনা এতে। তাই তখন তারা বাইরে থেকে রীতি-পদ্ধতি আর প্রেরণা আনবার জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠেছে। মানুষের জীবন নিয়ে আঁকবার পদ্ধতি ওদেশে গেল ভারতবর্ষ থেকে। সমস্ত দেশ দেখে দেখে, জগতের বিভিন্ন স্থানের উৎকৃষ্ট শিল্প-নিদর্শন সংগ্রহ ক'রে এনে, নিজেদের দেশকে উন্নত করবার চেষ্টায় ওকাকুরা দেশে-বিদেশে এই সব শিল্পীদের পাঠিয়েছিলেন। ফেনোলসা-র সঙ্গেও আলাপ ছিল ওকাকুরার।

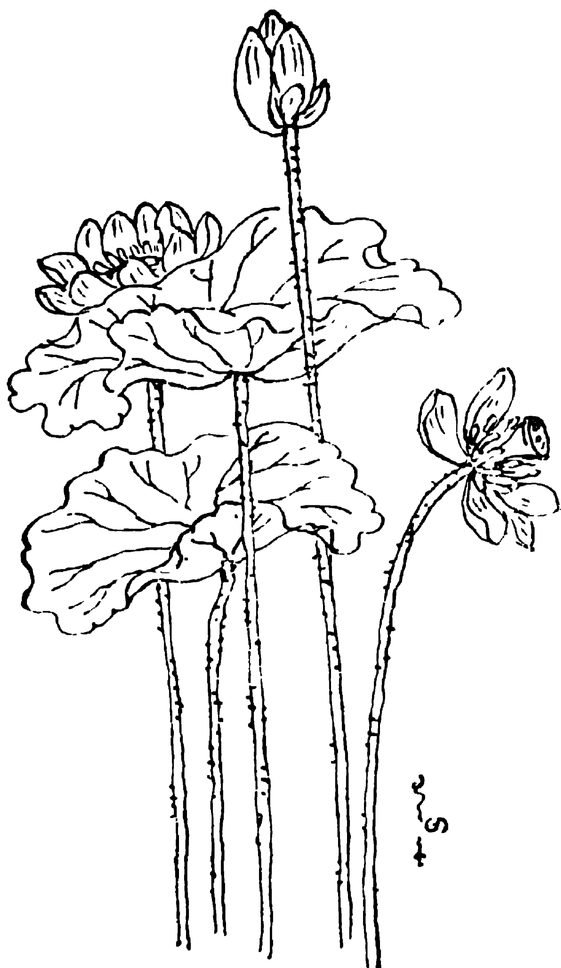
'বোস্টন থেকে ফিরে, জাপানে গিয়ে মারা গেলেন তিনি। অবনীবাবু,

গগনবাবু, সমরবাবুদের ভালোবাসতেন তিনি অন্তরের সঙ্গে। ওঁদের তিনজনের জন্যে নামের তিনটে সীল্ তৈরী করিয়ে, চীনে কাটারদের দিয়ে কাটিয়ে, ওকাকুরা কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। খুবই শ্রদ্ধা করতেন তিনি এঁদের। এই ধরনের সীল্ চীন ছাড়া আর কোথাও এইভাবে কাটানো যেতোনা। চীনে অক্ষরে এঁদের নাম লিখিয়ে দিয়েছিলেন। আর সে-গুলো কাটিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন কলকাতায়।

মিস্ ম্যাক্লাউড্ ॥ নন্দলালের সঙ্গে তাঁর দেখা বেলুড়মঠে। সেই প্রথম দেখা। বেলুড়মঠের গেস্ট-হাউসে থাকতেন তিনি একটা ঘরে। গণেন মহারাজ সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন নন্দলালকে। ঘরের মধ্যে ছিল প্রকাণ্ড একটা টেবিল। সেটা তৈরী একটা তক্তায়। ছ'সাত ফিট ব্যাসের একটা কাঠ। একটা গাছের একটা 'ছেয়ে'তে তৈরী করেছে। আমেরিকান গাছ ছিল সেটা। পাঁচ-ছ'শো বছর বাঁচে সে-গাছ। গাছের ছালও রাখা ছিল, দেখেছিলেন নন্দলাল। মিস্ ম্যাক্লাউড্ নন্দলালকে তাঁর ব্রোঞ্জের কালেক্শন দেখালেন। সেই থেকে বিশেষ আলাপ হয়েছিল ওঁদের। মাঝে মাঝে আলোচনাও হতো নানা বিষয়ে।

ইনি ছিলেন স্বামীজীর শিষ্যা। আমেরিকান মহিলা। ধনী ছিলেন খুব। রামকৃষ্ণ মিশনকে বরাবরই বহু টাকা জুগিয়েছেন। এদেশ থেকে ফিরে যাবার সময়ে তিনি সারা ভারত ঘুরে গেলেন। ওকাকুরার সঙ্গেও তাঁর আলাপ হয়েছিল। জাপানেও গিয়েছিলেন তিনি। ওকাকুরার বই Ideals of the East লিখতে মিস্ ম্যাক্লাউড্ বিশেষ সাহায্য করেছিলেন। প্রায়ই জাপানের কথা বলতেন তিনি —'বীরের জাত ওরা' —এই সব ব'লে, ওদের খুব 'সুখ্যাত' করতেন। জাপানী সামুরাইদের বীরত্বের গল্প বলতেন অনেক। সামুরাইদের একজনের কথায় বললেন, —আক্রমণকারী শত্রুর হাতে তালোয়ার ; অথচ তারই সঙ্গে সামুরাই লড়াই করছে, কাগজ পাকিয়ে তলোয়ার বানিয়ে ; —'যুধো' খেলছে। খেলতে খেলতে এমন প্যাঁচে ফেললে ; শেষে তলোয়ার ব্যর্থ হলো। শত্রু নিজের তলোয়ারে নিজেই কাটা পড়লো।

অনেক পরে, নন্দলালের করা বাগগুহার ছবির কপি —'ভীলরা নাচছে' —খুব পছন্দ হয়েছিল তাঁর। তার কপি চাইলেন একটা। নন্দলাল দিলেন



ওকাকুরার পদ্মঝরা ও পদ্মফোটা - জাপানী মূলের প্রতিলিপি

কপি ক'রে।

বহুদিন বাদে, মিস্ ম্যাক্লাউড্ বেড়াতে এলেন শান্তিনিকেতনে। নন্দলাল সঙ্গে নিয়ে সব স্থান ঘুরে ঘুরে দেখাতে লাগলেন। গ্রামের দিকেও নিয়ে গেলেন —গোয়ালপাড়ায়। ঘুরতে ঘুরতে সহসা একটা মজা-পুকুরে নেমে, খানিকটা পাঁক তুলে নিয়ে, পাড়ে ফেলে দিলেন মিস্ ম্যাক্লাউড্। কী ব্যাপার ? নন্দলাল জিজ্ঞাসা করলে বলেছিলেন, —'স্বামীজীর নির্দেশ। পুকুর-কাটানো হচ্ছে না, সংস্কার হচ্ছে না, পলি পড়ে যাচ্ছে। 'পঙ্কোদ্ধার করো', —এ-কথা মুখে বললে কোনো কাজ হবে না। আমরা যতটা পারি কাজে সাহায্য করবো। কেবল লেকচার দিয়ে কোনও কাজ হবে না। নিজে কাজে সাহায্য করবে। এ-দেশ গরীব দুঃখী হ'তে পারে ; কিন্তু কখনও তাদের গালাগাল দেবে না। এদেশের লোকই আমার দেবতা। —এই হলো স্বামীজীর নির্দেশ।'

বেলুড়ে মঠ আর মন্দির তৈরীর জন্যে অনেক টাকা তিনি দিয়েছিলেন। নন্দলাল একবার মঠে গিয়ে দেখেন, মন্দিরে একটা বিলিতী ঝাড়-লণ্ঠন টাঙ্গাচ্ছেন সাধুরা। নন্দলাল বললেন, —'ওটা টাঙ্গানো ভালো হচ্ছে না'। ওঁরা বললেন, —'উপায় নাই, টাঙ্গাতেই হবে, —হোক্ বিলিতী লণ্ঠন —এ হচ্ছে ভক্তের শ্রদ্ধার দান।'

'পুরাতন জাপানী-শিল্পীর আঁকা দু-খানি ছবি ওকাকুরা উপহার দিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দজীকে। তার একটি ছবিতে কুঁড়ি থেকে একটি পদ্ম ফুটেছে ; আর একটি পদ্ম ফুটেছিল, ঝ'রে পড়ছে। বেলুড়-মঠে ছিল ছবি দু-খানি। মিস্ ম্যাক্লাউড্ ছবি দু-খানি এনে শান্তিনিকেতন-কলাভবনে উপহার দিয়েছিলেন। আমি ভেবেছিলুম ছবি দু-খানি জাপানে পাঠাবো মাউণ্ট্ করাতে। মিস্ ম্যাক্লাউড্ নিষেধ করলেন, —'ওরা ফেরৎ দেবে না'। তাই কলাভবনে টাঙ্গানো হতো যেমন ছিল তেমনই।'

'রবীন্দ্রনাথকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন মিস্ ম্যাক্লাউড্। আশী বছরের ওপর বয়সে ইদানীং মারা গেছেন তিনি আমেরিকায়।

নূতন ও পুরাতন যুগের সন্ধিক্ষণে পদ্ম-ঝরা ও পদ্ম-ফোটার কাহিনী
॥ বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিল্পচিন্তা (১৮৭০-১৮৯৯) ॥

উনবিংশ শতাব্দের শেষ দশকের দিকে কলকাতার আর্টস্কুলে বা স্টুডিওতে এ্যাংলো-বেঙ্গলী কিংবা 'কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ' 'আদিম রঙলেপা বর্বর' ছবি ছাড়া আর কিছু মিলতো না। আর্ট-গ্যালারীতে অনুমানবোধ্য বিলিতী ছবির পসরা ; কালীঘাটের পট ছাড়া দিশী ছবি ছিল না একটিও। আর্টস্কুলের অধ্যক্ষ হ'য়ে হ্যাভেল সাহেব মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় সবে এসেছেন ১৮৯৬ সালে।

রবিবর্মা এদেশের তখন প্রথম প্রতিভাধর চিত্রকর। তিনি ভারতবর্ষের পৌরাণিক ভাবগুলির মর্মস্থলে প্রবেশ করেছিলেন সে তাঁর রুচি আর শিক্ষার ধাঁচে। রবিবর্মার চিত্রাবলী তখন বাঙ্গালাদেশে প্রথম প্রকাশিত হচ্ছিল 'সাধনায়' —১৮৯৪ সাল থেকে। কালীঘাটের পটে পরিতুষ্ট শহরে আর গাঁয়ে বাঙ্গালীসমাজের সবাই সেই নিয়েই খুশি ছিল তখন। অনুশীলনের অভাবে চিত্র-সৌন্দর্য উপভোগের বৃত্তিগুলিই তখন যেন আমাদের বিকশিত হ'য়ে ওঠেনি। রবিবর্মার ছবি ছাপালেও রবীন্দ্রনাথের শিল্পী-মন তাতে তৃপ্ত হ'তে পারেনি।

অবনীন্দ্রনাথ এই সময়ে রবিকাকার উপদেশে, বৈষ্ণব-কবিতা প'ড়ে, দিশীভাবে কৃষ্ণলীলার ছবি আঁকা (১৮৯৪-৯৬) শুরু করলেন। সেই সময়েই 'ঘটনাচক্রে' বিলেত থেকে ওঁদের সাবেক প্রথায় আঁকা একটা এ্যালবাম হাতে এলো অবনীবাবুর। দিশী পুরাতন শিল্পীদের আঁকা আর একটা এ্যালবাম তাঁকে পাঠালেন তাঁর এক আত্মীয়। এই দিশী ছবির এ্যালবামটি হলো পাটনা-স্কুলের স্কেচ্-করা —দিল্লীর ইন্দ্রসভার নকশা।

'আমাদের পুরাতন কলাভবনের 'লুপ্তপ্রায় চিত্রশিল্পের' এই দিশী এ্যালবামটি দেখে, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'দিল্লীর চিত্রশালিকা' নামে একটি প্রবন্ধ লিখলেন। প্রবন্ধটি ১৩০৫ সালের (১৮৯৮) বৈশাখ মাসের 'ভারতী'-পত্রিকায় প্রকাশিত হলো। অবনীবাবু বললেন, —এর

ফলে, 'চারদিকে তখন একটা সাড়া পড়ে গিয়েছিল'। দিশী চিত্রের এই এ্যালবামখানির চিত্রগুলিতে ভাব, ভঙ্গি, বর্ণ, লাবণ্য, শ্রী ও গঠন-পারিপাট্যের রমণীয়তা সম্পর্কে বলেন্দ্রনাথ বলেছিলেন :—

'নব্যতন্ত্রের হিসাবে হয় ত সে সূক্ষ্ম ছায়া আলোকও নাই এবং তুলিকার সে দূরানুসূচী লঘুস্পর্শও এখানে দুর্লভ, কিন্তু তথাপি আমাদের পুরাতন কলাভবনের এই লুপ্তপ্রায় চিত্রশিল্পের মধ্যে যে একটি মনোহর মোহ আছে, তাহা স্বীকার না করিয়া থাকা যায় না। শুধু যে পুরাতন বলিয়া, সে কালের বলিয়াই ইহার আদর তাহা নহে ; ইহার বিচিত্র সূক্ষ্ম রেখাপাত ও স্নিগ্ধোজ্জ্বল প্রাচ্য বর্ণবিন্যাসে যে সুন্দর কারু-কার্য প্রকাশ পাইয়াছে, এমন রমণীয় কলানৈপুণ্য অন্যত্র কদাচ লক্ষিত হয়। এবং এই কলানুসৃত নিপুণ কারুকার্যই ভারতবর্ষের শিল্পিজনচিত্তে এই সুরঞ্জিত চিত্রফলক এত দিন ধরিয়া এমন অম্লান আদর্শে সঞ্জীবিত রহিয়াছে।

পাশ্চাত্য চিত্রকলার সহিত ইহার সম্বন্ধ অল্পই —না ভাবে বিশেষ ঐক্য, না বর্ণবিন্যাস ও রচনাপ্রণালী একবিধ ; এমন কি, উভয়বিধ রচনার অন্তর্নিহিত প্রতিভার মধ্যেও যেন বহু দেশ ও বহুতর সমুদ্রের ব্যবধান। প্রাচ্য জীবনপ্রবাহেরই মত এই চিত্রার্পিত জীবন-স্রোত রূপে বর্ণে আলোকে, বিচিত্র মিলন-বিরহ-সম্ভোগে, কখনও হাসিতে, কখনও অশ্রুচ্ছ্বাসে, কখনও সুখে, কখনও বেদনায়, কোথাও নিবিড় নির্জন দাম্পত্যের রমণীয় স্নিগ্ধচ্ছায়ে, অন্যত্র আলোকচ্ছটাবিচ্ছুরিত সহস্রসখী-পরিরম্ভাকুলিত নৃত্যগীতরস-রভসে হিল্লোলিত ও বিহ্বলিত হইয়া মদালসময়ী মন্দগতিতে নিঃশব্দে বহিয়া চলিয়াছে। এবং ভারতবর্ষীয় সকল শিল্প-কলারই মত ইহার অবলীলাগতিভঙ্গে শিল্পীর সেই প্রায়নির্লিপ্তবৎ অনতি-সচেতন রচনাকলা সকল চেষ্টার ভাব অপসারিত করিয়া দিয়া কেমন একটি প্রশান্ত স্থৈর্য সঞ্চারিত করিয়া তুলিয়াছে।

আমাদের নিকট ইহা স্বভাবতই রমণীয় —বিষয়গুণেও বটে, এবং আরও বিশেষতঃ ইহার রবিকরোদ্ভাসিত বর্ণাভাসে। সে ঔজ্জ্বল্য আমরা আর কোথাও দেখিতে পাই না। প্রতীচ্য চিত্রে স্বভাবতই তদ্দেশেরই সূর্যালোক দীপ্তি

পাইয়া থাকে, এবং প্রতীচ্যবিদ্যাশিক্ষিত নব্য আর্টস্কুলের ছাত্রের রচনায়ও আলোকসন্নিবেশ প্রায়ই বিলিতী ছবির অনুরূপ হওয়ায় তদ্দেশীয় মৃদু আলোকেই এদেশীয় চিত্র উদ্ভাসিত হয়। আমাদের পুরাতন সূর্যালোক অবহেলালাঞ্ছিত তাহার সেই পুরাতন চিত্রপট আজিও পরিত্যাগ করে নাই। তাহা যেন কেবল এই প্রাচীন চিত্রফলক এবং যে বিচিত্র শিল্প ও কাব্যকলার মধ্যে এই চিত্রকলা চিরদিন বর্ধিত ও পরিপুষ্ট হইয়া আসিয়াছে, তাহারই বিচিত্রাভ বর্ণসঙ্গমে একান্ত নিহিত হইয়া রহিয়াছে।

সেই জন্যই বোধ করি, এই সমস্ত দেশীয় বিচিত্র শিল্প ও কাব্যকলার আবহাওয়ার মধ্যেই এই চিত্রগুলি সমধিক উজ্জ্বলতররূপে প্রতিভাত হইবার অবসর পায়। বিলিতী ফ্রেম ইহার সহিত কিছুতেই বেশ শোভন সঙ্গত হয় না। এবং পণ্যশালাবৎ অগণ্য বস্তুবিস্তারবহুল টুকিটাকিকণ্টকিত আধুনিক অভ্যর্থনাগৃহের বিলিতী শিক্ষিত অবহেলাসজ্জিত অসঙ্গতির মধ্যে সহস্রধা প্রতিহত হইয়া ইহার মর্মনিহিত সমস্ত সৌন্দর্য যেন একান্ত ক্লিষ্ট হইতে থাকে। এই শিল্পসৌন্দর্যের যথার্থ মর্ম গ্রহণ করিতে হইলে চতুর্দিক হইতে ঘনায়মান য়ুরোপীয় সভ্যতার বহু নিরর্থক বাহুল্যভার দূরে অপসারিত করিয়া দিতে হয়, যাহাতে ক্ষণে ক্ষণে তাহা চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিতে না পারে।

যে গৃহভিত্তিমূলে এই ছবিগুলি বসিবে, তাহার মর্মরহর্ম্যতলে, চিত্রিত প্রাসাদকক্ষে যেরূপ ঘননিবিড় কোমল বিচিত্রাভপুষ্পিত পারস্য গালিচার উপরে উষ্ণীষশোভিতশির সুদীর্ঘচাপকাননিবদ্ধবপু রাজসভাসদ্‌গণের আসন নির্দিষ্ট হইয়াছে, ঐরূপ পুরু খাপী কুসুমসুকুমারস্পর্শ নানা পুষ্পলতাবিচিত্র গালিচার উপরে কনককারুখচিত আমেদাবাদী কিংখাবের গেলাপমণ্ডিত গুটিকতক সুগঠিত গভীর আরাম-উপাধান বৈ আর বড় কিছু থাকিবে না। এবং লাক্ষাবিলেপচিত্রিত সহস্র বর্ণের আভানিঃস্যন্দী ছাদহর্ম্যতলে দন্তিদন্তখচিত আদ্যন্তখোদিত চন্দনপাদপীঠোপরি জয়পুরী কারুকার্যময় সুবর্ণদীপাধানে সুগন্ধী স্নেহাভিষিক্ত বর্তিকাশিখামুখ হইতে ধূপধূম্রগন্ধবৎ একপ্রকার লঘু স্নিগ্ধ সৌরভ উত্থিত হইয়া দিকে দিকে মৃদু অনুকূল মোহ সঞ্চারিত করিতে থাকিবে।

চিত্রও যেরূপ, চতুষ্পার্শ্বিক সমস্তই তদনুরূপ হওয়াই সঙ্গত। গৃহের স্থাপত্যে আগ্রার সেই সুরম্য প্রস্তরসন্নিবেশ এবং অলিন্দের আলিসায়

সেইরূপ জালিকাজের রচনা, কপাটে মহীশূরী খোদাই অথবা লক্ষ্ণৌয়ের কনকঝালরের সূক্ষ্ম কারুকার্য, খিলানের খাঁজে খাঁজে বিলম্বিত রবিকিরণকীর্ণ কনকঝালরের ইন্দ্রজালমায়া, এবং উদ্যানপ্রান্তের দূর তোরণ-মণ্ডপ হইতে নহবতের শেষপ্রায় স্বর্ণরেশটুকু। এবং আমরা দর্শকের দল এই রূপরসশব্দস্পর্শগন্ধমোহময়ী চিত্রশালিকায় প্রবেশ করিবার পূর্বে সভ্য প্রাচ্য রীতি অনুসারে দ্বারদেশে পাদুকা উন্মোচনপূর্বক ভব্য উষ্ণীষ চাপকান চুড়ীদার এবং তদুপরি বাম স্কন্ধ হইতে দক্ষিণ বাহুতল দিয়া বিলম্বিত সোনালী পাড়ের বায়ব উত্তরীয়পরিশোভিত হইয়া গেলেই সমস্তটির সহিত সম্যক্ একীভূত হইয়া যাই।

কিন্তু বাঙ্গলার পাঠকসাধারণের নিকট এ প্রাচীন চিত্রকলা বোধ করি, সেরূপ সুপরিচিত নহে এবং এতদানুষঙ্গিক এই বর্ণ-গন্ধ-গীতি-সৌন্দর্যময়ী শোভা-সম্পদ্-সুখ-বিলাস-উৎসববিচিত্রা জীবনযাত্রাও নব্য শিক্ষাগুণে বিস্মৃতপ্রায়। সেই জন্য এ সকল অনেকের নিকট দুরূহ প্রহেলিকা প্রতিপন্ন হইবার আশঙ্কা জন্মে। আমাদের মধ্যে যাঁহারা কিছু দিন পশ্চিম দেশে যাপন করিয়াছেন এবং দিল্লীর শ্রেষ্ঠিচত্বরে অথবা জয়পুরের কলাভবনে বিচিত্র দেশীয় শিল্পকলার মধ্যে এই মনোহারিণী চিত্রবিদ্যার পরিচয় গ্রহণের অবসর পাইয়াছেন, তাঁহাদের নিকট ভরসা করি, এই সকল কথা প্রহেলিকা বলিয়া প্রতিভাত হইবে না। কিন্তু যাঁহাদের অভিজ্ঞতা বাঙ্গলার নব্য রাজধানীর নির্দিষ্ট গণ্ডীর বাহিরে বড় যায় না, তাঁহারা যদি কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীতে কলিকাতার রাজপথে পরেশনাথের যে উৎসবযাত্রা বাহির হয়, তৎপ্রতি একটু লক্ষ্য রাখিয়া থাকেন এবং কল্পনার সাহায্যে সেই হয়গজরথধ্বজাসমন্বিত বিচিত্রবেশ রম্য দৃশ্যটুক্‌কে যথাযথ চিত্রপটে আরোপিত করিয়া তুলিতে পারেন, তবে তাঁহাদের মনে এই চিত্রকলা সম্বন্ধে ধারণা কথঞ্চিৎ পরিস্ফুট হয়। তেমনি লাল নীল সোনালী বেগুনী শ্বেত পীত জরী জহরৎ ঝকমক ঝিকিমিকি, অথচ এত ঔজ্জ্বল্যেও কেমন একটি প্রশান্ত কমনীয়তা —কোথাও কোনরূপ বর্বর আতিশয্য চক্ষুকে পীড়া দেয় না বা মনকে ক্লিষ্ট করে না।'

এর পর বলেন্দ্রনাথ কাদম্বরীর কায়দায় নিজস্ব ভাষার ভঙ্গিতে

(ক) রাজকীয় বিবাহে কন্যা-গৃহে আশীর্বাদী-প্রেরণের শোভাযাত্রা, আর (খ) রাজকীয় বিবাহের বরযাত্রার —মনোহর বর্ণনা দিয়ে মোগল-চিত্রকলায় আলোকসন্নিবেশের প্রয়োগ-বিজ্ঞান সম্পর্কে বলেছেন :—

'এই প্রয়োগবিজ্ঞানে অমোঘ পটুত্বই আমাদের ভারতবর্ষীয় শিল্পীর প্রধান গৌরব। এমন কি, এই অশিক্ষিতপটুত্বে শিক্ষিত পাশ্চাত্য রুচি যেখানে হস্তক্ষেপ করিয়াছে, সেখানেই তাহার বর্বর স্পর্শে শিল্পকলা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। অশিল্পী বর্বরেরা কৃত্রিম ও স্বাভাবিক দুইটা শব্দ ও তাহার আভিধানিক অর্থ শিখিয়া রাখিয়াছে মাত্র, প্রয়োগবিষয়ে তাহাদের ধারণা বালকেরও অধম। তাহারা গালিচার কৃত্রিম পুষ্পকে সর্বতোভাবে স্বাভাবিক করিয়া তুলিতে চাহে এবং আমাদের চিরন্তন শালের পাড়ে নেত্রঝলসী বর্ণে বিলিতী আদর্শানুযায়ী স্বাভাবিক প্যাটার্ণ সূচিত করিবার প্রয়াস পায়। ফলে, প্যাটার্ণ যতই স্বভাবানুরূপ হইয়া আসে, শিল্পের মনোহারিতা ততই দূর হইতে থাকে।

চিত্রশিল্প সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। যে কারণে গালিচার জমিতে ও শালের সূচিকার্যে স্বভাবের অবিকল অনুকৃতি নিষ্ফল হয়, ঠিক সেই কারণেই আমাদের চিত্রশিল্পে নব্যতন্ত্রের স্বাভাবিকতা স্ফূর্তি পাইয়া উঠে না। গৃহভিত্তিমূলে যে চিত্র অঙ্কিত হয়, ক্ষুদ্র গৃহাকাশের প্রস্তরনিবদ্ধ চতুষ্পার্শ্বে এবং স্থাপত্যের কৃত্রিম গঠনপ্রণালী ও সহস্র কারুকার্যের সহিত তাহার সঙ্গতি সংরক্ষণ নিতান্ত আবশ্যক। এবং এই সঙ্গতি রক্ষার্থেই খুঁটিনাটির প্রতি দেশীয় চিত্রকরের দৃষ্টি এরূপ তীক্ষ্ণ। গৃহের প্রাচীরবেষ্টনমধ্যে কি রেখাবর্ণ সমাবেশ সর্বাপেক্ষা সুশোভন হয়, আমাদের শিল্পীরা তাহার মর্মটুকু আশ্চর্য আয়ত্ত করিয়া লইয়াছেন। এমন কি, আমাদের চিত্রকলা স্থাপত্যের একটি প্রধান অনুরঞ্জনী অঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে।

নব্য পাশ্চাত্য চিত্রলেখার প্রণালীই কিছু স্বতন্ত্র। শিল্পী সেখানে যে উচ্চভূমি-পরে দাঁড়াইয়া সম্মুখের দৃশ্যপটে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তথা হইতে রেখাবর্ণের প্রত্যেক সূক্ষ্ম বিভাগ দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু বৃহৎ প্রকৃতি সেখান হইতে সমগ্রভাবে ভালরূপ চোখে পড়ে। এই জন্য, ঐ সকল ছবি দেখিতে গেলেও একটু তফাতে দাঁড়াইতে হয়.

যাহাতে খুঁটিনাটি দৃষ্টিপথে না পড়িয়া সমস্ত চিত্রখানি এক দৃশ্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। আমরা সচরাচর যে ভাবে দেয়ালে ছবি টাঙ্গাইয়া গৃহকে সজ্জিত করি, তাহাতে চিত্রের সৌন্দর্য যে সম্যক্ বিকশিত হইবার অবসর পায়, এমন বোধ হয় না। তাহার দূরানুসূচিতা অনেক সময় গৃহভিত্তির চতুঃসীমামধ্যে প্রতিহত হইতে থাকে এবং বাহিরের মুক্তাকাশের ছায়ালোকও বোধ করি, বদ্ধগৃহে কথঞ্চিৎ অসঙ্গত হইয়া উঠে।

আমাদের চিত্রশিল্প দূর হইতে কেবল মনোহর বর্ণসঙ্গম মাত্র এবং নিকটে কারুকার্যে চিত্তহারী। গৃহের মধ্যে লোকে অনেক সময়ে কাছে আসিয়া দেখিবে, ইহা আশা করাই যায়। সুতরাং সূক্ষ্ম কারুকার্যের এখানে বিশেষ সার্থকতা আছে। কিন্তু এ কারুকার্য কেবলই জ্যামিতিক রেখাবিন্যাস মাত্র নহে, এবং বারাণসী শাড়ী ও কাশ্মীরী শালের সূচিকার্যের সহিত কলাগত ঐক্য বা সাদৃশ্য থাকিলেও নরনারীর বিচিত্র মুখভঙ্গী ও হাবভাবে ইহাতে যে একটি সরস সজীবতা সঞ্চারিত হইয়াছে, তাহা কিছুতেই উপেক্ষণীয় নহে।

এবং ভারতবর্ষীয় চিত্রকরের রচনা এ বিষয়ে বিশেষ প্রশংসার্হ; সভামধ্যেই কি, অন্তঃপুরেই কি, উৎসবেই কি, সর্বত্র এবং সর্বাবস্থাতেই তাঁহার রচিত চরিত্রগুলির মুখে চক্ষে ভাবে ভঙ্গিতে একটু বিশেষ রকম আছে।'—

অতঃপর, বলেন্দ্রনাথ তাঁর অননুকরণীয় অপূর্ব ভাষায় বর্ণনা দিয়েছেন: (গ) রাজ-অন্তপুরের চিত্র, (ঘ) সপ্তরমণী ও সুগঠনা শ্যামাঙ্গী বীণাবাদিনী, (ঙ) তরুণী তন্বঙ্গী, (চ) বীণাবাদিনী —ব্যাঘ্রচর্মোপরি সমাসীন —মৃদুচন্দ্রালোকে নিবিড় বনান্তে, (ছ) শাহেনশাহ বাদশাহ, (জ) তরুণ রাজকুমারের শোভাযাত্রা, (ঝ) বীণাবাদিনী —সুপক্ষ পুরুষবর ও লাঙ্গুলী দৈত্যদল, (ঞ) পারসী বয়েৎ —শ্বেত ও সোনালী চতুঃসীমা, (ট) বীণাবাদিনী —সখীসমাগমে, (ঠ) দৈত্যদানবের নৃত্য প্রাচীর-বাহিরে; —এবং বর্ণনার উপসংহার টেনেছেন (ড) প্রিয়-সমাগমের পরমোৎসাহে মহোৎসবের মত্ততায়। অতঃপর 'দিল্লীর চিত্রশালিকা' প্রবন্ধের সমাপ্তি এইরূপ:—

'এবং যবনিকা পতনের পর সমগ্র নাট্যখানি মনের মধ্যে যেরূপ দৃশ্যে

আলোকে রূপে গীতে সৌন্দর্যে শৃঙ্গারে বর্ণে অভিনয়ে ঘনাইয়া আসিয়া উজ্জ্বল হইয়া উঠে, এই চিত্রকলাও সেইরূপ আমাদের মনঃ-অন্তঃপুরে তাহার ভাবে ভঙ্গিতে বর্ণে লাবণ্যে মুখশ্রী ও গঠনপারিপাট্যের সমাবেশে একটি সুন্দর মায়ালোকমোহে রমণীয় হইয়া আসে। মনে হয়, যেন পুরাতন ভারতবর্ষের কোন্ কলাভবন-প্রদর্শনী হইতে বাহির হইয়া আসিলাম, যেখানে কালিদাসের কাব্য, কাদম্বরীর বর্ণনা, তাজমহলের স্থাপত্য, দিল্লীর অন্তঃপুরের প্রসাধন-বিলাস, কাশ্মীরী শাল, পারস্য গালিচা, ঢাকাই মসলিন, কটকী রূপার কাজ, দক্ষিণের চন্দনখোদাই শিল্প, এই সমস্ত একত্র সুরক্ষিত হইয়াছে এবং সকলগুলির মধ্য হইতে ভারতবর্ষের কারুকুশলা প্রতিভা বিকশিত হইয়া কোথায় একটি মনোহর ঐক্য সূচিত করিতেছে। এই ঐক্যসূত্রেই ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা চির-সজীব এবং ইহাতেই আমাদের পুরাতন কলাভবন এত চিত্তহারী।'

অবনীন্দ্রনাথ বলেন, —এই প্রবন্ধ প্রকাশের ফলেই, 'সাধারণের সঙ্গে আমাদের আর্টের পরিচয় বাংলায় সূত্রপাত এইভাবে হলো।' ঠাকুরবাড়ির বলেন্দ্রনাথকে উনবিংশ শতাব্দের শেষ দশকে আমরা ভারতশিল্পকলার একজন মহাপ্রতিভাধর প্রবক্তারূপে পাই —তাঁর নানা রচনায়। প্রথমদিকে, অবনীন্দ্রনাথ যে-সব বর্ণাঢ্য মোগলাই ছবি এঁকেছিলেন, আর ভবিষ্যতে নন্দলাল, সুরেন গাঙ্গুলী বা ওঁদের অনুকরণে আর কেউ কেউ যে-সব হিন্দু-পৌরাণিক ছবি প্রথম দিকে আঁকলেন, আমরা দেখি, তার মৌলিক মডেল-গুলি 'নিপুণ শিল্পী' বলেন্দ্রনাথের লেখার মধ্যেই সব রয়েছে। নন্দলালের 'বীণাবাদিনী' ছবির খ্যাতি জগৎজোড়া। তারও জড় দেখি এখানেই।

বলেন্দ্রনাথ বাঙ্গালী হিন্দুর সমাজে ও ধর্মে সত্য শিব সুন্দর যা আছে, সে-সব খুঁটিয়ে পর্যালোচনা ক'রে গেছেন। কাব্য ও কলাবিদ্যা, মানব-সমাজ ও গৃহস্থ-গৃহ, মানবের চিত্ত ও মানবের জীবন —নানা বিষয়ে আলোচনা করেছেন তিনি। এই বিচিত্র বিষয়ের মধ্যে যা দেখবার, যা বোঝবার, যা আস্বাদন বা উপভোগ করবার —সবই তিনি দেখেছেন আর দেখিয়েছেন। তিনি একচোখো বিশ্লেষকের মতন কেবল দোষ-দেখানো বা হীনতার আবিষ্কার ক'রেই কর্তব্য সারেননি। তাঁর প্রধান কাজ ছিল —সৌন্দর্য-আবিষ্কার। যে-সৌন্দর্য অপরের চোখে ধরা পড়তো

না, তিনি তা' বের ক'রে এনে দেখিয়ে দিতেন। এই আবিষ্কারের জন্যে যে যোগ আবশ্যক তা' তাঁর ছিল যথেষ্ট পরিমাণেই। 'একদেশদর্শিতা', 'দৃষ্টিবিভ্রম', 'দৃষ্টিবিকার' —এ-সব থেকে তিনি মুক্ত ছিলেন সম্পূর্ণভাবে। তাঁর সংযম ছিল প্রচুর। তিনি ভাবের রাজ্যে ভ্রমণ করতেন; কিন্তু ভাবের বাতাসে উড়ে বেড়াতেন না। ভাবের বিকারেও তিনি আত্মহারা হ'য়ে যাননি। বিদেশী শিক্ষামোহ তাঁকে পেয়ে বসেনি। তাঁর স্বদেশে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বদেশী সৌন্দর্যে অনুরাগ আর প্রীতি সে-যুগের মনীষীদের চমকে দিয়েছিল। বলেন্দ্রনাথ বাঙ্গালী হিন্দুগৃহস্থের অন্তঃপুরের বা সামাজিক অনুষ্ঠানের মৌলিক 'নূতন কথা' তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে শুনিয়ে গেছেন —শব্দের মালা সযত্নে গেঁথে গেঁথে।

এই স্বল্পায়ু, শক্তিশালী, মনীষী লেখকের 'গ্রন্থাবলী' প্রথম প্রকাশ করেন তাঁর জেঠতুতো ভাই ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯০৭ সালে, আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের সাহায্যে। ত্রিবেদী মহাশয় 'গ্রন্থাবলীর' ভূমিকায় লিখেছিলেন —'জোড়াসাঁকোর যে বৃহৎ অট্টালিকার দিকে নব্যতন্ত্রের বাঙালী সমাজ এতদিন ধরিয়া সময়োচিত নূতন ভাবের ও নূতন তন্ত্রের, এমন কি, নূতন ফ্যাশনের জন্য উন্মুখ হইয়া চাহিয়াছিল, —মনের কথা গোপন নাই বা করিলাম —সেখান হইতে যে এমন কথাগুলি বাহির হইবে তাহার জন্য ঠিক প্রস্তুত ছিলাম না। বৃদ্ধ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের গুরুগম্ভীর উপদেশে নব্যবঙ্গ কর্ণপাত করা উচিত মনে করে নাই; মনীষী রবীন্দ্রনাথ যে মঙ্গলশঙ্খ মুহুর্মুহু ধ্বনিত করিয়া পথভ্রান্ত স্বদেশীকে আপন ঘরের লক্ষ্মীমন্দিরের কল্যাণপীঠের অভিমুখে প্রত্যাবর্তনের জন্য আহ্বান করিতেছেন, অধিক দিনের কথা নহে, সে শঙ্খঘোষও তখনও শুনা যায় নাই। কাজেই বাঙালীর অন্তঃপুরে, বাঙালীর গৃহস্থালীতে, সামাজিক প্রথায় ও দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্মে যাহা সত্য আছে, যাহা সুন্দর আছে যাহা শিব আছে, তাহা সহসা আবিষ্কৃত করিয়া বলেন্দ্রনাথ অন্ধকে দৃষ্টিদানের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।'

গত শতাব্দীর শেষ দশকের দিকে বলেন্দ্রনাথ প্রাচ্যকলা-সমাজের নবজাগরণের উন্মেষকালে যেন ভোরের কোকিলের মতো তান ধরেছিলেন। তাঁর সে সুরলহরী আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হয়েছিল। পরে, গোপনে

গোপনে সেই ভাবনারাশি ভবিষ্যৎ ভারতশিল্পীদের ভাবনাতেও একাত্ম হয়ে থাকবে।

১২৯৫ (১৮৮৮) সাল থেকে ১৩০৬ (১৮৯৯) সালে অকালে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর উৎকৃষ্ট প্রবন্ধমালার মধ্যে শিল্পকলাসম্পৃক্ত এই রচনাগুলি প্রকাশিত হয়েছিল 'ভারতী ও বালক', 'সাধনা', 'ভারতী ও প্রদীপ' পত্রিকায়, ১৮৮৮ 'গোধুলি ও সন্ধ্যা', ১৮৮৯ 'মুকুন্দরাম চক্রবর্তী', 'নগ্নতার সৌন্দর্য', 'বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস', 'ভারতচন্দ্র রায়', ১৮৯০ 'দুষ্মন্ত', 'যশোদা', 'রাধা', 'শরৎ ও বসন্ত', 'সূর্যাস্ত ও চন্দ্রোদয়', ১৮৯১ 'ঋতুসংহার', 'জানালার ধারে', 'দেওয়ালের ছবি', 'বুদ্ধদেব', 'মালবিকাগ্নিমিত্র', ১৮৯২ 'বাঙ্গালা সাহিত্যের দেবতা', 'ধর্মজঙ্গল', 'কালিদাসের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা', ১৮৯৩ 'উড়িষ্যার দেবক্ষেত্র', 'বারাণসী', 'কণারক', 'খণ্ডগিরি', 'প্রাচীন উড়িষ্যা', 'উত্তরচরিত', 'মৃচ্ছকটিক', 'জয়দেব', 'পশুপ্রীতি', 'রবিবর্মা', 'হিন্দু দেবদেবীর চিত্র', ১৮৯৪ 'কাব্যে প্রকৃতি', ১৮৯৫ 'গুজরাটে গরবা', ১৮৯৮ 'দিল্লীর চিত্রশালিকা', 'প্রাচ্য প্রসাধনকলা', 'নিমন্ত্রণ সভা', 'শুভ-উৎসব', 'গৃহকোণ', ১৮৯৯ 'রবিবর্মা' (অসমাপ্ত), 'শিবসুন্দর'। —বলেন্দ্রনাথের এই সকল রচনার আলোকধারা সেকালে পান করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ আর বিদগ্ধ বিদ্বজ্জনমণ্ডলী। সমগ্র বাঙ্গালা দেশের সঙ্গে অবনীবাবুও বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধ থেকে চিত্র-আস্বাদন ও চিত্র-রচনার নতুন দিগন্তের সন্ধান পেয়েছিলেন, —সে-কথা নিজেই স্বীকার করে গেছেন। এমন-কি, 'কলাভবন' নামটিরও পুনঃপুনঃ ব্যবহার প্রথম দেখা গেল বলেন্দ্রনাথের রচনায়।

অবনীবাবুর শিষ্যবর্গ তাঁদের পৌরাণিক চিত্রকর্মের উপযোগিতা বিশ্লেষণ ক'রে, তার সুস্পষ্ট রূপ-কল্পনার পূর্বে, এই সব রচনা থেকে পাঠ গ্রহণ করেছেন —সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। তবে সে পাঠ-গ্রহণ সোজাসুজিই হোক্, সিস্টার নিবেদিতার মাধ্যমেই হোক্ বা গুরু অবনীন্দ্রনাথের মাধ্যমেই হোক্। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখানো যেতে পারে —বলেন্দ্রনাথের 'হিন্দু দেবদেবীর চিত্র' প্রবন্ধটি। হিন্দুর আদর্শ দেবদেবীর চিত্র সেকালে যা পাওয়া যেত তার সমালোচনা ক'রে, যা হওয়া উচিত সেই রূপের গড়ন আর দর্শনতত্ত্ব বলেন্দ্রনাথ তাঁর

কাব্যধর্মী ভাষায় ব্যক্ত করেছিলেন এইভাবে ঃ—

দেবতাপ্রিয় ভারতবর্ষীয় কল্পনা বহিঃপ্রকৃতি ও মানবচরিত্রে যেখানে যে সৌন্দর্যটুকু অনুভব করিয়াছে, তাহাতে একটি নির্দিষ্ট গঠন দিয়া নিঃশব্দে আপন দেবতা গড়িয়া তুলিয়াছে। সেই জন্য ভারতবর্ষের পৌরাণিক দেবভূমিতে আসিয়া হৃদয় যেমন পরিতৃপ্ত হয়, এমন আর কিছুতে নহে। গ্রীসীয় প্রস্তরমূর্তির অতুলনীয় দেহসৌন্দর্য হয় ত আমাদের দেবলোকে সর্বত্র তেমন সুলভ নহে, কিন্তু এই সকল দেবমূর্তিতে আমাদের অন্তরের বহু গভীর আকাঙ্ক্ষা মূর্তিমান্ হইয়া উঠিয়াছে এবং ভারতবর্ষের অনাবিল অন্তরতম অন্তর সুন্দর অভিব্যক্ত হইয়াছে।

আমাদের সুখ-দুঃখ, বেদনা-আশা, সৌন্দর্য-প্রেম, মোহ-আকাঙ্ক্ষা, সকলই এই দেবলোকে। যাহা কিছু মর্ত্য —নিতান্তই ঐহিক —তাহাও আমরা মর্তালোকে সাহস করিয়া রাখিতে পারি নাই; দেবতাকে দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছি। তাই যোগী শিবকে পার্বতীর সহিত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া এই মর্ত্য গার্হস্থ্যকে কৈলাসের অমরলোকে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। কন্দর্পকে কেবলমাত্র সামান্য নরনারীর হৃদয়বন্ধন না করিয়া হরপার্বতীর চিরবন্ধনরূপে চিত্রিত করা হইয়াছে। যমুনাতীরের তমালছায়াসুপ্ত সুন্দর আহীরপল্লীটিকে মানবের না রাখিয়া দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এখানে যুদ্ধবিগ্রহ, দ্বন্দ্ব-কোলাহল, মান-অভিমান, প্রণয়-বিরহ যেমন যাহা ঘটে, দেবলোকে সকলই বজায় আছে; কেবল, এখানে মৃত্যু আছে, সেখানে মৃত্যু নাই। মৃত্যুও সেখানে অমর।

কিন্তু এই মৃত্যুই মর্ত্যের প্রধান সৌন্দর্য —পৃথিবীর সকল সুখ-দুঃখ, বেদনা-আনন্দের চরম পরিণাম। এই যে সকলি আছে অথচ সর্বদাই হারাইবার ভয়, এই যে নশ্বরতা, ইহাতেই ইহলোকের সকল সুখ-দুঃখ নিহিত। দেবলোকে যদি এই মৃত্যুই না রহিল, তবে দেবতাদের সুখ-দুঃখের সহিত আমাদের সুখ-দুঃখের সম্বন্ধ কিসের? ভারতবর্ষীয় হৃদয়, সুতরাং অমরধামেও মৃত্যুর ছায়া রচনা না করিয়া থাকিতে পারিল না। সতীর দেহত্যাগে ও রতিপতির অনঙ্গীকরণে এই মৃত্যুরই অনুরূপ

চিত্র সূচিত হইয়াছে।

এইরূপে সমস্ত মর্ত্য গুণাবলী দেবতায় আরোপিত হইয়া দেবলোকেই আমাদের অন্তর বিকাশ লাভ করিয়াছে। মানবের অতি তুচ্ছ সুখ-দুঃখ পর্যন্ত দেবতার। এবং বৃহৎ দেবলোক এই মর্ত্যধামেরই একখানি সুন্দর চিত্র। এই গঙ্গাই সেখানে মন্দাকিনীরূপে চিরপ্রবাহিত; এবং এখানকার মলয়ানিলস্নিগ্ধ চূতমুকুলিত বসন্ত মন্মথের সখারূপে নিত্য বিকশিত। অপ্সরাগণ সেখানে জলক্রীড়া করে এবং চারু-অঙ্গসন্নদ্ধ যৌবন চতুর্দিকে চিত্ত উদ্ভ্রান্ত করিয়া তোলে। মানবহৃদয় স্পর্শ করে না, দেবরাজ্যে এমন কিছুই নাই।

সেই জন্যই ভারতবর্ষের সাধারণ্যে দেবদেবীর চিত্র যেরূপ সমাদৃত, এমন আর কিছুই নহে। এবং চিত্রের দ্বারা আমাদের অন্তর স্পর্শ করিতে হইলে এই সকল চিত্রই সর্বাপেক্ষা উপযোগী। শিব, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কৃষ্ণের বাল্য যৌবন, বিবিধ লীলা, দেবলোকের নানাবিধ কাহিনী আমাদের সর্বসাধারণের হৃদয়ে বহু যুগ ধরিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। এবং মনে মনে আমরা এই সকল দৈব সৌন্দর্যের একটি অসম্পূর্ণ চিত্র গড়িয়া রাখিয়াছি। চিত্রকরের শিল্পনৈপুণ্যে এই অসম্পূর্ণ অপরিস্ফুট ভাব সৌন্দর্যে ও জীবনে পূর্ণ হইয়া উঠে।

দুঃখের বিষয়, বঙ্গদেশে ধর্মচিত্রাবলী এ পর্যন্ত যাহা বাহির হইয়াছে, তাহাতে হৃদয়ে সৌন্দর্য উন্মেষিত ত হয়ই না, বরঞ্চ অনেক সময় প্রাচীন সংস্কৃত আদর্শের সৌন্দর্যটুকু ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকে। দেবতার প্রাচীন আদর্শ আমাদের মনেও যে সর্বত্র অক্ষুণ্ণ আছে, তাহা নহে। সেনাপতি কার্তিকেয় বঙ্গনারীর সন্তানকামনার দেবতা হইয়া অবধি ধীরে ধীরে বর্ম ছাড়িয়া ধুতি চাদর ধরিয়াছেন এবং ময়ূরে চড়িয়া যখন বাহির হন, তখন হিন্দুস্থানী কাঠিন্য সে দেহে কিছুমাত্র প্রকাশ পায় না। বাঙ্গলার চিত্রকর যদি এই অধুনাতন বঙ্গীয় ভাবে কিঞ্চিৎ অধিকমাত্রায় বিচলিত হয়েন, সে জন্য তাঁহাকে তত দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু কার্তিকেয়কে বাঙ্গালী করিয়া আঁকিলেও তাঁহার গঠন ও মুখশ্রীতে সৌন্দর্যের বিশেষ বিকাশ হওয়া আবশ্যক। কারণ, সংস্কৃত আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইলেও আমাদের মনে কার্তিকেয়ের রূপের প্রতিষ্ঠা অটল।

কিন্তু বাঙ্গলার চিত্রশিল্পে রূপ যে কোথায় প্রচ্ছন্ন থাকে, তাহা দেবতারাও জানেন না। সৌন্দর্য উন্মেষিত করিতে পারিলে স্থলবিশেষে প্রচলিত আদর্শের অনুসরণ করিয়াও চিত্রকর আপন গৌরব রক্ষা করিতে পারিতেন। তাহাতেও ত বিশেষ একটা ভাবের বিকাশ থাকিত। এবং সেই ভাবের গুণে সংস্কৃত আদর্শ হইতে অল্পবিস্তর বিচ্যুতি কাহারও নিকট তেমন মারাত্মক বলিয়া বোধ হইত না। চিত্রকর যে ভাবেই চিত্রিত করুন, ভাবটি চিত্রে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে হইবে; এবং চিত্র যেন কোথাও অসঙ্গত না হয়।

কিন্তু সঙ্গতি বঙ্গীয় চিত্রাবলীতে কদাচ লক্ষিত হয়। মানবদেহের বর্ণ মানুষের মত না হওয়া, গঠনে প্রকৃতির সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম, এবং মুখশ্রীতে সকল ভাবের আত্যন্তিক অভাব, ইহাই এখন আমাদের চিত্রশালার গৌরব। গৌরাঙ্গ পীতবর্ণ; কারণ, কাব্যে গৌর অঙ্গের সহিত তপ্তকাঞ্চনের সাদৃশ্য উল্লিখিত হইয়াছে এবং তপ্তকাঞ্চনে হরিদ্রার কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। রাধার প্রেমাস্পদ শ্রীকৃষ্ণ যেন যুগ যুগ ধরিয়া সর্বাঙ্গে প্রাণপণে নীল পেন্সিল ঘষিয়াছেন; এবং এই বহু পেন্সিল ঘর্ষণের ফলে কেবলমাত্র শ্রীমতী রাধিকার হৃদয় নহে, কিন্তু বাঙ্গলার রাধিকাগঞ্জন ধর্মচিত্রকরদিগেরও হৃদয় মন অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। রণোন্মাদিনী শ্যামা এই অঙ্গারধূমোদ্গারী কলিযুগে মূর্তিমতী রাণীগঞ্জগঞ্জিনী অবিশ্রাম আলকাতরা লেপন ভিন্ন সৃষ্টিকর্তা বিধাতাও মানবশরীরে সে বর্ণের আভাস ব্যক্ত করিতে অক্ষম।

কিন্তু এই অদ্ভুত বর্ণসঙ্গম চিত্রকরের দোষে ঘটিয়াছে অথবা সংস্কৃত আদর্শের দোষে? সংস্কৃত সাহিত্যে শ্যামা রাত্রির ন্যায় কৃষ্ণবর্ণা; এবং শ্রীকৃষ্ণেরও বর্ণ মেঘের ন্যায়। সুতরাং মানবদেহে এই রাত্রি অথবা মেঘের বর্ণ ফুটাইতে হইলে চিত্রকর রাণীগঞ্জ, নীল পেন্সিল প্রভৃতির শরণাপন্ন না হইয়া কি করেন? কিন্তু, সাহিত্যরসজ্ঞ মাত্রেই জানেন, উপমা সাদৃশ্যসূচক মাত্র। চন্দ্রবদন বলিলে কাহারও মনে একটি কলঙ্করেখালাঞ্ছিত দীপ্ত গোলাকার মুখমণ্ডল উদিত হয় না—মনে একটি প্রস্ফুটিত সৌন্দর্যের ভাব উদ্রেক করে মাত্র। শ্যামার বর্ণ কালরাত্রির ন্যায় বলিলে সত্য সত্যই শ্যামা যে রাণীগঞ্জসম্ভবা, এমন বুঝায় না—কেবল একটি ঘোর

কৃষ্ণবর্ণ ভীষণগম্ভীর সৌন্দর্যের আভাস দেওয়া হয়। কৃষ্ণেরও বর্ণ সেইরূপ বাস্তবিকই মেঘ নহে। এবং নবদূর্বাদলশ্যাম রামচন্দ্রের বর্ণও নবোদ্‌গত দূর্বাহরিৎ নহে —নবদূর্বার স্নিগ্ধশ্যাম লাবণ্যবিশিষ্ট বটে। মানবের বর্ণ কখনও মেঘ অথবা রাত্রি অথবা দূর্বার মত হয়?

বর্ণও বস্তুভেদে বিভিন্ন। আকাশের নীল বর্ণ সমুদ্রের নীল নহে এবং নীলকণ্ঠের কণ্ঠ এতদুভয় হইতেই স্বতন্ত্র। শ্বেতকায় মানব শ্বেতকায় গোবৎসের সহিত একবর্ণ নহে; এবং দুগ্ধ, তুষার, ধবল বস্ত্র প্রভৃতি যাবতীয় শ্বেত পদার্থ মানবের শ্বেতবর্ণের চিত্র নহে। আমাদের দেশের গৌরবর্ণে হরিদ্রার ঈষৎ আভাস পাওয়া যায়, তাই বলিয়া তাহা হরিদ্রারঞ্জিতবৎ নহে। শ্যামবর্ণও সেইরূপ যতই শ্যাম হউক্ না কেন, মসীর মতও নয়, অঙ্গারসদৃশও বলা যায় না। সাহিত্যে এরূপ সাদৃশ্যগত অতিশয়োক্তি তাদৃশ দোষের নহে; কারণ, সাহিত্য পাঠকের মনে এই সকল সাদৃশ্যের দ্বারা বস্তুর যথার্থ চিত্রগ্রহণের বিঘ্ন উৎপাদন করে না। কিন্তু চিত্রে এ সকল আতিশয্য সর্বথা পরিহর্তব্য —চিত্র বস্তুকেই যথাযথ চিত্রিত করে।

ইহাও কে না জানে যে, নীল অথবা হরিদ্বর্ণ মানব আমাদের কাহারও মনে কোনরূপ সৌন্দর্য উদ্রেক করিতে পারে না? কৃষ্ণ যদি আকাশের মত নীল হইতেন, তাহা হইলে কি সমস্ত গোপীকুল তাঁহার জন্য কুলমানে জলাঞ্জলি দিতে বসিত? না, গৌরাঙ্গী রাধিকা অহর্নিশি গুরুজন ও ননন্দার বাক্যবাণ সহ্য করিয়াও ঐ শ্রীপাদপদ্মে সমস্ত শরীর মন আত্মা সমর্পণ করিতেন? নীল মানববর্ণের কোনও আকর্ষণ নাই। কৃষ্ণবর্ণে একটি সুকুমার উজ্জ্বল লাবণ্য দেখা যায়, তাহাতে একটি প্রশান্ত কমনীয়তা আছে। সেই জন্যই মহাভারতকার সাহস করিয়া কৃষ্ণা দ্রৌপদীকে স্বয়ম্বরসভায় উপস্থিত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকে কবি নারী-সৌন্দর্যের মধ্যস্থলে প্রতিষ্ঠিত করিয়াও অম্লান রাখিয়াছেন।

কিন্তু এ সকল ত গেল প্রেমসিক্ত সৌন্দর্যের কথা। যখন করাল কালিকার ভীষণ ভাব ব্যক্ত করিতে হইবে, তখন একটু অস্বাভাবিক কালো না করিলে চলিবে কেন? সে উলঙ্গিনী উন্মাদিনী মূর্তি দু'-এক পোঁছ আলকাতরা নহিলে ত খুলে না। কিন্তু কালীর ভীষণতা ব্যক্ত

করিতে হইলে এই অমানুষিক মিথ্যাবর্ণের আশ্রয় লইতে হইবে, এ কথা নূতন। ভীষণতা তাঁহার কিসে ব্যক্ত হয় নাই? নারীহৃদয় কঠিন হইয়া গিয়া শুধু শোণিতলালসায় উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে, এ দৃশ্য ভীষণ নহে? যে বক্ষে সন্তান স্নেহ পান করিয়া পরিপুষ্ট হইত সে বক্ষ জুড়িয়া সহস্র নৃমুণ্ড হইতে তপ্ত রক্ত ঝরিতেছে —ইহাতে কি ভীষণতার অভাব আছে? সে কৃপাণহস্তা উলঙ্গিনী মূর্তিই কি যথেষ্ট ভীষণ নহে? যে চিত্রকর শ্যামার দৈহিক গঠনে সৌন্দর্য ক্ষুণ্ণ করিয়া, জিহ্বাকে হস্তাধিক বিস্তৃত করিয়া দিয়া এবং সর্বাঙ্গে অদ্ভুত রং লেপন করিয়া তাঁহার ভীষণতা ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করেন, সে চিত্রকরের প্রতিভার প্রশংসা করা যায় না। —সাহিত্যের যথার্থ মর্মগ্রহণ করিতে না পারিয়া এবং নিরক্ষর কুম্ভকারগণের পদানুসরণ করিয়া আমাদের চিত্রকরেরা এই ত্রুটিগুলি ঘটাইয়াছেন।

চিত্রকরের প্রথম কর্তব্যই এই যে, এই সকল দেবদেবী সৃষ্টির মূলে যে সৌন্দর্য-কল্পনা নিহিত আছে, সেইটিকে আয়ত্ত করা। নহিলে, অসংখ্য সরল এবং বক্র রেখাপরম্পরার সমাবেশেও চিত্র কখনও উজ্জ্বল হইয়া উঠে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমাদের চিত্রকরদিগের হস্তে মহাদেবের যে সকল দুর্দশা ঘটিয়াছে, তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে।

মহাদেব আমাদের পুরুষসৌন্দর্যের চরম আদর্শ। কেবলি দৈহিক গঠনে নহে, অন্তরের ভাবে ও বাহিরের চালচলনেও তিনি পরম পুরুষ। একদিকে বৈরাগ্য, অন্য দিকে গার্হস্থ্য; এবং সেই অবিচলিত চরিত্রে উভয়েরই সমান প্রতিষ্ঠা। তাঁহার গৃহিণী অন্নপূর্ণা; অনুচর নন্দী-ভৃঙ্গী; তিনি স্বয়ং ভোলানাথ শিব সদানন্দ। নিজের জন্য তাঁহার কিছুই নাই। সর্বস্ব অন্নপূর্ণার হস্তে সমর্পণ করিয়া দিয়া শিব ভিখারী।

এই যোগি-গৃহস্থ আমাদের শ্রেষ্ঠ পুরুষ। গৃহে গৃহে শুভ্রবসনা কুমারীরা এই আদর্শের অনুরূপ পতিকামনায় নিত্য শিবপূজা করে। ঐ রূপ, ঐ অনিন্দিত উদার স্বভাব, ঐ অতুল প্রতাপ এবং ক্ষমাশীল ধৈর্য নারীহৃদয়ের সমস্ত পূর্ণ করিয়া আছে।

কিন্তু চিত্রপটে পেশীবিহীন গঠন, বাবু-মুখশ্রী, তাম্বুলরাগরক্ত অধর এবং নিষ্প্রভ ভাব মন্থন করিয়া এ শিবত্বের কিছুই পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ

ভাব সম্বন্ধে আমাদের চিত্রকরেরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। নহিলে, মদনভস্মের চিত্রে চিত্রকর মহাদেবের ললাটদেশ হইতে একটি তাম্রলোহিত ঝাঁটা বাহির করিয়া দিবেন কেন? যে দীপ্ত রোষানলে মদন ভস্ম হইয়াছিল, ইহাতে তাহা প্রকাশ পায় নাই; প্রকাশ পাইয়াছে কেবল উক্ত স্থূলকায় ঝাঁটা—যাহার অগ্রভাগে অগ্নি সংযুক্ত হইয়া মদনকে দগ্ধ করিয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

শুধু শিব নহে, দেবতাদের অনেকেই এইরূপ চিত্রকরের হস্তে পড়িয়া বহুবিধ বিকৃতি লাভ করিয়াছেন। দেবীগুলির উল্লেখ না করাই ভালো—আমাদের চিত্রশালায় এমন একখানি চিত্র নাই, যাহা দেখিয়া দেবীকে দেবকুলোদ্ভবা বলিয়া মনে হয়। বোধ করি চিত্রকরেরা যদি কিছুকাল স্ব স্ব মানসী সৌন্দর্যকে মনান্তরিত করিয়া দিয়া মানবী মডেল দেখিয়া চিত্র আঁকিতে শুরু করেন, তাহা হইলেও দেবতারা ইহলোকে কতকটা প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারেন।

এবং সেই সঙ্গে দেশের সর্বসাধারণেরও কিছু উপকার হয়। দেবতায় ভক্তি স্থাপন করিতে গিয়া পৃথিবীর যাবতীয় কুৎসিত বিকৃতিতে হৃদয় প্রতিষ্ঠিত হয় না। অন্তরে সৌন্দর্যের একটি অক্ষুন্ন আদর্শ জাগ্রত হইয়া উঠে এবং এই সৌন্দর্যজ্ঞান সংসারের ক্ষুদ্র বৃহৎ যাবতীয় অনুষ্ঠানে প্রযুক্ত হইয়া আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে সুন্দরতর করিয়া তোলে।

চিত্রকরের হস্তে এই এক মহা সংস্কার নির্ভর করিতেছে। সাহিত্য-কারের দায়িত্ব অপেক্ষা তাঁহার দায়িত্ব কম নহে। সাহিত্য বরঞ্চ অনেকের হৃদয়ে প্রবেশ করিতে সময় লাগে। চিত্র আপন নির্দিষ্ট গঠনপ্রভাবে সহজেই অন্তরে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সেই জন্যই বিশেষতঃ চিত্রকরেরা যখন সাহিত্যের সুন্দর আদর্শকে নষ্ট করিতে বসেন, তখন তাঁহারা দেশের যে কতদূর ক্ষতি করেন, তাহা বলা যায় না। একটি রাজনৈতিক অধিকার লাভ অপেক্ষা জাতির হৃদয়ে একটি সুন্দর আদর্শের প্রতিষ্ঠা করা গুরুতর কার্য। এই গুরুতর দায়িত্ব উপলব্ধি করিয়া আমাদের প্রাচীন সৌন্দর্যসমূহকে যে চিত্রকর অক্ষুণ্ণ বিকশিত করিয়া তুলিতে পারেন, তিনি দেশের একজন মহাত্মা।' —(সাধনা, মাঘ, ১৩০০)।

ঐ একই সময়ে বলেন্দ্রনাথ আরও বলেছিলেন: 'পৌরাণিকী

কল্পনাকে তুলিকার স্পর্শে মূর্তিমতী করিয়া তুলিতে পারেন, আমাদের মধ্যে এইরূপ এক প্রতিভার আবশ্যক হইয়াছে। ভাষায় যাহা কতকটা বর্ণনায়, কতকটা আভাসে, কতকটা লেখকের রচনায়, কতকটা পাঠকের মনে মনে গঠিত হইয়া পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, সেই সুন্দর ভাবগুলিকে সমগ্রভাবে —যে অংশ ব্যক্ত ও যে অংশ অস্ফুট, মিলাইয়া – রেখায় রেখায় অনুবাদ করিতে হইবে। এই নব চিত্রাঙ্কনী প্রতিভার ইহাই কার্য।' (—'রবিবর্মা', সাধনা, আশ্বিন-কার্ত্তিক, ১৩০০)।

বলেন্দ্রনাথের এই সকল উক্তি যেন নব্যভারত-শিল্প-জগতে নন্দলালের পুণ্য আবির্ভাবের শুভ শঙ্খধ্বনি। আমরা দেখছি, নন্দলালের প্রতিভা তাঁর সমগ্র সত্তার ধ্যান-ধারণা নিয়ে, বালক-কাল থেকেই এই সুমহান কর্মে নিমগ্ন হয়েছিল। অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়েও, নন্দলাল চিত্ররচনায় যে-পথ ধরলেন, সে হলো হিন্দু দেবদেবীর চিত্র-রচনার পথ। ভারতীয় ঐতিহ্যের ব্যাস-বাল্মীকি কালিদাস-ভবভূতির কাব্য-মহাকাব্য অবলম্বনে ভারতবর্ষের সনাতন ধর্ম-ইতিহাসাশ্রিত চিত্র-রচনায় ভারতশৈলীর নিজস্ব পথ। এই পদ্ধতি ধ'রে, ঘরে ফেরার মুখে ভারতবর্ষের মর্ম-প্রকাশক এই ধারা একতম আলোকবর্তিকা। 'সতীর দেহত্যাগ', 'কালী', 'তারা', 'মহাদেব', 'অন্নপূর্ণা ও শিব', 'রাধা', 'পার্থ-সারথি', 'উমার তপস্যা' —এই রকম সব ছবি এঁকে নন্দলাল অচিরকালের মধ্যেই দেশের লোকের মনোহরণ ক'রে ফেললেন। বিদেশীরাও বিহ্বল হয়ে গেলেন তাঁর এই সব চিত্রকর্ম দেখে। এই রকম এক প্রতিভার আবির্ভাবের জন্যে এতদিন চাতকের মতো উন্মুখ থেকে সমগ্র দেশের বিশুষ্ক চিত্তভূমি সহসা যেন অঝোর বর্ষণে পরিতৃপ্ত হয়ে গেল। এমন-কি, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ নন্দলালের এই গুণেই মুগ্ধ হয়ে তাঁর 'চয়নিকা' চিত্রভূষিত করবার জন্যে তাঁকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। উপরন্তু, ১৩২১ সালের (১৯১৪) ১২ই বৈশাখ শান্তিনিকেতনে শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরম কল্যাণীয় শ্রীমান নন্দলাল বসুকে সর্বপ্রথম আশীর্বাদ করেছিলেন তাঁর এই গুণের খাতিরেই। বিশেষতঃ নন্দলালের আঁকা শৈবচিত্রগুলি দেখেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর তুলিকাকে যেখান থেকে গঙ্গা নেমে আসছে সেই শিব-জটার সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। শুধু তাই নয়। তাঁর আদর্শ বিদ্যালয়ের শিল্প-শিক্ষাগুরু স্বরূপে বেছে

যেছে রবীন্দ্রনাথ সেই ব্যক্তিটিকেই শেষ পর্যন্ত বরণ করলেন যিনি 'হিন্দু দেবদেবীর চিত্র' এঁকেই তাঁর হাত পোক্ত করেছিলেন।

তুলনা ক'রে পড়লে দেখা যাবে, নন্দলালের এই সব ছবির আদল বলেন্দ্রনাথের ঐসব প্রবন্ধের সূতিকাগারে যেন সযত্নে লালিত হয়েছিল। তাঁর পৌরাণিক চিত্রচিন্তার আদর্শ স্থাপনে প্রভূত রসদ জুগিয়েছিল প্রবক্তা বলেন্দ্রনাথের রচনাবলী। সিস্টার নিবেদিতা, ডক্টর কুমারস্বামী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় নন্দলালের এই পথ কুসুমাস্তীর্ণ করেছিলেন। উত্তরভারত, দক্ষিণভারতের হিন্দু দেবদেবী, অজন্তা-গুহার বৌদ্ধ চিত্রাবলী তাঁর চলার পথে অবিস্মরণীয় পাথেয় জুগিয়েছে সন্দেহ নাই; কিন্তু, ব্রাহ্মমুহূর্তে নিদ্রাবেশ অপসারণের উদ্দেশ্যে কুহুতানের যদি কোনও বাস্তব মূল্য থাকে, সে প্রাপ্য অরুণ আলোর সেই তরুণ প্রবক্তা বলেন্দ্রনাথেরই। 'চাঁদের জ্যোৎস্নায়' 'স্নেহসুধা' সিঞ্চন করেছিলেন তিনি নব্যভারত-চিত্রকলা-লক্ষ্মী ভূমিষ্ঠ হবার আগেই।

॥ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিল্পচর্চার সূত্রপাত (১৮৭১-১৯০৫) ॥

অবনীন্দ্রনাথের ছবি-আঁকার হাতেখড়ি হয় নর্মাল-স্কুলে। ড্রয়িং-মাস্টার ছিলেন সাতকড়িবাবু; সতীর্থ —ভুলু। ভুলুর কাছেই কুঁজো আর গ্লাস আঁকতে শিখলেন প্রথম। অকালে স্কুল ছেড়ে থাকতেন একলা। একলা দেখতেন, একলা শুনতেন আর চিন্তা করতেন আপন মনে। ছবি দেখতেন London News-এর। বাবা গুণেন্দ্রনাথের শখ ছিল ছবি আঁকার। কাকা জ্যোতিরিন্দ্রনাথও ছবি আঁকতেন। সরকারী আর্টস্কুলেরও প্রথম ছাত্র ছিলেন ওঁরা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আঁকতেন পোর্ট্রেট্। ছোট-পিসিমা কুমুদিনীদেবীর ঘরে দিশী অয়েল-পেন্টিং ছিল —শ্রীকৃষ্ণের পায়েস-ভক্ষণ, শকুন্তলা, মদনভস্ম, সরোজিনী নাটক, কাদম্বরীর ছবির। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সরোজিনী নাটক থেকে পদ্মিনীর অগ্নি-প্রবেশের ছবি আর্ট-স্টুডিয়ো থেকে লিথোগ্রাফ্-প্রিন্ট্ হয়ে বেরিয়েছিল। ঘরে ঘরে সেই ছবি থাকতো দেবদেবীর পটের সঙ্গে। এঁকেছিলেন আর্টস্কুলের শিক্ষক অন্নদাপ্রসাদ বাক্‌চী আর দেখতেন কৃষ্ণনগরের ছোট বড়ো নানা পুতুল। সেই ছোট-পিসিমার ঘরে বসেই প্রথম ছবি দেখতে আর ভাবতে শিখলেন।

তাঁর মনকে হরণ ক'রে নিত একটা এঁদো-ঘরে রাখা কর্তাদের আমলের পুরাতন যত সব আসবাব-পত্র। সেটা এঁদো-ঘর তো নয়, যেন তাঁর 'পরীস্থান'। ছেলেবেলায় মিস্ত্রী হবারও চেষ্টা করেছিলেন।

খেয়াল হলো, কাঠবেড়ালির চলা, খরগোশের লাফ দেখবেন! —এ-সব দেখেওছিলেন অনেক ঝুঁকি নিয়ে —অসীম উৎসাহে। কোন্নগরের বাগান-বাড়িতে গিয়ে কুটির আঁকতে শিখলেন নিজের চোখে দেখে; দাদাদের কাছে শেখা বিলিতী ড্রইং-বুকের নকল দেখে দেখে আঁকায় মন ভরলো না।

বাড়িতে ভিস্তিখানায় রাখা ছিল টেবিলের ওপর বিসুবিয়সের ছবি, দাউ দাউ ক'রে আগুন উঠছে পাহাড়ের মুখ দিয়ে। তামাক-সাজাবার ঘর, আগুনের ছবি থাকতে হবে সেখানে; পুরাতন ভালো অয়েল-

পেন্টিং। আলপনায় পদ্ম আঁকা দেখেছিলেন হোলির নাচের আস্তরণে। ঠাকুরঘরে মহিম-কথকের পুরাণ পাঠ হতো। পুঁথির এক-একটি পাতা পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক-একটি ছবি যেন ভেসে উঠতো চোখের সামনে। সে-কথকতার ছবি এঁকেছিলেন অবনীবাবু।

তখন ইণ্ডিয়ান আর্ট বলে কিছু ছিল না। বিলিতী আর্টের কদর সবখানে। টমসনের দোকানে তৈরী বিলিতী ফোয়ারা, মানুষ-প্রমাণ ক্রীত-দাসীর ধাতুমূর্তি —সেকালের লোকের মন ভোলাবার পক্ষে ছিল যথেষ্ট। বাবামশায় একদা বলেছিলেন, —'অবন ইণ্ডিয়া দেখবে, জানবে' তা হয়েছিল। বাল্য ও যৌবনের সঞ্চয় —তার স্বাদ ছবির পর ছবিতে ফুটে উঠেছিল অবনীন্দ্রনাথের। ১৮৮৮ সালে অবনীন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। অন্দরমহলের প্রসাধন দেখে এঁকেছিলেন ছবি —'কনে সাজানো'। প্লেগে কন্যার মৃত্যু হলো। সুখের স্বপ্ন-ভাঙানো দাহ আছে 'শাহজাহানের মৃত্যুশয্যা' ছবিতে। বাল্যে পুতুলখেলা-বয়সের সঞ্চয় সব ধ'রে দিয়েছেন শেষ বয়সের যাত্রাগানে, রূপকথা-রচনায় আর টুকিটাকি ইঁট-কাঠ কুড়িয়ে পুতুল গড়ায়। সঞ্চয়ী মন তাঁর ফেলেনি কিছুই। কয়লাহাটার এক দিদিমার কাছ থেকে স্ত্রী-আচার সম্পর্কে নোট নিয়েছিলেন অনেক। গ্রাম্য প্রবাদ ছড়া সংগ্রহে বাড়ির 'বুড়ি দাসীটি'কেও ছাড়েননি তিনি রবিকাকার নির্দেশ মতো।

বুড়ী ভুবনবাঈ শোনাতো সখী-সংবাদ, মাথুর। কৃষ্ণলীলার ছবিতে ফুটে উঠেছে সেই বস্তু। ইহুদী আতরওয়ালা গেব্রিয়েল সাহেবের ঢিলে আচকান, হাতকাটা আস্তিন, সরু সরু একসার বোতাম ঝিক্‌ঝিক্ করছে; ঔরঙ্গজেবের ছবিতে আঁকা হয়েছে সে-সব।

দক্ষিণের বারান্দার বৈঠকে বসতেন মতিবাবু, অক্ষয়বাবু, ঈশ্বরবাবু, নবীনবাবু আর বুড়ো মুখুজ্যে মশায়। তিনকালের তিন চারটি বুড়োকে নিয়ে ওঁরা বৈঠক জমালেন তিন ভাই —গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ আর অবনীন্দ্রনাথ।

ইটালিয়ান আর্টিস্ট গিলার্ডি সাহেব কিশোর অবনীন্দ্রনাথকে প্যাস্টেল-ড্রইং আর অয়েল-পেন্টিং শিখিয়েছিলেন। বাবা আর জ্যোতিকাকা আর্ট-স্কুলে ভরতি হয়েছিলেন একসঙ্গে। দাদা গগনেন্দ্রনাথ সেন্ট্ জেভিয়ার্সে ছবি-

আঁকা শিখতেন রীতিমতো। ছবি এঁকে পুরস্কারও পেয়েছিলেন তিনি। সত্যদাদা বাড়িতে তেলরঙের ছবি আঁকতেন হরিনারায়ণ বাবুর কাছে; দাদাকেও শেখাতেন হরিবাবু। মেজদা সমরেন্দ্রনাথ, নিরুদা, অবনীবাবুর পিসতুত ভাই তাঁদেরও শখ ছিল ঘড়ি মেরামতের আর হাতীর দাঁতের ওপর কাজ করার। এক দিল্লীওয়ালা শেখাতো। তখন অবনীবাবু ঘাঁটাঘাঁটি করতেন রং নিয়ে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ Physiognomy বা মুখসামুদ্রিক আর Phrenology বা শিরসামুদ্রিক বিদ্যার চর্চা শুরু করলেন। লোক ধ'রে ধ'রে মাথা দেখেন আর ছবি আঁকেন। 'বালক'-পত্রিকায় রামগোপাল ঘোষ, বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসু ও আরো অনেকের ছবিসমেত চরিত্র-সমালোচনা বের হয়েছিল শিরসামুদ্রিক অনুসারে।

এই সময়ের অনেক পরে, একদিন অবনীবাবুর খেয়াল হলো 'স্বপ্ন-প্রয়াণ' বইখানি চিত্রিত করার। ইস্কুলে পড়ার সময়ে আঁকার অভ্যেস হয়েছিল। সংস্কৃত কলেজে অনুকূল ওঁকে লক্ষ্মী সরস্বতী আঁকা শিখিয়ে দিয়েছিল। ওঁর প্রথম শিল্প-শিক্ষার মাস্টার সেই; সূত্রপাত করিয়ে দিয়েছিল ছবি আঁকার।

'স্বপ্নপ্রয়াণের' ছবি আঁকার সময়ে অবনীবাবুর হাত কিছু কিছু পেকেছে। অন্ততঃ সেই থেকে ক্ষমতা জাহিরের চেষ্টা হলো। ছবি আঁকলেন: 'স্বপনরমণী আইল অমনি, নিঃশব্দে যেমন সন্ধ্যা করে পদার্পণ'। 'সাধনা' কাগজে ছাপা হয়েছিল। আর্টস্কুলের শিক্ষক লালা ঈশ্বরীপ্রসাদ ছবিখানি লিথোগ্রাম ক'রে দিয়েছিলেন। 'স্বপ্নপ্রয়াণে'র ওপর অনেক ছবি পর পর আঁকা হলো। উৎসাহ দিতেন মেজ-মা জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। 'বালক'-কাগজের জন্যে লিথোগ্রাফ-প্রেস করে দিলেন তাঁর বাড়িতে। 'স্বপ্ন-প্রয়াণে'র ছবি দেখে মেজ-মা ওঁকে রীতিমতো ছবি আঁকা শিখতে অনুরোধ করলেন। উনিই ধ'রে লাগিয়ে দিলেন শিল্পচর্চায়।

ওঁর নিজেরও ইচ্ছে জাগলো, ভালো ক'রে ছবি-আঁকা শিখতে হবে। তখন য়ুরোপীয়ান আর্ট ছাড়া গতি ছিল না। ভারতশিল্পের দামও জানতো না কেউ। ইটালিয়ান আর্টিস্ট গিলার্ডি সাহেব তখন ছিলেন আর্টস্কুলের ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল। ব্যবস্থা হলো, এক-একটা লেশনের জন্যে

দিতে হবে কুড়ি টাকা। মাসে তিন চারটে পাঠ দিতেন তাঁর বাড়িতেই। তাঁর কাছে গাছ ডাল পাতা এইসব আঁকতে শিখলেন। প্যাস্টেলের কাজও শেখালেন তিনি। তেলরঙের কাজ, পোট্রেট্ আঁকা, এই পর্যন্ত হলো তাঁর কাছে। ছবি-শেখার গোড়াপত্তন হলো এইভাবে। আর বিদ্যে এগোয় না। ইটালিয়ান ধরনে অয়েল-পেন্টিং চললো না আর। তুলি দিয়ে ধীরে ধীরে আঁকা সে বাঁধা গতে পোষাল না। গাছপালা আঁকায় তবুও আনন্দ পেতেন। কিন্তু, আর্টস্কুলের রীতিতে ধ'রে ধ'রে তুলি টানা আর রং মেলানো —সে আর পারলেন না। ছ-মাসের মধ্যেই স্টুডিয়োর সব শিক্ষা শেষ ক'রে কেটে পড়লেন।

তখন পর্যন্ত জানতেন —নর্থ লাইট মডেল না-হলে ছবি আঁকা যায় না। আর স্টুডিও না-হলে আর্টিস্ট কোথায় ব'সে ছবিই-বা আঁকবে। বাড়িতে স্টুডিও সাজালেন। রবীন্দ্রনাথ উৎসাহ দিলেন। 'চিত্রাঙ্গদা'র ছবি আঁকা হলো। সচিত্র চিত্রাঙ্গদা প্রকাশিত হ'য়ে গেল। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর চিত্রযোগ এই প্রথম। পরে, বহু প্রেরণা পেয়েছেন তিনি কবির কাছ থেকে।

প্যাস্টেল-ড্রয়িং-এ রবীন্দ্রনাথের চেহারা অনেক এঁকেছিলেন; অন্য অনেকেরও এঁকেছিলেন। পোট্রেটে হাত পাকলো। রবীন্দ্রনাথের পোট্রেট্ নিয়ে নিলেন জগদীশবাবু।

ঐ সময়ে একবার আর্টস্কুলের রবিবর্মা ওঁদের বাড়ি এসে বললেন, —'ছবির দিকে এর ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল'। ক্লাসে নন্দলালদের কাছে অবনীবাবু এ-গল্প করেছিলেন আনন্দ ক'রে।

প্যাস্টেল আর ভালো লাগে না। ভালো ক'রে অয়েল-পেন্টিং-এ লাগলেন। ইংরেজ-আর্টিস্ট —নাম সি. এল্. পামার। তাঁর কাছে গিয়ে পোট্রেট্ করতে লাগলেন গোরা আর মেম মডেল এনে। তৈলচিত্রের করণ-কৌশল শেখা হলো। পরীক্ষায় পাশ করেলন with credit। অতঃপর, লাগলেন এ্যানাটমি স্টাডি করতে। কিন্তু, মরার মাথার খুলি দেখে, সে পাঠ বিশেষ আর এগলো না। হ্যামারগ্রেনের আকৃতি নোট করেছিলেন ঐ সময়। রামমোহন রায়ের নাম শুনে নরওয়ে থেকে হেঁটে এসেছিলেন তিনি এদেশে।

জল-রঙের কাজ শিখতে লাগলেন সেই পামার সাহেবের কাছেই। এখন হলেন ল্যাণ্ডস্কেপ-আর্টিস্ট। ঘুরে বেড়াতে লাগলেন, ঘাড়ে ইজেল, বগলে রঙের বাক্স নিয়ে। অনেক পরে, মুঙ্গেরের দিকে গিয়ে দৃশ্য এঁকেছিলেন তিনি অনেকগুলি। সে পীর-পাহাড়ের কাহিনী পরে বলা যাবে।

কিন্তু, এই ক'রে ক'রে মন তো আর ভরে না। স্টুডিও হয়ে উঠলো তামাক, খাবার আর দিবা-নিদ্রার আড্ডাখানা। এই সময় বিলেত থেকে শিল্পী মিসেস মার্টিনডেল স্নেহবশতঃ বিলিতী ডল একটা পাঠালেন অবনীবাবুর কন্যা নেলীর জন্যে। ছোটদাদামশায় নগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেমসাহেব-বন্ধু ছিলেন তিনি। আইরিশ মেলডিজের কবিতার ওপর দশ-বারো খানা বড়ো বড়ো পুরানো ছবিও পাঠিয়ে দিলেন মার্টিনডেল। থ হ'য়ে গেলেন অবনীবাবু এই সব ছবি দেখে।

সেই সময় তাঁর ভগ্নীপতি শেষেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায় —বিনয়নী দেবীর স্বামী —শ্রীমতী প্রতিমা দেবীর পিতা —একখানা দিল্লীর পার্শিয়ান ছবির বই বকশিশ দিলেন তাঁকে। রবীন্দ্রনাথ দিলেন মাইকেল এঞ্জেলোর জীবনী আর রবিবর্মার কতকগুলি ছবির ফোটো-এ্যালবাম। তখন রবিবর্মাই ছিল আদর্শ। যাই হোক্, সেই আইরিশ মেলডিজের ছবি আর দিল্লীর ইন্দ্রসভার নকশা অবনীন্দ্রনাথের চোখ খুলে দিলে। একদিকে, পুরাতন য়ুরোপীয়ান আর্টের নিদর্শন আর একদিকে এদেশের পুরাতন চিত্রের সম্ভার। দু'দিকের দুই পুরানো চিত্রকলার আদ্য-পরিচয় ওঁর কাছে হলো এই। সেই সময়ে 'ভারতী'-পত্রিকায় ঐ ইন্দ্রসভার বর্ণনা দিয়ে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রবন্ধ লিখলেন 'দিল্লীর চিত্রশালিকা'। অবনীবাবু বলেন, —'ফলে চারদিকে একটা সাড়া পড়ে গেল'। মোগল পার্শিয়ান ছবির কড়া রং দেখে দেখে সে অভ্যাস হ'য়ে গেল। মোগলাই অলঙ্করণের ছবি এঁকে চললেন তিনি হু হু ক'রে নানা টেকনিকে। বলেন্দ্রনাথের রচিত ভাব-ঝলমল ভাষার তাজমহল থেকে, দিশী পুরানো ছবির অন্তরে প্রবেশ করবার বিশেষ প্রেরণা পেলেন অবনীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বলেছিলেন, বৈষ্ণব পদাবলী প'ড়ে ছবি আঁকতে।

চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির কবিতার রূপ দিতে হবে। তাতেই লেগে গেলেন। প্রথম ছবি ভারতীয় পদ্ধতিতে আঁকলেন গোবিন্দদাসের পদ : পৌখলী রজনী পবন বহে মন্দ, চৌদিশে হিমকর, হিম করু বন্দ'। —এ হলো ওঁর প্রথম দিশী ধরনের ছবি —'শুক্লাভিসার'। কিন্তু, দিশী রাধিকা যে হলো না; খাঁটি মেমসাহেব যেন শাড়ী-পরা। এ তো হলো না। শিখতে হবে দিশী টেকনিক। ছবিতে সোনা লাগাতে হবে। রাজেন্দ্র মল্লিকের বাড়িতে পবন মিস্ত্রীর কাছে 'অবন' শিখে নিলেন সে টেকনিক। বৈষ্ণব পদাবলীর এক সেট্ ছবি এঁকে ফেললেন সোনার রূপোর তবক ধরিয়ে।

তারপর আঁকলেন 'বেতালপঞ্চবিংশতি'। পদ্মাবতী পদ্মফুল নিয়ে বসে আছে; গাছের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছে রাজপুত্র; আর অন্য সব ছবি। তখন এই পথে বহু ছবি আঁকলেন। মনের ছাঁচটা এমন পোড় খেলে, হাত লাগালেই ছবি। কৃষ্ণচরিত্র, বুদ্ধচরিত্র, বেতালপঞ্চবিংশতি —এই সব। মহাত্মা শিশির ঘোষ মহাশয় কিন্তু অবনীবাবুর 'রাধা-কৃষ্ণ' দেখতে এসে পছন্দ করেননি। তবে, তাঁর বিরূপতায় দাগ কাটলো না মনে। দিশী মতে ছবি করতে লাগলেন কেবল। টাইকান এলেন, হিষিদা এলেন জাপান থেকে। টাইকানের কাছে শিখলেন লাইন-ড্রয়িং। শিখলেন ওয়াশের ছবি-করা। বিদেশী আর স্বদেশী শিল্পীতে হৃদ্যতা হয়েছিল খুব।

এই সময়ে 'খামখেয়ালী মজলিশে'র উদ্যোগে নাটক করার কাহিনী —সে আছে অনেক। ওঁদের আশ্চর্য অভিনয়-কলা দেখে, গিরিশ ঘোষ মশায় তখন বলেছিলেন, —'এ-রকম এ্যাক্টর সব যদি আমার হাতে পেতুম, তবে আগুন ছিটিয়ে দিতে পারতুম।'

কলকাতার প্লেগে মেয়ের মৃত্যু হলো। শোকে আচ্ছন্ন মন আর চলে না। সেই সময় হ্যাভেল সাহেবের সঙ্গে আলাপ হলো মেজ-মায়ের মাধ্যমে। আর্টস্কুলের ভাইস্-প্রিন্সিপ্যাল হলেন অবনীন্দ্রনাথ। প্রিন্সিপ্যাল হ্যাভেল সাহেব আর্ট-গ্যালারী দেখালেন। তখন মাত্র দু-তিনখানা মোগল ছবি আর দু-একখানা পার্শিয়ান ছবি —এই নিয়ে আর্ট-গ্যালারীর বহর। চোখে আতশী-কাচ লাগিয়ে বক-পাখি দেখালেন ওঁকে হ্যাভেল সাহেব।

সে হলো যেন তাঁর দিব্যচক্ষু। বক-পাখিটাকে দেখলেন যেন জ্যান্ত। প্রতি পালকে তার কী সূক্ষ্ম কাজের বাহার। দেখলেন, পুরাতন ছবিতে ঐশ্বর্যের ছড়াছড়ি। কিন্তু, অভাব —ভাবের। এখন ছবিতে ভাব যোজনা করা হলো তাঁরই কাজ। ঘরে এসে ছবি আঁকলেন —'শাহজাহানের মৃত্যু'। মেয়ের মৃত্যুর প্রগাঢ় শোক উজাড় ক'রে দিয়ে আঁকলেন ছবিটি। তাই ছবিখানি হলো এতো ভালো। হ্যাভেল সাহেব এই ছবিখানি আর 'তাজ-নির্মাণের স্বপ্ন' পাঠালেন দিল্লী-দরবারের প্রদর্শনীতে। জিনে আনলো রুপোর মেডেল। কন্‌গ্রেস ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এগজিবিশনে পেলেন সোনার মেডেল। 'পদ্মাবতী,' 'বেতালপঞ্চবিংশতি' দিলেন আর্ট-স্কুলের প্রদর্শনীতে। পদ্মাবতীর দাম হলো আশি টাকা। বড়লাট লর্ড কার্জনের ইচ্ছে হয়েছিল ছবিখানি নেবার। কিন্তু, দর-কষাকষি করতে করতে নিতে পারলেন না সে-ছবি শেষ পর্যন্ত। রইলো গ্যালারীতে। অবনীবাবু আঁকলেন তাঁর মায়ের ছবি —দিনের স্বপনে দেখে। অবশেষে, হাত লাগালেন কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যখানি চিত্রভূষিত করবার জন্যে। তাঁর শেষ বয়সের প্রসিদ্ধ ছবি —'ধনঘড়া লয়ে পাছে পলায় পার্বতী'। (এই সম্পর্কে আচার্য নন্দলাল আর আমাদের সঙ্গে অবনীবাবুর যে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছিল, সে-কথা 'গোলোক'-প্রসঙ্গে যথাসময়ে বলা হবে।)

ছাত্র নন্দলাল আঁকলেন 'গণেশ', 'কর্ণের সূর্যপূজা'; সুরেন গাঙ্গুলী আঁকলেন 'সমুদ্রশাসন'। নন্দলাল আঁকলেন 'কৈকেয়ী', 'অবনীবাবু জুড়ে দিলেন 'মন্থরা'। নন্দলাল আঁকলেন 'উমার তপস্যা' নিজের ভাবে; —সে তাঁর নিজের সৃষ্টি। ১৯০৭ সালে 'ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব্ ওরিয়েন্টাল আর্ট' খুলে গেল। হৈ হৈ কাণ্ড। অবনীবাবু বলেন, —সোসাইটি এই নামটি দিয়েছিলেন তিনিই।

বিলিতী বর্জন বা বয়কট ডিক্লেয়ার হওয়ার পরে, লীডারদের সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী-যুগ থেকে স'রে দাঁড়ালেন। কিন্তু, স্বদেশী যুগে স্বদেশী ভাবনা বা স্বদেশকে নিজস্ব কিছু দিতে হবে, —এই চিন্তা ওঁদের পেয়ে বসলো। অবনীবাবু দিশী ছবি করতে লাগলেন। স্বদেশী-যুগে 'ভারতমাতা' আঁকলেন অবনীবাবু। তখন খুব আদর হয়েছিল

এ-ছবির।

অবনীবাবু ভাবতেন, ছবি-আঁকা সহজ ক'রে দেওয়া দরকার; যাতে ছেলে-মেয়েরা নির্ভয়ে আঁকতে পারবে। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে নির্ভয় করেছিলেন। ছেলেদের নির্ভয় করেছিলেন অবনীবাবু। কিন্তু, এ-কাজ ক'রে তাঁর নিজের ভয় ধরলো,—কী হবে। যেন রাক্ষস তৈরী ক'রে প্রাণভয়ে ভীত ব্রহ্মার মতো অবস্থা হলো তাঁর। সবাই-যে বে-পরোয়া হ'য়ে ছবি আঁকে! সংযত হ'য়ে বুদ্ধি খাটায় ক'জন? তাঁর মূল কথা ছিল, আর্টকে নিজের করতে হবে, সহজ করতে হবে। অবনীবাবু দেখে গেলেন,—এখানকার ভারতশিল্পীদের শিল্পকলায় 'ভারত'ও নাই আর 'শিল্প'ও নাই। আমাদের সব কৃষ্টিই যেন কেষ্ট পেয়েছে। তাঁর মতে, আর্টের তিনটি মহল—একতলা, দোতলা আর তেতলা। একতলায় ক্রাফ্‌টস্‌ম্যান, দোতলায় রসের বিচার,—সে শিল্প-দেবতার খাস দরবার। আর তেতলা হচ্ছে—অন্দরমহল—মানে, অন্তরমহল। সেখানে স্বয়ং শিল্পী যেন মায়ের ভাবে বিভোর হয়ে শিল্পকে পালন করেন, সাজান। এ হ'ল দূরবীণের উল্টো দিক্ দিয়ে দুনিয়া দেখা। এ-হলো একটা শখ। শিল্পী-জীবনের ধারার ইতিহাস হচ্ছে —'শুধুই উজান-ভাঁটির খেলা।'

যাই হোক্, দিশী মতে ভাবতে হবে, দিশী মতে দেখতে হবে। রবিবর্মা দিশী মতে ছবি এঁকেছিলেন; কিন্তু তিনি বিদেশী ভাব কাটাতে পারেননি। তাঁর সীতা দাঁড়িয়ে আছে 'ভিনাসের ভঙ্গীতে'। সেইখানে হলো অবনীবাবুর পালা শুরু। তিনি বিলিতী পোর্ট্রেট্ আঁকতেন। সে-সব ছেড়ে, পট পটুয়া যোগাড় করলেন। পট স্টাডি করলেন। সে-সব পরীক্ষা-নিরীক্ষার খাতা আছে। স্বদেশী সুবাতাসে তাঁর নৌকো এগিয়ে চলেছিল তরতর ক'রে।

আমাদের দিশী দেবদেবীর ছবি ছিল না। নন্দলালকে দিয়ে অবনীবাবু নানান দেবদেবীর ছবি আঁকলেন। তখন আর্টস্টুডিও থেকে দেবদেবীর বীভৎস ছবি-সব বের হতো। তিনি নন্দলালকে বললেন, —যমরাজ, অগ্নিদেবতা —এই সবের মূর্তি আঁকতে। এক-একটা ক্যারেক্টার লোকের সামনে তুলে ধরা হ'লো। অবনীবাবু এ-সব আঁকতে পারতেন না। 'কৃষ্ণচরিত্র' সহসা খেলে গিয়েছিল কেমন ক'রে যেন। অবনীবাবু বলেছেন, —'নন্দলাল বেশ কতকগুলো দেবতার ছবি

আঁকলেন ; দেশের লোক তা গ্রহণও করলে।'

'তিনি দেশকে উদ্ধার করেছেন আত্মনিন্দা থেকে, আত্মগ্লানি থেকে তাকে নিষ্কৃতি দান করে তার সম্মানের পদবী উদ্ধার করেছেন। তাকে বিশ্বজনের আত্ম-উপলব্ধিতে সমান অধিকার দিয়েছেন। আজ সমস্ত ভারতে যুগান্তরের অবতারণা হয়েছে চিত্রকলায় আত্ম-উপলব্ধিতে। সমস্ত ভারতবর্ষ আজ তাঁর কাছ থেকে শিক্ষাদান গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের এই অহংকারের পদ তাঁরই কল্যাণে দেশে সর্বোচ্চ স্থান গ্রহণ করেছে।' অবনীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এ-কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন ১৯৪১ সালে। পক্ষান্তরে, 'রবিবর্মা কেরলের অধিবাসী। তাঁহার শিক্ষা ইয়ুরোপীয়। প্যাত্রের পরিচ্ছদ মারাঠী না দিলে সেগুলি গুরুকুলের মত হইয়া যাইত। আমাদের অবনীন্দ্রনাথের চিত্র সেই হেতু জাপানী হইতেছে। কল্পনার রাজ্যে অভ্যাস স্বপ্নাবস্থার মত অজ্ঞাতসারে আবির্ভূত হয়।' কাব্য বা অভিনয়, চিত্র বা ক্ষোদিত বিষয়, এ সকলে স্বাভাবিকতার সহিত কিঞ্চিৎ কাল্পনিকতা মিশ্রিত থাকা আবশ্যক হইয়া উঠে। যাহা প্রকৃত, তাহাই যে কুৎসিত, কিংবা কেবল কল্পিত বিষয়ই সুন্দর হইবে, এমন সংস্কার দোষাবহ। কোনও বিষয়ে কল্পনার সৌষ্ঠব বিধানের জন্য পুরাবৃত্তকে মিথ্যাবাদী করিতে নাই।' —এ হলো সেকালের (১৩১৮) সুবিখ্যাত সমালোচক 'সাহিত্য'-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি-মহাশয়ের 'সাহিত্য' পত্রে জনৈক লেখকের সুচিন্তিত অভিমত।

ভারতবর্ষের ধ্যানগম্ভীর ভাবব্যঞ্জনা বা চিন্ময় রূপ অবনীন্দ্রনাথের ছবিতে প্রকাশিত হয়েছে ঠিকই ; তবে, তাঁর অসামান্য প্রতিভা আর নিজস্ব রুচির প্রচণ্ড গতিবেগে চলার দরুন, প্রয়োগের ক্ষেত্রে সে-আদর্শ রূপকলায় কিভাবে কতখানি বিকাশলাভ করেছে, সে-সম্পর্কে তখন পরিমাপ করা সম্ভব ছিল না। উপরন্তু, কোনো রীতির প্রবর্তন তো তিনি করেননি। পক্ষান্তরে, বিভিন্ন রীতি আত্মীকরণ ক'রে এশিয়ার সংস্কৃতির ইতিহাসে একটি স্টাইলের অদ্বিতীয় স্রষ্টা হয়ে আছেন তিনি। অবনীন্দ্রনাথ আমাদের রসবোধকে জাগিয়ে দিয়েছেন —'রঙের সুর' আর 'রূপের ইঙ্গিত' দিয়ে।

জোড়াসাঁকোর পদ্মদহে একই ঝাড়ে দুটি পদ্ম —বলেন্দ্রনাথ আর অবনীন্দ্রনাথ। বলেন্দ্রনাথ ১৮৯৯ সালে উনত্রিশ বছর বয়সে মারা গেলেন ;

অবনীন্দ্রনাথ তখন আটাশ বছরের যুবক। বলেন্দ্রনাথ শিল্পতত্ত্ব শোনালেন; আর অবনীন্দ্রনাথ শিল্পিরূপে বিকশিত হ'য়ে উঠলেন। শিল্পচিন্তার অনেক সুগন্ধ বিলিয়ে বলেন্দ্রনাথের অকালে ঝ'রে-পড়া, আর শতাব্দীর শেষ দশকে শিল্প-জগতে অবনীন্দ্রনাথের ফুটে-ওঠার এই বিচিত্র কাহিনী —নূতন ও পুরাতন যুগের সন্ধিক্ষণে।

এখন গুরু অবনীন্দ্রনাথ সম্পর্কে শিষ্য শ্রীনন্দলালের মুখের কথা শোনা যাক্।—

'আধুনিক ভারতশিল্পের রেনেসাঁ প্রথম আরম্ভ করেন অবনীবাবু। আরম্ভ করলেন বঙ্গভঙ্গের সময়ে। তিনি বলতেন, আরম্ভের কারণটা অবশ্য বঙ্গভঙ্গ নয়। যাই হোক্, অবনীবাবু বিদেশীপনাকে দেখতেন বিষ-নজরে। বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের সময়ে সকলের মন জাতীয় ভাবনায় ভ'রে আছে। সেই শুভক্ষণেই নবজন্ম হলো একালের ভারতকলালক্ষ্মীর।

'সেই সময়ে অবনীবাবু ছোটদাদামশায় নগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একজন মেমসাহেব বন্ধুর কাছ থেকে একটা এ্যালবাম পেলেন; তাতে ছিল খৃষ্টের জীবন নিয়ে বুক-ইলিউমিনেশনের নকশা-চিত্রাবলী। একই সময়ে তাঁর এক আত্মীয় দিশী ছবির একটি অ্যালবাম পাঠালেন তাঁকে—সেটা ছিল পাটনা-স্কুলের নকশা করা।

'এ দু-টো পেয়ে তিনি লেগে গেলেন দিশী-পদ্ধতিতে কৃষ্ণের জীবনচিত্র আঁকতে। সে-সব মূল্যবান ছবির অধিকাংশ বর্তমানে 'রবীন্দ্র-ভারতী'র সংগ্রহে আছে। সে-সময়ের অনুভূতির কথা বলতেন তিনি, —'রোজই আরম্ভ করতুম ছবি; রাত্রে স্বপনের মতো দেখে রাখতুম। আর সকালে উঠে শেষ করতুম'। সেই সব ছবির সঙ্গে পরিচয়ে, বৈষ্ণব-পদাবলীর পদাংশ জুড়ে জুড়ে দিতেন। পরিচয়ের বাঙ্গালা হরফ লেখা হতো —পার্শিয়ান কায়দায়।

'অবনীবাবু বুদ্ধচরিতের ওপর অনেক ছবি এঁকেছিলেন। 'বুদ্ধ-সুজাতা,' 'বজ্রমুকুট' —এ-সব আঁকলেন; 'ঋতু-সংহার' থেকেও ছবি করলেন পাঁচ ছ'খানা। 'প্রবাসী'তে ছাপা হয়েছিল অনেক ছবি।

'এই সময়ে এসে গেলেন জাপানী শিল্পীরা। ওকাকুরার লোক সব আসতে লাগলেন। হিষিদা, টাইকান এলেন। ফলে, অবনীবাবুরও

স্টাইল কিছু বদলে গেল। জাপানী-পদ্ধতিতে 'মেঘদূতের' ছবি আঁকলেন অবনীবাবু। 'বকের পাঁতি,' 'গন্ধর্বের আকাশ-পথে গমন' —এই রকম পাঁচ ছ-খানা ছবি আঁকা হলো ওঁর নূতন স্টাইলে। তবে, একটা কথা জোর দিয়ে বলতে পারা যায়, অবনীবাবু জাপানী পদ্ধতিতে ছবি আঁকলেন বটে, কিন্তু তাঁর পদ্ধতিতে ওদের পদ্ধতি মিশিয়ে দিলেন। ফলে, ভারতশিল্পের ধারা খানিকটা প্রসারিত হয়ে গেল।

'অবনীবাবুর হাতে ক্রমশঃ এই পদ্ধতিরও বদল হ'তে লাগলো। স্বদেশী-যুগে অবনীবাবু 'বঙ্গমাতা'র ছবি আঁকলেন। 'বঙ্গমাতা'র ছবি আঁকা হয়েছিল ওয়াশে। সেই বছর টাইকান চলে গেলেন জাপানে। আমি তখন যাইনি আর্টস্কুলে। তখনও দেখা হয়নি অবনীবাবুর সঙ্গে। আমি যখন আর্টস্কুলে ভরতি হই, অবনীবাবু তখন 'বঙ্গমাতা'র ছবি ফিনিশ করেছেন। কিন্তু, সে ছবিখানা দু-টুকরো হ'য়ে গেছে। মধ্যিখানের ভাঁজে ক্র্যাক্ হয়েছে। জাপানী-পদ্ধতি আর তাঁর অনুসৃত আগের পদ্ধতি মিলিয়ে অবনীবাবু 'বঙ্গমাতা'র ছবি করেছিলেন।

'এই পদ্ধতি তিনি অনুসরণ করেন ওমর খৈয়মের চিত্রাবলীতেও। সে অদ্ভুত এক স্টাইল। সব সময়েই একটা স্ট্রাগল্ দেখেছি তাঁর মনে; এবং বার বার তা অতিক্রম করতে হয়েছে তাঁকে। একঘেয়েমি তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না কিছুতেই। বিশেষ ক'রে, তাঁর আগেকার আঁকা বিলিতী স্টাইল যখন এসে পড়তো, সেটা অতিক্রম করতে গিয়ে তিনি নানা পদ্ধতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে লাগলেন।

'অবনীবাবু আগে বিলিতী স্টাইলে ছবি আঁকতে শিখেছিলেন। প্যাস্টেল্, ওয়াটার কালার, অয়েল পেন্টিং —এই সবে তাঁর হাত পেকেছিল। সেই সঙ্গে মিশলো তাঁর নিজস্ব স্টাইল। জাপানী স্টাইল, তিব্বতী স্টাইল, পার্শিয়ান স্টাইল —এই সব। সব মিলেছিল অদ্ভুত রকমে তাঁর তুলিতে। মাঝে মাঝে ওলট-পালটও হ'য়ে যেতো। এই যেমন, প্রথম আরম্ভ করলেন তিনি দিশী পদ্ধতিতে আঁকতে। অথচ কম ক'রে পাঁচ ছ-খানা ছবিতে অয়েল-পেন্টিং, প্যাস্টেল ইত্যাদি স্টাইলের আদল এসে গেল। তাঁর এক-একটা সিরিজের ছবিতে দেখা যায়, নানাভাবের মিশ্রণ। যাই হোক্, বিলিতী চীনে জাপানী মোগল —এই সব পদ্ধতি

নিয়ে হলো ভারতশিল্পের রেনেস**াঁ**র চেহারা।

'আমরা মুগ্ধ হলুম; কিন্তু, অবনীবাবুর স্টাইল নিতে পারলুম না। আমাদের ঝোঁক হলো অজন্তার দিকে। কাঙ্গড়া, রাজপুত — এই সবও করতে লাগলুম। আমাদের ছবি জাপানে গেল এগ্‌জিবিশনে। সেখানকার লোকেরা ঐসব ছবি দেখে নিন্দে করলে। জার্মানীতে গেল। তারাও ছবির নিন্দে করলে। জার্মানরা বললে, —'ছবি ভালো, তবে হাত বড়ো উইক্; আর মোগল বা রাজপুতের মতো রঙেরও জেল্লা নাই। বিলিতী রং দিয়ে আঁকার দরুন ম্যাজমেজে।

'এ-সব শুনে তখন আমাদের সোসাইটির উডরোফ্ ব্লান্ট্ প্রমুখ সদস্যরাও বললেন, —'দিশী পদ্ধতিতে আঁকা শুরু করো। দিশী ছবি সব গ্যালারীতে টাঙ্গিয়ে দেওয়া হলো। মোগল কাঙ্গড়ার ছবিও টাঙ্গানো হলো। আমরা কিছু কিছু কপিও করেছিলুম। 'বিচিত্রা'য় কাম্পো আরাই জাপানী-পদ্ধতিতে আমাদের শেখাতে আরম্ভ করলেন —সে কালি-তুলির কাজ। দিশী-পদ্ধতি ঈশ্বরীপ্রসাদ শেখাতে লাগলেন আর্টস্কুলে।

'বিদেশে এই রকম বিরূপ সমালোচনার ফলে, আমরা আমাদের পুরাতন পদ্ধতিতে ফিরে গেলুম। আমরা সব পুরাতন পদ্ধতি শিখতে লাগলুম। তখন আমাদের প্রতিজ্ঞা হলো, বিদিশী ছবির অনুকরণ করবো না। মন থেকে ঝেড়ে ফেলবো সে সব।

'এদিকে পুরাতন পরম্পরার সঙ্গে পরিচয় তত না-থাকায়, নিজস্ব ধারায় আমাদের ছবি হ'তে লাগলো। তবে, আমাদের ঐতিহ্যের ধারা খুঁজে পেতেও খুব একটা বেগ পেতে হয়নি। আমি আরম্ভ করলুম পৌরাণিক ধারায় ছবি আঁকতে। অবনীবাবু করতেন নানা পুরাণ, সংস্কৃত কাব্য আর ইসলামি কাহিনী-কেচ্ছা থেকে রাজা বাদশাহের ছবি। এ-সব তিনি করতেন অতি অদ্ভুতভাবে। সেটা আমরা পারিনি। অবনীবাবু বলতেন, —'তোমরা পারবে না এ-সব ছবি করতে। এই রকম মোগলাই কায়দায় ছবি তোমাদের হবে না। আমাদের বংশের মধ্যে পিরিলী ধারায় আছে এই সব কায়দা। তোমরা করো স্রেফ্ দিশী ছবি।'

'অবনীবাবু নানা বিচিত্র বিষয় আত্মসাৎ করেছিলেন। আমরা তা' পারিনি। কিন্তু, আমরা যা পেলুম, সে হলো নিজেদের ধারার বৈশিষ্ট্য। আমার ধারা অবনীবাবুর মতো হলো না। সে-ধারা মোগল-পদ্ধতিও নয়, পার্শিয়ান-পদ্ধতিও নয়। অজন্তা, রাজপুত আর দিশী পদ্ধতি মিলিয়ে এ হলো আমার নিজস্ব ধারা —আমার গুরু অবনীবাবুর থেকে আলাদা।

'আর রং খুঁজেছি সব সময়ে। মোগলদের মতো ব্রাইট রং করা যায় কি করে, সে-চিন্তা আছে বরাবর। কালি দিয়ে করেছি লাইনের ছবি, চীনেদের মতো। এটা করতে গিয়ে, চীনে আর পার্শিয়ান কালি-তুলির কাজে হাত শক্ত করতে হয়েছে। আর করা হলো —ইণ্ডিয়ান্ স্কাল্‌প্‌চারের আদর্শে অলংকরণের ছবি।

নন্দলাল বললেন, 'যাই হোক্, গুরুর কথা বলতে গিয়ে নিজের কথাও এসে যাচ্ছে। আজ আর থাক্। তাঁর গুণের ওর মেলে না। গুরু আমার গৌরবিত —চার কাল ধরেই'। আত্মীয়-সম্পর্কে তাঁর চরিত্র-কথা আরও বলা হবে যথাসময়ে।

॥ **আনন্দ কেণ্টিশ কুমারস্বামী** ॥ —সিংহলী বাপ আর বিলিতী মায়ের ছেলে। বরাবর তিনি শ্রদ্ধা পোষণ করতেন ভারতবর্ষের আর সিংহলের পুরাতন সংস্কৃতির ওপর; অনেক বই লিখেছিলেন। বড়ো স্কলার ছিলেন ডক্টর কুমারস্বামী; কাজ করতে আরম্ভ করলেন ভারতীয় সংস্কৃতির ওপর। ফাস্ট'হ্যাণ্ড্ নলেজ সংগ্রহের জন্যে ভারত আর সিলোনের সমস্ত জায়গা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন, আর তার ইতিবৃত্ত লিখতে লাগলেন।

'সেই সূত্রে ডক্টর কুমারস্বামী ভারতে এলেন যখন, তখন আর্টস্কুলেও এসেছিলেন। —সে হলো ১৯০৬/৭ সালের কথা। বেশভূষা করতেন তিনি ভারতীয়দের মতো। পা-জামা, চোগা-চাপকান আর থাকতো সাদা পাগড়ী মাথায় বাঁধা। তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা এই পোশাকে। তাঁর পোশাকের মধ্যে অদ্ভুত লাগলো, —তাঁর দু-হাতে দু-টো রূপোর বালা আর কানে মাকড়ি; ঠোঁটের নিচে অল্প একটু

দাড়ি —এলেন এই বেশে। জানাজানি হয়ে গেল, বড়ো স্কলার এসেছেন, আর্ট-ক্রিটিক্ এসেছেন —এইভাবে। সেবারে ভারতবর্ষ ঘুরে তিনি ফিরে গেলেন ইংলণ্ডে।'

'দ্বিতীয়বার যখন এলেন, উঠলেন এসে অবনীবাবুদের বাড়িতে। প্রায় দু-তিন মাস ছিলেন তিনি ওঁদের পরিবারে —সে ১৯১০ সালের দিকে। তিনি যেন ঘরের লোক হয়ে গেলেন ওঁদের ওখানে। যেমন গগন, সমর, অবন, তেমনই যেন আর এক ভাই হলেন কুমারস্বামী। উঠতেন বসতেন খেতেন বেড়াতেন —এক সঙ্গে। একই সঙ্গে তামাক টানতেন গড়গড়াতে। এই রকম মেলামেশা। বেশ বাবরি চুল। বড়ো বড়ো আর কটা কটা চোখ। অবনীবাবু পোর্ট্রেট্ এঁকেছিলেন কুমারস্বামীর। 'প্রবাসী'তে ছাপানো হয়েছে তাঁর সে-ছবি।'

অবনীবাবুদের লাইব্রেরীতে যত ছবি ছিল, নন্দলাল সে-সবের তখন ক্যাটালোগ করছেন। সে ক্যাটালোগ 'অবনীবাবুর ঘরেই কোথাও ছিল' বললেন নন্দলাল ১৯৬৫ সালের ৭ই জুলাই। কুমারস্বামী নন্দলালের পাশে বসে বসে দেখতেন সে-সব ছবি। অবনীবাবুদের রাজপুত (জয়পুর-কাঙ্গড়া), আর মোগল (দিশী) আর্টের ছবির এ্যালবাম ছিল অনেক —সেগুলো অত্যন্ত রেয়ার জিনিস। —সেই এ্যালবাম থেকে কুমারস্বামী ক-গ্রন্থ বই ছাপালেন Indian Drawings, Mughal Painting (1910), Rajput Painting (1916) —এইসব নাম দিয়ে, ১৯১০ সালের দিকের সেই কাজ থেকে। কুমারস্বামী তাঁর বই-এর Foreword লিখেছেন এইভাবে :— I am greatly indebted to my friend Babu Gogonendranath Tagore for the opportunity of reproducing a large number of his valuable collection of artist's sketches and drawings which he obtained a few years ago from the decendants of hereditory artists of Patna. 'ক'টা Copy Book-ও ছাপালেন'।

অবনীবাবুর Studio-ঘরে নন্দলাল ক্যাটালোগের কাজ করছেন আর কুমারস্বামী ব'সে ব'সে দেখছেন আর নানা আলোচনা করছেন, সে-ছবি নন্দলালের অাঁকা আছে —কুমারস্বামীর সত্তর বছরের জন্মজয়ন্তী



কুমারস্বামী ও নন্দলাল - নন্দলাল

উপলক্ষে; মন থেকে আঁকা স্কেচ্। সে-স্কেচ্‌টি ছাপা হয়েছে নানা বই-এ। প্রিন্টও আছে তার। —সবাই দুপুরে ঘুমুচ্ছেন —আরাম-কেদারায় হেলান দিয়ে বই খুলে মৌজে ঢুলছেন সমরেন্দ্রনাথ; উপুড় হ'য়ে প'ড়ে নাক ডাকাচ্ছেন অবনীন্দ্রনাথ; আর চাদরমুড়ি দিয়ে চিৎ হ'য়ে শুয়ে সটকা টানতে টানতে বই পড়ছেন বড়-দা গগনেন্দ্রনাথ। এদিকে বালা-পরা হাত নেড়ে, জেগে বসে কথা কইছেন কুমারস্বামী, আর বসে বসে লিখতে লিখতে শুনছেন আর বলছেন বৃষস্কন্ধ নন্দলাল।

এই সময়ের একটা কথা স্পষ্ট মনে আছে নন্দলালের। তখন সহমরণের 'সতী' আর 'সতীর দেহত্যাগ' এঁকেছেন তিনি। তারিখ দেওয়া ছিল মূল ছবিতে। পাঁচশো টাকা প্রাইজ পেয়েছিলেন ছবি-দু'খানির ওপর। কুমারস্বামী দেখলেন তাঁর 'শিব-সতী' ছবিখানি। দেখে ভারী খুশি হলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, —'ওর ফিলসফি কি'? নন্দলাল বললেন, —'হিন্দুর ছেলে, হিন্দুর সুপরিচিত দেবতা 'শিব-সতী' এঁকেছি; ওর ফিলসফি কি, তা তো জানি না। গল্প জানি ওর —দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করেছিলেন। —সেই গল্প থেকেই করেছি। ফিলসফি-টিলসফি জানি না'। —কিন্তু, স্বয়ং কুমারস্বামী আর সিস্টার নিবেদিতা ব্যাখ্যা করেছিলেন সে-ছবির খাঁটি দর্শনতত্ত্ব (The Modern Review 1909, Sept. দেখুন)।

'পুরাতন আর্টিস্টদের স্কেচ্‌বুক ছিল পাঁচ-খানা —মোগল ইরোটিক ছবির। আমাকে দেখিয়ে কুমারস্বামী বললেন, —'কপি করে দাও'। আমি খুব পিউরিটান ছিলুম তখন। লজ্জিত হলুম। তিনি বারবার অনুরোধ করলেন, নকল ক'রে দিতে। নকল করে দিলুম আমি; কিন্তু লজ্জা হলো খুব, তখন বয়স অল্প ছিল ব'লে। আর গোঁড়া তো ছিলুমই। পরে, ক্রমশঃ ক্রমশঃ খানিকটা লিবারেল হয়েছি'। —এইভাবে কুমারস্বামী আর নন্দলাল অবনীবাবুদের লাইব্রেরী দেখতেন সারা দুপুর জেগে —মধ্যদিনে যবে গান বন্ধ করে পাখী'।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, —কি রকম ইরোটিক্ ছবি? নন্দলাল বললেন, —'ঐ মিথুন ছবি যেমন হয় আর কি' (৭-৭-১৯৬৫)।

'গগন সমর আর অবন —তিন ভাই খেতে বসতেন। কুমারস্বামীও

বসতেন ওঁদের সঙ্গে। ব'সে ব'সে খাওয়াতেন অবনীবাবুর মা। জলচৌকিতে বসতেন মা, পানের ডাবর হাতে নিয়ে। দাসী দাঁড়িয়ে থাকতো পাশটিতে। 'এটা খাও', 'ওটা খাও', 'এটা আনো', 'ওটা দাও' —মায়ের এইসব ফরমাশ চলছেই। তিন ভাইয়ের সঙ্গে কুমারস্বামীও পান খেতেন, আর তামাক খেতেন গড়গড়ায়। ওঁরা যা' করতেন, ইনিও তাই করতেন'।

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ কুমারস্বামীকে শ্রদ্ধা করতেন খুব। প্রবাসী (১৩১৮, পৃ. ১১১) আর মডার্ণ রিভিউতে (১৯১১) ওঁদের ফটোগ্রাফ ছাপা হয়েছে —কুমারস্বামী ব'সে আছেন, আর তাঁর পাশে রবীন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে আছেন। সেই বছরের ২৫-এ বৈশাখ পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হওয়ায় 'কবিকে সম্বর্ধনা' দেওয়া হয়েছিল। কুমারস্বামীও রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা করতেন খুব। তাঁর কবিতার ইংরেজী অনুবাদ করেছিলেন কুমারস্বামী ১৯১১ সালে।

'কুমারস্বামী বিয়ে করেছিলেন দু'-তিনটে। শেষের স্ত্রীর ছেলেটিকে শান্তিনিকেতন-কলাভবনে ভরতি ক'রে দেবার খুব ইচ্ছে ছিল তাঁর। কিন্তু, হলো না। সে ভরতি হলো গিয়ে 'গুরুকুলে'। নিজের ইচ্ছেয় সে 'গুরুকুলেই' রইলো —মারা গেল শেষটায়।' কুমারস্বামী মারা গেলেন ১৯৪৭ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর। বোধহয় বছর সত্তর বয়েস হয়েছিল মৃত্যুর সময়ে।

'কুমারস্বামী বোস্টনে লাইব্রেরী-ম্যুজিয়মের কিউরেটর হ'য়ে গেলেন ওকাকুরার পরে। অনেক প্রবন্ধ, অনেক বই আছে ওঁর আর্টের ওপরে। Modern Review, Dawn —এইসব দিশী আর বিদিশী নানা পত্র-পত্রিকায় অজস্র লেখা লিখেছিলেন তিনি।

কুমারস্বামীর অনুরোধে লণ্ডনের র‍্যালি টেক্সট্ সোসাইটির সিংহলী সেক্রেটারী এড্‌মাণ্ড্ রোল্যাণ্ড্ গুণেরত্নে 'রূপমালা' নামে একখানি সংস্কৃত পুরাতন পুঁথি উদ্ধার ক'রে তাঁর শ্লোক আর ইংরেজী অনুবাদ সমেত টাইপ করিয়ে তাঁকে দিয়েছিলেন ১৯০৭ সালে। —১৫২ পৃষ্ঠার এই বাঁধানো বইখানি কুমারস্বামী দিয়েছিলেন তাঁর বিশিষ্ট বান্ধব অবনীবাবুকে।—

বইখানিতে ১৫৮টি সংস্কৃত শ্লোক আছে। ভারতীয় হিন্দু দেব-দেবীর রূপ, অলঙ্কার, আয়ুধ, বেশ-বাসের বর্ণনা রয়েছে এতে। মূল গ্রন্থকর্তা বা গ্রন্থরচনার তারিখের হদিস নাই। তবে মনে হয়, গ্রন্থকার ধর্মে বৌদ্ধ ছিলেন। কারণ, তিনি বুদ্ধ-বন্দনা ক'রে গ্রন্থ-সূচনা করেছিলেন। ভাষা থেকে অনুবাদক অনুমান করেছিলেন, বইখানি ১০৯০-১১৯০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে লেখা হয়েছিল। তখন ভারত আর সিংহলে বিশেষ আদান-প্রদান অব্যাহত ছিল। পণ্ডিতদের আনাগোনা চলতো প্রায়ই। গুণেরত্নের মতে, সিংহলী পুরাতন ছবি যা' ওঁদের হাতে এসেছে, সে-সব ভারতীয়দের আঁকা ছবি থেকে কপি করা। মঠে-মন্দিরে ভিন্ন ধরণের ছবিও কিছু আছে; সে বৌদ্ধরুচির বৈশিষ্ট্য অনুসারে। সিংহলী রাজাদের সময়ে, হিন্দু তামিল রাজারা গিয়ে সিংহল দখল করেন। সেইজন্যে সিংহলে হিন্দুধর্মের ধারাটি বয়ে চলেছিল বৌদ্ধধর্মের পাশাপাশি। এমন-কি হিন্দুধর্ম অনেক স্থলে বৌদ্ধদের নির্জিত ক'রে ফেলেছিল। বহু কৃষক, শ্রমিক আর শিল্পীও গিয়েছিলেন তখন সিংহলে। —মূল 'রূপমালা' গ্রন্থের মূল পুঁথিখানি খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ। সেইজন্যে গুণেরত্নে বইটিতে কিছু সংযোজন-সংশোধন করেছিলেন —অনুবাদ করার সময়ে। ১৯০৭ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখে তাঁর এই কাজ সম্পূর্ণ হয়।—

শ্রীজ্ঞানকে নমস্কার ক'রে যে-সব দেব-দেবীর বিশেষ ধ্যান বা রূপ-চিন্তা 'রূপমালা' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছেঃ বুদ্ধ, আট নাথঃ শিবনাথ,

ব্রহ্মনাথ, বিষ্ণুনাথ, উমা (গৌরীনাথ), মাৎস্যদেবতা মৎস্যেন্দ্রনাথ (বিভীষণ), ভদ্রনাথ (কার্তিক), বুদ্ধনাথ, কুল্লভট্টু পেরুমাল (গণনাথ) বা গোপালনাথ, রামচন্দ্র, নীল-রামচন্দ্র, বিষ্ণুর দশ অবতার, দেবগরুড, শরভ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণপতি, হেরম্ব-গণপতি, নেত্র-গণপতি, ষণ্মুখ, সদাশিব, ঈশ্বর, ঈশ্বরী, অর্ধ-নারীশ্বর, (নটরাজ) শিবনর্তনম্, বীরভদ্র, অঘোর, মহাঘোর, বটুকনাথ, কামশিব, অম্বিকাস্বরূপ, ভুবনেশ্বরী, শিবদেবী ভদ্রকালী, কল্যাণভাল, মার্তণ্ড, পরমেশ্বরী মন্মথস্বরূপ, গণপতি তাল-প্রমাণম্, কিন্নর তালপ্রমাণম্, ষোড়শ ভর্গ সিংহ, হংসরূপম্, অশ্ব, লতাকিন্নর নসিংতালম্ বা পক্ষী, মকরম্, বিশ্বকর্মা, বাতরূপম্, পিত্তরূপম্, শ্লেষ্মারূপম্, সন্নিপাত, জ্বররূপম, সিদ্ধিরূপম্ ।—

কুমারস্বামী এই দুর্লভ পুঁথিখানি দিয়েছিলেন অবনীবাবুকে। অবনীবাবু বাঙ্গালা অক্ষরে মূল শ্লোকগুলি, আর তার ইংরেজী অনুবাদ, নিজ হাতে লিখেছিলেন, বাঁ-দিকে শূন্য পাতার এক পাশে। —বইটির প্রথম-দিকে কুড়ি পৃষ্ঠা পর্যন্ত অবনীবাবুর হাতের লেখা রয়েছে। গুণেরত্নের মূল কপির ওপর অবনীবাবু অনেক স্থলে সংশোধনও করেছিলেন। আমাদের দৃঢ় ধারণা, তিনি ১৯০৭/৮ সালের দিকে নন্দলাল প্রমুখ ছাত্রদের হিন্দু দেব-দেবীর চিত্র আঁকার জন্যে বিশেষ যে-সব বই থেকে রূপবর্ণনা বা আইডিয়া দিতেন, তার মধ্যে এই 'রূপমালা' বইটি অন্যতম। তাঁর মাস্টারির বহু চিহ্ন রয়ে গেছে এই অপ্রকাশিত 'রূপমালা' পুঁথির পাতায় পাতায়। অবনীবাবুর স্বহস্তের স্বাক্ষরটি আজও অম্লান।—

নন্দলাল যখন শান্তিনিকেতনে আসেন, তিনি এই বইটি উপহার পেয়েছিলেন উত্তরাধিকারসূত্রে। এখন রয়েছে পুঁথিখানি শান্তিনিকেতন কলাভবনে। ভারতশিল্পের দেব-দেবীর চিত্র-নির্মাণে এই গ্রন্থখানি অমূল্য, অভ্রান্ত ও অপরিহার্য একটি আদর্শ বহন করছে বলে মনে করি। সিংহলী হিন্দুধর্মের বিবরণ-স্বরূপে গ্রন্থখানির ঐতিহাসিক মূল্য অপরিমেয়। এবং এই দুষ্প্রাপ্য পুঁথিখানি এখন বিশ্বভারতীর সম্পত্তি, সে ডক্টর আনন্দ কেন্টিশ কুমারস্বামীর কৃপাতেই।

সুরেন গাঙ্গুলীর 'লক্ষ্মণসেনের পলায়ন' ছবির স্বপক্ষে, অক্ষয়

মৈত্রেয় মহাশয়ের বিরুদ্ধে লিখেছিলেন কুমারস্বামী। কিন্তু মডার্ণ-রিভিউ -সম্পাদক রামানন্দবাবু কুমারস্বামীর যুক্তি খণ্ডন করেছিলেন। ওঁদের বাদ-প্রতিবাদ হয়েছিল এইভাবে:—

Art and Archaeologyর পার্থক্য বুঝিয়ে Dr. Coomaraswamy লিখেছিলেন—

I hope no one will be led by the perusal of Mr. Akshay Kumar Maitra's interesting paper on the 'Flight of Lakshman Sen' to understand the significance of the Painting. Art is not Archaeology The value of Ramayana does not depend upon the scientific Proof or disproof of the former existence of the persons named Rama, Sita, or Ravana. Its value lies in its presentation of race ideals in a manner independent of time and place. This quality of timelessness belongs to all works of genius, and is quite other and much greater than, the merely critical faculty. Mr. Ganguly's painting is not, of course, a work of creative genius comparable in any way with the Ramayana; but its value depends in the same way, not upon whether a cowardly king named Lakshman Sen did actually fly the manner imagined, but upon the fact that the painting does represent all that is typical in such a flight, as Subjectively conceived by an Indian artist and from the Indian point of view The picture is a picture, not of the flight of this or that particular king but of all kings to whom in their downfall, there has come the bitter hour of stealthy and lovely flight.

It can never be the function of an archaeologist, as

such to criticise the work of an artist.

কিন্তু, সম্পাদক রামানন্দবাবুর মতে.—

In justice to Mr. Maitra it should be observed that he did not criticise the work of the artist, he examined the historical foundations of the story which the picture represents. He has praised the painting as a work of art. Further, though we are not art critics, we may be allowed to observe that by preference artists should paint subjects which give not ignoble pleasure......(Modern Review, 1909 p. 272).

Selected Examples of Indian Art-গ্রন্থে আনন্দ কেণ্টিশ কুমারস্বামী নন্দলালের 'সতী' ছবির বর্ণনায় লিখেছিলেন,—

PLATE XV SATI, BY NANDALAL BOSE.

Mr. Nandalal Bose is the best known of the pupils of Mr. Abanindronath Tagore. The picture here reproduced is probably his finest work. It represents an Indian widow's death upon her husband's burning pyre. Perhaps no ideal has move deeply fired the Indian imagination, than this, of lives too closely linked to endure separation. An Indian Poetess has written :—

Life of my life, Death's bitter sword
Hath severed us like a broken word :
Rent us in twain who are but one...
Shall the flesh survive when soul has gone ?

This is the burden of the picture.

The ideal that finds expression in Sati has been so misunderstood and so misrepresented that some words of explanation may be useful That Sati as a social custom enforced by men would be infinitely wrong, is very obvious. This, however, can only have been the case under exceptional and special conditions. It is an ideal upheld rather by women than by men. It is thus that the Infinite, despite our civilisation and common sense, makes recurring protest against the claims of the finite. It is the very same call that leads the sannyasi to surrender all things, house and fame and even life itself, to become one with God. And it is thus at the end of all things, when the dragons leave their guard at the Tree of Life, that the phenomenal fades from manifestation, and Sakti becomes one with Purusha.

Some may suppose that Sati has come to be regarded in India as a barbaric and cruel custom of the past. It may be indeed that the moderns could not endure its continuance: but they do not therefore think of it with horror. Families who can point to ancestors who 'became Sati' are proud of such heroic descent and, in Bengal at least, many, perhaps most wom n, cherish the ideal and wish that it could still be realised.

The picture is great because it expresses this ideal with elemental passion and directness. It has therefore more st ength than many other paintings of the modern school. The tragedy, even in a picture, is painful; not because of the individual sacrifice of one or many women,

but because it seems to embody the eternal tragedy of love that is life itself to a woman, and only part of life to a man The ultimate expression of this real thing in human psychology cuts accross all the quiet and comfortable sentiment of a prosperous bourgeoisie. We have lost the faith that made such things possible Are we greater, or less, because we cannot bear the thought of love like that ? Or is there till, perhaps, such love ?

The picture does not set these questions insistently before us. It appeals to no prejudice. It has the greater quality of attuning those who see it to one heroic mood, that mood in which Deirdre, flame of beauty in Eire, 'the western India,' lay down by Naoisi in the grave and died herself ; the mood in which Padmavati bade farewell to the saffron-clad warriors of Chitor.

For Sati is not merely Indian, it belongs to all epic and heroic life, and it is universal in heroic literature. When Cuchullin died, this was the lament of Emer : 'Love of my life, my friend, my sweetheart, my one choice of the men of the world, many is the women, wed or unwed, envied me until to-day : and now I will not stay living after you'. And so, too, the fierce-hearted Valkyrie, the northern Amazon, would not stay living After Sigurd ;

How then when the flames flare upward may I be left behind ?
How then may the road he wendeth be hard for my feet to find ?
How then in the gates Valhall may the door the gleaming ring

Clash to on the heel of Sigurd, as I follow on my king ?

It has been well said that the Rajputs were re-incarnated Vikings. Older pictures of Indian Sati are rare. An inferior example occurs in the Bodleian MS.

Ousely Add. 167 fol. 10. A much finer example is one of the three illuminations illustrating the British Museum MS. Or. 2837, the Suz U. Gudaz or 'Burning and Melting' of Nau'i, the story of a Hindu princess who burned herself on her husband's pyre in the reign of Akbar.

Collection of Mr. Abanindranath Tagore

—নন্দলালের 'সতী' সম্পর্কে কুমারস্বামীর এই মন্তব্যে কিন্তু সারা দুনিয়া একমত।

ডক্টর কুমারস্বামী ১৯১০ সালে তাঁর The Message of the East বইএ (প্রবন্ধাকারে প্রথম প্রকাশ Modern Review, 1909, May-June) ভারতের বাণী শুনিয়েছিলেন। কালের উল্টোগতি তিনি তখনই যেন বুঝতে পেরেছিলেন। দর্শনতত্ত্বে, মনস্তত্ত্বে, ধর্মতত্ত্বে আর শিল্পকর্মের মধ্যে দিয়ে Indianisation of the West ছিল তাঁর মনের কথা। তখনকার কোনো কোনো ইংরেজী লেখকের মতো তিনি বিশ্বাস করতেন : When a new inspiration comes into European art, it will come from the East. শুক্রাচার্যের নীতি অনুসারে তিনি ভাবতেন, শিল্পীর মানসী মূর্তি পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠে 'যোগ'-কৌশলের ফলে। ভারতশিল্প-মনস্তত্ত্বের কথাই হলো ব্যক্তিগত নির্দিষ্ট রূপ-কল্পনাকে বিকশিত করে' তোলা। পাশ্চাত্য আদর্শ অনুসরণ ক'রে জীবন্ত মডেল আনা আমাদের পক্ষে অনাবশ্যক। প্রত্যক্ষ জগতের অতীত অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্য রয়েছে ; তাকে মূর্ত ক'রে তুলতে হবে গভীরতর ধ্যান ক'রে ক'রে। পাশ্চাত্যের শিল্পকলা হলো বাস্তবাশ্রিত আর-প্রাচ্যের হলো আদর্শধর্মী। সেকালের শ্রেষ্ঠ আর্ট-ক্রিটিক্ কুমারস্বামী তাঁর নানা রচনার মধ্যে দিয়ে সাহসের কথা অনেক শুনিয়ে গেছেন ;

আর সে-কথাগুলো সত্যিকার নতুন বা মৌলিক।

Art and Swadeshi বই-এ কুমারস্বামী The Modern School of Indian Painting প্রবন্ধে কলকাতার আর্টস্কুলে হ্যাভেল-অবনীন্দ্রনাথকে নিয়ে নব্যবঙ্গের শিল্প-জাগরণের ইতিহাস সংক্ষেপে বলেছিলেন। তা'তে নন্দলাল সম্পর্কে কুমারস্বামীর কথা ঃ Some works by Nanda Lal Bose, too, have very excellent qualities : his 'Sati' is very sincere and a sepia drawing of 'Jagai and Madhai' (disciple of Chaitanya) a piece of admirable draughtsmanship (p 133)। নন্দলালের 'কৈকেয়ী' ছবিটির প্রিন্ট্ রয়েছে এই সঙ্গে।

শ্রীনন্দলাল একদা গুরু অবনীন্দ্রনাথের বাড়িতে বসে তাঁদের সংগ্রহে-রাখা সব ছবির তালিকা তৈরী করেছিলেন গভীর অভিনিবেশে। মনীষী কুমারস্বামীর সহযোগিতাও পেয়েছিলেন তিনি সে সময়ে। সে মূল্যবান্ চিত্র-তালিকাটির আজ আর কোনও সন্ধান মিলছে না। যাই হোক্, প্রসঙ্গতঃ চেষ্টা করা গেল, ভারতশিল্পী শ্রীনন্দলালের নিজের আঁকা ছবির তালিকা তৈরী করার। এতে আমরা সাক্ষাৎ সহযোগিতা পেলুম স্বয়ং শ্রীনন্দলালের।—

আপাততঃ ১৯০০ সাল থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত তাঁর মুখ্য চিত্রকর্মের বিবরণ দেওয়া গেল। এর পরেই আসবে ১৯০৭-৮ সাল থেকে ১৯১১-১২ সাল পর্যন্ত পাঁচটি বিশিষ্ট চিত্রপ্রদর্শনীর সংক্ষেপসার। সমগ্র বিশ্বের কথা এখন আমরা ভাবছি না ; তবে, ভারতবর্ষে বোধ হয়, জীবিত ও মৃত কোনও চিত্রশিল্পী শ্রীনন্দলালের মতো আজ ছিয়াত্তর বছর ধ'রে, অবিচ্ছিন্নভাবে এতো ছবি আকেননি। বা, আর কারোর এতো ছবি বোধহয় প্রকাশের সুযোগ লাভ ক'রে জনসমাজের গোচরে আসেনি।

রূপপতি শ্রীনন্দলালের চিত্র-রচনার আর চিত্র-প্রকাশের অজস্রতার একমাত্র তুলনা মিলতে পারে, স্বয়ং বাক্‌পতি রবীন্দ্রনাথের কবিতা-রচনার আর কবিতা-প্রকাশের সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথের আর শ্রীনন্দলালের শিল্পসৃষ্টি যেন গঙ্গা-যমুনা দো-রঙ্গা দুটি স্রোতোধারা ; দূর দুর্গম

গিরিকন্দর থেকে বয়ে এসে একদা মিলেছিল শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতীর পুণ্য সারস্বত-সঙ্গম-মহাতীর্থে, —যেখানে আগত ও অনাগত অসংখ্য নরনারী স্নান সমাপন ক'রে ধন্য হয়েছেন এই কালে, আর ধন্য হয়ে যাবেন কালে-কালান্তরে। —নয়নভুলানো একটি আশ্রমিক পরিবেশে তাদের প্রাণের আরাম মনের আনন্দ আর আত্মার শান্তির প্রত্যাশায়, সত্য শিব সুন্দরের মহান্ আদর্শকে চির-অম্লান রাখার জন্যে রবীন্দ্রনাথ আর নন্দলালের প্রতীকে জেগে রইল, সেকালের এক মহা ঋষির তন্দ্রাহারা দুটি স্নেহ-চোখ।

॥ শ্রীনন্দলালের অঙ্কিত চিত্রপঞ্জী (১৯০০-১১) ॥

(মূল কড়চা ও স্কেচ্‌বুক অবলম্বনে সঙ্কলিত। আচার্য শ্রীনন্দলাল-কথিত চিত্র-বিবরণ সম্বলিত, শ্রীবিশ্বরূপ বসু কর্তৃক অনুমোদিত। বলা বাহুল্য, এ তালিকা এখনও সম্পূর্ণ করা গেল না। —২২-৮ ১৯৬৫)

১৯০০ : বীণাকর্ণ-চূড়াকর্ণ ও মূষিককথা

১৯০১।২ ডোরা, ড্যাফোডিল্‌স্‌, লুসি গ্রে, হরিণ লাফিয়ে পড়ে ইত্যাদি

১৯০৩ : কয়েকটি বিলিতী ছবির কপি

১৯০৪ : মহাশ্বেতা

১৯০৫ : গণেশ, গণেশ

১৯০৬ : সিদ্ধার্থ কোলে হাঁস নিয়ে বসে আছেন, গাছ, দুটি হাঁস, পদ্ম, একটি প্যানেল, হনুমান, হাঁস, সরস্বতী

১৯০৭ : দশরথের অন্তিমশয্যা, কর্ণের সূর্যপূজা, ধৃতরাষ্ট্র সত্যভামা ও কৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, কুতুবমিনার থেকে (সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে হুমায়ুনের মৃত্যু), নিদ্রিতা, বুদ্ধ ও আহত হংস, বুদ্ধের গৃহত্যাগ, ঊর্মিলা, বঙ্গমাতা, কৈকেয়ী ও মন্থরা, বেহুলা-লখিন্দর, সতী (সহমরণের), রতনচূড়, পদ্মিনী (খসড়া), শিব-সতী (সতীর দেহত্যাগ)

১৯০৮ : বেতালপঞ্চবিংশতি, একটি পোর্ট্রেট্‌, নকল বুঁদী, শ্রীচৈতন্য গরুড়স্তম্ভতলে

১৯০৯ : গান্ধারী ও কুন্তী, দোহন (মূল), নৌকাবিহার, সাবিত্রী ও যম, ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা, তারা, শিবের তাণ্ডবনৃত্য, পদ্মিনী ও ভীমসিংহ, দময়ন্তীর স্বয়ংবর, তীর্থযাত্রী, দীক্ষা, চৈতন্যের জন্ম আরব্য-উপন্যাস-কথন, কর্ণ

১৯১০ : অগ্নিদেবতা, অহল্যা-উদ্ধার, অন্নপূর্ণা ও শিব, ইন্দিরা (কালাদীঘির পাড়ে), জতুগৃহদাহ, জগাই-মাধাই, কালী, রাধিকা, হিমালয়ের শিব, শ্রীকৃষ্ণ

১৯১১ : একলব্য, কুরু-পাণ্ডবের অস্ত্র-পরীক্ষা, হরিশ্চন্দ্র, ষষ্ঠীপূজা, কলসীকাঁখে, ডাকহরকরা, পৌষপার্বণ, জীবন ও মৃত্যু, তালপাতার

বাঁশী, রামায়ণের কুড়িখানি পট : দশরথের কোলে রামচন্দ্র, কৌশল্যার কোলে রামচন্দ্র, বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণের তাড়কাবধে যাত্রা, অহল্যা —উদ্ধারের পরে রামচন্দ্রকে প্রণাম করছেন, হরধনুভঙ্গের পরে শ্রীরামচন্দ্রকে সীতার মাল্যদান, পরশুরাম পরাজয়, গঙ্গাপারঘাটে গুহক কর্তৃক শ্রীরামচন্দ্রের পাদ-প্রক্ষালন, পঞ্চবটীতে সীতা, রাম ও লক্ষ্মণ, মারীচ মৃগের পশ্চাদ্ধাবন —কুটিরে সীতা একাকিনী, মায়ামৃগবধ ও সীতাহরণ, জটায়ু ও রাম-লক্ষ্মণ, বৃদ্ধা শবরীর প্রেম, বালি, সুগ্রীব ও রামচন্দ্র, সুগ্রীব ও রাম-লক্ষ্মণ, সীতাস্মরণ, সমুদ্রের নিকট রামের ধর্ণা, সেতুবন্ধ বা সমুদ্রশাসন, ইন্দ্রজিৎবধ, বানর-কটক সমেত শ্রীরামচন্দ্রের লঙ্কাযুদ্ধ, যুদ্ধান্তে সীতাসঙ্গে লঙ্কাপ্রবেশ, কাবুলিওয়ালা, কৃষক, খেলা, বিয়ের কনে, শুকপাখী (রাজপুত), যশোধারা, জাতক-কাহিনীর প্রেক্ষাপটে নীলপদ্মহাতে গৌতম, যশোধারা ও রাহুল, একটি বিচ্ছিন্ন টুকরা (ভগ্নদূত), একজন সৈনিকের মুখ, শ্বেতবোধিসত্ত্ব, ঢাকবাজানো (গুহা ১, অজন্তা), হাতীধরা, মদ্যপান (গুহা ১৭, অজন্তা), জলে স্থলে ও বাতাসে আনন্দোচ্ছ্বাস, পার্থসারথি, কৃষ্ণ ও রাধা, মহাদেব।

॥ চিত্র-পরিচয় (১৯০০—১১) ॥

১৯০০ : বীণাকর্ণ-চূড়াকর্ণ ও মূষিককথা, রঙিন, (আগে দেখুন);

১৯০১।২ : ডোরা, রঙিন, (আগে দেখুন);

ড্যাফোডিল্‌স্‌, ঐ, ঐ;

লুসি গ্রে ঐ, ঐ;

হরিণ লাফিয়ে পড়া, ঐ ঐ;

১৯০৩ : কয়েকটি বিলিতী ছবির কপি, প্যাস্টেল ড্রয়িং (ঐ)।

১৯০৪ : মহাশ্বেতা, আ. ৩৪½"×১৬½", কার্টিজ পেপার, রঙিন, এটর্নী অজিত ঘোষ নিয়েছিলেন। (আগে দেখুন)। একটি মেয়ে বসে আছে। তার হাতে বীণা আছে কিনা মনে পড়ছে না।

১৯০৫ : গণেশ, টেম্পারা, কাপড়ের ওপর হালকা রঙে আঁকা, গুরু

অবনীন্দ্রনাথকে আমার প্রথম অর্ঘ্য ;

গণেশ, স্কেচ্ এ্যাড্মিশন্ টেস্ট্ (আগে দেখুন)। পেন্ এ্যাণ্ড্ ইঙ্ক্। ব্যাস ২ ইঞ্চি।

১৯০৬ ঃ সিদ্ধার্থ কোলে হাঁস নিয়ে বসে আছেন, ৭"×৬", বাণীপুরের বাড়িতে ছিল. (আগে দেখুন);

গাছ, রঙ্গিন. বালির কাগজ, টাচের কাজ ;

দুটি হাঁস, আ. ১২"×৯", বালির কাগজ, টাচের কাজ, আ. নিজ-সংগ্রহ ;

পদ্ম, রঙ্গিন. বালির কাগজ, টাচের কাজ ;

একটি প্যানেল, মনে পড়ে না—৪-৮-১৯৬৫ ;

হনুমান, রঙ্গিন. বালির কাগজ, টাচের কাজ ;

হাঁস, রঙ্গিন. পাতলা বালির কাগজ. টাচের কাজ ;

সরস্বতী, প্রিণ্ট আছে বোধ হয়। মূল্য ২০ টাকা। (আগে দেখুন) ;

১৯০৭ ঃ দশরথের অন্তিমশয্যা (-বিলাপ) আ. ১৮"×১২", ব্রাউন লাইন. ওয়শ। হয়তো মঠে আছে, সিস্টার নিয়েছিলেন। মূল্য ৭৫ টাকা, (আগে দেখুন)। এই দশরথ হলেন শেষ বয়সের অসুস্থ প্রসন্নবাবুর মতো। দেওয়ালে ফ্রেস্কো দেখা যাচ্ছে —গঙ্গাবতরণ-টতরণ হ'তে পারে।

কর্ণের সূর্যপূজা, ৮"×৬", কার্টিজ পেপার, ওয়শ. গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর-সংগ্রহ। কর্ণ সূর্যপূজা করছেন, পায়ের কাছে বর্ম-টর্ম সব খুলে রেখেছেন. অরুণোদয় হচ্ছে আকাশে। গঙ্গার ধারায় দাঁড়িয়ে পুজো করছেন। এটি প্রথম ছবি কর্ণের ওপর। আর্টস্কুলে যাবার পরেই করা হয়। ওয়শ দিয়ে কিভাবে ছবি করতে হয়, অবনীবাবু এতে প্রথম দেখিয়ে দিয়েছিলেন। প্রিণ্ট্ আছে রামানন্দবাবুর এ্যালবামে। সেকালের মূল্য ৭৫ টাকা। (আগে দেখুন)।

ধৃতরাষ্ট্র, প্রিণ্ট্ আছে। মূল্য ৭৫ টাকা। (আগে দেখুন)। দাদাশ্বশুর প্রসন্নবাবু শেষের দিকে সব সময়ে বেঁকে ব'সে থাকতেন। তাঁর আদল আছে এই ছবিতে —১৪-৭-১৯৬৫।

সত্যভামা ও কৃষ্ণ, হদিস নাই। মূল্য ২৫ টাকা। মেয়ে মানুষের পায়ে হাত-দেওয়া পুরুষের ছবি করেছিলুম। ছবিটি দেখে সিস্টার



কৈকেয়ী ও মন্থরা - নন্দলাল, অবনীন্দ্রনাথের সংযোজন—মন্থরা

বকলেন। আর রিভাইজ করিনি।—১৪-৭ ১৯৬৫।

স্বামী বিবেকানন্দ, হয়তো মঠে আছে। স্বামীজী বসে আছেন, পাশ দিয়ে গঙ্গা বয়ে যাচ্ছে। সিস্টার যেমন আইডিয়া দিয়েছিলেন সেইভাবে করা। আ. ১৮"×১২", মূল্য ২৫ টাকা (আগে দেখুন);

কুতুবমিনার থেকে, সিঁড়ি থেকে হুমায়ুন পড়ে যাচ্ছেন —এই দৃশ্য (আগে দেখুন); আ. ১৮"×১২" ; হদিস নাই ;

নিদ্রিতা, রঙ্গিন। আর কিছু মনে নাই। —৪-৮-১৯৬৫ ;

বৃদ্ধ ও আহত হংস, বুদ্ধের পা গোল ক'রে এঁকেছিলুম বলে হ্যাভেল আর অবনীবাবুর তর্ক, (আগে দেখুন) ;

বুদ্ধের গৃহত্যাগ প্রিণ্ট্ আছে, মনে নাই ;

উর্মিলা, এঁকেছিলুম বটে। হদিস নাই, (আগে দেখুন) ;

বঙ্গমাতা, একহাতে কৃপাণ, অন্য হাতে বরাভয়। মনে নাই (আগে দেখুন) ;

কৈকেয়ী ও মন্থরা, আ. ১৪"×১২", কার্টিজ পেপার, ওয়শ, মূল্য ১৫০ টাকা (আগে দেখুন)। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর-সংগ্রহ। কৈকেয়ী রাগ করে বসে আছেন, পিছনে মন্থরা মন্ত্রণা দিয়ে চলে যাচ্ছে। আমি কেবল করি কৈকেয়ীর ছবি। পিছনে মন্থরা এঁকে দিয়েছিলেন অবনীবাবু —তাঁদের বাড়ির বুড়ী দাসীর টাইপে। 'কৈকেয়ীর শাড়ীর পাড়ের ঢেউ-খেলানো বক্ররেখায় যেন তাঁহার মানসিক আন্দোলনের বাহ্যসূচনা আমরা দেখিতে পাইতেছি'। —লোকে এ-কথা বললেও আমি কিন্তু ভেবে আঁকিনি ; ঐ রকম হয়ে গেছে। চ্যাটার্জীর এ্যালবামে প্রিণ্ট্ আছে। তখন ক্রোম্-ইয়োলো বিলিতী রং ব্যবহার করা হতো। কিন্তু ও রং পছন্দ হলে কি হয়, দেখা গেল, কিছু দিন বাদে কৈকেয়ীর ফর্সা রং কালো হয়ে গেছে। 'সতী'রও ঐ দশা হয়। 'কৈকেয়ী' জাপানী কাঠখোদাই-পদ্ধতিতে ছাপা হয়েছিল জাপানে।

বেহুলা-লখিন্দর, মূল্য ২৫ টাকা, (আগে দেখুন)। প্রবাসীতে প্রিণ্ট্ হয়েছিল কিনা মনে নাই।

সতী (সহমরণের), ১২"×৭½", কন্‌টিনিউয়াস কার্টিজ পেপার,

ওয়শ, important plate, মূল্য ৬০ টাকা, (আগে দেখুন)' অবনীবাবু কিনেছিলেন। জাপানে প্রিন্ট্ হয়েছিল। সোসাইটি করিয়েছিলেন। ওরিজিন্যাল থেকে পরে কপি করেছিলুম। হাতীবাগানের বাড়িতে প্রথম দফায় গোড়ার দিকে ৪নং থাকার ঘর —দক্ষিণদিকের ঘরে খসড়া করেছিলুম। প্রবাসী ১৩১৫, জ্যৈষ্ঠ, মডার্ণ রিভিউ ১৯০৮।

রতনচূড়, হাতের গহনা, স্কেচ্, হদিস নাই।

পদ্মিনী, (খসড়া), আগে দেখুন।

শিব-সতী (সতীর দেহত্যাগ), ২০"×১৫½", কন্‌টিনিউয়াস কার্টিজ পেপার, ওয়শ, অবনীবাবুর সংগ্রহে ছিল। এখন কার্টিজ-পরিবারে থাকতে পারে। এটা ওরিজিন্যাল (৯"×৭") থেকে বড়ো করে কপি করা। শিব দক্ষযজ্ঞে গিয়ে মৃত সতীকে কোলে ক'রে নিয়ে বসে আছেন। প্রবাসী ১৩১৯, মাঘ। এই ছবির যখন ড্রয়িং করি অবনীবাবু দেখে বললেন, —'শিবের হাতটা যেন বড় হয়ে গেল'। হাতটা অন্যরকমভাবে রাখলেও ভাবটা পালটে যাবে বলে, যেমন ছিল সেই রকম রাখতে বললেন। হাতীবাগানের বাড়িতে প্রথম দফা গোড়ার দিকে ৪নং থাকার ঘর —দক্ষিণদিকের ঘরে খসড়া করেছিলুম। ঐ ঘরের বারান্দাটি ভাঙ্গা ছিল। ওখানেই আলেয়া ভূত দেখেছিলুম।

১৯০৮ঃ বেতালপঞ্চবিংশতি, ৯"×৮", আ. প্রফুল্লনাথ ঠাকুর-সংগ্রহ মরা পিঠে নিয়ে রাজপুত্তুর যাচ্ছে, হাতে তলোয়ার আছে মডার্ণ রিভিউ ১৯০৮ জুন, চিত্রপরিচয় পৃ ৫৫৭;

একটি পোর্ট্রেট, গাঙ্গুলীর স্ত্রীর পোর্ট্রেট্। ভারী সুন্দরী ছিলেন দেবদেবীর চেহারা আঁকা এই রকম আদর্শ থেকেই হয়।

নকল বুঁদী, ১০"×৭½", নেপালী মাউন্টেড্ পেপার, টেম্পেরা, গুরুদেবে কবিতার আইডিয়া নিয়ে আঁকা। ছবিটি চুরি হয়ে গেছলো পৃথ্বী সিং নাহারদের ম্যুজিয়মে পরে আমি দেখতে পেয়েছিলুম

শ্রীচৈতন্য গরুড়স্তম্ভতলে, ১৫½"×৯", কনটিনিউয়াস কার্টিজ পেপার, ওয়শ বর্ধমানরাজ কিনেছিলেন —মূল্য ১০০০ টাকা। পুরীতে বেড়াে



বেতালপঞ্চবিংশতি - নন্দলাল

গিয়ে গরুড়স্তম্ভ দেখে আঁকতে ইচ্ছে হলো।

১৯০৯ ঃ গান্ধারী ও কুন্তী, ৬"×৫", পাতলা বিলিতী ওয়াট্‌ম্যান কাগজ, ওয়াটার কালার, অবনীবাবু কিনেছিলেন। কুন্তী ও গান্ধারী বারান্দায় বসে মক্-ফাইটে কর্ণ প্রভৃতির আসার কথা গান্ধারী কুন্তীকে জানাচ্ছেন। প্রবাসী ১৩১৫, চৈত্র; মডার্ণ রিভিউ ১৯০৯।

দোহন, (মূল), ৫½"×৪", ওয়াট্‌ম্যান পেপার, ওয়াশ, অবনীবাবু কিনেছিলেন। অলকেন্দ্রনাথের বিয়ের সময়ে হাতীবাগানের বাড়িতে অবনীবাবু নেমন্তন্ন করতে গিয়ে, ছবিটি দেখে বললেন,—'আমি এটি কিনে নিলুম।' এটা করবার আগে অবনীবাবুর কাছে একটা গল্প শুনেছিলুম। অবনীবাবু মুঙ্গেরে 'পীরপাহাড়ে' যখন বেড়াতে যান, তখন গ্রামের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে, একদিন একটি ঘরের ভেতর থেকে দুধ দোয়ার শব্দ শুনতে পান। সেই আইডিয়া তাঁর কাছে শুনে আমি ছবি করলুম। অবনীবাবুর আঁকা আর হলো না। এই ছবিটিরই পরে (১৯৪২) নাম হয়েছে 'সুজাতা'। কপিটি নিজ-সংগ্রহ। ছবি হলো —একটি মেয়ে গাই দুইছে।

নৌকাবিহার, ২১"×১৫", কার্টিজ পেপার, ওয়াশ, নিজ-সংগ্রহ। প্রিন্ট হ'য়েছে। কৃষ্ণ নৌকোয় বসে আছেন, দু-জন সখী উঠে বসেছেন, রাধিকাকে ধ'রে কৃষ্ণ তুলছেন।

সাবিত্রী ও যম, ১২"×৬½", কনটিনিউয়াস কার্টিজ পেপার, ওয়শ, অবনীবাবু কিনেছিলেন। জাপানে প্রিন্ট্ করানো হয়েছিল।

ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা, ১৬"×১০", কন্‌টিনিউয়াস কার্টিজ পেপার, ওয়শ, টেম্পেরা, অবনীবাবু কিনেছিলেন। দেবব্রত কালো রঙের দাসরাজের খড়্গে হাত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করছেন। দাসরাজ গালে হাত দিয়ে বিস্মিত হচ্ছেন। ভীষ্মের পিছনে বিবাহবেশে মৎস্যগন্ধা সত্যবতী দাঁড়িয়ে আছেন, চারদিকে পরিচারিকাবর্গ। দাসরাজের চেহারাটা অজন্তার একটি চেহারার মতো। পরিবেশটিও অজন্তার। তখনও কিন্তু অজন্তা যাওয়া হয়নি। গ্রিফিথ সাহেবের বই দেখে মশগুল।

শিবের তাণ্ডবনৃত্য, ১১"×৮", কনটিনিউয়াস কার্টিজ পেপার, ওয়শ, বর্ধমানের মহারাজা কিনেছিলেন। হাতীবাগানের বাড়িতে প্রথম

দফা গোড়ার দিকে ৪নং থানার ঘর —দক্ষিণদিকের ঘরে খসড়া করেছিলুম। এই ঘরেরই বারান্দাটি ভাঙা ছিল। ওখানেই আলেয়া ভূত দেখেছিলুম —(চিত্রপরিচয় আগে দেখুন); প্রবাসী ১৩১৬, বৈশাখ।

পদ্মিনী ও ভীমসিংহ, আ. ৭"×৫২/১", ওয়শ, ক্যালকাটা-ম্যুজিয়ম্-সংগ্রহ। প্রবাসী ১৩১৬, জ্যৈষ্ঠ। প্রথম মূল ছবিটি কিনেছিলেন থর্ণটন সাহেব (আগে দেখুন)।

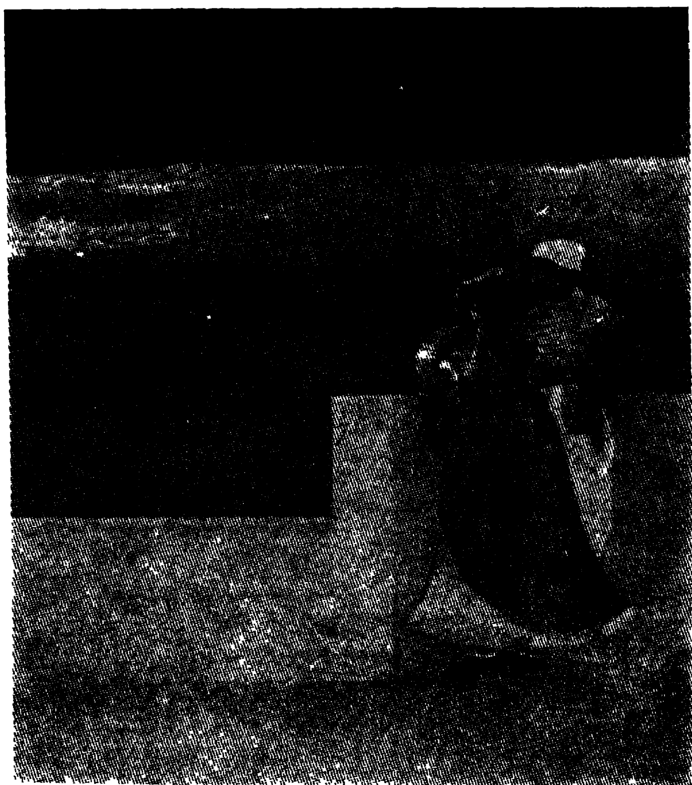
দময়ন্তীর স্বয়ম্বর, ১৪"×৯১/২", কনটিনিউয়াস কার্টিজ পেপার, ওয়শ, অবনীবাবু কিনেছিলেন। এই ছবিটি দেখে অবনীবাবু খুব খুশি হয়েছিলেন। বলেছিলেন, —'এ ছবিতে যেন চন্দনের গন্ধ পাচ্ছি'। প্রবাসী ১৩১৬, আষাঢ়; (আগে দেখুন)। 'তখনও অজন্তা যাইনি'। —৪-৮-১৯৬৫।

তীর্থযাত্রী, আ. ৮"×৬" কার্টিজ পেপার, ওয়শ। কান-বন্ধ নেপালী টুপি-পরা একজন তিব্বতী লোক, বরফের পাহাড়ের ধারে মানস-সরোবরের কিনারে সকালে বসে আরাধনা করছে; পাশে কমণ্ডলু আর পুজোর সামগ্রী। প্রিণ্ট্ আছে 'আরাধনা' নামে। একজন সাহেব কাশ্মীর সম্পর্কে বই লিখেছেন। তাতে অবনীবাবুর ছবি আছে। আর আমার এই ছবিটাও আছে। তাতে অনেক ফটোও আছে। —৪-৮-১৯৬৫।

দীক্ষা, পোস্টকার্ড সাইজ, ৬"×৪", কার্টিজ পেপার, ওয়াটার কালার। গুরু শিষ্যকে মন্দিরের ভেতর দীক্ষা দিচ্ছেন। 'রাজকাহিনী' থেকে নেওয়া। 'হাতে-খড়ি' নামটা ঠিক নয়। —৭-৭-১৯৬৫।

চৈতন্যের জন্ম, আ. ৪৮"×৩৬", ডাক্তার এ. এন মুখার্জীর (৬নং রাজাবাগান স্ট্রীট্) সংগ্রহে ছিল। পড়শী ডাক্তার হিসেবে তিনি অসুখে-বিসুখে আমাদের অনেক উপকার করতেন। বর্তমানে এটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ-ম্যুজিয়মে আছে।

আরব্য-উপন্যাস-কথন, ওয়শ, মলাট। মলাটের জন্যেই করেছিলুম। রঙিন ছবি। রামানন্দবাবুর বই। তিনিই ছাপিয়েছিলেন। —১৮-৮-১৯৬৫।



পদ্মিনী ও ভীমসিংহ - নন্দলাল

কর্ণ, ৭"×৬", আলাদা ছবি।

৯১০ ঃ **অগ্নিদেবতা**, ৭½"×৫½", ওয়াশলী, টেম্পেরা, অবনীবাবুর সংগ্রহে ছিল। উমাচরণ পণ্ডিতমশায় তখন শ্লোক দিয়েছিলেন। হাতীবাগানে তাঁর টোল ছিল। আর্টস্কুলে সে-সময়ে একজন ভালো এন্‌গ্রেভারকে দিয়ে অবনীবাবু এই ছবিটির রঙ্গিন উড্‌-এন্‌গ্রেভিং করিয়েছিলেন। ওকাকুরা এই ছবি দেখে বলেছিলেন, —ধ্যান অনুযায়ী ঠিক হয়েছে। কিন্তু অগ্নির যে বিশেষত্ব অর্থাৎ দাহিকাশক্তি তার আঁচটা গায়ে লাগছে না তো', (আগে দেখুন)।

অহল্যা-উদ্ধার, ৮½"×৬½", কার্টিজ পেপার, ওয়শ, রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুর-সংগ্রহ। বিশ্বামিত্র রাম লক্ষ্মণ দাঁড়িয়ে আছেন; সবে পাথর ভেঙ্গে উদ্ধার পেয়ে অহল্যা জোড়হাত ক'রে বসে আছেন। প্রবাসী ১৩১৭, বৈশাখ।

অন্নপূর্ণা ও শিব, ১৬"×১০½", কার্টিজ পেপার, ওয়শ। ফ্রান্সের প্রদর্শনী থেকে কিনে নেন একজন রাশিয়ান, মূল্য ২০০০ টাকা। অন্নপূর্ণা ও শিব —শিব ভিক্ষা করছেন, অন্নপূর্ণা ভিক্ষা দিচ্ছেন। একজন নিঃস্ব হয়েছেন, একজন পূর্ণ করছেন। শিব নৃত্য করছেন, অন্নপূর্ণার হাতে একটি বাটিতে অমৃত আছে। পরে, এর কপি করি। সেটি আছে নিজ-সংগ্রহে। একটি পদ্মের ডাঁটির ওপর দুটি বিভিন্ন রূপ। 'ভারতী' (১৩২২) পত্রিকায় প্রিন্ট্‌ হয়েছিল জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় এই পরিচয়ে :— 'মৌনেরে ঘিরিছে গান, স্তব্ধেরে করেছে আলিঙ্গন সফেন চঞ্চল নৃত্য' —রবীন্দ্রনাথ। —হাতীবাগানের বাড়িতে প্রথম দফায় গোড়ার দিকে ৪নং থাকার ঘর। দক্ষিণদিকের ঘরে খসড়া করেছিলুম। ঐ ঘরেরই বারান্দাটি ভাঙ্গা ছিল। ওখানেই আলেয়া ভূত দেখেছিলুম। প্রবাসীতে প্রথম ছাপা হয়েছিল।

ইন্দিরা, (কালাদীঘির পাড়ে), ৭"×৭", কার্টিজ পেপার, ওয়শ, অবনীবাবুর সংগ্রহ। ইন্দিরা কালাদীঘির পাড়ে ডুলিতে বসে পর্দা ফাঁক করে দেখছে —বঙ্কিমবাবুর 'ইন্দিরা' বই থেকে করা। দ্বিতীয়বার ভারতে এসে ছবিটি দেখে ওকাকুরা বললেন, —'এক্সপ্রেশন্‌

খুব ভালো হ'য়েছে, কিন্তু কালারটা খুব ডার্টি হয়েছে —অর্থাৎ ফ্রেশ্‌ হয়নি'। প্রবাসীতে প্রিণ্ট হয়েছিল।

জতুগৃহদাহ. ১৯"×১২", কার্টিজ পেপার, ওয়শ, আমার করা দ্বিতীয় নকল, নিজ-সংগ্রহ। তৃতীয় নকল আছে ভাই দিয়ালদাস-সংগ্রহে। জতুগৃহদাহ হচ্ছে —কুন্তীকে ঘাড়ে ক'রে নিয়ে যাচ্ছেন ভীম আর চার ভাই।

জগাই-মাধাই, আ. ৮"×৬", জাপানী, ওয়াশলী, রঙ্গিন খয়েরী লাইনে করা। জগাই-মাধাই কাঁধ ধরাধরি ক'রে বসে মদ খাচ্ছে, পাশে একটা মদ-তাড়ির ভাঁড় আছে, থেলো হুঁকোটা জগাইয়ের কোমরে আছে। সিস্টার নিবেদিতা জিগ্যেস করেছিলেন, জগাই মাধাইয়ের চেহারা কোথায় পেলে? আমি বললুম, —'গিরিশবাবুর চেহারা দেখে জগাই মাধাইয়ের কথা মনে হলো।' (আগে দেখুন)। প্রবাসী, ১৩১৭ কার্ত্তিক; চিত্রপরিচয় পৃ ৯৭ঃ 'শারীর-সংস্থানের দৃঢ় রেখা, হাজার রেখায় কল্পিত চুল, মাথায় বাঁধা নামাবলীর পাগড়ী, রেখার দ্বারাই ছায়া সুষমার সংসাধন, শিল্পীর দক্ষতার পরিচায়ক। অতসী কাঁচের ভেতর দিয়ে দেখলে এই মুখ দু'টির গঠনপারিপাট্য দেখে অবাক হ'তে হয়। শিল্পীর ভাবুকতা ও অন্তর্দৃষ্টির চমৎকার নিদর্শন।'

কালী. সিস্টার দেখে বললেন, —আরও উলঙ্গিনী হবে'। (আগে দেখুন)। সিস্টার বকলেন। আর আঁকিনি। ওটা কোথা আছে, জানিনি। —৭-৭-১৯৬৫।

রাধিকা, ৭½"×৫", টেম্পেরা, মোটা কাগজ। রাখাল মহারাজের পছন্দ হয়নি। আর করিনি। কোথা আছে মনে নাই।

হিমালয়ের শিব, বড়ো ছবি, ওয়শ, কার্টিজ পেপার। হিমালয়ের চূড়ায় শিবের মুখ। মডার্ণ রিভিউ, ১৯২২। সিস্টার ছবিটি দেখে খুব খুশি হয়েছিলেন (আগে দেখুন)।

শ্রীকৃষ্ণ, তাম্রফলকের ওপর লাইন ড্রয়িং। (পরে দেখুন)।

১৯১১ঃ একলব্য, ৭"×৫", কার্টিজ পেপার, মূল্য ১৫০ টাকা, ওয়শ, বর্ধমানমহারাজ-সংগ্রহ। জঙ্গলে একটা নিমগাছের তলায় পাহাড়ের

গায়ে দ্রোণের মূর্তি। তাঁর সামনে বাণ রাখা আছে। সেখান থেকে একলব্য শিক্ষা করছে আপনাআপনি। —সিস্টারের Indian Myths বই-এ ছাপা আছে।

কুরুপাণ্ডবের অস্ত্রপরীক্ষা ; আ. ৮"×৭", ওয়াশলী, টেম্পেরা, অবনীবাবুর সংগ্রহ। দ্রোণ বাণ-শিক্ষার পরীক্ষা নিচ্ছেন। অর্জুন তীর ফিঁকছেন। দ্রোণের রং কালো ছিল। দক্ষিণী লোক ছিলেন বোধ হয়। মহাভারতের রূপ-বর্ণনা থেকে পেয়েছিলুম। এর আগে দ্রোণকে কেউ কালো করেনি। তখনকার সংস্কার ভেঙে দিলুম। এত বড়ো লোক, তাঁর রং কালো হবে! এতে লোকে চটেছিল খুব। সিস্টার আর কুমারস্বামীর Myths of Hindus and Buddhists বই-এর জন্যে আঁকা।

হরিশ্চন্দ্র, ৭½"×৫", কার্টিজ পেপার, ওয়শ. প্রফুল্লনাথ ঠাকুর-সংগ্রহ।

ষষ্ঠীপূজা, ৭"×৫", পাতলা ওয়াট্‌ম্যান পেপার, ওয়শ। মা একটি ছেলেকে ও একটি মেয়েকে নিয়ে ঠাকুরকে প্রণাম করাচ্ছেন। বোসপাড়া লেনে সিস্টার নিবেদিতাকে এই ছবিটা দেখাতে উনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, —'তোমার বিয়ে হয়েছে'? আমি বললুম, —'আমার এক ছেলে আর এক মেয়ে'। (আগে দেখুন) প্রবাসী ১৩১৮, মাঘ।

কলসীকাঁখে, ৮"×৫½"। ছাপা হয়নি —৭-৭-১৯৬৫।

ডাকহরকরা, আ. ৭"×৬", কার্টিজ পেপার, ওয়শ, গুরুদেবের ডাকঘরকে আশ্রয় করে আঁকা। (প্রবাসীতে মুদ্রিত)।

পৌষপার্বণ, আ. ৬"×৬", রঙিন, ওয়শ। পরে উমার তপস্যা দেখুন।

জীবন ও মৃত্যু, ১৪"×১০", ওয়াটার কালার। মেঘের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের দুটি মূর্তি। পুরুষটির হাতে ধরা আধখানি চাঁদ। পুরুষটি সম্ভবতঃ শিব।

তালপাতার বাঁশী, ওয়শ। সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাই প্রমোদাবাবুর সংগ্রহ। অবনীবাবুর ছোট ছেলেকে প্রথমে করে দিয়েছিলুম। একটি মেয়ে তালপাতার বাঁশী তৈরী করছে; ঝুড়িতে আরো অনেক রাখা আছে।

রামায়ণের কুড়িখানি লম্বাটে ছোট পট: ১৯১২-১৩ সালেও এই পট আঁকা হয়, প্রবাসী ১৩১৯ ইত্যাদি দেখুন।

দশরথের কোলে রামচন্দ্র, অজন্তা শৈলীর অনুবৃত্তি। টেম্পেরা, কস্তুরভাই লালভাই-সংগ্রহ।

কৌশল্যার ক্রোড়ে রামচন্দ্র, ঐ, ঐ, ঐ

বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রামলক্ষ্মণের তাড়কা-বধে যাত্রা, ঐ, ঐ, ঐ

অহল্যা —উদ্ধারের পরে রামচন্দ্রকে প্রণাম করছেন, ঐ, ঐ, ঐ

হরধনুভঙ্গের পরে শ্রীরামচন্দ্রকে সীতার মাল্যদান, ঐ, ঐ, ঐ

পরশুরাম পরাজয়, ঐ, ঐ, ঐ

গঙ্গাপারঘাটে গুহক কর্তৃক শ্রীরামচন্দ্রের পাদপ্রক্ষালন, ঐ, ঐ, ঐ

পঞ্চবটীতে সীতা, রাম ও লক্ষ্মণ, ঐ, ঐ, ঐ

মারীচ মৃগের পশ্চাদ্ধাবন —কুটিরে সীতা একাকিনী, ঐ, ঐ, ঐ

মায়ামৃগ বধ ও সীতাহরণ, ... ঐ, ঐ, ঐ

জটায়ু ও রামলক্ষ্মণ, ... ঐ, ঐ, ঐ

বৃদ্ধা শবরীর প্রেম, ... ঐ, ঐ, ঐ

বালি সুগ্রীব ও রামচন্দ্র, ... ঐ, ঐ, ঐ

সুগ্রীব ও রামলক্ষ্মণ, ... ঐ, ঐ, ঐ

সীতাস্মরণ, ... ঐ, ঐ, ঐ

সমুদ্রের নিকট রামের ধর্ণা, ... ঐ, ঐ, ঐ

সেতুবন্ধ বা সমুদ্রশাসন, ... ঐ, ঐ, ঐ

ইন্দ্রজিৎ বধ, ... ঐ, ঐ, ঐ

বানরকটক সমেত শ্রীরামচন্দ্রের লঙ্কাযুদ্ধ ... ... ঐ, ঐ, ঐ

যুদ্ধান্তে সীতাসঙ্গে লঙ্কাপ্রবেশ ... ... ঐ, ঐ, ঐ

তারা, ৯"×৬", টেম্পেরা, ছোট ছবি। ধ্যানের জন্যে করে দিয়েছিলুম বাঁকুড়ার এক সাধুকে। (পরে দেখুন)।

কাবুলিওয়ালা, ৭"×৫", ওয়াশলী, ওয়াশ, প্রবাসী অফিসে ছাপার পরে মূল আর ফিরে আসেনি। প্রিণ্ট প্রবাসী, ১৩১৯। রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলিওয়ালা ও মিনু।'

কৃষক, লাইন ড্রয়িং, প্রবাসীতে মুদ্রিত।



রবীন্দ্রনাথের কাবুলিওয়ালা ও মিনি - নন্দলাল

খেলা, আ. ৬"×৬", লাইন ড্রয়িং। নরেন্দ্রনাথ ঠাকুর-সংগ্রহে ছিল। প্রবাসীতে মুদ্রিত।

আশীর্বাদী, রঙিন, ওয়শ, হ্যাণ্ড্‌মেড পেপার। মা ও মেয়ে। বিবাহের পরে আশীর্বাদী করছেন। প্রবাসীতে প্রিন্ট্‌ আছে।

বিয়ের কনে, কোলে করে নিয়ে যাচ্ছে শাশুড়ী (আগে দেখুন)।

শুকপাখী, রাজপুত কপি। একটি খাঁচা-ছাড়া শুকপাখীকে ধরবার জন্যে একটি মেয়ে খাবার পাত্র এগিয়ে দিয়েছে।

যশোধারা, অজন্তা-কপি। গুহা ১।

জাতক-কাহিনীর প্রেক্ষাপটে নীলপদ্ম-হাতে গৌতম, আ. ৬"×৪", কার্টিজ পেপার, ওয়শ, অজন্তা-কপি। গুহা ১।

যশোধারা ও রাহুল, ৪"×৬", কনটিনিউয়াস কার্টিজ পেপার, ওয়শ, অজন্তা-কপি। গুহা ১।

একটি বিচ্ছিন্ন টুকরা, 'ভগ্নদূত' নামে প্রবাসীতে মুদ্রিত। ঐ, ঐ

একজন সৈনিকের মুখ, ঐ, ঐ

শ্বেতবোধিসত্ত্ব, ঐ, ঐ

ঢাকবাজানো, একটি মেয়ে ঢাক বাজাচ্ছে, ঐ, ঐ

হাতীধরা, অজন্তা কপি। গুহা ১৭।

মদ্যপান, ২৪"×২৪", কনটিনিউয়াস কার্টিজ পেপার, ওয়শ, নিজ-সংগ্রহ। একজন কালো রঙের রাজা সুন্দরী রাণীকে কোলে নিয়ে বসে আছেন। হাতে মদের পেয়ালা। অজন্তা কপি। গুহা ১৭।

জলে, স্থলে ও বাতাসে আনন্দোচ্ছ্বাস, (সুবৃহৎ প্রাচীর চিত্র):

জলে আনন্দোচ্ছ্বাস, অজন্তার অনুকরণে আঁকা। Rejoicing in 'The Sea'

স্থলে ঐ, ঐ, Rejoicing in 'The Earth'

বাতাসে, ঐ, ঐ, Rejoicing in 'The Air'। কলকাতার ময়দানে, রাজা পঞ্চম জর্জকে সংবর্ধনা দেবার জন্যে যে মণ্ডপ তৈরী করা হয়েছিল তার অন্তর্সজ্জার জন্যে এই প্রাচীরচিত্রগুলি ব্যবহার করা হয়। পরে, এই ছবিগুলি ছিল সোসাইটির অফিস-ঘরে। —(পরে দেখুন)।

পার্থসারথি, ৩১"×২১", ওয়াট্‌ম্যান কার্টিজ পেপার, ওয়শ, অবনীবাবু কিনেছিলেন। এই ছবিটি যখন করি, ছবিটি নিয়ে শরৎ মহারাজের সঙ্গে দেখা করেছিলুম। তখন ছবিতে খুঁৎ ছিল। তাঁর কথায় সংশোধন করেছিলুম —(আগে দেখুন)।

কৃষ্ণ ও রাধা (দম্পতি), আ. ২৪"×১৮", কার্টিজ পেপার, ওয়শ। অজন্তার একটি কপি —স্ত্রী-পুরুষের, ১নং কেভে শ্বেতবোধি-সত্ত্বের পাশে আছে। ভুল নাম দিয়েছেন ওঁরা। মিসেস্ উড্‌রোফ্ কিনেছিলেন।

মহাদেব, ৩৬"×২৪", ওয়শ, কনটিনিউয়াস কার্টিজ পেপার। 'সতীর দেহত্যাগ' ছবির শিবের মুখ থেকে নিয়ে আলাদা বড়ো ক'রে করা। উড্‌রোফ্ সাহেব তখন তান্ত্রিক পুজোর জন্যে কিনেছিলেন। পরে আর একখানা কপি করি ইউসুফ মেহের আলীর অনুরোধে। —বললেন নন্দলাল ৭-৭-১৯৬৫ তারিখে।



খেলা • নন্দলাল

॥ নব্যভারত-শিল্পপ্রদর্শনী (১৯০৮-১২) ॥

অবনীন্দ্রনাথের আর নন্দলাল প্রমুখ তাঁর শিষ্যবর্গের ১৯০৭ সাল পর্যন্ত আঁকা ছবির পুরো প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছিল ১৯০৮ সাল থেকে। এই বিষয়ে প্রথম ও প্রধান উদ্যোগী হলেন ১৯০৭ সালের নবজাতক, কলকাতার The Indian Society of Oriental Art। নব্যবঙ্গের এই জাতীয়-চিত্রশিল্পধারায় কাজের অগ্রগতি সেকালে স্বদেশী-যুগের মনীষিগণ পর্যালোচনা ক'রে গেছেন বিশেষ আন্তরিকতার সঙ্গে। তাঁরা ভাবতেন, নব্যবঙ্গের আন্দোলনের মাধ্যমেই প্রকৃত সমাধান এসে যাবে আধুনিক শিক্ষিত ভারতের যত সব জটিল সমস্যার। নব নব সৃজনী-শক্তিতে এই ধারা ভারতের জাতীয় জীবনের একটা বিশেষ দিক আলোকিত করতে পারবে। প্রথম পাঁচটি প্রদর্শনীর বিবরণ মোটামুটি সংকলন করে দিচ্ছি সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদিত Dawn Magazine (1912) থেকে। —Modern Review-ও কিছু কিছু সংবাদ প্রকাশ করেছিলেন ১৯০৮ ও ১০ সালে। সে-ও এতে ধরা হলো। কুমারস্বামীর বিবরণও ধরা হয়েছে (Modern Review, 1911)।

১৯০৮ সাল থেকে প্রায় প্রতি বছরেই চিত্রপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা হতো। আমরা আট সাল থেকে বারো সাল পর্যন্ত পাঁচটি প্রদর্শনীর কথা পর পর বলছি। ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটীর উদ্যোগে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয় ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে। এর উদ্দেশ্য ছিল এই আন্দোলনের শুরু থেকে এই স্বল্প সময়ে এর যে অগ্রগতি হয়েছে তার পরিমাপ করা, আর জনসাধারণের সামনে নব্যবাঙ্গালার চিত্রশিল্পীদের শিল্পকর্ম তুলে ধরা।

প্রথম প্রদর্শনী ॥ ১৯০৭ সালের প্রদর্শনী হয়েছিল ১৯০৮ সালে কলকাতার গভর্ণমেণ্ট আর্টস্কুলে। ছবি সাজানো হয় আর্টস্কুলের দু'টি বড়ো হল-ঘরে। আর্টস্কুলের প্রাক্তন অধ্যক্ষ হ্যাভেল সাহেবের মোগল-চিত্রকলার সংগ্রহ রাখা হয়েছিল একটি হল-ঘরে। তিনি এগুলি সংগ্রহ করেছিলেন আর্ট-গ্যালারীর

জন্যে। এই সংগ্রহটির বিবরণ প্রদর্শনী-তালিকায় ধরা হয়নি। প্রদর্শনীর জন্যে বিশিষ্ট সংগ্রহ সব দ্বিতীয় হল-ঘরে রাখা হয়; এগুলির বিবরণ তালিকায় ধরা ছিল।

এই প্রদর্শনীতে সবচেয়ে আর বিশেষভাবে দেখবার ছিল অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আর তাঁর শিষ্যমণ্ডলীর চিত্রপট। এতে ছবি ছিল অবনীবাবুর শিষ্যবর্গের মধ্যে তাঁর দু'জন ছাত্র—শ্রীনন্দলাল বসুর, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের, আর অবনীবাবুর সহকর্মী লালা ঈশ্বরী প্রসাদের। —হল-ঘরের একটি দেওয়ালে রাখা হয়েছিল—এঁদের এই ছবিগুলি। বাকি তিনটি দেওয়ালে ছিল পুরাতন জাপানী, চীনা চিত্রাবলী, আর কিছু রঙিন প্রিন্ট্‌স্‌। ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে প্রদর্শনীর জন্যে ধার-নেওয়া ভারতীয় পুরাতন চিত্রাবলীও ছিল কিছু।

যামিনীপ্রকাশ গাঙ্গুলীর য়ুরোপীয় শৈলীতে আঁকা আধুনিক ভারতীয় চিত্রধারার এদেশী দৃশ্যাবলীও দেখানো হয়েছিল। নন্দলালের আঁকা 'সহমরণের সতী' আর 'সতীর দেহত্যাগ' এই প্রদর্শনীতেই দেখানো হয়। সুরেন গাঙ্গুলীর সুবিখ্যাত 'লক্ষ্মণসেনের পলায়ন'-চিত্রও দেখানো হয়েছিল এই সময়ে। কর্তৃপক্ষের বিচারে ওঁরা দু-জনে পাঁচশো ক'রে টাকা পুরস্কার পেয়েছিলেন এই ছবিগুলির ওপর।

দ্বিতীয় প্রদর্শনী ॥ সোসাইটীর ১৯০৮ সালের দ্বিতীয় প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয় ১৯০৯ সালে—সিমলায়। এই প্রদর্শনীতে নব্যবঙ্গ-চিত্র-সংগ্রহের অল্প-কিছু ধার নিয়ে ছবি দেখানো হয়েছিল মোট প্রায় ৪০ খানি। ছবির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল অবনীবাবুর 'ওমর খৈয়মের' চিত্রাবলী। তখন বিলাতের Studio আর্ট-ম্যাগাজিনের কর্তৃপক্ষ অবনীবাবুর আঁকা 'ওমর খৈয়মের' ছবি নিয়ে, চিত্রভূষিত ক'রে ফিট্‌জেরেল্ডের ইংরেজী 'ওমর খৈয়মে'র একটি বিশেষ সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন। এতে Pioneer মন্তব্য করেন:— প্রসিদ্ধ ইংরেজ শিল্পিগণ 'ওমর খৈয়ম' চিত্রভূষিত করেছেন, কিন্তু ঠাকুর মহাশয়ের চিত্রগুলি তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আর অনন্য। অবশ্য অবনীবাবুর ছবি সম্পর্কে এ শুধু তখনকার দিনের একটি পত্রিকার মন্তব্য নয়, এমন মন্তব্য তখন দেশে-বিদেশে সকল শিল্প-সমালোচকেরই। —রেখাঙ্কনে মনোহারিত্বে আধ্যাত্মিক মর্ম-বিশ্লেষণে,

অলৌকিক ব্যঞ্জনায়, আর রঙের সৌন্দর্যে এ হচ্ছে অতুলনীয়। উপরন্তু বোঝা যাচ্ছে, ভারতীয় শিল্পিগণ স্বদেশের পুরাতন শিল্প-ঐতিহ্যের অনুসন্ধান ক'রে, তার ওপর নিজেদের চিত্রপট রচনায় পটু। এবং এই ধারা বিলিতী ধারার থেকে একেবারে আলাদা, নিকৃষ্ট তো নয়ই। ভারতবর্ষে এযাবৎ যত শিল্পী 'সাউথ কেন্‌সিংটন'-পদ্ধতি অন্ধভাবে অনুসরণ ক'রে এসেছেন, য়ুরোপীয় কলা-সমাজে তাঁদের কেউ এ রকম বিস্ময় জাগাতে পারেননি। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের চিত্রাবলী বিলাতের মুখপত্রে অভিনন্দিত ও আলোচিত হয়েছে চরম শ্রদ্ধার সঙ্গে। এ ছাড়া, এই প্রদর্শনীতে যামিনীপ্রকাশ গাঙ্গুলীর ছবি দেখানো হয়েছিল। 'বর্ষা-সন্ধ্যা' ছবির জন্যে ১৯০৮ সালের 'ভাইসরয়-পুরস্কার' (The Modern Review, 1908, Sept. p. 269) পেয়েছিলেন তিনি।

অবনীবাবুর ছবি ছাড়া, প্রদর্শনীতে ক'টি নতুন ছবি দেখানো হয়েছিল —শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর আর স্বর্গত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের। এই দু-জন তাঁর সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র। এই বছরের নতুন একজন ছাত্রের ছবি দেখানো হয়েছিল, তিনি হলেন মহম্মদ হাকিম খান। পুরাতন মোগল-চিত্রকলার অনুসরণে তখন ইনি ক'টি বিশিষ্ট ছবি এঁকেছিলেন। —'সিমলায় এই দ্বিতীয় প্রদর্শনীতে আমি উপস্থিত ছিলুম'। —বললেন নন্দলাল ১৯৬৫ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী।

তৃতীয় প্রদর্শনী ॥ ১৯০৯ সালের প্রদর্শনী ১৯১০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে হয়েছিল কলকাতা-আর্টস্কুলের হল-ঘরে। কলকাতার কলাসমাজের কাজের প্রভূত অগ্রগতি দেখা গেল এই প্রদর্শনীতে। ১৯০৮ সালে আর্টস্কুলের চিত্রকর্ম দেওয়াল জুড়েছিল মাত্র একটি, আর এ-বছর ভ'রে ফেললে গোটা হল-ঘরটা।

আর ছবির কেবল সংখ্যাই এবারে বাড়েনি, আর্টস্কুলে চিত্রকরদের নতুন মুখও দেখা গেল ক'টি। এতে মনে হচ্ছিল, যেন একটি অমর, অবিচ্ছিন্ন ঐতিহ্যপরম্পরার আসন্ন প্রতিষ্ঠা অবধারিত। এই নবাগতদের মধ্যে রয়েছেন অসিতকুমার হালদার, বেঙ্কটাপ্পা, সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত; ঈশ্বরীপ্রসাদের দুই পুত্র —রামেশ্বর প্রসাদ আর নারায়ণ প্রসাদ।

এ ছাড়া আর্টস্কুলের বাইরে আরও দু-জন নতুন শিল্পীর অভ্যুদয় দেখা গেল —শ্রীঅর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় আর প্রিয়নাথ সিংহ। এঁরা ঠাকুর মহাশয়ের আর তাঁর শিষ্যবর্গের প্রায় অনুরূপ পদ্ধতিতেই কাজ করছিলেন।

এবারকার ভারতশিল্প-প্রদর্শনীতে দেখান হলো নতুন আর পুরানো দু'ধারাতেই আঁকা ছবি সব। পুরাতন সংগ্রহটি ধ্যানময় ভারতশিল্পের প্রতীক বলে মনে হচ্ছিল। সংগ্রহটি বড়ো নয়। তবু পাঁচশো বছরের পুরানো শিল্প-নিদর্শন সম্পর্কে কিছু ধারণা এ থেকে করা যেতে পারে। এই সব ছবির রঙের উৎকর্ষ সবাই স্বীকার করছেন। বেশির ভাগ ছবিই ছিল ধর্মাশ্রিত। কি কাঙড়া, কি কাশী, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ —সকল যুগের সকল ধারার সকল হিন্দু-চিত্রকরের মৌন চিত্রাবলীতে ভারতীয় আধ্যাত্মিক সত্তার মর্মকথাই যেন মুখর হয়ে উঠেছিল। মোগল লৌকিক চিত্রকলাও ছিল কিছু কিছু। তবে সেগুলি যেন মূল দেব-চিত্র-বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা বলে মনে হচ্ছিল।

'কৃষ্ণ বলরামের রাখালবেশে মথুরা প্রবেশ' ছবিতে রঙের আমেজ ছিল অদ্ভুত। পরিবেশ মোগল বা রাজপুত শহরের। রাখাল দু'টি যেন গ্রামের ছেলে। 'তপস্বিনী উমা সকাশে ব্রাহ্মণবেশী শিব', 'কৈলাস' —এই সব পুরনো ছবি। —এ সব দেখে মনে হলো, ছবিতে ঐতিহ্যগত আধ্যাত্মিক সাংকেতিকতা প্রবল থাকলেও, সেটা শিল্পকর্মের বন্ধনস্বরূপ হয়নি মোটেই। প্রকাশভঙ্গির সাবলীলতা দেখা যায় সর্বত্র। সাধারণ জীবন-চিত্রের ওপর যে এক ঝলক অপার্থিব আলো ঝলকিয়ে উঠেছে, তাতে যেন পৃথিবীর সকল শাস্ত্রকথার মর্মবাণী প্রকাশ হয়ে আছে। 'নারী-বেহারাবাহী শিবিকারোহী রাজা'র চিত্র অতি চমৎকার। নারী-বেহারাবাহী লোকটি আবার 'হুঁকা' খাচ্ছেন —এই পরিবেশ অলঙ্করণ হিসেবে এ-ছবিতে প্রশংসার দাবী রাখে।

সাদা রঙের বৈষম্য দেখিয়ে যামিনীপ্রকাশ গাঙ্গুলীর 'পদ্মানদী'র ছবি ঐতিহাসিক নজির সৃষ্টি করেছিল।

ভারতশিল্পের নবজাগরণের একটি বিশিষ্ট রূপ এই প্রদর্শনীতে দেখা গেল। বারো জনেরও বেশি কিশোর শিল্পীর ছবি ছিল এতে।

পুরাতন ধারার অনুবৃত্তি আর স্বচ্ছন্দ প্রকাশ রয়েছে এই সব ছবিতে। ভেঙ্কটাপ্পার 'মহাশ্বেতা বীণা বাজাচ্ছেন', 'তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালানো'; প্রিয়নাথ সিংহের 'চৈতন্য' এবারকার স্বদেশী ছবির মধ্যে ছিল বিশেষ আকর্ষণ। স্বর্গীয় সুরেন গাঙ্গুলীর ছবি দেখানো হয়েছিল পনেরো ষোল খানি। সুরেন গাঙ্গুলীর ছবি সাজানো হয়েছিল নন্দলালের ছবির বাঁ পাশে। তাঁর 'লক্ষ্মণসেনের পলায়ন', 'নহুষের রথ', 'কার্ত্তিকেয়', 'বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন', 'মহাভারত লিখন', 'রাজা অম্বরীষের চক্র', 'ডমরু' —প্রত্যেকটি বিশিষ্ট ছবি। প্রদর্শনীর কিছু আগে সুরেন গাঙ্গুলীর মৃত্যু হয়েছে। এটা নব্যবঙ্গ-কলা-জগতের পক্ষে অপূরণীয় ক্ষতি। 'ভেঙ্কটাপ্পা বেঁচে আছে এখনও। এখন সে আর ছবি আঁকে না; বীণা বাজায়' —বললেন নন্দলাল ১৯৬৫ সালের ২১এ ফেব্রুয়ারী। আর গভীর অনুরাগে ব'লে উঠলেন —'সুরেন গাঙ্গুলীর ফটোটা বড়ো ক'রে তুলে বাঁধিয়ে রাখবো। দিয়ো তো আমাকে একটা কপি'।

শ্রীনন্দলালের ছবি সম্পর্কে ১৯১০ সালের Modern Review-র মন্তব্য :— The works of Nandalall Bose need no introduction to his countrymen, who are justly proud of each new achievement His latest works —'Agni' and 'Ahalya' —were seen at this exhibition, along with specimens of each of the painter's many styles, and the conviction of his great technical power grew on us with every step. What we look for in this artist is the growth of a vaster, more masculine, and more synthetic treatment. His pictures of Bhishma's Vow and the Swayambara of Damayanti are efforts in this direction, put they fail to incorporate the surpassing charm of his smaller works. We want all these qualities at once in some great master piece ! —অর্থাৎ শ্রীনন্দলালের নতুন ক'রে কোনো পরিচয় দেওয়া তাঁর দেশবাসীর নিকট অনাবশ্যক। তাঁর প্রত্যেকটি নতুন চিত্রকর্মের জন্যে আমরা গৌরব বোধ করি। বিভিন্ন বিচিত্র পদ্ধতিতে আঁকা নানা ছবি তাঁর। শ্রীনন্দলালের

সর্বশেষ কাজ 'অগ্নি' ও 'অহল্যা' এই প্রদর্শনীতে দেখানো হয়েছিল। এই সঙ্গে নানা শৈলীতে আঁকা তাঁর নানা ছবির নিদর্শনও ছিল। শ্রীনন্দলালের ছবিগুলি দেখে মনে হলো, তাঁর মহা-প্রযুক্তি-শক্তি পদে পদে যেন প্রকাশিত হয়ে চলেছে। আমরা চাই —শ্রীনন্দলালের কাজ আরও বৃহত্তর, পৌরুষযুক্ত আর সমন্বয়ধর্মী হোক্। তাঁর 'ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা' আর 'দময়ন্তীর স্বয়ম্বর' ছবি দুটির প্রবণতা এই দিকে। তবু, এর মধ্যে তাঁর ছোট ছোট ছবির মনোহারিত্বের অভাব। আমরা চাই, —এই সমস্ত গুণ একত্রে —এখনই তাঁর কোনও মাস্টারপীসে।

ইউ. সি. গাঙ্গুলীর ছবি অতি নিকৃষ্ট স্তরের। তার একটিও স্বাভাবিক নয়। এ সব আঁকাও যেন মহা অপরাধ। কারণ তিনি রঙের অপব্যবহার করেছেন। আর আদর্শকে ভোলাতে চেয়েছেন বুদ্ধির কেরামতি দেখিয়ে। আমরা এই শিল্পীটিকে পরামর্শ দিই, যেন তিনি এক বছর রং-চিন্তা ছাড়া, আর কিছু না করেন। এইভাবে আত্মনিয়ন্ত্রণের পরে, তিনি দেখতে পাবেন —তাঁর সৃজনীশক্তি প্রকৃষ্ট পথ ধরেছে। অসিতকুমার হালদারের 'সীতা' ভালো হয়েছে। ভারতশিল্পের 'সীতা' য়ুরোপীয় শিল্পের 'ম্যাডোনা'র অনুরূপ। কিন্তু অসিতকুমারের 'সীতা'র ভাবোচ্ছ্বাস বেশি, আত্মসংযমের অভাব। হালদার মশায়ের আঁকা 'মোয়াজ্জিম' ছবিতে বর্ণ-সমাবেশ মনোজ্ঞ। পরিচ্ছদে প্রভাতের শুভ্রতা আর শ্বেতপ্রস্তরনির্মিত গম্বুজের পরিবেশ চমৎকার। কিন্তু, 'মোয়াজ্জিম'কে এতো পোষাক পরানো হয়েছে, যেন ছবি আঁকানোর জন্যেই তাঁর এই মহড়া। আসলে, 'আস্ সালাতো খাই-রুম্ মিনান্ নাওম্' —অর্থাৎ নমাজ ঘুমের চেয়ে ভালো —এই বাণীটি ছবির মধ্যে ফোটেনি।

ঈশ্বরী প্রসাদের ছবি বিশেষ লক্ষণীয়। তিনি বিশুদ্ধ ভারতীয় রং ব্যবহার করেছেন। প্রাচীন ভারতে এই রকম উজ্জ্বল রঙের ব্যবহার ছিল —এ আধুনিক কলাজগতের এক মহাবিস্ময়। এই একমাত্র রঙের জেল্লা ফুটিয়েই ভারতবর্ষ দিগ্বিজয় ক'রে নিতে পারে। এদেশের পুরাতন ছবি-পুনরুদ্ধারের পথেই, শিল্পজগতে তার অপ্রতিদ্বন্দ্বী আর অক্ষয় প্রতিষ্ঠা লাভ সম্ভব। স্যার লরেন্স জেংকিন্সের কাছ থেকে ধার নিয়ে 'কৃষ্ণ-যশোদার' যে-ছবি দেখানো হয়েছিল, তাতে এই পুরাতন বাহারি রঙের

সৌন্দর্যের শেষ সীমা যেন দেখা গেল। বিশুদ্ধ, উজ্জ্বল আর স্থায়ী সে-রং মোটেই এ-যুগের রঙের মতো মেকী নয়। আমরা বিশ্বাস করি, সোসাইটি এই রং-চিন্তার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রেখে, তার উন্নতির জন্যে দ্রুত কাজ ক'রে যাবেন। —এটা আমাদের অত্যন্ত জরুরী কর্তব্য।

হাকিম মহম্মদ খানের ছবি যেন নিজের কথা নিজেই বলে। তাঁর 'মহম্মদ শাহের দরবার' বিশিষ্ট ছবি। তাতে হিন্দু শিল্পীদের মননশীলতা পরিস্ফুট হ'লেও, এই জটিল বিষয়ের স্বচ্ছন্দ-প্রকাশের তুলনা মেলে না। প্রাণের সাবলীলতা এতে যেন উপচিয়ে উঠছে। বর্ণ-সমাবেশ অপূর্ব। স্মৃতি থেকে করা, শিল্পীর পিতার পোর্ট্রেট্ মোগল-রীতিতে পোর্ট্রেট্-নির্মাণের উৎকৃষ্ট অনুবৃত্তি।

আর কতকগুলি ছবির জন্যে এই প্রদর্শনীটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বহুসমাদৃত ছবিগুলি, আর তাঁর দাদা গগনেন্দ্রনাথের আশ্চর্য ইম্প্রেশনিস্ট্ স্কেচ্‌গুলি দেওয়ালে রাখা হয়েছিল। তাতে মনে হলো, যেন তাঁর ছাত্র আর শিষ্যমণ্ডলীর কাজের মূল্য-নির্ধারণের জন্যে এগুলি প্রেক্ষাপট রচনার কাজ করছে। আমরা এই প্রদর্শনী দেখে খুব খুশি হয়েছি। কারণ, এতে পুরাতন ও নূতন শিল্পধারার যোগাযোগ আর ক্রমবিকাশের স্তরগুলি খুব ভালোভাবে দেখানো হয়েছে; এবং কার্যতঃ আমাদের দূরের স্বপ্ন অনেকখানি কাছে চলে এসেছে। যে ধরনের প্রাচীর-চিত্র, ঐতিহাসিক চিত্র, জাতীয় চিত্র আর বীরত্বব্যঞ্জক চিত্র মহাভারতীয় শিল্প-বিদ্যালয় থেকে দেশের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যে বের হবে, তার অগ্রিম নিদর্শন সব যেন আমরা এখনই উপহার পেয়ে গেলুম। —সংক্ষেপসারে এই মন্তব্য হলো ১৯১০ সালের এপ্রিল সংখ্যার Modern Review পত্রিকার।

দ্বিতীয় হলঘরের দেওয়ালগুলি ভরতি ছিল প্রধানতঃ মোগল-আমলের পুরাতন ভারতীয় চিত্রকলা দিয়েই। এগুলি নির্বাচন ক'রে রাখা হয়েছিল কলকাতা-আর্ট-গ্যালারীর সংগ্রহ থেকে। তা'ছাড়া Sir Archdale, Mr. Menegns, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, Arbuthnot,

সোসাইটির সে-সময়ের সভাপতি Justice Woodroffe, Dr. Dennison Ross, N. Blount আর অধ্যক্ষ Percy Brown-এর সংগ্রহ থেকেও ছবি ধার নেওয়া হয়েছিল। সে-বছর ভারতীয় চিত্রকলার ছবিই বহু ছিল; ফলে, জাপানী আর চীনে চিত্রাবলীর স্থানই হয়নি প্রদর্শনীতে; অথচ, ১৯০৮ সালে চীন-জাপানের চিত্রসম্ভারই জায়গা জুড়ে বসেছিল অনেকখানি। তবে, এর মধ্যে জাপানী শিল্পী যোশিও খতসুতার রামায়ণ-চিত্রাবলী টাঙানো হয়েছিল। এগুলি দেখিয়েছিলেন ছবির মালিক গগনেন্দ্রনাথ। এই তৃতীয় প্রদর্শনীর (১৯১০) আর একটি উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ ছিল, ভারতীয় পিতলের আর তামার মূর্তি। বৌদ্ধ আর হিন্দুযুগের বহু মূর্তি নেপাল, তিব্বত আর দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহ ক'রে আনা হয়েছিল। এগুলি হলো মুসলমান-পূর্ব যুগের ভারতের ধর্ম-সম্পৃক্ত ভাস্কর্য। এর অনেকগুলিই কলকাতা-আর্ট-গ্যালারীর সম্পত্তি,—হ্যাভেল সাহেবের সংগ্রহ।

চতুর্থ প্রদর্শনী ॥ ১৯১১ সালে সোসাইটির ১৯১০ সালের চতুর্থ প্রদর্শনী হয়েছিল এলাহাবাদে আরও বড়ো আকারে। এই প্রদর্শনীর বৈশিষ্ট্য ছিল মোগল-আমলের হিন্দু ও মুসলমান উভয় শ্রেণীর শিল্পিগণের আঁকা পুরাতন ভারতীয় চিত্রাবলীর সুনির্বাচিত সংগ্রহ। অসংখ্য ব্যক্তিগত আর সাধারণ সংগ্রহ থেকে সংগ্রহ ক'রে, এ-সব নির্বাচন করেছিলেন ডক্টর কুমারস্বামী। এই চিত্রৈশ্বর্য ছড়িয়ে ছিল সারা দেশে। এ-সবের তিনিই শ্রেণী-বিভাগ আর সুবিন্যাস করেছিলেন। এই বিন্যাসে সুনির্দিষ্ট এইসব ধারার ছবি পাওয়া গেল, —মধ্য এশিয়ার ধারা, পারশিয়ান ধারা, আদি-মোগল অর্থাৎ ইন্দো-পারশিয়ান ধারা, মোগল ধারা, অন্ত্য-মোগল ধারা, রাজপুত বা জয়পুরী আর কাঙড়া ধারা। এলাহাবাদের এই প্রদর্শনীর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ছিল —অজন্তার বৌদ্ধগুহার কিছু ফ্রেস্‌কোর রঙিন নকল। নকল করেছিলেন —প্রখ্যাত ইংরেজ-মহিলা-চিত্রশিল্পী মিসেস সি. জে. হ্যারিংহাম, কলকাতার জাতীয় কলা-সমাজের শ্রীনন্দলাল বসু, সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত আর দাক্ষিণাত্য-ঔরঙ্গাবাদের সৈয়দ আহম্মদ ও মহম্মদ ফজলুদ্দীন

কাজী। অজন্তা-ফেস্‌কো হলো ভারতীয় চিত্রকলার প্রাচীনতম নিদর্শন। প্রাচীন ভারতের এই ধর্মাশ্রিত চিত্রাবলী এশিয়ার সমস্ত বৌদ্ধ দেশের —বিশেষ ক'রে, চীন-জাপানের আর সিংহলের চিত্রবিদ্যাকে প্রভাবিত করেছিল।

এই প্রদর্শনীর তৃতীয় বৈশিষ্ট্য ছিল নব্যবঙ্গ-ধারার আধুনিক ভারতীয় চিত্রাবলী-সংগ্রহের প্রদর্শনী। এই সব ছবি দেখানো হয়েছিল খুব বিস্তৃতভাবে —এই ধারার কাজের বিভিন্ন দিকের নিদর্শন দেখানো হয়। —এর মধ্যে অবনীবাবুর 'ওমর খৈয়াম' অন্যতম। দ্বিতীয় বছরে সিমলাতে এর কিছু দেখানো হয়েছিল। অবনীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভারতীয় কালি-তুলির কাজের নতুন আর মৌলিক শৈলীর চিত্রাবলীর নিদর্শনও দেখানো হয়। সিমলায় আর কলকাতার প্রদর্শনীতে এঁর কাজের কিছু কিছু নমুনা আগে দেখানো হয়েছিল। কিন্তু সোসাইটির এই প্রদর্শনীতে এগুলি হয়েছিল বিশিষ্ট আকর্ষণ; প্রত্যেকটি শিল্প-সমঝদার এই ছবিগুলি দেখে তারিফ করেছিলেন।

এলাহাবাদের প্রদর্শনী থেকে সোসাইটি একটি ক'রে পোর্টফোলিও প্রকাশ করতেন, দশটি ক'রে ছবির platinotype নিদর্শন দিয়ে। এ-কাজেরও খুব সুখ্যাতি হয়। ১৯১১ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর কলকাতার The Statesman পত্রিকা এই স্কেচ্‌গুলির শিল্পমূল্য সম্পর্কে সুসমালোচনা ক'রে সংবাদ বের করেন।

এই প্রদর্শনীর আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল —ধাতু আর পাথরের আধুনিক ও পুরাতন ছোট্ট একটি ভাস্কর্য-সংগ্রহ। এর বর্ণনা দিয়ে কুমারস্বামী একটি সচিত্র প্রবন্ধ লিখেছিলেন। —ঝাঁসি থেকে আনা হয়েছিল অপরূপ-গঠন 'বরাহ-অবতারের' মূর্তি। নেপাল থেকে আনা হয় তামার 'অবলোকিতেশ্বর' আর পেতলের 'তারা' মূর্তি। এই 'তারা'-মূর্তিটি প্রদর্শনী থেকে কিনে নিয়েছিলেন —কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 'রমেশ-ভবনে'র জন্যে। আধুনিক ভাস্কর্যের কিছু করা হয়েছিল পাথর আর ধাতুর ওপর। এগুলি করেছিলেন হিন্দু-ঐতিহ্য-পরম্পরার সে-সময়ের ভারতীয় কারিগরগণ, —জয়পুরের

মালিরাম, মাদ্রাজের এম্. মালাইকন্নু আচারী আর ব্রহ্মদেশের মঙ্-সান্-পে। জয়পুরের মালিরাম ছাঁচ বা খোদাই-এ উৎকীর্ণ করেছিলেন —রাজপুত মহিলার মূর্তি, হস্তিগুম্ফার ত্রিমূর্তির নকল, উপবিষ্ট উষ্ট্র ইত্যাদি। মাদ্রাজের মালাইকন্নু আচারী তৈরী করেছিলেন হনুমানের মূর্তি। ব্রহ্মদেশের মঙ্-সান্-পে উৎকীর্ণ করেন কিন্নর-মূর্তি। পুরাতন হিন্দু-শিল্প-পরম্পরার প্রাণ-প্রবাহ, আর ভবিষ্যতের প্রত্যাশিত অগ্রগতির ইঙ্গিত ছিল এই ভাস্কর্যগুলিতে। আধুনিক ভাস্কর্যের আর একটি নিদর্শন ছিল একটি লাইন-ড্রয়িং-এ কৃষ্ণ-মূর্তি আঁকা তাম্রফলক। এর ডিজাইন করেছিলেন শ্রীনন্দলাল বসু আর তা থেকে খোদাই করেন কলকাতার হিরণ্ময় রায়চৌধুরী আর অসিতকুমার হালদার। ১৯৬৫ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী নন্দলাল বললেন, —'এই ফলকটি ছিল জগদীশ বোসের বৈঠকখানায়'। এ ছাড়া, নন্দলালের 'মহাদেবের তাণ্ডব নৃত্য' ইত্যাদি ছবির আদর্শে হিরণ্ময় বাবু একাধিক মূর্তি তাম্রফলকে উৎকীর্ণ করেছিলেন। লক্ষ্ণৌ-এর দুর্গাপ্রসাদজী নিজের মূর্তি প্রস্তরে উৎকীর্ণ ক'রে বাস্ট্ তৈরী করেছিলেন। মালিরামের কাজের নমুনা শান্তিনিকেতন-কলাভবনে আছে। তাঁকে জানতেন নন্দলাল, আলাপ ছিল না। আচারী বিশেষভাবে কাঠের মূর্তি খোদাই করতেন।

১৯১০ সালের যুক্তপ্রদেশের এই এলাহাবাদ-প্রদর্শনীতে শ্রীনন্দলাল একটি রৌপ্যপদক পেয়েছিলেন। সে পদকটি প্রায় আড়াই ইঞ্চি ব্যাসের। ওজন প্রায় দশ ভরি। তার একদিকে দু-জন ভারত-মহিলা ছড়ানো অলঙ্কারে মধ্যে বসে, একটি আগ্রহী শিশুকে একজন একটি ট্রাফি-কাপ, আর একজন সার্টিফিকেটের রোল দিচ্ছে। দূরের দৃশ্যে দেখা যাচ্ছে সমুদ্র, নৌকো আর বন্দরের ক্রেন্। উল্টোদিকে দু'টি ফোটা পদ্মের জড়ানো লতার মধ্যিখানে লেখা আছে : Awarded to Nandalal Bose for Painting.

পঞ্চম প্রদর্শনী ॥ ১৯১১ সালের ছবির এই প্রদর্শনী হয়েছিল ১৯১২ সালের ২৩-এ জানুয়ারী থেকে ৩রা ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত। হয়েছিল কলকাতার পার্ক স্ট্রিটে 'পার্ক ম্যান্‌সনের' বড়ো হলঘরে। এই প্রদর্শনীতে

পুনরায় বিশেষ ক'রে দেখানো হয়েছিল মিসেস হ্যারিংহামের, শ্রীনন্দলাল বসুর আর অসিতকুমার হালদারের আঁকা অজন্তা ফ্রেস্‌কোর অনেকগুলির কপি। এর মধ্যে আগে কিছু দেখানো হয় এলাহাবাদে, কিন্তু এখানে দেখানো হলো সংখ্যায় অনেক বেশি, প্রায় দ্বিগুণের চেয়ে বেশি। এ ছাড়া ছিল শ্রীসুরেন্দ্রনাথ করের করা অজন্তা-গুহার কতকগুলি রেখাঙ্কন। এই প্রদর্শনীর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো অজন্তা-ধারায় সুবাসিত নব্যবঙ্গের ক'টি আধুনিক চিত্রকর্ম। এই ধারা বিশেষভাবে অনুসরণ করা হয়েছিল শ্রীনন্দলাল বসুর তিনটি সাম্প্রতিক সুবৃহৎ চিত্রকর্মে। চিত্রপটগুলি : 'জলে' 'স্থলে' ও 'বাতাসে' আনন্দোচ্ছ্বাস। —এর পরিকল্পনা শ্রীনন্দলালের, ছবিগুলি করেছিলেন তিনি নিজেই —অসিতকুমার হালদার আর বেঙ্কটাপ্পার সহযোগিতায়। কলকাতা-ময়দানে সম্রাটের সংবর্ধনার জন্যে যে-মণ্ডপ তৈরী করা হয়েছিল তার অন্তর্সজ্জার জন্যে এই ছবিগুলি ব্যবহার করা হয়। এই ধরনের দৃশ্য-চিত্র-রচনা চালিয়ে এলে, ভবিষ্যতের সভাগৃহ বা মন্দিরের প্রাচীরচিত্র (Mural)-অলঙ্করণের এক অপূর্ব চিত্রশিল্প পরিণতি লাভ করতো। নন্দলাল বলেন, —'এই চিত্রপটগুলি ছিল সোসাইটির অফিস ঘরে'। এই প্রদর্শনীর তৃতীয় বৈশিষ্ট্য ছিল পুরাতন পুঁথির চিত্রিত পাটার প্রদর্শনী। অষ্টাদশ শতাব্দের গোড়ার দিক থেকে চিত্রিত পাটা পাওয়া গিয়েছিল। এগুলি মুসলমান রাজত্বে বাঙ্গালাদেশে সুপ্রচলিত দিশী ধারার হিন্দু চিত্রকর্ম। এগুলির অঙ্কন-পদ্ধতি পুরাতন হিন্দু-বৌদ্ধ শিল্প-ঐতিহ্যের মূর্ত প্রতীক। চতুর্থ বৈশিষ্ট্য : আধুনিক কাঠ এবং পাথর খোদাইয়ের কাজ। এগুলি করেছিলেন কলকাতা আর্টস্কুলের মাদ্রাজী শিক্ষক টি. এ. আচারী, ওড়িষ্যার পুরাতন ধারার কারিগর [গিরিধারী মহাপাত্র] আর জয়পুরের মালিরাম। সর্বশেষে দেখা যায়, আধুনিক চিত্রকর্মের মধ্যে নব্যধারার প্রবর্তক অবনীন্দ্রনাথের, আর শ্রীনন্দলাল, বেঙ্কটাপ্পা, অসিতকুমার হালদার, সমরেন্দ্র গুপ্ত, শ্রীঅর্ধেন্দ্র-কুমার গাঙ্গুলীর প্রভৃত নতুন কাজ ছাড়া, এই বছরে কয়েকটি নতুন মুখের অভ্যুদয় হয়েছে —ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার, দুর্গেশচন্দ্র সিংহ আর শৈলেন্দ্রনাথ দে। চিত্রকর্মে এঁদেরও ভবিষ্যৎ ছিল খুব উজ্জ্বল।

শ্রীনন্দলাল বসুর এই বছরে অঙ্কিত ও প্রদর্শিত ছবির মধ্যে অজন্তা-চিত্রের বিশেষ প্রভাব ছিল। এই বছরে নব্যবঙ্গ-ধারার ছাত্রদের আর একটি কাজের দিকে ঝোঁক ও অগ্রগতি দেখা গিয়েছিল। সে প্রাচীন ভারতীয় 'টেম্পেরা'-পদ্ধতির প্রয়োগ। এই পদ্ধতিতে আঁকা ছবি উজ্জ্বল আলোয় রাখলে রঙের ঔজ্জ্বল্য বাড়ে এবং এতে মোগল ও রাজপুত ছবির মতো রঙের বিশেষ জেল্লা ফুটে ওঠে। টেম্পেরা-পদ্ধতিতে আঁকা ছবিগুলির কতকগুলিতে ভারতীয় দিশী রং —এলা আর গেরি রং ব্যবহার করা হয়েছিল —পুরানো ভারতীয় পদ্ধতিমতে। এই সময়ে দিশী রং তৈরীতে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন কিশোর শিল্পী বেঙ্কটাপ্পা। ইনি ছিলেন মহীশূররাজের সভাশিল্পীর বংশধর, পরম্পরাগত শিল্পরীতিতে পোক্ত।

পঞ্চম প্রদর্শনী সম্পর্কে এক-নজরে বলা যায়, এতে প্রধানতঃ নব্যবঙ্গ-ধারার চিত্রাবলীই প্রদর্শিত হয়েছিল। ভারতীয় মোগল আর রাজপুত চিত্রসংগ্রহ আগের প্রদর্শনীর তুলনায় এখানে অনেক কম দেখানো হয়। কিন্তু ভারতবর্ষের বিভিন্ন যুগের চিত্রকলার নমুনা, ভারতীয় জীবন প্রবাহ, ভারতীয় জনসমাজ —এই চিত্রাবলীর মাধ্যমে রূপ পরিগ্রহ করেছিল। এই রকম বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে মনে হয়, ভারতশিল্পের বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন স্তর যেন ভারতীয় জীবনের বিভিন্ন যুগের জীবন-যাত্রার মৌন সাক্ষী। আমরা ১৯১১-১২ সালের চিত্র-প্রদর্শনীটিকে এইভাবে ভাগ ক'রে দেখাতে পারি:

১। হিন্দু-বৌদ্ধযুগের পুরাতন ভারতীয় চিত্রাবলী

ধর্ম:—অজন্তার বৌদ্ধ-গুহামঠের দেওয়াল-চিত্রাবলীর নকল। এতে জীবনের সকল দিকের পরিচয় আছে; মানুষের এবং মনুষ্যেতর সমাজের জীবন-চিত্র একই ধর্মাদর্শে বিধৃত —প্রভু বুদ্ধের ব্যক্তিত্বের নিকট ভক্তির অভিব্যক্তি।

১। মুসলমান আমলের প্রাচীন ভারতীয় চিত্রাবলী

২। ধর্মীয় —হিন্দুরাজসভা ও তীর্থস্থানে লালিত:—

(ক) রাজপুত ধারা (জয়পুর ও কাঙড়া)

(খ) বঙ্গীয় ধারা

(গ) ইন্দো-মোগল ধারা

প্রথম ধারা দুটি সম্পূর্ণ দেশজ —মুসলমান-পূর্ব ভারতের পুরাতন শিল্পকলার অনুবৃত্তি ; তৃতীয়টির উৎপত্তি মোগল-দরবারে বা দরবারের ধারে কাছে। এতে মিশ্র-পদ্ধতিতে হিন্দুধর্মের বিষয় আঁকা হয়েছে। অংশতঃ রাজপুত, অংশতঃ মোগল। আঁকার বিষয়বস্তু হয় মহাকাব্যিক, পৌরাণিক অথবা গীতিধর্মী (লিরিক)। এতে দেখা যায়, প্রধানতঃ ভারতীয় মধ্যযুগের ভক্তি-আন্দোলনের প্রতিচ্ছবি। এই ছবিগুলি শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরামচন্দ্রের এবং শিবের পরম্পরাগত ঐতিহ্যকে কেন্দ্র ক'রে আঁকা।

২। লৌকিক —এর উৎপত্তি মোগল ও রাজপুত দরবারে, রাজা বাদশার আর অভিজাত খানদানীদের উৎসাহে ; এতে আছে দরবার-সংক্রান্ত ঘটনা, রোমান্টিক প্রেমের দৃশ্যাবলী, মনোহর দৃশ্যচিত্র, ব্যক্তিগত পোর্ট্রেট ইত্যাদি।

(ক) মোগলধারা —দিল্লী, আগ্রা, লক্ষ্ণৌ ইত্যাদির।

(খ) রাজপুত ধারা —কাঙ্গড়া উপত্যকা, জয়পুর ইত্যাদির।

৩। আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলা।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে নব্যবঙ্গধারার কাজ। এই কাজ স্বদেশী এবং সমন্বয়ধর্মী। এ-কাজের প্রেরণা এসেছে সমগ্র ভারতের অতীত ও বর্তমান জীবন থেকে, আর এই সব ছবি তারই প্রতিভূ। ভারতের অতীত আদর্শবাদের পুনরুদ্বোধন ক'রে এই সব ছবি বর্তমান প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন কর্মপ্রচেষ্টার গভীরতর তাৎপর্য আর আদর্শ রূপায়িত করেছে। নব্যবঙ্গধারার শিল্পীদের চিত্রপটকে এইরকম পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে :—

১। মহাকাব্যিক আর পৌরাণিক : যেমন শ্রীনন্দলাল বসুর 'রামায়ণ চিত্রাবলী'. 'একলব্য', 'হরিশ্চন্দ্র', 'পার্থসারথি', 'কৃষ্ণ ও রাধা', আর 'মহাদেব' ; অবনীন্দ্রনাথের 'হরপার্বতী ; বেঙ্কটাপ্পার 'নটরাজ' ; অসিত হালদারের 'নৃত্যরত গণেশ'।

২। হিন্দু ও মুসলমান যুগের ইতিহাস ও সাহিত্যপরম্পরা :— যেমন, অবনীন্দ্রনাথের 'অশোকের রাণী তিষ্যরক্ষিতা ও বোধিদ্রুম, ; মহম্মদ হাকিম এম্. খানের 'বাহাদুরশাহের দরবারে দৌত্য' ও 'মসনবী চিত্র' ;

ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদারের 'বোধিবৃক্ষ', 'বেহুলা' ও 'রাজকুমারী রত্নাবলী'; সমরেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'ওমর খৈয়মের চিত্রাবলী'; বেঙ্কটাপ্পার 'প্রতাপসিংহ' এবং রামেশ্বর প্রসাদের 'দিল্লীর শেষ হিন্দুরাজা পৃথ্বীরাজ'।

৩। কর্তব্য-পালনে আর আত্মীয়-সম্পর্কে আদর্শবাদ, সাধারণ জীবনের দৃশ্য ও ঘটনা ঃ—যেমন শ্রীনন্দলাল বসুর 'কাবুলিওয়ালা' আর 'ডাকহরকরা', অসিতকুমার হালদারের 'মাতৃমূর্তি'; প্রিয়নাথ সিংহের 'মাতৃমূর্তি'; অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পুরীর কৈবর্ত বালিকা'; মহম্মদ হাকিম এম্. খানের 'প্রতীক্ষা'।

৪। আচার ও ব্রতের ব্যাখ্যা ঃ—যেমন শ্রীনন্দলাল বসুর 'ষষ্ঠীপূজা' ও 'সহমরণের সতী'; অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দেবদাসী'; সমরেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'প্রদীপ ভাসানো'।

৫। মানসিক অবস্থার তাৎপর্য-ব্যাখ্যা ঃ— যেমন, অসিতকুমার হালদারের 'বাতায়ন পথে'; দুর্গেশচন্দ্র সিংহের 'বাতায়ন পথে'; বেঙ্কটাপ্পার 'ধ্যানমগ্না'।

॥ বিলাতী প্রশস্তি ॥

১৯১০ সালের ২৮-এ ফেব্রুয়ারী তারিখের লণ্ডনের Times পত্রিকায় একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছিল তেরো জন বিখ্যাত শিল্পী আর শিল্প-সমালোচকের স্বাক্ষরযুক্ত হ'য়ে। —(১) Frederick Brown (২) Walter Crane (৩) George Frampton (৪) Laurence Housman (৫) E. Lanteri (৬) W. R. Lethaby (৭) Halsey Ricardo (৮) T. W. Rolleston (৯) W. Rothenstein (১০) George W. Russell (১১) W. Reynolds Stephens (১২) Charles Waldstein আর (১৩) Emery Walker —ভারতশিল্পের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তাঁদের যুক্ত-ঘোষণা প্রকাশ করেছিলেন এইভাবে ঃ—

We the undersigned artists, critics and students...find in the best art of India a lofty and adequate expression of the religious emotion of the people and of their deepest thoughts on the subject of the devine.···We hold that the existence

of a distinct, a potent, and a living tradition of art is a possession of priceless value to the Indian people, and one which they, and all who admire and respect their achievements in this field, ought to guard with the utmost reverence and love. While opposed to the machanical stereotyping of particular traditional forms, we consider that it is only in organic development from the national art of the past that the path of true progress is to be found Confident that we here speak for a very large body of qualified European opinion, we wish to assure our brother craftsmen and students in India that the school of national art in that country, which is still showing its vitality and its capacity for the interpretation of Indian life and thought, will never fail to command our admiration and sympathy so long as it remains true to itself. We trust that, while not disdaining to accept whatever can be wholesomely assimilated from foreign sources, it will jealously preserve the individual character which is an out-growth of the history and physical conditions of the country as well as of those ancient and profound religious conceptions which are the glory of India and of all the Eastern world.

সেই সময়ের পাশ্চাত্য চিন্তার এই বাইরের আলোকে আমাদের নব্যবঙ্গের অর্থাৎ ঘরের ভারতশিল্প-ধারার নবজাগরণ, তার তাৎপর্য, আর গুরুত্ব ভালো ক'রে বুঝতে পারা গেল। Times পত্রিকার অভিমতে, ওরিয়েন্টাল আর্টের ইণ্ডিয়ান সোসাইটির বলিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষকতায় নব্যবঙ্গে ভারতশিল্পের এই পুনরুজ্জীবন আর অগ্রগতি ভারতবর্ষের একমাত্র আধুনিক শিল্প-আন্দোলন।—

এ ছাড়া এই এলোহাটে হঠাৎ-অবতারের মতো এদেশে নতুনের আমদানি করছি ব'লে তখন অনেকে সোচ্চার রব তুলেছিলেন; কিন্তু, আসলে অনুকারকদের মেকি ধরা পড়তে দেরি হয়নি। বিনা শ্রদ্ধা-প্রীতিতে, বিনা সাধ্যসাধনায় নতুনের জাগরণ বা আগমন সম্ভবপর হয় না।

১৩৩১ সালের শ্রাবণ সংখ্যার 'নবযুগ' পত্রিকায় 'নবদূর্বা' প্রবন্ধে অবনীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, —'দেশে নূতনকে এবং নবযুগকে আনার চেষ্টার তো অন্ত দেখিনে —খদ্দর যেটা বহুকাল হল এদেশের মানুষরাই গরমে এবং সভ্যসমাজে অসহনীয় বলে পরিত্যাগ করেছিল সেইটেরই পুনরাবৃত্তি, ওস্তাদি গান যেটা আকবরের আমলের, ছবি যেটা বৌদ্ধ যুগের, ধর্ম যেটা সেই ব্রহ্মার পিতামহের পিতামহের; সব পুরোনোকে নতুন গেলাসে ধরে এনে ভাবছি আমরা নতুন যুগ আনছি। পুরোনো কাসুন্দি নতুন ভাঁড়ে —'ভাঁড়ও ভারি পুরোনো গঠনের' —দিয়ে নতুন খাদ্য নতুন যুগের বল্লে তো চলে না কিন্তু কাযে ঘটছে তাই, খুব যারা নতুন করতে চাচ্ছে তারা বিলাতে যেটা অনেকটা পুরোনো এদেশে যেটা অজ্ঞাত সেটা বাজারে এনে বাহবা নিতে চলেছে এই তো দেখছি বয়েস হয়ে অবধি! নবযুগ এবং নূতন ক্বচিৎ আসে হঠাৎ বজ্রাঘাতে সবাইকে চম্‌কে দিয়ে দিক-বিদিক অন্ধকার করে, কিন্তু সচরাচর আসে সে গোপন অভিসারে নিঃশব্দ অনির্দিষ্ট পদসঞ্চারে, মানুষের ও দেশের মনের অন্তঃপুরে, উপবনে, কুঞ্জকাননে তার যাওয়া-আসার খেলা ক্বচিৎ কেউ দেখে রাত জেগে।'

ভারতশিল্পের ইতিহাস আলোচনার সূত্রপাত
।। স্বামী বিবেকানন্দের শিল্পচিন্তা ।।

সেকালের বাঙ্গালী-সমাজ ভারতশিল্পের পরম্পরাগত উচ্চ স্তরের শিল্পকলা সম্পর্কে বিশেষ অবহিত ছিল না। শিল্প বলতে তখন যেটুকু ছিল, সে হলো কারুশিল্প —প্রতিমা আর পটশিল্প। কিন্তু, এদেশের প্রাচীন প্রথাগত শিল্পকলার কিছু নমুনা, কিছু আগেই য়ুরোপে গিয়ে পৌঁছেছিল। তবে, সেকালে ওদেশে ভারতশিল্প সম্পর্কে অনুকূল মন্তব্য প্রচারিত হয়নি। ইংরেজ সাহিত্যিক ও শিল্পরসিক জন্ রাস্কিনের মতো প্রতিভাও ভারতশিল্পের স্বরূপটি ধরতে পারেননি। এই সময়ে আলেকজাণ্ডার কানিংহাম ভারতবর্ষের পুরাবস্তুর ও শিল্পকলার পরিচয় প্রথম প্রকাশ করেন।

শাক্য-বুদ্ধের অনেক পরে, গ্রীক-রোমক শিল্পীরা বুদ্ধের মূর্তি নির্মাণ করেছিলেন। ভারতীয় গান্ধার-শিল্পে দেবদেবীর মূর্তিগুলি ঐ সময়ে অনেকটা গ্রীক-রোমক ধাঁচে নির্মিত হ'তে থাকে। এই দেখে শিল্পতাত্ত্বিক ফুসে আর গ্রুনওয়েডেল ভারতশিল্প গ্রীক-রোমক প্রভাবপুষ্ট ব'লে মত প্রচার করেন। ভিন্সেন্ট্ স্মিথ্ প্রমুখ য়ুরোপের অন্য ঐতিহাসিকেরাও এঁদের ঐ মতের পরিপোষণ করতে থাকেন। গত শতাব্দে বিদেশে এইভাবেই ভারতশিল্পের পরিচয়ের সূত্রপাত হয়েছিল।

ভারতশিল্পে গ্রীক-রোমক প্রভাবের ভ্রান্ত এই পাশ্চাত্য প্রচার এদেশের পণ্ডিতেরা কিন্তু বেশি দিন বরদাস্ত করেননি। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই বিষয়ে প্রথম সার্থক গবেষণা ক'রে ভারতশিল্পের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নানা তথ্য ও তত্ত্বের সন্ধান দিয়েছিলেন। তাঁর পরে, এ বিষয়ে আলোচনা করেন মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

ভারতশিল্পের ওপর গ্রীক-প্রভাব সম্পর্কে য়ুরোপে যখন প্রচার চলছিল, সেই সময়ে তার তীব্র প্রতিবাদ করেন স্বামী বিবেকানন্দ। প্যারিসে ধর্মেতিহাস-কংগ্রেসে ১৯০০ সালের অক্টোবর মাসে তিনি ভারতীয় বুদ্ধমূর্তির স্বরূপ বিশ্লেষণ ক'রে, ফরাসী অধ্যাপক ম'সিয়ে ফুসের

প্রচারিত তথাকথিত ইন্দো-গ্রীক্ শিল্পবাদের সিদ্ধান্তকে বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করেছিলেন। সমগ্র ভারত পর্যটন ক'রে আর অসংখ্য শিল্প-তীর্থ সম্পর্কে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দিয়ে, স্বামীজী ভারতশিল্পের অপ্রমেয় ঐশ্বর্যকে উপলব্ধি করার ফলেই, এমন অসাধ্যসাধন সম্ভবপর হয়েছিল। ভারতশিল্পের মূল বৈশিষ্ট্য নিয়ে স্বামীজীর আলোচনা ও নির্দেশদান নব্যশিল্পসমালোচনার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম যুগবিপ্লব ঘটিয়েছিল।

তাঁর সতীর্থ শিল্পিবন্ধু প্রিয়নাথ সিংহ, প্রিয় শিষ্যা সিস্টার নিবেদিতা, জাপানী মনীষী ওকাকুরা কাকুজো তাঁর কাছ থেকেই ভারতশিল্পের স্বরূপ উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছিলেন। শ্রীনন্দলালের সঙ্গে এঁদের যোগাযোগের বিবরণ আগেই দেওয়া হয়েছে।

পাশ্চাত্য-শিল্পের নকল ক'রে প্রাচ্য-শিল্প দাঁড়াতে পারবে না, —এ-কথা স্বামী বিবেকানন্দ তখনই বলেছিলেন —তাঁর নিজস্ব বলার ভঙ্গিতে : 'ওদের নকল করে একটা আধটা রবিবর্মা দাঁড়ায়। তাদের চেয়ে দিশি চালচিত্রি-করা পটো ভাল। তাদের কাছে তবু···রঙ আছে। ওসব রবিবর্মা-ফর্মা চিত্রি দেখলে লজ্জায় মাথা কাটা যায়। বরং জয়পুরের সোনালি চিত্রি আর দুর্গা ঠাকুরের চালচিত্রি প্রভৃতি আছে ভাল।' ছেলে বয়সে স্বামীজী নিজেও ছবি আঁকতেন একাগ্র হয়ে। সত্যিকারের ভারতশিল্প আলোচনার ক্ষেত্রে স্বামীজী ছিলেন পথিকৃৎ, নবজাগরণের অগ্রদূত।

প্রিয়নাথ সিংহকে স্বামীজী বলেছিলেন : 'এশিয়াটিকের জীবন আর্টে মাখা। প্রত্যেক বস্তুতে আর্ট না থাকলে এশিয়াটিক তা ব্যবহার করে না। ওরে আমাদের আর্টও যে ধর্মের একটা অঙ্গ। যে-মেয়ে ভাল আলপনা দিতে পারে, তার কত আদর। ঠাকুর নিজে একজন কতবড় আর্টিস্ট ছিলেন।'...পাড়াগাঁয়ে চাষাদের বাড়ি দেখেছিস? ...তাদের ধানের মরাই দেখেছিস? তাতে কত আর্ট। মেটে ঘরগুলোয় কত চিত্তির-বিচিত্তির! আর সাহেবদের দেশে ছোটলোকেরা কেমন থাকে তাও দেখে আয়। কি জানিস, সাহেবদের ইউটিলিটি আর আমাদের আর্ট। ওদের সমস্ত দ্রব্যেই ইউটিলিটি, আমাদের সর্বত্র আর্ট। ঐ সাহেবী শিক্ষায় আমাদের অমন সুন্দর চুমকি ঘটি ফেলে এনামেলের

গেলাস এনেছেন ঘরে। ওই রকমে ইউটিলিটি এমনভাবে আমাদের ভেতর ঢুকেছে যে, সে বদহজম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন চাই আর্ট ও ইউটিলিটির কম্বিনেশন। জাপান সেটা বড় চট করে নিয়ে ফেলেছে, তাই এত শীঘ্র বড় হয়ে উঠেছে। এখন আবার ওরা তোমাদের সাহেবদের শেখাবে।'

মিসেস্ ওলিবুলকে এক পত্রে লিখেছিলেন ঃ 'আমার একান্ত ইচ্ছা যে, আপনারা কয়েক ঘণ্টার জন্য কলকাতার পশ্চিমের কয়েকটি গ্রামে গিয়ে কাঠ, বাঁশ, বেত, অভ্র ও খড়ের তৈরী পুরাতন বাংলার চালাঘর দেখে আসুন। এই বাংলোগুলি অপূর্ব শিল্পনৈপুণ্যের নিদর্শন। হায়! আজকাল শুয়োরের খোঁয়াড়ের মত ঘরগুলোরও 'বাংলো' নাম দেওয়া হয়েছে।'

কলকাতা জুবিলি আর্ট একাডেমীর প্রতিষ্ঠাতা রণদাপ্রসাদ দাসগুপ্তের সঙ্গে আলোচনায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্পের পার্থক্যটি স্বামীজী বুঝিয়েছিলেন এইভাবে ঃ 'যে জাতটা বড় materialistic তারা নেচারটাকেই আইডিয়াল বলে ধরে এবং তদনুরূপ ভাবের Expressionই শিল্পে দিতে চেষ্টা করে। যে জাতটা আবার প্রকৃতির অতীত একটা ভাব প্রাপ্তিকেই আইডিয়াল বলে ধরে, সেটা ঐ ভাবই 'নেচার'-এর শক্তিসহায়ে শিল্পে Express করতে চেষ্টা করে। প্রথম শ্রেণীর জাতদের নেচার-ই হচ্ছে Primary basis of Art, আর দ্বিতীয় শ্রেণীর জাতগুলোর ideality হচ্ছে শিল্পবিকাশের মূল কারণ।' রণদাবাবুর আর্টস্কুলের ছবিগুলিতে 'কোন expression নেই' ব'লে স্বামীজী নিন্দে ক'রে, 'হিন্দুদের নিত্যধ্যেয় মূর্তিগুলিতে প্রাচীন ভাবের উদ্দীপক Expression দিয়ে আঁকবার চেষ্টা' করতে বলেছিলেন। স্বামীজী বিবেকানন্দের মুখে তাঁর Kali the mother কবিতার আবৃত্তি আর ব্যাখ্যা শুনে ভয়ে রণদাবাবুর মাথা ঘুরে গিয়েছিল। মা-কালীর ক্ষেমঙ্করী ও ভয়ঙ্করী ভাবের সমাবেশ ঘটিয়ে, স্বামীজী রণদাবাবুকে একখানি ছবিতে 'Express' করতে বলেছিলেন। পরে, সিস্টার নিবেদিতা শ্রীনন্দলালকে এইভাবেই কালীমূর্তি আঁকতে আইডিয়া

দিয়েছিলেন।

বেলুড়মঠে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির যেভাবে নির্মাণ করতে স্বামীজীর ইচ্ছে ছিল, তার চমৎকার বর্ণনা দিয়ে ড্রয়িং করিয়েছিলেন তিনি। পৃথিবী ঘুরে গৃহশিল্প সম্পর্কে যত সব আইডিয়া নিয়ে এসেছিলেন স্বামীজী, তার সবই এই মন্দিরে ফুটিয়ে তোলার ইচ্ছে ছিল তাঁর। এর বহু পরে, কামারপুকুরে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মভিটায় প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ-মন্দিরের অভিনব মূল পরিকল্পনা আর আদর্শ (model) রচনা করেছেন রূপদক্ষ ভারতশিল্পী শ্রীনন্দলাল।

সমকালীন মনীষীদের ভারতশিল্পানুশীলন

॥ হ্যাভেল সাহেবের স্মৃতি ও চিত্রচিন্তা (১৮৯৬—১৯১৩) ॥

হ্যাভেল সাহেবের জীবনে সবচেয়ে বড়ো কাজ হলো অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আবিষ্কার ক'রে, তাঁকে কলকাতার সরকারী আর্টস্কুলে প্রতিষ্ঠা করা। অবনীন্দ্রনাথ ১৯০৪ সাল থেকে আর্টস্কুলে ওরিয়েণ্টাল আর্ট-ক্লাসের প্রবর্তন করেছিলেন অধ্যক্ষ হ্যাভেল সাহেবের পরামর্শে আর সর্বাত্মক সহযোগে। অবনীন্দ্রনাথকে 'ভারতশিল্পী' বলে সর্বপ্রথম প্রচার করেছিলেন হ্যাভেল সাহেবই। এতে সেকালের বিদ্বৎ-সমাজে ঝড় উঠেছিল। অবনীবাবুর চিত্রকলাকে ভারতশিল্পশাস্ত্রসম্মত ব'লেই অনেকে আমল দিতে চাননি। তাঁদের কথা যথার্থ কিনা, সে-আলোচনার গহনে এখন প্রবেশ করছি না। কিন্তু অধ্যক্ষ হ্যাভেল সাহেব, সিস্টার নিবেদিতা আর কেণ্টিশ কুমারস্বামী তাঁকে তখনই বরণ ক'রে নিয়েছিলেন নব্যবঙ্গশিল্পানুশীলন-চক্রের কেন্দ্রবিন্দু ব'লে। ১৯০৫ সালে নন্দলাল হ'লেন সরকারী আর্টস্কুলের ওরিয়েণ্টাল ক্লাসে অবনীন্দ্রনাথের প্রথম ছাত্র এবং তাঁর ছাত্রধারার কোহিনূর। নন্দলালের আঁকা 'সতী' নব্যভারত-চিত্রকলার প্রতীকরূপে গাঁথা রয়েছে হ্যাভেল সাহেবের Indian Sculpture and Painting-গ্রন্থে।

১৯০৭ সালে হ্যাভেল সাহেব অসুস্থ হ'য়ে বিলেতে চ'লে গেলেন। বিলেতের বাড়ি পৌঁছে, 'হিম-ঘরের পরিবেশে' তিনি সুস্থ হ'য়ে ওঠেন।

কিন্তু মনে তাঁর জ্বলতে থাকে ভারতশিল্পের সেই অনির্বাণ দীপশিখা। বাঙ্গালাদেশে নব্যভারত-শিল্পের শুভ-সূচনার বিষয়ে তিনি একটি মনোজ্ঞ বিবরণ প্রকাশ করেছিলেন ১৯০৮ সালের Studio-পত্রিকায়। এই বছরে তাঁর সুবিখ্যাত বই Indian Sculpture and Painting প্রকাশিত হলো লণ্ডন থেকে। এর তিন বছর পরে, ১৯১১ সালে বের হলো তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ The Ideals of Indian Art —ঐ লণ্ডন থেকেই। ১৯১২ সালের ২৬-এ এপ্রিল তাঁর 7, St Edmund's Terrace, Primrose Hill, N. W -এর বাড়ি থেকে কলকাতায় 'The Dawn and Dawn Society's Magazine'-এর সম্পাদক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে একখানি পত্র লিখেছিলেন। Dawn-পত্রিকায় অধ্যাপক রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ Interpretation of Indian Art নামে ধারাবাহিক যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন তাতে হ্যাভেল সাহেবের The Ideals of Indian Art বই থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছিল। সেই উদ্ধৃতিটি বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে, এই আশঙ্কায়, তার কৈফিয়তে লেখা এই পত্র। এই পত্রে তিনি বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রচর্চা শুরু করবার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। তবে, শিল্পকর্ম দেখে, শিল্পজ্ঞান বৃদ্ধি করানোর দিকেই তাঁর প্রবণতা ছিল বরাবর। ঐ সময়ে নতুন দিল্লীর নগরপত্তন পরিকল্পনার বোঝাপড়াতেও তাঁর অবদান অসামান্য। দূরে গিয়েও ভারতশিল্প-সম্পর্কে এই বিদেশী মহামনীষীর ধ্যানধারণা সারাজীবন ছিল অটুট। নব্যভারতচিত্রকলার বোধনে হ্যাভেল সাহেব যেন 'অধ্বর্যু'র কর্তব্য পালন ক'রে গেছেন নৈষ্ঠিকভাবে আমরণ।

নন্দলালের সঙ্গে যে ক'মাস হ্যাভেল সাহেবের যোগাযোগ ঘটেছিল, তার পরিচয় আগেই দেওয়া হয়েছে। এবারে অবনীন্দ্রনাথের 'হ্যাভেল গুরু'র শিল্পচিন্তা সম্পর্কে কিছু বলা যাচ্ছে। ভারতশিল্পের সুপ্রাচীন অবিচ্ছিন্ন ধারাটির যথার্থ স্বরূপ এতে পরিষ্কার বোঝা যাবে; ভারত-চিত্রকলার পরম্পরায় নন্দলালের চিত্রকর্মের স্থানটিও চিহ্নিত করা হবে। কেউ কেউ বলতে পারেন, —'ফুল ফোটাতে পাতার বাহার দরকার, কিন্তু ফুলকে ছাপিয়ে নয়।' এ কথার কৈফিয়ৎ হলো, —এমন অনেক ফুল আছে, পাতা-ছাড়া হ'লে, যার বাহার খোলে না। এমন

কি, পাতার পার্‌স্‌পেক্‌টিভ্‌-ই সেই ফুলের সৌন্দর্যের হেতু হয়। কবিশিল্পীর জীবন, বিশেষ ক'রে, রূপদক্ষ নন্দলালের জীবনের বিকাশ ভারতশিল্পপরম্পরার পরিপ্রেক্ষিতে। ভারতবর্ষের জনসমাজ আর দৃশ্যজগৎ সমান-তালে যোগান দিয়ে গেছে, তাঁর রূপাবিষ্ট মানসলোকের 'মহান্ ক্ষুধার'। সেকালের যে নির্মল ও বলিষ্ঠ চিন্তাধারার পরিবেশে রূপ ও রস আহরণ ক'রে শিল্পী নন্দলালের বিকাশ ও বৃদ্ধি, তার সমূহ বিবরণ আজও তাঁর মনে বিমল আনন্দের পরিমণ্ডল রচনা ক'রে রয়েছে। শিল্প-বিষয়ে সেকালে সার্থক আলোচনা ও বোঝাপড়া অনেকে করেছিলেন, অনেক সেই সব শ্রদ্ধেয় মনীষীর রচনা অনুসরণ ক'রেই শিল্প বিষয়ে নানা দুরূহ মর্ম ভেদ করার চেষ্টা করা যাচ্ছে —স্বয়ং আচার্য শ্রীনন্দলালের অভিমত বিষয়-বিভাগ অনুসরণ ক'রে।

॥ ভারতশিল্পের ইতিহাসের প্রাচীনত্ব ॥

হ্যাভেল সাহেবের Indian Sculpture and Painting-বইখানির প্রথম ভাগে ভাস্কর্য-বিচার আর দ্বিতীয় ভাগে চিত্রপটের সমালোচনা। তাঁর মতে ভারতভূমি অতি পুরাতনী। বহু জাতিধর্মের বিপ্লব বয়ে গেছে এর ওপর দিয়ে। পুরাতন চিত্রপট শুধু এদেশেই নয়; কোনও দেশেই টিকে নাই। ক্রমে রং চটে, ক্ষয়ে যায়। পুরাণ যুগের চিত্রপটের কথা পুরানো কাব্য-ইতিহাসে থাকলেও তার দেখা পাবার উপায় নাই। ভারতে যা আছে তার সূচনা বৌদ্ধযুগ থেকে। বৌদ্ধযুগের কীর্তিকলাপই রয়ে গেছে পর্বতগুহায় আর প্রস্তরস্তূপে। তারই সঙ্গে পাওয়া গেছে কিছু কিছু ফ্রেস্‌কো-পেন্‌টিং। কিন্তু বৌদ্ধযুগ বললেই শাক্যসিংহ-প্রবর্তিত ধর্মের যুগ নয়। তার আগেও এর অস্তিত্ব ছিল, আর তার বিস্তৃতি ছিল গোটা প্রাচ্যদেশ জুড়ে —মায় মিশর মেক্সিকো পর্যন্ত। সে-ধর্ম শাক্তও হতে পারে, সৌরও হতে পারে আবার ব্রহ্মবিদ্যাও হ'তে পারে। ঐসব অঞ্চলে পৌরাণিক দেবদেবীর মূর্তির আবিষ্কারই তার প্রমাণ। এগুলি বৌদ্ধ-জাতকাদির সঙ্গে ছড়িয়ে প'ড়ে এক অদ্ভুত ঐতিহাসিক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। কাজেই ভারতশিল্পের ভাস্করদের আদর্শ মাত্র

দু-তিন হাজার বছরের পুরাতন নয়। সুইজর্‌ল্যাণ্ডের পাহাড়ে প্যালিওলিথিক যুগের পাথরের যে মৃগমূর্তি পাওয়া গেছে, তার বয়েস অনুমান করা হয় পঞ্চাশ হাজার বছর। সে-সৃষ্টি নাকি বর্বর যুগের অদ্ভুত শিক্ষার প্রমাণ। তাই যদি হয়, তারা যাদের কাছে এ বিদ্যা শিখেছিল, তারা না-জানি কতো পুরানো। মিশর, আসীরিয়া ইত্যাদি আর ভারতবর্ষের পুরাণের জ্যোতিষ-সংকেত বিচার করে কেউ কেউ ভারতবর্ষের ইতিহাস-পরম্পরা ত্রিশ হাজার বছরের পুরানো বলেছেন। বৈদিক শতপথ-ব্রাহ্মণ থেকে আরও পুরাকালে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতিবিধির পরিচয় মেলে।

॥ ভারতশিল্পে ভাস্কর্যের প্রাচীনত্ব ॥

অধ্যাপক হ্যাভেল সাহেব দেখিয়েছেন, যে-সব প্রতিমূর্তি বৌদ্ধযুগে খোদাই করা হয়েছিল তাদের আদর্শ বহু পুরানো। সে আদর্শ তাঁর মতে Divine Ideal। য়ুরোপের নবযুগের আদর্শ বহিঃপ্রকৃতি। ভারতবর্ষের কাছে প্রকৃতি অলীক, কিন্তু তার ভেতরকার যে সৌন্দর্যটুকু দেখাতে পারলে পরমাত্মাকে ব্যবহারিকভাবে বোঝানো যায় —সেই হলো চিত্রকর্মের আদর্শ (পৃ ২৪)। গ্রীক ভাস্করদের আদর্শ ছিল দেহের গঠন-সৌন্দর্যকে নিখুঁত ক'রে দেখানো। ভারতশিল্পের আদর্শ সূক্ষ্মতর। জীর্ণ, শীর্ণ, কোমল, অতি কোমল, ক্ষীণ, কিংবা যোগীর অস্থিকঙ্কালসার দেহে দৈবজ্যোতি কি ক'রে ফুটে ওঠে, তাই দেখানো ছিল ভারতের উদ্দেশ্য। প্রসঙ্গতঃ, হ্যাভেল সাহেব যবদ্বীপের 'ধ্যানী বুদ্ধের' মূর্তিটি দেখতে বলেছেন (পৃ ২৮)। আদর্শ হলো —ধ্যানমগ্ন যোগেশ্বর। মুদ্রা, আসন, নিমীলিত চক্ষু ইত্যাদি দৈবী প্রকৃতির সঙ্কেতমাত্র। সারনাথের আসনে বুদ্ধের নির্বাণমূর্তিটি আর একটি উদাহরণ (পৃ ৩২)। হুয়েনৎ সান ভারতীয় যোগীর লক্ষণ আবিষ্কার করতে গিয়ে বৌদ্ধমূর্তি পাতি পাতি ক'রে দেখেছিলেন। দৈবী-সম্পদের বত্রিশটি লক্ষণ আছে বৌদ্ধ গ্রন্থে। তার মধ্যে সোনার বরণ গা, হাঁটুলম্বা হাত, কোঁকড়া চুল আর সিংহের মতো ঘাড় —বিশেষ লক্ষণ হলো এই কটা। রত্নসিংহাসনে-বসা ধ্যানমগ্ন নেপালের 'বোধিসত্ত্ব'-

মূর্তি অতি সুন্দর (পৃ ৩৮)। —এর দু-শো বছর পরে, ভারতশিল্পে মানবদেহের বহিঃসৌন্দর্য স্থান অধিকার করেছিল, দৈব লক্ষণ লুপ্ত হ'য়ে। —এর থেকে হ্যাভেল সাহেব সিদ্ধান্ত করেছেন, আদর্শ-চিন্তায় ভারতবর্ষ গ্রীস ও রোমের অনুকরণ করেনি।

বৌদ্ধশিল্পী পুরুষকে যোগাসনে দেখালেও, দৈবী প্রকৃতি ভগবতীকে শাক্ত বৌদ্ধগণ অপূর্ব-শ্রীসম্পন্না ক'রে দেখিয়ে অপূর্ব কীর্তি রেখে গেছেন। যোগিনী প্রজ্ঞাপারমিতা ব্রহ্মবিদ্যার জননী। জাভায় তাঁর একটী মূর্তি রয়েছে যার তুলনা পৃথিবীতে মেলে না (পৃ ৫১)। 'তারা'র বহু মূর্তি নেপালে পাওয়া গেছে। নেপালের মঞ্জুশ্রী মহাবিদ্যার একটি রূপ (পৃ ৬০)। পৌরাণিক মূর্তির মধ্যে জাভায় মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গা, এলিফ্যাণ্টা-গুহার ভৈরব মূর্তি (পৃ ৬৪), ইলোরার 'কৈলাস পর্বতপ্রান্তে তপস্যারত দশানন' উল্লেখযোগ্য। তবে সবই ভাঙ্গা বা ভগ্নপ্রায়। ইলোরার হিরণ্যকশিপু-বধও তাই। কর্ণাটী শিবের নটেশরূপে তাণ্ডব মন্দ নয় (পৃ ৭২)। জাভার হরিহর সুন্দর (পৃ ৭৪)।

৭৬ পৃষ্ঠায় হ্যাভেল সাহেব বলেছেন, লামা তারানাথের ইতিহাসে একটা অদ্ভুত কথা আছেঃ In former days human masters who were endowed with Miraculous powers produced astonishing works of art for some centuries after the departure of the Teacher, Many such masters flourish —then many masters appeared who took gods in human form ; these erected the eight wonderful chaityas of magadha etc.

হ্যাভেলের মতে, এই সব Master বহু পুরাকালের; কিন্তু, সে-সময়ের কোনও ছবি বা মূর্তি মেলে না। Inspiration যদি অলীক না হয়, তা'হলে ধরা যেতে পারে, সেই নিয়মে পুরাকালের গন্ধর্ব, কিন্নর, যক্ষ প্রভৃতির প্রতিভা যুগে যুগে নবীন দেহে একালেও অবতীর্ণ হতো। তারানাথ বলেন —চৈত্যগুলো নির্মাণ করেছিলেন যক্ষগণ। নাগার্জুনের সমকালে (খৃ ১৫০) যক্ষগণের কীর্তি অজন্তায় আছে; বিম্বিসার ও হর্ষবর্ধনের সময়ে চিত্রকর শৃঙ্গধর যক্ষবংশীয়।

দেবপালের সময়কার শিল্পী ধীমান অপূর্ব মাটির মূর্তি তৈরী করতেন; তিনি ছিলেন নাগবংশীয়। তারানাথের মতে, শঙ্করাচার্যের বেদান্তবাদ থেকেই বৌদ্ধশিল্পের পতন হয়। অথচ আশ্চর্য এই, এদেশে দৈব আদর্শ বা Divine Idealsএর পতনের সময়ে, পাশ্চাত্য জগতে খৃস্টীয় ধর্ম জেগে উঠে, চিত্র, সঙ্গীত আর কাব্যে ঈশ্বরের মহিমার বিকাশ ঘটিয়েছিল। সে-সব এখনও দেখা যায় Master Painter-দের চিত্রকর্মে। এখনও অনেকে সেই আদর্শের অনুকরণ ক'রে থাকেন।

সাঁচী আর অমরাবতীর মূর্তিগুলি মানুষী আদর্শের প্রথম আভাস। কিন্তু, তখনও সৌন্দর্যের আধার ছিল ধর্ম, আর দেবতা বা যুক্তাত্মা সব তার অধিকারী। সাঁচীর সিংহদ্বারে খোদাই মূর্তিগুলিতে মানুষের ইতিহাস থাকলেও, সে হলো ধর্মের ইতিহাস। রত্নসিংহাসনে ছত্র, কনকদণ্ডের চামর, দেব-গন্ধর্ব-সিদ্ধাদি আর মহর্ষিগণ সবাই একস্থানে যেন তুল্যমূল্য। ধর্মের দৈবজ্যোতি পৃথিবীর পদার্থের সৌন্দর্যকে উন্নত ক'রে তুলেছে। ভাবটা এই, 'তুমি যতই সুন্দর হও না কেন, তোমার গৌরব ধর্ম থেকে'। অমরাবতীর প্রস্তরফলকে বিদ্যাধরীর মূর্তির বিমানবিহারের ভাবটা ইতালীয় ধরনের। নালন্দা যেন ধর্মের পার্থিব নন্দনকানন।

ভারতবর্ষ থেকে যবদ্বীপে এলে, মানুষী সৌন্দর্যের পরিচয় মেলে অধিকতর। তবে তার মধ্যেও বিরাজ করছে ধর্মের জ্বলন্ত জ্যোতি। মুরজমুরলীধ্বনিত প্রাসাদের অভ্যন্তরে নৃত্যগীতের মধ্যে সিদ্ধার্থের চিন্তা-আকুলিত করুণ মুখচ্ছবি। হ্যাভেলের মতে, 'this is a perfectly ture note (১১৯)। তিনি ইতালীর ভাস্কর ঘিবার্টি'র শিল্পের সঙ্গে জাভার বরবুদুরের ভাস্কর্যগুলির তুলনা ক'রে বলেছেন, ভারতের শিল্প শ্রেষ্ঠ নানাংশে। বৌদ্ধশিল্প তক্ষশিলা, কাম্বোজ ইত্যাদি স্থানে পৌরাণিক ইতিহাসেও ফুটে উঠেছিল। কাম্বোজের নাথনভাটের মন্দির তার একটি প্রমাণ। সমুদ্র-মন্থনের একটি সুন্দর ছবি বার্লিনের ম্যুজিয়মে আছে। এসব হলো রামায়ণে, মহাভারতে বর্ণিত কথার খোদাই চিত্র।

॥ ভারতশিল্পে চিত্রপটের প্রাচীনত্ব ॥

এবার চিত্রপটের কথা হ্যাভেল সাহেব কি বলেছেন দেখা যাক্। তাঁর মতে, মিশরের মতন ভারতেও চিত্রসম্পর্কে প্রথম সূচনা হয়েছিল ফ্রেস্‌কো-পেন্টিং-এ। পাঞ্জাবের তক্ষশিলায়, বিহারের নালন্দায় আর ওড়িষ্যার শ্রীধান্যকটকে অতি পুরাকালে চিত্রবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অমরাবতী, এলোরা, এলিফ্যান্টার চিত্রসম্ভার তারই ফল। অজন্তা ও সিংহলের সিগিরিয়ার চিত্রগুলি অতি সুন্দর (পৃ ১৬৮)।

ধ্যানস্থ অবস্থায় সূক্ষ্মদেহে যে-সব মূর্তি যোগীদের মনে ভেসে ওঠে তার দু'টি সুন্দর চিত্র হ্যাভেল সাহেব দেখিয়েছেন ১৭০ আর ১৭২ পৃষ্ঠায়। এই দু'টি ছবিই তিব্বতী লামাদের ফ্রেস্‌কো-পেন্টিং। এর সৌন্দর্য অয়েল-পেন্টিং-এর মতো, মধ্যে মধ্যে সোনালী রঙের আভায় চিত্রগুলি উজ্জ্বলতর হ'য়ে উঠেছে। প্রথম চিত্রটি অমিতাভ বুদ্ধের দ্বিতীয়টি অশোকের সন্ন্যাসাবস্থা। তিন লোকের পরপারে সহস্রার প্রদেশে সুনীল জলদমালায় বেষ্টিত অশোক যোগাসনে ধ্যানস্থ। সম্মুখে সুবর্ণদ্বীপ। —এর সঙ্কেত সাধকে জানেন। যোগীর সহস্রার আর স্থূলদেহীর মস্তিষ্ক প্রায় একই স্থান। এর চিত্র শারীরশাস্ত্র থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে। ফস্টারের বই-এর ছবি দেখে ভেবে নেওয়া যায়ঃ সুবর্ণ-প্রদীপ হলো Pineal gland, Third Ventrecle থেকে Tissue of Rolando পর্যন্ত মাথার খাঁজগুলি হলো বিমানের ঢেউ-খেলানো মেঘমালা।

বৌদ্ধ চিত্রকরগণের পরে, বৈষ্ণব চিত্রকরগণের কিছু ছবি পাওয়া গেছে। 'রামের রাজ্যাভিষেক' একখানি সুন্দর চিত্র (পৃ ১৭৮)। এই ছবিতে বাহাদুরি হলো, পটে সিংহাসনের পেছনে অতি দক্ষতার সঙ্গে অযোধ্যা নগরীর সৌধমালার পার্সপেক্‌টিভ্ দেখানো হয়েছে।

পাঠান আর মোগল বাদশাহগণের সময়ে ভারতচিত্রকলা অন্য পথ ধরেছিল। ভারতে প্রাকৃত ছবির এই হলো প্রথম উন্মেষ। এতে আমরা দেখি, শিল্পীরা মানবদেহের আর তার হাবভাবের ওপরেই বিশেষ লক্ষ্য রাখছেন। প্রথম উদ্যমে কিছু পশু-পক্ষীর ছবি। যেটুকু

নকল হয়নি, তার অভাব ভরা হয়েছে রং দিয়ে। তবে আশ্চর্য এই, এখানে রঙের মর্যাদা প্রথমে, আকৃতির সম্মান পরে। এতে ধর্মের আদর্শ নাই। কিন্তু সৌন্দর্যের বাহার লেগে আছে মনে। হ্যাভেল সাহেবের মতে, এর নাম Impressionist School। এই Impression এসেছিল তিব্বত আর চীন দেশ থেকে। মহম্মদ তোগ্‌লকের নাটশালে ইরাণী নর্তকীদের হাবভাব খুবই মজার জিনিস। তবে দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণের সামনে গোপীগণের নৃত্য, একালের শিল্পীরা এই ফ্যাশনে দেখিয়ে, য়ুরোপের সামনে ভারতধর্মের মুখে কালি মাখিয়েছেন। কারণ, পার্থক্য যে আকাশ-পাতালের। মহম্মদ তোগ্‌লকের লক্ষ্য হলো যুবতীগণ, আর তাদের হাবভাব; কিন্তু বুদ্ধ বা শ্রীকৃষ্ণের তো তা নয়।

মোগল বাদশাহের সময়ে বিশেষ ব্যক্তির পোর্ট্রেট্ আর হাতী-ঘোড়ার আকৃতি অনেকটা সজীব হ'য়ে উঠেছিল। শিল্পী 'গোলাম'-এর করা 'মহম্মদ মোরাদের হাতী', 'হাফেজের ছবি' (পৃ ২০৬) নাম্বারের করা অমরসিংহের পুত্র সুরজমলে'র ছবি উল্লেখযোগ্য। জাহাঙ্গীরের আমলে একটি 'তুর্কী মোরগ পক্ষী'র আকৃতি কোনও চিত্রকরের প্রতিভার পরিচয় দিচ্ছে। —যাই হোক্, সেকালের ব'লে হ্যাভেল সাহেব এ-সবের প্রশংসা করেছেন। ক'টা প্রাকৃতিক দৃশ্যের পরিচয় দিতে গিয়ে হ্যাভেল সাহেব দেখিয়েছেন, প্রথম দৃষ্টিতে এগুলি অস্বাভাবিক বোধ হ'লেও, ক্রমে এর উদ্দেশ্য বুঝতে পারলে অতি সুন্দর ব'লে বোধ হবে। ২২০, ২২২, ২২৪ পৃষ্ঠায় রাত্রির পট আছে —তিনটি। তাতে অপূর্ব পর্বত, বন, ঘোড়া, হরিণ, বৃক্ষ, মোগলাই দাড়ি, যুবক রাজপুত্র, যুবতী রাজপুত্রী ঘোড়ায় চ'ড়ে নিশি-জাগরণ করছেন। —হ্যাভেলের প্রশংসার ফলে, এইসব ছবি আধুনিক চিত্রকলাপদ্ধতির খানিকটা আদর্শ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁর মতে, এগুলি Poem of form and colour।

এইভাবে মহাভারতের আমল থেকে উনিশ শতাব্দ পর্যন্ত চিত্রবিদ্যার সমালোচনা ক'রে হ্যাভেল সাহেব দেখিয়েছেন, য়ুরোপের চিত্রকলা

Realistic আর ভারতের চিত্রকলা Idealistic। কিন্তু উভয়ের সংমিশ্রণে অতি উচ্চদরের চিত্রকলার সৃষ্টি হ'তে পারে (পৃ ২৬৩)। এর উদাহরণ দিতে গিয়ে হ্যাভেল সাহেব অবনীন্দ্রনাথের আর তাঁর শিষ্যবর্গের ক-খানি ছবির উল্লেখ করেছেন। —(১) অবনীবাবুর 'কচ ও দেবযানী' (পৃ ২৫৪), 'বিমানবিহারী সিদ্ধগণ' (পৃ ২৫৬), 'দারার ছিন্নমুণ্ড পরীক্ষা' ঔরঙ্গজেব কর্তৃক (পৃ ২৫৮), 'ওমর-খৈয়মের রুবায়েত' (পৃ ২৬০), আর নন্দলালের 'সতী' (পৃ ২৬২) ও সুরেন গাঙ্গুলীর 'লক্ষ্মণ সেনের পলায়ন' (পৃ ২৬৪)। —শেষে, হ্যাভেল সাহেব বলেছেন, ভারতবাসিগণের পক্ষে চিত্রবিদ্যার উৎকর্ষ-সাধনের এই হলো সুচারু পথ। রবিবর্মার চটকে তাঁরা যেন না-ভোলেন।—

॥ হ্যাভেল সাহেবের উক্তির বিরুদ্ধ সমালোচনা ॥

পক্ষান্তরে, এ-কথা ব'লে কিন্তু হ্যাভেল সাহেবকে সেকালের শিল্প-সমালোচকদের বিশেষ সমালোচনার সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় ১৩১৮ সালের 'সাহিত্য'-পত্রে লিখেছিলেন:

'কেহই রাস্কিন্ কিংবা হ্যাভেল সাহেবের পুস্তক পড়িয়া, কিংবা ছবির কদর বুঝিয়া ক্রয় করে না। যাহার যেরূপ পছন্দ, সে নিজের মনোমত ছবি বাছিয়া লয়। ...রস্কিনের মতে, একালের পক্ষে প্রাকৃত বা Realistic ক্ষেত্রই উপযোগী। সত্যটুকু মনে অঙ্কিত করিতে গেলে, অর্থাৎ Diamatic Effect দিতে হইলে, কতকটা অতিরঞ্জিত করিতে হয়; কিন্তু যাহা সম্মুখে ধরিবে, সে মালমশলাগুলি স্বাভাবিক হওয়া চাই। ...পুরাকালের আদর্শ দেবী-প্রকৃতি। ...সে-কালের প্রাকৃতিক ক্ষেত্র আমরা এখন দেখিতে পাই না। তাহার সবিস্তার বর্ণনা কোনও ইতিহাসে নাই। কল্পনা করিলে সাধারণ লোকে বুঝিয়া উঠিতে পারে না। কারণ, প্রথমতঃ যৌগিক সত্যের অধিকারী অল্প। দ্বিতীয়তঃ, তাহার কল্পনা করিয়া সেকালের আদর্শ ছবি খাড়া করিবার শক্তি অতি অল্প লোকের আছে। পরমহংসদেব বলিতেন যে, 'চাপরাসওয়ালা গুরু অতি কম'। কাহার কাব্য মহাকাব্য, কাহার চিত্র মহাচিত্র,



এবং কাহার সঙ্গীত মহাসঙ্গীত, তাহা এ কালে বুঝিবার যো নাই; কেন না, যখন কষ্টিপাথর নাই, তখন সোনা ও পিতলের তারতম্য বুঝা শক্ত। নূতন চিত্রকলাপদ্ধতির ছবি দেখিয়া আমরা অবাক্ হইয়া থাকি, আকৃষ্টও হই, প্রশংসাও করি, কিন্তু বাস্তবিক কথা, বুঝিবার শক্তি আমাদের নাই। ইচ্ছা করে শ্রীকৃষ্ণের ও মহাদেবের মুখের ভাব একটু যেন পুরুষের মত হয়, অসুরগণের মোগলাই দিল্লীবাজ জুতাগুলি খুলিয়া চাঁদনীতে লইয়া যাই (সমুদ্রমন্থনে), এবং তাহাদের বর্ণটা আরও কালো এবং ভঙ্গীটা আরও বিকট করিয়া দিই। ঘোড়াগুলাকে আরও দুটি দানা খাওয়াইতে ইচ্ছা করে, অন্ধকারকে আরও একটু দূরে রাখিতে, মুখের দৃষ্টি আরও একটু দর্শক ভদ্রলোকের দিকে ফিরাইতে, এবং ছবির দাম আরও একটু কমাইতে ইচ্ছা করে, কিন্তু ভয়ে পারি না। রবি বর্মার কাটখোট্টা স্ত্রীলোক দেখিয়া ভয় হয়! মনে হয় যে, তাহারা নূতন চিত্রকলার শ্রীকৃষ্ণ ও মহাদেবকে টিপিয়া নিমেষের মধ্যে নিকাশ করিতে পারে। মহারাষ্ট্রীয় কল্পনা সবল ও প্রবল, বাঙ্গালার কল্পনা কৃশ ও কোমল। রবি বর্মার ধাঙ্গড়ের মত বিশ্বামিত্র, ঠাকুর মহাশয়ের কচ ও দেবযানীকে একদম্ গিলিতে পারে, এবং রবি বর্মার ময়ূর অবলীলাক্রমে সসর্প মহাদেবকে তাণ্ডবনৃত্যের সময় মুখে লইয়া সরস্বতী দেবীর কুঞ্জে রাখিতে পারে। ইহা বিদ্রূপের কথা নয়; মাপ করিয়া দেখুন, ওজন করিয়া দেখুন, সত্য। ফলে এই দাঁড়াইতেছে যে, Idealistic ও Realistic দলের বিবাদ পৌরাণিক ক্ষেত্রে মিটিবে না। আমি নিজে অবনীন্দ্র ঠাকুরের ছবির পক্ষপাতী; কিন্তু বিপক্ষদলের দাপট দেখিয়া বরাবর চুপ করিয়া আছি, এবং বলিতেছি, 'অ্যাও হয়, অও হয়'! কারণ, কোন্ পথে গেলে ঈশ্বরের দৈবজ্যোতিঃ দেখিতে পাইব, তাহা এখনও ঠিক করিতে পারি নাই। চিত্রে যোগীর কঙ্কালসার দেহ দেখিলে দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত বঙ্গীয় কৃষাণের ভাব আসে। কাঁদিতে যাই, কিন্তু নবীন অধ্যাপকগণ বলেন, উহাই 'শিব', সর্প ও ত্রিনেত্র দেখিয়া বুঝিয়া লও!

তাই বিপক্ষদলকে বলি, —'তোমরা একটু দাঁড়াও, জ্ঞান-চক্ষু

ফুটিলেই ভিখারী ও শিব এক হইয়া যাইবে, আপাততঃ কেবল রঙ্ ফলাইয়া জ্যোতিঃ টানিয়া আন।' —তথাপি, হ্যাভেল সাহেব হচ্ছেন ভারতের প্রকৃত বন্ধু। কেহ যেন মনে না-করেন, তিনি য়ুরোপীয় চিত্রকলা-কৌশল আমাদের হাত থেকে কেড়ে নেবার অভিসন্ধিতে একটা নূতন পথ দেখাচ্ছেন।

॥ শিল্পচর্চায় বাস্তববাদ ও আদর্শবাদ ॥

চিত্রকলার জন্মকথা আর পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য চিত্রকলার পার্থক্য সংক্ষেপে বিচার ক'রে ক্রমে ক্রমে দেখানো যাচ্ছে, আধুনিক চিত্রকলা-পদ্ধতির সঙ্গে প্রাচীন পদ্ধতির সংমিশ্রণ সম্ভব কিনা।—

চিত্রকলা সম্পর্কে দু'টি দল আছে। রাস্কিন্ তাদের সম্বন্ধে বলেছেন, —প্রথম দল বলেন, চিত্রকর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে সুন্দরতর ক'রে দেখাবেন। তাঁরা যেন সৃষ্টিকর্তার চেয়েও সুনিপুণ হতে চান। দ্বিতীয় দল বলেন, প্রকৃতিই আদর্শ, প্রকৃতিই চিত্রকরকে উন্নত ক'রে থাকে।

ভারতবর্ষের চিত্রকলা-পদ্ধতির সম্বন্ধে রাস্কিনের বিদ্যের দৌড় বেশি ছিল না ; বরং উল্টোপাল্টা ক'রে বলেছিলেন। তাঁর মতে, আরবের আর ভারতের চিত্রকলা-পদ্ধতিতে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করবার উদ্দেশ্যই প্রধান ; সত্য প্রকাশ উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু, য়ুরোপীয় চিত্রকরগণের সত্যই হচ্ছে লক্ষ্য, —আনন্দ গৌণ : 'Observe, that pleasure first and truth afterwards (or not at all), as with the Arabians and Indians ; or, truth first and pleasure afterwards, as with the Angelico and other great European painters.' —যাই হোক্, ভারতশিল্প সম্পর্কে তাঁর ও-কথা তুচ্ছ ক'রে অন্য কথাগুলি দেখা যাক্।

Pre-Raphaelitism নামে একটি প্রবন্ধে রাস্কিন্ প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন, —প্রাকৃতিক দৃশ্যের ঠিক নকল ক'রে, তার মধ্যে ক্রমে সত্য ও সৌন্দর্যের তথ্য আবিষ্কার করাই চিত্রকলার উৎকর্ষ-

বিধানের প্রধান উপায়। কল্পনা তার সাক্ষি-মাত্র। চোখের সামনে যা' দেখছি, আপাততঃ তাই আমাদের আদর্শ। যদি তার চেয়েও সুন্দর কিছু করতে চাই, তা'হ'লে দৃশ্যবস্তুর মধ্যেই তা ফুটিয়ে তুলতে হবে। অস্বাভাবিক হ'লে চলবে না। নকল করাই হলো প্রধান উপায়, তবে যার যত দিব্য দৃষ্টি, অনুকরণকে সে তত সুন্দর ক'রে তুলতে পারে। —এর পরিপোষক হলো —ধ্যান আর একাগ্রচিত্ততা। সমালোচক সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের মতে, —'ঘোড়া ঘোড়াই থাকিবে, গাধা গাধাই থাকিবে। উড্ডীয়মান স্বর্গীয় পক্ষিরাজ অশ্ব, কিংবা সঙ্গীতবিশারদ গর্দ্দভ পটে আঁকিলেও, তাহাদিগের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঠিক গাধা ও ঘোড়ার মতই হওয়া চাই। অস্বাভাবিকরূপে লম্বা পা, কিংবা গানোপযোগী লম্বা কণ্ঠদেশ অঙ্কিত করিলে, দোষের হইয়া পড়ে।'

—এই সিদ্ধান্তমতে, রাস্কিন্ ইংলণ্ডের রেনল্ডস্, গেন্স্বরো, হোগার্থ, উইলসন আর টার্ণারকে একালের (১৯১১) সর্বপ্রধান চিত্রকর ব'লে সাব্যস্ত করেছেন। এঁদের মধ্যে টার্ণার সবচেয়ে বড়ো। আর তাঁর মতে, সেকালের চিত্রশিল্পীদের মধ্যে টিটিয়ান সর্বপ্রধান। রাফেল, ঘিবার্টী, লীওনার্ডো ডা ভিন্সি প্রভৃতি নিম্নস্তরের।

পক্ষান্তরে, এর বিপক্ষদলের কথা হলো, নকল করা হচ্ছে ইতর চিত্রকরের লজ্জা ঢাকার উপায়। কাব্য ও সঙ্গীত নিয়ে বিচার করলে বোঝা যায়, দৃশ্য জগতে নকল করবার কিছুই নাই। প্রকৃতির মধ্যে কাব্য দেখাতে পারা যায়, কিন্তু কাব্যটা কবির নিজস্ব। প্রকৃতির বর্ণনা করলেই একটা মহাকাব্য সৃষ্টি করা হবে —এমন কোনও কথা নাই। কোকিল ও পাপিয়ার মতন ডাক ছাড়লেই মানুষ গন্ধর্বের মতো গায়ক হ'য়ে পড়ে না। এদের আদর্শ অভ্যন্তরে। আদর্শই কল্পনার মধ্যে দিয়ে আবিষ্ট হয়ে বের হয়, জড়-প্রকৃতিকে আনন্দময়ী ক'রে তোলে। সেইজন্যে কথায় বলে, বাণীবিদ্যা ঈশ্বরদত্ত বিদ্যা —'কাব্য দৈবীভাষা, চিত্র দৈবীমূর্তি, এবং গান দৈবধ্বনি। সকলেই একটি বিরাট সৌন্দর্যের অঙ্গ, একটি বিরাট আনন্দের সহচর। দৈবী প্রকৃতি চির-আনন্দময়ী।'

সুতরাং, যাদের হবার হয়, তাদেরই হ'য়ে থাকে। ভবভূতি বা কালিদাসের কোনও বংশ নাই। তবে ছন্দোবদ্ধ ব্যাকরণ ও ভাষা কিংবা গলা-সাধা আনুষঙ্গিক। সেটা গৌণ। Inspiration অর্থাৎ দৈবাবেশ হচ্ছে মুখ্য। চিত্রে তার তারতম্য বুঝতে সময় লাগে। কারণ, ক্রমাভিব্যক্তির সোপানে মানুষের হাবভাব আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অনেক দূর এগিয়ে গেছে। সেখানে নকল করবার স্থান অনেকটা পাওয়া যায়। কিন্তু সঙ্গীতে ও কাব্যে তার স্থান কম। বুদ্ধি অধ্যবসায় আর প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও রাস্কিন্ জীবনে একটা ভালো ছবি নিজে আঁকতে পারেন নি। যদি নকলই সত্যনিষ্ঠার আদর্শ হয়, তা' হলে ফটোগ্রাফই যথেষ্ট।

॥ হ্যাভেল সাহেবের মীমাংসার সূত্র-নির্ণয় ॥

—এই উভয় দলই খুব দড়। কার কথা সত্যি, সাধারণ লোকের পক্ষে সেটা সহসা নির্ধারণ করা শক্ত। এই পরিস্থিতিতে হ্যাভেল সাহেব তাঁর Indian Sculpture and Painting বই-এ এই উভয় দলের বিবাদ মেটাবার চেষ্টা করেছিলেন। হ্যাভেল সাহেবের আদর্শ ছিল, ভারতবর্ষের যোগশাস্ত্র। তিনি তথ্যের মূলে পৌঁছতে না-পারলেও, তিনি যতটা এগিয়ে সত্য আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন, সে দেখে অবাক্ হ'তে হয়। এর জন্যে তাঁর কাছে ভারতবাসী কৃতজ্ঞ।

হ্যাভেল সাহেবের বই বুঝতে চাইলে, সমালোচকের মতে, পুরাকালের গোটাকতক কথা পাড়া অতি আবশ্যক। কথাগুলো কিঞ্চিৎ দার্শনিক, কিঞ্চিৎ পৌরাণিক এবং কিঞ্চিৎ বৈজ্ঞানিক। এর মীমাংসা না-হোক্, অনুমান করবার যো আছে :—

(১) বহু মন্বন্তর ধ'রে জগতের সৃষ্টি হ'য়ে আসছে।

(২) প্রতি মন্বন্তরে অনেক যুগ বয়ে যায়। তাতে মূর্ত পদার্থের ক্রমাভিব্যক্তি হ'য়ে থাকে। সেই ক্রমাভিব্যক্তির মধ্যে দৈবীভাবের বা ধর্মের

বিকাশ আর আসুর ভাব বা অধর্মের তিরোধান হ'তে থাকে। কখনও এটা, কখনও বা ওটা প্রবল হয়।

(৩) অতি প্রাচীনকালে মানুষ ও জীবজন্তুর দেহের গড়ন যেমন ছিল এখন তা নাই। সৌরজগৎ অর্থাৎ চন্দ্র সূর্য তারকাদি থেকে জীবদেহ উদ্ভূত। কীট, পতঙ্গ, লতা, গুল্ম ও বৃক্ষাদি বেয়ে তার অভিব্যক্তি। এই হিসাবে এক এক জাতীয় মানুষের এক এক শ্রেণীর পিতৃপুরুষ ছিল। বাঘ, বানর, ভালুক প্রভৃতির দেহ দিয়ে তার ক্রমবিকাশ হয়েছিল। তার আংশিক ইতিহাস পুরাণ কিংবা প্রত্যেক দেশের Mythology-র মধ্যে পাওয়া যায়। এখনও বর্বর জাতির মধ্যে সেই ক্রমাভিব্যক্তির আভাস মেলে। প্রকৃত তথ্য না-জেনে আমরা তাকে Totemism বলি।

(৪) প্রত্যেক যুগেই দেহবিশেষে দৈবী আর আসুরী সম্পদের অভিব্যক্তি হ'য়ে থাকে। পুরাণে তার নাম অবতার। বিজ্ঞানের লক্ষ্য দৈহিক বিকাশের দিকে। পুরাণের লক্ষ্য সম্পদ্ কিংবা বিভূতির দিকে—অর্থাৎ জ্ঞান, ভক্তি, বুদ্ধি, দয়া, দাক্ষিণ্য, ধর্মাদির বিকাশের দিকে লক্ষ্য। দৈবী-সম্পদের মধ্যে কাব্য, চিত্র, সঙ্গীত, নৃত্যাদি এক একটি ধর্ম-বিশেষ। এর অভিব্যক্তি কেবল আধুনিক মানবদেহের মতো একরকম দেহেই চিরকাল ঘটেছিল, তা নয়। কোনও আদিমকালে দিব্যদেহে, কিংবা মিশ্রদেহে, যেমন গন্ধর্ব, বানর, ভালুক ইত্যাদির মূর্তিতে, কিংবা রাক্ষস প্রভৃতির দেহেও তার অভিব্যক্তি হতো।

(৫) বংশপরম্পরার বিকাশ-সাধনে তার অভিব্যক্তি আমাদের দেহে হচ্ছে।

(৬) পূর্বে দৈবীভাব ও আসুরভাব প্রবলরূপে দৈহিক শ্রেণীবিশেষে বিকাশ লাভ করত; ক্রমে, বর্ণসঙ্করত্বের প্রভাবে এখন মিশ্রদেহে বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। এখন একই মানবদেহে যেমন উভয় ভাব বর্তমান; পূর্বকালে তত ছিল না।

এটুকু হলো General Synopsis : কিন্তু দেহতত্ত্ব সম্পর্কে আর একটু বলা দরকার। তাকে তন্ত্র বলা হ'য়ে থাকে।—

(৭) ক্রমবিকাশে বীজ লুপ্ত হয় না।

(৮) প্রত্যেক জৈবিক দেহের বীজে তার অভিব্যক্তির ইতিহাস মাত্রা (matrix)-রূপে বর্তমান থাকে। শাস্ত্রে একে বলে —'সংস্কার'।

(৯) মাত্রাস্পর্শে কিংবা যোগাভ্যাসে কোনও সংস্কারবিশেষ পুনরুদ্দীপিত করা যেতে পারে। জাতিস্মরতা লাভ করলে ক্রমাভিব্যক্তি বা পুনর্জন্মের ইতিহাস জানা যায়। সাধনা করলে বাসনামুক্ত হ'য়ে, এই সব 'সংস্কার' একেবারে দগ্ধ করা যেতে পারে। —তার নাম নির্বাণ; কিংবা, দৈব-কর্ম-মাত্র রেখে, আসুরিক-কর্ম থেকে মুক্তিলাভ ক'রে, জগতের হিতসাধনে প্রবৃত্ত হ'তে পারা যায়।

(১০) ঐ মাত্রাস্পর্শ কিংবা পূর্বসংস্কারোদ্দীপন ধ্যানযোগেও লব্ধ ও সিদ্ধ হয়। তবে এ অভ্যাস সাপেক্ষ। যোগস্থ হ'লে দৈব দৃশ্যসমূহ প্রকাশ পায়; আসুর দৃশ্যসমূহও প্রকাশ পায়। বহু প্রকারের ধ্বনি উত্থিত হয়। দেহ আনন্দে পরিপ্লুত হয়।

(১১) এগুলি আমাদের 'কল্পনা' নয়. 'সত্য'। এ-যুগের পক্ষে সত্য না-হলেও, পূর্বযুগে, কিংবা বহু-যুগ পূর্বে সত্য ছিল। যা এখন স্বপ্ন কিংবা বিকার ব'লে ভ্রম হয়, পূর্বে তা' দৃশ্য ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ ছিল। এখন তা' মানবদেহের সূক্ষ্মাংশে নিহিত। কোন্ ভাবে, কোন্ দেহে, কি ভাবে তা' বর্তমান তার বিস্তার অনাবশ্যক।

(১২) এই সব দৃশ্য কিংবা সঙ্গীতাদির মধ্যে যা দৈবভাবে সম্পন্ন, অর্থাৎ চির-আনন্দময় আর ধর্মের অনুকূল, তা' 'আদর্শ'-স্বরূপ গৃহীত হ'তে পারে, চিত্রিত হ'তে পারে, গীত হ'তে পারে, উচ্চারিত কিংবা কাব্যে বর্ণিত হ'তে পারে।

(১৩) সাধনা না-করলেও, অর্থাৎ কোনও নিয়মের বশবর্তী হ'য়ে, গুরূপদিষ্ট পথ না-ধরলেও, কোনও ব্যক্তিবিশেষের পূর্বসংস্কার সহসা স্বতঃই উদ্দীপিত হ'য়ে, জগতের হিতার্থে প্রকৃতি কর্তৃক নিয়োজিত হয়।

—এ-সব কথার প্রমাণ দেওয়া আপাততঃ আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তন্ত্রশাস্ত্র, যোগশাস্ত্র, বিজ্ঞান, দর্শন ও আত্মসাধনা দ্বারা এর

সত্য সপ্রমাণ হ'তে পারে। মানবদেহের মূলে একটা প্রকাণ্ড ইতিহাস আছে, আর সেই ইতিহাস থেকে বহু মতের সামঞ্জস্য হওয়া সম্ভবপর। যেটুকু আমাদের আলোচনার পক্ষে আবশ্যক, সে হলো এই:—

(১) যা' এই দেহে আছে, কিংবা এরই সহযোগে অন্য দেহ থেকে আবিষ্ট হ'তে পারে, তাই আমাদের কল্পনার মূল। চিত্র তার অন্যতম।

(২) তা' আদর্শ হ'লে আনন্দের সঞ্চার ক'রে থাকে, মানবকে উন্নত ক'রে থাকে, এবং সেই হচ্ছে সত্য আদর্শ।

তবে, জগতে কাকেও চেনা দুঃসাধ্য। লোক আছে দু'রকমের। এক শ্রেণীর লোকের সাধা আওয়াজ, পাকা তুলি, আর দুরন্ত হাত। যোগাবলম্বন করুক্ বা না-করুক্ সে চট্ ক'রে সকলকে মুগ্ধ ক'রে ফেলে, উন্নত ক'রে তোলে। এঁরা 'সংস্কৃত' চিত্রকর। আর এক শ্রেণী, অপেক্ষাকৃত নতুন যুগের শিক্ষানবীস। এঁরা 'প্রাকৃত' চিত্রকর। 'সংস্কৃত' চিত্রকরকে রাস্কিন্ Master painters বলেছেন। বহুযুগ আগে তাঁরা তুলি সেধেছিলেন। তাঁদের কল্পনা পূর্বসংস্কারমাত্র। যা' হয়েছিল তারই পুনরাবৃত্তি। আদিকবিরা এই জন্যে আমাদের গুরু। আদিচিত্রকরগণও তাই। তাঁদের গুরু মহাযোগেশ্বর ঈশ্বর। —এ হলো পতঞ্জলির কথা। ঋষিগণই আদিকবি, চিত্রকর ও গায়ক। য়ুরোপে Saints and Apostles সেই ধর্মপ্রচার করেছেন।

প্রাকৃত-চিত্রকর হচ্ছেন শিষ্য। রাস্কিন্ বলেন, তাঁকে রীতিমতো তুলি সাধতে হবে। সৃষ্টিকর্তার চেয়ে নিপুণতর কেউ হ'তে পারে না। একটা অদ্ভুত idealist চিত্র সামনে এলে, প্রথমে দেখতে হবে, এর ওস্তাদ কে? আর আমরা সেই অদ্ভুত চিত্র থেকে কি শিখতে পারি।

॥ নব্যভারতশিল্পের আদর্শচিন্তা ॥

সেকালের সমালোচক বলেন, —য়ুরোপীয় নবযুগের বা রেনেসাঁর বিপরীত গতি দেখে স্তম্ভিত হ'তে হয়। পৌরাণিক ক্ষেত্রে ঈশ্বরের স্থান কেবল মানসপটে; বিংশ শতাব্দের ক্ষেত্রে সে বাইরে। কেবল ভারতবর্ষেই নয়, য়ুরোপে এবং প্রত্যেক প্রদেশে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের স্থলে বিবসনা কৃষকবধূর দুরবস্থা। যদুবংশের মুষল-প্রসবের বদলে করাল Democracy আর রাষ্ট্র-বিপ্লবের উদ্ভব। তার মধ্যে ছবি আঁকা, গান গাওয়া, আর কাব্যে নাটকে কান্নার সৃষ্টি করা সোজা কথা নয়। টিটিয়ানের কন্যা, রাফেলের ম্যাডোনা, বৌদ্ধযুগের ধ্যানীবুদ্ধ কেবল জ্ঞানী লোকের পথ্য। তানসেনের ধ্রুপদ, রবীন্দ্রনাথ ও শেলীর কবিতা, সদারঙ্গের খেয়াল, নিধুবাবুর টপ্পা সাধারণলোকের কাছে আদৃত নয়। সকলেই স্বীকার করবেন যে, নব্য-চিত্রকলা-পদ্ধতির ছবির কদর কেবল স্বপ্নজগতে। স্বপ্নজগতের কথা রাখা উচিত। কারণ, মহাদ্বন্দ্বময় জগতে সুষুপ্তির সময়ও একদিন আসবে। তার আদর করা আবশ্যক। অথচ ডিকেন্স্, হুড্, ক্র্যাব্, লিও টলস্টয় প্রাকৃত সমাজের মধ্যেই নতুন রং-ফলাবার কি ইঙ্গিত ক'রে গেছেন তাও ভেবে দেখা উচিত।

বৌদ্ধযুগে যেমন সন্ন্যাস-ধর্মের প্রবল বন্যা ব'য়ে গেছে, এখনকার যুগে সংসারধর্মের বাসনা তেমনি বেড়েছে। বৈষ্ণব-কবিগণের আমলে আমরা প্রেমকাহিনী অনেক শুনেছি। এমন-কি, বিশ তিরিশ বছর আগেও আমরা কুসুমকলিকায় অকালবসন্ত জাগিয়েছি। কিন্তু, সে-সব দৃশ্যের মাল-মসলা এখন পুরানো ফ্রেস্কো-পেন্টিং-এর গভীর স্তরে ব'সে গেছে। আছে স্মৃতিপটে। সময়-মাফিক জেগে উঠতে পারে। কিন্তু তাকে আদর্শ ক'রে বাজারে ছেড়ে দেওয়া যায় না। তাতে হিতে বিপরীত হ'তে পারে।

য়ুরোপের Realism অতি গভীর কথা। রাস্কিনের বাণীর অর্থ হলো:— তোমরা ঠিক যা' দেখছো, তাই বলতে শেখ, গাইতে শেখ, টানতে শেখ। সত্য এত দূর বাইরে এসেছে যে, কেবল দেখলেই হয়।

পুরানো দুর্গ, স্তূপ, ধর্মমন্দির সব গহন অরণ্যের মধ্যে লুকিয়ে থেকে চাঁদের আলোয় চুপটি ক'রে চোখের জল ফেলছে। বিগত গৌরব আর বৈভবের কথা ভাবো। নিশির শিশির আর অন্ধকারের অশ্রু দেখাও। নদীর দু-তীরে রাইক্ষেতের মধ্যিখানে উলঙ্গ কৃষক দেখ। কোথাও একখানি ডিঙ্গি-নৌকার ওপর বুড়ো মাঝি —সন্তানহারা। সোনারতরী' বা তরী-বোঝাই মাল আর নাই। গাঁয়ে বৌদ্ধ-তাম্রশাসন বা চিত্রফলক পেতে পার, কিন্তু আনন্দের কবিতা নাই। কাদায় পিছল পথ, হাড়বেরনো গরু, দেবযানীর পেটে পিলে। কুটীরে বিছানা নাই, অনাথের কুটীর নাই ; বানে আর দুর্ভিক্ষে উদ্বাস্তু দেশ। —একবার Portfolio আর Sepia রং-মাত্র নিয়ে, কোঁচার কাপড় কোমরে বেঁধে, কাদা ঘেঁটে যাও, আর স্কেচ ক'রে আনো। তার মধ্যেও যদি ম্লান হাসি আর ভারতের চিরপ্রসিদ্ধ দৈবজ্যোতি দেখাতে পার, তবে তুমি Landscape Painter, নইলে কেবল ফটো তোলার ব্যবসা ধর।

পোর্ট্রেট্ সম্পর্কেও সমালোচকের মতে, —য়ুরোপের কাছে শেখবার আছে অনেক। কেশবচন্দ্র সেন, রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, কবি রবীন্দ্রনাথ, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কারও চিত্র যথাযথ আঁকা হয়নি। যা' হ'য়েছে তাতে মানুষটাকে চেনা যায়, কিন্তু প্রতিভা বোঝা যায় না। কোন্ অংশটুকু অতিরঞ্জিত করতে হয়, তার তথ্য আমরা জানি না। 'লক্ষ্মণসেনের পলায়ন' উৎকৃষ্ট ছবি ; কিন্তু, লক্ষ্মণসেন বৃদ্ধ ; এ ছাড়া আর কিছু বোঝা যায় না। আনুষঙ্গিক সরঞ্জামের অভাব। তিনি পালাবেন, কি হেঁাচট্ খাবেন —বলা দুষ্কর।

মহানগরীর ভেতরও আঁকার ছবি আছে অনেক। অধর্মের শোচনীয় কুৎসিত পরিণাম, সৌন্দর্যের মধ্যে ফুটিয়ে তোলার উপায় ইংলণ্ডে প্রথম দেখিয়েছিলেন হোগার্থ। চোর-ডাকাতের আসুরিক ভাব, বেশ্যা ও কুচরিত্রা যুবতীদের নিখুঁত রূপের মধ্যেও পাপের কালিমা-রেখা, বিলাসিতার মধ্যে দুর্জয় মনঃকষ্ট, ধনী ও রাজাদের গেঁটে-

বাতের রোগ আর গরীবদের ওপর উৎপীড়ন —হোগার্থ প্রমুখ চিত্রকরগণ ভেবে গেছেন। আমাদের সমাজে বিধবাদের অবস্থা, বহুবিবাহের জঞ্জাল, পারিবারিক কলহ, দলাদলি, বিবাহ-বিভ্রাট ইত্যাদি সামাজিক বিষয়গুলি অতিরঞ্জিত ক'রে দেখানো যেতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়ে গেছেন, সত্য আর প্রাকৃত দৃশ্য নিয়ে দৈবী-প্রকৃতির মহান্ ভাব চিত্রিত করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থে, দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে সময়োপযোগী দৃশ্য আছে বহু। সেগুলি প্রিয় সবারই। ভক্তি বা উপাসনার ভাব এযাবৎ কোনো তৈলচিত্রে এদেশে আঁকা হয়নি। —এই সব বিষয় ভেবে দেখলে বেশ বোঝা যায়, রাস্কিন্ ও হ্যাভেলের Realism ও Idealism-এর ঝগড়া অনায়াসে মিটে যেতে পারে ভারতবর্ষে। কাব্য ও সঙ্গীত, সাহিত্য ও চিত্রকলা নিজের কোলে টেনে আনতে পারে সবাইকে। তাদের মধ্যে বিবাদ বাধবার কোনো হেতু নাই। অতঃপর, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের মতে, —এই বিবাদ 'মিটিয়া গেলে ছবি সস্তা হইয়া পড়িবে, সকলে কিনিয়া সত্য জিনিস দেখাইতে পারিবে, দেখাইয়া উন্নত করিবে।'

'আমাদের বেশ বিশ্বাস যে ভারতবর্ষে পানওয়ালা দোকানদার ও বৈরাগী হইতে আরম্ভ করিয়া কাশিমবাজারের মহারাজ পর্যন্ত প্রত্যেকেই অন্তরে সন্ন্যাসী।

যে সন্ন্যাসধর্ম পৌরাণিক যুগে ও বৌদ্ধযুগে বরাবর প্রবহমান ছিল তাহা এখনও আছে। যবদ্বীপের সিদ্ধার্থ মূর্তি দেখিয়া এখনও মনে হয় যে, আমরাও সেই মহাযান-পথের পুরাতন পথিক। জগতের এই তাণ্ডব ও উদ্দাম সঙ্গীতের মধ্যেও আমাদের চক্ষু সপ্তলোক ভেদ করিয়া জগৎ-নাথের দিকে অনিমেষভাবে চাহিয়া আছে।'

সত্যেন দত্ত॥ মজিলপুরের দত্তবাড়ির সত্যেন দত্তকে স্পষ্ট মনে আছে নন্দলালের। তিনি ছিলেন অবনীবাবুর প্রথম গ্রুপের ছাত্র। সত্যেনবাবু আর্টস্কুলের ছাত্র ছিলেন; সোসাইটিতেও তিনি ছবি আঁকতেন। সতীর্থ নন্দলালকে খুব ভালোবাসতেন তিনি। তাঁদের

দেশের খেজুরে গুড় সত্যেনবাবু প্রচুর খাওয়াতেন নন্দলালদের —প্রতি শীতকালে। তার স্বাদ নন্দলাল ভোলেননি এখনও (১৯৬৫)।

অনেক পরে, ওঁদের পরিবারের সঙ্গে এঁদের বিবাহযোগ হওয়ায়, সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। কিন্তু, তারপর থেকে নন্দলালের ও-দেশের নলেন গুড় আর খাওয়া হয়নি।

The Dawn-সম্পাদক সতীশ মুখুজ্জে মশায়ের প্রিয় শিষ্য ছিলেন সত্যেনবাবু। তাঁরই মাধ্যমে সতীশবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল নন্দলালের।

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৬৫-১৯৪৮) ॥ স্বদেশী-যুগের ইনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট পুরোধা। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'Dawn Society'-র মুখপত্র ছিল The Dawn Magazine। এই পত্রিকার মাধ্যমে সতীশবাবু দেশ-বিদেশের মনীষীদের নিয়ে ভারতশিল্প সম্পর্কে চর্চা শুরু করেন। Dawn Magazine-এ শিল্প সম্পর্কে লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে আমরা স্বদেশী ও বিদেশী বহু মনীষীর নাম দেখি। এঁদের মধ্যে অধ্যাপক রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, স্বয়ং সম্পাদক মহাশয়, ই. বি. হ্যাভেল, এ. কে. কুমারস্বামী, জে. বি. কীথ, রাম্‌সে ম্যাক্‌ডোনাল্ড্‌ প্রমুখের বরণীয় নামগুলি রয়েছে এই গোষ্ঠীতে।

Dawn-এর আদর্শস্বরূপে প্রতি সংখ্যার প্রচ্ছদে ও শীর্ষকে লেখা থাকতো :
Question : How can Indian students increase their love of country ?

Answer : It could be done by—

1. Increasing there knowledge of India and of Indian civilisation, esp. Hindu and Islamic ;

2. Working together for something useful to their district, town or village ;

3. Supporting indegenous industries and enterprises, even at a sacrifice ;

4. Supporting Indian Educational and Allied movements which aim primarily at fostering the unselfish instincts and developing thc constructive faculties of the Indian mind.

THE DAWN AND DAWN SOCIETY'S MAGAZINE

একরূপেণ হ্যবস্থিতো যোঽর্থঃ স পরমার্থঃ ।

That which is ever permanent in one mode of Being is the truth. —Sankara.

সতীশবাবুর পৈতৃক নিবাসগ্রাম হলো হুগলী জেলার তারকেশ্বর লাইনে হরিপালের কাছে নালিকুল স্টেশন থেকে কাছেই —বন্দিপুর। নন্দলালের পৈতৃক গ্রাম জেজুর, সুরেন কর মহাশয়ের ভাণ্ডারডিহি —ঐ একই অঞ্চলে। সতীশচন্দ্র ছিলেন নব্যবাঙ্গালার একজন যুগস্রষ্টা পথিকৃৎ —ভারতীয় সংস্কৃতি আর জাতীয়তাবাদীদের প্রাণময় প্রতীক। স্বদেশী-যুগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অরবিন্দ ঘোষ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় তাঁর একান্ত সহযোগী ছিলেন। সেকালে তাঁর মনীষা আর ব্যক্তিত্বের প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল সারা বাঙ্গালাদেশে আর ভারতের নানা প্রান্তে। অজস্র ধারায় তিনি সেদিন বাঙ্গালার চিত্তভূমিকে নবজীবন-রসায়নে সঞ্জীবিত করেছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'Dawn'-পত্রিকা (১৮৯৭—১৯১৩) আর Dawn Society (১৯০২-৭) ভারতের জাতীয়তাবাদের ইতিহাসে নবযুগের উদ্বোধন করেছিল।

সেকালে যেসব কৃতবিদ্য তরুণ ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশনের অধ্যক্ষ সতীশবাবুর কাছে আনাগোনা করতেন, নিকট-সান্নিধ্যে এসেছিলেন, যাঁরা তাঁর কাছে জীবনগঠনের দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, বিনয়কুমার সরকার, প্রফুল্লকুমার সরকার, হারাণচন্দ্র চাকলাদার, সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত প্রভৃতি। ছাত্রদের ওপরে ছিল তাঁর অসাধারণ প্রভাব। সতীশবাবুর গুরু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সঙ্গে ওঁরা দেখা করতে যেতেন। কলকাতায় 'জলটুঙ্গি'র কাছে জজ দ্বারিক মিত্রের বাড়ির পাশে তখন থাকতেন তিনি। রামকৃষ্ণ-কথামৃত-লেখক মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের সঙ্গে সতীশ বাবুর বন্ধুত্ব ছিল। অতি সৌম্যমূর্তি ছিল

তাঁর , গোঁসাইজীরও তাই । শিবনারায়ণ পরমহংসের সঙ্গেও যোগ ছিল এঁদের । তাঁর মনোহরপুকুরের বাড়িতে দেখা করতে যেতেন ছাত্রেরা । একটি দিব্য-জ্যোতির সঙ্কেতে সতীশবাবু আর গোঁসাইজী ছাত্রদের মন ভরপুর ক'রে রাখতেন সারাক্ষণ ।

১৮১২ সালের জুলাই সংখ্যার Dawn-ম্যাগাজিনের ১৩-১৬ পৃষ্ঠায় সতীশবাবু Deeper Significance of the Art Movement in Bengal—প্রবন্ধ লিখে, সংশীলনের জন্যে প্রকাশ করেছিলেন । সতীশবাবু এই শিল্প-আন্দোলনকে স্বাঙ্গীকরণ ও অনুকরণের পর্যায় পার হ'য়ে, অতীত ভারতকে আবিষ্কার ক'রে, নবসৃষ্টি ও পুনর্গঠনের ভিত্তিতে বর্তমানের নবজাগরণ বা নব্যভারতে নব-শিল্প-যুগের পত্তন ব'লে অভিনন্দিত করেছিলেন । তিনি ভাবতেন,—এই নবীন উদ্যম জাতীয় সাহিত্য, জাতীয় নাটক, জাতীয় কাব্য, জাতীয় সঙ্গীত ও গান, জাতীয় স্থাপত্য, জাতীয় ভাস্কর্য, জাতীয় চিত্রকলা, আর এমন-কি, জাতীয় অর্থনীতি, জাতীয় সমাজ, জাতীয় রাজনীতিতে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে । এই কলাশিল্পের ক্ষুরধার পথে সমগ্র দেশ তার নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য ও সৃজনী-শক্তিতে প্রাণবন্ত হ'য়ে, আধুনিককালের জটিল জীবন যাত্রার সঙ্গে মোকাবিলা করতে এগিয়ে যাবে । কেবল অপরের অনুকরণ ক'রে গেলে 'জাতীয় সংহতি' কিছুতেই প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে, অবিচলিত থাকতে পারে না । কুমারস্বামীর 'Indianisation'-এর মতে মত মিলিয়ে এই প্রবন্ধের তৃতীয় পরিচ্ছেদে সতীশবাবু ভারতশিল্পের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে লিখেছিলেন ঃ

The importance and significance of the present Art Movement in Bengal accordingly arises from the fact that it is already, and may be made more so as the days pass,—an instrument for promoting that 'Indianising' process among us which would restore to India her ancient powers of self-direction and initiative, in her struggle with the complexities of modern life. It is clear that mere 'borrowings' from others would not set us on the pedestal of our ancient greatness ; it would be more likely to hasten the process of India's disinte-

gration. The development of Art in India —indicating by that term all phases of activity in which the spirit of individuality and creativeness enters as the dominating factor —the development of Art in India as a renewed expression of India's powers to re-create and re-Indianise, —to re-interpret life and thought in vital relationship with the Past as well as with the Present —this progressive development of Art in India, showing that Indian talent and brain have not yet lost their old power and spirit, would constitute perhaps the only effective test and measure of her fitness to survive in that struggle for national existence with which she is now confronted. And signs of hope are not wholly wanting ; for the art-spirit which. in its essence is creative and hence dynamic, has once again taken birth on Indian soil, and although it is now in its infancy being conjined almost wholly to one department of activity, —(that of Indian Painting, which concerns itself with the task of interpretation and expression of Indian life, past and present, through the medium of colour and line) —it is clear that as the days go by, it would acquire an added strength and find joy and pleasure in bringing under itself the whole circle of thought and life, not excluding Civics, Politics, Economics, nor even the Principles of latter-day Science, and in interpreting them along Indian ways to suit Indian conditions.

নতুন দিল্লীর নগর-পত্তনে স্থাপত্য কেমন হবে, তার চিন্তা ক'রে হ্যাভেল সাহেব লণ্ডনের Morning Post (22-1-1913) পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাতে বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়েছিল অনেক। হ্যাভেল সাহেব ভারতের দিশী কারিগরদের দিয়ে দিশী ধরনে এই কাজ করানোর প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন সেকালের ইংরেজ-সরকারের কাছে। সতীশবাবু হ্যাভেল সাহেবের মতানুগ-



রামায়ণী পট : দশরথের কোলে রামচন্দ্র



কৌশল্যার কোলে রামচন্দ্র - নন্দলাল

সম্বলিত প্রবন্ধটি Dawn-এ প্রকাশ করেছিলেন ১৯১৩ সালে। দিশী কারিগরদের প্রতি বিদেশী হ্যাভেল সাহেবের এই সহৃদয় পৃষ্ঠপোষকতায় সেকালের এদেশী মনীষিগণ খুব খুশি হয়েছিলেন। নন্দলাল সে-প্রসঙ্গ স্বতন্ত্র অধ্যায়ে বলছেন।

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল নন্দলালের। আর্টস্কুলের ১৯১১-১২ সালের এগ্‌জিবিশনে নন্দলালের 'পার্থসারথি'র ছবি দেখে সতীশবাবু মন্তব্য করেছিলেন, —'বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়েছে।' নন্দলালের মতে, তার মানে হলো, —'ঠিক অনুভূতি থেকে আঁকনি, ছবি প্রাণ পায়নি'।

নন্দলালদের হাতীবাগানের বাড়িতে আসতেন তিনি। একদিন সতীশবাবু তাঁর শিবপুরের বাড়িতে পুরীর মহাপ্রসাদ খাইয়েছিলেন নন্দলালকে। খাইয়েছিলেন তুলসীতলায় বসিয়ে —'গোঁসাইজীর মালা'তে ক'রে।

রামায়ণের সিরিজ যখন নন্দলাল আঁকছেন, সতীশবাবু দেখতে এলেন। রামায়ণের পটে অজন্তার ধরন দেখে বেশ পছন্দ হয়নি তাঁর। আর একদিন সতীশবাবু এসেছিলেন নন্দলালদের বাড়িতে। রান্নাঘরে পেঁয়াজের গন্ধ পেয়ে বলেছিলেন, —'ও সব উগ্র জিনিস ব্যবহার কর কেন? তোমরা ভারতশিল্পী, তোমাদের সাত্ত্বিক হওয়া দরকার'। তারপর তিনি বললেন,—'সন্দেশ খাওয়াও'। বাজারে যাচ্ছিলেন নন্দলাল জুতো পায়ে দিয়ে। উনি তাড়াতাড়ি বললেন,—'থামো, থামো, জুতো পায়ে দিয়ে আমার জন্যে মিষ্টি আনতে যেয়ো না। জুতো খুলে খালি-পায়ে যাও'। পায়ে নোংরা-লাগানো নন্দলালের কিন্তু ভালো লাগেনি। খেতে খেতে তিনি বললেন,—'গোঁসাইজী খেতেন নারকোল-মালায়'। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন তিনি।

আর্টের কথায় সতীশবাবু একদিন বললেন,—'আর্টের রূপ তরল কিংবা কঠিন দু'য়েতেই দাঁড়ায় না। যেমন ধরো, মেয়ে মানুষ দেখবো না, বা মেয়ে মানুষ দেখে গলে যাবো —দুটোই খারাপ। চাই চরিত্র। মধ্যপথ ধরলে তবেই চরিত্র গঠন হয়। আর তাতেই সার্থক হয় আর্টের সৃষ্টি।'

সতীশবাবুর ঘরে কীর্তন হতো। নন্দলালেরা প্রায়ই যেতেন

কীর্তন শুনতে। হারাণ চাকলাদার, প্রফেসর রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ —এঁরা সব থাকতেন সেই আসরে। সতীশবাবুর গুরুভাইরাও জমায়ত হতেন।

নন্দলাল তখন ওঁর কাছে যেতেন; ভাবতেন, লিখতেন, পড়তেন; কিন্তু ভালোবাসতেন পরমহংসদেবকে। সতীশবাবু বলতেন, —'জানো, পরমহংসদেবের আর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সীল্-মারা হ'য়ে আছি —আমরা সব'।

॥ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের শিল্পচিন্তা ॥

১৯১২ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী অক্ষয়বাবু ঘোড়ামারা-রাজশাহী থেকে কলকাতায় সতীশবাবুকে একখানি পত্র লিখেছিলেন. ভারতশিল্পচিন্তা সম্পর্কে তাঁর নোটবুক থেকে টোকা কিঞ্চিৎ নির্যাস Dawn-এ পত্রস্থ করবার জন্যে। তিনি এই পত্রে সতীশবাবুর কাছে জানতে চেয়েছিলেন, ভারতীয় মূর্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে দেশের যত্রতত্র বিক্ষিপ্ত ও কোথাও-কেমন সংগৃহীত, প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত পুঁথিগুলি নিয়ে গবেষণা করবার জন্যে কোনও ধৈর্যশীল গবেষক পণ্ডিত তাঁর জানা আছে কিনা। অক্ষয়বাবুর শিল্পাদর্শ সম্পর্কে এই সংক্ষিপ্ত নোটস্-টি সতীশবাবু Dawn-এ প্রকাশ করেছিলেন কিঞ্চিৎ মন্তব্য সমেত। ভারতীয় মূর্তি-নির্মাণের নিদর্শন থেকে শিল্পাদর্শ যা পাওয়া যায়, তাই এতে লেখা হয়েছে। আর অক্ষয়বাবুর অভীপ্সিত ভারতীয় শিল্প-শাস্ত্রালোচনা সতীশবাবু শুরু করিয়েছিলেন অধ্যাপক রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ মহাশয়কে দিয়ে —তাঁর Dawn পত্রিকাতেই।

ভারতীয় মূর্তিনির্মাণ ও ভারতশিল্পাদর্শ সম্পর্কে অক্ষয়বাবু লিখেছিলেন :—

It is a happy sign of the times that many erudite scholars are trying to discover and study the art-ideals of ancient India. They have already discovered the self-evident fact that art in India has in all ages been the favourite handmaid of spiritual culture. The art-ideal





রামায়ণী পট : হরধনুভঙ্গের পরে
সীতার রামচন্দ্রকে মাল্যদান



বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রামলক্ষ্মণের তাড়কাবধে যাত্রা - নন্দলাল

can, therefore, be studied with best advantage in Indian sacred images of old. I am glad to find, you are also taking a keen interest in the subjcct. Allow me, therefore, to point out that the art-ideal of Indian image-making lies hidden in the very name Pratima, which signifies a sacred image. A Pratima is not a likeness of anything visible. The world is derived from the root ma to measure, and so it denotes a thing, a visible representation, that supplies a measure to realise the invisible in a visible form.

Pratimas are divided into four classes according to the four methods, by which they are made. These methods are indicated by the text,—

'চিত্রজা চৈব লেপ্যা চ শস্ত্রোৎকীর্ণা চ পাকজা।'

(i) A Chitraja-image is that which is produced by painting on canvas, walls or vessels. This is indicated by the text,—

'পটে কুড্যে চ পাত্রে চ চিত্রজা প্রতিমাস্মৃতা।'

(ii) A Lepya-image is that which is produced by 'earths' (mud, plaster and the like) by the process of lepa, placing one layer over another. This is indicated by the text,—

'লেপ্যা চ পার্থিবা জ্ঞেয়া।'

(iii) A pakaja-image is that which is produced by a melting-process of metals. It is called lohaja from the circumstances that in ancient times in India all metals were denoted by a generic name loha. This is indicated by the text,—

'লোহজা পাকজা মতা।'

(iv) A Sastrotkirna-image is that which is chiselled out by means of instruments either in wood or in stone. This is indicated by the text,—

'শৈলজা বৃক্ষজা চৈব শস্ত্রোৎকীর্ণা চ কীর্তিতা।'

The texts, however distinctly declare that although a pratima may be made in any one of these four methods, yet the divinity (the invisible ideal) comes nearer our mental vision only when tangible form is given to it by the method of painting; for in painting alone can we hope to bring out the grace, beauty, and bhava to perfection. This is indicated by the text,—

'কান্তিভূষণভাবাদ্যাশ্চিত্রে যস্মাৎ স্ফুটং স্থিতাঃ।
অতঃ সান্নিধ্যমায়াতি চিত্রজাসু জনার্দনঃ॥'

In this text lies hidden not only the art-ideal of image-making. but also a clue to the history of its gradual development. What the true history is of that development is, however, another story.

হ্যাভেল সাহেবের The Ideals of Indian Art বইখানি প্রকাশিত হবার পরে অক্ষয়বাবু বিশেষ সংবর্ধনা জানিয়েছিলেন। কিন্তু, হ্যাভেল সাহেবের কোনো কোনো উক্তির সঙ্গে একমত হ'তে না-পেরে বিরূপ সমালোচনা করেছিলেন, ১৩১৮ সালের চৈত্র সংখ্যার 'সাহিত্য'-পত্রে প্রকাশিত তাঁর 'ভারতীয় শিল্পাদর্শ' প্রবন্ধে। ভারতশিল্প কোন্ ভাবে অনুপ্রাণিত হ'য়ে বিকাশ লাভ করেছে, সে-বিষয়ে সর্বসম্মত কোনো স্থির সিদ্ধান্ত তখনও হয়নি। এই অবস্থায় হ্যাভেল সাহেব ভারতশিল্প-প্রতিভার মূল উৎসের সন্ধান লাভ করবার জন্যে 'লালায়িত' হয়েছেন দেখে অক্ষয়বাবু সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু হ্যাভেল সাহেবের 'Convinced as I am that the learning of the Orientalist, however profound and scientific it may be, is often most misleading in

aesthetic criticism, it has always been my first endeavour, in the interpretation of Indian ideal, to obtain a direct insight into the artist's meaning, without relying on modern archaeological conclusions and without searching for the clue which may be found in Indian literature (Introduction), —এই উক্তি অক্ষয়বাবু বরদাস্ত করতে পারেন নি ; তবু উপাদেয়বোধে এই গ্রন্থের সবিস্তর আলোচনা করেছিলেন।

হ্যাভেল সাহেব বলেছিলেন, ভারতশিল্পের শুরু শাক্য-বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পর থেকে ; কারণ তাঁর আবির্ভাবকালের আগেকার একখানিও চিত্র বা প্রতিমা বর্তমান নাই। কিন্তু হ্যাভেল সাহেবের এ উক্তি ঠিক নয়। কারণ, তিনিই বলেছিলেন,—

Hitherto archaeological excavations in India have been little more than a searching of the superficial layers. When the sandy deserts of Rajputana and the lower strata of the alluvial deposits of the Indus and the Ganges, and other sacred rivers, are explored as scientifically and systematically as the sand of Egypt and the soil of Crete we may learn a great deal more of the indigenous Indian Art which preceded the Asokan period. —(p. 18)। অক্ষয়বাবু বলেন, —এমতাবস্থায়, ভারতশিল্প চিত্রে ও প্রতিমায় বিকশিত হ'য়ে উঠতে বিলম্ব ঘটেছিল, এ-কথা তো বলা যায় না।

হ্যাভেল সাহেব আরও বলেছেন, —ভারতবর্ষে শিল্প-বিকাশের বিলম্বের হেতু হলো আর্যদের অনার্য-সংস্পর্শ-পরিহার-কামনা। অতি প্রাচীনকাল থেকেই আর্যঋষিদের মানসপটে চিরসুন্দরের দিব্যজ্যোতিঃ উদ্ভাসিত হয়ে উঠতো ; আর তার প্রকাশের জন্যে লিপির, চিত্রের অথবা ভাস্কর্যের আশ্রয় না-নিয়ে, মনে মনে তার পূজা করতেন। তাতেই উৎপত্তি হলো মন্ত্র ও গাথার। সমস্ত শিল্পপ্রতিভার আদি-উৎস চিরসুন্দরই লক্ষ্য ছিল তাঁদের। এই সূত্রে তাঁরাই মানবসমাজের অকৃত্রিম আদিশিল্পী।—

হ্যাভেল সাহেবের এই বিশ্লেষণটিকেও অক্ষয়বাবু যথার্থ ইতিহাস ব'লে মেনে নিতে পারেননি। কারণ, সেকালে যাগযজ্ঞ ছিল, উৎসব আনন্দ ছিল, নৃত্য-গীত ছিল, উদাত্তস্বরে মন্ত্রবাচন করবার প্রথা ও প্রয়োজন ছিল, রাজধানী, রাজদুর্গ, রাজপ্রাসাদ ছিল, সাহস শক্তি উৎসাহ ছিল; সুতরাং, চিত্রে বা ভাস্কর্যে পরমতত্ত্ব অভিব্যক্ত করবার সময়েই তাঁরা মৌন হয়েছিলেন, —এ-কথা অক্ষয়বাবু বিনা-প্রমাণে মানতে পারেননি। তিনি দেখিয়েছেন, —ঐতিহাসিক তথ্যাবলী হ্যাভেল সাহেবের এই কথার বিপরীত প্রমাণ পুঞ্জীকৃত ক'রে তুলেছে। আর্যগণ দীর্ঘকালের মৌনব্রত ভেঙ্গে মুখর হ'য়ে উঠেছিলেন তার অসংখ্য প্রমাণ পাষাণপ্রতিমায় অভিব্যক্ত। কিন্তু, হ্যাভেল সাহেব এই আলোচনায় হাত দেননি। মাত্র বলেছিলেন, —But the visions of the Vedic seers only materialised to the wonderful sculpture and painting of the great period of Indian Art, before the Mahomedan invasion, —that is from the fourth to the tenth centuries A. D, —when Vedic literature was first committed to writing. —(P. II). —ফলে, অক্ষয়বাবু হ্যাভেল সাহেবের এই উক্তিকে নস্যাৎ করেছিলেন। তাঁর মতে, —'খৃস্টাবির্ভাবের বহু পূর্বে, —এমন কি, শাক্য-বুদ্ধদেবের আবির্ভাব-কালেরও বহু পূর্বে, বেদমন্ত্র লিপিবদ্ধ হইয়াছিল; চিত্র ও প্রতিমা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। ভারতবর্ষের পুরাতন সাহিত্যে ইহার প্রমাণ লাভের সম্ভাবনা আছে।'

অক্ষয়বাবুর মতে, যে-যুগে চিত্র বা প্রতিমা দেখতে পাওয়া যায়, সেটাই শিল্প-প্রতিভার আদিযুগ নয়। চিত্র বা প্রতিমা হলো মানব-হৃদয়ের নিগূঢ় ভাব-সম্পদের বাহ্য অভিব্যক্তি। যে-যুগে সেই ভাব-সম্পদ অর্জিত হয়েছিল, সেই যুগটিই হচ্ছে শিল্প-প্রতিভার আদিযুগ। ভারতবর্ষের ইতিহাসে তার নাম 'বৈদিক যুগ'। সেই যুগের শিক্ষা-দীক্ষা, ধ্যান-ধারণা, আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে ভারতশিল্পের প্রকৃত আদর্শের অনুসন্ধান করতে হবে। হ্যাভেল সাহেব এই তথ্যের সন্ধান পেয়েছেন ব'লে অক্ষয়বাবু আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন।

অক্ষয়বাবুর মতে, —ভারতশিল্পের আদর্শ ‘ইহলোকে নহে, পরলোকে; —সান্ত পদার্থে নহে, অনন্তে; —আকারে নহে, ভাবে। সেইজন্য ভারতশিল্পে একটি অনন্যসাধারণ স্বাতন্ত্র্যের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহা ভারতবর্ষের সুনীল আকাশতলের চিরশান্তিনিকেতনের স্নিগ্ধ জ্যোতিতে ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া উঠিতেছিল। দীর্ঘকাল অন্য-সংস্পর্শের বাহিরে থাকিতে পারিলে, তাহা এখনও সেইভাবেই বর্তমান থাকিতে পারিত। —তাহার মূল প্রকৃতি আধ্যাত্মিকতা।’

অধ্যাপক হ্যাভেল লিখেছেন, —কিছুদিনের জন্যে আধ্যাত্মিকতা অন্ধকারে আবৃত হ'য়ে পড়েছিল; ব্রাহ্মণের সাড়ম্বর ক্রিয়াকলাপের বাহুল্যের ফলে চাপা পড়েছিল। শাক্যবুদ্ধের আবির্ভাবে শক্তিলাভ ক'রে, ভারতবর্ষে আবার অধ্যাত্ম দৃষ্টির প্রসার হয়। —হ্যাভেল সাহেব এই দ্বিতীয় যুগকে ভারতশিল্পের ‘অভ্যুদয়-যুগ’ —ভাবের আদান-প্রদানের কল্যাণ-যুগ বা নিখিল-মিলন-যুগরূপে ভারতের গৌরব-যুগ বলেছেন। ভারতশিল্পের এই মিলন-যুগই ‘অভ্যুদয়-যুগ’ বা হ্যাভেল সাহেবের মতে —‘আদিযুগ’। কিন্তু, অক্ষয়বাবুর যুক্তিমতে, হ্যাভেল সাহেবের এখানে হিসাবে কিঞ্চিৎ গড়মিল হয়েছে। আসলে ব্রাহ্মণের ক্রিয়াকাণ্ডের ফলেই, ভাব কর্মে অভিব্যক্ত হ'য়ে, আদর্শ শিল্পে পরিণত হয়েছিল, —অব্যক্ত শক্তিই ব্যক্তরূপ লাভ করেছিল। ব্রাহ্মণ পথপ্রদর্শক হওয়াতেই, অনির্বচনীয়কে বাক্যে, সঙ্গীতে, চিত্রে, প্রতিমায় অভিব্যক্ত করবার জন্যে ভারতবর্ষ ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছিল। বস্তুতঃ, শাক্য-বুদ্ধের পরবর্তী যুগ ভারতবর্ষের আদি শিল্পযুগ নয়। এ-বিষয়ে অক্ষয়বাবুর সিদ্ধান্ত এই, —(১) বৈদিক-যুগে ধারণা, অভিব্যক্তি, আদর্শ ও শিল্প ছিল; (২) অনার্য-সংস্পর্শ পরিহারের জন্যে আর্যগণ দীর্ঘদিন মৌন হ'য়ে শিল্প-প্রতিভা চেপে রাখেননি; (৩) ব্রাহ্মণগণ বেদের ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠান ক'রে বা নিয়ত বেদপাঠে রত থেকেও দিব্যজ্যোতিকে তমসাচ্ছন্ন ক'রে ফেলেননি; (৪) ক্রিয়া-কলাপের আতিশয্যে আত্মহারা হ'য়ে তাঁরা শিল্প-শক্তিকে সহায়রূপে না-জাগিয়ে, চেপে রাখেননি; (৫) শাক্য-বুদ্ধ ‘সর্বং অনিত্যং দুঃখং’ —এই মন্ত্রের প্রচারক ছিলেন; সুতরাং ভারতবর্ষে

ভাবের নিরুদ্ধ স্রোতকে তিনিই মুক্তি দিয়ে, আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে মানবিকতাকে বা সাংসারিকতাকে মিলিত ক'রে, ভারত-শিল্পের জন্মদান করেছিলেন —এ-কথা স্বতোবিরুদ্ধ। উপরন্তু, আমাদের পুরাতন সাহিত্য, আমাদের শ্রীমূর্তিসমূহ, আমাদের গুরুপরম্পরাগত শিক্ষা-দীক্ষা, হ্যাভেল সাহেবের সকল কথা অভ্রান্ত ব'লে মেনে নেওয়ার প্রবল অন্তরায়। সুতরাং, গুরুপরম্পরাগত ভাষা-ব্যাখ্যা অবলম্বন ক'রে শিল্প বিষয়ে অধ্যয়ন-রীতিই ভারত-শিল্পাদর্শ-প্রতিষ্ঠার প্রকৃষ্ট পথ।

ভিন্সেণ্ট্ স্মিথ্ সাহেব ১৯১২ সালে তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ A History of Fine Art in India and Ceylon, from the earliest times to the present day বের করেন। অক্ষয়বাবু এই গ্রন্থের সমালোচনা করেছিলেন ১৩১৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যার 'সাহিত্য'-পত্রে 'ভারতশিল্পের ইতিহাস' নামে প্রবন্ধ লিখে। অক্ষয়বাবুর মতে, স্মিথ্ সাহেবের এই গ্রন্থই ভারতশিল্পের ইতিহাসের প্রথম বই। এই রকম ইতিহাস-গ্রন্থ-সংকলনের প্রয়োজনের কথাই হলো প্রধান কথা। ভারতবর্ষকে বুঝতে হ'লে, তার শিল্প-কৌশলকে উপেক্ষা করলে চলবে না, —কারুকার্য-করা ভাঙ্গা পাথরের টুকরো এ-দেশের পথে-ঘাটে কুড়িয়ে বেড়াতে হবে। ইতিহাস শুধু ঘটনা-বিবৃতির তালিকামাত্র নয়, সে হলো 'মানব মনের ক্রমবিকাশের চিত্রপট'। শিল্পনিদর্শনগুলি উপেক্ষা করলে, সে চিত্রপট ঠিক ঠিক আঁকা হ'তে পারে না।

অক্ষয়বাবু বলেন, —শিল্প হলো 'দেশ প্রচলিত সর্বলোক-নমস্কৃত শিক্ষা-দীক্ষার ধ্যান-ধারণার অমোঘ নিদর্শন। লিখিত সাহিত্যের সাহায্যে শিল্পনিদর্শনের এবং শিল্পনিদর্শনের সাহায্যে লিখিত সাহিত্যের অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেই, আমরা পুরাকালের প্রকৃত চিত্রের সন্ধান লাভ করিতে পারি। ...শিল্পসাহিত্যেও অনেক মহাকবির আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহাদের নামগোত্র বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে বলিয়া তাঁহাদের রচনাগৌরব ক্ষুণ্ণ হয় নাই'। —যাঁরা অরূপকে রূপের আভাসে ব্যক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন তাঁরা অবজ্ঞাত হ'তে পারেন না। বেদ উপনিষদ্ পুরাণ তন্ত্র কাব্য

নাটক দর্শন গণিতের মতো সমপর্যায়ে অজন্তা, অমরাবতী, খণ্ডগিরির আলোচনা হওয়া আবশ্যক।

ভিন্সেন্ট্ স্মিথ্ তাঁর বই-এ লিখেছিলেন, —'Notwithstanding the endless diversity of races, creeds customs and languages, India as a whole has a character of her own which is reflected in her art' —স্মিথ্ সাহেবের এই উক্তিকে অক্ষয়বাবু অভিনন্দিত ক'রে বলেছিলেন, শিল্পের মধ্যে এই ঐতিহাসিক সত্য উজ্জ্বলভাবে প্রতিবিম্বিত হ'য়েছে —নিঃসংশয়ে।

অক্ষয়বাবু ভাবতেন, —জাতিভেদ, ভাষাভেদ, ধর্মভেদ, আচারভেদ সত্ত্বেও আমরা এক, আর এই ঐতিহাসিক সত্যটির ভেতরেই ভারতবর্ষের মুক্তিমন্ত্র নিহিত রয়েছে। আর শিল্পে তা প্রতিবিম্বিত হ'য়ে আছে ব'লেই সাহিত্য-আলোচনার মতন শিল্প-আলোচনা নব্যভারতের পক্ষে অত্যাবশ্যক। শিল্পাদর্শের আলোচনা প্রসঙ্গে ওকাকুরার 'Asia is one' —এই চিন্তাকে, কুমারস্বামীর শিল্পবিষয়ে ওজস্বিনী রচনাবলীকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন অক্ষয়বাবু। সমালোচক বার্ডউডের ভারতশিল্পের প্রতি হীন ও ভ্রান্ত আক্রমণকে কঠিন কষাঘাতে প্রতিহত ক'রে, বিলাতের তেরো জন মনস্বী শিল্পী ও শিল্পরসিক যে যুক্ত-বিবৃতি প্রকাশ করেছিলেন, তাতে অক্ষয়বাবু আন্তরিক উল্লসিত হয়েছিলেন। —এর কিছু পরে, তাঁরই প্রেরণায় অধ্যাপক রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ Dawn-এর পাতায় তাঁর শিল্প-শাস্ত্রচর্চার আলোচনা প্রকাশ করতে শুরু করলেন।

কাকাসু ওকাকুরার সুবিখ্যাত উক্তি : —আমরা এক, সমগ্র এশিয়াবাসী জনসাধারণই এক —তাঁর Ideals of the East গ্রন্থে সমগ্র এশিয়ার মধ্যে এক অখণ্ড ভাবগত ঐক্যের অস্তিত্বের ওপর এই অবিচল আস্থা, এবং শিল্পের মধ্যেই সেই ঐতিহাসিক সত্য প্রতিবিম্বিত, —আর কোনও জাতির চিরাগত কৃষ্টিকলা গ্রহণ-বর্জনের ফলে 'Victory from within or a mighty death wihtout' —এই কথাগুলি অক্ষয়বাবু মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন। ভারতশিল্পের

প্রকৃত ক্রমবিকাশ ঘটেছিল ভারতের জীবনাদর্শ, ভারতের ভাবকল্পনা আর ভারতের দর্শনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পুষ্ট হয়ে. —এই বোধটি ওকাকুরার জন্মেছিল পুরাপুরি —এদেশে এসে স্বামী বিবেকানন্দের আর সিস্টার নিবেদিতার সঙ্গে আলোচনার ফলে। এই দিক থেকেও বিশেষ জোর পেয়ে, অক্ষয়বাবু শিল্পশাস্ত্র আলোচনা ক'রে, এই মহাসত্যের সন্ধানলাভ করবার জন্যে অনুরোধ জানিয়েছিলেন দেশবাসীকে। তখন, এইভাবে ভারতশিল্পের আলোচনার যে সূত্রপাত হয়েছিল, তার ফলে, ভারতশিল্পের মূল-প্রকৃতি প্রকাশ পেতে লাগলো, এবং সভ্যসমাজ নতুন এক শিল্প-জগতের রুদ্ধদ্বারের উন্মুক্ত প্রান্তে এসে পৌঁছে গেল। সেই সব আলোচনায় সন্তুষ্ট হ'য়ে অক্ষয়বাবু বলেছিলেন, —'তাহাতেই আমরা আমাদিগকে চিনিয়া লইতে পারিব, —সেকালের সহিত একালের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধের পরিচয় লাভ করিয়া, আমাদের প্রকৃত মর্যাদা অনুভব করিতে পারিব।'

অক্ষয় মৈত্রেয় মহাশয়ের সঙ্গে তাঁর রাজসাহী-ঘোড়ামারার বাড়িতে দেখা করেছিলেন নন্দলাল। অক্ষয়বাবু নন্দলালকে বলেছিলেন, —'দেখো, যাই কর, সবার ওপরে বুদ্ধিটি পরিষ্কার থাকা দরকার। আমার যা' কাজ, এই প্রত্নতাত্ত্বিক বিষয়-বিভাগ, এতে সাধারণ-বুদ্ধি পরিষ্কার থাকা তো নিশ্চয়ই চাই। যে-কোন সভ্যতাই ধরো না কেন, খানিকটা ক'রে ছাপ বা পদচিহ্ন দেশে আর সমাজে কালে কালে রেখে যাবেই। ট্রেডিশনের ধারা অবিচ্ছিন্নভাবে ঠিকই বইছে। তার সেই অবিচ্ছিন্ন ধারাকে কাটিয়ে উঠতে পারে না কোনো যুগ। আসল কথাটা হচ্ছে, সাধারণ বুদ্ধি থাকা দরকার এইটে বেছে নেবার জন্যে। আমাদের ছাপ-মারা সেই ঐতিহ্য বেছে নিয়ে যদি ফোটাতে পারো শিল্পে, সেই হবে সত্যিকারের 'ভারতশিল্প' —এই ব'লে তিনি নিজের লেখা অনেক সব বই রেফার করলেন নন্দলালকে। নন্দলালের সঙ্গে দেখা তাঁর শেষ-বয়সে —প্রায় মৃত্যুশয্যায়।

—এইভাবে ক্রমে ক্রমে সেকালের সব শ্রেষ্ঠ মনীষীর সাহচর্যে এসে, নন্দলাল ভারতবর্ষের প্রথাগত আর চিরাগত শিল্পধারাটিকে চিনে নেবার চেষ্টা করেছিলেন, কেবল বুদ্ধি দিয়ে নয়, সমগ্র সত্তা দিয়ে। নন্দলাল সত্যিকারের স্বদেশী তাত্ত্বিকতার দিক্ থেকে ভারতশিল্পকে সংগ্রহ ও

চিত্রকর্মের মাধ্যমে যেভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ক'রে, অসাধারণ কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছিলেন, আমরা ক্রমে ক্রমে দেখবো, তিনি শুধু পথিকৃৎ নন, এ-পথে তিনি একক ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। —তাঁর গুরু অবনীন্দ্রনাথের থেকে তাঁর পথ —আলাদা পথ।

॥ অধ্যাপক রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষের শিল্পচর্চা ॥

সতীশবাবুর বাড়িতে কীর্তনের আসর জমতো জোর। সেই আসরে জমায়ত হতেন স্বদেশী যুগের যত সব উৎসাহী তরুণ। নন্দলাল মাঝে মাঝে উপস্থিত থাকতেন সে-আসরে। হৃদ্য আলাপ-আলোচনা হতো তাঁদের নানা বিষয়ে; শিল্পবিষয়ে তো বটেই। সে-সব দিনের স্মৃতি নন্দলালের মনে আজও (১৯৬৫) বিমল আনন্দের সঞ্চার করছে।—

সতীশবাবুর Dawn-এর পৃষ্ঠায় এই সময়ে (১৯১২, এপ্রিল) রবীন্দ্রবাবুর লেখা বের হ'তে শুরু হলো —Interpretation of Indian Art in the light of Indian Literary Records: A New branch of Study. —এই প্রবন্ধের প্রারম্ভে রবীন্দ্রবাবু অক্ষয়বাবুর গুরুত্বপূর্ণ শিল্পাদর্শ-চিন্তার উল্লেখ করেছেন। ভারতশিল্পের আদর্শ ও ক্রমবিকাশের বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে অক্ষয়বাবুর উপস্থাপিত এই আদর্শ সবারই বিশেষ চিন্তার খোরাক জুগিয়েছিল। সেকাল পর্যন্ত সংগৃহীত পুরাতন ধারাবাহী শিল্প-নিদর্শন সব, আর, তখন পর্যন্ত প্রকাশিত-অপ্রকাশিত শিল্পশাস্ত্র নিয়ে রবীন্দ্রবাবুর গবেষণা শুরু হলো।

সেকালে পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদেরা ভারতশিল্প আর স্থাপত্য নিয়ে আলোচনা করেছিলেন বটে, কিন্তু এদেশের শিল্পশাস্ত্রের সঙ্গে মিলিয়ে নিখুঁত আলোচনা করেননি কেউ। লণ্ডনের Royal Asiatic Society-তে ১৯১০ সালের ৮ই মার্চ একটি বক্তৃতায় ডঃ কুমারস্বামী এ-বিষয়ে পাশ্চাত্য দেশকে সচেতন করেছিলেন। তাঁর প্রধান বক্তব্য ছিল, —ভারতশিল্পের চর্চায়, বা তার তত্ত্বের প্রতিষ্ঠায় ভিত্তি হওয়া উচিত শিল্পশাস্ত্র। হ্যাভেলসাহেবও তাঁর Ideals of Indian Art

গ্রন্থে (পৃ ১১৬) জোর দিয়ে বলেছিলেন, —শিল্পশাস্ত্রগুলির ভালোভাবে Catalogue-ই তৈরী করা হলো না। শিল্প-বিষয়ে আলোচনার ব্যাপারে ভারতীয় শিল্পশাস্ত্র এখনও যেন আ-চষা খেত।

১৯০৮ সালের অগাস্ট মাসে কোপেনহেগেনে আহূত প্রাচ্যবিদ্‌দের পঞ্চদশ আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে ডঃ কুমারস্বামী আর F. O Oertel শিল্পশাস্ত্র আলোচনা করবার জন্যে পাশ্চাত্যের প্রাচ্যবিদ্‌গণের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিলেন। ফলে, সারনাথের বৌদ্ধস্তূপ থেকে পুরাকীর্তির উদ্ধারসাধন সম্ভবপর হলো। ডঃ কুমারস্বামী এই সময়ে শিল্পশাস্ত্রে প্রতিমা-নির্মাণ সম্পর্কে একটি সিংহলী পুঁথির অনুবাদ করেন। এই ধরনের পুঁথি প্রাচ্যদেশে যত্রতত্র থাকা সত্ত্বেও, পরিভাষার ভয়ে, সেগুলির অনুবাদে পণ্ডিতেরা এগোতে সাহস করেননি। অধ্যাপক Thibaut ইতিমধ্যে প্রচার করেছিলেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃতে রচিত জ্যোতির্বিজ্ঞানের বইয়ের অনুবাদের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। অধ্যাপক Thibaut-র এই ঘোষণায় উৎসাহিত হ'য়ে Oertel সাহেব ভারতের অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকেও ভারতীয় স্থাপত্য এবং শিল্প-বিষয়ে সংস্কৃত-গ্রন্থগুলিকে অনুবাদ করবার কাজে লাগবার জন্যে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। ১৯০৮ সালের অক্টোবর মাসে The Indian Antiquary পত্রিকায় Oertel সাহেবের প্রবন্ধ প্রকাশ ক'রে সম্পাদক Richard Temple সাহেব ভূমিকায় বলেছিলেন, — 'the Congress formally adapted Mr. Oertel's suggestion that arrangements should be made to collect and translate all the Silpa-Sastras dealing with architecture and sculpture that can be traced'; এবং আশা করেছিলেন তাঁর পাঠকেরাও এই কাজে হাত মেলাবেন।

পক্ষান্তরে, ভারতীয় শিল্পশাস্ত্র-চর্চার বিকল্প পন্থা প্রচার করেছিলেন Vincent A. Smith আর George Birdwood প্রমুখ কেউ কেউ। তাঁরা বলেছিলেন, —শিল্পশাস্ত্র পড়ার কোনো দরকার নাই, বা এর পরম্পরা বোঝাও অনাবশ্যক। সামনে যে-সব পুরোনো শিল্প-নিদর্শন রয়ে গেছে, এগুলো দেখেই এর ওপর মতামত প্রচার

করাই যথেষ্ট। এই বিষয়ে কোনও বিশেষ জ্ঞান —যেমন, ভারতীয় রহস্যবাদ, জীবনাদর্শ বা চরিত্রজ্ঞান —ভারতশিল্প বোঝার জন্যে দরকার নাই; ব্রাহ্মণ্য বা বৌদ্ধশিল্পের নিদর্শনগুলি বুঝতে তাঁদের পছন্দ-অপছন্দই যথেষ্ট; ভারতীয় ভাবাদর্শের সঙ্গে এই সব শিল্প-নিদর্শনের কোনও সম্পর্ক নাই; বরং যারা এই রকম সম্পর্ক বের করতে চায়, তারা চিত্রে ও ভাস্কর্যে উপনিষদ্ পড়ে থাকে। —বার্ডউডের ও স্মিথ্ সাহেবের এই যুক্তির অনুসরণের ফলে, Grunwedel বা Foucher-র ভারতশিল্প-চর্চা অমূল-মতবাদ ও অনুমান-নির্ভর হ'য়ে পড়ে। এবং তাঁরা জোর দিয়ে বলেন, ভারতশিল্প পাশ্চাত্যদেশ থেকে ধার করে গ'ড়ে উঠেছে। —এই যুক্তির প্রচার ক'রেছিলেন George Birdwood আর Smith সাহেব ১৯১০ সালে। ডক্টর কুমারস্বামী তাঁদের এই মতবাদ খণ্ডন করেছিলেন ১৯১১ সালের ৮ই মার্চ রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটিতে বক্তৃতা দিয়ে। ১৯১০ সালে মাদ্রাজের 'Hindu'-পত্রিকা কুমারস্বামীর বক্তৃতার পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করেন। এঁদের সমুচিত জবাবে কুমারস্বামী বলেছিলেন, —ভারতশিল্পের ঐতিহাসিকের উচিত গ্রীস রোম প্রমুখ দেশে শিল্পচর্চা কোন্ সময়ে কতখানি উন্নত হয়েছিল, সে এ-দেশের সঙ্গে তুলনা ক'রে দেখা। যে-দেশে শৈলীর পর শৈলী উদ্ভূত হচ্ছে, তাকে যথাযথ বোঝার পরে, কোন্ 'বর্বর' দেশ, কার কাছ থেকে কতখানি ধার নিয়েছে সেটা বোঝা যাবে।

হ্যাভেলসাহেব আর কুমারস্বামী মিলে ভারত-শিল্পচর্চার একটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদ্ধতি প্রবর্তন করেছিলেন। তার ফলে, এই ক্ষেত্রে পুরাতন দৃষ্টিভঙ্গি উল্টে গিয়ে, একটা বিপ্লবের সৃষ্টি করেছিল। নব্যভারত-শিল্প যার জন্ম মাত্র ১৯০৫ সালে, অর্থাৎ মাত্র পাঁচ বছর আগে, তাতে নতুন প্রেরণা সংযোজিত হলো। তাঁরা জোর দিয়ে বলেছিলেন, ভারতীয় জীবন ও ভারতীয় চিন্তা, বিশেষ ক'রে তার আধ্যাত্মিক দিক্‌টা বিশেষভাবে অধ্যয়ন করা উচিত। এর দার্শনিক দিক্‌টা না-দেখলে ভারতীয় চোখ দিয়ে দুনিয়াকে দেখা

যাবে না ; বা ভারতশিল্পে ভারতীয় প্রতিভার কিভাবে ক্রমবিকাশ ঘটেছে, তার কিছুই বোঝা যাবে না। কারণ, তাঁদের মতে, ভারতশিল্প বুঝতে গেলে, যে মানসিক পরিবেশে এর জন্ম সেটা আগে বুঝতে হবে। কুমারস্বামী বলেন, —ভারতীয় ভাস্কর্য আর উপনিষদ বা শিবস্তোত্র একই ভারতীয় মনের প্রকাশ। সুতরাং ভারতশিল্প বুঝতে গেলে, ভারতধর্মের অনুশীলন আবশ্যক সর্বাগ্রে। আধুনিককালে পাশ্চাত্যদেশে শিল্প, জীবন, ধর্ম সব আলাদাভাবে দেখা হয় বলেই, এই রকম উল্টো মতিচ্ছন্ন ভাবনার প্রাদুর্ভাব হচ্ছে। সুতরাং, ভারতীয় ভাস্কর্য বুঝতে উপনিষদ পড়ার দরকার নেই —এ-কথা অর্থহীন। আধ্যাত্মিক ভারতশিল্প সম্পূর্ণ অনুধাবন করবার জন্যে ধর্মগ্রন্থ সব পড়তেই হবে।

রবীন্দ্রনাথ কুমারস্বামীর এই যুক্তিতে উৎসাহিত হয়ে আরো জোর দিয়ে শিল্পশাস্ত্র-চর্চায় লাগতে বলেছিলেন। তিনি হ্যাভেল আর কুমারস্বামীর যুগান্তকারী বইগুলি দেখে, ভারতশিল্পের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে সুসংবদ্ধ আলোচনায় ব্যাপৃত হয়েছিলেন। এইরকম শিল্পচর্চায় তিনি অলঙ্কারশাস্ত্র আর শিল্পশাস্ত্র পড়তে বললেন। কারণ, এই ধরনের সংস্কৃত গ্রন্থে শিল্প সম্পর্কে সুবহু আলোচনা রয়েছে। কুমারস্বামী বলেছিলেন, —নব্যভারতশিল্পের প্রগতি পর্যালোচনার জন্যে এই রকম বই সব ভিত্তি হওয়া উচিত। কিন্তু, হ্যাভেল সাহেব শিল্পশাস্ত্র-চর্চায় অতটা জোর না-দিয়ে শিল্প-নিদর্শন দেখে, সোজা-সুজি শিল্পচর্চা করার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু তাঁর এই অভিমত এঁরা তখন মানতে পারেননি। কিন্তু, হ্যাভেল সাহেবের মতামত এমন-কিছু অনমনীয় ছিল না। পাছে তাঁকে ভুল বোঝা হয়, এইজন্যে তিনি সতীশবাবুকে যে চিঠি লিখেছিলেন তার উল্লেখ আমরা আগেই করেছি। প্রত্নতত্ত্বকে শিল্পতত্ত্বের ঘাড়ে চাপানোর ব্যাপারে, হ্যাভেলসাহেবের এই বিরূপ মন্তব্যের প্রতিবাদ করেছিলেন কুমারস্বামীও ১৯১২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের Hindusthan Review পত্রিকাতে। এই বিষয়ে অক্ষয়বাবুর আলোচনার কথা আমরা আগেই বলেছি। অধ্যাপক Goldstucker-এর সাবধান-বাণী উচ্চারণের

পরে, পাশ্চাত্যদেশেও শিল্পশাস্ত্র-চর্চা সম্পর্কে বিরুদ্ধমতের মোড় ঘোরে। হ্যাভেলসাহেবও তাঁর ভারতীয় শিল্পাদর্শ গ্রন্থে (১১৬ পৃষ্ঠায়) শিল্পশাস্ত্র-চর্চা সম্পর্কে বিশেষ জোর দিয়েছিলেন।

ভারতীয় প্রাচীন-সাহিত্যে শিল্প সম্পর্কে আলোচনা আছে প্রচুর। প্রথমে আমাদের দেখা দরকার, শিল্পশাস্ত্র বলতে কি বোঝায়। দক্ষিণ-ভারতের প্রসিদ্ধ হিন্দু-পণ্ডিত রাম রাজ ১৮৩৪ সালে Architecture of the Hindus নামে একখানি খুব মূল্যবান্ বই লিখেছিলেন। তাতে তিনি শিল্প-পরম্পরা সম্পর্কে লেখা বত্রিশখানি প্রধান পুঁথির উল্লেখ করেছিলেন। তিনি নিজে দক্ষিণভারত থেকে লুপ্তাবশিষ্ট এই রকম দশখানা পুঁথি সংগ্রহ করেছিলেন:—মানসার, ময়মত, কাশ্যপ, বৈখানস, সকলাধিকার, বিশ্বকর্মীয়, সনৎকুমার, সারস্বত্যম্, পাঞ্চরাত্রম্ ইত্যাদি। Aufrecht সাহেবের Catalogus Catalogorum-এ শিল্পশাস্ত্রের বহু বইয়ের উল্লেখ আছে। তার বেশির ভাগই দক্ষিণভারতের পুঁথিশালার ক্যাটালোগ থেকে নেওয়া। সে ক্যাটালোগ Burnell আর Oppert সাহেবের করা, Mackenzie সাহেবের পুঁথি-সংগ্রহ থেকেও কিছু নেওয়া হয়েছে। এই বইগুলির নাম হলো—শিল্পকলাদীপিকা, শিল্পগ্রন্থ, শিল্পলেখ, শিল্পসর্বস্ব-সংগ্রহ, শিল্পার্থসার, বিশ্বকর্মীয়, বিশ্বকর্মপ্রকাশ—এই রকম সব। ডঃ কুমারস্বামী তাঁর Mediaeval Sinhalese Art (1908) গ্রন্থে সিংহলে প্রাপ্ত তিনখানি পুঁথি ব্যবহার করেছিলেন—সারীপুত্র, মায়ামত্য আর রূপাবলীয়। রূপাবলী পুঁথিখানির আলোচনা আমরা আগেই করেছি। কুমারস্বামী এই পুঁথিখানি দিয়েছিলেন অবনীবাবুকে। অবনীবাবু দিয়েছিলেন নন্দলালকে। নন্দলাল দিয়েছেন শান্তিনিকেতন-কলাভবনকে। সেই সূত্রে এই দুর্লভ পুঁথিখানি এখন বিশ্বভারতীর সম্পত্তি।

ডি. আর. ভাণ্ডারকর শিবরূপ 'লকুলীশ' নামে তাঁর একটি প্রবন্ধে একখানি অপ্রকাশিত পুঁথির উল্লেখ করেছিলেন—বিশ্বকর্মাবতার-বাস্তুশাস্ত্রম্। এই পুঁথিখানি তিনি দেখেছিলেন পুণার Deccan College Library-তে। 'বিশ্বকর্মাশিল্প' নামে আর একখানি পুঁথি আমাদের প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁর বিশ্বকোষ-

অফিসের পুঁথি-সংগ্রহে পেয়ে, তাঁর Archaeological Survey of Mayurbhanja গ্রন্থে উল্লেখ ক'রে গেছেন। প্রসঙ্গতঃ অক্ষয় মৈত্রেয় মহাশয় যে শিল্পচিন্তা করেছিলেন, তার কথা আগেই বলা হ'য়েছে। এ-ছাড়া, অক্ষয়বাবু 'বিশ্বকর্মা'-নামে একটি বাঙ্গালা প্রবন্ধ লিখেছিলেন ১৯১১ সালের জানুয়ারী সংখ্যায় Dacca Review and Sanmilan-পত্রের বাঙ্গালা বিভাগে। প্রসঙ্গতঃ তিনি ভারতশিল্প-আলোচনাকল্পে 'বিশ্বকর্মাপ্রকাশ' নামে একখানি গ্রন্থের উল্লেখ করেছিলেন। বইখানি ছাপিয়ে প্রকাশ করেছিলেন বোম্বাইয়ের খেমরাজ শ্রীকৃষ্ণদাস আর মথুরার কিষণলাল দ্বারকাপ্রসাদ।

রবীন্দ্রবাবু তাঁর আলোচনার চতুর্থ অনুচ্ছেদে রাম রাজের সম্পাদিত 'মানসার'-গ্রন্থ থেকে বিষয়বিভাগ ক'রে, শিল্পশাস্ত্র সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা পরিস্ফুট করবার চেষ্টা করেছেন। এই মানসার গ্রন্থখানি ৫৮টি অধ্যায়ে বিভক্ত। এতে স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও কারিগরি সম্পর্কে নানাবিধ মাপজোখের বর্ণনা রয়েছে। অট্টালিকা, মন্দির বা বাস্তুবাড়ি ইত্যাদি নির্মাণকল্পে স্থান ও বেষ্টনী নির্বাচন, বিভিন্ন পাড়া, গ্রাম, নগর ও শহর পত্তনের ধারা, অট্টালিকার অলঙ্করণ, পাদপীঠ, বনেদ, স্তম্ভ, ফলকস্থাপন; বিভিন্ন ধরনের মন্দির—একতলা থেকে বারোতলা পর্যন্ত উঁচু মণ্ডপ-নির্মাণ, তোরণ, দরজা, প্রাসাদ ইত্যাদি; হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন প্রতিমা-নির্মাণ এবং গরুর গাড়ী ও অন্য যানবাহন; যাতে ক'রে দেববিগ্রহগুলিকে শোভাযাত্রার সময়ে নিয়ে যাওয়া হয়—গ্রন্থখানিতে এই সব কাজের বিবরণ আছে। তা'ছাড়া, শিল্পীর গুণাগুণ, নীতিবোধ, আধ্যাত্মিক ও মানসিক অবস্থার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এই সব কাজের রহস্য, মন্ত্র, যাগযজ্ঞ কিভাবে করতে হবে তারও বর্ণনা আছে। দেব-দেবীর উৎসবে গ্রামবাসীর কর্তব্য, মন্দির-নির্মাণের দিনক্ষণ-নির্ণয়েরও খুঁটিনাটি বিবরণ রয়েছে।

এতে বোঝা যাচ্ছে যে, শিল্পশাস্ত্র দেখে শিল্পকর্মে বাস্তব রীতি-পদ্ধতি প্রয়োগ করাই আসল কাজ। বিশেষ করে, মূর্তি বা মন্দির নির্মাণ করতে গেলে এ করতেই হবে। ধর্মকৃত্যে, উৎসব বা অন্য আচার-আচরণে এইসব শিল্পাদর্শ শিল্পিগণকে প্রাচীন ভারতে অবশ্যই মেনে চলতে হতো। এ ছাড়া, বিভিন্ন দেবদেবীর প্রতিমার রূপভেদের যে-সব বর্ণনা আছে, ভারতশিল্পে মূর্তি-

তন্ত্রের ওপরে সেগুলি মূল্যবান্ তথ্য সংযোজন করেছে। সে-তথ্য প্রামাণ্য ও দৃঢ়মূল। এবং এই সব তথ্য দিয়েই আজ পর্যন্ত সংগৃহীত অসংখ্য প্রকারের প্রতিমাগুলির স্বরূপনির্ধারণ সম্ভবপর হয়েছে।

শিল্পশাস্ত্র সংস্কৃত-সাহিত্যের কেবল একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শাখামাত্রই নয়; বরাহমিহিরের 'বৃহৎসংহিতা' হচ্ছে ভূগোল ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের কোষগ্রন্থ; 'শুক্রনীতি' হচ্ছে সামাজিক ও রাজনীতিক নিবন্ধসম্ভার। এ-ছাড়া, বিভিন্ন তন্ত্র, পুরাণ ও তীর্থকল্প গ্রন্থগুলি মন্দির-মঠাদি আর মূর্তিনির্মাণ-চিন্তায় শিল্পশাস্ত্রের তুল্যমূল্য। নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁর The Archaeological Survey of Mayurbhanja গ্রন্থে প্রকাশিত প্রতিমাগুলির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বহু পুরানো তন্ত্রের ঘন ঘন উদ্ধৃতি দিয়েছেন ঃ— ভবিষ্যপুরাণ, কালিকাপুরাণ, সারদাতিলকতন্ত্র, নিবন্ধতন্ত্র, রুদ্রজামলতন্ত্র, কঙ্কালমালিনীতন্ত্র, জ্ঞানার্ণবতন্ত্র, তন্ত্রসার, সাধনমালাতন্ত্র, স্বতন্ত্রতন্ত্র, সাধনসমুচ্চয়, সাধনকল্পলতা ইত্যাদি। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ১৯১১ সালে বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থের 'বিষ্ণুমূর্তি পরিচয়' প্রকাশ করেছিলেন। এই মূর্তির পরিচয় দিতে গিয়ে কাব্যতীর্থ মহাশয় বিভিন্ন ধরনের বিষ্ণুমূর্তির পরিচয় দিয়েছিলেন এই সব বই থেকে —অগ্নিপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, পদ্মপুরাণ কালিকাতন্ত্র, হেমাদ্রির চতুর্বর্গচিন্তামণি (ব্রতখণ্ড), বিষ্ণুপুরাণ, বৃহৎ-সংহিতা।

১৯১২ সালের মে মাসে রবীন্দ্রবাবু Dawn-এর পৃষ্ঠায় তাঁর দ্বিতীয় পর্যায়ের রচনা প্রকাশ করেছিলেন। এই প্রবন্ধে তিনি বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র আলোচনা ক'রে বৌদ্ধশিল্প ও বৌদ্ধমূর্তিগুলির পরিচয়নির্ণয় করবার সূত্র নির্দেশ করেছিলেন। এবং সেই সময় পর্যন্ত এ-বিষয়ে যে কাজ হয়েছিল তার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় রেখে গিয়েছেন।

বৌদ্ধতন্ত্রে বৌদ্ধমূর্তি এবং শিল্পমন্ত্র সব বিধৃত হ'য়ে আছে। এর কিছু আলোচনা করেছিলেন Prof. Grunwedel তাঁর Buddhist Art in India গ্রন্থে। এতে তিনি বলেছেন, —বিভিন্ন ধরনের বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব, দেবতা ও দানবের রূপভেদের ইতিহাস জানতে পারলে সমস্যার সমাধান সহজে হবে। তিনি দুঃখ করেছিলেন, এই বিষয়ে কাঁচা

মাল তাঁর হাতের কাছে ছিল না ব'লে। চিত্র ও ভাস্কর্য ছাড়া, উত্তরভারতে এক ধরনের সাহিত্য রয়েছে —সেগুলি বৌদ্ধ প্রত্নতত্ত্ব আলোচনার জন্যে অপরিহার্য। বুদ্ধের মূর্তিনির্মাণের খুঁটিনাটি বিষয়ে জানতে গেলে এই সব বই দেখতেই হবে। এ-ছাড়া, তিব্বতী কাঞ্জুর ও তাঞ্জুর (এই বইয়ে মূর্তির মাপ ও গুণাগুণ বর্ণিত আছে) হচ্ছে বৌদ্ধমূর্তির পরিচয় প্রদানে প্রামাণ্য গ্রন্থ। কিন্তু, এদিকে এখনও কারো নজর পড়েনি। আকর গ্রন্থ 'সাধনমালা'-সম্পর্কে আমরা সামান্যই জানি। এতে বৌদ্ধ মিথুন-মূর্তি, পরিচ্ছদ আর বোধিসত্ত্বের গুণাগুণ সম্পর্কে সবিস্তর বলা আছে। অন্যত্র, তিব্বতে বুদ্ধমূর্তি-নির্মাণের পদ্ধতি-চিন্তায় তিব্বতী-সাহিত্য অসামান্য। এ-ছাড়া, চীনে-বিশ্বকোষের অনেকটাই সংস্কৃত তন্ত্র-সাহিত্য দিয়ে ভরা। —এ সব গ্রন্থ হলো ভারতশিল্পের ইতিহাস লেখার অপরিহার্য উপকরণ।

এই বিষয়ে অনেক কাজ করেছিলেন Dr. Waddel। তিনি তাঁর গবেষণার ফল প্রকাশ করেছিলেন Buddhism of Tibet গ্রন্থে; আর ১৮৯৪ সালে লণ্ডনের Royal Asiatic Society-র পত্রিকায় The Indian Buddhist Cult of Avalokita and his consort Tara, the Saviouress illustrated from the remains in Magadha —এই নামে প্রবন্ধ লিখে। এ-ছাড়া, Dr. Waddel আরও অনেক প্রবন্ধ লিখেছিলেন ১৯১২ সালের মধ্যে। তিনি বলেছিলেন যে, ভারতে বৌদ্ধধর্মের নির্বাণ ঘটেছে। কিন্তু এই সাঙ্কেতিক প্রতিমাগুলির পরিচয় জানার চাবিকাঠি রয়েছে তিব্বতী লামাদের হাতে। এই লামারাই প্রাচীন ভারতের বৌদ্ধ-পরম্পরা আর আচার-আচরণকে অসীম শ্রদ্ধায় অবিচ্ছিন্নভাবে মধ্যযুগ পর্যন্ত অনির্বাণ ক'রে রেখেছিলেন। তিনি বৌদ্ধমূর্তির পরিচয়-নির্ণয়ের জন্যে তিব্বতে গিয়ে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। সেগুলি ভারতীয় শাস্ত্র এবং আরও পুরানো কালের তীর্থযাত্রীদের নোট্-বই থেকে সংগ্রহ-করা। এই রকম প্রধান চারটি বইয়ের উল্লেখ ক'রে Waddel সাহেব তাঁর Buddhism of Tibet গ্রন্থে 'The hundred Sadhana'-অধ্যায় প্রকাশ করেছিলেন। এই বই আর লামাদের সাহায্যে তিনি বহু জটিল বুদ্ধমূর্তির আলোকচিত্রের রূপভেদের পরিচয় পেয়েছিলেন।

এবং এই সব মূর্তি Waddel সাহেব মগধে আর মধ্যভারতে ইতস্ততঃ প'ড়ে থাকতে দেখেছিলেন। এই সব পর্যবেক্ষণের ফলে, তিনি ১৮৯৪ সালে ৪৯টি বোধিসত্ত্ব ও অবলোকিত-মূর্তির পরিচয় প্রকাশ করেন। অবলোকিত আর তাঁর শক্তি তারার মূর্তি তিনি প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্যের মধ্যে দেখেছিলেন। বাদবাকিগুলির পরিচয় ১৮৯১-৯৩ সালে তিনি পেয়েছিলেন; কিন্তু ব্যয়বাহুল্যের জন্যে প্রকাশ করতে পারেননি। ইতিমধ্যে মঁসিয়ে ফুসে এই ধারায় তাঁর সুবিখ্যাত প্রথম প্রবন্ধ ১৮৯৪ সালের Royal Asiatic Society-র Journal-এ প্রকাশ করেছিলেন। এতে আছে নেপালে-পাওয়া দ্বাদশ শতাব্দের পুঁথির আলোকচিত্র; সংস্কৃত ভাষায় লেখা সাধনসঙ্কেত-সমেত তার কিছু পরিচয় তিনি দিয়েছিলেন। তাতে তিব্বতী প্রমাণপত্রগুলির যাথার্থ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেল। এ-ছাড়া তিনি ভারতে পাথরে-ছাপতোলা মূর্তিগুলির অনেক বর্ণনা দিতে পারেননি। কিন্তু, এগুলি Waddel সাহেব তিব্বতী সূত্র থেকে দিয়ে মন্তব্য করেছিলেন, তিনি তিব্বতী পুঁথি থেকে সম্পূর্ণ অনুবাদ পরে পরে প্রকাশ করবেন; এবং তার ফলে, পরবর্তী গবেষকগণ অন্যত্র-পাওয়া অসংখ্য প্রতিমার নানাপ্রকার মাপজোখের পরিচয় জানতে পারবেন।

Dr. Waddel-এর গ্রন্থ, আর মঁসিয়ে ফুসের গ্রন্থ বৌদ্ধমূর্তিতত্ত্ব-সম্পর্কে প্রামাণ্য রচনা। মঁসিয়ে ফুসের গ্রন্থ হচ্ছে দু-খানি পুঁথির ওপর কাজ। এই বৌদ্ধ পুঁথিগুলি হলো 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা'র। পুঁথি দু-খানি ছিল Cambridge University Library-তে আর কলকাতার Asiatic Society-র Library-তে। পুঁথি দু-খানি পাল-যুগের। এতে ছিল বৌদ্ধ জাতকের নানা রঙিন চিত্র। পুঁথিতে মূর্তিগুলির পরিচয়-পত্র আঁটা ছিল। প্রসঙ্গতঃ প্রথম যুগের কাজ হিসাবে Dr. Burgess-র কাজেরও উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেছিলেন, উত্তরভারতের বৌদ্ধশাস্ত্রের আলোচনা করলে অজন্তার ছবিগুলির ব্যাখ্যা সম্ভবপর হবে। শুধু অজন্তা নয়, মধ্যযুগের অন্য চিত্র ও ভাস্কর্যসম্ভারেরও ব্যাখ্যা এর দ্বারা করা যাবে। ১৮৭৯ সালের দিকে পশ্চিমভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক রিপোর্ট লিখে (সংখ্যা ৯) তিনি

আধুনিক নেপালী সূত্র থেকে কয়েকটি বুদ্ধমূর্তির বিশদ পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু, তাঁর এই কাজ ম'সিয়ে ফুসে বা Dr. Waddel পুরানো নেপালী ও তিব্বতী সূত্র থেকে যে-কাজ করেছিলেন অতটা প্রামাণ্য আর সম্পূর্ণ নয়। অধ্যাপক Grunwedel তাঁর Mythology of Buddhism in Tibet and Mongolia-গ্রন্থে মহাবজ্রভৈরবতন্ত্র-পুঁথি থেকে বৌদ্ধমূর্তির ও শিল্পরীতির বিচার লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

রবীন্দ্রনাথ্যগবাবু আক্ষেপ করেছিলেন, ভারতশিল্প-চর্চার ব্যাপারে আসল শিল্পশাস্ত্রের আলোচনা হয়েছে অতি অল্পই। ফলে, অমূল মতবাদ আর অনুমানের ভিত্তি এখনও ধূলিসাৎ হচ্ছে না। এর জন্যে সংস্কৃত, প্রাকৃত আর তিব্বতী অসংখ্য প্রামাণ্য পুঁথি আমাদের অনুশীলন করতে হবে। শিল্পশাস্ত্রের বিধিবদ্ধ আলোচনা আশি বছর আগে আরম্ভ করেছিলেন রাম রাজ তাঁর Essay on the Architecture of the Hindus-গ্রন্থে। তাঁর এই বইখানি ১৮৩৪ সালে Great Britain আর Ireland-এর Royal Asiatic Society-র Oriental Translation fund থেকে ছাপা হয়েছিল। কিন্তু রাম রাজের বই এখন সেকেলে হ'য়ে গেছে! এবং তিনি মাত্র স্থাপত্যের দিক্‌টাই আলোচনা করেছেন। মূর্তিনির্মাণের দিক্‌টা বিশেষ হাত দেন নি। তাঁর পরে Dr Kern বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতার অনুবাদ করেন ইংরেজীতে। এই গ্রন্থের ৫৩সংখ্যক অধ্যায়টি গৃহনির্মাণ প্রসঙ্গে। ৫৬সংখ্যক অধ্যায়ে আছে বিভিন্ন মন্দিরের মাপজোখের বর্ণনা, আর ৫৮সংখ্যক অধ্যায়ে আছে বিভিন্ন মূর্তির আয়তন-নির্ণয়ের বিবরণ।

এ বিষয়ে আর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ হলো কলকাতা হাইকোর্টের পণ্ডিত প্রাণনাথ শাস্ত্রীর The Hindu Law and Endowment: এই বইয়ে বিভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে তিনি অনুবাদ করেছিলেন। এতে মন্দিরের আকৃতি, উপকরণ, পরিমাপ, গঠন, প্রতিষ্ঠা আর মূর্তিস্থাপন ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে।

শিল্প-বিষয়ে ১৯১২ সাল পর্যন্ত শেষ কাজ হলো কুমারস্বামীর

Mediaeval Sinhalese Art (1909)। এতে শিল্পশাস্ত্রের তিনখানি সিংহলী বৌদ্ধ পুঁথি থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। পুঁথিগুলি হলো —সারীপুত্র, রূপাবলীর আর ময়মত্য। এই বইয়ে কুমারস্বামী এই পুঁথিগুলিতে বিবৃত শিল্প-পদ্ধতির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন; আর শিল্পশাস্ত্রের কালনির্ণয়ের আলোচনার সূত্রপাত করেছেন। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে, তিনি শিল্পশাস্ত্রের সম্যক্ অনুশীলন করবেন। এলাহাবাদের Sacred Books of the Hindu Series-এর প্রকাশকেরা তাঁদের যে পরিকল্পনা প্রকাশ করেন তাতে কুমারস্বামীর লেখনীনিঃসৃত প্রাচীন শিল্প-শাস্ত্রের অনুবাদ কয়েক খণ্ডে প্রকাশিত হবে বলে প্রচার করেছিলেন।

সিংহলের পুরানো শিল্পকলা দেখে অবাক্ হ'য়ে, তার জড় খুঁজতে কুমারস্বামী এসেছিলেন ভারতবর্ষে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবারের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতার কথা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু ঠাকুরবাড়ির পরিবেশে কুমারস্বামী ভারতশিল্পের তত্ত্বগত বা দার্শনিক দিক্‌টি অবহিত হ'তে পেরেছিলেন ব'লে মনে হয় না। শিল্পিগুরু অবনীন্দ্রনাথ হ্যাভেলসাহেবের প্রেরণায় ভারতীয় পদ্ধতিতে চিত্রাঙ্কন শুরু করলেও, অবনীবাবুর প্রবর্তিত নব্যবঙ্গশিল্প-শৈলীতে প্রথম দিকে ভারতীয় ভাবাদর্শের বিশেষ কোনো ছাপ ছিল না। এই সময়ে নব্যবঙ্গের কলাপদ্ধতিতে চিত্রকর্মকে ভারতীয় করবার জন্যে বিষয়বস্তু আর টেকনিকের ওপরেই নির্ভর করতে হয়েছিল। ভারতশিল্পের তত্ত্বগত ভাবাদর্শের সিংহদ্বার তখনও এই নতুন পথিকদের কাছে উন্মুক্ত হয়নি। কুমারস্বামীর সঙ্গে বহু আলোচনা ক'রে অবনীবাবু ভারতশিল্পের আদর্শ তখন দাঁড় করিয়েছিলেন—

রূপভেদাঃ প্রমাণানি ভাবলাবণ্যযোজনম্।
সাদৃশ্যং বর্ণিকাভঙ্গ ইতি চিত্রং ষড়ঙ্গকম্॥

—এর সঙ্গে অজন্তা-গুহার চিত্রাবলীর আদর্শ মিলিয়ে নিয়ে ভারতশিল্পাদর্শে রেনেসাঁর সূচনা করা হয়েছিল।

॥ অবনীন্দ্রনাথের ভারতশিল্পে মূর্তি ও ষড়ঙ্গ চিন্তা (১৯১৩-১৪) ॥

অবনীবাবু ভারতশিল্পে 'মূর্তি'র চিন্তা ক'রে, প্রবন্ধ লিখে ১৩২০ সালের পৌষ ও মাঘ সংখ্যার 'প্রবাসী'তে প্রকাশ করেছিলেন — 'মূর্তি' —এই নাম দিয়ে। সুকুমার রায় প্রবন্ধটির ইংরেজী অনুবাদ করে Indian Society of Oriental Art-এর মাধ্যমে বই ক'রে প্রকাশ করেন Some Notes on Indian Artistic Anatomy —এই নামে ১৯২১ খৃস্টাব্দে। ঐ বছরেই আঁদ্রে কার্পেলে এই বইটির ফরাসী অনুবাদ প্যারিস থেকে প্রকাশ করেন। অবনীবাবুর এই বইয়ে ছাপা প্রত্যেকটি স্কেচ্ শ্রীনন্দলালের করা, —জিজ্ঞাসা করায় বললেন তিনি ১৯৬৫ সালের ৭ই অক্টোবর।

এই বইয়ের ভূমিকায় অবনীবাবু কিন্তু শিল্পশাস্ত্রের বচন, শাস্ত্রোক্ত মূর্তিলক্ষণ, তার মান-প্রমাণাদির বন্ধন অচ্ছেদ্য, কিংবা অলঙ্ঘনীয় মনে ক'রে, কোনো শিল্পীর শিল্পকর্মকে চিরদিন শাস্ত্র-প্রমাণের গণ্ডীর ভেতর আবদ্ধ রেখে, স্বাধীনতার 'অমৃত স্পর্শ' থেকে বঞ্চিত করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছিলেন —পাখী উড়তে না-পারা পর্যন্ত তাকে নীড় ও গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকতে হয়; অতঃপর শক্তিলাভ হওয়ামাত্র বাঁধ ভেঙ্গে বের হ'য়ে পড়ার চেষ্টা ক'রে শিল্পীকে সার্থক ও সম্পূর্ণ হ'তে হয়। তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন, —মুখ্য হচ্ছে —শিল্পী আর তাঁর সৃষ্টি; পরে, শিল্পশাস্ত্র আর শাস্ত্রকার, —'শাস্ত্রের জন্য শিল্প নয়, শিল্পের জন্য শাস্ত্র'। তাঁর মতে, —মূর্তি রচনা হয় প্রথম; পরে মূর্তিলক্ষণ, মূর্তিবিচার, মূর্তি-নির্মাণের মান-পরিমাণ নির্দিষ্ট ক'রে শাস্ত্রাকারে গাঁথা হয়। তিনি বলেছিলেন, —শিল্পশাস্ত্রের বাঁধাবাঁধি —শিল্পশিক্ষার্থীর জন্যে; কিন্তু শিল্পীর জন্যে তাল, মান, অঙ্গুল, লাইট্ শেড্, পার্স্পেক্টিভ্ আর এ্যানাটমির বন্ধন-মুক্তি। শিল্পশাস্ত্র মুখস্থ ক'রে তার গণ্ডির ভেতর আবদ্ধ থেকে কেউ শিল্পী হয় না। যাঁরা মেপেজুখে শাস্ত্রসম্মত মূর্তি তৈরী করেন, তাঁ'দিকে অবনীবাবু 'বিষম ভ্রান্ত' ব'লে চিহ্নিত করেছেন। অবনীবাবু ভাবতেন, —প্রকৃত শিল্পী শিল্পশাস্ত্রের বাঁধ ভেঙ্গে ফেলেন, —আত্মপ্রতিভার

দুর্বার গতিতে। তিনি বলেন, —প্রকৃত শিল্পী শাস্ত্রপ্রমাণের বন্ধন ভেঙ্গে প্রকৃত শিল্পকর্মের সার্থকতায় উত্তীর্ণ হবেন, —এ-কথা প্রাচীন শিল্পশাস্ত্রকারগণ বুঝতেন। সেইজন্যেই শাস্ত্র-বাঁধনের বজ্র-অাঁটুনীর মধ্যেও তাঁরা ফসকা-গেরোর ব্যবস্থা ক'রে গেছেন। অবনীবাবু 'সেব্যসেবক ভাবেষু প্রতিমালক্ষণং স্মৃতং' —শুক্রনীতির এই বচন উদ্ধার ক'রে দেখিয়েছেন, —কেবল পূজার জন্যে প্রতিমা গঠন করবার সময়ে শাস্ত্রবচন মানতে হবে, আর অন্যরকম মূর্তি গড়বার সময়ে যথা-অভিরুচি' অাঁকতে পারা যাবে। প্রমাণস্বরূপ অবনীবাবু তাঁর প্রবন্ধে ত্রিভঙ্গ মূর্তির দুটী চিত্র প্রকাশ করেছেন। তার একটিতে শাস্ত্রসম্মত মাপজোখ ঠিক রেখে করা হয়েছে, আর অন্যটি যে-কোনো একজন ভারতশিল্পীর করা মূর্তি থেকে বেছে নেওয়া হয়েছে। এই দুটী মূর্তিতে শাস্ত্রীয় টান, আর শিল্পীর টান কেমন ফুটেছে —সেটা বিশ্লেষণ ক'রে তিনি দেখিয়েছেন। অবনীবাবুর ধারণা, —সৌন্দর্যলক্ষ্মী শাস্ত্রছাডা, সৃষ্টিছাড়া। পূজার উদ্দেশ্যে মাপজোখের মধ্যে লক্ষণ মিলিয়ে তাঁকে দাঁড করালে সেখানে তিনি ধরা দেন না। অবনীবাবুর ভাষায়, —'পণ্ডিতে বলেন শাস্ত্রমূর্তিই সুন্দর মূর্তি ; কিন্তু, হায়, পূর্ণ সুন্দর লাখে তো এক মিলে না। একে বলে শাস্ত্রছাড়া সুন্দর কি ? আরে বলে সুন্দর সে যে হৃদয় টানে, প্রাণে লাগে'।

কিন্তু, অবনীন্দ্রনাথ বা নন্দলাল যাঁরা জাতশিল্পী সত্যযুগ থেকে যাঁদের সাধা তুলি, শিল্পসৃষ্টিতে স্বাধীনতার আনন্দ-আস্বাদ লাভ করা বোধ হয় তাঁদের পক্ষেই সম্ভবপর। 'সংস্কার'-হীন প্রবর্তকের পক্ষে এই লক্-ছাড়া আনন্দ, নিয়ে আসে মহতী বিনষ্টিঃ। কার্যতঃ ঘটেছিলও তাই। শিল্পরচনার পালে তথাকথিত 'নির্ভয়তার' হাওয়া লেগে, অনেকেরই সেটা ফুলে ফেঁপে বেলুন হয়ে উঠেছিল। পশ্চিমী ঝড়ে অনেকের সেটা ফেটে নানা খানা হয়ে গেল। হালের সঙ্গে বা তটের সঙ্গে যোগ থাকলে বোধ হয় ভবিষ্যৎ ভারত-শিল্পের এ-রকম ডাল ছাড়ার অপঘাত ঘটতো না। ভবিষ্যতে স্বয়ং অবনীবাবুকেও তাঁর কৃতকর্মের জন্যে সন্তাপ ক'রতে হয়েছে। তাঁর শিষ্যবর্গের অনেকে এমন ছবি এঁকেছেন যা দেখে অবনীবাবুকে বলতে হয়েছে, —এ ভারতশিল্পে 'ভারত'ও নাই আর শিল্পও নাই। তাঁর ভাষায়ঃ 'ব্রহ্মা একবার কোনো একটি রাক্ষস তৈরি করে

নিজেই প্রাণভয়ে অস্থির, রাক্ষস তাঁকে খেতে চায়। ভাবি, আমার বেলায়ও তাই হয় বা'। এ-সব আলোচনা পরে সবিস্তর করা হবে।

অবনীবাবু 'মূর্তি'-সম্পর্কে কি বলেছেন, দেখা যাক্। —শিল্পশাস্ত্রে মূর্তিকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হ'য়েছে, —নর, ক্রূর, আসুর, বাল্য আর কুমার। এই পাঁচ রকমের মূর্তি গড়বার জন্যে পাঁচ রকমের 'তাল' ও 'মান' নির্দিষ্ট করা হয়েছে —নর-মূর্তি দশ তাল, ক্রূর-মূর্তি দ্বাদশ তাল, আসুর-মূর্তি ষোড়শ তাল, বাল্য-মূর্তি পঞ্চতাল আর কুমার-মূর্তি ষট্‌তাল। তালের পরিমাণ হচ্ছে, —শিল্পীর নিজের মুঠের একের চার অংশকে এক 'অঙ্গুল' ধ'রে —বারো আঙ্গুল। নয় বা দশ তাল পরিমাণে নর-নারায়ণ, রাম, ইন্দ্র, অর্জুন প্রভৃতির মূর্তি গড়তে হয়। ক্রূর বা দ্বাদশ তাল পরিমাণে চণ্ডী, ভৈরব, বরাহ এই সব মূর্তি গড়বার নিয়ম। আসুর বা ষোড়শ তাল পরিমাণে রাবণ, কুম্ভকর্ণ, মহিষাসুর প্রভৃতির মূর্তি গড়তে হয়। বাল্য বা পঞ্চতাল পরিমাণে শিশুমূর্তি —যেমন বটকৃষ্ণ, গোপাল —এই সব গড়ার বিধি। কুমার বা ষট্‌তাল পরিমাণে কিশোর —যেমন উমা, বামন, কৃষ্ণসখা প্রভৃতির মূর্তি গড়ার নিয়ম। —অবনীবাবু এর খুঁটিনাটি বিস্তৃত বিবরণ লিখেছেন। এর পরে, 'আকৃতি ও প্রকৃতি' আঁকবার শাস্ত্রীয় বর্ণনা দিয়েছেন। শাস্ত্রমতে, মুখ আঁকতে হবে মুরগীর ডিমের মতন গোল; ললাট হবে ধনুকের মতন; ভ্রূযুগ হবে নিমপাতা কিংবা ধনুকের আকৃতি; চোখ হবে মৎস্যাকৃতি; কান হবে 'ল'-কারের মতন; নাক হবে তিলফুলের অনুরূপ; ঠোঁট হবে তেলাকুচোর মতন; চিবুক হবে আমের আঁটি; কণ্ঠ হবে শঙ্খের আকারে; শরীর বা কাণ্ড হবে গরুর মুখের মতন; কোমর হবে ডমরু বা সিংহের কোমর; পুরুষের বুক হবে বদ্ধ কবাটের মতন; স্কন্ধ হবে হাতীর মাথা; বাহু হবে হাতীর শুঁড়; কনুই থেকে হাতের চেটো পর্যন্ত হবে ছোট কলা-গাছের মতন; আঙ্গুল হবে শিম বা মটরশুঁটীর মতন; ঊরু হবে কদলীকাণ্ড, হাঁটু হবে কাঁকড়ার মতন; জঙ্ঘা হ'বে ডিমওলা

মাছের আকার ; হাত ও পা হবে পদ্মের আর পল্লবের মতন। —এ সবের সচিত্র বিবরণ দিয়েছেন অবনীবাবু।

অবনীবাবুর 'মূর্তি'-প্রবন্ধের তিনটি অনুচ্ছেদ। শেষ অনুচ্ছেদ হলো, —'ভাব ও ভঙ্গি'। অবনীবাবু বলেছেন, —ভারতশিল্পে মূর্তিতে মোটামুটি চার রকমের ভঙ্গি বা ভঙ্গ দেখা যায় —সমভঙ্গ, আভঙ্গ, ত্রিভঙ্গ আর অতিভঙ্গ। সমভঙ্গ বা সমপাদ মূর্তিতে —ঋজু দেহে বুদ্ধ সূর্য বিষ্ণু —এঁদের মূর্তি গড়া হয়েছে। আভঙ্গ সূত্রে —দেহ বাঁয়ে বা ডাইনে হেলিয়ে করা হয়। যেমন, বোধিসত্ত্ব বা সাধুপুরুষদের মূর্তি। ত্রিভঙ্গ ঠামে পুরুষ-মূর্তিকে বাঁয়ে, আর স্ত্রী-মূর্তিকে ডাইনে হেলিয়ে করার নিয়ম। বিষ্ণু, সূর্য প্রভৃতির মূর্তি তাঁদের শক্তির সঙ্গে গঠন করা হ'লে সমভঙ্গ, আর ত্রিভঙ্গ দু'রকম ভঙ্গেই গড়া হ'য়ে থাকে। অতিভঙ্গ-মূর্তিতে ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিই আরো বাঁকিয়ে করা হয়। অতিভঙ্গ ঠামে শিবতাণ্ডব, দেবাসুর-যুদ্ধ —এই সব মূর্তি করা হ'য়ে থাকে।

শুক্রনীতিসার, বৃহৎসংহিতা ইত্যাদি শিল্পশাস্ত্র সম্পর্কে পুরানো গ্রন্থে মূর্তির মান-পরিমাণ, আকৃতি-প্রকৃতি তন্নতন্ন করে দেওয়া আছে। মূর্তি-নির্মাণ সম্পর্কে অবনীবাবু 'সেব্যসেবক' শ্লোকটি তুলে পুনরায় বলেছেন, —পূজার জন্যে মূর্তি গড়লে যথাশাস্ত্র সর্ব লক্ষণ মিলিয়ে মূর্তি গড়তে হবে ; আর যে মূর্তির পুজো হবে না, সেগুলি শিল্পী নিজের অভিরুচি মতো করতে পারবেন। চিত্র, আলপনা, বালি, মাটি বা পিটুলী দিয়ে তৈরী মূর্তি বা প্রতিমা শাস্ত্রলক্ষণহীন হ'লেও দোষের হয় না ; কারণ, সেগুলি সাময়িকভাবে পূজার বা ব্রতের প্রয়োজন সিদ্ধ করে মাত্র। এ-সব মূর্তি মেয়েরাও তৈরী করে, ছেলেরাও তৈরী করে. অনেক সময়ে আমোদ-প্রমোদ বা খেলার জন্যে। ইষ্টদেবের মূর্তি তৈরী করতে হয় শাস্ত্র মিলিয়ে। প্রতিমার হাত-পা কৃশভাবে তৈরী করলে দেশে দুর্ভিক্ষ হয় ; মোটা করলে রোগের প্রাদুর্ভাব হয় ; সুতরাং, এ-সব সুঠাম ক'রে তৈরী করার নিয়ম। পঞ্চমুখ, ষড়মুখ বা দশমুখ গড়নের ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম আছে ; চার বা তার বেশি

হাত তৈরীরও নিয়ম আছে ; ইষ্টদেবতার মূর্তি তৈরী করতে হয় —বালক বা তরুণের মতন ; বুড়োর মতন নয় কখনও।

শিল্পিগুরু অবনীবাবুর 'ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ'-চিন্তা অদ্যাবধি অদ্বিতীয়। তাঁর এ-বিষয়ে প্রবন্ধগুলি 'ভারতী'-পত্রিকাতে প্রকাশিত হয় ১৩২১ সালে। পরে, এ-গুলির ইংরেজী (১৯২১) ও ফরাসী ভাষায় (১৯২২) অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। অবনীবাবুই প্রথম চীনের আর ভারতের শিল্পকলার ষড়ঙ্গ-চিন্তার তুলনামূলক আলোচনা করেন। কিন্তু History of Indian and Indonesian Art (1927) গ্রন্থের ৮৮পৃষ্ঠায় আমরা দেখি, কুমারস্বামীর মতন অনেক শিল্পশাস্ত্রী অবনীবাবুর এই ষড়ঙ্গ-ব্যাখ্যান সম্পূর্ণ গ্রহণ করেননি। তবুও শিল্পাচার্যের এই বিশ্লেষণ বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য। অনেক পরে, 'বাগীশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী'-গ্রন্থে অবনীবাবু তাঁর মতামত সবিস্তারে বলেছেন, —সে-আলোচনা আমরা যথাসময়ে করবো।

কামসূত্রের টীকায় পণ্ডিত যশোধর আলেখ্যের ছ'টি অঙ্গ নির্দেশ করেছেন, —(১) রূপভেদ, (২) প্রমাণ, (৩) ভাব, (৪) লাবণ্যযোজন, (৫) সাদৃশ্য ও (৬) বর্ণিকাভঙ্গ। যশোধর এই ষড়ঙ্গ-বিভাগ সংকলন করেছিলেন এগারো থেকে বারো শতাব্দের মধ্যে। তবে, এই ষড়ঙ্গ-বিচার কতো প্রাচীনকাল থেকে ভারতে প্রচলিত ছিল, তা বলা শক্ত। চিত্রের এই ষড়ঙ্গ জয়পুরের শিল্পীদের মধ্যে বহুকাল থেকে প্রচলিত ছিল। চীনদেশের শিল্পাচার্য শে-হো (Hsieh Ho) পঞ্চম শতাব্দের দিকে যে ষড়ঙ্গ লিখেছিলেন, সে ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গেরই অনুরূপ। এ-ছাড়া, চীনদেশে তৃতীয় খৃস্টাব্দে অমিতাভ বুদ্ধমূর্তি সর্বপ্রথম গঠন করেন চীনা শিল্পী তাইকুচি (Tai Kuci)। এতে অবনীবাবুর ধারণা, পঞ্চম শতাব্দের আগেই বৌদ্ধশিল্প-পদ্ধতি আর তার সঙ্গে আমাদের চিত্রের ষড়ঙ্গ চীনদেশে গিয়েছিল।

'পঞ্চদশী'-গ্রন্থের রচয়িতা চিত্রপটের চার অবস্থা দেখে ব্রহ্মের স্বরূপ ও ব্রহ্মাণ্ডের রহস্য-নির্ণয় করেছেন। সুতরাং চিত্রকলা আমাদের দেশে সখের খেলা ছিল না। সে-ছিল আমাদের জ্ঞান ও কর্মের সঙ্গে নিগূঢ় সম্বন্ধে যুক্ত। চিত্রকলাকে আমাদের পূর্বপুরুষেরা যে-চোখে দেখতেন,

চীন ও জাপান ছাড়া, আর কোনো জাতি সে-চোখে দেখে না। চিত্রে এই ষড়ঙ্গ-প্রয়োগ ভারতবর্ষে সুপ্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত ছিল; সুতরাং এই বিষয়ে একটা আধুনিক চর্চা বর্তমানেও দরকার ব'লে অবনীবাবু মনে করতেন; বিশেষ ক'রে নব্যচিত্রকলা-পদ্ধতির আলোচনায় এর বিচার অপরিহার্য।

অবনীবাবুর মতে, ভারত-ষড়ঙ্গ সংক্ষেপে এই: —(১) রূপভেদ —অর্থাৎ রূপে রূপে বিভিন্নতা, রূপের মর্মভেদ বা রহস্য-উদ্ঘাটন —জীবিতরূপ, নির্জিতরূপ, চাক্ষুষরূপ, মানসরূপ, সুরূপ, কুরূপ ইত্যাদি।

ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকেই আমরা রূপকে দেখি —বহু প্রকারে। —ছোট, বড়ো, মোটা, চার-কোণা, নানা-কোণা, গোল; সাদা, কালো, বেগুনী, রক্ত-পীত, কঠিন, চকচকে, পিছিল; মৃদু, দারুণ; ছোট, বড়ো, রোগা, মোটা, কাটাছাঁটা, গোলগাল, কালোধলো, একরঙা, পাঁচরঙা ইত্যাদি। —এর বিস্তার অশেষ। এই রূপের অসীমতা এক এক বস্তুতে আলাদা। ভিন্ন ভিন্ন দেখা আর এই অখণ্ড বিভিন্নকে একে সমাহিত অসীমে প্রতিষ্ঠিত দেখাই হচ্ছে চোখের আর আত্মার কাজ। অবনীবাবু বলেন —'প্রথমে রূপের সহিত চোখের পরিচয়, ক্রমে তাহার সহিত আত্মার পরিচয় —ইহাই হইতেছে রূপভেদের গোড়ার কথা এবং শেষের কথা'।

(২) প্রমাণ: —প্রমাণ কথাটির অর্থ হলো —বস্তুর রূপের সম্পর্কে প্রমা বা অভ্রান্ত জ্ঞানলাভ করা; বস্তুর নৈকট্য, দূরত্ব, তার দৈর্ঘ্যপ্রস্থ ইত্যাদির মান-পরিমাণ —এক কথায় বস্তুর হাড়হদ্দ জানা।

(৩) ভাব: —অর্থাৎ আকৃতির ভাবভঙ্গি, স্বভাব, মনোভাবাদি আর ব্যঙ্গ্য। শরীর আর ইন্দ্রিয়ের বিকার বিধান ক'রে থাকে ভাব। বিভাবঘটিত চিত্তবৃত্তির নাম ভাব। নির্বিকার-ধর্মী চিত্তে ভাব হলো প্রথম বিক্রিয়া, অর্থাৎ নির্বিকার-চিত্তে ভাবই প্রথম বিক্রিয়া দান করে। চিত্ত স্বভাবতঃই স্থির; ভাবই তাকে চঞ্চল করে। ভাবের কাজটি আমরা চোখ দিয়ে ধরতে পারি —নানা আকৃতির নানা ভঙ্গিতে। চোখে আমরা ভাবকে দেখি; আর দেখাই ভঙ্গী দিয়ে —ত্রিভঙ্গ, সমভঙ্গ, অতিভঙ্গাদি শাস্ত্রীয়, আর অগণিত অশাস্ত্রীয় ভঙ্গী দিয়ে। কিন্তু, চিত্রে কেবল ভঙ্গীটুকু দেখালে, সে-রূপে ভাবের ব্যঞ্জনার দিকটি বাদ পড়ে যায় —ইঙ্গিতের অভাবে ব্যঙ্গ্যের অভাবে।

শাস্ত্রে আছে, —ব্যঞ্জ্যের অভাবে শব্দচিত্র, বাচ্যচিত্র, এমন-কি লিখিত-চিত্রও অনুত্তম হ'য়ে পড়ে। চিত্রমাত্রেই উত্তম হয় তখনই, যখন তাতে ব্যঙ্গ্য থাকে। ব্যঙ্গের নামান্তর হলো —tone। অবনীবাবুর ভাষায় —'ভাবের কার্য হইতেছে রূপকে ভঙ্গী দেওয়া। এবং রূপের আড়ালে মনোভাবের ইঙ্গিতটিকে যেন অবগুণ্ঠিতভাবে প্রকাশ করা হইতেছে ব্যঙ্গ্যের কার্য'।

(৪) লাবণ্য যোজনা ঃ—ভাবে দীপ্তি দিয়ে থাকে লাবণ্য। চিত্রের রূপ, প্রমাণ, ভাব —সবই নিষ্প্রভ হ'য়ে থাকে, এই তিনের মধ্যে লাবণ্য এসে দীপ্তি না-দিলে। রূপকে পরিমিত করে প্রমাণ, যথাযথ সীমার মধ্যে এনে; —লাবণ্য তেমনি পরিমিতি দেয় ভাবের কাজকে বা ভঙ্গিকে, অদ্ভুত বা উচ্ছৃঙ্খল ভঙ্গি থেকে নিরস্ত ক'রে। চিত্রের সমস্ত ভাব-ভঙ্গীতে লাবণ্য একটি শীতলতা, একটি শোভনতা দিয়ে, চিত্রটিকে নয়নস্নিগ্ধকর আর মনোহর করে তোলে। এ-যেন ঠিক্ ব্যঞ্জনে লবণ-সংযোগের মতো। ছবিতে বিশুদ্ধি ও সংযম এনে দেয় লাবণ্য।

(৫) সাদৃশ্য ঃ—রূপে রূপে মিল থাক্, না-থাক, সাদৃশ্যের পক্ষে ভাবে ভাবে সম্বন্ধ থাকা দরকার। একের ভাব যখন অপরে উদ্রেক করে, তা'র নাম —সাদৃশ্য। দুয়ের আকৃতি ভিন্ন থাকা সত্ত্বেও এক বস্তু অন্য বস্তুর যথার্থ ভাব উদ্রেক ক'রতে পারে। অবনীবাবু বলেন, —আকৃতির সাদৃশ্য এবং দুয়ের স্ব স্ব ধর্মের সাদৃশ্য সুলভ নয়। সেইজন্যে সাদৃশ্য দেখাবার জন্যে বস্তুর আকৃতির চেয়ে প্রকৃতি, বা স্বধর্মের দিক্ দিয়ে সাদৃশ্য দেখানো ভালো। কোনো-এক রূপের ব্যঞ্জনাটুকুকে অন্য এক রূপ দিয়ে ব্যক্ত করা হ'লে সেই সাদৃশ্যই উত্তম। মনোভাবের সদৃশ হচ্ছে —সাদৃশ্য। চিত্রে শত সহস্র রেখা, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণভেদাদি, মানস মূর্তির সদৃশ ক'রে আঁকা হ'লে, তারই নাম সাদৃশ্য-দেওয়া। ভাবের অনুকরণ থেকে উত্তম-সাদৃশ্য হয়; আর আকৃতি বা রূপের অনুকরণ থেকে হয় অধম-সাদৃশ্য।

(৬) বর্ণিকাভঙ্গ ঃ— অর্থাৎ নানা বর্ণের সংমিশ্রণ, ভঙ্গী ও ভাব, বর্ণ-বর্তিকা, টান-টোনের ভঙ্গী —এইসব। বর্ণজ্ঞান আর বর্ণিকাভঙ্গ

হচ্ছে ষড়ঙ্গ-সাধনার চরম সাধনা ; আর সর্বাপেক্ষা কঠোর সাধনা। বর্ণিকা-ভঙ্গ অর্থাৎ বর্ণজ্ঞান না-হ'লে, বা তুলির টান-টোনে দখল না-হ'লে, ষড়ঙ্গের পাঁচটি সাধনাই বৃথা।

তন্ত্রশাস্ত্রে প্রত্যেকটি অক্ষরের আর রেখার এক-একটি ক'রে আত্মা, আর তার এক-একটি বিশেষ বর্ণ দেওয়া হয়েছে। গায়ত্রীর এক-একটি অক্ষরও আত্মাবান্। নাট্যশাস্ত্রের মতে, বর্ণের বিধি ও প্রকৃতি বুঝে তবে অঙ্গ-রচনা করতে হয়। চোখ বর্ণ মেশায় না ; বর্ণ মেশায় মন। মন আর কালি যতক্ষণ পৃথক, ততক্ষণ কালি কালো-কালি-মাত্র ; কিন্তু তার সঙ্গে মন এসে মিললেই, কালি আর কালো থাকে না। দেখা যায়, —সে যেন 'ষড়ঙ্গের বরণডালায় আলোর শিখার মতো জ্বলিয়া উঠিয়াছে'।

এর পরের অনুচ্ছেদে, বোই (Bowie), ওকাকুরা আর বিনিয়ন্ (Binyon) সাহেবের মতামত অনুসরণ ক'রে অবনীবাবু ভারতশিল্পে 'ষড়ঙ্গ-দর্শন'কে চীন জাপানের ষড়ঙ্গ দর্শনের সঙ্গে, রস ও ছন্দের দিক্ থেকে তুলনামূলক আলোচনা করে তাঁর 'ভারত'শিল্পের 'ষড়ঙ্গ-চিন্তা'র পরিসমাপ্তি করেছেন। অবনীবাবুর মতে, চীন-জাপানের চিত্রকলার ষড়দর্শন, আমাদের বেদান্ত-উপনিষদাদির গভীরতম চিন্তাগুলির প্রতিধ্বনি মাত্র।

॥ শ্রীঅরবিন্দের ভারতশিল্পচিন্তা (১৯১৮-২১) ॥

একদা আর্চার (Archer) সাহেব ভারতশিল্পের ওপর একহাত নিয়েছিলেন। য়ুরোপের শিল্পসমালোচকদের মধ্যে তিনি ছিলেন তখন ভারতশিল্পের বিরুদ্ধবাদীদের শেষ প্রবক্তা ; কিন্তু, তীক্ষ্ণতম বিরুদ্ধ কণ্ঠে নিন্দে ক'রে গেছেন তিনি ভারতশিল্পের। শ্রীঅরবিন্দের মতে, —কোনো দেশের সংস্কৃতি-সম্পদের মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান্ হচ্ছে তার নন্দন-তত্ত্ব। কোনো দেশের দর্শন বা ধর্মের মতো এই কলাশিল্পের দিক্‌টিরও আলোচনা হওয়া উচিত। কারণ, এই হলো ভারতীয় জীবনের ভিত্তিমূল। এ-কথা ব'লে, শ্রীঅরবিন্দ বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ

করেছিলেন, এই বিষয়ে হ্যাভেল্‌স সাহেবের আর ডক্টর কুমারস্বামীর প্রভৃত কাজের কথা উল্লেখ ক'রে। তিনি নব্যভারতের কাছে আবেদন জানিয়ে গেছেন, তাঁরা বিদেশী ধাঁচে শিক্ষালাভ করলেও, ভারতের অতীত ও বর্তমানকে নিয়ে ভবিষ্যৎ ভারত গঠন করবেন তাঁরাই।

আর্চার সাহেব তাঁর গ্রন্থে ভারতশিল্পের নিন্দে ক'রে গেছেন বেপরোয়া। তবে, তাঁর মন্তব্যগুলি শ্রীঅরবিন্দের যুক্তির ধোপে টেকেনি। আধ্যাত্মিক বা দার্শনিক তত্ত্ববস্তুগুলির ভেতর সাহেব আদৌ ঢুকতে পারেননি। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর লেখার প্রতিবাদ ক'রে দু-একটি নিদর্শন দিয়েছেন। তিনি বলেন, —ভারতশিল্পের বৈশিষ্ট্য হলো, পুরুষ-মূর্তি আঁকতে গেলে, কাঁধ খুব প্রশস্ত ক'রে আর মধ্যভাগ ক্ষীণভাবে দেখাতে হয়। —ব্যতিক্রম হলো গণেশ আর যক্ষমূর্তি। ভারতের কবি ও শিল্পশাস্ত্রিগণ সিংহের কোমরের সঙ্গে বীরপুরুষের কোমরের তুলনা ক'রেছেন। অথচ মজার কথা এই, আর্চার সাহেবের মতে, এটাই হলো একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ, —ভারতবর্ষের লোকগুলো সবে অর্ধবন্যস্তর থেকে বের হ'য়ে এসেছে! আর্চারের বুদ্ধিতে আরো পরিষ্কার হয়েছিল যে, ভারতীয়েরা বীরপুরুষের আদর্শকে এদেশের জলা জঙ্গল থেকে পেয়েছিল পশুপূজার অনুকরণ ক'রে। শ্রীঅরবিন্দ শ্লেষ ক'রে লিখেছেন, —এই সূত্রে আর্চার বলবেন, কম্বনের করা সমুদ্রের মূর্তি আর সীতার চোখের গভীরতা হলো, আদিম বর্বর যুগের জড়-প্রকৃতির পূজা; অথবা, সীতার 'মদিরেক্ষণা' বিশেষণটি দেখে বলবেন, বাল্মীকির এই বর্ণনাটা হচ্ছে ভারতীয় কবি-মানসের অর্ধমত্ত আবেশমাত্র। —এই সব হলো আর্চার সাহেবের যুক্তির নিদর্শন। নব্যবঙ্গচিত্রকলার মূর্তির সরু সরু হাত-পা দেখে অনেকে নিন্দা করেন। প্রসঙ্গতঃ, সেকালের 'ওরিয়েণ্টাল'-চিত্রবিরোধীদের বিরুদ্ধ সমালোচনার একটু স্বদেশী নমুনা দেওয়া যাচ্ছে:—

'শিল্পাচার্য—

নিরস্ত পাদপ দেশে
এরণ্ডবৎ আশ্চর্য
অন্ধ দেশ এই বঙ্গ মাঝে
আমিই শিল্প-আচার্য
হাত পা গুলো হোক্ না নুলো
আঙ্গুলগুলো সাপের মত
ওরিয়াণ্ট্যাল থাকুক সুখে
মাসিক-পৃষ্ঠায় অবিরত
পাঠক ভায়া রাগ করো না
সহ্য এটা কর্তেই হবে
বেঁচে থাকুক ভারতবর্ষ
পৃষ্ঠা তাহার দিব ভরি—
বিচিত্র এই চিত্র কলার
কিম্ভূত কিমাকার মাধুরী
নইলে 'ইন আর্টিস্টিক' বলে তোমায়
ভক্তেরা মোর দিবে গালি।'

—নবযুগ, শ্রাবণ, ১৩৩১, পৃ. ৭৬

শ্রীঅরবিন্দ বলেন, —এদেশের লোকের তথাকথিত আধুনিক সংস্কৃতির বদহজমে, শিল্প-সম্বন্ধে সূক্ষ্ম সচেতনতার বিকাশ সম্ভবপর নয় ব'লে, না-হয় ক্ষমা করা যেতে পারে; কিন্তু, কোনো পেশাদার সমালোচক এর অপব্যাখ্যা করলে সে-যুক্তি অবশ্যই অবজ্ঞেয়।

এ-ছাড়া, আর্চার সাহেব শিল্প-দর্শন নিয়েও অনেক আলোচনা করেছেন। ভারতশিল্পের শাশ্বত সৃষ্টিগুলির প্রেরণা হলো শিল্পশাস্ত্রসম্মত, আধ্যাত্মিক ও প্রজ্ঞাভিত্তিক। হ্যাভেল সাহেব এ-সব কথা খুব জোর দিয়েই বলেছিলেন। কিন্তু, আর্চার সাহেব তার ধার ঘেঁষেও যাননি। উল্টে, তিনি বুদ্ধমূর্তি আর নিউটনের মূর্তিকে এক পর্যায়ে ফেলে অসম তুলনা করেছেন। শিল্পবিষয়ে কিছুমাত্র বোধ যাঁর আছে তিনি বুঝবেন, বুদ্ধের সঙ্গে নিউটনের তুলনাটির অসারত্ব কতখানি।

বুদ্ধের নির্বাণ, 'সংস্কার'-ত্যাগ এবং বৈদান্তিক প্রজ্ঞা, অপরোক্ষানুভূতি —এ-সব ব্যাপার আর্চারসাহেবের মাথায় ঢোকেনি। বরং তিনি অনর্থক অনেক গোলযোগ ঘটিয়ে ফেলেছেন।

শ্রীঅরবিন্দ বলেন, —প্রমাণ জ্ঞানকে অতিক্রম করে; এবং সত্যের সূক্ষ্মতর ও বৃহত্তর পরিধিতে নিয়ে যায়; পক্ষান্তরে, প্রজ্ঞা প্রমাণকে ছাড়িয়ে সত্যের জ্যোতির্ময় শক্তির সিংহদ্বারে উপনীত করে। কিন্তু, কবি বা শিল্পী বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিকের মতন কেবল প্রজ্ঞার উপর ভর ক'রে এগোতে পারেন না। লিওনার্ডো ডা ভিঞ্চির বৈজ্ঞানিক প্রজ্ঞা এবং শিল্পীর সৃষ্টির প্রজ্ঞা একই শক্তি থেকে উদ্ভূত হ'লেও, তার পরিবেশ অধস্তরের মানসিক বৃত্তিগুলি ভিন্ন ধরনের এবং ভিন্ন রঙের। অবশ্য শিল্পে বিভিন্ন রকমের প্রজ্ঞা আছে। বাল্‌জাক বা ইবসেনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সেক্সপীয়রের জীবন-দর্শনের মৌলিক পার্থক্য অনেক। কিন্তু তথাপি প্রজ্ঞার স্বরূপে উভয়েই সমান। বৌদ্ধ বা বৈদান্তিক জীবন-দর্শন শিল্পসৃষ্টির ভিত্তি-রচনায় সমান শক্তিসম্পন্ন। এই প্রজ্ঞা একজনকে হয়তো শান্ত বুদ্ধমূর্তি নির্মাণে প্রবৃত্ত করে; পক্ষান্তরে, অপরকে শিবতাণ্ডব অঙ্কনে প্রেরণা দেয়। যাই হোক্, ভারতশিল্পের আলোচনায় এ-সব হলো গোড়ার কথা। কিন্তু, এ-সব অগ্রাহ্য করলে, ভারতশিল্পের অবিচল ও সূক্ষ্ম সত্তাটিকে আদৌ বোঝা যাবে না —ধরা-ছোঁওয়া যাবে না।

শ্রীঅরবিন্দ হ্যাভেল সাহেবের বহুৎ প্রশংসা করেছেন। হ্যাভেল সাহেবের চোখ দিয়ে তিনি ভারতশিল্পের মর্ম-প্রবেশের উপদেশ দিয়েছেন। ভারতশিল্পে, শান্ত-গম্ভীর বুদ্ধমূর্তি, শিবের মূর্তি, বা অসুরমর্দিনী অষ্টাদশভুজা দুর্গার মূর্তি তথাকথিত সমালোচকদের মতে, 'বর্বর' ভারতশিল্পের কাজ হ'তে পারে; কিন্তু, এর প্রতীকে গভীর জীবনদর্শনের গভীরতর স্পর্শ আমরা পেয়ে থাকি নিঃসন্দেহে। ইন্দো-সারাসেনিক শিল্প তাজমহল দেখেও অবাক্ হ'তে হয় —এ ভারতশিল্পের সৃষ্টি ব'লে। যে বিদেশী ছোঁয়াচ এতে রয়েছে —সেই বিদেশী প্রতিভাও যেন কোন্ নিভৃততম মুহূর্তের যাদুতে

নিঃসংশয়ে নিজেকে ভারতীয় সত্তায় মিলিয়ে দিয়েছিল।

প্রাচীন ভারতশিল্পের ভেতরের তত্ত্ব হচ্ছে, —বস্তুজগতের ওপর তার কিছু প্রভাব রাখা। এর প্রধান কাজ হলো —আত্মার প্রতি, অনন্তের প্রতি, ঐশ্বরিক সত্তার প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদন এবং সান্ত রূপে অনন্ত শক্তিকে ধরবার সঙ্কেত মূর্ত করা। ভারতশিল্প আসলে হচ্ছে আধ্যাত্মিক লক্ষ্যের সঙ্গে অভিন্ন, এবং ভারতের সমস্ত সংস্কৃতির মধ্যে অন্যতম। শিল্পশাস্ত্রের রীতি-পদ্ধতি অনুসরণ করেই ভারতশিল্পী তাঁর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করে ; এমন-কি, বিশিষ্ট শিল্পসৃষ্টিতেই তাঁর আত্ম-উপলব্ধি হয়ে থাকে। ভারতশিল্প বাইরের উত্তেজনা-প্রসূত নয় কদাপি, —সে প্রসন্ন ক'রে থাকে অন্তরাত্মাকে। ভারতশিল্পের নন্দনতত্ত্বের অনুশীলন করেই আমরা মহৎ শিল্পকর্মের মর্মের গভীরে প্রবেশ করার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠি। শিল্পশাস্ত্রচর্চার অভাবে, স্থূল বহির্বিষয় ছাড়া, গভীরতর কিছু আমাদের বোধে ধরা দেয় না। ভারতশিল্প হচ্ছে —প্রজ্ঞাসঞ্জাত আধ্যাত্মিক শিল্পকীর্তি এবং একে দেখতে হবে প্রজ্ঞাপন্ন আধ্যাত্মিক দৃষ্টি দিয়ে। অন্যথায়, এর অভ্যন্তরে প্রবেশ লাভ অসম্ভব। ভারতীয় স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা —এ-সব হচ্ছে পুরোপুরি ভারতীয় দর্শন, ধর্ম, যোগ, সংস্কৃতির মৌলিক অনুপ্রেরণাজাত। এ সবই হলো —হিন্দু-বৌদ্ধ শিল্পশাস্ত্র-রীতিসম্মত নিদর্শন। এ-যেন ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক চিন্তাপ্রসূত আর ধর্মপ্রাণবিচ্ছুরিত সৌন্দর্যের স্বাক্ষর।

॥ ২ ॥

মহৎ স্থাপত্য, ভাস্কর্য আর চিত্রকলা —এই তিন্‌টি হচ্ছে মহাশিল্প। কারণ, চোখের ভেতর দিয়ে এদের আবেদন পৌঁছয় সোজা গিয়ে আত্মার কাছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিল্প স্বধর্মে বিভিন্ন —তারা ভিন্ন দৃষ্টিতে সমস্যা-সমাধানের চেষ্টা করে। শ্রীঅরবিন্দ বলেন, —পাশ্চাত্য মন আকৃষ্ট হয় দৃশ্যবস্তুর দ্বারা। এবং মূলতঃ

সেই দৃশ্যবস্তুকেই শিল্পের ভাষায় প্রকাশ করে থাকে, —ঠিক শরীর যেমন আত্মাকে ধরে থাকে। পক্ষান্তরে, ভারতীয় মনের গতি ঠিক এর উল্টো। ভারতীয় দৃষ্টিতে রূপ হলো আত্মার সৃষ্টি এবং রূপের ইঙ্গিত ও মূল্য সবই এসে থাকে আত্মার কাছ থেকে। প্রত্যেকটি রেখা, বস্তু-বিন্যাস, রং, আকৃতি, ভঙ্গি, ব্যঙ্গ্য যাই হোক্ না-কেন, এবং যতই হোক্ না-কেন, সবই আত্মশক্তিতে বিধৃত। শিল্পীর আত্মশক্তির উদ্দীপন হলে তবেই এই রূপ অর্থবহ আকার গ্রহণ করে। ভারতবর্ষে আধ্যাত্মিক মর্ম ও পরিবেশকে এইভাবে জানারই নাম হলো —'ধ্যান'। এপিক্‌টেটাস্ (Epictatus) বলেছিলেন, —মনই সব। তাঁর মতে, মানুষ হচ্ছে অনুপরিমাণ একটি আত্মা, আর তিনি একটা মৃতদেহকে বয়ে বেড়াচ্ছেন। সাধারণ পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে, প্রত্যেক প্রাণী তার জীবনে আত্মার প্রতিচ্ছায়া বহন করে বেড়াচ্ছে। কিন্তু, ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি হলো, মানুষের দেহে মহান্ আত্মার বসতি ; তিনিই সান্তের মধ্যে অনন্ত হয়ে রয়েছেন। আর এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশই হলো প্রকৃত ভারতশিল্প। এদেশে কোনো মহৎ শিল্পকর্ম সহজে তার রহস্য উদ্ঘাটন করে না ; বিশেষতঃ কৌতূহলী দর্শকের চোখে সে সদাগুপ্ত। ভারতশিল্পকে দেখতে হয় একান্তে, আত্মার নিভৃত গভীরে —ধ্যানের দ্বারা। জাপানীদেরও মোটামুটি এই দৃষ্টিভঙ্গি ; আর সে ভারতের কাছ থেকেই পাওয়া। ভারতীয় স্থাপত্য গভীর একাগ্রতায় চেয়ে দেখতে হয় ; অন্যথায়, আগন্তুকের কাছে সে আদৌ মর্মপ্রকাশ করতে চায় না। প্রাচীন ভারতের নিরালা সৌধ, তার হর্ম্যরাজি বিশেষ অবশিষ্ট নাই ; কিছু আছে পর্বতগুহায়, কিছু মন্দিরে, কিছু নগরীতে ; কিছু আছে পরবর্তিকালের মন্দির-স্থাপত্যে, —যেমন —শ্রীরঙ্গমে, রামেশ্বরমে, মাদুরায় ; আর এইসব মন্দির সেকালে ছিল ভারতের সমাজ ও সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র। বিদেশী শিল্পসমালোচকেরা প্রায়শঃই এ-সবের মহিমা অনুধাবন করতে না-পেরে অনাবশ্যক কটাক্ষ করে গেছেন। এমন-কি এ-সবের বিশালত্ব দেখে আর্চারসাহেব বলেছিলেন, —এ-সব হলো দৈত্য, দানব, রাক্ষসদের বিশাল বর্বরতা। অবশ্য, উত্তরভারতের স্থাপত্য

তাঁর চোখে এতটা অপ্রিয় হয়ে ওঠেনি। এর মধ্যে তাঁর কাছ থেকে মুসলমান অর্থাৎ ইন্দো-সারাসানিক্ স্থাপত্যগুলি এই কুৎসা থেকে রেহাই পেয়েছে।

শ্রীঅরবিন্দের মতে, ভারতীয় মন্দিরাদি হলো স্বরূপতঃ আত্মার একত্ব, সমন্বয় এবং অনন্ত সত্তার পার্থিব রূপ বা লক্ষণাক্রান্ত, এ যেন এপিক্ ও লিরিক্ কাব্য —যেন অনন্ত সত্তারই এপিক্ ও লিরিক রূপ। ভারতশিল্পের স্থাপত্য-কলার আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যের মর্ম অনুভব করতে চাইলে তার সুসঙ্গত জটিল পরিবেশটি পর্যবেক্ষণ করা আবশ্যক। ভারতীয় শিল্পী নগরের মধ্যে মন্দিরস্থাপন করতে চাইলে তার সম্পূর্ণ রূপটি অনুধাবন করবার জন্যে মন্দিরটিকে প্রকৃতির প্রেক্ষাপটে স্থাপনা করে থাকেন। এ-কথা বলে, শ্রীঅরবিন্দ কালহস্তির মন্দির আর সিংহাচলমের মন্দির দু-টীর নির্মাণকৌশল ব্যাখ্যা করে বলেছেন, —মন্দির দু'টি ভিন্ন পদ্ধতিতে নির্মাণ করা হলেও এদের উদ্দেশ্য এক এবং সে উদ্দেশ্য সার্বজনীন।

দ্রবিড় স্থাপত্যের নির্মাণ-কৌশল একটু স্বতন্ত্র ধরনের। এই সব স্থাপত্যকর্মে ব্যঞ্জনা পরিস্ফুট থাকলেও বিশাল হর্ম্যরাজির বিশালত্বের মধ্যে প্রতিষ্ঠাতার উচ্চাকাঙ্ক্ষাও যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু উত্তরভারতের স্থাপত্য-কলার ভাষা স্বতন্ত্র ধরনের। এখানে একটি বিশিষ্ট মূল রীতির নিদর্শন পাওয়া যায়; সে-হলো ধ্যানগম্ভীর এবং প্রজ্ঞাপন্ন পদ্ধতি; এবং তার ভেতরে সৌন্দর্যের ইঙ্গিতে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার পরিচয়ই মূর্ত হয়ে উঠেছে। মন্দিরের ঐশ্বর্য, অলঙ্কার-বিস্তার, পরিবেশ হচ্ছে জগতের অনন্ত বৈচিত্র্যের প্রতীক। —এ-সবের বিরুদ্ধ সমালোচনা যতই হোক্, শ্রীঅরবিন্দ আশা প্রকাশ করেছিলেন, —এমন দিন আসবে, যখন পৃথিবীর সকলেই এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠবে। আর্চার সাহেবের এই বিষয়ে প্রতিকূলতা সুবিদিত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ভারতের বিশাল মন্দির এবং সৌধাদি দেখে অধ্যাপক গেডিস্ (Geddes) সাহেবের মতো হৃদয়বান্ পণ্ডিত ব্যক্তির মনে 'Sense of a monstrous effect of terror and gloom'-এর ভাব জেগেছিল। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ অধ্যাপক গেডিসের মতও খণ্ডন করেছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের মতে

—'terror' ও 'gloom' কারও মনে এক সঙ্গে জাগতে পারে না। তিনি বলেন, —আমাদের ধ্বংসের দেবতা একই সঙ্গে স্নেহময়ী মাতা এবং সন্ন্যাসী মহেশ্বর রুদ্র হলেন মঙ্গলময়, শিব, আশুতোষ ; এবং প্রাণিজগতের আশ্রয়স্বরূপ। আমাদের শিবের নৃত্য হচ্ছে —মৃত্যুর নৃত্য, ধ্বংসের নৃত্য —নটরাজের নৃত্য। এ হলো অনাদি অনন্ত অচঞ্চল আনন্দের পরিমণ্ডলে বিশ্বছন্দের নৃত্য। আমাদের কালী-মূর্তি য়ুরোপীয়দের চোখে ভয়ঙ্কর ; কিন্তু আমরা জানি, আমাদের মা কালী বিশ্বপ্রসবিনী এবং অসুর-বধের উদ্দেশ্যে খড়্গ-খেটকধারিণী ; —জগতের অমঙ্গল-বিদূরণকারিণী শক্তি তিনি। এই ভাব হেলেনিক ভাবের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ভারতশিল্পে দৈত্য, দানব, রাক্ষসাদির মূর্তি যেভাবে রূপ পরিগ্রহ করেছে. তাতে মানবমনের গভীরতর স্তরসমূহের বিভিন্ন পর্যায়ের ছাপ সুস্পষ্ট।

য়ুরোপীয় বিরুদ্ধ-সমালোচনার প্রতিবাদে শ্রীঅরবিন্দ হিন্দু ও দ্রবিড় স্থাপত্যের কথা বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। পরিশেষে, ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্য সম্পর্কেও তিনি অনেক কথা বলেছেন। এই শিল্পকলায় তিনি আরব ও ইরাণী কল্পনায় ভারতীয় মনেরই প্রকাশ লক্ষ্য করেছেন। কোনো কোনো মসজিদে ও সমাধিতে আফগান ও মোগলের সবল চিন্তার প্রতিফলন থাকলেও, এই মুসলিম স্থাপত্যে ভারতের বিশিষ্ট নিজস্ব দান রয়েছে। মুসলমানদের আসার আগে এদেশের দিশী ভাস্কর্যে, বিশেষ করে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে · এবং জাভাতে উভয় শিল্পের সমন্বয় ঘটেছিল। শ্রীঅরবিন্দ বলেন, —এ-সব ভাস্কর্যের ব্যাখ্যা আর্চারসাহেবের গ্রীক্-শিল্পপদ্ধতির ব্যাখ্যার সঙ্গে মিলবে না।

শ্রীঅরবিন্দ বলেন, —তিনি ভারতীয় স্থাপত্য থেকে নৈতিক কোনো নির্দেশের ইঙ্গিত দাবী করেন না, কিন্তু, এই সব ইন্দো-মুসলিম সৌধাদিতে ঐশ্বর্য, সৌন্দর্য. লাবণ্য যা রয়েছে, সে-সব বাইরের জিনিস। এ-সব মহৎ শিল্পকর্মের নিদর্শন কদাচ নয়। কবরের গম্বুজ, মৃত্যুর পরেও যেন স্বর্গের সৌন্দর্য আর আনন্দলোকের দিকে নিয়ে যায়। ফতেপুরসিক্রীর সৌধাবলীর ক্ষীয়মান সৌন্দর্য ভারতশিল্পের সৌন্দর্যকলার নিদর্শন নয় আদৌ, অবশ্য এইরকম ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছিল আকবরের সময়ে। এ-সব হলো মরজগতের

মহত্ত্ব, শক্তি আর সৌন্দর্যের প্রতীক। এতে ভারতীয় মনের আত্মিক তৃপ্তি না-ঘটলেও, এ-সব স্থাপত্য শিল্পকর্মে দেখা যায়, ভারতীয় মনেরই প্রতিফলন। পশ্চিম এশিয়ার প্রভাবকে আত্মসাৎ করে এ একটা অনবদ্য রূপ-সৃষ্টিতে রূপান্তরিত হয়েছিল। এতে ভক্তহৃদয়ের আধ্যাত্মিকতার স্পর্শ রয়েছে; দেখেই মনে হয়, সে যেন দেব-ভাবনার প্রান্ত স্পর্শ করে আছে। তাতে আধ্যাত্মিক অনাসক্তি না-থাকলেও, জীবনের সবদিকের ছোঁয়াচ রয়েছে; এবং সে ভারতীয় সংস্কৃতিরই অঙ্গবিশেষ। —এই ধারা সুপ্রাচীন কাল থেকে শুরু হয়ে, সেকালেও এসেছিল এবং নব প্রভায় এখনও সে ভারত-আত্মার জ্যোতির্ময় সত্তাকে স্পর্শ করে চলেছে।

॥ ৩ ॥

প্রাচীন ভারতের ভাস্কর্য ও চিত্রকলা অতি-সম্প্রতি পুনর্বাসিত হয়েছে সহসা। ফলে এর মূল্যমান বেড়ে গেছে; তবু নব্যভারত-চিত্রকলা সবে নবজাতকমাত্র। শ্রীঅরবিন্দ ভেবেছিলেন, কেবল পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধ সমালোচনা নয়, য়ুরোপীয় শিক্ষাপ্রাপ্ত এদেশী লোকেরাও এর আসল রূপটি ধরতে পারেননি। এদেশী বিরুদ্ধ-সমালোচকের বেশির ভাগই পাশ্চাত্যের বুলি কপচায়। শ্রীঅরবিন্দ বলেন, —এখনও অনেকে রবিবর্মা আর অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে এক পর্যায়ে বসিয়ে বলে থাকেন, তাঁরা উভয়েই ভিন্ন-পদ্ধতির শিল্পস্রষ্টা; উভয়েরই শক্তি এবং প্রতিভা সমান। শ্রীঅরবিন্দের মতে, এই ধরনের 'criticism' অতি বড়ো মূর্খতা, কিছু না-জেনেই এঁরা ঐ বুলি কপ্‌চে থাকেন! এই বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ সম্পূর্ণ একমত। এক্ষেত্রে, আর্চারসাহেবের মতো বেকুব সমালোচকের ধাপ্পায় মুগ্ধ না-হয়ে ওকাকুরা বা লরেন্স বিনিয়ন (Laurence Binyon)-এর মতো সুসমালোচকদের মতামতই সর্বদা গ্রহণ করা উচিত।

ইজিপ্ট, গ্রীস আর ভারতবর্ষে সুপ্রাচীন কাল থেকে ভাস্কর্য উত্তুঙ্গ সীমায় পৌঁছেছিল। মধ্যযুগে বা আধুনিক য়ুরোপে তেমনটি

সম্ভবপর হয়নি। পক্ষান্তরে অন্ত্যমধ্যযুগে য়ুরোপীয় চিত্রকলায় রেনেসাঁর অনুপ্রেরণায় ভালো ছবি অনেক আঁকা হয়েছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্প সম্পূর্ণ ভিন্ন মনের সৃষ্টি। পাশ্চাত্য শিল্পের বাস্তব ও আদর্শবাদের প্রবণতা সম্পর্কে জন রাস্কিনসাহেব বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। পরবর্তী যুগে য়ুরোপ ভাস্কর্যে কৃতিত্ব দেখাতে পারেনি। এর মধ্যে অবশ্য. Angelo বা Rodin ব্যতিক্রম মাত্র। কারণ হলো, তাঁরা পাথর বা তামা দিয়ে মূর্তি তৈরী করলেও, পাথর ও তামাকে তাঁরা জীবন-ছন্দের প্রতীক বলে গ্রহণ করেছিলেন। পক্ষান্তরে, ইজিপ্টে ও ভারতে ভাস্কর্য বহু যুগ ধরে স্বমহিমায় অনুশীলিত হয়ে এসেছে। ১৯১৮ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষে যে-সব বিখ্যাত মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছিল তাদের বয়স খৃস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দ। এর মানে হলো, ভারতবর্ষে এই মূর্তিবিদ্যা আরো বহু আগে থেকে শিল্পীদের অধিগত ছিল। এই বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দ অক্ষয় মৈত্রেয় মহাশয়ের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।

ভারতের মহান্ মূর্তিশিল্পের পরম্পরা ভারতীয় জীবনের সৌন্দর্যবোধ, আধ্যাত্মিক অনুভূতি, দার্শনিক বিশ্লেষণ আর নন্দনতত্ত্বের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী। পুরাকালের মূর্তিশিল্প ভারতে যা আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে দেখা যায়, সেকালের জীবনের ভাষাই তাতে পরিস্ফুট হয়ে আছে। এবং জীবনবোধের সে-চিন্তা দানা বেঁধেছিল উপনিষদ, মহাভারত, রামায়ণ থেকে। মানুষের দেহের ও ভাবের আদর্শ সৌন্দর্য-সৃষ্টিই ভারতশিল্পীর লক্ষ্য। এই মহৎ সৃষ্টির প্রেরণা আসে সম্পূর্ণরূপে আত্মার সৌন্দর্য ও ব্যঞ্জনা থেকে। কোনো রাজা বা সাধুসন্তের মূর্তি করতে গেলে তাঁদের জীবনের বিশেষ কোনো নাটকীয় কার্যকলাপ এঁকে বিশেষ কিছু প্রকাশ করা যায় না। তাঁদের আত্মিক শক্তি অথবা গভীর অনুভূতির বা চরিত্রের বিশেষ কোনো মুহূর্তকে ধরে দেখাতে পারলে, সেই প্রচেষ্টাই হয়ে ওঠে প্রকৃত শিল্পকর্ম। এই নিরীখে মন্দিরের দেবতা বা চৈত্যগুহার বুদ্ধমূর্তি বা দক্ষিণভারতের তাম্রমূর্তিনিচয় বিচার করতে হয়, —অবশ্য গান্ধারশিল্প এই মাপকাঠির বাইরে। বিশেষ করে শ্রীঅর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়-সংগৃহীত ও আলোচিত কালসংহার বা নটরাজ-মূর্তিগুলি

অনুধাবন করা আবশ্যক। এই সব মূর্তিতে শিবের চার, ছয়, আট, দশটি করে হাত, দেবী দুর্গার হাতের সংখ্যা আঠারো পর্যন্ত। এই রকম আকৃতি বাস্তব-জগতে দেখা যায় না বলে পাশ্চাত্যেরা ভাবেন, এ দানবীয় রূপ। কিন্তু, এ-সবেরও সুসঙ্গতি অনুধাবন করলেই পাওয়া যাবে। অসুরমর্দিনী অষ্টাদশভুজা দুর্গা-মূর্তি বা পহ্লব-যুগের তৈরী নটরাজ শিবমূর্তির মধ্যে মহাকাব্যের ছন্দ আর ঐশ্বর্য দুর্লক্ষ্য নয়। এখানে যেন শিল্প তার সাধনার চরম শিখরে পৌঁছে গেছে। ভারতশিল্পে মানবমূর্তিরও বৈশিষ্ট্য রয়েছে অনেক। নন্দনতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য তো বটেই। তা-ছাড়া এর আদর্শও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আর্চারসাহেব সন্দেহ করেছিলেন, প্রাচীন ভারতীয়েরা Anatomy জানতেন না। এই ধারণার বশে আর্চারসাহেব হ্যাভেলসাহেবের উক্তির ওপর অনাবশ্যক কটাক্ষ করেছিলেন। কিন্তু প্রাচীন ভারতের ভাস্করদের Anatomy-র জ্ঞান ছিল টনটনে —এর প্রমাণ দিয়েছেন হ্যাভেল সাহেব। যাই হোক, এই অধ্যায়ের শেষে শ্রীঅরবিন্দ ভবিষ্যৎ-ভারতশিল্পে যাতে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার রূপটি অব্যাহত থাকে সেই আশা প্রকাশ করে তাঁব বক্তব্য শেষ করেছেন।

॥ ৪ ॥

প্রাচীন ও পরবর্তী কালের ভারতবর্ষে শিল্পকর্ম প্রায়শঃই ধ্বংস হয়ে গেছে। ফলে, তুলনা করে আলোচনা করার নিদর্শন স্বল্প। গত কয়েক শতাব্দের শিল্পকর্মই তেমন দেখা যায় না। পরে মোগল এবং হিন্দু শিল্পীরা মিলে মোগল আমলে ভারতশিল্পের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছিলেন। তবে এটা ঠিক যে, রং ও রেখার সৌন্দর্য-উপলব্ধিতে প্রাচীন কাল থেকেই ভারতবাসীরা সচেতন ছিলেন। বর্তমান দিশী রাজপুত-শিল্পে ভারতশিল্পের এই প্রাচীন ধারাটি এখনও চলছে। তা'ছাড়া অজন্তার শিল্প-গুহাতেও এর বেশ-কিছু নিদর্শন রয়ে গেছে। তবে প্রাচীন শিল্পীদের শ্রেষ্ঠ মানসিকতা-প্রসূত পুরাতন চিত্রকলা অল্পই অবশিষ্ট আছে। অবশ্য যা আছে

তার মধ্যেই এর বৈশিষ্ট্যগুলি বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়ে আছে। অজন্তার উনত্রিশটি গুহাতেই ভিত্তিচিত্রে অলঙ্করণ ছিল বলে অনেকে মনে করেন। চল্লিশ বছর আগেও মূল ছবির ষোলখানি টিকে ছিল। কিন্তু, এখন আছে মাত্র ছ'খানি। বাগ-গুহাতেও ভিত্তি-চিত্রের প্রচুর নিদর্শন ছিল। সিগিরিয়ার দু'টি পর্বত-প্রকোষ্ঠে স্ত্রীমূর্তির ক'টি চিত্র ছিল। দক্ষিণভারতের ক'টি চিত্রকলাতেও অজন্তা-রীতির অনুসরণ দেখা যায়। এই সব কাজ খৃস্টীয় প্রথম শতাব্দ থেকে ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দের দিকের; এর আগেকার তেমন কিছু প্রত্নচিত্র পাওয়া যায়নি। সপ্তম শতাব্দের পরে ভারতবর্ষে শিল্পের সম্পূর্ণ অবনতি ঘটেছিল। কিন্তু সুখের বিষয়, ভারতবর্ষের বাইরে এবং হিমালয় প্রদেশে কিছু ভাস্কর্য আবিষ্কৃত হয়েছে। তা' থেকে দ্বাদশ শতাব্দের শেষের দিক পর্যন্ত এই শিল্পকর্মের জের টানা যায়; এবং এ-থেকে দেখা যাচ্ছে, রাজপুত-শিল্পে এই ধারাটি অদ্যাবধি অব্যাহত। খৃস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দেও ভারত-শিল্পে আত্মপ্রকাশের ইতিহাসের নিদর্শন রয়েছে। এই সব পুরাতন নিদর্শন থেকে বোঝা যাচ্ছে —ভারতবর্ষে স্থাপত্য আর ভাস্কর্য চলেছিল সমরেখায়।

বৌদ্ধশিল্পীদের পুরাতন শিল্পকর্ম যা অবশিষ্ট আছে তার উৎস নিহিত প্রাগ্ বৌদ্ধযুগে। তিব্বতী ঐতিহাসিকের মতে, সমস্ত প্রাচীন কারুশিল্পের জড় আছে প্রাগ্-বৌদ্ধযুগে! এবং প্রত্ননিদর্শন যত আবিষ্কৃত হচ্ছে এই সিদ্ধান্ত ততই বলবৎ হচ্ছে। তৃতীয় খৃস্টাব্দের আগেও এদেশে শিল্পচর্চা দৃঢ়মূল ছিল। 'ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ' আবিষ্কারই তার প্রমাণ। এর প্রায় হাজার বছর পরে চীনা শিল্প-ষড়ঙ্গের সঙ্গে এর সাদৃশ্য বিস্ময়াবহ। এই সকল শিল্পসূত্র প্রাগ্-বৌদ্ধযুগের তো বটেই। ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যে কালিদাস, ভবভূতি, ভাস প্রভৃতির হিন্দু-বৌদ্ধ যুগের রচনায় যে-সব উপমা-উৎপ্রেক্ষার ব্যবহার রয়েছে, সে-সব এদেশে আরো প্রাচীনকাল থেকে চিত্রকর্মের সুপ্রচলন না-থাকলে সম্ভবপর হতে পারতো না। সেকালে লৌকিক শিল্পের প্রেরণা এসেছিল রাজসভায়। বৌদ্ধ-

শিল্পীদের শিল্পকর্মগুলি ধর্মমূলক ; বেশিরভাগই বৌদ্ধ উৎসব ও জাতক-কাহিনী বা সাধারণ জীবনচিত্র থেকে নেওয়া। মহাকাব্য ও নাটকাদি থেকে যে-সব শিল্পাদর্শ নেওয়া হয়েছে সে-সব চিত্রকলা হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে সৌন্দর্যভিত্তিক —ব্যক্তিগত, গার্হস্থ্য ও সমাজজীবন থেকে নেওয়া। পক্ষান্তরে বৌদ্ধ-চিত্রকলার নিদর্শন হিসেবে সিগিরিয়ার ভিত্তিচিত্রে দেখা যায়, রাজা কশ্যপের রাণীদের প্রতিমূর্তি বা অজন্তায় পারস্যদূতের ঐতিহাসিক প্রধিনিধিত্ব, বিজয়সিংহের লঙ্কায় অবতরণ। অনুমান করা যায়, হিন্দু ও বৌদ্ধ যুগে চিত্ররচনার জন্যে যেভাবে ভিত্তি তৈরী করা হতো পরবর্তী রাজপুত-শিল্পে তারই জের চলে এসেছে। আর তার ওপর আঁকা হতো ভারতীয় জনজীবনের সংস্কৃতি ও ধর্মের আলেখ্য। এবং সে আলেখ্যের লক্ষ্য ছিল স্থির ঐক্যের এবং অবিচ্ছিন্ন সত্তার প্রকাশ করার দিকে। অজন্তার প্রাচীন কাজগুলি প্রাচীনতর বৌদ্ধ-ভাস্কর্যের অনুরূপ। কিন্তু পরবর্তী চিত্রগুলি জাভার ভাস্কর্যের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত। অজন্তার রীতি-পদ্ধতি বাগ, সিগিরিয়া এবং খোটানের ভিত্তিচিত্রে অনুসৃত হয়েছে ! পরবর্তী বৌদ্ধ-পুঁথিগুলির চিত্রকলা রাজপুত-শৈলীর সমধর্মী। এই ঐক্য ও পরম্পরা দেখে এর আদর্শ কি ছিল তা' আমরা পরিষ্কার বিচার করতে পারি। এবং আরও দেখাতে পারি, য়ুরোপ ও এশিয়ার শিল্পকর্মের পার্থক্য কোথায়।

ভারতে চিত্রকলার আর ভাস্কর্যের আদর্শ হলো অভিন্ন। উভয় ক্ষেত্রেই আত্মানুসন্ধানের প্রয়াস। ভারতের যে-কোনো শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম নিয়ে বিচার করলে ভারতশিল্পের সামগ্রিক ছন্দটি পরিষ্কার বোঝা যায়। ভারতের সমূহ আধ্যাত্মিকতা যেন এই শিল্পকর্মে প্রকটিত। ভারতের ভাস্কর পাথর কেটে যে রূপ প্রকাশ করতে চায় ভারতের চিত্রকর রং আর তুলি দিয়ে আত্মার সেই মহিমাই প্রকাশ করে। আত্মিক শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে তপস্যায় যেমন শম দমের প্রয়োজন, কোনো ভারতশিল্পীর কৃচ্ছ্রসাধনা তার চেয়ে কম নয়। প্রকৃতি থেকে রূপ রস গ্রহণ করে, তুলি আর

রঙের ভেতর দিয়ে তাকে প্রকাশ করতে রীতিমতো সাধনার দরকার। সাধক আর শিল্পী উভয়েরই চরম লক্ষ্য হচ্ছে সৌন্দর্যানুভূতি। শ্রীঅরবিন্দের মতে, ভারতচিত্রকলার রং ও রেখার কাজে 'ষড়ঙ্গ' অনুসরণ করা প্রাথমিক কর্তব্য। অতঃপর তিনি ষড়ঙ্গের রূপভেদ, প্রমাণ, ভাব, লাবণ্য, সাদৃশ্য আর বর্ণিকাভঙ্গের বিশেষ আলোচনা করেছেন।

যে-সব শিল্পী পাশ্চাত্য-শাস্ত্রসম্মত ছবি আঁকেন তাঁদের কাজ হলো বহিঃপ্রকৃতির রূপকে সজ্ঞানে যথাযথভাবে প্রকাশ করা। তাঁদের কল্পনার ক্ষেত্র কেবল বাস্তব-প্রকৃতিকে ঘিরে। তাঁদের দৌড় বড় জোর 'idealised imaginativc Realism' অর্থাৎ 'রূপভেদ' পর্যন্ত। আমাদের ভাষায় এঁদের মৌলিক আদর্শ হলো —'প্রবিশ্য যঃ প্রতিরূপো বভূব' তাঁকে প্রকাশ করা; অবশ্য এ-সব বচনও এখন আর পাশ্চাত্য-শিল্পে সত্য নয়। অন্ততঃ তার আধুনিক ক্রমবিকাশ থেকে তাই দেখা যাচ্ছে। পক্ষান্তরে ভারতশিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ভিন্ন; সে নিবিষ্ট আরো গভীরে। মাইকেল এঞ্জেলোর চিত্র, টিটিয়ান বা তিঁতোরেতোর (Tintoretto) পদ্ধতি খানিকটা ভারতীয় চিত্রের সমধর্মী। ভারতশিল্প-পদ্ধতির লাবণ্য-যোজনা কিঞ্চিৎ মাত্রায় দেখা যায় ইতালীয় শিল্পকলায়। চিত্রকর্মে পাশ্চাত্য শিল্পী প্রকৃতির সঙ্গে সাদৃশ্য দেখতে চায়; কিন্তু ভারতশিল্পে এটা পরিত্যাজ্য। পাশ্চাত্যশিল্পী সাদৃশ্য দেখিয়ে 'স্বভাবের' অনুকরণ করে; কিন্তু ভারতশিল্পী তারও বেশি কিছু দেখাতে চায়। বর্ণিকাভঙ্গেও পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য রীতি পৃথক।

অজন্তা-গুহায় Adoration Group-এ বুদ্ধের সামনে মা ও ছেলের মূর্তিটি একটি master piece। এতে যেন বৌদ্ধধর্মের আধ্যাত্মিকতা ও ভারত-আত্মার গভীরতর ব্যঞ্জনার যুগলমিলন ঘটেছে। য়ুরোপীয় চিত্রকলা চরিত্রের মধ্যে আত্মিক শক্তিকে দেখাতে চায়; কর্মপ্রবণতা দেখায়; ইন্দ্রিয়-ধর্মের কর্তৃত্ব দেখায়, অনুভূতি দেখায়; মনের আর দেহের প্রকৃতি দেখায়; মনের ও আত্মার বিশেষ মুহূর্তটিকে ধরে দেখায়। পক্ষান্তরে ভারতশিল্পী দেখায় গতি; এবং বিশেষ করে দেখায় —সীমার মধ্যে অসীমের স্পর্শ। ভারতচিত্রকলা হলো

মূলতঃ আধ্যাত্মিক স্ফুরণ। অজন্তায় এর সুবহু প্রমাণ রয়ে গেছে। এখানে প্রকাশ করা হয়েছে 'নির্বাণের' প্রকৃত আনন্দস্বরূপ। দিশী শিল্প পরম্পরাগতভাবে যা' চলে এসেছে —সে-সব মোগল-চিত্রকলায় বিধৃত হয়েছে ; সে-সবের বেশির ভাগই ইরানের দান। কিন্তু পারস্যের ও ভারতের শিল্পের ভাষা স্বতন্ত্র। পূর্বেকার ইন্দো-পার্সিয়ান শৈলী ভারতের দিশী শৈলী নয়। পক্ষান্তরে মোগলশিল্প মূলতঃ বিদেশী নয় ; এতে মিলন হয়েছে উভয় শিল্পধারার। একদিকে পাশ্চাত্য বাস্তববাদের অনুরূপ বহির্বস্তুর প্রতি বিশেষ প্রবণতা, অন্য দিকে দিশী লৌকিক শিল্পের বর্ণনামূলক পদ্ধতি। কিন্তু, উভয় পদ্ধতি মিলে সে-হলো ভারতীয় পদ্ধতি। এদেশের চিত্রকলা প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে শুরু হয়ে নতুন যুগে পুনর্জাগরণের আশায় সমানে সঞ্চালিত হয়ে এসেছে। জাপানী অলঙ্করণ-রীতি শ্রেষ্ঠতর হলেও শিল্পকর্মে আধ্যাত্মিকতার প্রকাশে ভারত অদ্বিতীয়। স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলা —ভারত-শিল্পের এই ত্রি-ধারায় সমগ্র মানবজাতির বহুমুখী অধ্যাত্ম শক্তিই যেন সবার ওপরে বিচিত্র লীলায় আত্মপ্রকাশ করে রয়েছে। —এই ভাবে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর The Foundations of Indian Culture গ্রন্থে (১৯৫৯) ভারত-সংস্কৃতির প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থায় ভারতশিল্পকে স্বদেশী ও বিদেশীর মার থেকে সযত্নে সুরক্ষিত করে গেছেন।

শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে শ্রীনন্দলালের যোগাযোগ ছিল দীর্ঘকাল ধরে। শ্রীঅরবিন্দকে শ্রীনন্দলালের প্রথম দেখার কাহিনী এই : —নন্দলাল শ্রীঅরবিন্দকে দেখেছিলেন প্রথমবার কলকাতায় গগনেন্দ্রনাথের বাড়িতে। সে বোধ হয় ১৯০৮ সালের কথা। সেই বছরেই শ্রীঅরবিন্দ সম্ভবতঃ শেষ তাঁর কোন্‌নগরের জন্মভূমিতে এসেছিলেন। তখন মুরারিপুকুর বোমা-কেসের মামলা চলছে।

নন্দলাল আর্টস্কুল থেকে যেতেন মাঝে মাঝে অবনীবাবুদের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। একদিন তিনি দেখলেন, —'একটি লোক একটা বেঞ্চিতে চুপ করে বসে আছেন। বেঁটে খাটো, আধ-ময়লা মানুষটি। গলায় চাদর ঝোলানো। ঝোলা গোঁফ। বসেছিলেন চুপটি করে। তিনি চলে যাবার পরে, গগনবাবু আমাকে বললেন, —'কে

জানো ? অরবিন্দ'। নাম শুনে আমার খুব অবাক্ লাগলো।'

নন্দলাল বললেন, —'আর দেখ, মহাপুরুষদের মুখের ধরন কেমন যেন ওভারল্যাপ করে। পরমহংসদেব, অরবিন্দ সব পাশাপাশি রাখ, মুখের আদল দেখবে যেন মেশামিশি হয়ে যাচ্ছে। ভেতরে ওঁদের চিন্তার যে ঐক্যধারা বইতে থাকে তাতেই ওঁদিকে ঐরকম দেখায়। আর অসাধারণ ছিল ওঁর ধীশক্তি। বিলেতে একটা ক্লাবে একটা প্রকাণ্ড ল্যাটিন বই আধ ঘণ্টায় পড়ে শেষ করেছিলেন। গুরুদেবেরও ঐরকম মেধা ছিল। স্বামীজীরও। কি করে হয় জানি না'। আমি বললুম, —'ব্রহ্মচর্য করার ফলে'। নন্দলাল তৎক্ষণাৎ বললেন, —'ঠিক বলেছ'।···

॥ আচার্য শ্রীনন্দলালের ভারতশিল্পশাস্ত্র চর্চা ॥

১৯০৯ সালের দিকে শ্রীনন্দলাল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রথম বিশেষ সান্নিধ্যে আসেন। ফলে, কবির দৃষ্টি দিয়ে শ্রীনন্দলাল প্রকৃতিকে ভালোবাসার গভীরতর একটি অন্তর্লোকের সন্ধান পেতে থাকেন দিনে দিনে। কবিগুরুর আহ্বানে নন্দলাল অভিনন্দন গ্রহণ করতে শান্তিনিকেতনে আসেন ১৯১৪ সালে, শিলাইদহে যান ১৯১৫ সালে, কলকাতার জোড়াসাঁকোর 'লালবাড়িতে' 'বিচিত্রা স্টুডিও' স্থাপিত হয় ১৯১৬ সালে। ফলে নন্দলালের জীবনে আসে বৈচিত্র্য। তাঁর তুলিকাতে পরম্পরাগত হিন্দু-বৌদ্ধ ভারতচিত্রকলা বিচিত্র রূপ রসের নতুন খাতে মোড় ভাঙ্গে। তাঁর অঙ্কনপদ্ধতি আর বিষয়বস্তুর পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু পুরাতন ধারাবাহী ভারতশিল্পের প্রেরণা অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো প্রবাহিত হতে থাকে ভিতরে ভিতরে —সে তাঁর সারা জীবন। ১৯২১ সালে বিশ্বভারতী-শান্তিনিকেতনের পরিবেশে রবীন্দ্র-সকাশে এসেও তাঁর এই মৌলিক প্রেরণা অব্যাহত ছিল তাঁর নানা চিত্রকর্মে, তার প্রমাণ রয়ে গেছে।

আমাদের আলোচ্য সময়ের বহু পরে, শান্তিনিকেতনে কর্ম-জীবনে আচার্য শ্রীনন্দলাল ভারতশিল্পশাস্ত্র-আলোচনাকল্পে সেকালের সেই সব মনীষীর চিন্তা কাজে পরিণত করেছিলেন। ১৯২২-২৪

সালের দিকে শান্তিনিকেতনে প্রাথমিকভাবে শিল্পশাস্ত্রের চর্চা শুরু করেন তিনি অসিতকুমার হালদার, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর, শ্রীবিনোদ-বিহারী মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে শ্রীহরিদাস মিত্র মহাশয়ের সঙ্গে। এঁদের মধ্যে শ্রীনন্দলাল ও শ্রীবিনোদবিহারী নিয়মিত শাস্ত্রচর্চা করতেন; আর অসিতকুমার ও শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে আসতেন সে-আসরে। এই আলোচনাচক্রে সংশীলনের ফলে নন্দলালের মনে সেই সময় থেকেই এই চর্চা জীইয়ে রাখবার গভীর আগ্রহ জন্মেছিল। এই সময়ে একদিন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ বৈকালিক চা-চক্রে এসে নন্দলালকে বলেছিলেন, —'হরিদাসবাবুকে আপনার কলাভবন-সংগ্রহের Curetor করে রাখুন, ওঁর মিউজিয়ম-গড়া হাত'।

অক্ষয় মৈত্রেয় মহাশয়ের সুযোগ্য শিষ্য, 'গণেশ'-খ্যাত শ্রীযুক্ত হরিদাস মিত্র মহাশয়কে ১৯৪৩ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ১৯৪৬ সালের জুন মাস পর্যন্ত কলাভবনে Indian Art and Aesthetics-এর রবীন্দ্র-রিসার্চ-ফেলো নিযুক্ত করে শ্রীনন্দলাল শিল্পশাস্ত্রের নিবন্ধ এবং গ্রন্থসূচী (ক্যাটালোগ) তৈরী করার কাজে লাগিয়েছিলেন। হরিদাস বাবু ১৯৫১ সালে তাঁর Contribution to a Bibliography of Indian Art and Aesthetics-গ্রন্থ প্রকাশ করেন বিশ্বভারতীর মাধ্যমে। এই বই-এ মিত্রমহাশয় বাস্তু, শিল্প ও চিত্রবিষয়ে আলোচনা করেছেন। এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিক, পৌরাণিক ও রাষ্ট্রীয় বিধি-ব্যবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন মূল্যবান গ্রন্থের ওপর তিনি কাজ করেছেন। আগম, তন্ত্র, পুরাণ ও নীতিশাস্ত্রও তাঁর আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। গ্রন্থ-বিবরণীতে মিত্রমহাশয় শ্রেষ্ঠ আচার্যগণের আকরগ্রন্থসমূহের গ্রন্থকারগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন। Preface-এ মিত্র মহাশয় লিখেছেন— To Acarya Akshaya Kumar Maitreya who initiated me to the studies of Indian Art and Antiquities and to Adhyaksha Sri Nandalal Bose whose never-failing encouragement and guidance were great sources of inspiration, deep sense of gratitude, is acknowledged. সেই সময়ে শিল্পশাস্ত্র সম্পর্কে ওঁদের যে আলোচনা হতো তার নোট্ রাখা

জানো ? অরবিন্দ'। নাম শুনে আমার খুব অবাক্ লাগলো।'

নন্দলাল বললেন, —'আর দেখ, মহাপুরুষদের মুখের ধরন কেমন যেন ওভারল্যাপ করে। পরমহংসদেব, অরবিন্দ সব পাশাপাশি রাখ, মুখের আদল দেখবে যেন মেশামিশি হয়ে যাচ্ছে। ভেতরে ওঁদের চিন্তার যে ঐক্যধারা বইতে থাকে তাতেই ওঁদিকে ঐরকম দেখায়। আর অসাধারণ ছিল ওঁর ধীশক্তি। বিলেতে একটা ক্লাবে একটা প্রকাণ্ড ল্যাটিন বই আধ ঘণ্টায় পড়ে শেষ করেছিলেন। গুরুদেবেরও ঐরকম মেধা ছিল। স্বামীজীরও। কি করে হয় জানি না'। আমি বললুম, —'ব্রহ্মচর্য করার ফলে'। নন্দলাল তৎক্ষণাৎ বললেন, —'ঠিক বলেছ'।···

॥ আচার্য শ্রীনন্দলালের ভারতশিল্পশাস্ত্র চর্চা ॥

১৯০৯ সালের দিকে শ্রীনন্দলাল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রথম বিশেষ সান্নিধ্যে আসেন। ফলে, কবির দৃষ্টি দিয়ে শ্রীনন্দলাল প্রকৃতিকে ভালোবাসার গভীরতর একটি অন্তর্লোকের সন্ধান পেতে থাকেন দিনে দিনে। কবিগুরুর আহ্বানে নন্দলাল অভিনন্দন গ্রহণ করতে শান্তিনিকেতনে আসেন ১৯১৪ সালে, শিলাইদহে যান ১৯১৫ সালে, কলকাতার জোড়াসাঁকোর 'লালবাড়িতে' 'বিচিত্রা স্টুডিও' স্থাপিত হয় ১৯১৬ সালে। ফলে নন্দলালের জীবনে আসে বৈচিত্র্য। তাঁর তুলিকাতে পরম্পরাগত হিন্দু-বৌদ্ধ ভারতচিত্রকলা বিচিত্র রূপ রসের নতুন খাতে মোড় ভাঙ্গে। তাঁর অঙ্কনপদ্ধতি আর বিষয়বস্তুর পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু পুরাতন ধারাবাহী ভারতশিল্পের প্রেরণা অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো প্রবাহিত হতে থাকে ভিতরে ভিতরে —সে তাঁর সারা জীবন। ১৯২১ সালে বিশ্বভারতী-শান্তিনিকেতনের পরিবেশে রবীন্দ্র-সকাশে এসেও তাঁর এই মৌলিক প্রেরণা অব্যাহত ছিল তাঁর নানা চিত্রকর্মে, তার প্রমাণ রয়ে গেছে।

আমাদের আলোচ্য সময়ের বহু পরে, শান্তিনিকেতনে কর্ম-জীবনে আচার্য শ্রীনন্দলাল ভারতশিল্পশাস্ত্র-আলোচনাকল্পে সেকালের সেই সব মনীষীর চিন্তা কাজে পরিণত করেছিলেন। ১৯২২-২৪

সালের দিকে শান্তিনিকেতনে প্রাথমিকভাবে শিল্পশাস্ত্রের চর্চা শুরু করেন তিনি অসিতকুমার হালদার, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর, শ্রীবিনোদ-বিহারী মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে শ্রীহরিদাস মিত্র মহাশয়ের সঙ্গে। এঁদের মধ্যে শ্রীনন্দলাল ও শ্রীবিনোদবিহারী নিয়মিত শাস্ত্রচর্চা করতেন; আর অসিতকুমার ও শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে আসতেন সে-আসরে। এই আলোচনাচক্রে সংশীলনের ফলে নন্দলালের মনে সেই সময় থেকেই এই চর্চা জীইয়ে রাখবার গভীর আগ্রহ জন্মেছিল। এই সময়ে একদিন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ বৈকালিক চা-চক্রে এসে নন্দলালকে বলেছিলেন, —'হরিদাসবাবুকে আপনার কলাভবন-সংগ্রহের Curetor করে রাখুন, ওঁর মিউজিয়ম-গড়া হাত'।

অক্ষয় মৈত্রেয় মহাশয়ের সুযোগ্য শিষ্য, 'গণেশ'-খ্যাত শ্রীযুক্ত হরিদাস মিত্র মহাশয়কে ১৯৪৩ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ১৯৪৬ সালের জুন মাস পর্যন্ত কলাভবনে Indian Art and Aesthetics-এর রবীন্দ্র-রিসার্চ-ফেলো নিযুক্ত করে শ্রীনন্দলাল শিল্পশাস্ত্রের নিবন্ধ এবং গ্রন্থসূচী (ক্যাটালোগ) তৈরী করার কাজে লাগিয়েছিলেন। হরিদাস বাবু ১৯৫১ সালে তাঁর Contribution to a Bibliography of Indian Art and Aesthetics-গ্রন্থ প্রকাশ করেন বিশ্বভারতীর মাধ্যমে। এই বই-এ মিত্রমহাশয় বাস্তু, শিল্প ও চিত্রবিষয়ে আলোচনা করেছেন। এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিক, পৌরাণিক ও রাষ্ট্রীয় বিধি-ব্যবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন মূল্যবান গ্রন্থের ওপর তিনি কাজ করেছেন। আগম, তন্ত্র, পুরাণ ও নীতিশাস্ত্রও তাঁর আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। গ্রন্থ-বিবরণীতে মিত্রমহাশয় শ্রেষ্ঠ আচার্যগণের আকরগ্রন্থসমূহের গ্রন্থকারগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন। Preface-এ মিত্র মহাশয় লিখেছেন— To Acarya Akshaya Kumar Maitreya who initiated me to the studies of Indian Art and Antiquities and to Adhyaksha Sri Nandalal Bose whose never-failing encouragement and guidance were great sources of inspiration, deep sense of gratitude, is acknowledged. সেই সময়ে শিল্পশাস্ত্র সম্পর্কে ওঁদের যে আলোচনা হতো তার নোট্ রাখা

আছে কলাভবনে। সেই মূল পাণ্ডুলিপিখানি সম্পাদিত ও মুদ্রিত হলে এই বিষয়ে বিশেষ আলোকপাত হতে পারে। পক্ষান্তরে হরিদাসবাবুর কথা নন্দলাল পরে আরও বলেছেন! —স্বয়ং আচার্য শ্রীনন্দলালের 'শিল্পকথা' আর 'শিল্পচর্চা' গ্রন্থের আলোচনা যথাসময়ে করা হবে।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবারে সেকালের প্রচলিত ভারতীয় আদর্শের পরিমার্জনা হয়েছিল অনেক। একদা য়ুরোপীয় আদর্শও প্রবলভাবে শিকড় গেড়েছিল এই পরিবারে। উপনিষদের 'একমেবা-দ্বিতীয়ম্' ব্রহ্মতত্ত্ব অনুসরণের ফলে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চণ্ডীমণ্ডপ থেকে দুর্গাপ্রতিমা বিদূরিত হয়েছিল। প্রসঙ্গতঃ পৌত্তলিক আদর্শের পরিপোষক পুরাণ-প্রবচনের অনুশীলনেরও অবসান ঘটেছিল। কিন্তু প্রাচীন ভারতবর্ষের জীবন-প্রবাহে শিল্প মুখ্যতঃ রূপায়িত হয়ে উঠেছিল ধর্মকে অবলম্বন করে। শিল্প ছিল অধ্যাত্মসাধনার অন্যতম অঙ্গ। পৌত্তলিকতাকে বিদেয় করার ফলে, ঠাকুরপরিবার কিন্তু এইভাবে ভারতীয় ভাবধারার এবং ভারতসংস্কৃতির একটি দীর্ঘ-প্রবাহিত জীবনস্রোত থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। উনিশ শতাব্দের শেষদিকে ঘটনা-পরিবর্তনে তাঁরা স্বাদেশিকতার দিকে ঝুঁকলেও ভারতশিল্পের মৌলিক আবেদনে পৌত্তলিকতার প্রত্যক্ষ প্রভাব থাকায়, জোড়াসাঁকোর বাড়িতে পরম্পরাগত ভারতশিল্পের আর পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়নি শেষ পর্যন্ত। রবীন্দ্রনাথের জীবনেও ভারতশিল্পের এই বৈশিষ্ট্য-সম্পর্কে ব্যবহারিক পরিচয় ছিল না। আধ্যাত্মিক প্রেরণার ফলে, তাঁর কবিচিত্ত প্রত্যক্ষ শিল্পের দিকে আকৃষ্ট হয়ে, মর্ম অনুধাবনের জন্যে ব্যাকুল হলেও তত্ত্বগরিষ্ঠ, ধারাবাহী ভারতশিল্প সম্পর্কে তিনি ছিলেন প্রায় নীরব। নিজে ব্রাহ্ম না হয়েও, ব্রাহ্ম পরিবারের পরিবেশে অবনীবাবু প্রথাগত ভারতশিল্পকে বুঝতে চেষ্টা করেছিলেন বুদ্ধি দিয়ে। এই পরিপ্রেক্ষিতে তাত্ত্বিকতার দিক্ থেকে ভারতশিল্পকে এ-যুগে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার এবং জীবনব্যাপী অনুবর্তনের সত্যিকারের দায় বর্তালো একা শ্রীনন্দলালের।

॥ শ্রীনন্দলালের শিল্পচিন্তার উৎস-নির্ণয় ॥

আলোচ্য সময়ের অর্থাৎ ১৯১২-১৫ সালের বহু পরে প্রকাশিত নন্দলালের গ্রন্থ 'শিল্পকথা'র ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন : 'আজকে পৃথিবীতে যে দুর্দৈব দেখা দিয়েছে তার কারণ মানুষের দেহবুদ্ধির ও স্বার্থবুদ্ধির প্রবলতা। অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক উপায়ে তার সাময়িক যে প্রতিকারই সম্ভব হোক, স্থায়ী ও গভীর প্রতিকার হল —কেবল প্রাণধারণ ও স্বার্থসাধন এই উভয়ের অতীত যদি কোনো প্রেরণা মানুষের থাকে তারই অনুশীলন, তারই সাধনা।

সাহিত্য ও শিল্প সেই জাতের জিনিস। মানুষের চিত্তবৃত্তির সংস্কার এতে হয়; ব্যষ্টির ও সমষ্টির জীবনে ছন্দ সুর ও সামঞ্জস্য তার দান।

আজকের দিনেই সাহিত্য ও শিল্প বিষয়ে আমাদের বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। অনেকে মনে করেন, দেশব্যাপী যখন এত দুঃখ, পৃথিবীব্যাপী যখন এত পাপ, সাহিত্য বা শিল্প-চর্চার সময় কোথা —তার ঔচিত্যই বা কোন্‌খানে। এ কথা ভুল। কারণ, সাহিত্য ও শিল্পের অনুশীলন তো বিলাস নয়, স্বপ্নপ্রয়াণ নয়, পলায়নপর মনোবৃত্তির ছল নয়। অবশ্য সত্যদৃষ্টি নিয়ে আমরা যদি সাহিত্য ও শিল্পকে দেখি, তার চর্চা করি।

স্বার্থের ও অজ্ঞানের ঘনীভূত অন্ধকারেও আমরা অন্তঃকরণে যে আলোক দেখতে পাই সাহিত্য বা শিল্প তারই ছটা; তাতে বাইরের অন্ধকারও দূর হতে পারে, দুঃখ দূর না হোক দুঃখের কারণ দূর হতে পারে। আমাদের কেবল সচেতন সাধকোচিত মনোভাব প্রয়োজন, একাগ্রতা ও সত্যনিষ্ঠা প্রয়োজন। ঠিকভাবে স্বধর্মের অনুসরণ করলেই সাহিত্যিক ও শিল্পীর পক্ষে সমাজের প্রতি তাঁদের যা কর্তব্য তা পালন করা হবে (১৩৫১)।

আমরা দেখি, আচার্য শ্রীনন্দলালের পরিণত বয়সের এই শিল্পচিন্তা অর্থাৎ ভারতশিল্পের মর্মকথা ও সত্য-দর্শনের সূত্র 'হ্যাভেল গুরু'র শিল্পচিন্তার পথ ধরেই চলে এসেছে। হ্যাভেলসাহেবের The Ideals

of Indian Art গ্রন্থে শিল্পচিন্তার যে-পদ্ধতি বিবৃত করা হয়েছে, এ অংশতঃ তারই অনুবৃত্তি।

ভারতবর্ষের শিল্পচিন্তা করতে গিয়ে হ্যাভেলসাহেব শিল্পের তিনটি স্তর-বিভাগ করেছেন —Spiritual বা আধ্যাত্মিক, Intellectual বা বুদ্ধিভিত্তিক আর Material বা বাস্তব।

আধ্যাত্মিক শিল্প বলতে হ্যাভেলসাহেব ভারত-দর্শনের মর্ম-কথা যা বুঝেছিলেন, —আনন্দ থেকেই বিশ্বজগতের উৎপত্তি, আনন্দেই সমস্ত সুখ-দুঃখ বিধৃত, এবং এ সব বেদনাবোধ ছাড়িয়েও আনন্দের অস্তিত্ব বিদ্যমান। সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি আর প্রাণপ্রকৃতির ভিতরের ও বাইরের যাবতীয় খণ্ড রূপ এক অখণ্ড আনন্দরূপ মহাপ্রাণ থেকে নিঃসৃত হয়ে প্রাণশক্তিতেই স্পন্দমান। আত্মা অবিনশ্বর এবং পরমাত্মাই বিশৃঙ্খল বিশ্বে একত্ববিধায়ক পরম সত্তা —এই সত্যবোধ যেদিন বৈদিক ঋষিদের মনে ঝল্সে উঠেছিল, সেই শুভলগ্নেই জন্মলাভ করেছিল ভারতের শিল্পকলা। বেদ উপনিষদ ছাপিয়ে শতাব্দক্রমে সেই ধারা পারস্য, চীন, আরবের চিন্তাকেন্দ্র বেয়ে সমস্ত এশিয়ার শিল্পক্ষেত্র প্লাবিত করে, বর্তমান শতাব্দের তীরে এসে পৌঁচেছে। বৈদিক ঋষিগণই সভ্যতার আদিম উষায় বিশ্বপ্রকৃতি আর প্রাণপ্রকৃতি অভিন্ন —এই জ্ঞান লাভ করে, বিশ্বের আদিকারণ পরম সত্তা থেকে প্রেরণা লাভের দাবী জানিয়েছিলেন। দেবী বাক্ ঋষি-কবির মনে অধিষ্ঠিত হয়ে, তাঁকে বিশ্বসত্তার সঙ্গে অভিন্ন জ্ঞান করিয়েছিলেন। বিশ্বপ্রকৃতির সকল অবস্থায় শিল্পীর যে অভেদ জ্ঞান, সেই হলো এশিয়ার যাবতীয় কবিতা, সঙ্গীত এবং শিল্পকলার মর্মকথা।

শিল্পকলা জীবনের গভীরতর দিকগুলোকে উপেক্ষা করে না। শিল্পবিদ্যা স্বপ্নবিলাস নয়। সংসার থেকে স'রে পড়ার পথও সে ধরে না। শিল্পচর্চা না করেও মানুষ বাঁচতে পারে, এবং বাঁচতে পারে সহজভাবেই —এ কথা ঠিক্। পক্ষান্তরে অনেক শিল্প আছে যা' কেবল বুদ্ধিবৃত্তির কসরৎমাত্র; কিন্তু আত্মার খোরাক তাতে মেলেনা কিছুমাত্র। শিল্পকলার প্রকৃত পরিচয় হচ্ছে তার সর্বাতিশয়িতা বা

সর্বত্রগামিতা। যিনি চিন্তাশীল এবং মনে প্রাণে যিনি আর্ত তিনি অন্তরের অন্তস্তলে এই উৎসের সন্ধান পেয়ে থাকেন। ললিতকলার সংজ্ঞা হলো Science of the Beautiful অর্থাৎ সৌন্দর্যবিজ্ঞান। বিজ্ঞানের অন্য শাখার মতো শিল্পকলা হলো জগতের আদিকারণ শিল্পিশ্রেষ্ঠ পরমেশ্বরের লেখা প্রকৃতিরূপ মহাগ্রন্থের মধ্যে অভিনিবিষ্ট হওয়া।

শিল্প হলো —কল্পনা, সৃষ্টি আর ছন্দ। কিছু রং, কিছু রেখা, কিছু রূপ আর ইঙ্গিতে অনেকখানি ভাবনা আর বেদনার ব্যঞ্জনা জাগিয়ে রসানুভূতির প্রকাশ, আর রসের উদ্রেক করাতেই তার চরিতার্থতা। শিল্পী তাঁর সৃষ্টিতে রসের প্রেরণায় বস্তুর একটি প্রাণময় ছন্দের রূপদান করেন। ফলে, বিশেষ রূপের বিশেষ ছন্দ বিশ্বব্যাপী প্রাণের ছন্দে মিলে এক হয়ে যায়। শিল্পকর্ম প্রকৃতির ঠিক অনুকরণ নয়। বাহ্য প্রকৃতির মধ্যে সৃষ্টির যে আবেগ নিরন্তর সক্রিয়, শিল্পীর মনেও তারই প্রেরণা, তারই ক্রিয়া। শিল্প হলো শিল্পীর ধ্যান। অন্যের ভাবনায় সঞ্চারিত হতে হলে সেই ধ্যানকে সংহত রূপ ধরতে হয়। শিল্পের ভাষায় সেই রস সঞ্চারিত হয়। রসের সুষ্ঠুতম প্রকাশ হয় ছন্দে। ভাব, অনুভূতি, রূপ, রং, গতি ছন্দোময় হলেই বস্তু Aesthetic value বা সৌন্দর্যমূল্য লাভ করে।

সকল শিল্পের লক্ষ্য অভিন্ন। চিত্র, মূর্তি, কবিতা, নৃত্য, সঙ্গীত সকল কলাবিদ্যাই সৃষ্টির মূল আনন্দের ছন্দকে আপন আপন ছন্দে প্রকাশ করতে চায়। এই দিক থেকে যোগ-সাধনার সঙ্গে শিল্পসাধনার ঐক্য রয়েছে। অধ্যাত্ম-সাধনায় সৃষ্টির সমুদয় বৈচিত্র্যের অন্তরালে ঐক্যসূত্রের সন্ধান করা হয়; সেই এককেই খোঁজা হয়, যাঁকে জানলে আর-কিছু জানার প্রয়োজন থাকে না। সমগ্র শিল্পধারাও ঠিক্ এই রকম বিরাট্ একের সঙ্গে এক হবার উদ্দেশ্যে চলেছে। অদ্বৈতসাধনার চরম পরিণতি পরম উপলব্ধিতে পৌঁছতে হলে ভিন্ন ভিন্ন স্তর বা অবস্থা অতিক্রম করে যেতে হয়। শিল্পীর আত্মবিকাশের ধারাও এই গতিতে চলে। সাধনার পথে অনিবার্য

যা-কিছু ছেড়ে যেতে হয় তা অনিত্য, তা তুচ্ছ। কিন্তু সে-সব নিয়েও শিল্পসৃষ্টি করা নিরর্থক নয়। শিল্পসৃষ্টি হয় মায়াকে আশ্রয় করে। মায়া স্রষ্টাকে অভিভূত করে না, যেমন সাপের বিষে সাপ জর্জরিত হয় না। রবীন্দ্রনাথ বলতেন, —আমাদের কারবার মায়া নিয়ে। শিল্পী মায়াকে সম্যক্‌রূপে জেনে তার প্রয়োগ-কৌশল অবগত থাকেন বলেই সে হয়ে ওঠে লীলা। আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছ, উচ্চ, নিত্য, অনিত্য যাই হোক্‌ সব-কিছুর ভেতর ওতপ্রোত একের ঐক্যধারাটিকে অনুভব করা আর প্রকাশ করাই হলো শিল্পীর সাধনা, শিল্পীর সিদ্ধি। বিষয়ের মোহ হলো মায়ার দাসত্ব। শিল্পী মায়াকে দেখে থাকেন একের মধ্যে বিচিত্র ছন্দের দোলারূপে। সমতা আর সমগ্রতার বোধের জন্যে প্রয়োজন হলো বিশেষ বেদনার; তার অভাবে প্রেরণার উৎস শুকিয়ে যায়, রসের চির-উৎসারের সন্ধান মেলে না।

ভারতীয় শিল্পদৃষ্টি হচ্ছে বিস্তৃততর গভীরতর আর সামগ্রিক অর্থাৎ সব-কিছুকে নিয়ে। ভারতশিল্পী মনে করেন, সমগ্র বিশ্বসৃষ্টি আর তার প্রত্যেকটি অংশই হলো তাঁর সাধনার ক্ষেত্র —ইস্কুল-মাস্টারের দাগ-দেওয়া কোনো বিভাগবিশেষ নয়। ভারতীয় চিন্তাধারায় সৌন্দর্য হচ্ছে ব্যক্তিগত বস্তু —বস্তুগত বিষয় নয় আদৌ। আকার অথবা বস্তুতে সৌন্দর্য ধরা থাকে না, —এ হলো ব্যক্তির আত্মিক বস্তু; এবং আত্মিক ঐক্যবোধের দ্বারাই একে উপলব্ধি করা সম্ভবপর হয়। লতা গুল্ম বৃক্ষে বা নরনারীর আকৃতিতে সৌন্দর্য বসে না। সৌন্দর্য-সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে সকলের সঙ্গে যথাযথভাবে যুক্ত হওয়া —বিশৃঙ্খল বিশ্বসৃষ্টিতে সৌন্দর্যই সমন্বয় ঘটিয়ে শৃঙ্খলা এনে থাকে।—

কিন্তু কেবল যথাযথ হলেই বস্তুর যথার্থ সৌন্দর্য প্রকাশ হয় না। সে সম্ভবপর হয় শিল্পকর্মে ঐশ্বরিক ভাবধারা প্রকাশ করে মানুষের সুপ্ত সৌন্দর্যবোধকে জাগাতে পারলে তবেই। মানুষের মন সৌন্দর্য-পিপাসায় সর্বদাই আতুর। অপার্থিব ঐক্যসূত্রে আমাদের মন যত বাঁধা থাকে ততই আমরা বেশি করে সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে পারি। শিল্পীর কাজ হলো অপরের কাছে এই সৌন্দর্য প্রকাশ করে দেখানো।

সৌন্দর্যের আবাস হলো মানুষের মনে। কেবল বস্তুতে সুন্দর অথবা কুৎসিত কিছু থাকে না। শিল্পের সাধক সৌন্দর্য-নিষ্কাশনের বাসনায় কেবল গড়ন বা বস্তুর চর্চায় সম্পূর্ণরূপে মগ্ন থাকলে সে-সাধনা নিষ্ফল হয়ে থাকে।

শিল্পীর প্রকৃত লক্ষ্য, প্রকৃতি থেকে সৌন্দর্য নিষ্কাশন করা নয়। জীবনের ভিতর থেকে জীবন, মায়ার ভিতর থেকে সত্য, বস্তুর ভিতর থেকে প্রাণ প্রকাশ করাই শিল্পীর কাজ। কোনো শিল্পীর শিল্পকর্মে এই ভাব প্রকাশিত হলে তখনই সৌন্দর্য আত্মপ্রকাশ করে থাকে। এইজন্যে শিল্পীর কাছে বিশ্বপ্রকৃতি সৌন্দর্যময়রূপে প্রকাশিত না হলেও তিনি তার মধ্যে ঐশ্বরিক সত্তাকে উপলব্ধি করে সুন্দরকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করতে পারেন সহজেই। ঈশ্বরের সৃষ্টির মধ্যে অশুচি অথবা মলিন কিছু থাকতে পারে না। কিন্তু আমাদের মধ্যে সুপ্ত ভাগবত-শক্তিকে স্ফুরিত করে আমরা জীবনকে সুন্দর করতে পারি। সেইজন্যে কথা আছে, দেবতার মূর্তি গড়বার সময়ে শিল্পী মানুষের মনের মতো করে না-গড়ে, গড়বেন কেবল আপন আত্মার আলো জ্বালিয়ে। ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের দৃষ্টিতে দেখলে ভারতশিল্প সহজেই বুঝতে পারা যায়। কারণ ভারতের ধর্ম ও দর্শন ভারতের শিল্পী ও জনসাধারণকে সমানে উদ্বুদ্ধ করেছিল। যে-পরিবেশে এর সৃষ্টি ভারতশিল্পকে দেখতে হবে সেই চিন্তার পরিমণ্ডলে। —নন্দলাল বলেন, —পাগল 'হ্যাভেল গুরু' ভারতের শিল্পদৃষ্টির এইভাবে ব্যাখ্যা করে গেছেন ভারতদর্শনের 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ' অনুসরণ করে। —ভারতশিল্পের মৌলিক এই ত্রিধারা অবলম্বন করে শ্রীনন্দলালের শিল্পচিন্তা যেভাবে ক্রমাভিব্যক্ত হয়ে এসেছিল —তার যথাযথ বিশদ আলোচনা আমরা যথাস্থানে করব।

॥ শ্রীনন্দলালের অঙ্কিত চিত্রপঞ্জী (১৯১১—১৫) ॥

১৯১১ : (জের) রামায়ণী পট —সাত খানি।

১৯১২ : গোকাল-ব্রত।

১৯১৩ : উমার তপস্যা, কলিকাতায় পথের দৃশ্য, কিরাত-অর্জুন, গরুড়, ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয়, নবজাত কৃষ্ণকে নিয়ে বসুদেবের পলায়ন, যম ও নচিকেতা, যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ, শিবের বিষপান, বর্ষফল-কথনে ব্যাপৃত শিব-পার্বতী, শকটার।

১৯১৪ : বুদ্ধ ও মেষশিশু, সর্বনাশ, ভরতের ভ্রাতৃভক্তি।

১৯১৫-১৬ : পদ্মা —শীতে।

॥ চিত্র-পরিচয় (১৯১১—১৫) ॥

১৯১১ : (জের) **রামায়ণী পট** —সাত খানি (বিস্তৃত বিবরণ পরে দেওয়া হবে)।

১৯১২ : **গোকাল-ব্রত**, পোস্টকার্ড সাইজ, পোস্টকার্ডে করা, ওয়াটার কালার, গেরির রং প্রধান, অবনীবাবুর সংগ্রহ। আমাদের দেশের বাড়িতে একবার বোশেখ মাসে ঐ ব্রত হচ্ছিল। তখন এঁকেছিলুম। অবনীবাবুকে দ্বারভাঙ্গা থেকে পাঠানো হয়েছিল। গরুটিকে দেখেছিলুম আগে খড়্গপুরে (আগে দেখুন)। লণ্ডনের এন্‌গ্রেভার-ফার্ম 'কার্ল হেনচেল'-এর ওখান থেকে ছবিটির ব্লক করিয়ে আনা হয়। তখন 'কুমারীব্রত' নামেও এই ছবিটি চলতো।

১৯১৩ : **উমার তপস্যা** (১), ৫½"×৮", কার্টিজ পেপার, ওয়াশ। উমা প্রবল শীতে তপস্যা করছেন ঠাণ্ডা জলে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে। উমা নিরাভরণা। আকাশে ব্লু রং। দূরের পাহাড়ে পাতলা নীল। হিমালয়ের পরিবেশ। পাশে ঝরণা ঝরছে। পদ্মের ফুল ন[illegible] পাতাও ম্লান হয়ে গেছে প্রবল শীতে। ছবিতে স্বাক্ষর আছে। লর্ড কারমাইকেলসাহেব কিনেছিলেন। ভূমধ্যসাগরে



গরুড় সুধাভাণ্ড নিয়ে যাচ্ছেন - নন্দলাল

জাহাজডুবি হয়ে তাঁর সংগ্রহের সঙ্গে এটিও ডুবে যায়। এর সঙ্গে আমার 'পৌষপার্বণ' ছবিটিও ছিল। সিস্টারের Myths of the Hindus and Buddhists গ্রন্থে ছাপা আছে। ছবিটি ডুবে যাবার পরে আমার খুব দুঃখ হলো। অবনীবাবু বললেন, —ভাবছ কেন, আমাদের ছবিগুলোকে বরুণদেব নিয়ে গিয়ে পাতালপুরীতে এগ্জিবিশন করছেন। এর পরে আরও বড়ো করে উমার তপস্যা আঁকা হয়। (বর্ণনা পরে দেখুন।)

কলিকাতায় পথের দৃশ্য, আ. ৭"×৬", কার্টিজ পেপার, ওয়শ, ড্রয়িং। একটি গলির মোড়ে কতকগুলি গরিব পথের ছেলে খেলা করছে। আরাইসান্ এই ছবিখানি নিয়েছিলেন আমাকে তাঁর ছবি বদলা দিয়ে।

কিরাত-অর্জুন, ৭"×৬", ওয়শলী, টেম্পেরা, অবনীবাবুর সংগ্রহ। অর্জুন শিবের গড়-পুজো করছেন মাথা নিচু করে। পিছনে কিরাতবেশী শিব ও পার্বতী দু'জনে দাঁড়িয়ে আছেন আশীর্বাদ করবেন বলে। সিস্টারের আর কুমারস্বামীর Myths of the Hindus and Buddhists বইয়ের জন্যে করা।

গরুড়, ৫"×৪", ওয়শলী, দিশী কাগজ, ওয়শ। অবনীবাবু কিনেছিলেন। গরুড় অমৃতভাণ্ড নিয়ে চলে যাচ্ছে, আর পায়ে সাপ ধরে নিয়ে যাচ্ছে। Indian Myths-এ প্রিন্ট্ আছে। মূল ছবি অনেক রঙে করা। লাইন-ড্রয়িং-এ আলাদা করেছিলুম। 'প্রবাসী'তে প্রিন্ট্ আছে (১৩২২, আশ্বিন)।

ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয়, আ. ৮"×৭", কন্‌টিনিউয়াস কার্টিজ পেপার, ওয়শ। অবনীবাবু কিনেছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র বসে আছেন খাটের ওপর। সঞ্জয় বসে আছেন আর-একটা খাটের ওপর। হাত-টাত নেড়ে যুদ্ধের বর্ণনা করছেন। ধৃতরাষ্ট্রের conception-টা আমার দাদাশ্বশুরমশায়কে দেখে করা। খুব লম্বা-চওড়া ছিলেন। তবে পোর্ট্রেট মিল নাই। আর সঞ্জয় করেছিলুম কলকাতা-মিউজিয়মে একটা পাথরের পুরানো হাতকাটা মূর্তির আইডিয়া নিয়ে।

নবজাত কৃষ্ণকে নিয়ে বসুদেবের পলায়ন- আ. ৮"×৬", দিশী

কাগজ, ওয়াশলী, রঙ্গিন। বিক্রী হয়ে গেছে। জন্মাষ্টমীর মতন ছবিটা; তবে দেবকী পিছনে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে নাই। কোথাও হাত রেখে আগ্রহভরে কৃষ্ণকে দেখছেন। Indian Myths-এর জন্যে করা।

যম ও নচিকেতা, ৭"×৫", কন্‌টিনিউয়াস কার্টিজ পেপার, ওয়শ, আ. নিজ সংগ্রহ। Indian Myths-এ ছাপা আছে। কিন্তু পরিচয়ে দু'টি গুরুতর ভুল রয়েছে। ছবির পরিচয়ে লেখা আছে: 'Krishna instructing Arjuna', আর চিত্রকরের নাম লেখা হয়েছে: Surendranath Kar। ছবিতে আমার স্বাক্ষর না-থাকলে ছবিটা গাপ হয়ে যেতো বেমালুম।

যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ. ৭"×৫", কন্‌টিনিউয়াস কার্টিজ পেপার, ওয়শ। যুধিষ্ঠির স্বর্গে যাচ্ছেন, সঙ্গে বাটুয়া কুকুর।

শিবের বিষপান, আ. ১০"×৭", ওয়াট্‌ম্যান কন্‌টিনিউয়াস কার্টিজ পেপার, ওয়শ। মূল আছে ও. সি. গাঙ্গুলীর কাছে। নিজ-সংগ্রহে কপি আছে। ওরিজিন্যাল থেকে বড়ো করে কয়েকটি কপি করা হয়, সেগুলি বড়ো ছবি একই মাপের —৩০"×২২"। সমুদ্রমন্থনের আইডিয়া নিয়ে করা। নির্বিকার নীলকণ্ঠ শিব পৃথিবীর যাবতীয় হলাহল পান করছেন।

বর্ষফল-কথনে ব্যাপৃত শিব-পার্বতী, চিত্রাধিকারী শ্রীঅর্ধেন্দ্র কুমার গঙ্গোপাধ্যায়।

শকটার, মহারাজ নন্দের মন্ত্রী। রঙ্গিন, পরিচয় মনে নাই। খোঁজ কর। সম্ভবতঃ আর্য ক্ষেমেশ্বরের 'চণ্ডকৌশিক' নাটক থেকে দৃশ্যবিশেষ নিয়ে করা হয়। মহাপদ্ম-নন্দ এঁর পরামর্শে ক্ষত্রিয় বিনাশ করেন।

১৯১৪: **বুদ্ধ ও মেষশিশু**, ১৯"×১২", ওয়াট্‌ম্যান পেপার, ওয়শ, রঙ্গিন। সিস্টারের Footfalls of Indian History (১৯১৫) বই-এ প্রিণ্ট্‌ আছে। বুদ্ধের কাঁধে খোঁড়া মেষশিশু; বুদ্ধের পায়ের চারদিকে ভেড়ার পালের মধ্যে খোঁড়া শিশুটির মা। নদী পেরুতে পারছে না বলে বুদ্ধ মেষশিশুটিকে সাহায্য করছেন। নদীর তীরের দৃশ্য। রাজগীরের সূর্যাস্তের প্রেক্ষাপট।

সর্বনাশ, আ. ৭"×৫", কনটিনিউয়াস কার্টিজ পেপার, ওয়শ, রঙ্গিন। সম্ভবতঃ মেঘের মধ্যে মহাকালের মুখ।

ভরতের ভ্রাতৃভক্তি, ৬·৩"×১১·৮", তখন মাউন্ট করা হয়নি, ওয়াট্‌ম্যান পেপার, ওয়শ, মূল্য ১৮০ টাকা। ১৯১৫ সালে কলকাতায় ৫. দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনে সোসাইটির এগজিবিশন হয়েছিল। তাতে মহামান্য গভর্ণরের প্রাইজ পাবার জন্যে কম্‌পিটিশানে দেওয়া হয়েছিল। মূল ছবির নাম দেওয়া হয় 'Brother of Rama'। এগ্‌জিবিশনের পরে ছবিটি শ্রীঅর্ধেন্দ্র কুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের হস্তগত হয়। সম্প্রতি বেলুড়মঠের মাধ্যমে শ্রীমতী গীতা ঘোষ শান্তিনিকেতনে এসে মূল ছবিটিতে ৩০-৮-৬৫ তারিখে আমার স্বাক্ষর করিয়ে নিয়ে যান। তিনি বললেন, —কিছুদিন আগে তিনি ছবিটি ও সি. গাঙ্গুলীর কাছ থেকে অনেক দাম (দু' হাজার টাকা) দিয়ে কিনেছেন।

১৯১৫-১৬ঃ **পদ্মা —শীতে**, ৩৬"×১৫$\frac{১}{২}$", প্রফুল্লনাথ ঠাকুর-সংগ্রহ। ওয়াটম্যান, ওয়শ। শিলাইদহের প্রথম অভিজ্ঞতা। পদ্মার বিরাট বালুচরের মধ্যে জলধারা; আকাশের ওপর এক ঝাঁক হংস-বলাকা। (পরিচয় পরে দেখুন)।

॥ 'তারা'-সাধক একজন সাধুর কথা ॥

একবার একজন সাধক এসেছিলেন নন্দলালদের হাতীবাগানের বাড়িতে। দুপুর তখন গড়িয়ে গেছে। নন্দলাল দেখলেন, —একটি লোক উঠনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, গায়ে জড়ানো তাঁর খাটো ধুতির কোঁচার খুঁট। লোকটির মুখ দেখে নন্দলালের মনে ভারী একটা শ্রদ্ধার ভাব জাগলো, আগন্তুকের মুখের ছাপ পড়লো শিল্পীর মনে। প্রশ্ন করে জানলেন —অবনীবাবু তাঁকে ও'র কাছে পাঠিয়েছেন। —পূজার জন্যে 'তারা'-মূর্তি দরকার তাঁর। অবনীবাবুর কাছে গিয়েছিলেন তিনি তাঁর ধ্যানের মূর্তির প্রয়োজনে। 'অবনীবাবু বলেছিলেন ঃ আমি দে-দেবতার মূর্তি-টুর্তি —ও সব আঁকি-টাঁকি না। আপনি নন্দলালের কাছে যান।

অবনীবাবু তাঁকে আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন।'

'সেই সাধুলোকটি তাঁর ইষ্টদেবী 'তারা'র মূর্তি আঁকবার জন্যে আমাকে ধ্যানের শ্লোক দিলেন। সেই শ্লোক পেয়ে আমি ছবি-আঁকা শেষ করলুম পাঁচ-ছ দিনে।'

'সপ্তাহখানেক পরে সাধু এসে ছবি পেয়ে খুব খুশি হলেন। খুশি হয়ে আমাকে আশীর্বাদ করলেন, —'যেমনটি আছ তেমনটি থাকো' —এই আশীর্বাদের অর্থ আমি আজও খুঁজি মনে মনে (১৯৬৫)। সত্যিই কি আমি যেমনটি ছিলুম তেমনটি আছি ? —সে আদর্শ-চিন্তা করে দেখো তোমরা।'

—খোঁজ নিয়ে জানা গেল, এই সাধুটির বাড়ি ছিল বাঁকুড়ায়। সেখানে তিনি পরিচিত ছিলেন —'মুখুজ্জে মশাই' নামে। ওখানে তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন সকলেই। তিনি মারা গেছেন। তবে নন্দলালের আঁকা সেই 'তারা'-মূর্তিটির আজও পুজো হচ্ছে —সেই সাধু মুখুজ্জেমশায়ের প্রিয়-শিষ্য বাঁকুড়ানিবাসী শ্রীকণ্ঠ ভট্টাচার্য মহাশয়ের বাড়িতে। শ্রীকণ্ঠ ভট্টাচার্য মহাশয় ছিলেন রিটায়ার্ড পোস্ট্যাল সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট্। —এ সংবাদ আমরা পেলুম শিল্পী শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছ থেকে।

নন্দলালের স্কেচ্‌বুক (সংখ্যা ৩২) বিবরণে দেখছি, সেই 'তারা'-মূর্তিটির প্রিন্ট রয়েছে। মূর্তিটির বৈশিষ্ট্য হলো, জিব আর ঠোঁটের অদ্ভুত ঐক্য। জীবন ও মৃত্যুর একতানতা। 'সাবিত্রী ও যম' (১৯০৯) আর এই 'তারা'-মূর্তি নন্দলালের প্রথম দিকের ছবি। তাঁর এই প্রথম ছবিগুলি অবনীবাবুর কাছে প্রথম দেখে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন —'যম এতো সুন্দর'! এই দেখেই নন্দলালকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'চয়নিকা' চিত্রিত করবার জন্যে অনুরোধ করেন —১৯০৯ সালে। সে-প্রসঙ্গ যথাসময় বলা হচ্ছে।

দুইটি কেবল বুজিবার জন্য নহে, দেখিবার জন্য। নিজেও দেখিতে শিখুন। কেবল কুমারস্বামী, নিবেদিতা প্রভৃতি পরের চক্ষু দিয়া জগতে অন্ততঃ আমাদের হিন্দুজগতে শনির দৃষ্টি দিবেন না। হিন্দুর পয়সায় প্রবাসী পুষ্ট হইতেছে, চিত্রচ্ছলেও তাঁহাদের দেবতাকে বিকৃত করিয়া 'এক ঢিলে দুই পাখী' মারিবেন না। স্বীকার করিতেছি, আমরা ইংরাজী জানি না —গৌরাং বাণীতে মূর্খ এবং নিবেদিতা ও কুমারস্বামীকেও গুরু বলিয়া মানি না ; কিন্তু যাহা জানি, অকুণ্ঠিতচিত্তে আপনাকে তাহা নিবেদন করিলাম।'

সেকালের শ্রেষ্ঠ সমালোচক পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তাঁর কঠিন সমালোচনার কষাঘাত থেকে কাকেও রেহাই দেননি। অবনীবাবুর চিত্রকলা বিদেশে সমাদৃত হলেও সমাজপতি মহাশয় তাঁর বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন। অবনীবাবুর 'বুদ্ধ ও সুজাতা' তাঁর বিদ্রূপবিদ্ধ হয়েছিল, খানিকটা একমুখোভাবে। তাঁর মতে, অবনীবাবুর চিত্রে কোনো চিত্রগুণ নাই। অবনীবাবুর 'গণেশ জননী'-চিত্রেরও তিনি বিরূপ সমালোচনা করেন।

কলা-সমালোচনার ক্ষেত্রে রামানন্দবাবুর 'প্রবাসী' আর মডার্ণ রিভিউ'র প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল সমাজপতি মহাশয়ের সুখ্যাত 'সাহিত্য' পত্রিকা। এই সমালোচনা-সংগ্রামে রামানন্দবাবুর সহায় ছিলেন চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আর শ্রীযুক্ত অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়। চারুবাবু তাঁর নামের আগে 'শ্রী' শব্দ ব্যবহার করতেন না। ফলে, সুরেশবাবু তাঁকে বলতেন, —'শ্রীহীন চারু'। অর্ধেন্দ্রকুমার কেবল ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন —'শ্রীঃ'। এই 'শ্রী'-ছদ্মনামের ভদ্রলোকটিকেও সমাজপতি মহাশয় কেমন বিশ্রী করে দেখাতেন, তা আমরা একটু আগে তাঁর কথা তুলেই দেখিয়েছি।

রামানন্দবাবুর আর সুরেশবাবুর আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রভেদ ছিল তীব্র ও মৌলিক। উভয়েই ছিলেন আদর্শনিষ্ঠ। কারও মুখ চেয়ে তাঁরা এর ব্যতিক্রম স্বীকার করতেন না কখনও। উভয়েই ছিলেন স্পষ্টবক্তা ও নির্ভীক। সমাজপতি মহাশয়ের পাণ্ডিত্য ও বঙ্গভাষায় তাঁর অধিকার সম্পর্কে তখন কারও কোনো দ্বিমত ছিল না। সুরেশবাবুর মধ্যে বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র উভয়ের ভাষার

প্রভাব পড়ে নতুন একটি ওজস্বী ভাষার সৃষ্টি হয়েছিল। 'সাহিত্য'-পত্রিকার সমালোচনার একটি বিভাগ খুলে, সেকালের সাহিত্য ও চিত্রকলাকে সবার সামনে তুলে ধরতেন অতি সুস্পষ্ট করে। সে ভাষা একদিকে যেমন সহজ সরল অন্যদিকে তেমনি সুতীক্ষ্ণ ও গূঢ় তাৎপর্যপূর্ণ। মন্তব্য হতো কঠোর কঠিন ও তেজোদৃপ্ত। তবে, তাঁর ভাষায় কারো জ্বালাবোধ হতো না, বরং সে হতো উপভোগ্য। বাৎসরিক প্রদর্শনীর পরে, বা 'প্রবাসী' ও 'ভারতী'তে নব্যচিত্রকলার প্রতিলিপি ছাপা হলে সেকালে সবাই উৎসুক থাকতেন, এবারে সমাজপতিমশায় কি আঘাত হানেন তার অপেক্ষায়।

সমাজপতি মহাশয় মূলতঃ কিন্তু শিল্পবিদ্বেষী ছিলেন না। তাঁর 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রায় প্রতি সংখ্যায় তিনি দু-একখানি করে বিদেশী চিত্রের রঙ্গিন প্রতিলিপি প্রকাশ করতেন। এর মধ্যে অনেক মাস্টার পীস্ও তিনি ছাপিয়েছিলেন। তিনি নিয়মিত চিত্র-সমালোচনা করে পাঠকদের শিল্পকলা সম্পর্কে সজাগ ও সচেতন করে তুলতেন। অবশ্য তাঁর সমালোচনা তাঁর নিজস্ব রুচি, শাস্ত্রজ্ঞান ও নিজস্ব মতামতেরই সুষ্ঠু প্রকাশ। ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে, বা স্বাজাত্যবোধের বিচারে সেটা 'নির্জলা কদালোচনা' কিনা সে-আলোচনায় আমরা এখন প্রবেশ করছি না। তবে তিনি তাঁর আলোচনার দ্বারা জনসাধারণের শিল্পরুচিকে জাগিয়ে তুলেছিলেন সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।

সমাজপতি মহাশয় তাঁর 'সাহিত্য'-পত্রে ভারতীয় নতুন চিত্রকলা সম্পর্কে মাসে মাসে যে বিরুদ্ধ সমালোচনা করতেন তার সার কথা ছিল মোটামুটি এই:—ভারতীয় চিত্রকলার মূল সূত্রই বোধ করি এই যে, 'এমন বস্তু আঁকিবে, বা এমন বিকৃত করিয়া আঁকিবে যে স্বাভাবিক বস্তুর সহিত তাহার কোনও সৌসাদৃশ্য না থাকে, লোকে চিনিতে না পারে' অর্থাৎ 'স্বভাব-বিরোধিতাই তথাকথিত ভারতীয় চিত্রকলার প্রাণ। স্বাভাবিকতার শ্রাদ্ধই প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলার একমাত্র উদ্দেশ্য। পানের দোকানে ও পুরাতন পঞ্জিকার পৃষ্ঠায় ভারতীয় চিত্রকলার যে আদর্শ দেখা যায় ভারতীয় শিল্পের নতুন পন্থীগণের চিত্র, সৌন্দর্যে কল্পনায় বা বমনোদ্দীপক বর্ণবিন্যাসে তাহাদের অপেক্ষা

ধ্যান না করিয়া নন্দবাবু যে মহাদেবকে কল্পনা করিয়াছেন তাহাকে অত্যন্ত নব্য বলিয়া মনে হয়। মহাদেবকে 'নবীন' রূপে কল্পনা করিবার উদ্দেশ্য কি বলিতে পারি না।'

সমাজপতি মহাশয়ের এই আলোচনার উত্তর দিয়েছিলেন প্রবাসী ১৩১৬ সালের আশ্বিন সংখ্যায়। তার বয়ান এই :

'মহাদেবের শ্মশ্রুমুণ্ডন।

প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর বিখ্যাত 'শিবতাণ্ডব' চিত্রের প্রতিলিপি কয়েক মাস পূর্বে 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল, এবং সম্প্রতি সাহিত্যপত্রে তাহার সমালোচনা নয়, সদালোচনাও নয়, কিন্তু কুৎসা জল্পনা বাহির হইয়াছে। সমালোচক দেবাদিদেব মহাদেবকে 'হাড়গিলা' ইত্যাদি সুমধুর সম্ভাষণ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, মহাদেবের শ্মশ্রুমুণ্ডন ছল ধরিয়া ভদ্রসন্তানকে ইতর ভাষায় গালি দিয়াছেন। সাহিত্যপত্রের সমালোচনা-লেখকের গালিবর্ষণপটুতা দেশবিখ্যাত ও আমাদের নিকট চিরপুরাতন, কিন্তু ভারতশিল্প ও দেবমূর্তি সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণা (?) বিশেষ বিস্ময়কর ও আমাদের কাছে এক অপূর্ব সামগ্রী বলিয়া ঠেকিতেছে ; —এক কথায় যেন অনধিকার চর্চা বলিয়াই বোধ হইতেছে।

এই মহাদেবের শ্মশ্রুমুণ্ডন যেটাকে তিনি এত গুরুতর অপরাধ বলিয়া ধরিতেছেন —সেই শ্মশ্রু আমরা প্রাচীন ভারতের কোনো মহাদেবমূর্তিতে, পুরাণ উপপুরাণ কাব্য সাহিত্যে কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। রূপমালা স্তবমালা প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ ও শিল্পশাস্ত্র যেগুলি বিশেষ করিয়া শিল্পিগণের জন্য রচিত তাহার কোথাও মহাদেবের দাড়ি বহিয়া গঙ্গা নামিতেছেন কিম্বা গিরিসুতা সেই বিকট দাড়ির উকুন বাছিতেছেন এরূপ বর্ণনা আছে বলিয়া মনেতো পড়ে না। বাংলা দেশে আসিয়া মহাদেব কখন কখন ছদ্মবেশে শ্বশুর ও শাশুড়ী এবং কন্যাযাত্রীকে ভয় দেখাইয়াছেন বটে, কিন্তু সেও অল্পক্ষণের জন্য। তাঁহার নিজমূর্তি তিনি কখনও কোথাও এক রাশ দাড়ি দিয়া ঢাকেন নাই —অধুনাতন বাংলা দেশের কালীমূর্তির পদতলেও নয়, পুরাকালের ত্রিমূর্তিমন্দিরেও নয়।

আমাদের দেশের ভক্ত কবি ও শিল্পী এমন কি , কুমারটুলীর কুমারগণকেও তিনি গৌরীভুজলতাবেষ্টিত নীলকণ্ঠরূপে দেখা দিয়া কৃতকৃতার্থ করিয়াছেন। কেবল কেন যে তিনি 'সমালোচক' মহাশয়কে বিকট শ্মশ্রুরাজিমণ্ডিত রূপে দেখা দিয়া ছলনা করিতেছেন বুঝিতে পারি না। বোধ হয় তিনি নিজের শ্মশ্রুগুম্ফমুণ্ডিত করিয়া মানুষ হইয়াও নিজেকে স্বল্প-রোম দেবতারূপে চালাইতে চাহেন, সেইজন্য রুদ্রের কোপে পড়িয়াছেন। এখন তিনি সে রুদ্রকোপ হইতে বিমুক্ত হইবার জন্য শঙ্করের অবতার ভগবান শঙ্করাচার্যের সর্বজনবিদিত শিবস্তোত্র পাঠ করুন। অথবা পিঙ্গল দাড়ির অন্তরালে মহাদেব নীলকণ্ঠ কেমন শোভা ধরিয়াছে, তাহার একটি বর্ণনা পুরাণাদি হইতে উদ্ধৃত করিয়া আমাদিগকে শুনাইয়া দিন। নচেৎ—।

শ্রীঃ।'

এই সমালোচনার তীব্র জবাব লেখক 'শ্রীঃ' —ছদ্মনামে হলেন শ্রীযুক্ত অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়। উপরন্তু প্রবাসীর সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মন্তব্য করেছিলেন ঃ [যাঁহারা শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয়ের এই চিত্রখানির উৎকর্ষ বুঝিতে চান, তাঁহারা সেপ্টেম্বর মাসের মডার্ণ রিভিউয়ে ভগিনী নিবেদিতা ও ডাক্তার কুমারস্বামীর তৎসম্বন্ধে মন্তব্য পাঠ করুন। কিন্তু যদি কেহ তাঁহাদের ইংরাজী বুঝিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া original হইতেই হইবে। প্রবাসীর সম্পাদক।]'

এর পরে সমাজপতি মহাশয়ের পাল্টা আক্রমণ বের হলো ১৩১৬ সালের অগ্রহায়ণ মাসের 'সাহিত্যে'। এই আক্রমণে তিনি 'শ্রীঃ' আর প্রবাসী-সম্পাদকের ওপরে চড়াও হলেন এই ভাষায় ঃ 'শ্রীঃ' স্বাক্ষর করিয়া যিনি 'মহাদেবের শ্মশ্রুমুণ্ডনে' সাহিত্য সম্পাদককে গালি দিয়াছেন তাঁহার স্পর্ধা ও অহঙ্কার বাস্তবিকই উপভোগ্য। তাঁহার মতে শিবতাণ্ডব চিত্র সম্বন্ধে আমরা 'সাহিত্যে' যাহা লিখিয়াছি, তাহা 'সমালোচনা নয়, সদালোচনাও নয়, কিন্তু কুৎসা জল্পনা।' তাহা ছদ্মবেশীর মতে সমালোচনা না হইতে পারে, সদালোচনাও না হয় প্রবাসী ও তস্য মুরুব্বীদের একচেটে, কিন্তু 'কুৎসা' কাহাকে বলে, তাহা এই আত্মগোপনকারীর জানা আছে কি ? যাহাদের আত্মপ্রকাশ করিবার সাহস নাই, মুখোস পরিয়া ভাড়াটিয়া গুপ্ত-ঘাতকের মত যাহারা পশ্চাৎ

হইতে আক্রমণ করে তাহারা কৃপার পাত্র নয়, ঘৃণার পাত্র। সেই ছদ্মবেশী কাপুরুষ লিখিয়াছেন, —'সমালোচক……ইতর ভাষায় গালি দিয়াছেন।' প্রথমে বলিলেন 'সমালোচনা নয়, সদালোচনাও নয়।' আবার বলিতেছেন, 'সমালোচক'। উভয় উক্তিতে চমৎকার সামঞ্জস্য। তাহার পর বক্তব্য এই যে 'ইতর ভাষা' সম্বন্ধে ছদ্মবেশী এমন 'ন্যাকা' সাজিলেন কেন? সে ভাষায় তিনি যে সিদ্ধহস্ত, তাহা কি ভুলিয়া গিয়াছেন? শুধু ভাষা নয়, ভাবও যে তদ্রূপ। তিনি নিজেও কুমারটুলী অঞ্চলের কুম্ভকার সম্প্রদায়ের প্রসাদেই প্রতিবাদের ভাষা সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহাও এই প্রতিবাদেই সুপ্রকাশ। অথচ ইতর ভাষা সম্বন্ধে তাঁহার এমন অধ্যারোপ —বস্তুতে অবস্তুর আরোপ —রজ্জুতে সর্পভ্রম ঘটিল কেন? কস্তুরী মৃগ যেমন মৃগনাভির গন্ধে উন্মত্ত হইয়া চারিদিকে ছুটিতে থাকে, আপনার নাভিরন্ধ্রেই যে সেই গন্ধের কারণ বিদ্যমান, তাহা বুঝিতে পারে না, দেখিতেছি এই ছদ্মবেশীর অবস্থাও সেইরূপ। ভারতশিল্প ও দেবমূর্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিবার অধিকার কেবল ঠাকুরবাড়ির পটুয়া, পরিকর ও মুরব্বীদিগকে ও তাঁহাদের বাহন প্রবাসীকে কোন কর্ণওয়ালিশ দলীল লিখিয়া দশশালা বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু দেখিতেছি, সে অধিকার চিরস্থায়ী স্বত্বে পরিণত হইয়াছে। লেখকের মতে আমাদের পক্ষে তাহা আলোচনা 'অনধিকার চর্চা'। আর নির্লজ্জ স্তাবকদিগের তাহা স্বাধিকার কেননা তাঁহারা মাইকেল এঞ্জিলো, র‍্যাফেল ও রাস্কিনের অবতার। 'প্রাক্তনজন্মবিদ্যার' ন্যায় শিল্পবিদ্যাও তাঁহাদের ক্রীতদাসী। এ বিষয়ে তাঁহাদের অশিক্ষিত পটুত্ব। শ্রীঃ বলেন, —আমরা দেবাদিদেব মহাদেবকে হাড়গিলা বলিয়াছি। শান্তং পাপম্ —প্রতিহতম্ মঙ্গলম্। দেবাদিদেব মহাদেবকে কোন হিন্দু হাড়গিলা বলিতে পারে না। আমিও বলি নাই। আমি নন্দলালের তুলিকার বরপুত্র জীববিশেষকে উক্ত পক্ষীর সহিত তুলিত করিয়াছিলাম। শ্রীঃ সত্যের মস্তকে পদাঘাত করিয়া তাহা দেবাদিদেব মহাদেবে আরোপ করিয়াছেন। কিন্তু 'মিছা কথা ছেঁচা জল' কতক্ষণ রয়? শ্রীঃ হয় শঙ্করাচার্য, নয় কুক্কুট মিশ্র শর্মা —যিনি 'বেদান্ত শাস্ত্রানি দিনত্রয়ঞ্চ, আস্রয়ঞ্চ তর্ক বাদান্' তর্কক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই একরত্তি

প্রতিবাদে তিনি নিজের বিদ্যার যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। পুরাণ, উপপুরাণ, কাব্য, সাহিত্য —এমন কি, রূপমালা, স্তবমালা প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ ও শিল্পশাস্ত্র —সকলেই অজ্ঞাতকুলশীল কুক্কুট মিশ্র শর্মার মস্তিষ্কে —যদি থাকে —'নরী নৃত্যতে'। আমাদের অত বিদ্যা নাই। মহাদেবের শ্মশ্রু ছিল কিনা, আমরা পরে তাহার আলোচনা করিব। তাহা সময়সাপেক্ষ। কিন্তু গোঁপ ছিল কিনা? থাকিলে সে গোঁপ কোথায় গেল?

উপসংহারে প্রবাসীর সম্পাদক টিপ্পনী করিয়াছেন, —যাঁহারা শ্রীযুত নন্দলাল বসু মহাশয়ের এই চিত্রখানির উৎকর্ষ বুঝিতে চান তাঁহারা সেপ্টেম্বর মাসের মডার্ণ রিভিউয়ে ভগিনী নিবেদিতা ও ডাঃ কুমারস্বামীর তৎসম্বন্ধে মন্তব্য পাঠ করুন। কিন্তু যদি কেহ তাঁহাদের ইংরাজী বুঝিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া অরিজিনাল্ হইতে হইবে।

অর্থাৎ যাঁহারা ভারতীয় চিত্রকলাপদ্ধতির রসগ্রহণে অক্ষম, তাঁহারা ইংরাজী জানেন না। আর যাঁহারা ভগিনী নিবেদিতা ও কুমারস্বামীর মতগুলি নির্বিচারে শিরোধার্য করিতে না পারেন, তাঁহারা মূর্খ। ছাত্র-জীবনে বরং এরূপ বিদ্যার 'গুমোর' শোভা পাইতে পারে, এখন পরব্রহ্মের দিকে যার পা, গঙ্গার দিকে পা তাঁহার পক্ষে খাটে না, পলিত ছদ্মনা' জরা বলিতেছে 'শেষের সেদিন মন কররে স্মরণ।' এখনও সেই ময়ূর প্রকৃতি কি শোভা পায়? না হয় দুপাতা ইংরাজীই পড়িয়াছেন, —কিন্তু যা পড়েন নাই, তা সমুদ্রের ন্যায় বিশাল। বিড়ালাক্ষী ভারতী আমাকে দয়া করেন নাই বলিয়া আপনি ইঙ্গিতে উপহাস করিয়াছেন। কিন্তু নিজের ধর্ম, নিজের শাস্ত্র, নিজের দর্শন, নিজের তন্ত্র, নিজের সাহিত্য —কি পড়িতে পারিয়াছি? সে দুঃখ রাখিবার যে স্থান নাই। সুতরাং আপনার খোটা শিরোধার্য করিলাম। কিন্তু আপনি স্বদেশী বক্তৃতায় গোলদীঘি ও বিডন বাগান প্রতিধ্বনিত করেন, এখন গোরার ভাবে এত মসগুল ভ্রাতৃভাবে ভোর, অথচ ধরাকে সরাতে নয় —মধুপর্কের বাটী অপেক্ষাও ক্ষুদ্রজ্ঞান করেন। ছি! ইংরাজীতেই ছাপা হউক, আর হিব্রুতেই লেখা হউক, হাঁ করিয়া কিছু গিলিবেন না। একটু ভাবিয়া দেখিবেন —গ্রহণীয় কিনা। ভগবান সেই জন্যই স্কন্ধের উপর মুণ্ডটি বসাইয়া দিয়াছেন। চক্ষু

॥ **সুরেশচন্দ্র সমাজপতি** ॥

ইনি হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাতি। বঙ্কিমবাবুর পরে সুরেশ সমাজপতি মহাশয় সমালোচক বলে বিশেষ বিখ্যাত হয়েছিলেন। খুব পণ্ডিত লোক ছিলেন তিনি। সুরেশবাবুর সঙ্গে জানা-শোনা ছিল নন্দলালের। বাড়ি ছিল এক পাড়ায়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বড়ো মেয়ে হেমলতা দেবী আর বড়ো জামাই গোপালচন্দ্র সমাজপতির বড়ো ছেলে তিনি। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কথা অনেক জানতেন নন্দলাল; কিন্তু বলতে তাঁর বাধে। নন্দলাল বললেন, —'নামী লোকদের জীবনের অন্ধকার দিক্‌টা দেখতে নাই।'

নন্দলালদের হাতীবাগানের বাড়িতে আসতেন সুরেশবাবু। 'সাহিত্য'-পত্রের সম্পাদনা করতেন তিনি। 'সাহিত্য' ছিল সেকালের একটি শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্র। সেকালের বহু শ্রেষ্ঠ মনীষীর শ্রেষ্ঠ রচনাসম্বলিত হয়ে মাসে মাসে 'সাহিত্য' নিয়মিত আত্মপ্রকাশ করতো। ওতে 'ওরিয়েণ্টাল' ছবির তীব্র সমালোচনা করতেন সম্পাদক সুরেশবাবু। সেই প্রসঙ্গ তুলে সমাজপতিমশায় একদিন নন্দলালকে বললেন, —'আমার কাগজে তোমাদের বিরুদ্ধে লিখি, সে আমার কাগজের কাট্‌তি বাড়াবার জন্যে। ব্যক্তিগত আক্রমণ বলে ওসব কখনও মনে করো না।'

লম্বা চওড়া ফর্সা ভোজপুরী আকৃতি ছিল সমাজপতিমশায়ের। আর প্রকৃতিতে ছিলেন তিনি উগ্র রক্ষণশীল রাঢ়ী ব্রাহ্মণ। তাঁর শিল্প-বিচার ছিল দেশ-কালের গণ্ডী ছাড়িয়ে অর্থাৎ বিশ্বজনীন। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের চিত্রবিচারের বাঁধা ছক মানতেন না তিনি। এদেশের-ওদেশের জীবনাদর্শের পার্থক্যের প্রশ্নও ছিল তাঁর কাছে অবান্তর। কলাক্ষেত্রে তিনি জাতীয়তাকে স্বীকার করতেন না। সম্ভবতঃ সেইজন্যেই সেকালের কলকাতায় নবজাতক চিত্রকলাকে তিনি সুনজরে দেখেননি। কিংবা আরও কোনও গূঢ় কারণ আছে —সে আলোচনা আমরা এখনই করবো।

তাঁর 'সাহিত্য'-পত্রে নন্দলালের একাধিক ছবি সম্পর্কে বেধড়ক গালিগালাজ করেছিলেন সমাজপতি মহাশয়। ১৩১৬ সালের আশ্বিন

সংখ্যার 'সাহিত্যে' নন্দলালের 'কৈকেয়ী' চিত্র সম্পর্কে তিনি কঠিন সমালোচনা করেছিলেন। ঐ বছরের ভাদ্রমাসে 'ভারতী'-পত্রিকায় নন্দলালের 'কৈকেয়ী' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। সেই প্রিণ্ট্ দেখে তিনি লিখেছিলেনঃ —'সর্বপ্রথমে 'কৈকেয়ী মন্থরা সংবাদ' নামক একখানি অপরূপ চিত্র, —আষাঢ়ে কল্পনার উদ্ভট উদ্গার। মন্থরা দেখিয়াই নয়ন মন্থর হইয়া গেল, সমগ্র সৌন্দর্য ভোগ করিবার জন্য দৃষ্টি আর চিত্রকরের কল্পনালোকে কুচ্ করিতে পারিল না। যত পারো, গালি দাও. সত্য কথা বলিতে ছাড়িব না, —এ চিত্র কল্পনার অপমান, অত্যন্ত জঘন্য।

'ভিন্নরুচির্হি লোকাঃ'। হ্যাভেলের অঙ্কুশে ও ইঙ্গিতে যাঁহাদের গম্ভীরবেদিনী অতি স্থূল রুচি —করেণু নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়, তাঁহারাই চিত্রজগতের এই 'নাপ্নি' খোসমেজাজে বহাল-তবীয়তে পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে ভোগদখল করিতে থাকুন।' —কিন্তু মজার কথা এই, যার বিরুদ্ধে সমাজপতি মহাশয়ের মূল অভিযান সেই 'মন্থরা' নন্দলালের আঁকা নয়। —সে কথা আমরা আগে বলেছি।

নন্দলালের প্রখ্যাত ছবি 'মহাদেবের তাণ্ডব নৃত্যে'র প্রিণ্ট্ ১৩১৬ সালের বৈশাখ সংখ্যার প্রবাসীতে বের হয়েছিল। আর আষাঢ় মাসের 'সাহিত্য'-পত্রিকায় তার সমালোচনা বের হলো এই ভাবেঃ 'বৈশাখে শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর অঙ্কিত 'মহাদেবের তাণ্ডব নৃত্য' নামক একখানি সুরঞ্জিত চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। মহাদেব তাণ্ডবনৃত্য করিতেছেন, অথবা হাড়গিলের মত এক পায়ে দাঁড়াইয়া আছেন তা বুঝিতে পারিলাম না। ভারতীয় চিত্রকলাপদ্ধতির অমোঘ নিয়মে মহাদেবের আল্‌তামাখা পদতল একটু দীর্ঘ বলিয়াই মনে হয়। আর লতানে অঙ্গুলী —চম্পক নয়, যেন লাউডগাগুলি ত্রিশূল দণ্ডে জড়াইয়া আছে। মহাদেবের শ্মশ্রু নাই, গুম্ফ নাই। ভারতীয় চিত্রকলাপদ্ধতির অনুরোধে চিত্রকর বসুজা নরসুন্দর হইয়া মহাদেবের সেই মান্ধাতার আমলের দাড়ি গোঁফ কামাইয়া দিয়াছেন। সৌভাগ্যক্রমে মাথার কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ মুণ্ডন করিয়া দেন নাই। এই স্বর্ণ-বর্ণ, কোমল কুঞ্চিত চিকুর বোধকরি জটার কল্পনা। কালানল শিখা ও ভগ্নস্তূপের কল্পনা মনোজ্ঞ হইয়াছে। পৌরাণিক বর্ণনার অনুশীলন ও

কোনও অংশে হীন নহে। ভারতীয় চিত্রকলার অনুশাসনে আঙ্গুল ও পা অস্বাভাবিক ও অতিরিক্ত লম্বা করা হয়। 'এনাটমি'র বিরুদ্ধে হইলেই যে কোনও চিত্র ভারতীয় চিত্রশালার যাদুঘরের যোগ্য হয়। যে 'স্বাধীন কল্পনায়' মহাদেব হাড়গিলে, জগন্মাতা পার্বতী লালসাময়ী নারী ও মানুষের হাত পা যোজনবিস্তৃত বিকারে পরিণত হয়, তাহার কল্পনা অভিধানের যোগ্য নহে। 'ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতি' অনুসারে চিত্রিত চিত্রগুলি স্বভাবের এত বিরুদ্ধ ও 'লতানে' কেন হয় তাহাও আমরা বুঝিতে পারি নাই' —(প্রবাসী ১৩১৭ পৃ, ২৮৩)।

সমাজপতি মহাশয়ের মতে, —'চিত্র ও সাহিত্য সত্যমূলক, সার্বভৌমিক। তাহা দেশ-কালের ক্রীতদাস হইতে পারে না। অতিরঞ্জন সকল আর্টের কলঙ্ক।' তাঁর ধারণা ছিল, ভারতবর্ষের আর্ট ভারতের নিজস্ব বা আদি ও অকৃত্রিম নয়। বিবর্তে পৃথিবীর পরিবর্তন হয়, সুতরাং ভারতের চিত্রও পরিবর্তনশীল। তিনি স্বকীয়তার গোঁড়ামি মানতেন না। কিন্তু সমাজপতি মহাশয় আধুনিক চিত্রপদ্ধতি সম্পর্কে পরে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির কিছু পরিবর্তন করেছিলেন।

অজন্তা-চিত্রের নব্য অনুকরণকে তিনি বলতেন, —'তথাকথিত ভারতীয় চিত্রকলা-পদ্ধতির উপাসক নকলনবীশগণের চিত্রে গোঁড়ামি।' কালীঘাটের পটও ছিল সমাজপতি মহাশয়ের বিদ্রূপের বস্তু। তাতে 'দেশীয় চিরন্তন সংস্কার এবং রুচির অভিব্যক্তি' থাকলেও, তাঁর মতে, কালীঘাটের পট মহাচিত্র হতে পারে না কখনও।

১৩১৯ সালের চৈত্র-সংখ্যার 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত অবনীবাবুর 'পুষ্পরাধা' চিত্রের বিরুদ্ধে সমালোচনা করেছিলেন সমাজপতি মহাশয় ১৩২০ সালের বৈশাখ সংখ্যার 'সাহিত্যে'। অবনীবাবুর 'কাজরী' ছবিখানি বের হয়েছিল ১৩২৪ সালের কার্তিক সংখ্যা 'ভারতী'-পত্রিকাতে। অগ্রাণ মাসের 'সাহিত্যে' এ-চিত্রও সমাজপতি মহাশয়ের বিদ্রূপবর্ষণে কলঙ্কিত হয়েছিল। অবনীবাবুর 'হোলী' চিত্রখানি প্রকাশিত হয়েছিল ১৩২৬ সালের ফাল্গুন সংখ্যার 'প্রবাসী'তে। চৈত্র সংখ্যার 'সাহিত্যে' সমাজপতি মহাশয় সমালোচনায় কিছু কৃপাবারি বর্ষণ করে-

ছিলেন। চিত্রখানির প্রশংসা করে তিনি লিখেছিলেন —'ক্রমে ফুলে ফুলে মধু আসে, আমরা নিরাশ হইব না।'

উভয় পক্ষ বিচার করে আমার মনে হয়, সমাজপতি মহাশয় বিচারে খুব বেশি ভুল করতেন না। নব্যভারত-চিত্রকলার প্রতি আমাদের যতই স্নেহ থাক, তার শাস্ত্রীয় আদর্শচ্যুতি, অস্বাভাবিকতা, মাত্রাতিরিক্ত ভাবালুতা, অতিপ্রাকৃত অভিব্যক্তি, প্রকৃতির সঙ্গে বৈশাদৃশ্য, অসম অন্তর্মুখিনতা অস্বীকার করার উপায় নাই। নব্যভারত-কলাকারদের মুখপাত্র শ্রীনন্দলাল মুখ্যতঃ ভারতশিল্পী হলেও তাঁর শিল্পকর্ম পুরাপুরি শাস্ত্ররীতির অনুকরণ বা অনুসরণ নয়। এবং যে বিদেশী ও প্রগতিশীল পরিবেশে তাঁর শিক্ষাদীক্ষা, সেখানে ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রের পঠনপাঠন থাকলেও, কর্মক্ষেত্রে শিল্পিগণ 'স্বাধীন' চিত্র 'নির্ভয়ে' রচনা করতেই বিশেষভাবে উৎসাহ পেতেন। মৌলিক 'ক্যারেক্‌টর' গড়নেই থাকতো তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ। ফলে বলা বাহুল্য প্রতিভার উৎকর্ষের তারতম্যে তাঁদের সকলের সকল সৃষ্টিই প্রথম শ্রেণীর হতো না। নানা দোষ-ত্রুটি থাকতো অনেকের রচনাতেই। এমন-কি প্রবাসী, মডার্ণ রিভিউও নির্বিচারে নব্য চিত্রকলার প্রশস্তি গেয়ে প্রচার করেননি। কাজেই উগ্র রক্ষণশীল সমাজসেবী সমালোচকের রুচিতে এই সকল ত্রুটিবিচ্যুতি বিশেষভাবেই আঘাত করতো। এর চেয়ে বরং তিনি খাঁটি বিলিতী ছবি বা তার অনুকরণ ভালো বলে, যামিনীপ্রকাশ গাঙ্গুলীর রীতি পছন্দ করতেন। সুতরাং সমাজপতি মহাশয়ের শাণিত লেখনীর সিধে খোঁচায় তাঁর অভিমান মধ্যে মধ্যে প্রচণ্ডভাবেই বিস্ফোরিত হতো। —এতে তাঁকে তেমন দোষ দেওয়া যায় না কিছুতেই। উপরন্তু, তিনি অনেক সময় লেখার জন্যেই লিখতেন; সে-কথা তিনি নন্দলালের নিকট অকপটে স্বীকার করেছিলেন। তাঁর আত্মমর্যাদা আর অর্থাগমের চিন্তাও এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল শেষের দিকে।

॥ প্রাচ্য-চিত্রকলার ষষ্ঠ প্রদর্শনী, ১৯১৩ ॥

'ভারতী', 'প্রবাসী', 'মডার্ণ রিভিউ', 'সাহিত্য' ছাড়া অন্য পত্র-পত্রিকাও সেকালে নব্যচিত্রকলা নিয়ে মাথা ঘামাতেন। এবং এর গুণাগুণ বিচার করতেন প্রায় যথাযথভাবে। সেকালের এই রকম একটি পত্রিকা হচ্ছে 'গৃহস্থ'। 'গৃহস্থ'-পত্রের স্বত্বাধিকারী ছিলেন রামরাখাল ঘোষ। ইনি 'ইণ্ডিয়া প্রেস'-এরও মালিক ছিলেন। কলকাতার ২৪ নং মিডিল রোড, ইটালী থেকে 'গৃহস্থ' বের হতো। এই পত্রিকার বিশেষত্ব ছিল তার 'আলোচনা'-অংশ। সেকালের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী মনীষীদের রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে মাসে মাসে এই পত্রিকাখানি আত্মপ্রকাশ করতো। স্বদেশের উন্নতি-চিন্তায় সে-সব রচনা ছিল ভরপুর। এ ছাড়া গৃহস্থের গ্রাহকগণ দু'পয়সার টিকিট পাঠালে, চল্লিশখানা 'স্বদেশী পোস্টকার্ড' বিনামূল্যে পেতেন।

যে উদ্দেশ্যে 'গৃহস্থ' আত্মপ্রকাশ করেছিল সে হলো এই: 'মাতৃভাষার সাহায্যে সকল বিষয়েই এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণীতেও শিক্ষাদান করিতে হইবে। এজন্য ভারতবর্ষের প্রাদেশিক সাহিত্যগুলিকে অল্পকালের মধ্যে পরিপুষ্ট ও সর্বতোমুখী করিয়া তুলিতে হইবে। এতদুদ্দেশ্যে কতিপয় যোগ্য লেখক, অধ্যাপক, অনুবাদককে সাহিত্য-সেবায় অনন্যকর্মা হইয়া জীবন অতিবাহিত করাইতে হইবে। এই সাহিত্যসেবিগণের অন্নচিন্তা দূর করিবার জন্য সাহিত্যক্ষেত্রে 'সংরক্ষণনীতি' (Policy of Protection) প্রতিষ্ঠা দ্বারা তাঁহাদিগকে উপযুক্ত মাসিক অর্থ সাহায্য করিতে হইবে।'

'গৃহস্থ' ছিল বঙ্কিম-ভূদেবের আদর্শপুষ্ট। একটি প্রচ্ছদে ভূদেবের উদ্ধৃতি রয়েছে: 'ভারতবাসী 'জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায়' বলিতেছেন। তিনি সে মহাবাক্য কখনই ভুলিবেন না —পরজাতি-বিদ্বেষ এবং পরজাতি-পীড়ন তাঁহার স্বজাতিবাৎসল্যের অঙ্গীভূত হইবে না। প্রত্যুত পৃথিবীর অপর সকল জাতি তাঁহার নিকটে জ্ঞান এবং প্রীতির ঐ মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইবে। কিন্তু সম্প্রতি তিনি অপর একটি মন্ত্রেরও উচ্চারণ করিবেন —জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।'

'গৃহস্থ'-পত্রের 'আলোচনা'-বিভাগ সেকালে শুধু চিত্র-সমালোচনা করেই কর্তব্য সারেননি। সেকালের সমাজের অবস্থা পর্যালোচনা করেছেন দরদী দৃষ্টি দিয়ে, শিল্পীর শিল্প-প্রতিভার মান নিরূপণ করেছেন নির্ভীকভাবে। চিত্রপ্রদর্শনীর সার্থকতা নির্ধারণ করেছেন নিখুঁতভাবে; ভারতীয় চিত্রকলার আদর্শ উপস্থাপন করেছেন গভীর-তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে। 'সাহিত্য-পত্রে'র সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের মতো এঁরা মহা আরামে নাশকতামূলক মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হননি। কিন্তু নব্য-প্রাচ্য-চিত্রকলাকে সগৌরবে বাঙ্গালী-গৃহস্থের ঘরে ঘরে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পূতনতচিত্তে গঠনমূলক আদর্শচিন্তা করেছেন; আর সেই চিন্তা বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে সঞ্চালিত করতে আন্তরিক প্রযত্ন করে গেছেন। প্রাচ্য-চিত্রকলার ১৯১২-১৩ সালের চিত্রপ্রদর্শনী সম্পর্কে ১৩২০ সালের বৈশাখ সংখ্যার (পৃষ্ঠা ৩২০-২৮) 'গৃহস্থ' পত্রিকা যা লিখেছিলেন তাঁদের ভাষাতেই শুনুন।—

'আমাদের শিল্প নষ্ট হইয়াছে, বাণিজ্য নষ্ট হইয়াছে, ব্যবসায় নষ্ট হইয়াছে। আমরা সকল প্রকার কলাবিদ্যা ভুলিয়াছি। আজকাল আমাদের ধন নাই. ঐশ্বর্য নাই, সুখ নাই, সম্পদ নাই। এখন জীবন নিরানন্দময়, সংসার অন্ধকারময়। সমাজে সঙ্গীতের আদর নাই —শিল্প-নৈপুণ্যের প্রতি শ্রদ্ধা নাই। কারুকার্য এখন অবহেলার সামগ্রী হইয়াছে। লেখা-পড়া কেবলমাত্র পুঁথি মুখস্থ করায় পর্যবসতি হইয়াছে। ক্রীড়া-কৌতুক, আমোদ-প্রমোদ, উল্লাস-উচ্ছ্বাস —এই সকল জীবনবত্তার লক্ষণগুলি দেশ হইতে নির্বাসিত হইয়াছে। ভারতের সরস্বতী এখন মলিন ও শীর্ণকায়। বাগদেবীর অঙ্গে কোন আভরণ নাই —বীণাপাণির বীণায় ঝঙ্কার নাই। সঙ্গীত ও সাহিত্যের জননী এখন সঙ্গীতহীনা।

সুখের কথা —নানা দিক হইতে আমাদের এই সর্বতোমুখী অবসাদ দূর করিবার আয়োজন চলিতেছে। আমাদের স্বাধীন চিন্তা নানা দিক দিয়া কাটিয়া বাহির হইতে আরম্ভ করিয়াছে। আমাদের জাতীয় জীবন নানা ধারায় প্রবাহিত হইয়া নানা উপায়ে জন্মভূমিকে সুশ্রী ও সহাস্যবদনা করিতেছে। গত ফাল্গুন মাসের কলিকাতার ধর্ম-সমবায় কোম্পানী-নির্মিত হিন্দুস্থান-বীমা সমিতির বিশাল ভবনে অনুষ্ঠিত প্রাচ্য-

চিত্রকলার প্রদর্শনী দেখিয়া আমাদের মনে আশার উদ্রেক হইয়াছে। আমাদের জীবনী-শক্তির প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছে। আমাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ হইবার কারণ ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে।

এই প্রদর্শনীতে সর্বসমেত আঠার জন চিত্রকরের কার্য প্রদর্শিত হইয়াছিল। কয়েকজন নতুন লোকের নাম দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। বুঝা গেল চিত্রবিদ্যা আমাদের সমাজে ক্রমশঃ প্রসার লাভ করিতেছে। নবীন শিল্পিগণকে এই প্রদর্শনীতে স্থান দিয়া অনুষ্ঠাতারা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন। কয়েকটি চিত্র সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে।

শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ দে বাঙ্গালীর জিনিসগুলি ও হিন্দুর সুপরিচিত সামগ্রী লইয়া চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। তাঁহার 'তুলসী গাছ'টি সকল হিন্দুর মনেই ধর্মভাব জাগরিত করিবে। তুলসী-মঞ্চের চারিদিকে একটা ভক্তি ও শ্রদ্ধা যেন মাখান আছে, ইহাতে তরুণ শিল্পীর প্রতিভা কথঞ্চিৎ প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ করের 'বাল্মীকির তপস্যা' এবং 'ননিচোরা' হিন্দু ইতিহাসের দুইটি চিত্র আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কোন বিশেষত্ব নাই —কবিত্বের কোন পরিচয় পাইলাম না। তবে বাল্মীকির ধ্যানস্তিমিত লোচন দুইটি অতি সুন্দর হইয়াছে। 'ননিচোরা' চিত্রে বাঙ্গালী শিশুগণ প্রীত হইবে —একটু স্বাভাবিকতা আছে। কর মহাশয়ের 'সরস্বতী' সকলেরই মন মুগ্ধ করিবে। এরূপ 'কুন্দেন্দুধবলার' চিত্র বোধ হয় আর কখনও কেহ দেখে নাই। কিন্তু ফুলগুলি আকাশে কেন ঝুলিতেছে? শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আদর্শ রাধিকা'-কল্পনাটি বৈষ্ণব-সাহিত্য হইতে গৃহীত। শিল্পীর রচনাও আদৃত হইবার যোগ্য। কিন্তু তাঁহার 'প্রথম দর্শন' চিত্রে রমণীর পাশবালিশের মত পাগুলি অতি কদাকার হইয়াছে। যে কোনো দর্শকের মনেই বীভৎস রসের সঞ্চার হইবে। বঙ্গীয় নাট্যমঞ্চের নক্সা করিয়া ঠাকুর মহাশয় কতকগুলি চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। এইগুলি দেখিয়া সকলেই প্রীত হইবেন —নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।

নন্দলালের প্রতিভা

সুনিপুণ নন্দলালের 'গোকাল-ব্রত' চিত্রটি অতি মনোরম হইয়াছে। কি বিষয়-নির্বাচন, কি সূক্ষ্ম ভাবপ্রকাশ, কি চিত্রিত বিষয়ের অন্তরে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা —সকল দিক্ হইতেই এই অঙ্কনটি অতি উচ্চ শ্রেণীর কারুকার্য হইয়াছে। বঙ্গের গ্রাম্য জীবনে হিন্দুর পারিবারিক কার্যকলাপের মধ্যে গোকাল-ব্রত অনুষ্ঠানটিই কবিত্বময় —হৃদয়ের প্রসার-বর্দ্ধক। বৈশাখ মাসে হিন্দু বালিকারা দূর্বা-চন্দন দ্বারা গরুর পূজা করিয়া থাকে। একটি বালিকা হাতে পূজার সামগ্রী ধরিয়া গরুর সম্মুখে বসিয়া আছে, গরুর চুঁ মারিবার ভয়ে বালিকা ভীত হইতেছে —অথচ বসিয়াই আছে। এই বিষয় লইয়া কবি চিত্রে যে সূক্ষ্ম ভাবটি প্রকাশ করিয়াছেন তাহা দেখিয়া আমরা মোহিত হইয়াছি। বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে এই চিত্রের নকল চিত্র বিরাজ করুক। দেশের জাতীয় অনুষ্ঠানগুলি নবজীবন লাভ করিবে —সন্তান-সন্ততিরা চিত্রে জাতীয় জীবন আস্বাদন করিতে শিখিবে।

নন্দলালের 'রামায়ণী চিত্রগুলি' এবারও প্রদর্শিত হইয়াছিল। এইগুলি আমাদের জাতীয় সম্পদ। কবি আমাদের ধর্ম ও সমাজের প্রধান প্রধান স্মরণীয় ঘটনাগুলিকে হিন্দুর আদর্শে চিত্রিত করিয়া সমগ্র জাতিকে ঋণে আবদ্ধ করিলেন। তিনি অবতার রামচন্দ্রের চরিত্র প্রত্যেকটি চিত্রে অতিশয় নৈপুণ্যের সহিত ফুটাইতে সমর্থ হইয়াছেন। বীরবর, ত্যাগিশ্রেষ্ঠ, নবযুগের প্রবর্তক রামচন্দ্র হিন্দুচিত্রকরের ভক্তিপূর্ণ চিত্তে সত্য সত্যই প্রতিবিম্বিত হইয়াছেন। চিত্রকরের ধ্যান করিবার ক্ষমতা আছে, আধ্যাত্মিক বিষয় বুঝিবার প্রবৃত্তি আছে, আধ্যাত্মিক ভাব ফুটাইবার শক্তি আছে, হিন্দুর জাতীয় ইতিহাসে তাঁহার দখল আছে। আমাদের জাতীয় জীবনের প্রারম্ভকালে নন্দলালের অভ্যুদয়ে সাতিশয় আনন্দলাভ করিয়াছি।

অতুলকৃষ্ণের কালীমূর্তি

তারপর শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ মিত্রের 'কালীমূর্তি'। 'গোকাল-ব্রত' এবং 'কালী' —এই দুইটি চিত্রই এবারকার প্রদর্শনীতে সর্বোচ্চ স্থান পাইবার যোগ্য। অতুলকৃষ্ণের চিত্রে ভয়ঙ্করা কালীর তাণ্ডবনৃত্যে সমগ্র মেদিনী যেন কাঁপিতেছে। চিত্র দেখিয়াই মনে হয়, বিশ্ব ভরিয়া আলোড়ন হইতেছে —ত্রিভুবনের মধ্যে এক বিরাট শক্তির কার্য চলিতেছে। এইরূপ ভাব মনে জাগান যে সে শিল্পীর সাধ্য নয়। মূর্তিটির পশ্চাৎ ভাগে এক অসীম শূন্য বিরাজমান। তাহাতে গাম্ভীর্য বাড়িয়াছে, চিত্তে অপরূপ ভাবুকতার সঞ্চার হইতেছে। কালীমূর্তি অনেক দেখিয়াছি —কিন্তু এরূপ সংহারকর্ত্রীর চিত্র এই প্রথম দেখিলাম। ভয়ঙ্কর-রসে কবির হাত আছে। কঠোরতর সৌন্দর্য, কষ্টের মাধুরী, শ্মশানের নিবিড় আনন্দ, বিনাশের অমৃত —চিত্রকর আস্বাদ করিয়াছেন। তাঁহার চিত্রে দর্শকেরাও প্রলয়ের অনন্ত সুখ উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

অতুলকৃষ্ণের 'কালীয়-দমন' চিত্রেও ভয়ঙ্কর রসেরই অবতারণা হইয়াছে বটে। কিন্তু তিনি সুষ্ঠুরূপে তেজস্বিতা ও শক্তির ক্রিয়া ফুটাইতে পারেন নাই।

যাহা হউক অতুলকৃষ্ণ যে সকল বিষয়ে হাত দিয়াছেন তাহা দেখিয়া আশা হয়। মামুলি প্রেমের জগৎ, হা-হুতাশের জগৎ ছাড়াইয়া আমরা দিন দিন কত দূরে সরিয়া আসিতেছি —সাহিত্যে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। চিত্রেও তাহার প্রমাণ পাইয়া বুক আশায় ভরিয়া গেল।

আমাদের জাতীয় জীবনে গাম্ভীর্য আসিয়াছে। বিশ্বের গূঢ় তত্ত্বগুলি এবং জগতের সমস্যাসমূহ গভীরভাবে বুঝিবার জন্য আমাদের প্রয়াস হইতেছে। ব্রহ্মচর্য, ত্যাগ-স্বীকার, কঠোরতা, নির্ভীকতা. বৈরাগ্য. সাধনা, ভক্তি —এই সকল ভাব লইয়া আমরা কাব্যরচনা করিতেছি, সাহিত্য সৃষ্টি করিতেছি, চিত্র আঁকিতেছি, মূর্তি গড়িতেছি। বাঙ্গালী বাজে কথায় —ফাঁকা আওয়াজে —নিরর্থক বাক্‌বিতণ্ডায় সময় ব্যয় করিবে না, ইহাই তাহার পরিচয় ও পূর্বাভাষ।

চিত্র-সমালোচনা

শ্রীযুক্ত মুকুলচন্দ্র দে মহাশয়ের 'পলাতক' চিত্রে ভয়বিহ্বল বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির অবস্থা অতি সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার আরও চারি পাঁচটি রচনা প্রদর্শিত হইয়াছে—সকলগুলিতে ভাব প্রকাশ করিবার প্রয়াস আছে, কিন্তু সফলতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে 'জন্মাষ্টমী' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত দুর্গেশচন্দ্র সিংহের 'সান্ধ্যমেঘ' চিত্রণে নৈপুণ্য আছে। তাঁহার 'শিবপূজায়' সৌন্দর্য আছে, কিন্তু পূজার স্থান-নির্বাচনটি তত সুবিধাজনক হয় নাই। তাঁহার 'ভগ্ন মুকুর' চিত্রে কোন বিশেষত্ব নাই। ইনি নানা বিষয়ে হাত দিয়াছেন।—কোন্ বিষয়ে ঠেকিবেন বুঝা যাইতেছে না। কোন দিকেই সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষ দেখিলাম না। তবে হাতের সাফাই আছে, রং ফলাইবার ক্ষমতা আছে। তিনি বাহ্য সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারেন, কিন্তু মানবচিত্তের নিগূঢ় চিন্তারাশি লইয়া তাঁহার খেলিবার শক্তি নাই।

শ্রীযুক্ত বেঙ্কটাপ্পা মান্দ্রাজী চিত্রকর। তাঁহার কেবল একটিমাত্র রচনা প্রদর্শিত হইয়াছে। রামচন্দ্র নিদ্রিত, ধরিত্রী রামচন্দ্রকে পাদুকা উপহার দিতেছেন—সীতা তাহা গ্রহণ করিতেছেন। এই চিত্রে রামচন্দ্রের বৈরাগ্য ও অনাসক্তি বেশ ফুটিয়াছে, কিন্তু রমণীদ্বয়ের অঙ্কনে কবি বিশেষত্ব দেখাইতে পারেন নাই। তবে সীতা দেবীর ভক্তিভাবে উপহার-গ্রহণ বেশ চিত্রিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনারায়ণ দত্তের 'তারা মূর্তিতে' রং ফলাইবার ক্ষমতা দেখিলাম—চণ্ডী দেবীর ঈষৎ আভাষ পাওয়া যায়। কিন্তু অতুলকৃষ্ণের 'কালী'র কাছে এই 'তারামূর্তি' নিষ্প্রভ।

শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর কয়েকটি চিত্র পাঠাইয়াছেন। কোন কোন বাঙ্গালা কবিতাকে চিত্রে ফুটাইবার প্রয়াস দেখিতে পাইলাম। কিন্তু চিত্রগুলি দেখিয়া কোন রসবোধ হয় না! কয়েকটি চিত্রের নীচে কবিতার দুই এক পংক্তি লেখা আছে, তাহাতেও

চিত্র বুঝিবার বিশেষ সাহায্য পাওয়া যায় না। 'সান্ধ্যপ্রদীপ' চিত্রটি ভালই বুঝা যায়, কিন্তু বুঝাইবার জন্য চিত্রকর যে কবিতাটি উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার সার্থকতা পাই না। আর একটি চিত্র অঙ্কন করিয়া ঠাকুর মহাশয় একজন ডাকওয়ালার গানকে স্থায়ী আকারে ধরিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে কবির মনোভাব প্রকাশিত হইয়াছে। দুইটি লোক নির্জন পার্বত্য দেশের পথ বাহিয়া চলিতেছে —চারিদিকে সুদূরবিস্তৃত প্রান্তর। এই দুইটি পথিকের পশ্চাদ্ভাগ জনপ্রাণীশূন্য —আড়ম্বরশূন্য —বিশাল ও বিস্তীর্ণ। এই ব্যাক্‌গ্রাউণ্ডের প্রভাবে অনন্তের পথে যাত্রা —কোন এক দূর জগতের বার্তা —কোন অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রতি আকাঙ্ক্ষা সুন্দরভাবে প্রকাশিত হইতেছে। দর্শক মাত্রেই ব্যাখ্যা ব্যতীত পথিকদ্বয়ের এই অনুসন্ধানের প্রয়াস বুঝিতে পারিবেন। 'পাণ্ডবগণের পলায়নে' বিশেষ কিছু পাইলাম না। তবে পলায়নের অবস্থাটা মন্দ চিত্রিত হয় নাই। মুকুলচন্দ্রের 'পলাতকে'ও আমরা এই শক্তি দেখিয়াছি।

শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদারের 'যমুনা-জলে'-চিত্রে নয়ন রঞ্জনই হয় না। তবে তাঁহার 'রোগী' এবং 'গোপিনী' এই দুইটি চিত্রে মানুষের বিভিন্ন অবস্থা জীবন্তরূপে ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা দেখা যায়। বিহারী চিত্রকর শ্রীযুক্ত রামেশ্বর প্রসাদের 'রাগিণী মেঘমল্লার' চিত্রে মৌলিকতা নাই —কিন্তু কারুকার্যটি মন্দ হয় নাই। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদারের সাতটি চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার আলোচ্য জগৎ এখনও অতি বিস্তীর্ণ —কোন এক বিষয়ের জন্য সাধনা করিলে সফলকাম হইতে পারিবেন আশা করা যায়। তাঁহার 'হরপার্বতী' না ধরাই উচিত ছিল। প্রায় চিত্রেই তথাকথিত ভারতীয় চিত্রকলার বিসদৃশ অঙ্গুলি এবং অঙ্গের সৌষ্ঠবহীনতা বর্তমান। আমরা অন্যান্য যে সকল চরিত্রের কবিত্ব উপভোগ করিয়াছি, তাহার মধ্যে এইরূপ অস্বাভাবিকতা বা বৈসাদৃশ্যের প্রভাব পাই নাই।

আর একজন বিহারী শিল্পী শ্রীযুক্ত নারায়ণ প্রসাদ কয়েকটি চিত্র দিয়াছেন। তাঁহার 'হরগৌরী' অতি সুন্দর হইয়াছে। গৌরীর কোলে গণেশ শুইয়া আছে। গৌরীর চক্ষু মুদ্রিত, গণেশের চোখ খোলা। গণেশের শয়ন চিত্র অতিশব মনোহারী হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হাকিম খাঁ মহাশয়ের দুইটি চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। দুইটিই অত্যধিক মূল্যে বিক্রয় হইবে। কিন্তু কোনটিরই বিশেষত্ব খুঁজিয়া পাইলাম না। একটি চিত্রে দিল্লীর রাস্তা দিয়া বন্দী দারাকে লইয়া যাওয়া হইতেছে। প্রকাণ্ড দুর্গের একেবারে নিকটে দারার হাতী আসিয়া উপস্থিত। তাহাতে বিষয়টা বুঝিবার পক্ষে যথেষ্ট অন্তরায় ঘটিয়াছে। এই দুইটি পদার্থ ব্যতীত আর কোন জন-প্রাণী চিত্রের মধ্যে আছে কিনা দেখিবার অসুবিধা হইতেছে —তাহাদের অস্তিত্বের কোন প্রভাব চিত্রের উপর পড়িতে পায় না। বিশাল অট্টালিকা ও বিশাল হস্তী —এই দুই বৃহৎ চিত্রের চাপে পড়িয়া চক্ষুও নির্যাতিত হইতেছে, চিত্তের দুয়ারও অবরুদ্ধ হইয়া যাইতেছে। তাহার উপর, চিত্রকর দারার মানসিক অবস্থা বুঝাইবার কোন প্রয়াস পান নাই।

অর্ধেন্দ্রকুমারের মৌলিকতা

শ্রীযুক্ত অর্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী এবার কালী-মূর্তিতে হাত দিয়াছেন। তিনি শাস্ত্র-বচনের সঙ্গে মিলাইয়া চিত্র আঁকিয়াছেন। ধ্যানগুলি বুঝিবার জন্য তাঁহার যত্ন আছে —হিন্দুশাস্ত্র আলোচনা করিয়া তিনি চিত্রে ধর্মতত্ত্বগুলি ফুটাইতে প্রয়াসী হইয়াছেন। তাঁহার পন্থা অনুসরণ না করিলে হিন্দুর আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিতে কোন চিত্রকর সমর্থ হইবেন না। যে সকল কবি ও শিল্পী হিন্দুর দেবদেবী লইয়া ব্যাপৃত আছেন তাঁহাদের আর গতি নাই। অলীক ও মনগড়া ভাবুকতার দ্বারা হিন্দুর জাতীয় ধর্মের বিন্যাসগুলি খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। গাঙ্গুলী মহাশয় চিত্রবিদ্যার সঙ্গে শাস্ত্রচর্চা যোগ করিয়াছেন দেখিয়া আশার উদ্রেক হয়।

তাঁহার চিত্রাঙ্কনেও ক্ষমতা দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। গত বৎসরে প্রদর্শিত তাঁহার 'চৈতন্য' আমাদের মনে আছে। এবারকার

কালীমূর্তিটিও প্রদর্শনীর একটি বিশেষত্ব। তিনি অতুলকৃষ্ণের ন্যায় সমগ্র বিশ্বে প্রলয়ের সঙ্গীত ও নৃত্য দেখাইতে প্রয়াসী হন নাই। তাঁহার উদ্দেশ্য কালীর আকৃতিগত স্বরূপটি প্রতিষ্ঠিত করা। তিনি এ বিষয়ে অনেকটা কৃতকার্য হইয়াছেন। অতুলকৃষ্ণের চিত্রে পারিপার্শ্বিক পরিকল্পনার মধ্যে কালীর সংহার-মূর্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। অর্ধেন্দ্রকুমার কালীর বিকট মূর্তিরই আরাধনা করিয়াছেন—জগতের অন্যান্য পদার্থের সঙ্গে কালীর যোগ রাখেন নাই। অতুলকৃষ্ণে ধ্বংসের ছবি—প্রলয়ের চিত্র দেখিতে পাই। অর্ধেন্দ্রকুমারে কালীর ব্যক্তিগত রূপ, স্বকীয় বিশেষত্বই প্রকটিত হইয়াছে। তিনি যে ধ্যানটিকে মূর্তি দিয়েছেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

'কালী কপালাভরণা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী
বিচিত্রা খট্বাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা।
অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনাভীষণা।
নিমগ্না রক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্‌মুখা'॥

এই বিবরণের বিকট মূর্তিটি অর্ধেন্দ্রকুমারের চিত্রে অতি দক্ষতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে। সাধারণ দৃষ্টিতে এই 'সাঁওতালী' কালী অতি কদাকার ও বিশ্রী বোধ হইবে। কিন্তু যিনি ভাবুক তিনি বুঝিবেন ইহার মধ্যে সুষমা আছে। কবি এই রাক্ষসী মূর্তির মধ্যে যে সৌন্দর্য ঢালিয়াছেন তাহা বর্ণনাতীত। সকলকেই তাঁহার স্বাধীনচিন্তা ও মৌলিকতার প্রশংসা করিতে হইবে। 'অতিবিস্তারবদনা'র লাবণ্য প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়া তিনি আমাদের চিত্রকর-জগতে নূতন কলার খনি—অভিনব সৌন্দর্যের আকর আবিষ্কার করিয়া দিলেন। তাঁহার কৃতকার্যতায় মামুলি সৌষ্ঠবের পথ ছাড়িয়া বিভীষিকার গরিমা দেখাইতে অনেক শিল্পীই অগ্রসর হইবেন। ভারতীয় কলার ইতিহাসে অর্ধেন্দ্রকুমার একটা নূতন অধ্যায় খুলিবার সূত্রপাত করিলেন।

চিত্র-প্রদর্শনীর সার্থকতা

এবারকার প্রদর্শিত চিত্রগুলি দেখিতে দেখিতে কয়েকটা সাধারণ কথা মনে আসিয়াছে।

প্রথমতঃ, বঙ্গে বিদ্যার জগতে —কলার সংসারে —সাহিত্যক্ষেত্রে পরানুবাদ ও পরানুকরণ ক্রমশঃ কমিয়া অসিতেছে। স্বাধীনভাবে নিজস্ব দান করিবার জন্য শিল্পী, কবি, লেখক, চিত্রকর নিজ নিজ হাতিয়ার ধরিয়াছেন। সকল দিকে ব্যক্তিত্ব, মৌলিকতা, স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীন চিন্তা আধিপত্য লাভ করিতেছে। দ্বিতীয়তঃ, বাঙ্গালীরা বাঙ্গালার নদ-নদী, জীব-জন্তু, উৎসব-আমোদ সম্বন্ধেই চিত্র আঁকিতেছেন, গান গাহিতেছেন, কাব্য লিখিতেছেন। বঙ্গে ভারতবর্ষের সামগ্রীগুলি —হিন্দুর ঐতিহাসিক ঘটনা সকল এবং জাতীয় জীবনের বিচিত্র অনুষ্ঠানসমূহ —শিল্প, কলা ও সাহিত্যের আলোচ্য বিষয় হইতেছে। চিত্রের ভিতর দিয়া, কাব্যের ভিতর দিয়া আমরা আমাদের স্বদেশকে চিনিতে আরম্ভ করিয়াছি —স্বসমাজকে প্রতিষ্ঠিত করিতে শিখিতেছি। তৃতীয়তঃ, এই সকল শিল্পকলা অবলম্বন করিয়া আমরা ভারতের বিশেষত্বসমূহ আমাদের জাতীয় জীবনের স্বতন্ত্র আদর্শগুলি —আমাদের ইতিহাসগত পার্থক্যই প্রকাশিত করিতেছি। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব, আধুনিক ইউরোপীয় জীবনের আদর্শ, বিদেশীয় জাতীয়তার আধিপত্য আমরা ক্রমশঃ ছাড়াইয়া উঠিতেছি। আমাদের চিত্রে, সাহিত্যে, নানাবিধ কলার অনুষ্ঠানে, হিন্দুত্ব —হিন্দুজীবনের সনাতন আদর্শ —ভারতবাসীর স্বাভাবিক লক্ষ্য ফুটিয়া উঠিতেছে। আদর্শের দাসত্ব —লক্ষ্যের দাসত্ব —সাধনার দাসত্ব পরিত্যাগ করিয়া আমরা আমাদের স্বধর্ম খুঁজিতে আরম্ভ করিয়াছি। আমাদের ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের যে লক্ষ্য —আমাদের পুরাতত্ত্ব-সংগ্রহের যে উদ্দেশ্য —সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যই আমাদের চিত্রকরেরা তুলি, রং ও পেন্সিলের সাহায্যে সাধারণের গোচর করিতেছেন।

চতুর্থতঃ, বিদেশীয় কলা-জগতে সৌন্দর্য প্রকাশ করিবার যে সকল রীতি আছে, তাহাও আমাদের শিল্পিগণ আয়ত্ত করিতে পারিয়াছেন। পারশ্য কবিদিগের রং ফলাইবার ক্ষমতা, আমাদের চিত্রকরগণ নিজস্ব করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। পুরাতন মোগল শিল্পীদিগের নিকট আমাদের

চিত্রকরেরা বাস্তব জগতের বিবিধ বস্তু অতি স্পষ্ট ও বিশদরূপে চিত্রিত করিবার দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিতেছেন। আধুনিক জাপানীরা কলাজগতে এক অভিনব সৌন্দর্যের, অতি সূক্ষ্ম সুষমার অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহাদের হাত-সাফাই ও সহজ সুলভ ভাব প্রকাশের ক্ষমতাও আমাদের চিত্রজগতে প্রভাব বিস্তার করিতেছে। এতদ্ব্যতীত, ইউরোপীয় রোমান্ ক্যাথলিক-যুগের ধর্মপ্রাণ ভাবুক কবিগণ চিত্রে ও কারুকার্যে এক আধ্যাত্মিকতা, ধর্ম-প্রবণতা ফুটাইয়াছিলেন। আমাদের শিল্পীরা এই আধ্যাত্মিক ভাব ফুটাইবার ক্ষমতা লাভ করিতেছেন। চিত্তের নিগূঢ় রহস্যগুলি উদ্ঘাটন করিবার যোগ্যতা আমাদের কলাজগতে আধিপত্য লাভ করিতেছে। সুতরাং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কলাজগতের শ্রেষ্ঠ টেকনিক্গুলি আমাদের নিজস্ব হইয়া যাইতেছে। অতীত ও বর্তমান যুগের শিল্পচাতুর্যসমূহ এবং সৌন্দর্য ফলাইবার কায়দা সকল আমাদের বঙ্গীয় চিত্রজগতে স্থান পাইতেছে। বিদেশের নিকট, অতীতের নিকট যাহা যাহা গ্রহণীয়, সকলেই আমরা উদারভাবে গ্রহণ করিতে শিখিতেছি। এই উপায়ে আকৃতির লাবণ্যে নজর পড়িতেছে, বাহ্য সৌষ্ঠব পুষ্ট হইতেছে, কলা-নৈপুণ্য বাড়িতেছে। ফলতঃ আমাদের সুকুমার শিল্পগুলি সম্পদ লাভ করিতেছে। জাতীয় কলা ঐশ্বর্যশালী হইতেছে।

অতএব দেখা গেল যতগুলি উপকরণ থাকিলে স্বতন্ত্র জাতীয় সভ্যতার বিশেষত্ব পুরিপুষ্ট হয়, সকলগুলিই বঙ্গীয় কলাজগতে আসিয়া জুটিয়াছে। গত ছয় বৎসর ধরিয়া প্রাচ্য শিল্পের প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইতেছে। প্রদর্শনীগুলি উত্তরোত্তর আমাদের এই ধারণাই বদ্ধমূল করিতেছে।

ভারতীয় চিত্রকলার আদর্শ

আমরা বলিলাম জাতীয় উন্নতির সর্ববিধ উপাদান আমাদের চিত্র-জগতে সংগৃহীত হইয়াছে। এই সময়ে আমাদের জীবনের লক্ষ্য, ভারতীয় সভ্যতার আদর্শ, আমাদের জাতীয়তার মূলমন্ত্রগুলি আরও গভীরভাবে আলোচনা করা আবশ্যক। আমাদের শিল্পিগণকে ভারতীয় সাহিত্য, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, শিল্পশাস্ত্র বিশেষরূপে শিখাইবার আয়োজন করা

কর্তব্য। হিন্দুত্ব বুঝিবার জন্য যথোচিত আয়াস স্বীকার আবশ্যক, সাধনা আবশ্যক। আধুনিক পাশ্চাত্য জগতে কাব্য, সাহিত্য ও দর্শন-বাদের অভ্যন্তরে কিছু ভাবুকতা প্রবিষ্ট হইয়াছে। সেই ভাবুকতায় কথঞ্চিৎ তরলীকৃত হিন্দুত্বের আভাষ পাওয়া যায়, উপনিষৎ-বেদান্তের ক্ষীণ উপদেশ শুনা যায়। সেইটুকু কোন মতে আওড়াতে পারিলেই হিন্দুর মূলমন্ত্র বুঝিতে পারা যাইবে না। কারলাইল, এমার্সন, টলস্টয় প্রভৃতি পাশ্চাত্য ঋষিবর্গকে ছাড়িতে হইবে। তাহার পরিবর্তে স্বদেশের আবহাওয়ায় সে সকল মহাত্মা আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাঁহাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত হইতে হইবে। কেবল তাহাই নহে, এই আবহাওয়ায় যে সকল আচার-ব্যবহার, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, রীতিনীতি পরিপুষ্ট হইয়াছে তাহাও বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে। তাহার জন্য কষ্ট কল্পনা প্রয়োজন —সে শিক্ষা আমাদিগকে গ্রহণ করিতেই হইবে —সে সাধনায় আমাদিগকে ব্রতী হইতেই হইবে।

তাহা না করিলে অনধিকার-চর্চার দোষে পদে পদে বিব্রত হইতে হইবে। মনে রাখিবেন —যে কোন উপায়ে বাস্তব জগতের অপদার্থতা, অসম্পূর্ণতা ও নশ্বরতা প্রমাণ করিলেই হিন্দুসভ্যতা প্রকাশ করা হইল না। মনে রাখিবেন, ইহ সংসারকে হীন দেখাইলেই আধ্যাত্মিকতা প্রমাণিত হইল না। মনে রাখিবেন, হিন্দুর শিল্পশাস্ত্রে মাপ জোকের খুঁটিনাটি বড় কম ছিল না। মনে রাখিবেন, হিন্দুর নীতিশাস্ত্রে দেবদেবীর মূর্তি-গঠন বিষয়ে সামান্য মাত্র নিয়মভঙ্গের কঠোর প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা ছিল। মনে রাখিবেন, এখনও নগণ্য পল্লীগ্রামের সামান্য রমণীরাও জানেন যে, মূর্তিগুলিকে বিকৃতভাবে গড়িলে শিল্পীর ও গৃহস্থের প্রতি আরাধ্য দেবদেবীগণ অসন্তুস্ট হন। মনে রাখিবেন, অঙ্গের সৌষ্ঠব নস্ট করিলেই, শরীরকে ক্ষীণ ও অবসন্নভাবে আঁকিলেই ধর্মপ্রাণতা, ভাবুকতা ব্যক্ত করা হইল না। মনে রাখিবেন, হিন্দুর বিচারে —'শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্'। মনে রাখিবেন, হিন্দু বিষয়কর্মে উদাসীন ছিলেন না, সংসারকে, বাস্তবজগৎকে, সমাজরক্ষাকে অবহেলা করেন নাই, পরিবার পালনকে, গৃহস্থ-ধর্মকে উপেক্ষা করেন নাই। মনে রাখিবেন, হিন্দু ইন্দ্রিয়ের জগৎকে বিনষ্ট করেন

নাই —তাহার উপর অতীন্দ্রিয়ের ছাপ মারিয়াছিলেন, হিন্দু ভোগকে বর্জন করিতেন না, —ত্যাগের আকাঙ্ক্ষা দ্বারা, অনাসক্তির দ্বারা, ভোগবাসনাকে শান্ত সংযত নিয়ন্ত্রিত করিতেন। হিন্দুর বিধানে মানব-জীবনের সকল অভিব্যক্তিই —পার্থিব সকল অনুষ্ঠানই —যথাযথ রক্ষিত হইয়াছে। এই জন্য হিন্দুর বৈরাগ্য, হিন্দুর আধ্যাত্মিকতা, হিন্দুর পরকালবাদ অলীক ধারণামাত্র ছিল না —হাওয়ায় হাওয়ায় ঘুরিয়া বেড়াইত না। পরন্তু সংসারের কার্যকলাপসমূহই ধর্মভাবের দ্বারা অনুরঞ্জিত হইত, ভোগের অনুষ্ঠানগুলিই আধ্যাত্মিকতায় প্রতিষ্ঠিত হইত, সমাজের সর্ববিধ প্রতিষ্ঠানই বৈরাগ্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইত। ইহার ফলে হিন্দুর ভাবুকতা, হিন্দুর সন্ন্যাস ব্রহ্মচর্যে, গার্হস্থ্যে, রাষ্ট্রে, শিল্পে, পল্লীজীবনে, সকলের অভ্যন্তরেই স্বকীয় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কার্যতঃ সকল ক্ষেত্রে সন্ন্যাস ও সংসারের সমন্বয়, ত্যাগ ও ভোগের সামঞ্জস্য বিধান, অতীন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের সন্ধিস্থাপন, ইহাই হিন্দুর সনাতন সাধনা। তাই হিন্দুর আদর্শ-কবি কালিদাস হিন্দুর আদর্শ-গৃহস্থ নরপতির জীবন চিত্রিত করিয়াছেন ঃ—

জুগোপাত্মানমত্রস্তো ভেজে ধর্মমনাতুরঃ।
অগৃধ্নুরাদদে সোঽর্থমসক্তঃ সুখমন্বভূৎ ॥

তিনি আত্মরক্ষা করিতেন —কিন্তু ভয়ের জন্য নয় ; তিনি ধর্মের নিয়ম পালন করিতেন —কিন্তু অনুতাপের বশে নয় ; তিনি ধন গ্রহণ করিতেন —কিন্তু লোভের প্রভাবে নয় ; তিনি সুখ ভোগ করিতেন —কিন্তু আসক্তির জন্য নয়।

সুতরাং হিন্দুর সনাতন আদর্শে —আত্মরক্ষা, ধর্মের নিয়মপালন ও সুখভোগ সকলেরই যথানির্দিষ্ট স্থান আছে। এই সকল জাগতিক, সাংসারিক ও বৈষয়িক কার্যাবলী হিন্দুর বিচারে গর্হিত ও নিন্দনীয় নহে।

সুখের বিষয় —হিন্দুর এই বৈষয়িক ও রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের দিকে, হিন্দু সভ্যতার সাংসারিক অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতি আধুনিক শিক্ষিত বাঙ্গালীর দৃষ্টি পড়িয়াছে। পণ্ডিতেরা হিন্দুর নীতি-শাস্ত্র, শিল্পশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র ইত্যাদি সর্ববিধ সমাজশাস্ত্র মন্থন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল হিন্দুর পদার্থবিজ্ঞানের আবিষ্কার-গুলি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় হিন্দুর রাসায়নিক

জ্ঞান সাধারণের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় হিন্দুর সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বাহির করিয়াছেন। এই উপায়ে হিন্দুর জাতীয় ইতিহাস ও অতীত গৌরব-কথার আলোচনায় বৈষয়িক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের চিত্র পরিস্ফুট হইতেছে। এই নবযুগের ইতিহাসালোচনায় বহু নূতন তথ্য আবিস্কৃত হইয়াছে। সেই সমুদয় তত্ত্ব আমাদের শিল্পে ও চিত্রকলায় ধীরে ধীরে ছড়াইয়া পড়িতেছে। নীতিশাস্ত্র ও মূর্তিতত্ত্ব অনুসারে শিল্পিগণ স্বকীয় কারুকার্য নিয়ন্ত্রিত করিতে প্রয়াসী হইতেছেন। তাহার নমুনা এবার চিত্রপ্রদর্শনীতে দেখিয়াছি। চিত্রকরেরা বাস্তব জগৎকে আর উপেক্ষা করিতেছেন না। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ শরীরের সৌষ্ঠবকে ক্রমশঃ কম অগ্রাহ্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহাদের ক্রমশঃ বিশ্বাস জন্মিতেছে যে বাহ্য আকৃতির লাবণ্য ভুলিলেই অন্তঃসৌন্দর্য প্রকটিত হয় না। শারীরিক ও বৈষয়িক লক্ষণগুলির প্রতি দৃষ্টি না দিলে ভারতীয় কলাজগতের সম্যক্ উন্নতি হইবে না।'

॥ **সপ্তম চিত্র-প্রদর্শনী, প্যারিস, ফেব্রুয়ারী, ১৯১৪** ॥

মাদ্‌মোয়াজেল অাঁদ্রে কাপ্লে'র একটি প্রবন্ধে আমরা ফরাসীদের রাজধানী প্যারী নগরীর গ্রাঁপালে প্রাসাদে আয়োজিত নব্য-ভারতীয় চিত্র-কলা-প্রদর্শনীর একটি মনোজ্ঞ বিবরণ পাই। য়ুরোপে সর্বপ্রথম এই প্রদর্শনীর ব্যবস্থা। ইংরেজ বা বেলজিয়ানদের আগেই ফরাসীরা এই প্রদর্শনী দেখার সুযোগ লাভ করেন। এই প্রদর্শনীতে অবনীন্দ্রনাথ আর তাঁর শিষ্যবর্গের অঙ্কিত চিত্রকলা বিশেষভাবে প্রদর্শিত হয়। ফরাসী কলারসজ্ঞেরা এই চিত্রশিল্পী-সম্প্রদায়কে 'একোল ডি ক্যালক্যাটা' অর্থাৎ 'কলিকাতার চিত্রকলা-সমাজ' নাম দিয়েছিলেন। তাঁদের আশা ছিল, এ নাম তার বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে সমর্থ হবে। নবজাগ্রত ভারতের পক্ষে বিশেষ গৌরবের কথা যে, জনকয়েক আগ্রহী বঙ্গীয় কলাবিৎ এক-সঙ্গে মিলে স্বদেশের প্রাচীন কলাশিল্পের পুনরুদ্বোধনের জন্যে আত্মোৎসর্গে ব্রতী হয়েছেন। ইংরেজ ভারত অধিকার করার পর থেকে পাশ্চাত্য চিত্রকলার

প্রভাবে ভারতে এক দোআঁসলা প্রাণহীন মিথ্যা চিত্রকলার আবির্ভাব ঘটে। আর্টস্কুলের চিত্রাবলী তার সাক্ষী। এই দলের চিত্রকরেরা য়ুরোপের অতি সাধারণ নিম্নস্তরের চিত্রকলা থেকে আদর্শ গ্রহণ করতে শিক্ষা পেয়ে থাকেন।

অজন্তার অমর ফ্রেস্কো-চিত্র, রাজপুত ও মোগল আমলের সুচারু চিত্রাবলীর স্মৃতি, পাশ্চাত্য-কলা-পদ্ধতির মোহে ভারতীয়দের মন থেকে প্রায় মুছে গিয়েছিল। ভারতের শান্তরসাস্পদ দৈনন্দিন জীবনস্রোতে যে চিরন্তন কাব্য-প্রবাহ বয়ে চলেছে, সে হলো ভাব বা আদর্শের অনন্ত উৎস, সে-কথা ভারতশিল্পীরা ভুলে গিয়ে, ঘৃণা আর তাচ্ছিল্যভরে এই অনাদি উৎসকে অগ্রাহ্য করে, বিলিতী অসার চিত্রাবলীকে আদর্শ খাড়া করে তারই অনুকরণ করছিলেন।

যথাসময়ে জনকয়েক মহাপ্রাণ শিল্পীর চেষ্টায় এই স্রোতের মোড় ঘুরে গেল। এই চেষ্টার প্রথম প্রবর্তক ই. বি. হ্যাভেল। ১৯০৮ সালের ১৫ই জুলাই তারিখের 'Studio' পত্রিকায় তিনি এই বিষয়ের বিবরণ লিখেছিলেন। কিন্তু নব্যভারতীয়েরা হ্যাভেল সাহেবকে প্রথম দিকে সাহায্য করেননি বা উৎসাহও দেননি। বাঙ্গালার অবনীন্দ্রনাথ সেই সংস্কার এড়িয়ে হ্যাভেলের সঙ্গে মিলে ভারতশিল্পের প্রাণ-প্রতিষ্ঠায় প্রধান পুরোহিত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে জনকয়েক উৎসাহী যুবক শিল্পী অবনীন্দ্রনাথকে গুরুবরণ করে তাঁরই প্রতিভার আলোর সাহায্যে হ্যাভেলদর্শিত পথে অন্তর্হিতা কলাদেবীর অনুসন্ধানে অগ্রসর হয়েছিলেন। এইভাবে ভারতের কলাশিল্পের নবজাগরণ-যুগ সূচিত হলো এবং এই চেষ্টার প্রথম ফল হলো 'কলকাতার কলাসমাজ'।

প্যারী প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত ভারতচিত্রকলা পাশ্চাত্য জগতে কেবল নতুন কলাতত্ত্ব উদ্ঘাটিত করেনি, আর একটি বিষয়ে পাশ্চাত্য দেশকে অভিভূত করেছিল। যে-সব য়ুরোপীয় ভারতবর্ষে কখনও আসেননি তাঁরা এই বঙ্গীয় নব্যকলাবিদদের চিত্রপ্রদর্শনী দেখে, ভারতের আসল জীবনের বা ভাব-ভাবনা-সংস্কার-প্রবাহের বিচিত্র নিখুঁত চিত্র

পেয়েছিলেন —এঁদের আঁকা চিত্রাবলীতে।

১৯১৪ সালের আগে বঙ্গীয় কলাসমাজে কতটা অগ্রগতি হয়েছিল ফরাসীরা তা জানতেন না। ১৯১৪ সালের পর থেকে যে সব নতুন চিত্রকর ও চিত্রাবলীর উদ্ভব হয়েছে তার পরিচয়ও ওঁরা পাননি। 'Modern Review'-এ প্রকাশিত এ্যাল্‌বামের সাহায্যে ওঁরা যা-কিছু জানতেন। মৌলিক চিত্রগুলির প্রতিলিপি দেখে য়ুরোপের মনে হয়েছিল, অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যদল গুরুভক্তিবশতঃ জ্ঞানে বা অজ্ঞানে তাঁর নিজস্ব অঙ্কন-পদ্ধতি অনুকরণ করতেই সমুৎসুক। ফরাসী দেশে Cezanne, Rodin, Eugener Carriere প্রমুখ শিল্পীদের শিষ্যগণের এই রকম অনুকরণ প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে উঠেছিল। ওঁদের ধারণা, Carriere আর অবনীন্দ্রনাথ এক পর্যায়ের শিল্পী। শিষ্যের পক্ষে প্রতিভাবান্ গুরুর পদ্ধতি অনুকরণ প্রশংসনীয় ; তবে শিষ্যদের চিত্রাবলীতে গুরুর শিল্পকলার ব্যঞ্জনা-প্রকাশ সকল সময়ে সম্ভব হয় না। ফলে, ভাবের স্বচ্ছতার বদলে সে হয়ে ওঠে ভাবুকতার ফেনায় ভরা। এ-দোষ সম্ভবতঃ পূর্বগামী পাশ্চাত্য প্রভাবের অজ্ঞাত আমেজ। ঠাকুরশিষ্যগণ আঁকার বিষয়ের বস্তুগত সত্তার প্রতি যত্নশীল না-থেকে, কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক ভাবকেই রূপদানে ব্যস্ত। লেখিকার মতে, ভারতের জাতীয় জীবনের সঙ্কটকালে নব্যদের মধ্যে এতটা ভাবুকতার প্রশ্রয় ভালো নয়। তা'ছাড়া, তাঁদের চিত্রকলায় স্বানুবর্তিতা নাই। গুরুর প্রবর্তিত পন্থা বা পদ্ধতিকে নিজের ভাব ব্যক্ত করবার সময়ে নতুনভাবে একটু ঘুরিয়ে, কলা-রীতিকে বদলিয়ে নেবার মতো সাহস বা শক্তি তাঁদের তখনও দেখা দেয়নি। এ-দোষটা তাঁদের গুরুর নাই ; ভারতের প্রাচীন বিশিষ্ট কলাবিদদেরও ছিল না। তবে একটা নতুন শিল্প-প্রচেষ্টার শৈশবে আরব্ধ পন্থা থেকে স্বতন্ত্রভাবে স্বাধীন পন্থা আবিষ্কার করে 'আইডিয়্যাল' ও 'রিয়েল' উভয়ের মাঝামাঝি পথ বা রীতি খাড়া কর অত্যন্ত কঠিন।

কলকাতার নব্যকলা-সমাজের প্রধান কীর্তি হচ্ছে, উচ্চদরের চিত্রশিক্ষা জন্যে ইংলণ্ডের অনুকরণের মোহত্যাগ। দ্বিতীয় কীর্তি, তাঁরা স্বদেশবাসী চোখ খুলে দেখিয়েছেন যে, অতীত ভারতের কলাশিল্প এক মহনীয় বস্

এবং তার আলোচনা ও অনুশীলন দেশবাসীর প্রধান কর্তব্য। বঙ্গীয় নব্যশিল্পীদের আর্টশিক্ষার ব্যাপারে পাশ্চাত্য দেশের শিল্পীদের চেয়ে সুযোগ বেশি। এখানে উন্মুক্তগাত্র মানুষ আর তার গতিভঙ্গি পথে-ঘাটেই পাওয়া যায়; তার জন্যে ভাড়াটে 'মডেল' আনা অনাবশ্যক। এদেশের নরনারীর চলা-ফেরার মধ্যে মনোরম কাব্যগন্ধ আছে যা পাশ্চাত্যে নাই। কলকাতার কলা-সমাজের মধ্যে তখনও কোনো ভাস্কর দেখা দেননি। অথচ, মহাবলীপুর, ইলোরা, এলিফ্যাণ্টা, সাঁচী থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় ভারতের ভাস্কর্য-বিদ্যা কতো উন্নত ছিল। তবে, তখন নব্যবঙ্গ-কলা-সমাজের সূচনামাত্র। তখনও ফ্রেস্কো বা প্রাচীর-চিত্রাঙ্কন-বিদ্যার চর্চার শুরু হয়নি। কিন্তু এমন হওয়া উচিত, গৌরবে যা অজন্তার প্রাচীন চিত্র-সম্পদের সমান হবে। মৌলিক রং আবিষ্কার করে তাঁরা তার ব্যবহারে অর্থাৎ বর্ণ-বিন্যাস-কৌশলে চিত্রগুলিকে চিত্তরঞ্জক করে তুলতে শিখবেন। এই ধরনের শোভন কলা বা decorative art কাশী আর উদয়পুরের প্রাসাদ-প্রাচীরে আছে।

বঙ্গীয়-নব্যকলাবিদদের অনেক সুবিধে রয়েছে। সেইজন্যে তাঁরা বাস্তব বা ভাবাত্মক কলা-সৃষ্টিতে বিরাটত্বের ব্যঞ্জনা ফোটাতে পারবেন। প্রাকৃতিক অবস্থার আনুকূল্যে আর ঠাকুরগুরুর অঙ্কনপদ্ধতির প্রভাবে ও সাহায্যের গুণে এ সম্ভবপর হবে। ঠাকুরশিল্পীর নিজের অাঁকা ছবির আদর্শে উপদেশে আর কলাসাহিত্য-রচনার মাধ্যমে তাঁর শিষ্যদের মধ্যে যে শিল্পানুরাগ ও নতুন নতুন সৃষ্টিপ্রচেষ্টার প্রবাহ এনে দিচ্ছে তা নিষ্ফল হতে পারে না।

প্যারী-প্রদর্শনীতে অবনীন্দ্রনাথের যে-সব ছবি দেখানো হয়েছিল সেগুলি খুবই প্রশংসা পায়। যেমন (১) শেষযাত্রা (২) কেশ-প্রসাধন (৩) পুরীর সমুদ্রবক্ষে ঝটিকা (৪) রবীন্দ্রনাথের ও কুমারস্বামীর প্রতিকৃতি চিত্র। এই প্রদর্শনীতে নন্দলালের চার পাঁচখানি আর সুরেন গাঙ্গুলীর একখানি ছবি পাঠানো হয়েছিল। শ্রীনন্দলালের অাঁকা 'যুধিষ্ঠিরের মহাপ্রস্থান', 'রাম-জননী কৌশল্যা', 'সমুদ্রতীরে শয়ান রামচন্দ্র', 'জতুগৃহ দাহ' ঐ সময় ওদেশে বিশেষ প্রশংসা লাভ করে।

ঠাকুরশিল্পীর সাহায্যে নব্যবঙ্গের কলাবিৎ শিষ্যদল শীঘ্রই বর্তমান ভারতশিল্পকে প্রাচীন গৌরবময় রাজপুত ও কাঙড়া সম্প্রদায়ের সমশ্রেণীতে তুলতে পারবেন —সে আশা তাঁরা করেছিলেন। এর সঙ্গে শোভন কলা আর জনরঞ্জক চিত্রবিদ্যার (Decorative and Popular art) একটি নতুন শাখা সংযোজিত হয়েছিল। অবনীন্দ্রনাথ দেশের প্রাচীন আলপনা-বিদ্যারও প্রচলন করেছিলেন।

গৌরী মা॥ 'ইনি ছিলেন ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিদুষী, সন্ন্যাসিনী শিষ্যা —গৌরদাসী, গৌরীপুরী বা গৌরী মা। তাঁর স্কুল ছিল। সেখানে আমার কন্যা শ্রীগৌরীদেবীকে (জন্ম ১৯০৭) দু'চার দিন নিয়ে গেসলেন গৌরী মা। গৌরী মা আমাকে বললেন, —তোমার মেয়েকে আমার স্কুলে নিয়ে যাই'। তখন গৌরীর বয়েস ছয় সাত। ওর শরীর খারাপ থাকতো প্রায়ই। কিছু খেতে চাইতো না। কৃমি হতো পেটে। 'মুসুর দাল ভিজেনো জল খেতে দাও ওকে' —একদিন বললেন গৌরী মা। রাত্রে দাল 'ভিজিয়ে রেখে সকালে জলটা খাওয়ানো হতো। গৌরী মা গৌরীকে নিয়ে যেতেন পাঁজাকোলা করে। 'ভালো মেয়ে, দাও আমাকে' —বলেছিলেন গৌরী মা। আরও বলতেন তিনি, —'ওর খুব ভালো হবে'। আমরা মায়ার বশে ওখানে দিতে পারিনি শেষ পর্যন্ত। উনি আসতেন আমাদের হাতীবাগানের বাড়িতে। তেজঃপুঞ্জ খুব লম্বা চওড়া চেহারা ছিল গৌরী মায়ের। মহিমবাবু বলতেন, —'তেজী মেয়ে'।

'একবার গৌরী মা পুরী না কটকের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন। পিছনে ম্যাজিস্ট্রেট্ টম্‌টম্ হাঁকিয়ে আসছেন। কোচ্‌ম্যান্ হাঁক দিচ্ছে, —'হট্ যাও, হট্ যাও'। তখন ইংরেজীতে বললেন গৌরী মা, —'ওয়েট্, আই উইল মার্চ বাই টাইম'। শুনে, ম্যাজিস্ট্রেট্ ভড়কে গেলেন।

'শ্রীশ্রীঠাকুর মারা যাবার পরে, গৌরী মা অনেক জায়গায় গিয়ে তপস্যা করেছিলেন। শেষ অনুভূতি হলো —সাক্ষীগোপালের। কৃষ্ণকে ডাকলেন। আসেন না। নূপুরে বালি ঢুকে গেছে, দেখলেন কাছে গিয়ে। সাক্ষীগোপাল গিয়ে গৌরী মার ঈশ্বরানুভূতি হলো। ওঁকে আমি প্রায়ই দেখতুম।

'বেলুড় মঠে উৎসবে গৌরীমা লেকচার দিতেন। বক্তৃতা দিতেন ইংরেজীতে, সংস্কৃতে, বাঙ্গালায়। বৈষ্ণব-শাস্ত্র ছিল তাঁর মুখস্থ।

নিজে গৌরদাসীকে খাতির করতেন। বৃন্দাবনে গিয়ে গৌরী মা চিঠি দিতেন আমাকে।

'গৌরী মায়ের দেহান্ত হবার পরে, তাঁর স্কুলের শিক্ষয়িত্রী শান্তিনিকেতনে আমার কাছে মাঝে মাঝে আসতেন। আমাকে খুব শ্রদ্ধা করতেন তিনি। আমাদের শান্তিনিকেতন-আশ্রম দেখতে আসতেন। অনেক মেয়েকে ওঁদের ওখানে বেদ-উপনিষৎ পড়ানো হয়, আর ট্রেনিং দেওয়া হয় সন্ন্যাসিনী-জীবনের। আমি মাঝে মাঝে টাকাকড়ি পাঠিয়ে দিতুম তাঁর স্কুলের জন্যে।'

॥ অবনীবাবু —আত্মীয় সম্পর্কে ॥

এই প্রসঙ্গে আচার্য শ্রীনন্দলালের নিজের মুখের কথাই বলছি :—

'আর্টস্কুলে অবনীবাবুর সঙ্গে আমার শিক্ষক ছাত্রের বা তার চেয়েও বেশি গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক ছিল। সে নানা খুঁটিনাটি ব্যাপার কিছু কিছু করে সব বলবো। ঘরোয়া সংস্রবে আমি ওঁদের বাড়ির লোকের মতন হয়ে গেলুম। গুরু অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার আত্মীয়-সম্পর্কে কয়েকটি ঘটনা।—

'অবনীবাবু তাঁদের বাড়ির একটি বিয়েতে (১৯০৯) আমাদের হাতীবাগানের বাড়িতে গিয়ে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। অবনীবাবুর সঙ্গে কে কে ছিলেন সে এখন আর আমার মনে নাই। তিনি নেমন্তন্নর চিঠি দিলেন না। বাড়িতে এসে মুখে বললেন। ঐ সময়ে একটা ঘটনা হলো। —তখন 'দোহন' ছবি আমার আঁকা হয়ে গেছে। ঐ ছবিটা দেখেই অবনীবাবু বললেন,—'খামে ভরতি করে দাও।' পকেটে পুরলেন। বললেন, 'আমি যে ঘটনা দেখেছিলুম সেটা আমি আর আঁকতে পারবো না'। কিন্তু, আমি সেটা অবনীবাবুরই মুখ থেকে শোনা ঘটনা নিয়ে করেছিলুম।—

—'অবনীবাবু মুঙ্গেরে 'পীর পাহাড়ে' ছিলেন একবার। তখন তিনি পাহাড়ের নিচে আশে-পাশে ঘুরে বেড়াতেন। একদিন তিনি গোয়ালাদের একটি গ্রামের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন, এমন সময় একজন গোয়ালা গো'ল ঘরে সকালবেলা ধোঁয়া দিয়ে গাই দুইছে। তখন হেমন্তকাল। হেমন্তের

সকালের ধোঁয়া সোজা আকাশে ওঠে না। কুণ্ডলী বেঁধে ওপরে ঘোরে। অবনীবাবু গো'ল ঘরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে দুধ দোওয়ার শব্দ শুনছেন। গোয়ালী দুধ দুইছে —চ্যাঁক-চোঁক শব্দ শুনে তিনি তা বুঝতে পারলেন। কল্পনার ক্ষেত্রে শিল্পীর কাছে দেখা আর অ-দেখার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই। শিল্পী ইচ্ছে করলে দুই রাজ্যেই থাকতে পারে। আবার ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান —তিন কালেও থাকতে পারে। মোদ্দা কথা হচ্ছে, কল্পনার দ্বারাই শিল্পীর দিব্যদৃষ্টি লাভ হয়।

—'যাই হোক, ঐ ঘটনা ছবির মতন দেখে, ঐ রকম একটি ছবি আঁকবেন বলে অবনীবাবু যখন কল্পনা করছেন —তখনই গল্পটি তিনি বললেন আমাকে। আর এই গল্পটি ধরেই আমি 'দোহন' ছবিটি এঁকে ফেললুম! আমি কিন্তু আঁকবার সময়ে মনে মনে সেকালের গোয়ালিনী সুজাতাকে যেন দেখে এঁকেছি। সুজাতা দুইছেন, আমি দেখলুম ভেতর থেকে। ছবি আঁকলুম 'দোহন'। আমার এই 'দোহন' ছবিটিরই পরে নাম হলো —'সুজাতা'।

'ছবি আঁকা বা কবিতা লেখার আগে নিজের কল্পনার কথা কারুর কাছে বলতে নাই। তাতে শিল্পসৃষ্টি করার শক্তি নষ্ট হয়ে যায়। গর্ভস্রাব হয়ে যাওয়ার মতো দুর্ঘটনা এটা। বা, যেমন জন্মাবার আগে ভ্রূণকে দেখবার চেষ্টা। অবনীবাবু বললেন, —'আমার আর ছেলে হবে না'। অর্থাৎ ওঁর কল্পনাশক্তি হারিয়ে গেল। —এই 'সুজাতা' —সম্পর্কেই তিনি বললেন, ছবিটা পকেটে পুরে।

'ঐ রকম আর একটি এঁকেছি parallel বা সদৃশ ঘটনা নিয়ে। —সে আর-এক ধরনের ঘটনা। গরু হারিয়ে যাবার ছবি। সেটা প্রফুল্লনাথ ঠাকুর নিয়েছিলেন। সে ঘটনাটা এই রকম : খড়্গপুরে থাকতে আমি একদিন সন্ধ্যেবেলায় বনের ধার দিয়ে যাচ্ছি। আর বনের ভেতরে একটা গরু হারিয়ে গেছে। পথ-ভোলা গরু। রাখাল চেঁচাচ্ছে, মানে হাঁক দিয়ে ডাকছে। আর গরুটাও 'হাম্বা' 'হাম্বা' করে সাড়া দিচ্ছে বন থেকে। গরুর গলায় ঘণ্টাটা বাজছে। বাঘের ভয়ে ভীত গরু ঘণ্টা বাজিয়ে বাজিয়ে যেন সাড়া দিচ্ছে।

'গরু তখন আমার চোখে-দেখার বাইরে। কিন্তু আমি যেন

গরুটাকে প্রত্যক্ষ করলুম। গরুকে নিজের চোখে দেখতে পেলুম। যেন গরুটার নিকটে গিয়ে তাকে প্রত্যক্ষ দেখলুম। ছবিটা অাঁকা সেই অবস্থায়। গরু হারিয়ে গেলে কি রকম অবস্থা হয়, তার ভয়, তার ব্যাকুলতা সব যেন চোখে দেখে নিলুম। পরোক্ষে শব্দ শুনে কল্পনায় প্রত্যক্ষ করলুম। পরোক্ষে. যা ছিল অ-দেখা তাকে দেখতে পেলুম। সেই অবস্থায় তার ছবি অাঁকলুম।

'আর একটি ঘটনা। —গুরুদেব যেদিন মারা গেলেন সেই দিনই অবনীবাবু একখানা ছবি অাঁকেন —'ভাসাও তরণী হে কর্ণধার'। এতো তাড়াতাড়ি প্রেরণা এসেছিল তাঁর মনে, জুতোর পিজবোর্ডের বাক্সর ডালার ওপরে ঐ ছবিখানা এঁকে ফেলেছিলেন অবনীবাবু। কাগজ খোঁজবার সময় হয়নি। আমাকে পাঠালেন। বললেন. —'কলাভবনে রেখে দেবে'। প্রথম ছবিখানি কলাভবনে আছে। দ্বিতীয় ছবি যেটা ভালো করে অাঁকলেন সেটা পরে কাগজে ছাপা হয়।

'ঐ সময় আমিও কল্পনা করেছিলুম, গুরুদেবের 'যাবার সময়' ছবি অাঁকবো। অনন্ত সমুদ্রে গুরুদেবকে ভাসিয়ে দেওয়া হচ্ছে —এই রকম কল্পনা করলুম ; যেন ঢেউয়ের মাথায় একটি পদ্মফুল —জনতার ঢেউয়ের ওপর দিয়ে —মাথার ওপর দিয়ে একটি. পদ্মফুল ভেসে যাচ্ছে।

'এক কল্পনা দু'বার ছবিতে করা যায় না। করা গেলেও তার বেগ বা জোর কমে যায়।...

'অবনীবাবু নেমন্তন্ন তো সেদিন করে গেলেন হাতীবাগানের বাড়িতে এসে। গেলুম আমি, শৈলেন, ক্ষিতীন, অসিত —আর সে-সময়ের আর্টস্কুলের ছাত্রেরা অনেকে। এক সঙ্গে গেলুম বরযাত্রী হয়ে। জোড়াসাঁকো থেকে বের হলুম আমরা। ওদিকে বিবাহ হতে লাগলো। খাবার-দাবারও আয়োজন হচ্ছে। সবাই এক জায়গায় বসে আছি। অবনীবাবু দেখতে এলেন —আমরা গেছি কি না। খুব খুশি হলেন আমাদের দেখে।' —'এখেনে বসে আছ, সোফায়, বেশ হয়েছে, এসেছো। আচ্ছা, এখানে বসে থেকে কি করবে, বিয়ের ব্যাপারে

এস্থেটিক্ অনুষ্ঠান হচ্ছে স্ত্রী-আচার ; —সেইটে হলো আর্টিস্টদের দেখার জিনিস। দেখবে এসো।' —এই বলে অবনীবাবু আমাদের সঙ্গে নিয়ে গেলেন। অন্দরের ভেতরে সামনের উঠনে, ভেতরের পর্দা ঠেলে আমাদের ঢুকিয়ে দিলেন। অন্দরের ভেতরে গেলুম আমরা।

'একটু পরে দেখলুম, কন্যেকর্তা এসে বলছেন, 'এরা কারা ?' —'মেয়েদের গাদায় এরা কারা ?' —রঙ্গের মেজাজে দারোয়ান ডেকে হুকুম দিলেন আমাদের বার করে দিতে।

'শৈলেন তখন ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে রাগে। আমরা সবাই তখন বলাবলি করছি, কি করা যায়। 'বাঙ্গালীর রাগ —সে কেবল ভাতের ওপর।' সুতরাং স্থির হলো, খাবার খাবো না।.. খাবার আগেই সবাই চলে যাবো। কিন্তু পাশের কেউ যেন এ-কথাটা শুনলে। সে বসে বসে সে-সময়ের সব ঘটনা দেখেছে আমাদের।

'এদিকে অবনীবাবু আমাদের খুঁজতে এসে দেখেন, আমরা নেই। সেই লোকটি বোধহয় সব ঘটনা বলেছিল তাঁকে। শুনেই অবনীবাবু বললেন, —'বর তোল', 'বিয়ে দেবো না', 'এ বাড়িতে বিয়ে কিছুতেই আর আমি দেবো না'। —'কি হলো' ? —'কি হলো' ? 'তোল বর' —হাঁকছেন অবনীবাবু। হৈ হৈ ব্যাপার।

'তখন ওঁরা হাত জোড় করেন অবনীবাবুর কাছে। অবনীবাবু বললেন, —'যাও, এক্ষুণি ডেকে নিয়ে এসো ওদের। লোক দৌড়লো সঙ্গে সঙ্গে। কাকেও পেলে, কাকেও পেলে না। সকলের কাছেই ক্ষমা চেয়ে আসবে, আদেশ দিয়েছিলেন তিনি। কন্যেকর্তা স্বয়ং প্রত্যেকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ক্ষমা চেয়ে চেয়ে বিবাদ মেটালেন।

'আমি এই অপমান হজম করতে পারতুম। নানা টাইপের বন্ধুদের বিশেষ ব্যগ্রতা দেখে চলে আসতে হলো। পরে আমি ভাবলুম, এটা করে আমি ঠকেছি। কারণ, খাবার ফেলে আসছি। খাবার ছাড়াটাই ঠকা বলে আমার মনে হলো। উপরন্তু, ওদের —আমার সতীর্থদের আত্মীয়তা ছিল না অবনীবাবুর সঙ্গে। কিন্তু, আমার ছিল।

'একজন শিল্পী দিনকতক অবনীবাবুর খুব ভক্ত হয়ে পড়লো।

যেখানে অবনীবাবু আঁকতেন, পায়ের কাছে বসে আঁকতো সে। কাজ দেখাতো। কিছু দিন ধরে এই চলছে। একদিন আমি জোড়াসাঁকো গেছি। ওঁদের সঙ্গে দেখা করতে চাইলে আমি হুট্ করে ভেতরে চলে যেতুম না। চাকরকে দিয়ে খবর দিতুম আগে। হুকুম আসতো, —'ডাকো'। তবে যেতুম।

'একদিন সেই শিল্পীটি অবনীবাবুর বদলে আদেশ দিলেন, —'এখন নয়, পরে'। শুনে অবনীবাবু রেগে চাকরকে বললেন, —'যাও, ডেকে আনো।' 'কেন, কি হয়েছে, ডাকো'। তার ওপর বিরক্ত হয়ে অবনীবাবু আমাকে ডাকতে বললেন।

'একদিন অবনীবাবুর কাছে বসে আছি, বড়ো ভেবে তাঁর এক ছেলে গ্যালারী-ঘরের দরজার কাছ থেকে আমাকে ডাকছেন, —'নন্দ এদিকে এসো।' শুনতে পেয়ে অবনীবাবু বললেন, —'এদিকে এসো!' 'নন্দ কি তোমার বাড়ির চাকর? আর কক্খনো এ রকম বলবে না।'

'আর এক শিল্পী প্রসঙ্গে একটি ঘটনা ঃ তখন তিনি আর্টস্কুলে পড়ছেন, আমি অবনীবাবুর বাড়িতে কাজ করছি আর্টস্কুল শেষ করে। অবনীবাবুর বাড়িতে যেতুম সকাল সন্ধ্যা দু'বেলাতেই। একদিন আমি তখন অবনীবাবুর বাড়িতে আছি; খবর দিলে চাকর ঃ 'একজন বাবু এসেছেন।' 'কি দরকার'? —জিজ্ঞাসা করলেন অবনীবাবু। চাকর বললে, —'ছবি দেখাতে এসেছেন।' সম্ভবতঃ দেবল ওঁকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল। 'যেতে বল, এখন ছবি দেখানো হবে না। পরে দেখাবে।' —বললেন অবনীবাবু। আমাকে গিয়ে দেখতে বললেন —'দেখো কে এসেছে'। আমাকে তাঁর ছবির দোষের কথা বললেন। 'ও খোশামোদ করছে, আমি কি করবো' —বললেন অবনীবাবু।

'এর পরে, সেই শিল্পীটি একদিন হাতীবাগানের বাড়িতে আমার কাছে গেছেন। গিয়ে বললেন, —'আমি Indian Art শিখতে চাই'। তখন তিনি বিলিতী অয়েল পেন্টিং করেন। 'তোমার কাছে শিখবো' বললেন তিনি। সোসাইটীতে গিয়ে শিখতে চাইলেন —আমার কাছে।

পরে, একদিন সত্যিই দেখি না, তিনি সোসাইটীতে আসতে আরম্ভ করেছেন। —কেন এই ইচ্ছে হলো ? নইলে খাতির হয় না, Indian Art না-শিখলে। আর দেখ, এমন অনেক লোক আছে যারা তোমার অস্ত্র দিয়ে তোমাকেই মারবে। আমার প্রসঙ্গে ঐ শিল্পীর ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত কিন্তু গড়িয়েছিল সেই দিকে। সে কথা এখন থাক্।

'বয়সে ছিলেন তিনি আমার একবয়সী। তখন কুমারস্বামী জোড়া-সাঁকোর বাড়িতে আছেন। তিনি হয়তো বিলিতী আর্ট কুমারস্বামীকে দেখাতে যাননি। যাই হোক্, রেগে শিখতে এলেন তিনি। কিন্তু আর্ট রেগে শেখা যায় না। শ্রদ্ধাতেই শিক্ষা হয়। ফলে তাঁর আর্ট উৎকট হলো। পরে তিনি Indian Art করেছেন মডেল পুরাণের থেকে নিয়ে। কিন্তু বিশেষ প্রশংসা পাননি। তবে, কাজিন্‌স্‌সাহেব তাঁর রীতির খুব ভক্ত ছিলেন। দেব দেবীর ছবি তিনি অনেক এঁকেছিলেন।

'একবার জোড়াসাঁকোর দোতলায় দেখা করতে গেছি। অবনীবাবু বললেন, —'একটা বাইসিক্‌ল্ কিনেছি, —আমার দরকার নাই, —তুমি নিয়ে যাও'। আমি বললুম, —'চড়তে জানি না ; নিয়ে কি করবো ; দরকার নাই'। অবনীবাবু পাশের একটি লোককে বললেন, —'দ্যাখো, নিতে চায় না'। অর্থাৎ দরকার না-হলে নেবো না'।

'গৌরীর বিয়েতে। কি রকম হবে। ঠিক্‌ঠাক্ হলো। পাত্রের খুড়ো রায়বাহাদুর। ছেলে এম-এ পড়ছে। ওর শ্বশুর আর্টিস্ট কিশোরীবাবু বলছেন. এতো নগদ টাকা আর গহনা লাগবে। আইটেম্ দিয়েছে — নগদ টাকা সে প্রায় দু'আড়াই হাজার চাই। —কোথায় পাব ? অবনীবাবু আমাকে বারাণ্ডায় ডেকে চেক্ দিয়ে দিলেন।

'পরে যখন দ্বারভাঙ্গায় আমার পিতৃবিয়োগ হয় সে ১৯১৭ সালের কথা। বাবার অসুখ শুনেই আমি দ্বারভাঙ্গায় গেলুম। সেখানে বাবা তো মারা গেলেন। শ্রাদ্ধ করলুম এসে রাজগঞ্জে। অবনীবাবু সাহায্য করেছিলেন। নেমন্তন্ন আমি করেছিলুম তাঁকে যথারীতি। তিনি এসেছিলেন রাজগঞ্জে স্টীমারে করে —নেমন্তন্ন রাখতে। সে এক আশ্চর্য ঘটনা। বললেন তিনি, —'প্রথমে ভেবেছিলুম, যাব না। রাত্রে দেখি কি, স্বপ্নে মা বলছেন, —'ওর বড়ো দুঃসময় ; যাওয়া দরকার তোমার অবন।'

—'তাই এসে গেলুম'। —শ্রাদ্ধের খরচাও দিয়ে গেলেন কিছু।

'গগনবাবু অসুখে যখন শয্যাগত সেই অবস্থায় আমি গেলুম একবার। গগনবাবু কাগজ চাইলেন। ছবি আঁকবেন। একটি বাটিতে ইঙ্ক্ গুলে দিলুম। ছবি আঁকলেন —'হিমালয় পাহাড়'। এঁকে, আঙুল দিয়ে আমাকে দেখিয়ে বললেন, —এ ছবি তোমাকে দিলুম'। রথীবাবু সে ছবিটি চেয়ে নিলেন আমার কাছ থেকে। আর একটি ছবির কথা। —রাজমহলে মানসিংহের দালান থেকে গঙ্গার ধারে মসজিদ দেখা যাচ্ছে —এটা আমি এঁকেছিলুম; সেটাও চেয়ে নিলেন রথীবাবু। কোনও বই-এ ছাপানোর জন্যে যেন চেয়ে নিলেন। আগেরটিতে আমারও একটু ভুল হয়েছিল। গগনবাবু আমাকে দিলেন বলে লিখিয়ে নিই নি। ফলে, গোলে হরিবোল হয়ে গেল। গরীবের এক টাকা ধনীর অনেক টাকার গাদে মিশিয়ে গেল। গগনবাবুর শেষ ছবি —আমার নামে লেখা ছিল না বলে আমার কাছ থেকে চলে গেল। আর একটা পোর্সিলেনের বাটি এল্‌মহার্স্ট্ আমার জন্যে সংগ্রহ করে এনেছিলেন। রথীবাবু নিয়ে নিলেন।

'পীর পাহাড়ে' থাকার সময়ে মুঙ্গেরের ছবি অবনীবাবু অনেকগুলি এঁকেছিলেন। —'বন্য হরিণী'র কয়েকটি ছবি বিলিতী জল-রং-এর পদ্ধতিতে এঁকেছিলেন। আর একটি ছবি আমার মনে আছে, —গঙ্গাঘাটে চাঁদোয়া খাটিয়ে রামলীলা হচ্ছে।

'ওঁদের বাড়িতে পুরাতন আমল থেকে পাল-পার্বণে যে-সব উৎসব-টুৎসব হতো —রাস, দোল, কীর্তন, নৃত্য ইত্যাদি তখনই ওঁদের ছাত্রদের নেমন্তন্ন করতেন। সেই সঙ্গে খ্যাঁটের ব্যবস্থা থাকতো প্রচুর। পারিবারিক বিবাহাদিতেও নেমন্তন্ন থাকতো। আসল কথা, আমাদের হৃদ্যতা হয়েছিল। যখন খেতুম, অবনীবাবু ঘুরে ঘুরে এসে দেখতেন, —'আজে-বাজে জিনিস দিয়ো না ওদের; গরম গরম বেগুন-ভাজা, পটলভাজা আর লুচি দাও' —বলতেন। 'তোমরা কিচ্ছু খেতে পারো না। আমার সময়ে আমি খুব খেতে পারতুম। —এক সময় এক ধামা চপ খেয়েছিলুম একলাই' —একবার বললেন অবনীবাবু। খুব খেতে পারতেন উনি। 'একটা, দুটো করে কি দিচ্ছ,

একেবারে গামলা উল্টে দাও', —ঢালোয়া হুকুম দিতেন তিনি বসে বসে।

'আবার উনি মহর্ষির কাছে যখন বসে খেতেন তখন খুব আথান্তরে পড়তেন। 'মহর্ষি নিজে বসে খাওয়াতেন। কাছেই বসে থাকতেন সোফায়। মহর্ষির তরকারী-খাওয়া —সে এক ভয়ানক ব্যাপার। সমস্ত তরকারী তিনি খুবই মিষ্টি দিয়ে খেতেন। সবশেষে আসতো পায়েস। সে এক জামবাটী ঘন পায়েস। আর স্থির হয়ে তিনি বসে থাকতেন, —খেতেই হবে। সেখানে সে-খাবারের কাছে আমার খাওয়ানো কিছুই নয়। মহর্ষি একাই দিনে দুধ খেতেন সাত সের করে। যেদিন খেতে ডাকতেন, আমাদের হৃৎকম্প হতো' —অবনীবাবু খাওয়াবার সময় গল্প করতে করতে বলতেন এই সব।

'কোনো উৎসব-টুৎসব হলে মহর্ষি এ-বাড়ির ছেলেদের আর ওঁদের বাড়ির সকলকেই ডাকতেন, কি রকম সাজগোছ হয়েছে দেখবার জন্যে। কেতাদুরস্ত সাজগোছের ওপর তাঁর দৃষ্টি ছিল প্রখর। চাপকান, চোস্ত, পাজামা, টুপি আর ধুতি হলে, পাঞ্জাবী চাদর-টাদর চাই। এলোমেলো বেশ, বা ঠিক ঠিক কেতা মতো বেশ না-হলে মহর্ষি খুশি হতেন না'। —বলতেন অবনীবাবু। গুরুদেবের ছিল ঠিক ঐরকম ভাব।

'শিক্ষক আর ছাত্রছাত্রীদের ওপর কড়া নজর রাখতেন অবনীবাবু। কখনও কখনও অত্যন্ত কডা হতেন তিনি। তার অনেক ঘটনা তোমাকে বলেছি। সে-সব লিখো না।

'বিচিত্রা'র 'সাহিত্যচক্রে' অবনীবাবু তাঁর লেখা পড়তেন। বিচিত্রা-সভার হলঘরে রথীবাবু তাঁর বৈজ্ঞানিক মাথা থেকে তামা আর পেতলের তার বসিয়ে দিয়েছিলেন —সেতারের মতন ঝঙ্কার হবে বলে। কতটা হয়েছিল জানি না। পাহাড়, নদীর ওপর লেকচার দিতেন তিনি স্লাইড্ দেখিয়ে।

'জোড়াসাঁকোর বাড়িতে অবনীবাবুরা দক্ষিণের বারাণ্ডায় বসে ছবি আঁকতেন। সেখানে একদিন নিয়ে গেলুম আমার শ্বশুরমশায়কে দেখা করাতে। তিনি দেখা করে বললেন, —'এ তো আপনারই ছেলে।

তবে, ও আট বছর বয়সে আপনার কাছে এসেছিল, —এ-কথা ঠিক নয়'। বাইশ বছর বয়সে আমি গেছি আর্টস্কুলে। আমি বললুম, —'আপনি আপনার লেখাতে এই ভুল করেছেন। শুনে অবনীবাবু বললেন, —'আমি সংশোধন করবো না'। —আমাকে তিনি ছেলের মতন মনে করতেন বলেই এই সংশোধন করতে চাইলেন না। তাঁর কাছে আমি যেন বরাবরই তাঁর ছেলে —সে বাইশেই হোক আর আটেই হোক।

'ওঁদের বাড়ির মেয়েরা নাচ শিখবে, অবনীবাবু তার বিরোধী ছিলেন। উঁচু গলায় মেয়েদের গান শেখারও তিনি বিরোধী ছিলেন। কিন্তু গুরুদেব তাঁর ওসব গোঁড়ামি ভেঙ্গে দেন। শুধু গান আর নাচ নয়, স্টেজে গিয়েও নেচেছিল মেয়েরা। এই নাচ গান নিয়ে তখন তিন ভাইয়ে তুমুল বাগ্‌-বিতণ্ডা হয়েছিল। উপস্থিত ছিলুম আমি। গুরুদেবকে সাপোর্ট্ করছেন গগনবাবু আর সমরবাবু; আর অবনীবাবু একাদিকে একলা। আমি সঙ্কোচের সঙ্গে এই ফ্যামিলি কোয়াল্‌ শুনলুম।

শিবু কীর্তনীয়া ॥ —ওঁদের জমিদারি শিলাইদহ অঞ্চলের লোক। গগনবাবুর আঁকা ছবি আছে। মেটে রঙের, শ্যামবর্ণ, বেঁটে-খাটো মোটাসোঁটা, ভুঁড়িওয়ালা, টাক-পড়া মাথা। সে-মাথায় ফুলের মালা জড়ানো। গলায় তুলসীর কণ্ঠি। কোমরে চাদর বেঁধে, নেচে নেচে কীর্তন করতো শিবু সা —সে এক অপূর্ব দৃশ্য। ঠাকুরবাড়িতে 'গোষ্ঠলীলা' খুব ভালো গাইতো। মাঝে মাঝে মেয়েদের দিক থেকে, চিকের আড়াল থেকে নতুন নতুন ফরমাশ আসতো। দেখতুম শিবুকে, কেউ প্রশংসা করলেই মাথা হেঁট করে মাটিতে প্রণাম করতো।

'**জাভানী নর্তক** ॥ সেই আমি প্রথম জাভার নৃত্য দেখলুম। বিচিত্রা-হলে হয়েছিল।

'দেশের ইলিশ মাছ। ফি বার মরশুমে যখন খুব পড়তো, ওঁদের বাড়ির জন্যে ছ'সাতটা করে টাটকা ইলিশ মাছ জেলেদের মার্ফৎ নিয়ে যেতুম। ওঁরা বকশিশ দিতেন জেলেদের। আর খাওয়াতেন। ওই রকম ইলিশ মাছ আর তপসে মাছ নিয়ে যাওয়া আমার বরাদ্দ ছিল।

'মঠে গণেন মহারাজ, আমাদের গুরুদেব, এ. এন্. মুখার্জী (আমাদের

বাড়ির সামনের হোমিওপ্যাথ ডাক্তার) —ওঁদের সব পাঠাতুম —চল্লিশ-পঞ্চাশটা করে মোট। ওঁরা সে মাছ পেয়ে খুব প্রশংসা করতেন। ‘খুব খেলুম সব’ —বলতেন।

‘পুজোর সময়ে অবনীবাবু আমাদের নতুন কাপড় পাঠাতেন ; ঘরের ছেলের মতন। মা (অবনীবাবুর স্ত্রী) পাঠাতেন। কাপড়, সন্দেশ এই সব পাঠাতেন মা। আমরা যখন ওখানে বসে খেতুম তিনি বসে খাওয়াতেন। আর খাওয়ার শেষে আঁচানো হলে ‘ডাবা’ থেকে পান বার করে দিতেন। অবনীবাবু তাঁর স্ত্রীর —আমাদের ‘মায়ের’ ছবি এঁকেছেন।

‘অবনীবাবুর সঙ্গ পেতুম সদা-সর্বদা —আত্মীয়ের মতন, বন্ধুর মতন। ‘আমি নইলে মুষড়ে পড়েছিলুম’ —একবার বলেছিলেন তিনি। কেউ আর্ট সম্পর্কে চিন্তা করতো না তখন। একা একা ঘরে থাকতেন। আমার সঙ্গ পাওয়াতে মন ওঁর খুব খুশি থাকতো। যখন শান্তিনিকেতন থেকে আমাকে নিয়ে গেলেন সোসাইটীতে, বললেন, —‘তোমাকে ফিরে পেয়ে কেমন মনে হচ্ছে জান ? যেন এক বোতল ব্রাণ্ডি খেয়ে মনটা চাঙ্গা হলো’। তখন কলকাতায় গিয়ে ওঁকে আমি সঙ্গ দিলুম বটে, ওখানে থাকতে, কিন্তু কলকাতা আমার খুব বদ্ধ মনে হতো। আবার সোসাইটি থেকে আমি শান্তিনিকেতনে ফিরে এলুম।

‘গুরুদেব আমাকে আনলেন এখানে আশ্রমের কাজের জন্যে। সোসাইটি তখন চলছে, আমাকে আবার ডেকে পাঠালেন অবনীবাবু। গুরুদেবকে তিনি বললেন, —‘তুমি যখন ডেকেছ তখন ও নিশ্চয়ই যাবে ; কিন্তু, আমার ক্ষতি হবে।’ যখন সোসাইটীতে গেলুম, অবনীবাবু বললেন, —‘মন চাঙ্গা হলো আমার’।

‘সমরেন্দ্রবাবুর এক মেয়েকে আমি art শেখাতুম। গগনবাবুর ছেলে নবুও শিখতো এক সঙ্গে। তার পরে বন্ধ করে দিলেন।

‘অবনীবাবু একটা দিশী পাকুড় গাছকে নিয়ে জাপানী প্রথায় ‘বামন গাছ’ (dwarf tree) করবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু পারেননি। কারণ, তার ধর্ম —বড়ো হওয়া। তার ডাল-পালা, পাতা কিছুতে ছোট করতে পারেননি। কাজে কাজেই তিনি হতাশ হয়ে সেটাকে আর চেষ্টা করেননি বামন করতে। ১৯২০ সালের মার্চ মাসে যখন আমি

পাকাপাকিভাবে শান্তিনিকেতনে এলুম, তিনি বললেন, —'তুমি এটা নিয়ে যাও। শান্তিনিকেতনের মাঠের মধ্যিখানে ছেড়ে দাও।' —আমি সেটাকে নিয়ে এসে, এখানে কলাভবনের কেন্দ্রস্থলে বসিয়ে দিলুম। আর সেটা অতি শীঘ্র বড়ো হয়ে উঠলো। সে গাছ এখনও (১৯৫৬) আছে তার ডাল-পালা ছড়িয়ে।

'সোসাইটীতে ছবি নিয়ে যেতুম এখান থেকে Exhibition করতে। অবনীবাবু বেছে দিতেন। Exhibition হতো। দাম ঠিক করে দিতেন অবনীবাবু। ক্রমশঃ অহংবোধ এলো। সে প্রথা উঠে গেল। এখন artistরা নিজেরাই দেয় তাদের ছবির দাম ঠিক করে। ছাত্রদের ছবির মূল্য প্রথম যুগে অবনীবাবু ধার্য করে দিতেন। আমরা তাতে খুব সন্তুষ্ট হতুম। এখান থেকে ছবি নিয়ে গিয়ে পাঁচ ছ' জনে মিলে সোসাইটিতে থেকে ফ্রেম করা, টাঙ্গানো —সব করতুম। ওখানে হোটেলে খেয়ে ওখানেই শুয়ে থাকতুম। যখন জিনিস ফেরৎ আসতো, আমাদের লোক —পরে, বিশু থাকতো। তখন শান্তিনিকেতনের কলাভবন ছিল যেন ওখানকার অবনীবাবুর প্রতিষ্ঠানেরই একটা continuation। অবনীবাবুই শান্তিনিকেতনের কলাভবনের জনক —এটা যেন লোকে বোঝে —মনে রাখে।

'অবনীবাবুর ছবি-সংগ্রহ —পুরাতন ছবি আর বাঙ্গালা দেশের নব্যশিল্পকলার বহু ছবি ঠাকুর-বাড়িরই এক ছেলে আর বউ মিলে ব্যবস্থা করে কস্তুরভাই লালভাইকে আমেদাবাদে বিক্রী করে দিলেন —আধা কড়িতে। সে-সব বাঙ্গালাদেশেই থাকা উচিত ছিল। কাঙ্গড়া, মোগল, জাপানী সব ছবি চলে গেল। তার প্রিন্ট্ও নাই।

॥ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম আলাপ, ১৯০৯ ॥

'কবির সঙ্গে আমার প্রথম দেখা জোড়াসাঁকোর লালবাড়িতে — এখন (১৯৫৫) যেখানে বিশ্বভারতীর অফিস হয়েছে। যোগাযোগ হলো কি করে সে-কথা বলি। —আমাদের হাতীবাগানের বাড়িতে এসেছিলেন বাঁকুড়ার এক সাধু। তাঁর কথা আগে বলা হয়েছে। পূজার জন্যে তাঁকে 'তারা'-মূর্তি করে দিয়েছিলুম। তিনি তো আশীর্বাদ করে সে ছবি

নিয়ে চলে গেলেন। তার কিছুদিন পরেই কবির জোড়াসাঁকোর বাড়িতে সহসা ডাক পড়লো আমার। সসংকোচে গেলুম আমি দেখা করতে। কবি বললেন,—'তোমার 'তারা'-মূর্তি আমি দেখেছি। বেশ হয়েছে। তা, তোমাকে এখন আমার কবিতার বই (চয়নিকা, ১৯০৯, ১৩১৬) ইলাস্‌ট্রেট্‌ করতে হবে'। শুনে, প্রথমটা আমি চম্‌কে গেলুম। আমার 'তারা'-মূর্তি ইনি দেখলেন কি করে। ভাবলুম, নিশ্চয় অবনীবাবু তাঁর রবিকাকাকে দেখিয়ে থাকবেন। সে-খোঁজ আর করা হয়নি। কবিকে আমি বললুম, —'আমি আপনার বই পড়িনি বললেই হয়। পড়লেও মানে কিছু বুঝিনি'। কবি বললেন, —'তাতে কি, তুমি পারবে ঠিক। এই আমি পড়ছি, শোন'। বলে, তিনি তাঁর চয়নিকার কবিতা পড়তে আরম্ভ করলেন, —'পরশ পাথর', 'ঝুলন', 'মরণ মিলন' এই সব কবিতা। আর দেখ, তাঁর পড়বার ভঙ্গিতেই আমার মনে যেন নানা ছবি বসতে লাগলো। আগে পরে ছবি এঁকেছি —'খেপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ পাথর, 'শিবের তাণ্ডব', 'অন্নপূর্ণা ও শিব', 'নকল বুঁদি' – আরও সব। 'শিবের তাণ্ডব' ছবিখানা ছিল বর্ধমানরাজের ঘরে। 'নকল বুঁদি' ছিল পূরণচাঁদ নাহারের গ্যালারিতে। কবির 'ছিন্নপত্রে'র মলাটে ছবি আঁকা ছিল আমার। —সবুজের ওপর সোনার রঙ্গে এম্‌বস্‌-করা পদ্মের পাপড়ি খসার ছবি। কথার শেষে কবি বললেন, —'আমার বোলপুর বিদ্যালয়ে তুমি বেড়াতে যাবে'। 'আজ্ঞে, আচ্ছা,' বলে উঠে পড়লুম আমি।'

নন্দলালের আঁকা 'তারা', 'সাবিত্রী ও যম' প্রথম দিকের ছবি প্রথম দেখে রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়েছিলেন। বলেছিলেন, —'যম এতো সুন্দর।' তিনি এগুলি দেখেছিলেন, নন্দলাল 'চয়নিকা' চিত্রিত করার আগে। এই ছবিগুলি দেখে মুগ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ 'চয়নিকা'র জন্যে নন্দলালকে ছবি করতে বলেছিলেন (স্কেচ্‌বুক প্রথম পর্যায়, সংখ্যা ৩২)।

তখন 'চয়নিকা' প্রথম সম্পাদন করা হয়েছিল। তাতে নন্দলালের সাতখানি ছবি দেওয়া হয়। এর মধ্যে তাঁর 'শিবতাণ্ডব', 'নকল বুঁদি' আগেই আঁকা ছিল। বাকি পাঁচখানি এই সময়ে কবির

কথামতো নন্দলাল এঁকেছিলেন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই বিবরণ 'রবীন্দ্রজীবনী'তে (২, পৃ ২২৯, পা-টী) মোটামুটি ঠিক করে লিখেছেন। প্রথম প্রকাশিত 'চয়নিকা'তে (১৩১৬।১৯০৯) নন্দলালের ছবিগুলি এই নামে দেওয়া হয়ঃ (১) কেবল তব মুখের পানে চাহিয়া (২) ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে (ভূমিকা) (৩) যদি মরণ লভিতে চাও এস তবে ঝাঁপ দাও (৪) খেপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশপাথর (৫) হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ (শিবতাণ্ডব, রঙ্গিন) (৬) ভূমির পরে জানু পাতি তুলি ধনুঃশর (নকল বুঁদি) (৭) আমায় নিয়ে যাবি কে রে দিনশেষের শেষ খেয়ায়। —১৩২৪ সালের দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে 'চয়নিকা'র ছবি বাদ দেওয়া হয় একাধিক কারণে।

১৯০৯ সালে সংকলিত 'চয়নিকা' ইণ্ডিয়ান্ প্রেস থেকে তখন সবেমাত্র প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'কাব্য-গ্রন্থাবলী' (১৩০৩) ছাড়া, কবিতার সংকলন-গ্রন্থ এই প্রথম হলো। চয়নিকার কবিতা সংকলন করেছিলেন কবির সঙ্গে পরামর্শ করে অজিতকুমার চক্রবর্তী, মণিলাল গাঙ্গুলী, চারু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ মিলে। ছাপা 'চয়নিকা' পেয়ে রবীন্দ্রনাথ চারুবাবুকে লিখেছিলেনঃ

পোষ্ট্ মার্ক (বড়বাজার)

'প্রিয়বরেষু,— ২৮শে সেপ্টেম্বর, ০৯ কলি

চয়নিকা পেয়েছি। ছাপা ভাল, কাগজ ভাল, বাঁধাই ভাল। কবিতা ভাল কিনা তা জন্মান্তরে যখন সমালোচক হয়ে প্রকাশ পাব তখন জানাব।

কিন্তু ছবি ভাল হয়নি সেকথা স্বীকার করতেই হবে। এই ছবিগুলোর জন্যই আগ্রহের সঙ্গে প্রতীক্ষা করছিলুম। কারণ এগুলি আমার রচনা নয়।

নন্দলালের পটে যে রকম দেখেছিলুম বইয়েতে তার অনুরূপ রস পেলুম না। বরঞ্চ একটু খারাপই লাগল।' —(প্রবাসী ১৩৪৮, পৃ ১১৭)।

—এই খারাপ লাগার কারণ হলো, ছবির প্রিণ্ট্ ভালো হয়নি। নন্দলালের 'পটে' আঁকা মূল ছবিগুলি দেখে কবি খুবই খুশি হয়েছিলেন।

এবং এই ছবিগুলির প্রিন্ট্ ভালোভাবে করা হবে, তারই সাগ্রহ প্রতীক্ষায় ছিলেন। কারণ, যশস্বী ভারতশিল্পী নন্দলালের ছবির প্রতি ১৯০৯২ সালের আগে থেকেই কবির শ্রদ্ধা ও দায়িত্ববোধ জন্মেছিল। ফলতঃ প্রিন্ট্ খারাপ হওয়ায় তাঁর খারাপ লাগাই স্বাভাবিক।

'চয়নিকা'র এই সাতখানি ছবির বিষয় হলো: (১) দু'জন পথিক নরনারী চলেছে অজানার সন্ধানে (২) একটি মেয়ের হাতে-ধরা ধূপদানী থেকে ধূপের ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে ওপরে উঠছে, আবার নেমে আসছে (৩) একটি মেয়ে পুকুরে স্নান করতে নেমে কলসী ভাসিয়ে দিয়েছে জলের ঢেউয়ে (৪) নেঙটী-পরা, কোমরে শেকল-আঁটা একজন পাগল —তাকে দেখা যাচ্ছে পিছন থেকে —সাগরবেলার পরিবেশে (৫) শিবতাণ্ডব (রঙ্গিন) (৬) ধনুকে শর জুড়ে বসেছে রাণার ভৃত্য কুম্ভ —তার পিছনে মাটির নকল কেল্লা দেখা যাচ্ছে (রঙ্গিন) (৭) নদীর কিনারায় একটি লোক বসে আছে পারের প্রতীক্ষায়। —এর মধ্যে ৫ আর ৬ সংখ্যক ছবি ছাড়া বাকি ছবিগুলি কালি-তুলির কাজ।

॥ শান্তিনিকেতনে প্রথম আসার কথা, ১৯১৪ ॥

'শান্তিনিকেতন-আশ্রমে আমি প্রথম আসি ১৯১৪ সালে। তারিখ বোধহয় হবে ৩০-এ এপ্রিল। বাঙ্গালা সাল ১৩২১, ১১ই বোশেখ। আমি এখানে আসার আগে, অসিত আমাকে আনবার জন্যে কলকাতা গিয়েছিলেন। এখানে আসবার সময়ে হাওড়া স্টেশন থেকে এক টুকরো কার্বন কুড়িয়ে এনে তিনি যে কাণ্ড করেছিলেন সে-কথা পরে বলবো। পরের দিন শান্তিনিকেতনে আমাকে অভিনন্দন দেওয়া হলো —১২ই বোশেখ।

'দুপুরের দিকে হাওড়া স্টেশনে লুপ-লাইনের গাড়ীতে চেপে, বিকেল গড়িয়ে গেলে বোলপুর স্টেশনে এসে নামলুম। আমার ভাই সুরেনও আমার সঙ্গে এসেছিলেন। স্টেশনে টপ্পর গাড়ী মোতায়েন ছিল। এসে পোঁছলুম ফাঁকা মাঠে শান্তিনিকেতন-আশ্রমে। আমাকে থাকবার

জায়গা দিলে শিশুবিভাগের পশ্চিমে শালবীথির পাশে দু'কামরার একটি মাটির ঘরে। ঐ ঘরটিতে প্রেস-ম্যানেজার দাড়িওয়ালা কালাচাঁদবাবু, হরিচরণবাবু মশাই থাকতেন। ঐ ঘরের একটা ফাঁকা কামরায় আমি রইলুম। রাতের খাওয়া হলো রান্নাঘরে গিয়ে। সাত্ত্বিক খাবার বটে, তবে সে এলাহি পরিমাণে।

'ভোরবেলা দেখি, খাটা-পায়খানা রয়েছে একটা। তখন সন্তোষ মজুমদার তত্ত্বাবধান করতেন নতুন গেস্ট এলে। দেখলুম, সকালবেলায় সন্তোষবাবু নিজে দু'টিন ভরতি জল দিয়ে গেলেন দু'হাতে করে। আর দরকার মাফিক সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিগোস-পড়া করলেন।

'সকালে (১লা মে, ১৯১৪ ঃ ১২ই বোশেখ, ১৩২১) একটু বেলা হলে, আশ্রমে আমার অভ্যর্থনার আয়োজন হলো। অসিত ছিলেন, পিয়ার্স'ন ছিলেন। এ্যাণ্ড্রুজ, ক্ষিতিবাবু, ভীমরাও শাস্ত্রী, বিধুশেখর শাস্ত্রী আরও অনেকে সব ছিলেন। বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ তখন ছিলেন নিচু-বাঙ্গালায়, তিনি কিন্তু সভায় আসেননি। এখানকার পাকা 'কারমাইকেল-বেদী'র সামনে তখন একটি কাঁচা-মাটির বেদী ছিল। সেখানে গিয়ে দেখি, পদ্মপাতা পেতে রাখা হয়েছে ; আর মাটির ওপর গাঁইতি দিয়ে ডোবা কেটে, পদ্মের পাপড়ির ডিজাইন এঁকে, সেই গর্তগুলো লাল কাঁকড় দিয়ে ভরতি করে, পদ্ম এঁকে রেখেছে। বেদীর সামনে আলপনা আঁকা। মণি গুপ্ত তখন এখানকার স্কুলের ছাত্র ছিলেন। ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ, শরদিন্দু, ডি. এল. রায় —এঁরাও তখন ছাত্র ছিলেন। মণি গুপ্ত ছিলেন অসিতের তল্পিদার। ওদের দিয়ে গুঁড়ি গুলিয়ে আলপনাও দেওয়া হয়েছিল —বোধহয় বৈদিক মতে।

'কবি এলেন। ওখানে আমি বসতেই শাঁখ বাজানো হলো। অসিত কিংবা ছেলেদের কেউ মালা দিলে আমার গলায়। কবি আমার হাতে অর্ঘ্য দেবার পরে খানিক বললেন। আমি বললুম অল্প। —বিশেষ করে বললুম —'আমি ধন্য হয়েছি'। এর পরে কবি এই কবিতাটি পড়লেন ঃ

ওঁ

শ্রীমান নন্দলাল বসু
    পরম কল্যাণীয়েষু
তোমার তুলিকা রঞ্জিত করে
    ভারত-ভারতী-চিত্ত !
বঙ্গলক্ষ্মী ভাণ্ডারে সে যে
    যোগায় নূতন বিত্ত !
ভাগ্যবিধাতা আশিষ মন্ত্র
    দিয়েছে তোমার কর্ণে—
বিশ্বের পটে স্বদেশের নাম
    লেখ অক্ষয় বর্ণে !
তোমার তুলিকা কবির হৃদয়
    নন্দিত করে, নন্দ !
তাইত কবির লেখনী তোমায়
    পরায় আপন ছন্দ ।
চিরসুন্দরে কর গো তোমার
    রেখাবন্ধনে বন্দী !
শিবজটাসম হোক্ তব তুলি
    চিররস-নিষ্যন্দী !

শান্তিনিকেতন — শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১২ই বৈশাখ
১৩২১

[১৯১৪ সালের জুন সংখ্যার 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকা ও ১৩২১ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার 'প্রবাসী' কবির লেখা এই অভিনন্দন-কবিতাটির অটোগ্রাফ-কপি ছাপিয়েছিলেন। 'মডার্ণ রিভিউ' এই কবিতাটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন : An address given to Babu Nandalal Bose by Babu Rabindranath Tagore in his own handwriting.]

'অভিনন্দনের পরে গুরুদেবের লেখাটি অসিত আমার হাতে দিলেন। অসিত সেদিন আমার একটি ছবিও এঁকেছিলেন। গুরুদেব প্রথম যখন

অভ্যর্থনার কবিতাটি লিখবেন, অসিত বললেন, ভালো চাইনীজ ইঙ্ক্ আছে, এনে দিচ্ছি। অসিত কালি ঘষতে বসলেন, কিন্তু ঘষছিলেন তিনি হাওড়া স্টেশন থেকে আনা সেই কার্বন। চাইনীজ ইঙ্কের নামে ঠাট্টা করে কার্বন ঘষে গুরুদেবকে দিলেন। গুরুদেব সেটা দিয়ে লিখলেন অতি কষ্টে। অভ্যর্থনার শেষে লেখাটি ফ্রেমে বাঁধানো হলো। ফ্রেমে বাঁধানো মূল অভিনন্দনপত্রখানি আমার দাদাশ্বশুর ক্ষিতীশ মিত্র মশাই-এর কাছে ছিল।

'এই অভিনন্দনের পরে, আমার একটা অদ্ভুত অনুভূতির ঘটনা হলো। গুরুদেব আমাকে বরণ করলেন অর্ঘ্য দিয়ে, আশীর্বাদ করলেন কবিতা পড়ে। অনুষ্ঠানের শেষে আমি চলে এলুম আমার ডেরাতে। কবির দেওয়া অর্ঘ্য তখনও আমার হাতে। সহসা আমার মনে হলো, আমাতে যেন আমি নাই। আমার দেহটা আছে বটে, তবে অতি স্বচ্ছ হয়ে গেছে। আমার রক্ত-মাংসের স্থূল শরীর ভেদ করে যেন আলো বাতাস খেলে যাচ্ছে। অপূর্ব অনুভূতিতে আমার সমস্ত চেতনা আনন্দে ডগমগ করে উঠলো। কবির ভেতর দিয়ে মহর্ষির আশীর্বাদ আমাকে যেন ছুঁয়ে গেল। আমি যেন শান্তিনিকেতন-আশ্রমের অন্তরে প্রবেশ করলুম।

'আশ্রম ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলুম। ছেলেরা মালতী লতায় চড়ে দোল খাচ্ছে। গাবতলায় ইন্দারা থেকে ছেলেরা জল তুলছে নাইবে বলে। —দুপুরে কিচেনে খাওয়া হলো। সন্ধ্যেবেলায় নাটক অভিনয় হলো —'অচলায়তন'। স্বয়ং গুরুদেব নাটক করেছিলেন এখানকার অধ্যাপক আর ছেলেদের নিয়ে।

'নাটক শেষ হবার পরে ছাতিমতলার দক্ষিণ দিকে লম্বামতন একটি খড়ের বাড়িতে ('বটতলা-বাড়ি') গেলুম। ঐ বাড়ির একটা কামরায়, পরে, আমাদের সুরেন এখানে 'বিচিত্রা'-ফেরৎ প্রথমে এসে কিছুদিন ছিলেন ১৯১৭ সালে। ঐ ঘরে ঐ সময়ে ওঁদের মাঝে মাঝে আড্ডা জমতো। গান বাজনা নাচ হতো। সরোজ রায়চৌধুরী, অক্ষয় রায়, গৌর ঘোষ, ভীমরাও শাস্ত্রী —এই রকম ক'জন মিলে ওঁরা খুব আসর জমালেন। রাত্রি বারোটা-একটা পর্যন্ত সেদিন

নাচ গান চলেছিল। নেচেছিলেন সরোজ। সে সময়কার স্কেচ্ আছে অনেক আমার করা। ২রা মে অর্থাৎ পরের দিন সকালে আমি কলকাতা ফিরে গেলুম।'

শান্তিনিকেতনে শ্রীনন্দলালের এই অভ্যর্থনা সম্পর্কে 'মডার্ণ রিভিউ'-এ এই সম্পাদকীয় মন্তব্য বের হলো :

Nanda Lall Bose

Babu Nanda Lall Bose one of whose water colours we reproduce in this number recently had occasion to visit Rabindranath Tagore's school at Bolpur The poet gave him a cordial reception and presented him with a benedictory poem —This is an honour of which any artist may well be proud.

'প্রবাসী'তে (১৩২১, জ্যৈষ্ঠ) রামানন্দবাবু লিখলেন : **'নন্দলাল বসুর অভিনন্দন**। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বোলপুরস্থ বিদ্যালয়ের গ্রীষ্মাবকাশ উপলক্ষে ছুটি হইয়াছে। ছুটির পূর্বে রবীন্দ্রনাথ কয়েকজন অধ্যাপক ও ছাত্রকে লইয়া 'অচলায়তন' নাটকের চমৎকার অভিনয় করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে কলিকাতা হইতে বিদ্যালয়ের অনেক বন্ধু বোলপুর গিয়াছিলেন। বিখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু তাঁহাদের মধ্যে একজন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার মত গুণী ব্যক্তিকে আশ্রমে পাইয়া তাঁহার যথোচিত আদর করেন। ইহা সামান্য সৌভাগ্য নহে। রবীন্দ্রনাথের অভিনন্দন-কবিতার প্রতিলিপিটি আমরা মুদ্রিত করিলাম।

প্রসঙ্গতঃ এই সংবর্ধনা সম্পর্কে রবীন্দ্রজীবনীকার এই মন্তব্য করেছেন : 'এণ্ড্রুস সম্বর্ধনার ছয় দিন পরে আশ্রমে বেড়াইতে আসেন চিত্রশিল্পী শ্রীনন্দলাল বসু। নন্দলালের সহিত তখন শান্তিনিকেতনের কোনোপ্রকার সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নাই, এমন-কি তাহার কল্পনাও কোনো পক্ষ হইতে হয় নাই। সেদিন আশ্রমে একজন কবি একজন শিল্পীকে সমাদর করিলেন একটি মাত্র কবিতা উপহার দিয়া (১২ই বৈশাখ, ১৩২১)—

তোমার তুলিকা রঞ্জিত করে
ভারত-ভারতী চিত্ত
বঙ্গলক্ষ্মী ভাণ্ডারে সে যে
যোগায় নূতন বিত্ত

এই শুভদিনে নন্দলাল জানিতেনও না যে এই শান্তিনিকেতন তাঁহার শিল্পিজীবনের কেন্দ্র হইবে, রবীন্দ্রনাথও জানিতেন না যে বিশ্বভারতীর প্রধান একটি অঙ্গ নন্দলাল গড়িয়া তুলিবেন।' —(রবীন্দ্রজীবনী, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ২য় খণ্ড, পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ ১৩৬৮, পৃষ্ঠা ৩৭৪)। —কিন্তু এই মন্তব্য যথোচিত বলে মনে হয় না। কারণ শ্রীনন্দলাল এখানে স্থায়িভাবে এসে থাকার সম্পর্কে তখন কিছু কিছু চিন্তা করছিলেন; পক্ষান্তরে, কবির মনোগত ইচ্ছা সেদিকে আগেই প্রধাবিত হয়েছিল, এর পরের বিবরণ থেকে তা' বেশ বোঝা যাবে। উপরন্তু, 'বোলপুরে চিত্রবিদ্যাটা ভালো করে শেখাবার' ব্যবস্থা করার জন্যে কবির ব্যাকুলতা অসিত হালদার মহাশয়কে লেখা ১৯১২ সালের একটি চিঠিতে অতি পরিষ্কারভাবে ধরা আছে।

॥ শিলাইদহে রবীন্দ্র-প্রসঙ্গে, ১৯১৬ ॥

এই প্রসঙ্গে স্বয়ং শ্রীনন্দলালের অভিজ্ঞতার বিবরণ তাঁর নিজের ভাষাতেই শুনুন :—

'পদ্মার পরিবেশ দেখাবার জন্যে কবি আমাদের ডাকলেন শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে। গেলুম আমি, সুরেন কর আর মুকুল দে। সুরেন আগেই গিয়েছিলেন কবির সঙ্গে। তখন শীতকাল। ১৯১৬ সালের জানুয়ারী মাসে জোড়াসাঁকোয় 'ফাল্গুনী'র প্রথম অভিনয়ের পরেই। কুঠির হাটের ঘাটে নেমেই দেখি, কবি স্বয়ং এসেছেন আমাদের নিয়ে যেতে। তাঁর পিছু পিছু হাঁটছি; হঠাৎ দেখি কি, এক ঝাঁক বালিহাঁস উড়ে গেল ঠিক আমাদের মাথার ওপর দিয়ে। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলুম। আমার

গতিক দেখে কবি বললেন, —'চলো না, আরও কত দেখবে।' পদ্মার ধূ ধূ চর। নানা পাখী চড়ে কত। সকালে আসে, সন্ধ্যায় ফেরে। তাদের গতিবিধি সব জানা ছিল কবির। সে সব তিনি আবিষ্ট হয়ে বলতেন আমাদের। আমাদের হলো হাতে-কলমে নেচার-স্টাডির সেই হাতে-খড়ি। আগে ছবি আঁকতুম শাস্ত্র পুরাণ পড়ে। অবনীবাবু পণ্ডিত রেখে পড়াতেন। আইডিয়া পেতুম তখন বই থেকে। কিন্তু এখানে গুরুমশাই হলেন পদ্মার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর তার ব্যাখ্যাতা স্বয়ং বিশ্বকবি। এ মনিকাঞ্চনযোগ দুর্লভ। আমাদের এই সৌভাগ্যের সীমা নাই। আমাদের শিল্পিজীবনে 'আরও কত দেখার' কি আর শেষ আছে। যাই হোক, পরে ছবি এঁকেছিলুম প্রথম দেখা সেই বালিহাঁসের ঝাঁকের। সে ছবিখানা আছে এখন প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের বাড়িতে। পরে ছাপাও হয়েছে।

'কবি কত হাঁটতে পারতেন! কত জায়গায় ঘুরতেন —কখনো হেঁটে, কখনো বোটে। গাঁয়ের কত লোক আসত তাঁর কাছে বিষয়ের জটিলতা নিয়ে। তিনি সে সব অম্লানবদনে ফয়সালা করে দিতেন। পাকা জমিদার ছিলেন তিনি। মহর্ষি দ্বিজেনবাবুকে একবার পাঠিয়েছিলেন জমিদারি দেখতে। তিনি গিয়ে বাপকে লিখলেন, এরা গরীব, এদের কাছ থেকে খাজনা নাও কি করে। এরা খেতে পায় না, থাকতে পায় না, আমি এদের বাড়ি করিয়ে দেবো। আমাকে টাকা পাঠান। মহর্ষি টাকা অবশ্য পাঠিয়ে দিয়েছিলেন; কিন্তু, এই দয়াল ছেলেটিকে ফিরিয়ে এনে, জমিদারিতে আর কখনো পাঠাননি। সুরেন ঠাকুর মশায়ও জমিদারি ঠিক ঠিক চালাতে পারতেন না। তিনি ছিলেন প্রিয়দর্শন, অক্রোধ, অজাতশত্রু; আর ছিলেন দিলদরিয়া মেজাজের। হিন্দুস্থান বীমাকোম্পানীও তাঁর দৈন্য শেষে ঢাকতে পারেনি। কবির পরে সুরেন ঠাকুর মশায়ই জমিদারি তদারক করতেন। শিলাইদহে গোপীনাথের একটি মন্দির ছিল। তাতে টেরাকোটা ছিল অনেক। সে মন্দিরটা ভেঙ্গে পড়ছিল জরাজীর্ণ হয়ে। তিন-চার বস্তা টেরাকোটা

সুরেনবাবু পাঠিয়ে দিয়েছিলেন আমাদের। কলাভবনে রাখা আছে সেগুলো। গোপীনাথের রথটিও ভেঙ্গে গিয়েছিল। তার কাঠের বড়ো বড়ো পুত্‌লোগুলো চেষ্টা করেও আর আনা গেল না। কিন্তু যে-কথা বলছিলুম, আমাদের কবি ছিলেন সবার চেয়ে চৌখস জমিদার।

'দ্বিজেন্দ্রনাথ জমিদার হিসেবে ফেল হয়ে গেলেন। গুরুদেব কিন্তু সব বুঝতেন। শিলাইদহে গিয়ে তিনি পুরাতন লোক ডিস্‌মিস্‌ করে দিয়ে নতুন লোক নিয়ে আমলা কর্মচারী বদল করলেন। ফলে, প্রজাপীড়ন বন্ধ হলো। এখানে কবির কবিত্বও কাজে লাগল। জমিদারিতে গাঁয়ের লোক চিনে চিনে কবি হলেন লোক-চরিত্র বিশারদ। তাঁর বুদ্ধিতেই সব উৎকর্ষ হতে লাগলো। অর্থাৎ 'সবচড়' ছিলেন তিনি। ঐ সঙ্গেই গ্রাম-উন্নতির কাজ আর লোক-শিক্ষার কাজ ওখানে আরম্ভ করে দিলেন। প্রথমে অনেক উন্নতি করলেন। পরে এল্‌মহার্স্ট'রা এসে অর্গানাইজ করলেন। দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করলেন নানা স্থানে। শেষে কিন্তু, তিনি তাল সামলাতে পারেননি। এখন সেই দেখে কত স্থানে এই ধরনের কত প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।

'সারা দিন চলত বৈষয়িক কাজ, আর তারই ফাঁকে ফাঁকে কবির নিজের লেখাপড়া। সহজিয়া মতের একজন বাউল আসত, দেখেছি। তাঁর সঙ্গে কবির গুহ্য আলোচনা চলতো। আমরা কৌতূহল প্রকাশ করলে, কবি বলতেন, 'তোমরা ও সব বুঝবে না।' রাত্রে বহুক্ষণ ধরে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতেন। 'বোষ্টমী'কে আমরা দেখিনি। তবে শুনেছি তার সম্পর্কে। 'জমিদার বাহাদুর' রবীন্দ্রনাথ একা একা গ্রামে বেড়াতেন। সঙ্গে পাইক গেলে বিরক্ত হয়ে ফিরিয়ে দিতেন। লেঠেল মেছের সর্দারের ঘটনাটি বোধহয় রেকর্ড হয়েছে।

'শিলাইদহে আমরা পৌঁছতেই কবি আমাদের নিয়ে পড়লেন। সে কী যত্ন তাঁর শিল্পীদের প্রতি। খাবার খবরদারি। আক্ষেপ করতেন প্রায়ই, —'রথীর মা নেই! বড়ো ভালো রাঁধতেন তিনি লঙ্কা-ফোড়ন দিয়ে। রেঁধে খাওয়াতেন তোমাদের।' তাঁর একজন পুরুষ রাঁধুনী জাতে নাপিত রাঁধত তখন ওখানে। বাবুর্চিও ছিল একজন —দাড়িওয়ালা।

'পদ্মার ইলিশ। টাটকা ইলিশ। তার স্বাদ মুখে লেগে আছে এখনও। খুব খানা-পিনা চালাচ্ছি আমরা। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ল একজন। কবির হোমিওপ্যাথিক ওষুধের কথা জানতাম আমরা। বললুম, —ওকে ওষুধ দিন। কবি হেসে বললেন, —'ওর কাজ হবে না আমার ওষুধে। ওকে চাই ঘোড়ার ওষুধ।'

'শিলাইদহে কাছারি-বাড়ির কাছেই গোপীনাথের পুরাতন মন্দির। কবি দিয়েছিলেন সেটির সংস্কার করিয়ে। একদিন তিনি বললেন আমাদের, —'তোমরা তো হিন্দু; ওদের মন্দিরে বলে দিয়েছি, প্রসাদ দিয়ে যাবে।' গোপীনাথের প্রসাদ-ভোগ এলো পায়েস-টায়েস, ফল-টল নানারকম সব। আমরা খেলুম। কবি বললেন, —'হিন্দুরা পুজোই করে কেবল; মন্দিরটা যে ভেঙ্গে পড়ছিল, সেদিকে দৃষ্টি ছিলনা কারো। মন্দিরটা সারিয়ে দিয়েছি আমি। জানো তো, আমিও একজন হিন্দু।' বোধ করি, সমাজের কটাক্ষে ক্ষোভ কিছু ছিল মনে।

'চলন্ত বোটে সভা বসত তাঁর। পদ্মার শাখায় শাখায় ডিহিতে ডিহিতে নোঙ্গর পড়তো। দেখতে আসত গ্রাম থেকে—সে কত লোক। পাড়ে ভিড় লেগে যেত। কতো স্কেচ্ করেছি সে সময়ে—বোটের কাছে চরের ওপর শান্ত শিষ্ট মুসলমান প্রজা সব বাবু-মশায়কে দেখবে বলে বসে দাঁড়িয়ে আছে। ছোট ডিঙ্গিতে করে জল টপকে আসত—কাজ থাকত যাদের। কবিরও দ্বার ছিল অবারিত। দিন কয়েক কাটত এক ডিহিতে। আমাদের আচারে-ব্যবহারে সে উন্মুক্ত নির্মল পরিবেশে আবর্জনা জমে উঠলেই কবি বলতেন, —'চলো'। বলতেন —'দেখ, মানুষেই জমায় আবর্জনা। প্রকৃতির মধ্যে লালিত যারা তারা সহজেই নির্মল। পাখীদের দেখো; কী সহজে ময়লা মুক্ত করে ওরা। আমাদের সভ্যতা এমনভাবে গড়ে তুলেছি আমরা যা প্রকৃতির বিরুদ্ধ। আমাদের জমানো আবর্জনা সেই জন্যে পীড়া দেয় আমাদিকেই।'

পাবনা জেলার সীমা—দূরে দেখা যাচ্ছে—সাজাদপুর। কবি বললেন, —ঐ যে দেখছ সাজাদপুর, আমাদের জমিদারির সবচেয়ে শাঁসালো অংশ ছিল এটা। মহর্ষি যখন কল্পতরু হয়েছিলেন, গুণেন্দ্রবাবু তখন এই লাটটা চেয়ে নিয়েছিলেন। তাই, ওটা এখন গগনদের ভাগে পড়েছে।

'তবে তাতে কোনও খেদ দেখলাম না কবির। সহজ আনন্দেই আবিষ্ট থাকতেন সব সময়ে। একটা মজার ঘটনা বলি, শোনো। পাবনা কাছে আসতেই সহসা হাতে টুস্কি বাজিয়ে গা দুলিয়ে গান ধরলেন কবি, —'যুবতী ক্যান্ বা কর মন ভারী, পাবন থ্যাহে আন্তে দেব ট্যাহা দামের মোটরি'। কবি যে কত হালকা হতে পারতেন —সে তখন দেখেছিলুম। কবিত্বে তাঁর মন ভরে থাকত সর্বক্ষণ।

'আমাদের জীবনে গ্লিম্পস্ দিয়ে গেলেন তিনি। তাই পাথেয় হয়ে রইল সারা জীবনের। আমাদের কাছে তিনি কল্পলোকের দরজা খুলে দিয়েছেন। গান কবিতা শিল্প যাই বলো সব হয়েছে প্রকৃতি থেকে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর দেশদেখা চোখ নিয়ে আমাদের মন্ত্র দিলেন সেই প্রকৃতিকে তার মর্মস্বরূপে দেখবার।

'অপ্রাকৃত ব্যাপারেও কবির বিশ্বাস ছিল বলতে পারি। তোমরা 'ভূত' বলে উড়িয়ে দেবে তো? কিন্তু কবি বোধহয় বিশ্বাস করতেন ঘটনাটি। বলি শোনো। —প্রভাতবাবু মাঝে মাঝে টণ্ট্ করে কথা বলতেন হিন্দুধর্ম, হিন্দুশাস্ত্র এই সবের ওপর। যেখানে হিন্দুয়ানিতে বিশ্বাস সে-ক্ষেত্রে স্বয়ং কবি সম্পর্কেও তিনি বহু তথ্য বিকৃত করেছেন। প্রভাতবাবুরই শ্লেষের প্রসঙ্গে একদিন কথায় কথায় বললেন কবি তাঁর এই শোনা কাহিনীটি। ...পদ্মার স্রোতে ভেসে-আসা একটি কড়ি-কাঠ এক গেরস্থ আটকেছিল। সেটি দরকার তার ঘরের ছাদে লাগানোর। দিনের বেলায় পাঁচ ছ জন জোয়ান মিলে চেষ্টা করেও সেটাকে যথাস্থানে তুলতে পারেনি, ভারী বলে; মাপেও সেটা ছিল বড়ো। রাত গেল। সকালে সকলে সবিস্ময়ে দেখলে, কড়ি-কাঠটি যথাস্থানে লাগানো রয়েছে!! এ কি করে হলো? অবিশ্বাসীরা কি জবাব দেবে?

'আচ্ছা, রামগড়ে কবির ভিশ্‌ন (vision) দেখার সেই ঘটনাটি রেকর্ড হয়েছে কি? হয়নি কেন? সে তো কবির শোনা কাহিনী নয়। তাঁর জীবনের বাস্তব ঘটনা। কতকগুলো সন তারিখ আর খবরের কাগজের কাটিংস্ সংগ্রহ করলেই কি জীবনী লেখা হয়? মহামানবদের জীবনে এই রকম অতীন্দ্রিয় দর্শনের ঘটনা অল্প-বিস্তর তো হামেশাই ঘটে থাকে। কবি একাধিকবার বলেছিলেন আমাদের তাঁর সেই মাতৃমূর্তি-

দর্শনের ঘটনাটি। রামগড়ে পাহাড়ের চুড়ো কিনেছিলেন ওঁরা, ওখানকার বাগানবাড়িতে থাকবেন বলে। সেখানে একবার এক বিরাট মাতৃমূর্তির ভিশ্‌ন (vision) দেখেছিলেন তিনি। —দেখলেন কবি, পাহাড়ের কাছে উঁচু আকাশে বিরাট এক প্রশান্ত মাতৃমূর্তি! তাঁর কোলের কাছে খেলায় রত একটি শিশু। শিশুটি খেলা করছে নিজের মনেই। আমাদের অসিত ছবি এঁকেছিলেন কবির কাছে ঘটনাটি শুনে। কলাভবনে আছে সে ছবিটা, দেখো। ছাপাও হয়েছে। তবে কবির দেখা নেই ভিশ্‌নের (vision) ভাবটি ঠিক ঠিক ফোটেনি ছবিটিতে।

'শিলাইদহের আরো কত কথা মনে পড়ে। আমাকে একদিন কবি বললেন, —'এই যে নদী পদ্মাকে দেখছ এক মাইল, বর্ষায় এর চেহারা ভীষণ হয়। এই নদীতে আমি আর বড়ো দাদা (দ্বিজেন্দ্রবাবু) একবার সাঁতারে পার হয়েছিলেম। আমি আর বড়ো দাদা সাঁতারে নামলেম। সঙ্গে ছিল বোট। এপার ওপার চলেম।' কবি বললেন —'আর একটা মজার ঘটনা মনে আছে। একবার নৌকায় বসে আছি। বর্ষায় পদ্মার প্রচণ্ড স্রোত। একটি মেয়ের লম্বা চুল জলের ওপর দিয়ে হাবুডুবু খেতে খেতে যাচ্ছে। জমিদারিতে নৌকো (জালি-বোট) আর লেঠেল (বরকন্দাজ) ছিল। তারা জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো। টেনে তুললে মেয়েটিকে। গ্রামের মেয়ে। ওষুধ খেয়েছে আত্মহত্যা করবে বলে। আমরা তাকে বাঁচিয়ে ঘরে পাঠিয়ে দিলুম'।

'এমনি সব টুকিটাকি ঘটনা কত শুনবে। যাই হোক, কবির সঙ্গে শিল্পীদের সেই উন্মুক্ত পরিবেশে যেন হৃদয়ে হৃদয়ে মিল হয়ে গিয়েছিল। আমাদের কোনো সংকোচ হতো না তাঁর কাছে। আমাদের শত ত্রুটিতেও তিনি কিছু মনে করতেন না। ধাত আমাদের চিনে নিয়েছিলেন তিনি।

'আমাদের তখনকার দৈন্যের কথা আর কি বলব। এই পোশাকের কথাই ধরো। দু-একখানি করে সার্ট্‌ মোটে পুঁজি ছিল আমাদের। অতদিন ওখানে থাকায় তার অবস্থাটা বুঝতেই পারছ। ময়লা তো হয়েছেই ; তার ওপর ছিঁড়ে গেছে। তবুও লজ্জা ছিল না আমাদের কবির কাছে। তাঁরও যেন চোখ ছিল না এতে। মনে উল্লাস আমাদের

অফ্‌রন্ত। কল্পলোকে বাস করছি তখন কবির সঙ্গে। অদ্ভুত সব অনুভূতি তখনকার।

'সহসা আমাদের এই সুখের নীড় ভেঙ্গে গেল। কি করে জানো? একদিন দেখি, জেটিতে এসে নামলেন র-বাবু আর ন-বাব্‌ হ্যাট্‌ কোট্‌ চড়িয়ে, অলস্টার হাতে নিয়ে, বড়ো বড়ো ভারী সূটকেস্‌ মুটের মাথায় চাপিয়ে। তখন সেই বেশে তাঁদের দেখে সহসা আমাদের নিজেদের প্রতি চোখ পড়ল। কী দীন আমরা! সুতরাং চলো, চলো, আর নয়, পালাই চলো। ওঁদের চোখের সামনে আমাদের এই ছেঁড়া সার্ট আর ময়লা কাপড়ের দীনতা ঢাকা যাবে না কোনো রকমে।

'কবিকে বলল্‌ম আমরা, আমরা যাবো এবার। তিনি যেন এক লহমায় বুঝে নিলেন সব —অন্তর্যামীর মতো। শান্ত স্বরে বললেন, —'চলো, দিয়ে আসি তোমাদের, বোটে করে, কুঠিবাড়ি পর্যন্ত।' বোট চলল। কুঠিবাড়ির ঘাটে এসে নোঙ্গর পড়ল।

'আমাদের নামিয়ে দিয়ে কবি বললেন, —'তোমাদের দিতেই কেবল আসিনি। এলেম আমার 'বাসন্তী'কে দেখতে'। —'বাসন্তী' হলো কবির নিজ হাতে রোয়া একটি ফুলের গাছ। তখন ছিল তার ফুল ধরাবার সময়। বাসন্তী রঙ্গের ফ্‌লে ফ্‌লে তখন সে তার সারা গা ভরিয়ে ফেলেছে। কবি তাঁর সেই বাসন্তীকে দেখতে লাগলেন। আমরা রওনা হলুম'।

প্রসঙ্গতঃ রবীন্দ্রজীবনীকার লিখেছেন :—'শিলাইদহে কবির সঙ্গে এবার আসিয়াছেন তিনজন শিল্পি। নন্দলাল বসু (জন্ম ১৮৮২) মুকুলচন্দ্র দে (জন্ম ১৮৯৫) ও সুরেন্দ্রনাথ কর (জন্ম ১৮৯৩)। নন্দলাল তখনই যশস্বী; মুকুলচন্দ্র শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় ছাড়িয়া (১৯১২) অবনীন্দ্রনাথের নিকট শিক্ষানবিসিতে আছেন। সুরেন্দ্রনাথের বয়স তখন মাত্র বাইশ বৎসর —মুকুলের বিশ। কবি এই তরুণ শিল্পীদের পাইয়া বড়ই আনন্দ পাইয়াছেন —'their enthusiasm of enjoyment adds to my joy. —1915' —(রবীন্দ্রজীবনী ২, পৃ ৪০৩-৪)। —কিন্তু এই উক্তিতে তথ্যগত কিছু অসঙ্গতি আছে —প্রথমতঃ, নন্দলাল ও মুকুলচন্দ্র পরে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গিয়েছিলেন মাত্র সুরেন্দ্রনাথ; ওঁদের দুজনের আগেই ফিরেও এসেছিলেন তিনি। দ্বিতীয়তঃ, ওঁরা শিলাইদহে ১৯১৫ সালে যান

নি। গিয়েছিলেন ১৯১৬ সালের একেবারে গোড়ার দিকে। নন্দলালের তারিখ-দেওয়া অসংখ্য স্কেচেই তার প্রমাণ রয়ে গেছে।

শিল্পীরা রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে শিলাইদহ গিয়েছিলেন। অদূরভবিষ্যতে শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ের কাজে ওঁদের যোগ দেবার ইচ্ছা জাগানোর উদ্দেশ্য ছিল কবির মনে। তখন কলকাতায় বিচিত্রা স্টুডিয়ো-স্থাপনার উদ্যোগপর্ব চলছে। একদিন বোটে সুরেন্দ্রনাথের নিকট তখনই কবি শান্তিনিকেতনে এসে কাজে যোগ দেবার জন্যে প্রথম প্রস্তাব করেছেন।

শ্রীনন্দলালের ৩১ সংখ্যক ডায়ারিতে দেখছি, এতে তিনি শিলাইদহের কয়েকটি স্কেচ্ করে রেখেছেন।

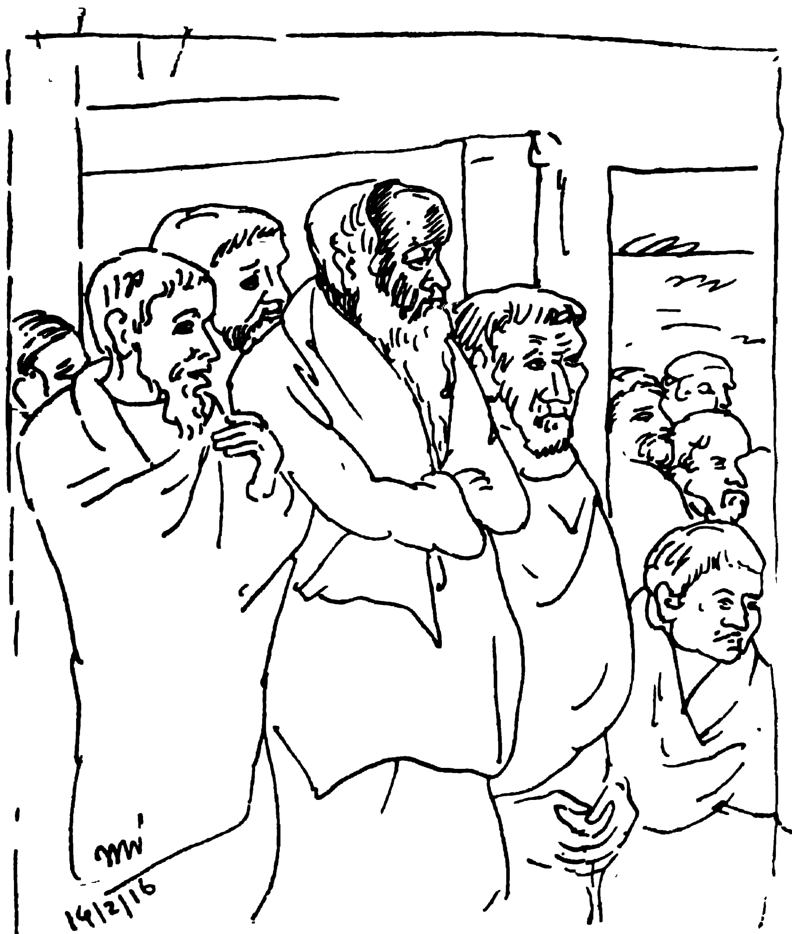
তাঁর স্কেচ্‌বুক সংখ্যা ৯-এ দেখা যাচ্ছে —তিনি ১৯১৬ সালে শিলাইদহে হিন্দু ও মুসলমান প্রজাদের অনেক ছবি এঁকেছেন। এই স্কেচ্‌বই-এর ৫৮ ইত্যাদি সংখ্যক ছবিগুলি হচ্ছে —'শিলাইদহে প্রজারা নদীর ধারে বসে আছে গুরুদেবকে দেখবে বলে। মুসলমান প্রজা সব। শান্ত শিষ্ট। পরে, মোল্লারা এদেরই দফা সেরে দিলে'। এই স্কেচ্‌বুকেই রয়েছে ওঁরা সান্তাহারের পথে যাচ্ছেন। —'তখন মুকুল দে ভাল স্কেচ করতেন। তা থেকে আমি নকল করতুম। তার পরে, আমি ভাল স্কেচ্ করতে শিখলুম'। ৭৭ সংখ্যার চিত্রটি হচ্ছে —সাজাদপুরের পোকন মাজী —দরবার করছে। ৮১-৮২ সংখ্যায় আছে, —গোমস্তা পাশে বসে রয়েছে —গুরুদেব ধমক দিচ্ছেন। ৮৫ সংখ্যক স্কেচে দেখছি, —তারণ সিং —গুরুদেবের চাপরাসী। প্রজারা এলে সে তাদের নিয়ে নিয়ে গিয়ে দরবার করাতো। —এই সব স্কেচের বিশদ বিবরণ ও সম্পূর্ণ সূচী আমরা যথাসময়ে প্রকাশ করবো।

দ্বিতীয় পর্যায়ের ২১ সংখ্যক স্কেচ্‌বুকে শিলাইদহের স্কেচ্ রয়েছে কতকগুলি ১৯১৬ সালে করা।

নন্দলালের করা —নিজের চোখে দেখা, আর কতক শোনা শিলাইদহের বাস্তব চরিত্রের স্কেচ্ বিভিন্ন বই-এ ছাপা হয়েছে, সে সব ১৯১৬ সালের প্রথম দিকে আঁকা। ওখানকার তারিখহীন স্কেচ্ আর কালি-তুলির বা রঙিন ছবিগুলির কতক ওখানে বসে, আর কতক লকাতায় ফিরে এসে এবং পরে, শান্তিনিকেতনে

বসেও এঁকেছিলেন। তারিখযুক্ত স্কেচ্‌গুলির সময়সীমা হচ্ছে ১৯১৬ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী থেকে ১৪ই এপ্রিল পর্যন্ত, অর্থাৎ শীত থেকে বসন্ত —দু মাস দশ দিন। কিন্তু শিল্পী শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর মহাশয় বলেন, —সেবারে শিলাইদহে ওঁরা দশ পনের দিনের বেশি ছিলেন না।

নন্দলালের আঁকা শিলাইদহের মুদ্রিত স্কেচ্‌ (১) লালা পাগলা (১৪-৪-১৬) (২) নিমাই ঠ্যাঁটা (৪-২-১৬) (৩) 'চরের প্রজা' (৪) লালন ফকির (৫) বোটের মাঝি (১০-২-১৬) (৬) চর-ভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ (৭) 'কিসের তরে নদীর চরে চখা-চখীর মেলা' (৮) তারণ সিং (৯) ফটিক মজুমদার (১২-৩-১৬) (১০) শান্ত শিষ্ট মুসলমান প্রজার দল কতক বসে আছে, কতক দাঁড়িয়ে আছে রবীন্দ্রনাথকে দেখবে বলে (১৪-২-১৬ (১১) কলসী রেখে মেয়েরা নায় ঘাটে (১২) খেয়া-ঘাটে ভিড় করেছে পদ্মাপারের লোক (কুঠির হাট) (১৩) স্বর্গ আমি বানিয়েছিলাম মাদারতলার চরে (মাদারতলার চর) (১৪) একটা কালো দাগের মত মিলায় বহুদূর (হানিফ্‌ চাচা) (১৫) সে বছর ভাদ্রমাসে মাঠ যবে জলে ভাসে (রায়-গিন্নি) (১৬) শোনাতে ছিলেন বাবুর হুকুম প্রজাদের সব ডেকে (এরফান মাতব্বর) (১৭) তিনশো বিঘার জ্যৈষ্ঠ করেতে উল্লাসে দিলো চাষ (১৮) আনন্দ ব্যাপারী। (এই স্কেচ্‌গুলি ছাপা রয়েছে শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারীর 'সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ' (১৩৪৯), 'পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ' (১৩৫২) 'সেকালের রবীন্দ্রতীর্থ' (১৩৫৩), 'কবিতীর্থের পাঁচালী' (১৩৫৩), 'রবীন্দ্রমানসের উৎস সন্ধানে' (১৩৬৬) বইগুলিতে। এ ছাড়া, নন্দলাল শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে অনেক ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিলেন।



এরফান মাতব্বর - নন্দলাল

॥ বাণীপুরের বাড়িতে কালীঘাটের পট পুনরুজ্জীবনে, ১৯১৬ ॥

শ্রীনন্দলালের ডায়েরী (সংখ্যা ১) থেকে দেখা যাচ্ছে, ১৯১৬ সালে কালীঘাটের পটের বিষয়ে অবনীবাবু আর নন্দলাল চিন্তা করছেন—কিভাবে এই পুরাতন রীতিতে নতুন ধারা প্রবর্তন করা যায়। অবনীবাবু ছিলেন তাঁর গুরু ; কিন্তু কেবল শিক্ষাদাতাই নন। মনে মনেও ছিল ও‘দের চিন্তার এক অদ্ভুত মিল। ১৯১৬ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে ‘বিচিত্রা-সভা’ প্রতিষ্ঠিত হবার আগে অবনীবাবু একদিন নন্দলালকে বললেন, —‘কালীঘাটের পট কিছু কর তোমরা। নতুন করে করতে হবে। অর্থাৎ আঁকার বিষয় হবে নতুন, কিন্তু টেক্‌নিক্ হবে পুরাতন অর্থাৎ ট্র্যাডিশন্যাল্। যাতে লোকে ছবি নেয়, লক্ষ্য রাখবে সেদিকে।’

কি রকম বিষয় নিয়ে নতুন ধরনের পট আঁকা হবে —সে সব চিন্তা করে অবনীবাবু নন্দলালকে ছবির নামের তালিকা দিয়েছেন। আর শ্রীনন্দলাল নানা পুরাতন বই থেকে তখন নানা জন্তু-জানোয়ারের ছবির স্কেচ করেছেন পটের ধরনের। তবে, পটের ছবি আঁকতেন তিনি বাণীপুরের বাড়িতে ব’সে ; কালীঘাটে বসে নয়। অবনীবাবু বলেছিলেন, —‘নন্দলাল আমার কাছে আর আসে না। সে কালীঘাটে বসে ছবি আঁকছে।’ —এ কথা আদবে ঠিক নয়।

১৯০৮ সালে নন্দলাল দক্ষিণ-ভারতে গিয়েছিলেন। ১৯০৯-১০ সালে গিয়েছিলেন অজন্তা। মেদিনীপুরের তমলুকে বর্গভীমা দেখতে গিয়েছিলেন ১৯১৩ সালে মহিমবাবুর সঙ্গে (ডায়েরী সংখ্যা ৩৮)। মেদিনীপুরে পট-পাটা সংগ্রহ করেছিলেন কিছু, আর দক্ষিণী কিছু কাটিংস্ সংগ্রহ করেছিলেন, দেখা যাচ্ছে প্রথম পর্যায়ের ২৭ সংখ্যক স্কেচ্‌বুকে।

অবনীবাবুদের বাড়ির সংগ্রহে পটের ছবি অনেক ছিল। ১৯০৮-৯ সালের আগে, আর্টস্কুলে পড়ার সময়ে, কালীঘাটের পটো-পাড়াতে গিয়ে অনেক পট সতীর্থদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে সংগ্রহ করেছিলেন নন্দলাল —তখন থেকে ১৯১৬ সাল পর্যন্ত এবং তার পরেও। প্রথম পর্যায়ের ৯ সংখ্যক

স্কেচ্‌বুকে দেখছি, তিনি ১৯২০ সালে শান্তিনিকেতনে স্থায়িভাবে আসার আগে কালীঘাটের ধরনের ছবি এঁকেছেন। তখনকার কালীঘাটের পুরাতন ঐতিহ্যের শেষ পটুয়া —পার্বতী চক্রবর্তী লেন-নিবাসী নিবারণচন্দ্র ঘোষ-এর স্কেচ্‌ করে রেখেছেন শ্রীনন্দলাল।

পট আর পুঁথির পাটার ওপর তাঁর আগ্রহ দেখেছি বরাবর। অবনীবাবু তাঁর পাটা-সংগ্রহ শান্তিনিকেতন-কলাভবনে উপহার দেন। ঐ সময়ে হাত-বদল হয়ে একখানি পাটা তাঁর নিকট আসে (ডায়েরী সংখ্যা ৫)। ড. শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একদা তাঁকে কয়েকখানি পাটা উপহার দিয়েছিলেন। বিশ্বভারতীর বাঙ্গালা-পুঁথিবিভাগ থেকে কলাভবনে অনেকগুলি পুঁথির পাটা ম্যুজিয়মে রাখবার জন্যে দেওয়া হয়। ছাত্রদের নির্দেশ দিয়ে একাধিক রঙিন পাটা কপি করিয়েছেন শ্রীনন্দলাল। দু-শো বছরের পুরানো পুঁথির পাটার ওপর আঁকা 'বকাসুরে'র রং আর অঙ্কন-পদ্ধতির সঙ্গে শ্রীনন্দলালের আঁকা 'গরুড়'-এর সাদৃশ্য বিস্ময়কর। —যাই হোক্‌ এ-সব ছবির তালিকা তৈরি করে তুলনামূলক আলোচনা পরে করা হবে।

এবার এই প্রসঙ্গে শ্রীনন্দলালের মুখের কথা শুনুন : —'অজন্তা যাবার আগে কালীঘাটের পটে প্রথম হাত-মক্‌স করেছিলুম। আবার আমাদের দেশের বাড়িতে বসে কালীঘাটের পট করতে লাগলুম, সে 'বিচিত্রা' হবার আগে। তার ত্রিশখানা ছবি ছিল অবনীবাবুর কাছে ; এখন আছে সেগুলি অলকেন্দ্রের ঘরে। ভাবলুম, গ্রামে বসে ফোক্‌-আর্ট করে রোজগার করবো। দেশে বসে আঁকবো, দেশেই বিক্রী করবো। সে এক মজার এক্সপেরিমেন্ট্‌ হবে।

'আঁকতুম বালির কাগজে। সাবজেক্ট্‌ ছিল প্রবাদ-প্রবচন —'বেল পাকলে কাগের কি', 'সাপে নেউলে', 'নেড়া বেলতলায় ক'বার যায়' —এই রকম সব। গ্রামের লোকে আনন্দ পাবে এই সবে। দাম কত ? —চার পয়সা করে।

'বাড়ির পাশেই মুদীর দোকান। সুতোয় বেঁধে টাঙিয়ে দিতুম সেখানে আমার ছবির পসরা। চুক্তি হলো মুদীর সঙ্গে, যা বিক্রী হবে সব পয়সা নেবে না সে। কিছু দেবে আমাকে। আমার

ছবিগুলো হলো মুদীর চা-বিড়ি-মণিহারী দোকানের যেন বিজ্ঞাপন।

'কুলি-কামিনদের কলে যাবার পথের ধারেই ছিল দোকান। ছবি আমার বিক্রী হতে লাগলো। আট আনা দশ আনা এক টাকারও বিক্রী হতো সারাদিনে। কোনদিন আবার হতোও না।

'বাইরের ঘরে বসে ছবি আঁকতুন। কিনতো যারা —দেখতে পেতো, যে-লোকটা ছবি আঁকছে তাকে। দেখতে দেখতে কৌতূহল বাড়তো তাদের। যাওয়া-আসার পথে চোখ আট্‌কাতো প্রতিদিন। লোভ ঘনালে জানলার গোড়ায় দাঁড়িয়ে লুব্ধ চোখে বলতো, —'ছবি কিনবো'। কিনতো —একখানা, দুখানা, ব্যস্‌, ট্যাঁক খালি। শেষে বলতো —'আর যে পয়সা নাই বাবু'। শুনে আমি বলতুম, —'তাতে কি, নে, নে পয়সা দিতে হবে না'। দু-একখানা ছবি ফাউ পেয়ে তাদের কী ফুর্তিই না হতো তখন, সে আর কি বলবো।' আমার শিল্পখেলা জমেছিল ভালোই। মাসে মাসে আসতো তা প্রায় পনেরো কুড়ি টাকার মতন। আরো আঁকতে পারতুম। কিন্তু, আঁকা হয়নি। কেন হয়নি সে কথা বলছি।

'সহসা একটা ঘটনায় এ্যাটিটুড্‌ বদলে গেল। হাত গুটিয়ে গেল। অবনীবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেছি —অনেক দিন পরে। বগলে আমার অ-বিক্রী ছবির তাড়া। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে দক্ষিণের বারাণ্ডায় বসে, বসে তিন ভাই একসঙ্গে গড়গড়া টানছেন। একসঙ্গে বসেই তামাক খেতেন তিন ভাই —অবনীবাবু, গগনবাবু আর সমরেন্দ্রবাবু। ছবিও আঁকতেন তাঁরা একসঙ্গে বসে।

'ছবি থাকলে, গুরুর কাছে হুট্ করে প্রথম দেখাতুম না। মন মেজাজ বুঝে তবে মেলে ধরতুম। সেদিন দেখলুম, খুশি বটে। আমাকে দেখামাত্র অবনীবাবু বললেন, —'ভাবছি, এতোদিন ছিলে কোথায়? কালীঘাটের পট নতুন করে আঁকবার জন্যে লিস্টি করেছি, বাঙ্গালা প্রবাদ-প্রবচনের বিষয়গুলো নিয়ে।' 'এই যে লিস্টি' —বলে, অবনীবাবু আমার সামনে তাঁর করা লিস্টি মেলে ধরতেই,

আমার বগল থেকে বেরিয়ে গেল আমার-করা ছবির তাড়া। 'অ্যাঁ, তুমিও এই করছিলে নাকি!' —থম্‌কে গেলেন তিনি। ছবি দেখে বললেন, —'এখনও রং হয়নি। বিক্রী করছো?' আমি বললুম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।' —'দাম কত?' —'চার পয়সা করে'। 'এক টাকা করে আমি কিনে নিলুম' —বলেই, তিরিশ টাকা তিরিশখানি ছবির জন্যে দিয়ে, অবনীবাবু কিনে নিলেন আমার সব ছবি। ব্যস্‌, আমারও মন কুঁচকে গেল —লজ্জাবতী লতার মতন। আর্টে ঘা পড়লো। এ্যাটিটুড্‌ বদলালো। সেই ধারা সেই থেকে বন্ধ হয়ে গেল। ও-খেলা ছেড়ে দিলুম। কেন যে এ্যাটিটুড বদলালো সে রহস্য বরাবর আমার অজানা।

'অবনীবাবুর ঘরে বসে অজন্তার ছবি কপি করার আগেও এই উদ্যোগ হয়েছিল। তার আগে ১৯০৯-১০ সালে গিয়েছিলুম অজন্তা। তবে সেই যে সেকালে কালীঘাটের পটে হাত-মক্‌স করেছিলুম, সেটা ব্যর্থ হয়নি আমার। তার ফল ফলেছিল —হরিপুরা-কংগ্রেসে। সেখানে যা এঁকেছিলুম সেগুলো সেই কালীঘাটের পটেরই বৃহত্তর খেলা। কালীঘাটের পটের প্রতি আমার যে প্রীতি ছিল, সেটা রূপ নিলে হরিপুরায় যাবার পরে। —সে-কথা পরে বলা হবে।

'ঐ রকম এক্স্‌পেরিমেন্ট্‌ আর একবার করেছিলুম শান্তিনিকেতনে। ১৯৪১ সালে গুরুদেবের মৃত্যুর পরে, অবনীবাবু বিশ্বভারতীর আচার্য হয়ে এখানে আসার আগে। লোকে বলতো,—আমাদের ছবির দাম বড়ো বেশি। মধ্যবিত্ত লোকে কিনতে পারে না। কিনতে পারে না, যারা ছবি ভালোবাসে তারা। সুতরাং আমার মাথায় এলো, ছবির দাম তিরিশ টাকার বেশি করবো না। অথচ যেমন আঁকি তেমনি আঁকবো। —'দুধ-চোরা গরু' কাকে বলে জানো তো? —নিজের মোড়ে দুধ থাকতে যে গাই বাঁটে দুধ ঝরায় না। আর্টিস্ট কখনো সেই দুধ-চোরা গরু হতে পারে না। যা জানে তা তাকে দিতেই হবে। বিশেষ উদ্দেশ্যে কিছু হাতে রাখবে এমন হয় না। যারা ওস্তাদ, বেতালা, বেসুরো গান তারা কখনো গাইতে

পারে না।

'সে সময়ে পাঁচখানা ছবি আঁকলুম আমি —তিরিশ টাকা করে দাম বাঁধলুম প্রত্যেকটার। 'গোল্ডেন বুকে' এই পর্যায়ের ছবি 'গুরুপল্লী' ছাপা হয়েছিল; নামও হয়েছিল। 'কেন্দুলীর মেলা', 'উড়ন্ত শালিকের ঝাঁক', 'ইনোসেণ্ট্ গার্ল', 'রাধার তমাল-আলিঙ্গন' —আঁকলুম মধ্যবিত্ত শিল্পরসিকদের জন্যে। দাম সস্তা বলে তারা কিনে নিতে পারবে, এই ভেবে। কিন্তু শেষে হলো কি, 'গোল্ডেন বুক্ অব টেগোরে' ছাপা ছবি 'গুরুপল্লী' ও. সি. গাঙ্গুলী কিনে নিলেন। আর বেশির ভাগ ছবি কিনে নিয়ে গেলেন দক্ষিণের চেট্টি মুদালিয়র। এই পর্যায়ের আর একখানি ছবি ছিল —'কালী'। কালী নাচছেন, হাতে তাঁর পদ্মের মৃণাল ধরা, পরিবেশ সূর্যের আলোর —বালার্কের ছায়ামণ্ডল। 'প্রবাসী'তে ছাপা হয়েছে ছবিখানি।

'এই 'কালী'র ছবিখানি তখনও বিক্রী হয়নি। অবনীবাবু ছবিখানি দেখেছিলেন; দাম শুনে চটেও ছিলেন। 'দু-শো টাকা দিয়ে কিনে নিলুম,' — বললেন গুরু আমার। অবনীবাবুর সংগ্রহ থেকে কিন্তু সে ছবিখানা মনে হয় চলে গেছে এখন আহমেদাবাদ কস্তুরভাই-লালভাই-সংগ্রহে।

'দেখলে তো, মধ্যবিত্তের উপকার করতে গিয়ে, কেবল ঠকলো আর্টিস্ট্। লাখপতির ঘর থেকে সে ছবিগুলো আবার চলে যাবে কোটিপতির ঘরে; আর এই ঠকা হলো কেবল মিড্‌ল্‌ম্যানের জন্যে। দুনিয়ার অর্থনীতির কাঠামো না-বদলালে আমাদের এই এক্স্‌পেরিমেণ্ট্ অর্থহীন। —সুতরাং ও পথ ত্যাগ করলুম।

'অজন্তার গুহাচিত্রের কপিতে মিসেস হ্যারিংহাম্‌কে সাহায্য করবার জন্যে সিস্টার সুপারিশ করে আমাকে পাঠিয়েছিলেন। তিন মাস বাদে অজন্তা থেকে ফিরে এসে, অবনীবাবুর বাড়িতে আমাদের কাজের ভিড় জমলো। মিসেস্ হ্যারিংহাম তো তাঁর কপিগুলো নিয়ে চলে গেলেন বিলেতে। তাঁর কপিগুলির কপি, আর আমাদের করা কপিরও কপি, সব আমাকে দু'কোড় করে করতে হয়েছিল —অবনীবাবুর জন্যে, আর মিসেস্ হ্যারিংহাম্-এর জন্যে। তখনই লক্ষ্য

করেছিলুম, অজন্তার ছবির সঙ্গে আমাদের দিশী পটের আঁকা পট আর পুঁথির পাটার ওপর আঁকা ছবিতে শিল্পছন্দে বেশ একটা মিল রয়ে গেছে। তাছাড়া, ওড়িষ্যার যে পট ও পাটা-শিল্প তার সঙ্গে বাঙ্গালাদেশের মেদিনীপুর-বাঁকুড়া-বর্ধমান-বীরভূম-মুর্শিদাবাদের পট ও পাটার ছবির বিষয় আর অঙ্কনপদ্ধতির মিল আছে। এতে আমার মনে হয়, এই দিশী চিত্রবিদ্যার শেকড় খুব পুরাতন কালের; আর এদেশের এই শিল্পধারা দ্বীপময় ভারতেও ছড়িয়েছিল। —সে-সব আলোচনা এখন থাক্।

এই অধ্যায়টিও আরম্ভ করা হচ্ছে শ্রীনন্দলালের মুখের কথা দিয়ে। —'শিলাইদহ থেকে আসার পরেই হলো 'বিচিত্রা' ১৯১৬ সালে। আর্টস্কুল থেকে আগেই (১৯১১) বেরিয়ে এসেছি। রোজগার করে খেতে হবে, সেই চিন্তা আমাদের সবার মাথায়। ক্ষিতিন, অসিত, শৈলেন —সব আসতেন। আমাদের হাতীবাগানের বাড়ির ছাদে বসে কথা হতো। ঠিক করলুম, আমরা পাঁচ-ছ'জন মিলে কলকাতায় বাড়ি করবো। একসঙ্গে রান্নাবাড়া হবে। খাবো, থাকবো, ছবি আঁকবো। ছবি বিক্রী করবো, বুক্-ইলাস্ট্রেট্ করবো —এই সব আমাদের আইডিয়া তখনকার।

'আমাদের এই জল্পনা শুনে অবনীবাবু বললেন, —'তোমাদের এর জন্যে আর ঘর করতে হবে না। আমারই ঘরে আসর পাতো তোমরা'। অবনীবাবুর ঘরেই আমাদের আসর পাতা হয়েছিল। পরে, কবির কানেও উঠেছিল এই কথাটা। তিনি পাকা কথা শেষে কয়ে দিলেন, —'অবন কেন, আমিই দিচ্ছি ঘর'। ব্যস্, লালবাড়িতে আমরা জুটে গেলুম সবাই —আমি, অসিত, মুকুল, সুরেন, দেবল —সবাই। প্রত্যেকের বৃত্তি হলো ষাট টাকা করে।

'দেখি. ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুর স্ট্রিটে 'লালবাড়ি'র নিচের তলায় লাইব্রেরী গোছাতে লাগলো। গুরুদেবের আর অবনীবাবুর বই সব নিয়ে প্রভাতবাবু লাইব্রেরী গোছাতে লাগলেন। অজিত চক্রবর্তী মশায় তখন লিখছেন —মহর্ষির জীবনী। রথীবাবুকেও প্রায়ই দেখতুম ওখানে। 'লালবাড়ি'র 'বিচিত্রা' নামকরণ কবিই করেছিলেন। সম্পূর্ণ নামটি হলো —'দ বিচিত্রা স্টুডিয়ো ফর্ আর্টিস্টস্ অভ্ দ নিয়ো বেঙ্গল স্কুল'। নিয়ম-টিয়ম তৈরী করেছিলেন বোধহয় সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। অবনীবাবু হলেন ফার্স্ট মাস্টার। গগনবাবু হলেন ডিরেক্টার। হাইকোর্টের জজ স্যার জন্ উডরোফ্, ব্যবসায়ী এন্.

ব্লাণ্ট্ আর এস্. মূলার সাহেব হলেন ভিজিটর।। ফাউন্ডেশন্ মেম্বার হলুম আমি, অসিত আর মুকুল। রথীন্দ্রনাথ ছিলেন সেক্রেটারী আর ট্রেজারার। তাঁরই উদ্যম ছিল সবচেয়ে বেশি। 'বিচিত্রা'য় যে যা আপনার কাজের, আর ওঁদেরই ওখানে থাকবার ব্যবস্থা করে নিজে। জমে উঠলো খুব। ছবি আছে, 'বিচিত্রায় একদিনের কাজ' —কলাভবনে রাখা আছে; দেখলেই ব্‌ঝতে পারবে। ব্যাপারটা হলো দুপুরে আর্টিস্টদের সব দিলখোলা বিশ্রাম।

'আমি আর সুরেন ছাড়া সবাই ওখানে এক-একখানা ঘর নিয়ে আস্তানা গাড়লো। ওখানেই থাকতো ওরা; আর খেতো ওঁদেরই রান্নাঘরে। আমি আর সুরেন রাজগঞ্জ থেকে ডেলি-প্যাসেঞ্জারী করতুম। সুরেন হলো আমার পিসতুত ভাই। অসিত, মুকুল, দেবল —সবাই ওখানে রইলো। নারায়ণ কাশীনাথ দেবল মূর্তি তৈরি (modelling) করতেন। মারাঠি বাপ আর বার্মীজ মা। এখনও দেবল আছেন বোধহয় দক্ষিণে কোথাও। শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র ছিলেন দেবল। ১৯১২ সালে গুরুদেব তাঁকে বিলেতে নিয়ে গিয়ে স্কাল্প্‌চার্ শিখিয়ে এনেছিলেন।

'দিনের বেলায় সকালে বিকালে ক্লাস চলতো 'বিচিত্রা'য়। ঠাকুরবাড়ির প্রতিমা দেবী, অলকেন্দ্রের স্ত্রী, সমরেন্দ্রনাথের ছেলে 'গবা' ওরফে ব্রতীন্দ্রনাথ, গগনবাবুর ছেলেমেয়েরা —কণকেন্দ্র, নবেন্দ্র, হাসি, পূর্ণিমা, সুধীন্দ্রনাথের কন্যা রমা, এণা, অলকেন্দ্রের ভাই 'কোকো' সব ছিলেন ছাত্রছাত্রী। বার থেকে আসতেন নীলরতনবাবুর তিন মেয়ে —নলিনী, অরুন্ধতী আর মীরা। আরও দু'একজন।

'ঐ সময়ে একজন জাপানী আর্টিস্ট্ এলেন, নাম কাম্পো আরাই সান। বিচিত্রাতে জয়েন করলেন তিনি। জাপানী-পদ্ধতিতে আমরা শিল্প-শিক্ষা আরম্ভ করলুম তাঁর কাছে। ইনি পরে একজন বিখ্যাত আর্টিস্ট্ হয়েছিলেন। জাপানের কিওটোতে হিরিওজি মন্দির ছিল প্রসিদ্ধ। সেই মন্দিরের ফ্রেস্কোর হুবহু মিল ছিল আমাদের অজন্তার ছবির সঙ্গে। অনেক সময় মনে হয়, যেন কপি। আরাই সান হিরিওজি মন্দিরের সেই ছবিগুলো সব কপি করেছিলেন। এখন কাঠের মন্দিরটা গেছে পুড়ে; রয়ে গেল মাত্র ছবির সেই কপিগুলি। দ্বীপময় ভারতের বিস্মৃত সংস্কৃতির

দুর্লভ নিদর্শন এগুলি। —আরাই শেখাতেন আমাদের। আমরা শেখাতুম আমাদের ছাত্রছাত্রীদের।

'মুকুল বিলেত থেকে ফিরে এসে তামার পাতের ওপর এচিং (etching) করতে লাগলেন। শেখাতেও লাগলেন। বিলেতে মিওরহেড্ বোনের কাছে তিনি এচিং শিখেছিলেন। আমাদের পিয়ার্সন সাহেবের বন্ধু স্যার মিওরহেড্ বোন্ (Muirhead Bone) সাহেবের আঁকা গুরুদেবের পোট্রেট্ বিখ্যাত। আমি, অসিত আর সুরেন লাগলুম পেন্টিং-এ। ১৯১১ সাল থেকে সুরেন অবনীবাবুর কাছে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করছিলেন। মুকুল বোধহয় এসেছিলেন অবনীবাবুর কাছে ১৯১২ সালে।

'বিচিত্রায় আরও যখন ছাত্র-ছাত্রী বাড়লো, বড়-বাড়ির পূব বারাণ্ডায় শিখতো প্রায় তিরিশ পঁয়ত্রিশ জন ছাত্রছাত্রী। বসতো সবাই আসন পেতে। আমরা ঘুরে ঘুরে শেখাতুম। কখনো আবদার করিনি আসবাবের জন্যে। ভাবিনি কখনও আসবাবের কথা। আর কলাভবনে এখনও (১৯৫৭) ওটা আমরা চালিয়ে যাচ্ছি। 'বিচিত্রা' —নামের সীল্ এঁকে-ছিলুম আম পল্লী-কুটিরের আদর্শে।

[১৩৬৪ সালের দিকে এই প্রসঙ্গ লেখার সময়ে শ্রীনন্দলালের সঙ্গে লেখকের আলোচনার পরে, নন্দলাল 'বিচিত্রা'র একটি সীল্ নতুন করে এঁকে, একখানি চিঠি লিখে লেখককে পাঠিয়েছিলেন ১৩৬৪ সালের ২২-এ শ্রাবণ। তাঁর এই নতুন আঁকা সীলটির সঙ্গে মূল স্কেচ্‌টির কিছু পার্থক্য আছে। এই সময়ে তাঁর সেকালের স্কেচটির আদল যা মনে পড়েছিল সেই রকম এঁকে পাঠিয়েছিলেন। এবং বিচিত্রার এই নতুন সীল্‌টি লেখকের 'বিচিত্রা'-প্রবন্ধের গোড়ার দিলে ভালো হয় —এই মন্তব্য লিখেছিলেন। লেখকের 'বিচিত্রা'-প্রসঙ্গে নন্দলাল' প্রবন্ধটি ১৩৬৪ সালের 'শারদীয় যাত্রী', পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। শহরের সেরা বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত অভিজাত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'বিচিত্রা-সভা'র প্রতীক আঁকতে গিয়ে পল্লীকুটীরের আদর্শ-চিন্তায় শ্রীনন্দলালের ধাতটি পরিষ্কার বোঝা যায়, —আমাদের দেশের পুরানো গ্রামীণ ঐতিহ্যকে ভালোবেসে তার পরিচয় সীমাহীন কালে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করা।]

'বিচিত্রার সময়ে 'কবির কলম' এঁকেছিলুম আমি —ঐ সময়ে ওখানে কবি যত রকম কাজের কথা ভেবেছিলেন সেগুলোর প্রতীক এঁকে। বিচিত্রায় আমন্ত্রণ-লিপিতে এই 'কবির কলম' আর 'বিচিত্রা'-সীল্ ছাপা থাকতো দুদিকে। এক পয়সার ডাক টিকিট লাগিয়ে সেই চিঠি সভ্যদের ঠিকানায় পাঠানো হতো। ওখানে ফর্‌ম্যাল্ সভ্য কেউ বোধহয় ছিলেন না। সবাই আসতেন অন্তরের তাগিদে।

'রথীবাবু আর সুরেন ঠাকুরের চেষ্টায় বিচিত্রার সাহিত্যসভা খুব জাঁকিয়ে চলেছিল। গুরুদেবই অবশ্য ছিলেন বিচিত্রার সাহিত্যসভার প্রাণ। আর ছিলেন অবনীবাবু। নিচের লাইব্রেরী আর দু'তলার হল-ঘর সাজানো হলো। দেওয়াল শীতলপাটী দিয়ে মুড়ে কাঠের ব্যাটন্ দিয়ে আটকানো হয়েছিল। হল-ঘরের দেওয়ালে আমার করা 'স্বপ্ন' আর সুরেনের করা 'সাথী' —দুটি বড়ো ছবি টাঙ্গানো হলো। অসিতের বড়ো ছবি 'গুহকের সঙ্গে রামের মিতালি' ছিল বলে মনে পড়ছে না। আসবাবের জন্যে আমি খাটোলা-চেয়ারের পরিকল্পনা করলুম। হাতলওয়ালা চৌকি, বেতের আসন, নতুন নক্সা কেটে করানো হলো। এর আগেই আমি রাঁচি বেড়িয়ে এসেছিলুম। সে-কথা এখনই বলছি।

'বিচিত্রা'র সাহিত্য-সভায় অবনীবাবু তাঁর লেখা পড়তেন। গুরুদেবও তখন 'ছবির অঙ্গ' এই নামে প্রবন্ধ লিখেছিলেন —অবনীবাবুর 'ষডঙ্গ' লেখা দেখে। 'বিচিত্রা'-সভার হল-ঘরে রথীবাবু তাঁর বৈজ্ঞানিক মাথা থেকে তামা আর পেতলের তার বসিয়েছিলেন —সভার অধিবেশনে কথা বললে, সেতারের মতন ঝঙ্কার হবে বলে। কতটা হয়েছিল জানি না। পাহাড়, নদীর ওপর লেকচার দিতেন তিনি শ্লাইড্ দেখিয়ে। রথীবাবুও এই সময়ে আর্টের চর্চা একটু একটু করে শুরু করতে থাকেন। জলরঙ্গে কতকগুলি ফুলের ছবি তখন এঁকেছিলেন তিনি। পরে, বিলেত থেকে তিনি চামড়ার ওপর শিল্পকাজ প্রথম শিখে এলেন। পরে, তিনি চমৎকার কাঠের শিল্পকাজও করেছিলেন অনেক। প্রতিমা দেবীও বিলেত থেকে মাটির শিল্পকাজ শিখে এসেছিলেন। ১৯০৯ সালে ওঁদের বিয়ে হয়। বিচিত্রার সময়ে ওঁদের এক বিবাহবার্ষিক দিবসে খাবার-ঘরের বিচিত্র মণ্ডন করে দিয়েছিলুম মনে পড়ে। ওঁদের বিয়ের বছরে আমি

'চয়নিকা'র জন্যে ছবি আঁকি। রথীবাবু বিচিত্রার সময়ে কলকাতায় মটরকারের কারখানা খুলেছিলেন। আমি প্রতিমা দেবীকে তখন নিয়মিত ছবি-আঁকা শেখাতুম।

'গগনবাবু, সুরেন ঠাকুর আসতেন; সুকুমার রায়, চারু বন্দ্যো, সৌরীন মুখো, সত্যেন দত্ত আসতেন; দিনুবাবু তো ঘরেরই লোক। এ-ছাড়া জামাই মণিলাল, বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র, সম্পাদক রামানন্দবাবু, ভাষাতাত্ত্বিক সুনীতিকুমার আনাগোনা করতেন নিয়মিত। সভার অনেক অধিবেশনে গুরুদেব অনেক রচনা পড়েছেন। ওস্তাদী গান বাজনার তোড়জোড় থাকতো খুব। কবি নিজে ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীর ওপর লেকচার দিয়েছিলেন একবার। শুধু বক্তৃতা নয়। প্রত্যেকটি রাগিণী নিজেই গেয়ে গেয়ে সেদিন প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে, তাঁর লেখা গান আর তাঁর দেওয়া সুর, মার্গসঙ্গীতের অজ্ঞতা-প্রসূত নয়। অজ্ঞ বরং নিন্দুকেরাই। কালোয়াতি গানে কবি দুরস্ত নন বলে কটাক্ষ করতেন যাঁরা, সেদিন সে-সব বিখ্যাত ওস্তাদী গান তাঁর মুখে শুনে তাঁদের মুখ বন্ধ হলো।

'গগনবাবুর আঁকা নানা ব্যঙ্গচিত্র আর অবনীবাবুর আলপনার বই বিচিত্রার লিথো-প্রেস থেকে তখন ছাপা হয়েছিল।

'তা'ছাড়া নাটক অভিনয়। 'ফাল্গুনী' (১৯১৬, জানুয়ারী), 'বৈকুণ্ঠের খাতা' (১৯১৭, ১২ আশ্বিন, ১৩২৪), 'ডাকঘর' (১৯১৭, ২৫ আশ্বিন, ১৩২৪) অভিনয় এই বিচিত্রার মারফৎ হয়েছিল কলকাতায়। স্টেজ-রচনা আর অভিনয়-সজ্জার সকল ভার পড়েছিল আমাদের ওপর। অবনীবাবু তাঁর 'ঘরোয়া'য় এ-সব কথা বেশ লিখে গেছেন। 'ডাকঘর' অভিনয় দেখতে আনি বেসান্ট্, মদনমোহন মালব্য, গান্ধীজী, তিলক এসেছিলেন।

'রসিক ধরার ফাঁদ জানা ছিল কবির। বনেদী ভদ্রতাও বলতে পারো। সাহিত্যসভার আসর জমানোর চার সব থরে থরে সাজানো থাকতো প্রকাণ্ড একটা টেবিলে। —চব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয় খাবার সে কতো রকমের। অপর্যাপ্ত সে সব খানাপিনা। যার যা খুশি চালাতো ঘুরে ফিরে, —সেই লালবাড়ির ওপরতলার মাঝের ঘরে। জলযোগের আগেই পালাবার চেষ্টা করে কেউ বোধহয় সফল হননি কখনও।

'এই রকম এক মজলিসে অবনীবাবু একবার একটা তাজ্জব ঘটনা বললেন। তাঁর নিজের চোখে দেখা ঘটনা —'পেরেটির খানা বিখ্যাত ছিল সে সময়ে। ব্যাপারটা সেই নিয়েই। একজন মুসলমান বাজিকর এসে বললে, —কি খেতে চান আপনারা। বললুম সবাই আমরা পেরেটির খানা খাব। সাদা কাপড়ে প্রকাণ্ড টেবিল ঢেকে দিলে বাজিকর। খানিক বাদে বললে, —'ঢাকা খুলুন'। সবাই সবিস্ময়ে দেখলুম, সত্যিই সব গরম গরম প্লেট। প্রত্যেকটি প্লেটে পেরেটির মার্কা মারা। হৈ হৈ ব্যাপার। সত্যি করেই 'পেরেটির খানা' খাওয়া হলো।'

'আর একটা বাজি করেছিল সে, —বললেন অবনীবাবু। —'সেটা একটা ঘড়ি নিয়ে। একজনের একটা দামী ঘড়ি চেয়ে নিয়ে, থলেতে পুরে হাতুড়ি দিয়ে গুঁড়ো করে ফেললে সেটাকে। যার ঘড়ি সে বেচারা তো অস্থির। তখন বাজিকর তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললে, ঘাবড়াচ্ছেন কেন, আপনার ঘড়ি আপনার বাক্সেই আছে। আয়ারন্ সেফ্ খুলে সত্যিই ঘড়ি পাওয়া গেল। তখনকার দিনে বিখ্যাত বেতালসিদ্ধ ছিল যেন লোকটি।

'বিচিত্রায় বেতন আমরা পেতুম নিয়মিত। পেত না কেবল একজন। সে ভারী মজার ঘটনা। তখন ওখানে গোপাল চাটুজ্জে ছিলেন খাজাঞ্চী। তিনি ছিলেন আমাদের হরিচরণবাবুর পিসতুতো ভাই যদু চাটুজ্জে মশায়ের ছেলে। জমিদারি সেরেস্তার মেজাজী লোক। আমরা 'গোপালদা' বললে ভারী খুশি হতেন তিনি। শুধু কি তাই, অগ্রিমও দিতেন দরকার পড়লে। কি করে জানো? তাঁর সঙ্গে জমিয়ে-ছিলুম আমরা। বসে আড্ডা দিতুম আপিসে। সুখ-দুঃখের কথা বলে আত্মীয়তা জমিয়েছিলুম তাঁর সঙ্গে। কিন্তু যাঁর কথা বলছি, তিনি তাঁর সঙ্গে অফিসীয়েল ট্রিট্‌মেণ্ট্ করতেন। ফলে, মেজাজ যেত তাঁর বিগড়ে। চার পাঁচ দিন ধরে বেগ দিতেন তাঁকে টাকা দিতে। তাতে কষ্টে পড়তেন তিনি। একদিন নালিশ করলেন তিনি কবির কাছে। কবি ছিলেন লোকচরিত্রবিশারদ; বিশেষ করে জমিদারি সেরেস্তার লোকেদের চরিত্র ছিল যেন তাঁর নখদর্পণে। তিনি তাঁকে পরামর্শ দিলেন —'ওকে 'গোপালদা' 'গোপালদা' করবি, তা হলে দেখবি, টাকা

পেতে আর দেরি হবে না। ঠিক সময়মতো দেবে।’ ব্যস, ওষুধ পড়লো রোগের মতো। তারপর থেকে মাইনে পেতেন তিনি আমাদের সঙ্গেই।

‘সুরেশের বাড়িতে আড্ডা জমতো আমাদের, তাঁর হোগলকুড়িয়া লেনের বাড়িতে। সুকুমার রায়, চারু বন্দ্যো, সত্যেন দত্ত, দিনুবাবু —আমরা সব জুটতুম সেখানে। জাপান-ফেরতা ছিল আমাদের সুরেশ বন্দ্যো। জাপানের সুকমার-শিল্প সম্পর্কে সুরেশ বন্দ্যো অনেক আলোচনা করেছিলেন ১৩২৪ সালের দিকে প্রবাসী-ট্রবাসীতে।

‘সত্যেন দত্তের বাড়ি যেতুম প্রায়ই। আমাদের হাতীবাগানের বাড়ির কাছেই মসজিদবাড়ি স্ট্রিটে ওঁদের বাড়ি ছিল। চায়ের আড্ডা বসতো সেখানে। সত্যেন দত্তর জাপানী ধরনের লেখার তখন খুব নামডাক ছিল। তাঁর সেই মানি-ব্যাগ আর মরা কোলা-ব্যাঙের স্যাটায়ার তখন আমাদের মুখে মুখে ফিরতো। ওঁদের লাইব্রেরী খুব ভালো ছিল। ছবির বইয়ের সংগ্রহই ছিল ওঁদের সবচেয়ে ভালো। প্রিমিটিভ্ আর্টের বই ওঁদের বাড়িতেই প্রথম দেখি। সত্যেন দত্ত সেই সময়ে কবিতা লিখেছিলেন আমাদের ওপর—

‘একদা যে দীপ জ্বালিল ধীমান, সে দীপ আজি এ নগরী জ্বালে।
পঞ্চ-প্রদীপ অবনী গগন অসিত মুকুল নন্দলালে॥’

কিন্তু বড়ো মরোস্ —বিমর্ষ থাকতেন তিনি। আর থাকতেন ভয়ানক গম্ভীর, যেন কি একটা দুঃখ চেপে আছে সব সময়ে তাঁর ওপর। চোখও খারাপ ছিল খুব। নেশা ছিল সিনেমায়। রসিকও যে ছিলেন না তা নয়। কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে আসতেন যখন সত্যেন দত্ত, সুকুমার রায়, সুনীতিবাবু, ধীরেন দত্ত ট্রেনে হৈ হৈ করতে করতে আসতেন। গুরুদেবকে লেখা শোনাতেন তাঁদের। শুনে যেতেন কবির লেখাও। ফিরতেন ট্রেনে সবাই —একজোটে গান হেঁকে।

‘প্রিমিটিভ আর্টের কথা বলতে, রামগড়ে আমাদের একজনের ভালুক-শিকারের কথা মনে পড়লো। পাহাড়ে ভালুক কি করে চড়াই-উৎরাই করে জানো? যখন উঠতে হয় তখন ভালুক হাতে-পায়ে ওঠে ঠিক। যখন নামতে হয় সে-পদ্ধতি ওদের যেন ভারি আরামের। ওপর থেকে ওরা হাত পা ছেড়ে দেয় চোখ বুজে, তার গড়াতে গড়াতে কোনো গাছ-

পালা, গুহা-গহ্বরে এসে পৌঁছে যায়। এখন ওদের ভালুকটা ছিল পাহাড়ের ওপরের একটা গাছে। বন্দুকধারী শিকারীকে আর ওদের দেখেই প্রাণভয়ে গাছ থেকে নেমে সেই ভালুকটা ঢালু পাহাড়ে গড়াতে লেগেছে। এই না দেখে আমাদের বীর শিল্পীটি তখন ঝাপটে ধরেছে শিকারীকে। শিকারী বলছে —আঃ ছাড়ুন, গুলি করি ওটাকে। তখন আর কে কার কথা শোনে। ফলে হলো কি, অক্ষত অবস্থাতেই ভালুকটা গড়াতে গড়াতে একটা নিরাপদ স্থানে পৌঁছে গেল।

'বিচিত্রা বেশি দিন চলেনি। দেড় বৎসর মাত্র। সহসা একদিন শুনলুম, এখান থেকে পাত্তারি গোটাতে হবে। বিচিত্রায় তখন ভাঙ্গন লেগেছে। অসিত, মুকুল, দেবল চলে গেল। আর যে যা ছিল সকলেই চলে গেল। বিচিত্রা ভেঙ্গে গেল।

'রইলুম আমি আর সুরেন। প্রতিমা দেবীকে তখনও আমার শেখানো চলতে লাগলো। আর আর ছাত্রছাত্রী সব চলে গেল। ফাণ্ড্ ফুরিয়ে গেছে গুরুদেবের। টাকা ফুরিয়েছে। তবুও রইলুম আমি আর সুরেন। তখন জগদীশবাবু কাজের অর্ডার দিলেন ওঁর বৈঠকখানায় ছবি করবার কাজ।—

'এই সময়ে ১৯১৬ সালে দ্বারভাঙ্গায় আমার পিতৃবিয়োগ হয়। বাবার অসুখ শুনেই আমি দ্বারভাঙ্গায় গেলুম। সেখানে বাবা তো মারা গেলেন। সে আশ্বিনের ঝড়ের বছর। ১৩২৩ সালের বিজয়া দশমীর ঝড়। আমি দ্বারভাঙ্গা থেকে ফিরে এসে শ্রাদ্ধ করলুম রাজগঞ্জে।

'বাবার মৃত্যুর পরে, শ্রাদ্ধ সেরে ফিরে এসে তখনও আমি প্রতিমা দেবীকে শেখাচ্ছি; নিজেও আঁকছি। সোসাইটিতেও যাচ্ছি। জগদীশবাবুর বৈঠকখানার বাকি Fresco-র কাজটা শেষ করলুম। দ্বারভাঙ্গা যাবার আগে কিছুটা করে গেসলুম, ফিরে এসে শেষ করলুম। এর মধ্যে সুরেন —কতকগুলি পাটাতে —অজন্তার কপি শেষ করে রেখেছিল। জগদীশবাবুর কাজ শেষ করে সুরেন এলেন শান্তিনিকেতনে ১৯১৭ সালের জুলাই মাসে।—

'এর আগেই বিচিত্রার সেই শেষের ঘণ্টা বেজে গিয়েছিল।

সে বড়ো আশ্চর্য আর করুণ-স্মৃতি-জড়ানো কাহিনী ; অচিরেই সংহারের দেবী মনে প্রকট হলেন যেন। বলি, শোনো। আমার স্টুডিও ছিল লালবাড়ির পুবের বারাণ্ডায়। সেখানেই বসে কাজ করতুম। সেই সময় (১৯১৭ মে) গুরুদেবের জন্মোৎসব হলো বিচিত্রায়। আমি বসে আঁকছি একদিন, সহসা কবি এসে নিঃশব্দে পাশে কখন যে বসেছেন, টের পাইনি। সুরেনকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে যাবার প্রসঙ্গে, আমার পিঠে হাত দিয়ে, শান্তস্বরে কবি বললেন, —'দেখ নন্দলাল, তোমার বাহনটিকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে যাবো ঠিক করেছি। ও ওখানে ছেলেদের ছবি আঁকা শেখাবে'। 'বেশ তো' —আমি বললুম, 'খুশি হবো'। কবিকে কেমন যেন আনমনা দেখালো। আর কথা এগোল না বিশেষ কিছু। আমি তখন ছবি আঁকছিলুম, —ছোট্ট, ওয়াটারকালার ছবি —'ধূমাবতী'র। ধ্বংসের দেবী ধূমাবতীর। কাকধ্বজ ধ্বংসের দেবী ধূমাবতী। ছবিটা কিনে নিলেন ও. সি. গাঙ্গুলী। 'বিচিত্রা' সত্যিই ভেঙ্গে গেল।

'বিচিত্রা'-প্রসঙ্গে নন্দলালের ডায়েরীতে অনেক সংবাদ লেখা আছে। ১৯১৬-১৭ সালের ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ১০, ১৬, ২৬, ৩২ ও ৩৮ সংখ্যক ডায়েরী থেকে বিস্তৃত সংবাদ অনেক পাওয়া যায়। এ ছাড়া, শ্রীনন্দলালের দ্বিতীয় পর্যায়ের স্কেচ্‌বুকের প্রথম সংখ্যাতে বিচিত্রাকালীন কিছু স্কেচ্‌ আছে।

তাঁর লেখা ডায়েরীতে এই সব সংবাদ লেখা রয়েছে : —(১) ১৯১৬ —কালীঘাটের পটের বিষয়ে অবনীবাবু আর নন্দলাল চিন্তা করছেন, —কিভাবে নতুন ধারা প্রবর্তন করা যায়। কি রকম বিষয় নিয়ে নতুন আঁকা হবে, সে-সম্পর্কে অবনীবাবু একটি তালিকা দিয়েছেন। আর নানা পুরাতন বই থেকে নানা জন্তু-জানোয়ারের ছবির স্কেচ্‌ করা আছে।

(২) বিচিত্রার সময়কার কতকগুলি জন্তু-জানোয়ারের ছবি করা আছে পুরাতন বই থেকে দেখে।

(৩) বিচিত্রার সময়ের note বই : এতে আছে বিচিত্রার শেষপর্যায়ে জগদীশবাবুর বৈঠকখানায় ফ্রেস্‌কোর ছবি আঁকা হচ্ছে

তার বিবরণ, তার খরচপত্রের হিসেব। জাপানী কায়দায় আসনে বসা, কালি-গোলা, কালি দিয়ে তুলি টানার কায়দা দেখানো আছে। জাপানী-পদ্ধতিতে অাঁকার সময়ে শিল্পিবেশের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। জাপানী কায়দায় ছবি থেকে মোটা কাগজের ওপর ট্রেস্ করার বিবরণ —বাগগুহায় এই রকম পদ্ধতি প্রয়োগ করা হতো —অল্প শিক্ষালাভ করেই। জাপানী রঙের নাম —শি, শিধো —এই সব। আরাই সানের বলা জাপানী রঙের সব নাম। জগদীশ বাবুর বাড়িতে পটোরা সিলিং-এ বেত বাঁকিয়ে তুলি দিয়ে বৃত্ত অাঁকছে —তার স্কেচ্।

(৪) দেশে থাকতে টালির ওপর জাফরি-কাটার স্কেচ্।

(৫) একজনের কাছ থেকে একখানি খোদাই-করা পাটা (নক্সা) কেনা হয়। তিনি এটি অবনীবাবুর পাটা-সংগ্রহ থেকে বাগিয়েছিলেন। অবনীবাবু তাঁর পাটা-সংগ্রহ কলাভবনে উপহার দেন। এই পাটাটি সেই সংগ্রহেরই।

দুর্গা-প্রতিমার চালচিত্তিরের কাঠামোর নক্সা।

মেয়েদের হাতের গহনার পর পর নাম: পৈঁছা, কঙ্কণ, চুড়ি, ছন্দ, তাড় (নদীর ধার 'বিচ') —চুড়ির নিচের ভাগ।

অসিতের ও সুরেনের (কর) বিচিত্রাকালীন পোট্রেট্।

১৯১৬ ॥ 'মানসার' থেকে দিশী মাপের তালিকা —এই সব মাপ ব্যক্তিগত শিল্পীর হাতের মাপ অনুযায়ী হবে।

কতকগুলি প্রদীপ ও পিতলের পেঁটরার নক্সা।

বিবাহে স্ত্রী-আচার, বরণ-ডালা ইত্যাদির বর্ণনা।

(৬) বিচিত্রার সময়কার ॥ ব্রহ্মার কমণ্ডলুর নক্সা —কলকাতা-ম্যুজিয়াম-সংগ্রহ থেকে —জরায়ুর আকৃতি-অনুসারী।

(৭) বিচিত্রার সময়ে 'ডাকঘর' —অভিনয়ে স্টেজের পরিকল্পনা। হাওড়া-পুলের স্কেচ্।

(১০) বিচিত্রার সময়কার কবির কলম এঁকেছিলেন: বাঁশের খুঙ্গিতে রাখা হাতুড়ি, আড়বাঁশী, কলম, তুলি আর কাগজের গুটুলি —বিচিত্রার কাজের প্রতীক। হাতের কাজের জন্যে হাতুড়ি, গানের বাঁশী,

লেখার কলম, ছবি আঁকার তুলি আর বিদ্যার আধার পুঁথির খুঙ্গী।

একটি Exhibition —ছবি ও list.

ফার্ণিচার : থলি ইত্যাদির নক্সা।

(১৬) বিচিত্রার সময়কার কাজের নির্দেশ। . Class work (routine)।

হ্যাভেল সাহেবের বই থেকে ফ্রী-হ্যাণ্ড্ ড্রয়িং, নতুন কম্পোজিশন, অলঙ্করণ —এই সব করানো হতো। ছাত্রছাত্রী : নবু, গোপাল, গবা, প্রতিমা, মুকুল, কোকো প্রভৃতি।

'রুদ্রবীণে'র স্কেচ্।

(২৬) নোট বই। বিচিত্রার সময়কার। অজন্তার কয়েকটি স্কেচ্। Indian Anatomy (অবনীবাবু) লিখছেন —তার জন্যে নন্দলালের করা ছবির নক্সা। ধানক্ষেতের তিলে-কাঁকড়ার স্কেচ্। ওলগাছের ও ভেটকোল গাছের স্কেচ্। 'দেশে থাকতে তিলে-কাঁকড়া খুব খেতুম তখন।'

(৩২) ১৯১৭। দ্বিজেন্দ্রনাথের ছোট ছেলে কৃতীবাবুর পোর্ট্রেট্ —অজীন্দ্রনাথের কাকা।

অলকের স্ত্রী পারুলের পোর্ট্রেট্। গগনবাবুর কন্যার মুখ। আর ঠাকুরবাড়ির কয়েকজন ছেলেমেয়ের স্কেচ্। কাঞ্চনজঙ্ঘার কয়েকটি স্কেচ। একট ভুটিয়া মন্দির। নীলরতনবাবুর বড়ো মেয়ে —বিচিত্রায় নন্দলালের ছাত্রী ছিলেন তাঁর স্কেচ্। ('নাম ভুলে গেছি —বিশেষ কিছু না-হলে আভাসে মনে থাকে। ওরা ঠিক্ মনে রাখে ; মেয়েদের ব্যাপার তো')। নামগুলি উদ্ধার করে দেওয়া হয়েছে।

(৩৬) ১৯১৭। বিচিত্রার সময়কার। (১) মুকুল দের পোর্ট্রেট্ অবনীবাবুর আঁকা ; অবনীবাবুর সবই এতে আছে (২) মুকুল দের পোর্ট্রেট নন্দলালের করা —মুকুল দে এচিং করছেন।

অতঃপর শ্রীনন্দলালের দ্বিতীয় পর্যায়ের স্কেচ্‌বুকের প্রথম সংখ্যায় রয়েছে :— (পৃ. ৩) নন্দলালের করা অবনীবাবুর পোর্ট্রেট, (পৃ. ৫)

অবনীবাবু আলমগীর ছবি করছেন —পাশে রূপকৃষ্ণ বসে আছেন, (পৃ. ৮) নন্দলালের ছোট ছেলে গোরাচাঁদের স্কেচ্।

দ্বিতীয় পর্যায়ের স্কেচ্‌বুক সংখ্যা ৪ (পৃ. ৭) নন্দলালের করা সুরেন করের ১৯১৭ সালের পোট্রেট। পোট্রেট —ক্ষিতীশ মিত্র —মামাশ্বশুর। ক্ষিতীশ মিত্রের বাবা ছিলেন ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট্।

দ্বিতীয় পর্যায়ের স্কেচ্‌বুক সংখ্যা ১৭ (পৃ. ১) ১৯১৭ 'কালী'র ছবির ড্রয়িং।

॥ সতীর্থ অসিত হালদারের সঙ্গে রাঁচি-ভ্রমণ, ১৯১৬ ॥

১৯১৬ সালে 'বিচিত্রা' থেকে রাঁচি-ভ্রমণে গেলেন শ্রীনন্দলাল পুজোর সময়ে। রাঁচি গেসলেন চেঞ্জে। তখন নন্দলালের হাতে এক রকম বেদনা হতো। শিরায় ব্যথা। কন্‌কন্ করত শুধু। নিউরেল্‌জিক পেন্। অসিতকুমারের পিতা সুকুমার হালদার মহাশয়ের নাপিত ম্যাসাঝ্ করতে পারতো খুব ভালোভাবে। নার্ভ টিপে টিপে সরষের তেল দিয়ে মালিশ করে দিত সে। তার ঐ মালিশ দিয়ে দলাই-মলাইয়ের ফলে সেরে গেল বেদনাটা।

অসিতকুমারের মা সুপ্রভা দেবী তখন বেঁচে। রবীন্দ্রনাথের সেজদিদি শরৎকুমারী আর যদুনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা ছিলেন তিনি। খুব সুগৃহিণী ছিলেন সুপ্রভা দেবী। রাঁধতে জানতেন খুব ভালো। সুকুমারবাবু তখন ডেপুটিগিরি থেকে অবসর নিয়েছেন। প্রচুর ধানজমি কিনেছেন রাঁচিতে সাম-লং অঞ্চলে চাষ-আবাদের জন্যে। সেই জমিতে বাড়ির যাবতীয় খরচের জন্যে দরকারী তরিতরকারি ফলাতেন তিনি। ফল-টলও হতো সবই। মায় সরষে থেকে তার তেল পর্যন্ত পেষা হতো। তিল, সরষে, মসনের সব চাষ করতেন তেলের জন্যে। সুকুমারবাবুর সাম-লং ফার্মের বাড়িতে এক নুন ছাড়া প্রায় আর কিছু কিনতে হতো না।

মলশোধক পায়খানা ছিল না তখন ওখানে। সুকুমারবাবু নতুন রকমের একটা পায়খানা তৈরি করিয়েছিলেন। পায়খানা নর্দমা সব —দূরে। গাড়ীতে করে ময়লা আরও দূরে ঠেলে নিয়ে গিয়ে জমিতে পোঁতা হতো। সুকুমারবাবুর উদ্ভাবনী-শক্তি ছিল খুব। দেখতেও ছিলেন তিনি খুব লম্বা চওড়া —চমৎকার। তিনি ছিলেন এ্যান্টি-মিশনরী। দু'চোখে দেখতে পারতেন না ওঁদের। মিশনরীরা তখন ওখানে আদিবাসী কোসদের ওপর খুব অন্যায় করতো, অত্যাচার করতো। আর নানা প্রলোভন দেখিয়ে ওদের ধরে ধরে খৃষ্টান করতো। এই সব অন্যায় অত্যাচার কি ধরনের করা হতো, সে-সব সবিস্তর লিখে তিনি বিলেতে

তার করে পাঠিয়েছিলেন।

রাঁচিতে বেড়াতে গিয়ে নন্দলাল 'কোল-ডান্‌স' দেখেছিলেন। কোলদের নাচের ব্যবস্থা করলেন সুকুমারবাবু। সেই নাচ দেখে নন্দলাল স্কেচ করলেন। স্কেচটি শেষ করে পাঠিয়ে দিলেন তিনি অবনীবাবুকে। সেই মূল ছবিটি এখন রয়েছে বোধহয় শ্রীপুলিনবিহারী সেন মহাশয়ের কাছে। অলকবাবুর কাছ থেকে তিনি সংগ্রহ করে থাকবেন। নন্দলাল চেপে ধরলে অলকবাবু আবার ব্রতীন্দ্রবাবুর ওপর দায় চাপিয়ে থাকেন। মোদ্দা কথা, ওটা অবনীবাবুদের বাড়ি থেকেই বিক্রী হয়ে থাকবে। প্রিণ্ট আছে সে ছবির।

নন্দলালের করা সেই 'কোল-ডান্‌সের' স্কেচ থেকে অবনীবাবু বড়ো লাইফ-সাইজ অয়েল-পেনটিং করে পরে দেখিয়েছিলেন নন্দলালকে। নন্দলাল আবার কিছু কিছু অদল-বদল করে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন অবনীবাবুকে। ওঁরা দু'জনে মিলে ফিনিশ করেন সেই ছবিখানি। সে ছবিখানি নাই এখন এদেশে। সুইডেনের কে যেন একজন সেটি কিনে নিয়ে গেলেন। দু'তিন হাজার টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে গেছেন। সাত আট ফুট হবে সে ছবিটির সাইজ। বেশ বড়ো ছবি।

সুকুমারবাবুর বোধহয় পাঁচ জন ছেলে শান্তিনিকেতনে থেকে পড়াশোনা করত। বড়ো ছেলে শ্যাম একটু অপ্রকৃতিস্থ ছিলেন। সেই ছেলের সঙ্গে বাপের ঝগড়া হয়। ঝগড়া করে মাটির চাঁই তুলে মেরে, ছেলে দিলেন বাবার চোখ কানা করে। তাই বাড়িতেই আট্‌কানো থাকেন। তবে পিতা ক্ষমা করেছিলেন পুত্রকে।

নন্দলাল, অসিতকুমার আর কালিদাস চট্টোপাধ্যায় মিলে হুঁড্রু ফল্‌স্ দেখতে গেলেন। যাবার সময়ে অসিতকুমারের মা আলুর রুটি তৈরি করে দিলেন। আর দিলেন একটা আস্ত মুরগীর রোস্ট্ করে। সেগুলো সব বেঁধে-ছেঁদে নিয়ে পুশ্‌পুশ্ গাড়িতে চড়লেন। পুরুলিয়ার দিকে পার্বত্য পথে গাড়ি চলতে লাগল। গাড়ি থামল এসে 'জোন্‌হা' স্টেশনে। সেখানে নেমে, সব দেখে শুনে, স্নান করে এক রাত্রি রইলেন স্টেশনে। পরদিন তাঁরা দিনের মতো খাবার রেঁধে নিলেন। মুরগীর রোস্ট্‌টা ঝুলিয়ে রাখতেন। মাঝে মাঝে কিছু রুটি খেতেন,

আর রেখেও দিতেন কিছু। কালিদাসবাবুর আর অসিতকুমারের সহযোগে অম্বরী তামাক খেতে লাগলেন নন্দলাল মনের আনন্দে। তারপর সারাটি পথ হেঁটে চলতে হবে। ওখানে রান্নাবাড়া করতেও মজা পেয়েছিলেন খুব।

এদিকে, ভোরবেলা হঠাৎ টক গন্ধ পেলেন। দেখলেন রোস্টটা খারাপ হয়ে গেছে। শেষে, রুটি আর চা খেয়ে সারা সকাল হেঁটে চলতে লাগলেন। হাঁটা পথে জোন্‌হা থেকে হুঁড্রু প্রায় আট-দশ মাইল। দু-তিনটে পাহাড় টপকে যেতে হবে। তাঁদের হাঁটা চলতে লাগলো বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে, আবার রোদ্দুরে শুখোতে শুখোতে। রোদ্দুরে কাপড় মেলে দিয়ে, শুখোলে আবার চলা শুরু হয়। প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গেলেন দুপুর নাগাদ। ছ'সাত ঘণ্টা লেগেছিল মোট। দূর থেকে শব্দ শোনা গেল হুঁড্রু জলপ্রপাতের। খুব বিখ্যাত প্রপাত। প্রায় ১৫০ ফুট ওপর থেকে জল পড়ছে। জল পড়ছে দুটো পাহাড়ের খাঁজের ভেতর দিয়ে। সুবর্ণরেখার জল। অনেক পাহাড়ের চুড়ো ভেঙ্গে বয়ে আসছে নদী সুবর্ণরেখা। নিচে জল পড়ছে। আচমকা দেখে মনে হয়, যেন তুলোর গাদা ঘূর্ণী ঝড়ে ওপরে ওঠার চেষ্টা করছে।

ওঁদের সঙ্গী অসিতকুমারের সেই পাগল ভাই শ্যাম নিচে প্রপাত দেখতে দেখতে হঠাৎ টলে পড়লো। ধরে ফেললেন নন্দলাল। বেঁচে গেল সে। তার মস্ত ফাঁড়া গেল একটা। প্রপাতের ঠিক ওপরেই একটা পাকাবাড়ি আছে। একজন সাহেব ঐ বাঙ্গলোটা তৈরি করিয়েছিলেন। বাড়িতে কিছুদিন বসবাসও করেছিলেন তিনি। সহসা একদিন সেই সাহেবটিকে আর পাওয়া গেল না। বাঘে নিয়ে গেছে। তখন দিনের বেলায় বাঘ ঘুরতো ওখানে। সে বাঘ আসতো হাজারীবাগের জঙ্গল থেকে, বিন্ধ্যপাহাড়ের বন থেকে।

ওদিকে, প্রপাতের নিচে সব ঘুরে-ঘুরে দেখে-টেকে ওঁরা ওপরে উঠে এলেন। ওখানকার লোকেরা বললে, —'সন্ধ্যের আগেই এখান থেকে ফিরে যান, কাছেই গ্রাম আছে।' একটি টুলিতে অর্থাৎ গ্রামে এসে দোকানে মুড়ি আর পেঁয়াজ কিনে নেওয়া হলো। সঙ্গে

ছিল চা-চক্রের ব্যবস্থা। ফলে, মুড়ি পেঁয়াজ আর গরম গরম চা খাওয়ার ব্যবস্থা হলো। কিন্তু চিনি ফুরিয়েছে। চিনি ফুরবার হেতু ছিল। রাস্তায় দেখলেন, একটা গাছে বেল পেকে আছে —এক-গাছ বেল; কিন্তু চেখে দেখা গেল, সে বেল খুবই তিতো। সেই বেল পেড়ে শরবত করতে গিয়ে দেখলেন, একেবারে হাকুচ তিতো। যতই চিনি গোলা হয় সে শরবতে, তিতো আর ঘোচে না। এদিকে চায়ের চিনিও খতম্।

সন্ধ্যের আগেই বৈকাল তিনটে-চারটের মধ্যে ওঁদের ফেরবার কথা। যাই হোক্, আগেই সন্ধ্যে হয়ে গেল। ওঁরা ফিরলেন। রাস্তার ওপরে সরাই। সেখানেই থাকা হলো একজনদের বাড়িতে। সারা রাত মায় ভোর পর্যন্ত মশার কামড়। হুঁড্রুতে ভয়ঙ্কর ম্যালেরিয়া। রাঁচিতে ফিরে এসে, সবাইকেই ম্যালেরিয়ায় ধরল। কেবল রেহাই পেলেন নন্দলাল। এই অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে শ্রীনন্দলাল বললেন. —'বর্ধমানের বনকাটিতে যখন যাই সেখানেও গিয়ে দেখি, ঐ রকম মশা। ওখানে রাত্রে হাব্ড়ি-জুব্ড়ি সরষের তেল মেখে শুয়ে থাকতুম। তাতে মশা কামড়াতো না।'

হুঁড্রুতে তখন মুণ্ডাদের গ্রামে গিয়ে একজনদের বাড়িতে বসবার একটা খাটোলো-চেয়ার দেখেছিলেন নন্দলাল। সেদিন সেখানে আদিবাসীদের বাড়িতে সেই চেয়ারটির গড়ন দেখে তাঁর খুব পছন্দ হয়। শ্রীনন্দলাল সেই ডিজাইনের স্কেচ্ করে রাখেন। পালকির হাতলের মতন কৌচের হাতল-দেওয়া চৌকি। রাঁচি থেকে কলকাতা ফিরে, বিচিত্রার সাহিত্যসভা সাজাবার জন্যে আদি-বাসীদের ঘরের ঐ খাটের ডিজাইন থেকে খাটোলা-চেয়ার তৈরি করার পরিকল্পনা করলেন। সেই ডিজাইন দেখে রথীবাবু খাটে নক্সা করেন। —(প্রথম পর্যায়, স্কেচ্‌বুক সংখ্যা ৮, পৃ. ২০)। পরে অসিতকুমারের সঙ্গে পরামর্শ করে খাটোলা-চেয়ার তৈরি করানো হয়। ঠাকুরবাড়ি থেকে তাঁদের পূর্বপুরুষের ভিক্টোরিয়ান ভেলভেটের গদি-আঁটা কৌচ, চৌকি বিদূরিত করে এই খাটোলা ধরনের কোচ ফার্ণিচার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ধরনের স্বদেশী আসবাব এখন বনেদী বাড়িতে

গৃহসজ্জার প্রধান উপকরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

॥ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, ১৯১৬ ॥

এই সময়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ থাকতেন রাঁচিতে মোরাবাদী পাহাড়ের বাড়িতে। শ্রীনন্দলাল একদিন সুকুমারবাবুর বাড়ি থেকে গেলেন তাঁকে দর্শন করতে।

'ঋষিতুল্য লোক ছিলেন তিনি। গুরুদেবের মতনই দেখতে। আমাদের দেখে খুব খুশি হলেন তিনি। তাঁর ওখানে আমাদের থাকার আর খাওয়ার জন্যে বার বার অনুরোধ করতে লাগলেন। নিচের রাস্তা থেকে তাঁর পাহাড়ী বাড়িতে ওঠার জন্যে পাহাড়ের গায়ে পথ রয়েছে। সে রাস্তার দু'দিকে রেখেছিলেন নানা জন্তু-জানোয়ার —শেয়াল, খরগোশ —এই সব। আর নানা রকমের পাখী। মোরাবাদী পাহাড়ের চড়াইয়ের মধ্যপথে পাহাড়ের গায়ে সমতল ভূমির ওপর তাঁর বাড়ি —বাগান। পাহাড়ের চুড়োয় একটি চত্বর —কাশীর মন্দিরের ধাঁচে তৈরি। সে হলো তাঁর উপাসনার স্থান। ওখান থেকে পাশাপাশি পাহাড়গুলো কাঁকে, রাঁচি-পাহাড় আর সমস্ত রাঁচি শহরটা একনজরে ভারী চমৎকার দেখায় —একটা ছবির মতন। পাহাড়ের গা খোদাই করে চা-খাবার চেয়ার টেবিল তৈরি করা হয়েছে —তার ওপর আলপনা এঁকে। রঙিন পাথরে পদ্ম-কাটা আলপনার ডিজাইন এখনও আছে (১৯৬২)। ওখানে দেখলুম বসবাসের সমস্ত ব্যবস্থাই রয়েছে, নাই কেবল জল। বড়ো অভাব ছিল জলের। পাহাড়ের নিচে থেকে জল বয়ে নিয়ে যেতে হতো ওপরে। পাহাড়ের ওপরে জলের কোনো ব্যবস্থা ছিল না।'

'জ্যোতিরিন্দ্রবাবুর একটা প্রধান হবি ছিল —'ফ্রেনোলজি' —অর্থাৎ মাথা টিপে টিপে মানুষের পোট্রেট স্কেচ করার। অনেকের পোট্রেট স্কেচ করেছিলেন তিনি। এবং সে স্কেচ করতেন খুব আগ্রহভরে। ছাপা এ্যালবাম হয়েছে সে-সব স্কেচের।

'সেদিন আমাকে পেয়েই তিনি খুব খুশি হলেন। যেন আজ একটা শিকারের মতন শিকার পাওয়া গেল —এই রকম ভাবখানা। ছবি আঁকার জন্যে তাঁর একখানি বড়ো খাতা ছিল। সে খাতা তাঁকে

দিয়েছিলেন গগনবাবু। ছবি-ভরতি সেই খাতাখানা পরে বেচে দিয়েছে গগনবাবুর ছেলে। ছবি-টবি, চিঠি-পত্র —সমস্তই বিক্রী হয়ে গেছে, সে আট দশ volume হবে। সে volume-এর অনেক সংগ্রহ করেছেন শ্রীপুলিনবিহারী সেন। গণেন মহারাজকেও কিছু বিক্রী করেছিল। সে হাত-চালান হয়েও গণেন মহারাজের বাড়িতে আসতে পারে। গণেনের বাড়িতে আমি দেখেছিলুম সে-সব। —রামমোহন রায়ের মুসলমানী বিবাহের খবরও ঐসব চিঠিপত্রের ভেতর থেকেই প্রথম প্রকাশ পায়। সে এ্যালবামগুলো সব আবার বেরিয়ে এখন কোথায় যে গেল জানি না। জ্যোতিবাবুর যে এ্যালবামে পঁচিশ-ত্রিশখানা পোট্রেট রেকর্ড করা ছিল সেই এ্যালবামখানাই গণেন-এর কাছে এসেছিল। হয়তো কোনো বাবুর থু দিয়ে বাড়ির ছেলেরা ছেড়ে দিয়েছিল। জানি আমি, অতি তুচ্ছ দামের বদলে একটি একটি করে ছবি বিক্রী করে দেওয়া হয়েছিল। মুকুলচন্দ্র কিছু তা' থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। মুকুলচন্দ্রের কাছ থেকে আবার কতক কিনে নিয়েছিলেন রথীবাবু —রবীন্দ্রভারতীর জন্যে।

'মোরাবাদী পাহাড়ের বাড়িতে যাওয়ার পরে, সেদিন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আমার স্কেচ করলেন। জ্যোতিবাবুর আঁকা আমার সে পোট্রেট কোথাও ছাপা হয়নি এখনও। অবনীবাবুর, গুরুদেবের অনেক স্কেচ করেছিলেন তিনি। জ্যোতিবাবু ফ্রেনোলজি জানতেন খুব ভালো রকম। লোকের মাথা টিপে টিপে বলতে পারতেন —কিরকম চরিত্রের লোক সে। আমার মাথাটা সেদিন অনেকক্ষণ ধরে টিপে টিপে দেখলেন। আমার ঘাড়টাও নানাভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন। দেখে মন্তব্য করলেন, —'তোমার দেখছি ইটালীয়ন আর্টিস্টদের মতো ফেস্। অবজারভেশন্ আছে খুব।'

'ঐ ছবিগুলো আর তাঁর চিঠিপত্র কেনা হয়েছে মুকুলচন্দ্রের কাছ থেকে। কিনেছিলেন রথীবাবু। জ্যোতিবাবু যখন আমার ছবি আঁকেন তখন তিনি চোখে ভালো দেখতেন না। খুব নিকট থেকে আঁকতেন তিনি। তিনি আঁকতেন কখনও হার্ড লেড্পেনসিল দিয়ে, কখনও আঁকতেন ক্রেয়ন পেনসিল দিয়ে। হার্ড-পেনসিলে স্কেচ্ করলে চট্ করে দাগ উঠে যায় না। আর একটু ডার্ক-ও হয়। অনেকক্ষণ সময় লাগত

তাঁর কোনো ছবি আঁকতে। কিন্তু আঁকতেন অতি উত্তম। যার মুখের যে ক্যারেকটার্ বা বৈশিষ্ট্য থাকতো সে তাঁর স্কেচে ফুটে উঠতো ঠিক্ ঠিক্। আমার বেলাতেও উঠলো তাই। কিন্তু, তিনি অবশেষে শিকার ব্যাগ্ করলেন। তাঁর আঁকা আমার সে পোর্ট্রেট তিনি আমাকে দিলেন না। He put me into his bag.

'খাওয়াতে দাওয়াতেও খুব ভালোবাসতেন তিনি। ১৯১৬ সালে যখন আমি যাই তখন দেখি তিনি ঐসব নিয়েই আছেন। তাঁর চেহারাটি তখন হয়ে গেছে ঠিক ঋষির মতন। তাঁর স্ত্রী কাদম্বরী দেবী আমাদের গুরুদেবকে খুব স্নেহ করতেন।

—'এই ঘটনার অনেক পরে, গুরুদেব একদিন শান্তিনিকেতনে বসে ছবি আঁকছেন —নারী-মূর্তি। সেই মূর্তির চোখ যা এঁকেছেন সে অতি অদ্ভুত চোখ —পীয়ার্সিং চোখ। সেই চোখ দেখামাত্র আমি বলে উঠলুম, —'বাঃ, ভারী সুন্দর চোখ এঁকেছেন তো! এতো সুন্দর চোখ আগে কারো তো কখনও দেখিনি! আমার কথাটা শুনে তখন গুরুদেব যেন নিজের মনেই বলে উঠলেন, —'না, ও হলো আমার নতুন বৌঠানের চোখ।' —এ হলো তাঁর জীবনের ঘটনা। সব দেশে সব ফ্যামিলিতে এরকম ঘটনা হামেশাই হয়ে থাকে। একান্নবর্তী বৃহৎ পরিবারে এই টান অতি স্বাভাবিক ব্যাপার। ও-সব কিছু নয়। ধর্তব্যের মধ্যেই নয় ও সব।

'সেদিন সন্ধ্যে পর্যন্ত মোরাবাদী পাহাড়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'শান্তিধাম'-বাড়িতে ওঁর কাছে থেকে, ওঁকে প্রণাম করে ফিরে এলুম। ফিরলুম মাইল দুই দূরে সুকুমার হালদার মশায়ের সাম-লং-এর বাড়িতে। জ্যোতিবাবুর সঙ্গে দেখা করার পরেও কিছুদিন ছিলুম রাঁচিতে। কিছুকাল চেঞ্জে ওখানে থাকার ফলে আমার শরীরটা ভালো হলো। শরীর ভালো হলে দেশে ফিরে এলুম। এই সময়ে 'বিচিত্রা'য় এলেন আরাই সান জাপান থেকে।

'ওকাকুরা জাপান থেকে হরি-সানকে শান্তিনিকেতনে পাঠালেন সংস্কৃত পড়বার জন্যে। কলকাতায় পাঠালেন তাইকান আর হিসিদাকে শিল্পকলা শিখতে। তারা এদেশ দেখবে, নিজেরা ছবি আঁকবে, আমাদের দেখে শিখবে। আমরাও তাদের কাজ দেখবো, শিখবো, আমাদের উপকার হবে। তাইকান. হিসিদা এসে সুরেন ঠাকুরের বাড়িতে ছিলেন মাস ছয়েক। অবনীবাবু তাইকানের কাছে লাইন-ড্রয়িং শিখতেন ; ধীরে ধীরে লাইন টানার পদ্ধতি শিখে নিলেন তিনি। তাঁরাও নানা টেকনিক শিখলেন অবনীবাবুর কাছে, আর ভারতীয় নানা পদ্ধতি দেখে।

'জাপানের নতুন শিল্প-আন্দোলনের প্রধান আচার্য ছিলেন হাসিমতো গোহো। তাইকান, হিসিদা সব এঁর শিষ্য। খতসুতা এদেশ থেকে ফিরে যাবার সময়ে হাসিমতোর জন্যে অবনীবাবুর উপহার 'বুদ্ধের নির্বাণ' ছবিখানি নিয়ে গিয়েছিলেন। জাপানী চিত্রকরদের প্রভাবে অবনীবাবুর শিল্পরীতি অনেকটা বদলে গিয়েছিল। তাঁর তখনকার আঁকা 'বুদ্ধ ও সুজাতা', 'বজ্রমুকুট' সে সময়ে —১৯০৫ সালের আগেই আমার মন টেনে নিয়েছিল।

'স্বদেশী-আন্দোলনের সময়ে আমাদের নতুন আর্ট-আন্দোলন চলতে লাগলো। এই সময়ে আসা খতসুতার কথা আমরা আগে বলেছি। শান্তিনিকেতনে এলেন জুজুৎসু পালোয়ান সানো সান। জাপানী জুজুৎসুর প্যাঁচও একটা আর্ট। তিনি ছুতোরের কাজও জানতেন ভালো রকম। খতসুতা জোড়াসাঁকোয় ছিলেন প্রায় তিন বৎসর। সানো সান শান্তিনিকেতনে অতদিন থাকেননি। খতসুতা ১৯০৮ সালে ফিরে যাবার পরে এলেন কাওয়া গুচি। তিনি ছিলেন পরিব্রাজক। এঁর সঙ্গেও অবনীবাবুর আর রবীন্দ্রনাথের যোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। ১৯১১ সালের দিকে এলেন কাসাহারা। তিনি ছিলেন জাপানের একজন সরেস মিনিয়েচার গার্ডেনার বা বামন-উদ্যান রচয়িতা। অবনীবাবু তাঁর টেক্‌নিক্ শিখেছিলেন, সে-প্রসঙ্গে আগে কিছু বলা হয়েছে।

এঁর পরে, ওকাকুরা দ্বিতীয়বার অর্থাৎ শেষ এলেন ১৯১১ সালের শীতকালে, সে-কথাও আগে বলা হয়েছে।

'রবীন্দ্রনাথ জাপানে গিয়ে তাইকানের পরামর্শে আর্টিস্ট্ আরাই সানকে কলকাতার 'বিচিত্রা' স্টুডিয়োর জন্যে পাঠিয়ে দিলেন ১৯১৬ সালে। আমি তখন বিচিত্রায় কাজ করছি। আরাই জোড়াসাঁকোয় ছিলেন দেড় বৎসর। আমার সঙ্গে তাঁর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। জাপানী শিল্পিবন্ধু আরাই সানের কথা অনেক।

'তিনখানা ছবি আছে আরাই-এর। তাঁর নাম-করা ছবি —'অন্ধের সূর্যপূজা'। সোসাইটিতেও তিনি কাজ করেছিলেন। ওঁরা সব বিজুইৎসিন সোসাইটির আর্টিস্ট্। আমাদের এখানে যেমন্ হয়েছিল সোসাইটি, জাপানে তেমনি ঐ বিজুইৎসিন সোসাইটি। জাপানে পুরাতন আর্ট নষ্ট হচ্ছে দেখে, ওকাকুরা করলেন কি, পুরাতন আর্টিস্ট্দের বংশধর খুঁজতে লাগলেন। পেলেনও তিনি পুরাতন আর্টিস্ট্দের বংশধরদের। তারা তখন থিয়েটার-হলের দরজা-গোড়ায় বসে বসে শো-কার্ড এঁকে দেয়। সেই কার্ড বিক্রী করে যেটুকু উপার্জন হতো, তা থেকেই তারা দিন-গুজরান করতো। বড়ো বড়ো আর্টিস্ট্ সব ছিল তাদের মধ্যে। পুরাতনের কদর গেছে তখন। তাদের সব ধরে ধরে যোগাড় করে নিয়ে এলেন ওকাকুরা। নিয়ে এসে, পুরাতন যে-সব ট্র্যাডিশন ছিল আর চীনেরও পুরাতন ট্র্যাডিশন মিলিয়ে, তাদের শিক্ষা দিতে লাগলেন বিজুইৎসিন সোসাইটিতে। জাপানী আর্টস্, এস্থেটিক্স্ বিশদভাবে বুঝিয়ে দিলেন। আর নেচারের সঙ্গে কি করে মিলতে হয়, কি করে তাকে ভালোবাসতে হয়, কি করে তাকে দেখতে হয়, সে-সবও বুঝিয়ে দিলেন।

'ওকাকুরা ওদের সব নিয়ে গিয়ে, নদীর ধারে, অন্ধকার রাতে, জ্যোৎস্না রাতে, নির্জন লেকের ধারে বসিয়ে রাখতেন! নেচারকে ঐ পরিবেশে দেখতে আর চিন্তা করতে বলতেন। তাদের নিয়ে তিনি ছোট্ট একটা স্কুলের মতো করলেন। কিছু ছাত্র নিয়ে, ছবি আঁকার স্কুলের মতো করে, নিজে ছাত্রদের সঙ্গে বসে কাজ করতেন। এই হলো বিজুইৎসিন সোসাইটির গোড়াপত্তন। জাপানী ইয়ার্‌লী

রিপোর্টে এ-সবের বিস্তৃত বিবরণ লেখা রয়েছে।

'পুরাতন যা অবশিষ্ট আছে, আর যা চলে আসছে, সেটাও খারাপ হয়ে আসছে, অধঃপতন হচ্ছে, —সেই পদ্ধতিতে নেচার থেকে ছবি হচ্ছে বটে, কিন্তু মানুষের চিত্তের চিন্তা আর হচ্ছে না। মনের চিন্তা হচ্ছে না। মানুষের সম্পর্কে চিন্তা বৌদ্ধ আর্ট থেকে শুরু হয়। মানুষের চিন্তা থেকে আসে ব্যক্তিগত মানুষের সম্পর্কে চিন্তা। ইণ্ডিভিজুয়েলিটির চিন্তাই হলো আর্ট। —এই চিন্তা ওরা বৌদ্ধ আর্ট থেকে পায়। সেই আর্ট তখন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে জাপানে। এইটে রিভাইভ্ করতে পারলে জাপানী আর্ট তবেই আবার হবে পূর্বের মতো। —এই চিন্তা করে ওকাকুরা সব বিজুইৎসিন আর্টিস্ট্‌দের বিদেশে পাঠাতে আরম্ভ করলেন। বিদেশের শিল্পীদের কাছে পাঠালেন জাপানী শিল্পীদের। ইতালীতে গেল, ইংলণ্ডে গেল এক এক জন করে। ভারতে পাঠালেন ক'জনকেই। তবে, ভারতেই আর্টিস্ট্ সবচেয়ে বেশি পাঠিয়েছিলেন। বোধহয় পাঁচ জন। ১৯০২ সাল থেকে ১৫।১৬ সাল পর্যন্ত —আরাই পর্যন্ত আসা শেষ। —'বিচিত্রা' পর্যন্ত।

'ওঁরা প্রত্যেকেই এসে ভারতের দ্রষ্টব্য শিল্পস্থান, ভাস্কর্য, ছবি সব দেখতেন, স্টাডি করতেন। অজন্তার কপিও ওঁরা করে নিয়ে গেছেন। ইংলণ্ডে গেসলেন সামামুরা খানজান। সামামুরা ওখানে গিয়ে বড়ো বড়ো আর্টিস্টদের ভালো ভালো ছবি সব কপি করতে লাগলেন। আর নিজেও তিনি ওখানে বসে ছবি আঁকতেন। ইংরেজী বলতে পারতেন না। তাতে ওখানে ওঁর এসে যায়নি কিছু। দেড়-দু'বছর চুপ করেই থাকতেন। কারো সঙ্গে কিছু আলোচনা করতে পারতেন না। সব কাজ সারতেন ইঙ্গিতে।

'ইটালীতে গেসলেন তাইকান। ভারতে এলেন এই ক'জন। তাইকান আমাদের দেশে এসে, এদেশের আর্টের যে বিশেষ অভিব্যক্তি হয়েছিল, তাতে চোখ রাখলেন। এদেশে আর্টে বেশি করে ফুটেছিল —পার্সন্যাল ঈশ্বরের লীলারূপ। সেইদিকেই তাইকান বিশেষ দৃষ্টি রাখলেন। ঈশ্বরের অনন্ত লীলায় যেখানে অবতারবাদ স্বীকৃত হয়েছে সেখানেই আর্টে পার্সন্যাল গড্ বা ব্যক্তি-ঈশ্বরের সৃষ্টি। কিন্তু, ওরা

—চীনে ও জাপানী শিল্পীরা তখন নৈসর্গিক ছবি করতে ব্যস্ত। সে সময়ে জাপানে পার্সোন্যাল আর্ট যা হয়েছিল তা ভারতবর্ষ থেকে 'দরুমা' ('ধর্ম' ?) যাবার পরে। এই 'দরুমা'ই বৌদ্ধধর্ম নিয়ে গেসলেন জাপানে। পুরাকালে ভারতভ্রমণ সেরে দেশে ফিরে ফা-হীয়ান, হুয়েন সান —এঁরা সব বৌদ্ধ ভিক্ষু পাঠালেন এদেশে। সেই বৌদ্ধ পুরোহিতদের দেশে ফেরার সঙ্গে বৌদ্ধ আর্টও গেল এদেশ থেকে চীন দেশে।

'বিজুইৎসিন সোসাইটি বড়ো হলো ক্রমশঃ। পরে. এর ওপর দৃষ্টি পড়ল স্টেটের। সাহায্য করতে লাগলো অর্থ, সামর্থ্য দিয়ে। স্টেট হাতে নিলে সব জিনিসই ভেঙ্গে-চুরে নিজেদের মনের মতন করে গড়তে চায়। ওখানেও তাই ঘটলো। তাই অনেক আর্টিস্ট বিরক্ত হয়ে বিজুইৎসিন সোসাইটি ছেড়ে এলো। রইলেন কেবল সামামুরা। প্রভূত সুবিধে দিলে ওঁকে স্টেট থেকে। সে ওঁকে মতে পাবার জন্যে। স্টেট্ দেশ চালাবে গায়ের জোরে। এখানে যেমন আর্ট-একাডেমীতে এই রকম হবার একটা আশঙ্কা আছে। স্টেট্ সোসাইটি হাতে নেবার পরে, স্টেটের সঙ্গে আর্টিস্ট্দের মতের মিল না হওয়ায় ওঁরা অনেকেই কাজে ইস্তফা দিলেন।

'আরাই সান এলেন কলকাতায় আমাদের 'বিচিত্রা'তে। তাঁর খরচা, - থাকার, খাওয়ার, বেড়ানোর সব খরচা বহন করেছিলেন আমাদের গুরুদেব। 'বিচিত্রা'তে খেতেন-দেতেন আর থাকতেন আরাই। আর ভারতবর্ষের সব শিল্পস্থান দেখে বেড়াতেন তিনি। সব স্থান ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন আরাই। 'বিচিত্রা'তে ক্লাস নিতেন। তাতে 'বিচিত্রা'র শিক্ষকেরা আর নতুন ছাত্রেরা একসঙ্গে মিলে তাঁর কাছে প্রত্যহ দু-এক ঘণ্টা করে চীনে তুলি-কালির কাজ শিখতেন। আর কাজের ওপর লেশনও নিতেন তাঁরা। আমি ওঁর ছবি আঁকা —রং-লাগানো, রঙ-ভরা —সিল্কের ওপর কাজ করা —সব দেখতুম বসে বসে। একহাতে তিন আঙ্গুলে তিনটি তুলি একই সময়ে চালাতে পারতেন আরাই। স্কেচ্ও করতে পারতেন তিনি —তিন চার গুণ ছোট বা বড়ো করে।

'আমি যখন পুরী-কোণারক যাই তখন আমার সঙ্গে ওখানে গেলেন আরাই। পুরীতে অবনীবাবুর মস্ত একটি বাড়ি ছিল —নাম হলো 'পাথারপুরী'। সেখানে গিয়ে আমরা উঠলুম, আরাইও গেলেন। আরাই মাসখানেক ছিলেন সেখানে।

'কোণারকে একসঙ্গে বেড়াতে গেলুম। নেচার থেকে ওঁরা কি করে স্কেচ্ করেন ওখানে সেটা আমার দেখার সুযোগ হয়েছিল। উনি ওখানে বসে পুরাতন ছবি, —মোগল ছবি, কাঙ্গড়া ছবি কিছু কিছু কপি করলেন। কপিগুলি তিনি সঙ্গে নিয়ে গেলেন জাপানে ফেরবার সময়ে।

'ভারতবর্ষে বছর দেড়েক ছিলেন তিনি। শান্তিনিকেতনও দেখতে এসেছিলেন আরাই। 'বিচিত্রা' যতদিন ছিল, আরাইও ততদিন ছিলেন সেখানে। ওখান থেকে জাপানে ফিরে গিয়ে পরে তিনি আবার এদেশে আসেন অজন্তার ছবি কপি করতে। সঙ্গে আরো ক'জন আর্টিস্ট্ নিয়ে এসেছিলেন। বড়ই দুঃখের বিষয়, সে কপিগুলো সব পুড়ে গেছে। 'বুদ্ধে'র ছবি, 'রাসলীলা'র ছবি, আর যে যে সব ছবির কপি করা ছিল, আর তার আগের ছবির কপিগুলিও সব পুড়ে গেল। জাপান-সরকার ওঁদের ছবি সব পরে এখান থেকে কিনে নিয়ে গিয়েছিল। অজন্তার ছবির কপিগুলিও কিনে নিয়েছিল। সেগুলোও সব পুড়ে গেল —আর্থকোয়েকের সময়ে। পুড়েছে সে-সব ১৯২৩ সালে।—

'বিচিত্রা' থেকেই আমরা পুরী-কোণারক ভ্রমণে গেলুম —আরাইও সঙ্গে ছিলেন আমাদের। সেই প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে।

॥ পুরী ও কোণারক ভ্রমণ, ১৯০৬, ১৯০৮, ১৯১৭ (জানুয়ারী) ॥

'পুরী বেড়াতে গেছি ছ'বার আর কোণারক গেছি দু'বার। আর্টস্কুলে পড়বার সময়ে ইস্কুলের বন্ধু শিবপুরের হরিহরের সঙ্গে ১৯০৬ সালে প্রথম যাই পুরীভ্রমণে। ওখানে জানাশোনা কেউ ছিল না। উঠেছিলুম গিয়ে পাণ্ডাদের বাড়িতে। পাণ্ডাদের খোলার ঘর। সে ঘরের স্কেচ করেছি আমি। খোপের ভেতরেই রান্না-বাড়ার একটা উনুন

আর হেঁশেল-শাল। তার পাশেই শোবার বিছানা। পায়খানার জন্যে দুঃখ পেয়েছিলুম খুব—সে ভোলবার নয়। নর্দমার ময়লা গড়িয়ে এসে ঘরে ঢোকে, আর প্রাণ বেরবার জো হয় আমার। শুধু পথে পথে ঘুরে বেড়াতুম সারাদিন—আর নানা স্কেচ্ করতুম। সেই বোধহয় আমার প্রথম স্কেচ্। অন্ততঃ ঝোঁক করে স্কেচ্ করি সেই প্রথম।

'হরিদাস সাধুর আস্তানা, জগন্নাথের মাসীর বাড়ি—গুণ্ডিচা, সব দেখলুম ঘুরে ঘুরে। হরিহর ছাড়া আর কে কে পাণ্ডাদের ঘর থেকে তখন সঙ্গে ঘুরতে যেত—সে আর আজ আমার মনে নাই। তবে তখনকার সেই সঙ্গীদের মধ্যে পরে কে একজন যেন 'মাতলাপঞ্জী' প্রকাশ করেছিলেন, শুনেছিলুম। টং টং করে কেবল ঘুরে বেড়াতুম। যেখানে যা চোখে পড়তো—বাড়ির ডিজাইন, অলঙ্করণ, জাফরির কাজ আর যা কিছু সব স্কেচ্ করেছি।

'রান্না করার ঝামেলা এড়াবার জন্যে জগন্নাথের 'ভোগের হাঁড়ী' কিনে আনতুম।' সে অন্নভোগ বিক্রী হয়। মোটা ভাতের ওপর মেটে সাদা আলুর চক্কল, নারকোল, কচু, কাঁচকলা, কুমড়ো, বেগুন আর অড়রের দাল—বেসর দিয়ে রান্না করা—, আর তার ওপর ফুল ছড়ানো—এই দিয়ে ভোগ সাজানো হতো। কচু আর কুমড়োর ঘ্যাঁট্ আর নারকোলের টক্—এই হলো প্রধান তরকারি। ছোট ছোট 'কুঁড়ি' কিনতে পাওয়া যেত,—তার ওপরেও দুটী করে তুলসী পাতা বিছানো আর তরকারি রাখা তার ওপর। দু'বেলাই আমরা ঐ ভোগ খেতুম। খাওয়া-দাওয়ার পরে, যা বাকি থাকতো, সেগুলো হাঁড়িতে পুরে, হাঁড়ি ঝুলিয়ে রাখতুম শিকেয়। একদিন বেড়িয়ে ফিরে এসে, দুপুরে খেতে গিয়ে দেখি, শিকের হাঁড়ি ফাঁক। কি ব্যাপার? পাণ্ডাদের বাড়ির একজন ঝি আমাদেরও কাজ করে দিত। তাকে জিজ্ঞাসা করতে, সে অম্লানবদনে বললে. —'মুঁই খাইছি প্রসাদ'! —অর্থাৎ জগন্নাথের মহাপ্রসাদ যেহেতু—সে চুরি-চামারি করে খেলেও তাতে কোনো দোষ অর্শায় না—সহজ সরল এই রকম তার ভাবখানা। আর জাত-বিচারের তো কথাই ওঠে না। কি আর করা যায়। নিরাপত্তার আশায় এর পর থেকে আমরা রান্না করা শুরু করে দিলুম।

কখনও ভাত, কখনও রুটি বা ভাত রুটি, তরকারি আর কোনও দিন বা স্রেফ্ ভাতে ভাত। ভাত রান্না করে, তাতে চারটি করে মহাপ্রসাদ ছেড়ে দিয়ে সবটাকেই জগন্নাথের মহাপ্রসাদ করে নিতুম। এইভাবেই আমরা বেশ চালাতে লাগলুম যে ক-দিন ছিলুম ওখানে।

'মন্দির এলাকায় ঢুকে, ডান দিকের দেউড়িতে অক্ষয়বটের তলায় চাতালে শুয়ে থাকতুম আমরা। পাণ্ডারা খাবার জন্যে একদিন ডাকতে এলো; আমি বললুম,—আমরা খাবো-টাবো না। কিন্তু আমাদিকে ওরা অভুক্ত রাখবে না। ওরা ভোগ আনতে গেল মন্দিরের রান্নাঘরে। আমি ঐ সময়ে শুয়ে শুয়ে ভাবছি,—রাজভোগ পাই তো খাই; নইলে খাবো-টাবো না। ভাত খেতে ইচ্ছে করছিল না একেবারে। একটু পরেই দেখলুম,—ওরা সিফ্লির ভোগ এনেছে—সর-টর, নিমকি, মালপোয়া আর সত্যিই রাজভোগ!

'ওখানে সবচেয়ে দেখবার জিনিস হচ্ছে—মন্দির-এলাকায় জগন্নাথের বাগান। অসংখ্য চাঁপাফুলের গাছ আর বেলফুলের গাছ। ঠাকুরের জন্যে মালা গাঁথা হয় এই সব ফুল থেকেই। জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রার অত বড়ো বড়ো মূর্তি সব—মালায় মালায় ঢেকে দেয়—সে প্রতিদিন।

'প্রথমবারে পুরী যাবার সময়ে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থখানি সঙ্গে নিয়ে গেসলুম। শ্রীক্ষেত্রে মহাপ্রভুর লীলা যত—সব পড়তুম, আর মিলিয়ে মিলিয়ে সব লীলাস্থান দেখতুম। ঐ চৈতন্যচরিতামৃত পড়ে পড়েই ঐ সময়ে ওখানে চৈতন্য-জীবনের যত স্কেচ্ করেছিলুম। সে-সব স্কেচ্ ছাপা হয়নি এখনও। পোস্টকার্ড-সাইজের কার্ডে সে সমস্ত স্কেচ্ করা আছে। গরুড়স্তম্ভতলে শ্রীচৈতন্য, সিদ্ধ-বকুল, হরিদাস সাধুর কুটির, মন্দির—এর সব স্কেচ্ করেছিলুম। প্রত্যহ মন্দিরে ঠাকুরকে দর্শন করে তবে প্রতিদিনের কাজ আরম্ভ করতুম।

'অদর্শনের পরেও মহাপ্রভু দর্শন দিতেন ভক্ত যবন হরিদাসকে। এ-কথায় কিছুমাত্র অবিশ্বাস হয়নি সেদিন। সিদ্ধ-বকুলের প্রবাদ হচ্ছে,—চৈতন্যদেব যে বকুল-ডালে দাঁতন করতেন সেই ডাল যবন হরিদাস মাটিতে পুঁতে দিয়েছিলেন। সেই দাঁতন-কাঠি পুঁতেই এই গাছ হয়েছে। যাই

হোক মজা হলো এই —গাছটা এখন ফোঁপরা হয়ে গেছে। ভেতরে কাঠ নাই একদম। সব গাছটাই ছালের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রায় পাঁচশো বছরের অতি পুরাতন গাছ। জগন্নাথের রথের চাকা তৈরি করতো —সেই বকুলগাছের ডাল কেটে নিয়ে। একবার আদেশ হলো, —ঐ গাছ থেকে ডাল না কাটার। এখন অবশ্য সবটাই গেছে, কিছু নাই আর। দূর থেকে জগন্নাথের মন্দির প্রথম দেখে শ্রীচৈতন্যদেব ভাবে অচৈতন্য হয়ে ছুট্ দিয়েছিলেন। আঠারো-নালার ছবি —এই সবের তখনকার মূল স্কেচ থেকে বড়ো করে চৈতন্যজীবন সম্পর্কে পরে ছবি এঁকেছিলুম।

'প্রথমবারে হরিহরের সঙ্গে যখন পুরীতে গিয়েছিলুম সে বোধহয় রথযাত্রার সময়ে। তৃতীয়বারে —তখন স্নানযাত্রা হয়েছিল। —জগন্নাথকে 'চান'-বেদীতে আনা হলো। জগন্নাথের স্নানপর্ব দেখা যায় রাস্তা থেকেই। ভোগ-সাজানোও দেখেছি। ভোগ নিয়ে যায় 'সাঙ্গে' করে। তারও স্কেচ করেছি। ঠাকুরকে চান-বেদীতে আনলে, ওদিকে মন্দিরের বেদী খালি হয়। যে মন্দিরে ঠাকুর থাকেন তার গর্ভগৃহ ঘুটঘুটে অন্ধকার। কিন্তু সামনের নাটমন্দির আলো-ঝলমল। মন্দিরে তিনটি পাকা বেদী। সেই বেদীতেই পুজো হয়। সেখানে ঐ খালি বেদীতে ক'দিন পুজো করে শবর জাতি —মন্দিরের পাণ্ডারা নয়। এর মানে হচ্ছে —জগন্নাথের প্রথম পূজারীই হলো ঐ শবর জাতি। আগের জগন্নাথের যে মূর্তি ছিল, সে মূর্তি পুড়িয়ে দেয় কালাপাহাড়। কিন্তু মন্দির খালি থাকতে পারেনা, —এই ভেবে রাতারাতি মূর্তি তৈরি করে পাণ্ডারা বসিয়ে দিয়েছিল।

'শবর পাণ্ডারা জগন্নাথের পুজো করে। নৌকোতে শবরদের কাছে জগন্নাথের ছোট প্রতিমূর্তি থাকে। প্রসাদ বলে, রান্না ভাতের রাশ থেকে কিছু আর ভাতের ফেন আমানি খেতে হয়। আর খেতে হয় হাড়ীর ঝাঁটা। আমানি হলো —কাঁজি-পোড়া। সবাই খেলে গণ্ডূষ করে। আমিও খেলুম। ভোগ আনলে পাণ্ডারা —মালপোয়া ভোগ। একরাশ মালপোয়া পাতার ওপর রেখে পাণ্ডারা ভাগাভাগি করছে। যে যা চাইবে সেই সেই পাণ্ডাদের ভাগ থেকে কিনে নিতে হবে। ধুলো-মাখা সিঁড়ির ওপর সেই মালপোয়া এনে ফেললে। সে দৃশ্য দেখেই আমার হয়ে

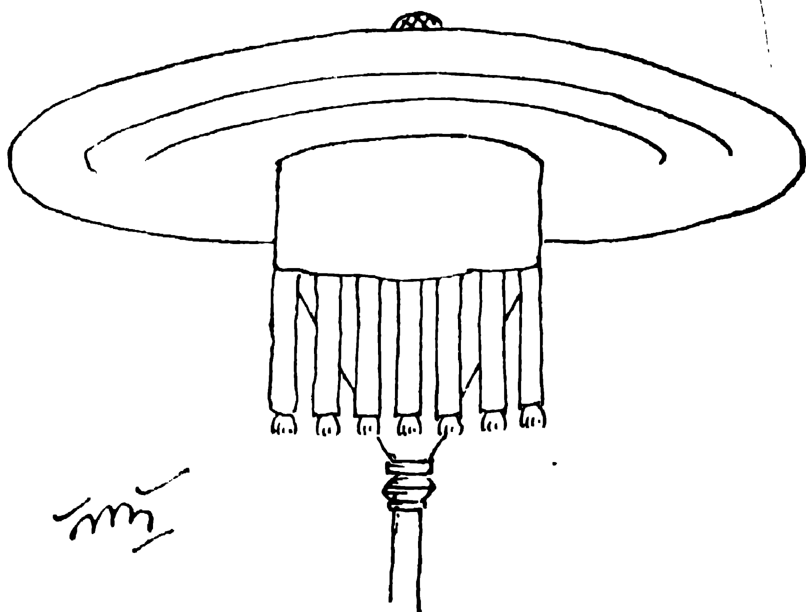
গেল। আমি আর খেতে পারলুম না। দোকানের খাবার দোকানে গিয়ে কিনে খেলুম। দোকানের কটকটে উড়িয়া লোক সব দেহাতী।

'এর পরে, দ্বিতীয় বারে ১৯০৮ সালে আমি পুরী গিয়েছিলুম শ্রীঅর্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী মশায়ের দলে ভিড়ে। সে কথা আগে বলা হয়েছে।' —নন্দলালের ২২ সংখ্যক ডায়েরীতে পুরীর নানা স্থানের স্কেচ আছে। এর কতক প্রথমবারের অর্থাৎ ১৯০৬ সালের আঁকা আর কতক ১৯০৮ সালের আঁকা। 'পাথারপুরী'তে যাবার আগেকার করা স্কেচ রয়েছে।

'তৃতীয়বারে —১৯১৭ সালে পুরী যাই সপরিবারে। তখন আমার বাবার মৃত্যু হয়েছে। মন খুব খারাপ। অবনীবাবু বললেন, —একটু বাইরে ঘুরে ঘেরে এসো। প্রথমবারের মতন এবারেও পুরী গেলুম কলকাতা থেকে সোজা। তখন পুরীতে সমুদ্রের ধারে অবনীবাবুর প্রকাণ্ড একটা বাড়ি ছিল। নাম তার 'পাথারপুরী'। আমরা যাবার আগে অবনীবাবু বললেন, —'তোমরা সব আমার বাড়িতে গিয়ে উঠবে'। আমরা রওনা হবার আগেই, আগে থাকতে অবনীবাবুর দারোয়ান গিয়ে ঘর-দুয়ার সব পরিষ্কার-টরিষ্কার করে, সব ঠিকঠাক ব্যবস্থা করে এলো। গেলুম আমি, আমার স্ত্রী, বিশু (জন্ম ১৯১০), গোরা (জন্ম ১৯১৪), গৌরী (জন্ম ১৯০৭) আর যমুনা (জন্ম ১৯১২)। আর গেলেন আমার পিসতুতো ভাই সুরেন। আমার ভাই রমানাথ ('পাঁচু') ঐ সময়ে যায় একবার।

'আমরা সাতজনে 'পাথারপুরী'তে পৌঁছবার ক'দিন পরেই, কলকাতা থেকে অবনীবাবু আমাকে লিখে পাঠালেন, —'আরাই সান যেতে চায়। তুমি এসে সঙ্গে নিয়ে যাবে।' আরাই সান তখন বিচিত্রায় কাজ শেখান। পত্র পেয়ে আমি আবার কলকাতায় এসে, আরাইকে সঙ্গে নিয়ে পুরীতে ফিরে গেলুম। অবনীবাবুর পুরীর সমুদ্রতীরের সেই বিরাট বাড়ি 'পাথারপুরী' পরে, বি. এন আর. কোম্পানী কিনে নিয়ে হোটেল করেছিল। আমরা পাথারপুরীতে নিশ্চিন্তে থেকে, ঘুরে ঘুরে ওখানকার সব-কিছু দেখতে লাগলুম। পুরীতে আমরা ছিলুম ঐ সময়ে প্রায় তিন মাস। সারা গ্রীষ্ম কাটালুম ওখানে। আমি তখন বিচিত্রায় কাজ শেখাই। ফলে, আমাকে কলকাতা থেকে পুরী ক'বার যাতায়াত করতে হয়।'

নন্দলালের প্রথম পর্যায়ের স্কেচ্‌বুক সংখ্যা ৬-এ ১৯১৭ সালে করা



জগন্নাথের শ্বেতছত্র - নন্দলাল

অনেক স্কেচ রয়েছে। তার মধ্যে পুরীর কয়েকখানি স্কেচ, নানা স্থানের কয়েকটি ছবি, নানা বাড়ির আর্কিটেকচারাল ডিজাইন, চৈতন্যদেবের চরণের নিকটে পুঁথির আকারে মার্বেল পাথরের ওপর লেখা আছে —তার স্কেচ্।

জগন্নাথের স্নানযাত্রার সময়ে ব্যবহৃত শ্বেতছত্রের নক্সা —জগন্নাথের মাথায় ধরা হয়। এই শ্বেতছত্রের স্কেচ্ করেছিলেন তিনি অবনীবাবুকে পাঠাবার জন্যে। রাস্তায় পুলিশে ধরলে – যেন তিনি ডুবোজাহাজের পেরিস্কোপের নক্সা করে পাঠাচ্ছেন। এই রকম সন্দেহ করে পুলিশে সে স্কেচ্ আটক করে অনেক দেরি করে পাঠালে। সর্বদর্শী নলের কথা তখন কাগজে বের হয়েছিল।

'জগন্নাথের শ্বেতছত্রের নক্সা —পুলিশে আটক করলে পেরিস্কোপ ভেবে'।

এনার মঠে কাঠের সদর-দরজা। পরে ঐ দরজা ভেঙে নতুন দরজা করা হয়েছে। নন্দলালের মতে, আগের কাঠের দরজাটি সুন্দর ছিল।

গুণ্ডিচা-বাড়ির ছাদের নিচে ফ্রীজের ওপর একটি নক্সা (২৯)।

ঝোলানো একটি প্রদীপ (৩০)।

পুরীর মন্দির থেকে মহাপ্রসাদের ফেন বের হয় যে নল দিয়ে তার মুখে হাঙ্গরের ডিজাইন —নলের মুখ (gargoil)।

৮ সংখ্যার স্কেচ্‌বইতেও ২৯ সংখ্যার ছবিটি —পুরীর স্নানযাত্রার সময়ে জগন্নাথদেবের শ্বেতছত্রের নক্সা।—

'আমার ভাই রমানাথের স্ত্রী মারা যায় একটি কচি মেয়েকে রেখে। এই সময়ে তার বয়েস হবে এই আট দশ মাস। সেই মা মরা মেয়েকে মানুষ করতেন আমার স্ত্রী। সেই ছোঁড়্ মেয়েটিও এবারে পুরীতে আমাদের সঙ্গে ছিল।

'পুরী থেকে আমরা স্থির করলুম. কোণারক যাবো। এর আগে আমি আর কোণারক যাইনি। কিন্তু ওখানে যাবার জন্যে যানবাহন কিছু পাওয়া গেল না। তখন ঠিক করলুম, আমরা সবাই হেঁটেই যাবো। ঐ সময়ে ওখানে অবনীবাবুর আত্মীয়া একজন সাধুমা থাকতেন। তিনি বললেন, —'তোমরা এই ছোট ছেলে মেয়ে

নিয়ে, সাতাশ-আঠাশ মাইল রাস্তা, বৃষ্টির মধ্যে হেঁটে যেতে সাহস কর কি করে। অবশেষে, তিনি তিনখানা গরুর গাড়ি ঠিক করে দিলেন। তিনখানা গরুর গাড়ির দু-খানাতে যাত্রীরা সব, আর একখানাতে মাল-পত্তর বোঝাই করা হলো। গরুর গাড়ি তিনটি রওনা হলো পুরী থেকে কোণারকের রাস্তায়। এক জায়গায় এসে সন্ধ্যা হলো। আমরা জলযোগ করে নিলুম। সেই সময়ে বৃষ্টি এলো —দারুণ। একজনের মাটির বাড়িতে আশ্রয় নিলুম। খাওয়া হলো খিঁচুড়ি রান্না করে। গাড়ি ছেড়ে দেওয়া হলো ভোর রাত্রিতে।

'একটি নদী। নাম তার চন্দ্রভাগা। মেলা বসেছিল সেখানে পথের ধারে। আমরা যখন গিয়ে পৌঁছলুম, ওরা বললে, —মেলা শেষ হয়ে গেছে। রান্না-খাওয়া করেছে মেলার যাত্রীরা —তার নিদর্শন ভাঙ্গা হাঁড়ি ভাঙ্গা মালসা —সব ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে।

'সেই ভোর রাতে গাড়ি ছেড়ে সোজা গেলুম আমরা কোণারকে। ঢেউখেলানো, বালিয়াড়ি মাঠের মধ্যে দিয়ে পথ। পথের দু-দিকে কেয়াবন। মাঠ —একের পর এক মাঠ পার হয়ে যাওয়া গেল। সে-পথ চিনতো কেবল গাড়োয়ানরা। পথে আমি প্রায় বরাবরই গেছি গাড়িতে চড়ে, সঙ্গে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে। বড়োরা হাঁট্‌তো মাঝে মাঝে —হুম্‌টো পথে। বিশু তখন সাত বছরের। ওকে কোলে করে নিয়ে যেতো। গোরা তিন বছরের। আরাই সান গোরাকে কাঁধে নিয়ে চলতো মাঝে মাঝে।

'পথে দেখা গেল হরিণের পাল। যেতে যেতে পথে দু-তিন জায়গায় হরিণের পাল দেখলুম। মাঝে মাঝে হরিণে 'মাঠ' করেছে। সেই নাদি স্তূপাকার হয়ে আছে, ঢিপির মতন হয়ে আছে। আর আশ্চর্য হচ্ছে এই, হরিণের পাল তাদের 'মাঠে'র কাজ সারে, মাত্র একটি জায়গা বেছে নিয়ে। যেখানে-সেখানে নাদি দেখে, পাছে কেউ তাদের আস্তানা ট্রেস্ করে, ওদের ধরে ফেলে, তারই প্রতিরক্ষায় প্রকৃতির এই অদ্ভুত ব্যবস্থা।

'আমাদের সাড়া পেলেই হরিণের পাল মুহূর্তের মধ্যে কান খাড়া করে শিং উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে যেত ব্যূহ রচনা করে। হরিণী আর

হরিণশিশুগুলি সকলে অনেক দূরে চলে গেলে, তার পর-মুহূর্তেই রাইট্‌-এ্যাবাউট্‌ টার্ন্‌ করে, মিলিটারী ভঙ্গিতে, সহসা ঘুরে দাঁড়িয়ে বিদ্যুৎগতিতে ছুট্‌তে আরম্ভ করত দলকে দল।

'পরদিন ভোর বেলায় পৌঁছলুম কোণারকে। তখন সূর্যোদয় হচ্ছে। এমন সূর্য-ওঠা এর আগে কখনও দেখিনি আমি। —বড়ো, গোল, লাল। পাথরের সূর্য-মন্দিরের গায়ে লালের আভাস। দু-মাইল দূরের ধূ ধূ সমুদ্রের জলও লাল, —ঢেউয়ের ওপর ফিকে লালের পোঁচ। —এই ভোরেই মন্দিরে পৌঁছলুম আমরা গরুর গাড়িতে চড়ে।

'মন্দিরের কাছেই নিরঞ্জন-মঠ। ঠাকুর-ঘরের সামনে বারাণ্ডা। সেখানেই ওঠা হলো। সেখানে উঠে বিছানা-পত্র পেতে নেওয়া গেল। সপ্তাহের রসদ ছিল সঙ্গে। ওখানেই খাওয়া থাকা শোওয়া হতো। ঠাকুর-ঘরে কোনো দেবতা নেই। আছে মাত্র একটি বেদী। ওখানেও এদিক-ওদিক সকাল-সন্ধ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াতুম। মঠে আরতি হয় তিনবার —সন্ধ্যায়, দুপুর-রাতে আর ভোরবেলায়। রাত্রে আরতি হয় বারোটার দিকে। একজন সাধু নেংটি-পরা আর তাঁর কোমরে পেতলের একটা ব্যাজ-আঁটা; প্রায় উলঙ্গ। গেরুয়া কপনি। নিরঞ্জন-পন্থী সাধু।

'তিনিই আরতি করলেন প্রদীপ জ্বেলে, আর ধূপের ধোঁয়া দিয়ে। সামনের বেদীতে দেবতা তো নাই। আরতি করলেন তিনি বাইরের মুক্ত আকাশে। আমরা বারাণ্ডায় শুয়ে আছি, আরতি করলেন আমাদেরও। শেষে, আরতি করলেন তিনি নিজেরই দেহখানাকে। আরতি শেষ করে গাইলেন ভজন-টজন।

'আমরা প্রসাদ পেলুম নিরঞ্জন-মঠের। —ভাত আর মাছের ঝোল। সোল মাছের ঝোল। এই হলো প্রসাদ। স্নান করতুম ওখানে আমরা ছোট্ট একটি গেড়ে পানা-পুকুরে। মন্দিরের কাছেই ছোট্ট একটি হাট বসতো —সপ্তাহে দু-একদিন করে। আমরা ওখান থেকেই আনাজ-পাতি কিনে নিতুম।

'পরের দিন আমার স্ত্রী আমার ভাইঝিকে উঠনে শুইয়ে রেখেছেন। শুইয়ে রেখে তিনি তেঁতুলগাছের তলায় উনুন কেটে খিঁচুড়ি রাঁধতে বসলেন। এদিকে ভাইঝি কাঁদছে। ব্যাপার কি? দেখতে এলেন তিনি

গাছতলায় খিঁচুড়ির হাঁড়ি ছেড়ে। ওদিকে আবার এমন সময়ে একটা লালমুখো বাঁদর এসে উনুনের ওপর চড়ানো সেই খিঁচুড়ির হাঁড়িটা উল্টে ফেলে দিয়েছে। পড়ে গেছে সব খিঁচুড়িটাই। কি আর করা যায় তখন। ঠাণ্ডা হলে, সেই মাটিতে পড়া খিঁচুড়িই ওপর ওপর হাত দিয়ে দিয়ে খানিক খাওয়া হলো। খাওয়া-দাওয়ার পরে, এদিকে এসে আমার স্ত্রী আবার দেখেন কি, সেই বাঁদরটা আমার ঘুমন্ত ভাইঝির কাছে চুপটি করে বসে আছে। বাঁদরটার ভাবখানা দেখে আমার মনে হলো, সে বোধহয় মানুষের সঙ্গ এই প্রথম পেয়েছে। যাই হোক আমার স্ত্রীর তখন সাহস ছিল খুব। একটা পোড়া চেলা-কাঠ নিয়ে তেড়ে দিলেন তিনি সেই লালমুখো বাঁদরটাকে। —এর পরেও আমরা দিন পাঁচেক ছিলুম ওখানে। ছোট ছেলেমেয়েদের অতঃপর সাবধানে আগলে রাখা হতো। আর ওখানকার দেখবার জিনিস সব দেখতে লাগলুম ঘুরে ঘুরে।

নন্দলালের (দ্বিতীয় পর্যায়ের ২৫ সংখ্যক) স্কেচ্‌বুকে স্কেচ্‌ করা রয়েছে : আরাই-এর সঙ্গে প্রথমবার যখন কোণারক যান তখনকার পথের দৃশ্য —গরুর গাড়িতে করে যেতে যেতে পথের দু'দিকের দৃশ্য — আর মন্দিরের কাছে সমুদ্রের দৃশ্য।

'কোণারকের মন্দির-প্রাঙ্গণে ভগ্নস্তূপ থেকে পাথর সব সরিয়ে মন্দিরের চারদিকের জায়গা জুড়ে রেখে দিয়েছে। ওখানে হাঁট্‌কাতে হাঁট্‌কাতে একটা ভালো মূর্তি পাওয়া গেল। —ছোট মূর্তিটি হলো, মাকড়ী-শুদ্ধ একটি মেয়ের মুখ —নাকটা ভাঙ্গা। —আর একটা মূর্তি পাওয়া গেল —একটা হাতীর পিঠে হাওদায় চড়ে রাজা আর পারিষদেরা যাচ্ছেন। মূর্তিগুলি পেয়ে আমাদের মনে মনে ভয় হলো, যদি ধরে ফেলে কেউ। মাত্র আমরা তিনজন লোক সেখানে —আমি, আরাই আর সুরেন। তাই ভয়ে ঝোপের মধ্যে ফেলে দিলুম মূর্তিগুলোকে ; আবার মূর্তিশিল্পের কথা চিন্তা করে তুলে নিলুম মূর্তি দু'টি। এনে রাখা হয়েছিল কলকাতায় অবনীবাবুর জোড়াসাঁকোর বাগানে। এখন সে মূর্তি সব কোথায় যে গেছে, জানি না।

'সপ্তাহখানেক বাদে, কোণারক থেকে আমাদের সেই গরুর

গাড়িতে করেই আমরা ফিরে এলুম। ফিরে এসে রইলুম পুরীতে সেই 'পাথারপুরী'তে। আরাই-সানকে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে নিয়ে গেলুম একদিন —বৌদ্ধ বলে। সেবারে আরাই আমার সঙ্গে সঙ্গেই সমুদ্রে স্নান করত। কিন্তু আরাই পারতপক্ষে আমার সঙ্গে সমুদ্রস্নান করতে চাইত না। রহস্যটা পরে আমার মনে এলো। একদিন দেখি, তার কোমরে 'বগলী' রয়েছে। এই রকম 'বগলী' থাকে কেবল স্পাইদের কোমরে। তবে আরাইকে 'স্পাই' বলে কোনোদিন সন্দেহ হয়নি আমার।

'আর একবার পুরীতে এসে, পুরী থেকে কোণারক গিয়েছিলুম ১৯৪১ সালে। সেবারে আমার সঙ্গে ছিল আমার ছাত্র বিনোদ আর জাভানী ছাত্র সুতান হারহাপ। দ্বিতীয়বার এদের নিয়ে যখন কোণারক যাই, তখন নিরঞ্জন-মঠ ভেঙ্গে পড়েছে। পাথরের নাটমন্দিরও আগেই ভেঙ্গে গেছে। চালাঘরও সব পড়ে গেছে। মূল মন্দিরের স্কেচ্ করা আছে আমার কাছে —মন্দিরের গা বেয়ে জল পড়ছে, সে ছবিখানা ছাপা হয়েছে। ঐ স্কেচ্ থেকে বড়ো ছবি করা হয়েছিল দুটো। তার একটা হলো —মন্দিরের গা-বেয়ে জল পড়ছে, আর একটা তার লিথো-প্রিনটিং।

নন্দলালের প্রথম পর্যায়ের ৩৪ সংখ্যক স্কেচবুকে দেখা যাচ্ছে, পরে, বিশ্বরূপ বসু কোণারকের একটি পাথরের ঘোড়ার মাপ নিয়ে আসেন (পৃ ১৬)। কোণারকের আর একটি বড়ো মূর্তির মাপ আনেন তিনি গজ-ফুটের হিসেব করে।

'১৯১৭ সালের পরে আমি পুরী গেছি ১৯৩৮ সালে। তখন উঠেছিলুম গিয়ে মমতাদের বাড়িতে। মমতা হলেন ক্ষিতিমোহনবাবুর মেয়ে—ডক্টর শৈলেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের স্ত্রী। সেবারে ধীরেন, বীরেন, তনয়বাবু আর মেয়েদেরও অনেকে গিয়েছিলেন। ওঁদের বাড়িতে ঐ সময়ে আমি একখানা বড়ো ছবি এঁকেছিলুম। —'আগমনী' পর্যায়ের। এই ছবিতে দুর্গার সঙ্গে গণেশ আছে। শারদীয় আনন্দবাজারে সে ছবি ছাপা হয়েছে —'গণেশ জননী' নাম দিয়ে। সেবারেও সমুদ্রে স্নান করা হতো খুব। তখন 'পাথারপুরী' বিক্রী হয়ে গিয়েছিল।

'১৯৪১ সালেও পুরী গেছি। সেবারে বিনোদ আর সুতান হারহাপ

আমার সঙ্গে ছিল। ছ'সাত দিন থাকা হয়েছিল। সেবারেও 'আগমনী' ছবি এঁকেছিলুম। উঠেছিলুম গিয়ে —'নন্দীকুটিরে'। সে ভাড়া-বাড়িতে। শেষ পুরী যাই ১৯৫০ সালে। এবারেও উঠেছিলুম ভাড়া-বাড়িতে। বিশ্বভারতীর বিদ্যাভবনের ওড়িয়া অধ্যাপক কুঞ্জবাবু ঐ বাড়িটা ঠিক করে দিয়েছিলেন। এই শেষবারের ভাড়া-বাড়িতে প্রায় এক মাস থাকা হয়েছিল। আত্মীয়-স্বজন মিলিয়ে আমরা প্রায় আঠারো-উনিশ জন গিয়েছিলুম। তখন বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষ ডক্টর প্রবোধ বাগচী মহাশয়ও পুরীতে ছিলেন।

'বিচিত্রা'র শেষ পর্বে জগদীশবাবুর ওখানে ছবি আঁকবার জন্যে যোগাযোগ হয়। দ্বারভাঙ্গায় (১৯১৬, বিজয়া দশমী) বাবার মৃত্যুর সংবাদ শুনে আমি দ্বারভাঙ্গায় যাই। ওখান থেকে ফিরে এসে জগদীশবাবুর সব ছবি শেষ করা হয়। সে-কথা এবার বলা হবে।

॥ আচার্য জগদীশচন্দ্রের পৈতৃক বাড়িতে ও বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে শিল্পকর্ম (১৯১৬-১৭) ॥

'জগদীশ বসু মহাশয়ের সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় ছিল। গণেন মহারাজ আমাকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে প্রথম আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন —সে ১৯০৯ সালের আগের কথা। আর্ট সম্পর্কে অনেক আলোচনা করতেন তিনি। —ছবি আঁকবার জন্যে বড়ো বড়ো সব আইডিয়া দিতেন আমাকে। বিশেষ প্রীতি ছিল তাঁর রামায়ণ মহাভারতে। মহাভারতের দ্রোণ-চরিত্র তাঁর ভালো লাগেনি। দ্রোণাচার্যকে 'ইন্‌সিন্‌সীয়ার, মীন্‌ ব্রাহ্মণ' বলেছিলেন তাঁকে তিনি —সমালোচনা প্রসঙ্গে। কৌশল করে শিষ্যের আঙ্গুল কেটে নিয়েছিলেন বলে, তিনি আদবে পছন্দ করতেন না দ্রোণকে। সব চেয়ে পছন্দ ছিল তাঁর কর্ণকে —বীর কর্ণকে।

'আমার সঙ্গে আচার্য জগদীশচন্দ্রের যোগাযোগ ছিল বরাবর। নিমন্ত্রণ করতেন তাঁর বাড়িতে। খোঁজ-খবর করতেন প্রায়ই। ১৯০৯ সালের বড়ো-দিনের সময়ে তিনি দলবল নিয়ে অজন্তা-গুহায় গিয়েছিলেন আমাদের তদ্বিরের জন্যে। সিস্টার আর লেডি বসুও সে-সময় তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন।

'বিচিত্রার শেষ পর্বে (১৯১৭), আমি আর সুরেন টুং-টাং করে ওখানেই রয়ে গেলুম। জগদীশবাবুর পৈতৃক বৈঠকখানায় আর নতুন লেকচার-হলে ঐ সময়ে ফ্রেস্কো করার কথা হলো। কথা বলেছিলেন জগদীশবাবু আর অবনীবাবু। ১৯১৭ সালে বসু-বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হবার সময়ে ওখানে তাঁর পৈতৃক বাড়িতে অনেক ছবি করা হলো।—

'ফ্রেস্কো করার জন্যে আড়াই-তিন ফুট করে চওড়া আর পাঁচ-ছ ফুট করে লম্বা সেগুন কাঠের তক্তা গণেন মহারাজ কিনে দিয়ে গেলেন আমাদের। কি কি ছবি করতে হবে, সে-কথা জানবার জন্যে জগদীশবাবুর বাড়িতে গিয়ে আমাকে দেখা করতে বলেছিলেন গণেন।

'অনেক আলোচনার পরে কথা পাকা হলো, ছবি হবে মহাভারত থেকে, আর অজন্তার ছবির কপি থেকে। দেওয়ালের একদিকে মহাভারতের যে-প্যানেল করা হলো, তাতে আছে পার্থসারথি, মাঝখানে পাশাখেলা, কৌরবের মন্ত্রণা, পাণ্ডবগণের বিষাদ; আর একদিকে হাতীর পিঠে চড়ে দুর্যোধন যুদ্ধ করছেন। উল্টোদিকের দেওয়ালে অর্থাৎ রাস্তার দিকের দেওয়ালের মাঝখানে যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ —একেলা চলেছেন যুধিষ্ঠির, তাঁর সঙ্গে ধর্মরূপী কুকুর। আর দু'পাশে দুটো প্যানেল। তাতে আছে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের শেষ পর্ব। জনশূন্য প্রকাণ্ড মাঠ। মাঝে মাঝে চিতা জ্বলছে; কৃপাচার্যেরা সবাই পালাচ্ছেন; মাঝে যুধিষ্ঠির —এ-সব করলুম আমি।—

'মাঝে মাঝে অজন্তার প্যানেল। দুটো পদ্ম, আকাশ-পথে কিন্নরী, দুটো হায়না —এই মিলিয়ে মোট চারটে অজন্তার প্যানেল করলেন সুরেন।

'লেকচার-হলে তামার প্লেটে সৌরজগতের 'উদয় সবিতা' —আলোক ও আঁধারের দ্বন্দ্ব, —রথে অধিষ্ঠিত সবিতার আবির্ভাবে আঁধারের পরাভব। ডিজাইন করেছিলুম আমি ঠোকাইয়ের কাজের জন্যে। চিৎপুর রোডের একজন কারিগর আমার সেই ডিজাইন থেকে ঠোকাই করে দিয়েছিলেন।

শ্রীনন্দলালের ডায়েরী সংখ্যা ২২-এ ডক্টর বসুর বৈঠকখানায় সূর্য-মূর্তির ডায়াস-এর স্কেচ্; নিচে বিভিন্ন ধ্যান থেকে রাহু, কেতু, বুধ, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও রবির স্কেচ্ করা রয়েছে।

'সরস্বতীর ডিজাইন করতে বলেছিলেন জগদীশবাবু। সে আর আমাদের করা হয়নি।

'সিস্টার নিবেদিতার রিলিফের একটি মূর্তি আছে —বসু-বিজ্ঞান মন্দিরে। তার ডিজাইন আমার করা। বোম্বের কারমারকার করেন ঐ রিলিফের কাজ আমার ডিজাইন থেকে দেখে। —শ্বেতপাথরের ওপর লো-রিলিফের কাজ। ছ'মাসের বেশি লেগেছিল আমাদের সব কাজ শেষ করতে। ওখানে সারাদিন কাজ করতুম আমরা।

'বৈঠকখানার মাঝের প্যানেলটা আগেই করেছিলেন ঈশ্বরী

প্রসাদ। সে হলো অবনীবাবুর 'ভারতমাতা' ছবির লাইনে-করা ফ্রেস্কো। বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের সময়ে অবনীবাবু এঁকেছিলেন 'বঙ্গমাতা'র ছবি। পরে, তারই নাম হলো 'ভারতমাতা'। নাম দিয়েছিলেন সিস্টার নিবেদিতা। 'ভারতমাতা' নাম দিয়ে সে-ছবি সিল্কের পতাকার ওপর এঁকে, প্রোসেশন্ করা হতো স্বদেশী আমলে —এ-কথা আগেই বলা হয়েছে। সেই 'ভারতমাতা'র রেখাচিত্র আর্টস্কুলের ঈশ্বরীপ্রসাদ জগদীশবাবুর বৈঠকখানার মাঝের প্যানেলে আঁকলেন। জগদীশবাবু ছিলেন খাঁটি স্বদেশী মানুষ।

'প্যাট্রিক্ গেডিসের প্রসঙ্গে ওঁদের কথা অনেক মনে পড়ে আমার। প্যাট্রিক্ গেডিস্ থাকতেন এসে জগদীশবাবুর ঘরে। লেডি বসু তাঁকে স্নেহ-যত্ন করতেন মায়ের মতন। ওঁদের বাড়িতে আমি গিয়েছিলুম গেডিস্‌কে দেখতে। সেই সঙ্গে কাজও ছিল। ওঁদের জন্যে সিল্কের ওপর যে-ছবি আমি করেছিলুম, সেটা তখন তাঁদের লেক্চার-হলে খাটিয়ে দেওয়া হবে।

'এখনও লেক্চার-হলের ওপরে টাঙ্গানো আছে সে-ছবি —কল্পনা আর বিজ্ঞানের জয়যাত্রা। একটি মেয়ে বাঁশী বাজিয়ে আগে আগে চলছে, আর তার পিছনে পিছনে চলছে একজন পুরুষ —হাতে খাপ-খোলা তলোয়ারের ধার পরীক্ষা করতে করতে।

'ছবিখানি দেখে গেডিস্ বললেন, —'ভালো হয়েছে। তবে, আর একটা জিনিস করে দাও। যে-লোকটা চলে যাচ্ছে, পিছন-পথে তার পায়ের চিহ্ন এঁকে দাও। অতীতের ট্র্যাডিশন্ ওটা'। —'কি দিয়ে করবো, রং তো আনা হয়নি' —বললুম আমি। 'খড়ি দিয়ে করে দেবে। তাতে কি। খড়ি অনেক দিন থাকবে' —বললেন গেডিস্। খড়ি দিয়ে আমি এঁকে দিলুম —পদচিহ্ন।

'কলকাতায় কিসের একটা মীটিং ছিল একদিন। গেডিস্ বেরুচ্ছেন বক্তৃতা দিতে। অনেক দিন হলো মাথার চুল ছাঁটা হয়নি। আরশি দেখে নিজের মাথার চুল ছেঁটেছেন নিজেই। এব্ড়ো-খেব্ড়ো হয়েছে —মাথাময়। লেডি বসু আপত্তি করলেন। গেডিস্ বললেন, —'তা হোক্, ওতে আর কি হবে। বসুজায়া সে-কথা না

মেনে, নিজেই কাঁচি দিয়ে চুল খানিকটা সোজা করে দিলেন সাহেবের।

'একবার ফাউন্‌টেন্‌পেনের কালি বুক-পকেটে লেগে গেছে। লেডি বসু আপত্তি করলেন সে-জামা পরায়। সাহেব বললেন, —'ও থাক্ না'। নিচে গাড়ি দাঁড়িয়ে। কাচবারও সময় নাই। তখন খড়ি নিয়ে গেডিস্ নিজেই খানিক ঘষে দিলেন। ফলে, কালির দাগের ওপর আরও খানিকটা সাদা পোঁচ প'ড়ে গেল।

'জগদীশবাবুর বাড়িতে গেডিসের কথা আরও অনেক আছে। সে-সব গেডিসের প্রসঙ্গে পরে বলা হবে। দার্জিলিং-এ নীলরতনবাবুর বাগান-বাড়ি ছিল —নাম 'মায়াপুরী'। গেডিস্ গিয়ে উঠেছিলেন সেই বাড়িতে। ডক্টর বোসও থাকতেন ওখানে গিয়ে। সে-সব প্রসঙ্গ এখন থাক্।

'তবে জানতে ইচ্ছে করে, আমার সিল্কের ছবির লোকটার সেই পিছনে-ফেলে-আসা পদচিহ্নের সাদা খড়ির দাগগুলো আজও আছে কিনা।

নন্দলালের ডায়েরী সংখ্যা ১২ থেকে দেখা যাচ্ছে, জগদীশবাবুর পৈতৃক বাড়ির বৈঠকখানায় আর নবপ্রতিষ্ঠিত বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে শিল্পকর্মের জন্যে ওঁরা শেষ দক্ষিণা পেয়েছিলেন ১৯২০ সালের ১০ই মার্চ। শেষ দক্ষিণার পরিমাণ —শ্রীনন্দলাল পেয়েছিলেন ১৩৩১২ টাকা আর শ্রীসুরেন কর মহাশয় পেয়েছিলেন ৬৩১ টাকা।

নন্দলালের করা বাড়ির নক্সা সংখ্যা (ট) হাতীবাগানের বাড়ি-প্রসঙ্গে লেখা রয়েছে: '১ বাইরের ঘর। জে. সি. বোসের লেবরেটরী-হলের জন্যে সিলিং-এর ওপর ছবি আঁকি —যা পিছনের দিকে খিলান ভেঙ্গে বার করতে হয় —এই ঘরে বসে করি। এই ঘরে সুরেনের বাবা দীননাথ কর থাকতেন আগে। পরে মুঙ্গেরে চলে যান।

'বাড়ির নক্সা সংখ্যা (ঠ): হাতীবাগানের বাড়ি। পার্টিশনের পরে দু'খণ্ড করা হলো। ১, উপর তলার পাকা ঘর —এই ঘরে 'তারা'র ছবি আঁকি। প্যাট্রিক গেডিসের অর্ডারের জন্যে চারখানি ছবি আঁকি। নীলরতনবাবুর তিন মেয়ের জন্যে তিনখানি ছবি করি। 'তিন শবরীর তিন অবস্থা'। পরেও তিন শবরী এঁকেছি।

সুদামার ছবি আর শবরীর ছবি তিনখানি পাঠাতেই নীলরতনবাবু ৫00 টাকা পাঠিয়ে দিলেন। টাকা পেতেই গোরার কলেরা হলো। গোরা তখন ছ'সাত বছরের ছেলে।

'নিচে-তলার বাইরের ঘরে ডক্টর বোসের জন্যে ছবি ইত্যাদি আঁকি। উপরে 'গরুর পাল', শিলাইদহের বহু স্কেচ্ ইত্যাদি করি। নিচে কোণারকের ছবি আঁকি। সুরেনের 'পথের সাথী' ছবি সংশোধন করি।' —এই সব সংবাদ লেখা রয়েছে।

॥ দ্বারভাঙ্গা ১৯০০, ১৯১০, ১৯১৬ ॥

শ্রীনন্দলালের পিতা পূর্ণচন্দ্রের ডায়েরীর পাতায় দেখা যাচ্ছে, লেখা রয়েছে : '৩রা ডিসেম্বর ১৮৮২ সাল ইং রাত্র ১১টার সময় ১৯ অগ্রহান ১২৮৯ সাল দ্বিতীয় পুত্রের জন্ম হয় —ঈশ্বর কৃপায় পুত্রটি জীবিত রহিল। —নাম নন্দলাল বসু'—

বিহারের মুঙ্গের জেলার হাভেলী-খড়্গাপুরে শ্রীনন্দলালের জন্ম। সেইজন্যেই যেন সারা জীবনে তিনি সবচেয়ে বেশিবার আনাগোনা করেছেন বিহারের ঐ জন্মভূমি অঞ্চলে। ' সারা বালককাল যেখানে কেটেছে, মধুর স্মৃতিবিজড়িত সেই স্থানে যাবার জন্যেই যেন ঘুরে ফিরে নাড়ীর টান অনুভব করতেন তাঁর অজ্ঞাতসারেই। পরবর্তী কর্মজীবনে ছুটী-ছাটা পেলেই তাই শ্রীনন্দলাল বেরিয়ে পড়তেন দলবল নিয়ে, বিহারের নানা দর্শনীয় স্থান দেখবার জন্যে। পিতা পূর্ণচন্দ্র ছিলেন দ্বারভাঙ্গা-এস্টেটের হাভেলী-খড়্গাপুর-তহশীলের ম্যানেজার। পরে তিনি দ্বারভাঙ্গা সদরে ইঞ্জিনীয়ারের পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৮৯৫ সালে খড়্গাপুর থেকে নন্দলাল কলকাতায় আসেন। ১৯০০ সালের দিকে পূর্ণচন্দ্র খড়্গাপুরের পাট গুটিয়ে গিয়েছিলেন দ্বারভাঙ্গায়। ঐ ১৯০০ সালেই ১৮ বছর বয়সে নন্দলাল প্রথম দ্বারভাঙ্গা যান বাবার কাছে বেড়াতে। এর পরে ১৯১০-১২ সালের দিকেও গিয়েছিলেন দ্বারভাঙ্গায়। সবশেষে গিয়েছিলেন ১৯১৬ সালে পূজার সময়ে তাঁর বাবার অসুখের বাড়াবাড়ি শুনে।

'রাজার ইঞ্জিনীয়ার হয়ে আমার বাবা থাকতেন দ্বারভাঙ্গা সদরে রাজবাড়ির কাছেই। এস্টেটের যে বড়ো বাড়িটিতে আমি গিয়ে উঠলুম —সেখানে খুব বড়ো একটি বাগান ছিল। নানা গাছের বাগান। আমার বাবারও বিশেষ শখ ছিল বাগান করার। বাগান করাতেন মালীদের দিয়ে। লিচুবাগান, আমবাগান —সব ছিল। মজঃফরপুরের লিচুর গাছ আর আমের বহু গাছ ছিল —গোলাপখাস, তোতাপুরী,

ন্যাংড়া, ফজলি, মালদই —সে কত রকমের আম। সে-সব ছিল কলমের গাছ। মহারাজ ছিলেন তখন রামেশ্বর সিং। খুব ভালবাসতেন তিনি আমার বাবাকে। প্রায়ই ডাকতেন তাঁকে নিজের খাস মজলিসে।

'বাবা আমাদের দ্বারভাঙ্গা যেতে বলে চিঠি লিখতেন মাঝে মাঝে। যেতুম আমরা। যেতুম গরমের সময়ে —লিচুর সময়ে, আমের সময়ে। লিচুগাছের লিচু আর আমগাছের আম, গাছে উঠে পেড়ে খেতুম প্রাণ ভরে। পড়ে গিয়েছিলুম একবার আমগাছ থেকে —সে স্পষ্ট মনে আছে। তবে হাত পা ভাঙ্গেনি ঠিকই। দ্বারভাঙ্গায় গিয়ে কিছু স্কেচ করেছিলুম। ছবিও এঁকেছি ওখানে। —একটি বুড়ো তার মেয়েকে নিয়ে যাচ্ছে শ্বশুরবাড়িতে রাখতে। এই দৃশ্য খড়্গপুরে দেখে, আমার নোট করা ছিল। এটা ভালো করে এঁকেছিলুম দ্বারভাঙ্গায় বসে। ছবিটি ছাপাও হয়েছিল বোধহয় কোথাও। আমার 'গোকাল ব্রত' (১৯১২) ছবিখানির প্রথম স্কেচ করে অবনীবাবুকে পাঠিয়েছিলুম দ্বারভাঙ্গা থেকেই।

'বাবার সহচর ছিলেন বাঙ্গালী আর মৈথিলী বিশিষ্ট ব্যক্তি অনেকে। বাঙ্গালীদের মধ্যে ছিলেন জগদীশ ভট্টাচার্য, ক্ষেত্রনাথ সেন —এঁরা সব। জগদীশ ভট্টাচার্য মাস্টারি করতেন ইস্কুলে, সেতারীও ছিলেন তিনি নাম-করা; বাড়ি ছিল তাঁর দ্বারভাঙ্গা-বাজারে। বাবা যতদিন জীবিত ছিলেন —সেই ১৯১৬ সাল পর্যন্ত আমরা ওখানে আনাগোনা করেছি প্রায়ই। যখন যেতুম, থাকতুম ওখানে এক-নাগাড়ে অনেকদিন ধরে। তবে দ্বারভাঙ্গা শহর ছেড়ে ওখানকার কোনো গাঁয়ের দিকে আমরা বেড়াতে যাইনি কখনো।

'১৯১০-১২ সালের দিকেও দ্বারভাঙ্গায় গেছি। গরমের বন্ধেই ওখানে যাওয়া হতো বিশেষ করে। বাগান-ভরতি আম আর লিচু, মনে আছে যখনই গেছি, খেয়ে শেষ করতে পারা যেত না। ঐ সময়ে একবার গ্রীষ্মকালে খুব বৃষ্টি হলো। জল ছুটছে রাস্তার ওপর দিয়ে। রাস্তার দু'পাশ থেকে মাটী কেটে তুলেছিল রাস্তার ওপরে দেবার জন্যে। চৌকো গর্তগুলো জলে ভরতি হয়ে গেছে। তার ভেতর থেকে জেগে আছে কেবল মাটী-কাটার 'সাক্ষী'গুলি। আর সেই 'সাক্ষী'গুলিকে ঘেরে ঘেরে ঘুরছে

অসংখ্য মাছ। সে-মাছ এসেছে এখানে পুকুর-ভেসে। সেই মাছ আমরা অনায়াসে ধরলুম প্রচুর। বাড়িতে খাওয়া তো হলোই। ছোট বড়ো অনেক মাছ পাঠানো হয়েছিল প্রতিবেশীদেরও ঘরে ঘরে।

শ্রীনন্দলালের ১২ সংখ্যক স্কেচ বই-এ দ্বারভাঙ্গা যাবার কিঞ্চিৎ উল্লেখ রয়েছে। সেবারে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর মহাশয়ও শ্রীনন্দলালের সঙ্গে দ্বারভাঙ্গায় গিয়েছিলেন —মামাবাবুর কাছে। ১৯১০-১২ সালের দিকের সে-কথা। লেখা রয়েছে, —দ্বারভাঙ্গা যাওয়ার সময় —সিগারেটের ফটো এ্যাল্‌বাম —টিকিট দিলে পাওয়া যেত। আর সে-এ্যাল্‌বাম সংগ্রহ করেছিলেন শ্রীনন্দলাল সুরেন্দ্রনাথের কাছ থেকে।

'রাজবাড়ির সীমানার বাইরে রেল-লাইনের ওপারে আমার বাবা কিছু জমি কিনেছিলেন —বিঘে দেড়-দুই-এর মতন। কিনেছিলেন বোধহয় তাঁর ছোট ছেলের নামে। আমাদের সেই কেনা-জমির ওপরেও কিছু বাগান করা হয়েছিল। আমের গাছই ছিল সেখানে বেশি। জমির মাঝখানটির দিকে একটি বেলগাছ ছিল। আর বাগানের চারদিকে ছিল শিশুগাছ। শিশুগাছের বেড়া দেওয়া হয়েছিল বাগানের আমগাছগুলি ঝড় থেকে বাঁচাবার জন্যে। আমাদের ঐ আমবাগানের আম হলে, তা থেকে কিছু হতো বিতরণ করা, আর কিছু বিক্রী করে জমির খাজনা দেওয়া হতো। সে-জমি আমাদের দখলে এখনও (১৯৬৫) আছে।

'রাজার প্রিয় পারিষদ ছিলেন আমার বাবা। তাঁর শেষ অসুখের সময়ে চিকিৎসা করেছিলেন রাজবৈদ্য। কোনো ত্রুটি ছিল না তাতে। তথাপি তিনি পরলোক গমন করলেন —সে ১৯১৬ সালের বিজয়া-দশমীর দিনে। রাজার কুলদেবীর চরণামৃত এনে দেওয়া হলো। সেই চরণামৃত পান করে বাবা দেহরক্ষা করলেন বিজয়া-দশমীর দিনে। —পুত্রকন্যাদের ওপর আমার বাবার শাসন কোনো দিনই কড়া ছিল না। খড়্গপুর থেকে দ্বারভাঙ্গা যাবার পরে তিনি আমাদের বিশেষ খোঁজ-খবর রাখতে পারতেন না। ১৯০৩ সালে আমার বিবাহের পরে দাদাশ্বশুর প্রসন্নবাবু হলেন আমার প্রকৃত গার্জেন। আমার মতো ভবঘুরে নাতজামাই-এর জন্যে তাঁর দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। আমাকে জীবিকার বাঁধা পথে চালিত করবার জন্যে তাঁর উৎসাহে ভাঁটা পড়েনি কোনও দিন। কিন্তু

আমার বিধিলিপিই যে আলাদা। সামনে আমার চলার জন্যে অবারিত ছিল প্রশস্ত অথচ বন্ধুর পথ। আমার ভাগ্যবিধাতা বিশ্বকর্মা সেই ক্ষুরধার পথ দিয়েই আমাকে চালিয়ে নিয়ে যাবেন —এটা যেন স্থির করাই ছিল।

'বাবাকে দাহ করা হলো তাঁরই কেনা সেই টুকরো লাখেরাজ ভিটের ওপর সেই বেলগাছটির তলায়। তুলসীগাছও বসানো হয়েছিল তাঁর শ্মশানের কাছে। ধর্মে আমরা বৈষ্ণব তো। ওদিকে আমাদের ঐ বাগানের পাশেই কালীবাড়ি আছে একটি। কালীর সেবাইতরা জমির খানিক এখন দখল করে নিয়েছে। জমিটাও চাইছে তারা। দেবোত্তর করে দান করে দিলে মন্দ হয় না। যাই হোক্, সেই ভিটে আর বেলগাছ তদারক করতেন একজন ব্রাহ্মণ। এখনও (১৯৬৫) সেই শ্মশান-ভিটে আমাদেরই আছে, নাই শুধু বেলগাছটি। বাবার শ্মশানের ওপর ঐ বেলগাছটিকে ঘিরে, শ্মশান-বেড়ে আমার ইচ্ছে ছিল একটি 'পঞ্চবটী' করার। শান্তিনিকেতনে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ 'পঞ্চবটী' তৈরি করেছিলেন —উত্তরায়ণের বাগানের ঈশেন কোণে। বট, বেল, আমলকী, অশ্বত্থ আর নিম —এই পাঁচ রকমের পাঁচটি গাছ পুঁতে শান্তিনিকেতনে 'পঞ্চবটী' করেছিলেন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ। সে-সময়ে বিধুশেখর শাস্ত্রীমশায় 'পঞ্চবটী'-প্রতিষ্ঠার জন্যে মন্ত্র-তন্ত্র নির্বাচন করে দিয়ে গুরুদেবের এই উদ্যোগে বিশেষ সহযোগিতা করেছিলেন।

॥ বাণীপুর ॥

'শেষ যে-বছর দ্বারভাঙ্গা যাই সে হলো বাবার ঐ মৃত্যুর বছর —১৯১৬ সাল। সে-বছর ঝড় হয়েছিল খুব পূজার সময়ে, বিজয়া-দশমীর দিন। আমি দ্বারভাঙ্গায় বসে সে ঝড়ের ব্যাপার কিছুই টের পাইনি। দ্বারভাঙ্গায় বাবার মুখাগ্নি সেরে বাণীপুরের বাড়িতে ফিরে এসে দেখি, আমাদের গোয়ালঘরের চাল-টাল সব উড়ে গেছে। গরুগুলোকে সব তোলা হয়েছে ঘরে এনে। তবে গরুগুলো তখন যেখানেই থাক্, আমার মাথার ওপর থেকে যেন সব আচ্ছাদন সরে গেছে বলে আমার তখন

মনে হতে লাগলো। অত্যন্ত অসহায় বোধ করতে লাগলুম।

'বাণীপুরের বাড়িতে থাকার সময়ে আমাকে একবার সাপে কামড়েছিল। সে সর্পাঘাতে মরিনি তখন। কিন্তু হৈ চৈ হয়েছিল খুব। —সে-কথা বলছি। গ্রামের বাড়িতে বাগানের ওদিকে জেলেরা থাকতো। আমাদের পুকুরে মাছ ধরবার সময়ে তাদের ডেকে আনা হতো। পৈতৃক আমল থেকেই আমাদের বাড়ির সব কাজের জন্যে জমির ব্যবস্থা করা ছিল। জেলেদেরও বোধহয় দেওয়া ছিল 'জেলেত্র' জমি কিছু —পুরোহিতের দেবত্রের মতন। তবুও মাছ ধরার মজুরী পেত তারা —পোনা মাছ হলে তিন ভাগের ভাগ, আর চুনো মাছ হলে আধাআধি। আমাদের বাড়ির পুকুরের চার পাড়েই ছিল নারকোল গাছ আর কলমের আমের গাছ। কিন্তু পুকুর সব সময়ে সাফ্ থাকতো না। দল-দাম বা কচুরিপানা-টানা হলে সেগুলোকে তুলে গাবালের চারদিকে জড়ো করে রাখা হতো।

'একদিন পুকুরে মাছ ধরা হচ্ছিল, আমি উপস্থিত ছিলুম সেখানে। মাছধরা দেখতে গিয়েছিলুম। মাছ-ধরা দেখার আগেই চোখ পড়লো আমার কচুরি-পানার ফিকে বেগুনী রঙের বড়ো বড়ো ফুলগুলির ওপরে। ইচ্ছে হলো তুলে আনি। শুখনো কচুরি-পানার গাদা পেরিয়ে গাবালের জলে পা ডুবিয়ে ফুল তুলতে লাগলুম। ফুল তুলে মনের আনন্দে যখন ডাঙায় উঠে আসছি, পাঁকের ভেতরে আমার পা গাড়া গেছে। কাদা-সমেত পা তুলতেই, দেখি না, পায়ের সঙ্গে একটা সাপ উঠে আসছে! সাপটা আমার পা কামড়ে ধরেছে। সাপটা হলো হলুদে আর সবুজে মেশানো কালচিটে রঙের। —সেই দৃশ্য দেখে আমি ঘাবড়ে গেলুম। পুকুরপাড়ের লোকেরা হৈ চৈ করতে লাগলো। অন্দরের ভেতরেও খবর গেল। সেখানেও হৈ চৈ বেধে গেল। সাপটা পা ছেড়ে এর মধ্যে সরে পড়েছে। আমাকে তখন আধা-অসাড় অবস্থায় পুকুর-ধার থেকে ধরে ধরে বৈঠকখানায় নিয়ে এলো।

'সেকালে বাণীপুরের এদিকে-ওদিকের গাঁয়ে সাপের অনেক রোজা ছিল। রোজাদের ডেকে আনা হলো বাড়িতে। তারা এসে সাপে-কাটা জায়গাটায় চুন লাগিয়ে দিলে আর আমাকে তাদের 'গন্দ' খাওয়ালে।

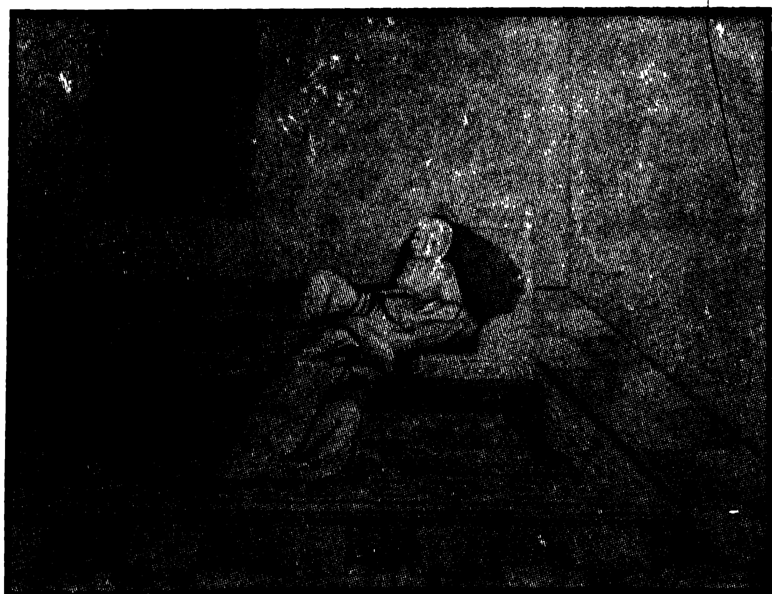
তারপর হাত-চেলে মা মনসার নামে বিষ ঝাড়তে লাগলো, আস্তে জোরে সুর করে করে নানা ছড়া কেটে মন্ত্র পড়ে ক্ষতস্থানে ফুঁক দিতে লাগলো। 'কাঙুর কামিক্ষে', 'হাড়িঝি চণ্ডীর' নাম করে করে ক্রমাগত 'নরসিংহ কিল'-এর চাপড় মারতে লাগলো পুরো দমে। খানিক পরে, একজন ওস্তাদ বললে, —আর বিষ নাই। কিন্তু আমি তখনও চাঙ্গা হইনি। আমার অবস্থা দেখে আর একজন ওস্তাদ বললে, —তাহলে বিষ অন্য কোথাও উঠে গেছে। একদল রোজা হার মেনে গেল। আর এক গাঁয়ের আর একদল রোজা এলো। এরা এসে বললে, —কোনো ভয় নাই, আমরা বিষ নামিয়ে দেবো। তখন আগের দলের সঙ্গে এদের বচসা হতে লাগলো। আগের দল বললে, —আমরা কি ওস্তাদ নই? কে একজন বললে, —নতুন দলের ওপর আকজ করে আগের দল বিষ 'ভেড়ে' দিতে পারে। কথাটা আমার কানে আসতেই, নতুন দল বিষ নামাতে পারবে না ভেবে আমার শরীরটা আরও অবশ হয়ে এলো। শেষে আপোসে দু'দলে মিলেই বিষ চালা শুরু করলে। নতুন করে খড়ির আঁক কেটে আবার হাত-চালা শুরু হলো। রোজাদের কেউ বলে, বিষ হেঁটোয় নেমেছে। কেউ বলে, না, জাং পেরিয়েছে, কেউ বলে এত দূরে, কেউ বলে আরো দূরে, মোরগ-ঝাঁপ না-করলে উপায় নাই।—

'রোজাদের এইসব এলোমেলো কথা শুনে আমার মনে হলো, —এই ওস্তাদদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলেই আমার গায়ের বিষ নেমে যাবে। ঠাকুর বলেছিলেন —'নাই, নাই বললে সাপের বিষ নেমে যায়'। কথাটা হঠাৎ মনে হতেই শরীরটা যেন চাঙ্গা বোধ হতে লাগলো। খানিক বিশ্রাম পাওয়ার পরে দেখলুম, আমার খিধে পেয়েছে। তখন পেট ভরে ভিজে ভাত আর এক পাথরবাটী আমানি খেতেই আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলুম। ওদিকে সট্‌কে-পড়া সাপটা মারা পড়েছিল। সবাই গিয়ে দেখলে —সেটা 'বেত-আছড়া' সাপ। গাছে থাকে। জলে গিয়েছিল ব্যাং খেতে। বেত-আছড়া সাপের বিষ নাই।

'দেশের বাড়িতে থাকতে অনেক অদ্ভুত ঘটনা আমার দেখার বা শোনার সুযোগ হয়েছিল। আমার চোখে-দেখা একটি ঘটনার কথা বলছি। —পূর্বজন্মবাদ বলবে? তাতে কিন্তু আমার আপত্তি নাই। আমার ভগ্নী

নীলনলিনীর বিবাহ হয়েছিল আমতার কাছে ছোটময়রা গাঁয়ে। গাঁয়েই থাকতো ওরা। আমার ভগ্নীপতি সুরেন সরকার ছিলেন ছোটো-খাটো জমিদার। গ্রামটি ছিল মুসলমানপ্রধান। কানা দামোদরের কাছেই। একবার সুরেনরা আমাদের বাড়িতে এলেন। তখন ওঁদের একটি মেয়েছেলে হয়েছিল। সেই মেয়েটি হয়ে থেকেই তার কানে ছিল তেরোটি ছিদ্র। নীলনলিনী তাঁর মেয়ের এ-কথা আমাকে প্রথম বলার পরে আমি কথাটা আদবে বিশ্বাস করতে পারিনি। সেবারে নীলনলিনী তাঁর মেয়েকে আমার কাছে এনে তার কান টেনে ছিদ্রগুলি পরে পরে গুণে গুণে সব দেখিয়ে দিলে। মেয়েটির কানটির লতি ধরে টানতেই ছিদ্রগুলি সত্যিই পর পর দেখা গেল। পর পর তেরোটি ছিদ্র —ঠিক যেন মাকড়ী-পরার। দেখে অবাক লাগলেও বিশ্বাস আমাকে করতেই হলো। সে মেয়েটির বয়েস তখন এই দু-তিন মাসের মতো হবে। কিন্তু তাহলে তার কানের এই ছিদ্রগুলি থাকার কি হেতু হতে পারে। আমার বিশ্বাস, মেয়েটি পূর্বজন্মে গাঁয়ের মুসলমানবাড়ির কেউ ছিল। কারণ ওঁদের ছোটময়রায় ঐ রকম কান-জুড়ে মাকড়ী পরার রেওয়াজ বর্ধিষ্ণু মুসলমান-জেনানাতেই তখন ছিল বিশেষ করে। সুরেনদের বাড়িতে এই রকম গয়না পরার পাট আগেই উঠে গিয়েছিল। আর কানে অতো মাকড়ী পরার মতো ধনী হিন্দুও গাঁয়ে ছিল না। যাই হোক্ ন্যায়ের ফাঁকি থাকলেও সেই শিশুটির কানের ছেঁদাগুলির এ-ছাড়া কি ব্যাখ্যা হতে পারে, আমরা তখন সে-রহস্যের কোনো সমাধান করতে পারিনি।

'এই সঙ্গে আর একটা ভয়ানক ঘটনার কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। এটা অবশ্য আমি নিজের চোখে দেখিনি। পিসিমায়েদের কাছে শোনা গল্প। —আমার জেঠতুতো ছোট ভাই ছিলেন আমার সমবয়সী। আমার জেঠাইমায়ের এই ছেলে নরেন —সে বেঁচেছিল কিছুদিন। নরেন হবার আগে কিন্তু জেঠাইমায়ের বিভ্রাট গেছে অনেক। এক বছর দেড় বছর অন্তর অন্তর জেঠাইমায়ের পর পর চারটি ছেলে হয়। আর তারা মারা যায় এক বছর দেড় বছরের হতে না-হতেই। এই মরাঞ্চে-পোয়াতীর জন্যে বাড়ির সবাই খুব চিন্তিত হয়ে পড়লো। নরেনের



প্রসন্নবাবুর আদলে দশরথের অন্তিমশয্যা - নন্দলাল

আগে জেঠাইমায়ের যে শেষ ছেলে হলো —সে-ও মারা গেল। শেষ ছেলেটি মরার পরে, সেই মরা-ছেলেকে নদীর ধারে নিয়ে গিয়ে পুঁতে রেখে এলো। যে পুঁততে গেল. সে আগের মরা ছেলেগুলিকেও পুঁতে এসেছিল। বারে বারে ঐ একই কর্ম করে করে সে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। দেড় বছর পরে পরে ঐ রকম মরা ছেলে পোঁতার একই হাঙ্গামা। শেষবারে ছেলে পুঁততে গিয়ে সে স্থির করলে, —এবারে পোঁতবার আগে তার অঙ্গে 'চিহ্ন' করে দেবে। এই ভেবে সে ঐ মরা ছেলেটার পা মুচড়ে, হাঁটু মট্‌কে, কোদাল দিয়ে ছেলেটার ঠোঁট কেটে পুঁতে দিলে। কিন্তু আশ্চর্য হলো এই, জেঠাইমায়ের এই ছেলেটার পরেই, নরেন যখন জন্মাল, দেখা গেল কি, তার ঠোঁট দু-টো কাটা, আর হাত-পাগুলো মুচ্‌ড়িয়ে ভাঙ্গা। সবাই তো আঁতুড়-ঘরে ছেলের এই চেহারা দেখে অবাক হয়ে গেল। এই নরেন কিন্তু বেঁচেছিল কিছুদিন। সে মারা গেল দশ-বারো বছর বয়সে। নরেন মারা যাবার পরে, গয়ায় পিণ্ডি দিয়ে তবে বাড়ির সবাই নিষ্কৃতি পেলেন।

'মুঙ্গের, খড়্গপুর, গাংটা আনাগোনা করা হয়েছে অনেকবার। খড়গপুরে আমার শ্বশুরবাড়ি। ওঁরা ছিলেন ওখানে বর্ধিষ্ণু গৃহস্থ। আমার দাদাশ্বশুর প্রসন্নবাবু খুব দীর্ঘজীবী ছিলেন। শেষ দিকে তাঁর প্যারাালিসিসের মতো হয়েছিল। এই অবস্থাতেও তিনি বেঁচেছিলেন প্রায় চার-পাঁচ বছর। লম্বা চওড়া ফরসা বিরাট পুরুষ ছিলেন তিনি। আমার 'দশরথ', 'ধৃতরাষ্ট্র' মূর্তি-কল্পনার আদর্শ ছিলেন আমার দাদাশ্বশুর এই প্রসন্নবাবু। তিনি মারা গেলেন বোধহয় ১৯০৬-৭ সালের দিকে। অসুস্থ অবস্থায় শেষের দিকে তাঁর সেবা-যত্ন করতেন আমার শ্যালীরা। তাঁকে নাওয়ানো খাওয়ানো শোওয়ানোর বিশেষভাবে তদারক করতেন আমার মেজো শ্যালী। তার ডাক-নাম ছিল —'ভূতন্'। প্রসন্নবাবু ছিলেন সেকেলে মজলিসী মানুষ। আমার বাবা পূর্ণচন্দ্রের দরবারে তাঁর আনাগোনার কথা আগে বলা হয়েছে।

'প্রসন্নবাবু পরলোক-টরলোকের গল্প বলতে খুব ভালোবাসতেন। অসুস্থ অবস্থায় একদিন আমার মেজো শ্যালী 'ভূতন্' মজা করে তাঁকে

বললে, —দাদু আপনি তো চলে যাবেন, গিয়ে আমাদের খবর-টবর দেবেন কিন্তু। পরলোক থেকে সঠিক খবর দেওয়া চাই। ভূতনের এই কথাটা শুনে প্রসন্নবাবু কিন্তু হাসেননি। তিনি গম্ভীর হয়ে উত্তরে বলেছিলেন, —'চেষ্টা করবো'। ভূতন্ তখন কথাটাকে বিশেষ আমল দেয়নি।

প্রসন্নবাবুর মৃত্যু হলো। বাড়ির সকলেরই মন-মেজাজ খারাপ। সবারই মন শোকে আচ্ছন্ন। সেই অবস্থায় 'ভূতন্' একদিন শুয়ে আছে —দাদু যে-ঘরে মারা গেছেন সেই ঘরে। ভূতনই সবচেয়ে নেওটো ছিল দাদুর। সেই ঘরে সকালের দিকে সে প্রদীপ জ্বালিয়ে, ধূপ-টুপ দিয়ে চুপটি করে শুয়ে আছে। তার নাওয়া নাই, খাওয়া নাই —শোকে বিহ্বল। এমন সময়ে আচম্বিতে গম্ভীর স্বরে খুব জোরে জোরে ডাক দিলেন তিন বার —'ভূতন'! 'ভূতন'!! 'ভূতন'!!! আর আশ্চর্য এই, সেই ভয়ঙ্কর ভূতুড়ে নির্ঘোষে সমস্ত ঘরখানা সত্যিই থরহরি কেঁপে কেঁপে উঠলো। বাড়ির সবাই সাক্ষী আছেন সে ঘটনার।

'১৯১৬ সালে পুজোর সময়ে আমার বাবার মৃত্যুর এক বছর পরে, ১৯১৭ সনের পুজোর ছুটীতে শান্তিনিকেতনে দু'চারদিন থেকে, খড়্গাপুরের দিকে বেড়াতে গেলুম আমি, মুকুল আর সুরেন। খড়্গাপুরে আমার শ্বশুরবাড়ি তখনও জমজমাট। কিন্তু, আমাদের পাট ওখান থেকে অনেক আগেই (১৯০০) উঠে গিয়েছিল। আমাদের বরিয়ারপুর স্টেশন পেরিয়ে জামালপুর জংশন থেকে মুঙ্গেরে যাওয়া যায়। সেবারে আমরা বরিয়ারপুর থেকে ট্রেনেই মুঙ্গের আনাগোনা করলুম। সোজা হেঁটেও যাওয়া যায়। মুঙ্গের থেকে ফিরে, দু'তিন দিন আমরা খড়্গাপুরে থেকে গাংটা গেলুম।

॥ মুঙ্গের, ১৯১৭ ॥

মুঙ্গেরে গিয়ে অনেক স্কেচ্ করেছিলেন নন্দলাল ১৯১৭ সালে। এর মধ্যে সব চেয়ে মূল্যবান হচ্ছে, —মুঙ্গেরে ফোর্ট, মুসলমানদের কবরের নক্সা, গৈবীনাথ থেকে মসজিদ, মুঙ্গেরের গঙ্গা আর কষ্টহারিণীর ঘাট। মুঙ্গের-ফোর্ট নানা কারণে পূর্বভারতীয়দের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান। —রাজনৈতিক দ্যূতক্রিয়ায় নবাব মীরকাশিম এখানে প্রমত্ত হয়ে উঠেছিলেন। মুসলমান ঐতিহাসিক গোলাম হোসেনের একটা জায়গির ছিল মুঙ্গেরের ফোর্ট-এলাকায়। বাঙ্গালার শেষ স্বাধীন নবাব মীরকাশিম গোলাম হোসেনের ঐ জায়গিরটী দখল করলেন। দখল করে বকশিশ করলেন তাঁর জেনারেল গুরগিন খাঁকে। সেখানে যে পুরানো কেল্লা ছিল সেটা মেরামত করালেন। ঐ কেল্লার পাশেই ছিল সরকারী কেল্লা। গুরগিন খাঁ মীরকাশিমের কাছে ঐ কেল্লা পেয়ে ওখানে ফৌজ তৈরি করতে লাগলেন আর মুঙ্গেরের ফোর্টের ভেতর নতুন ধরনের বন্দুক কামান গড়ারও বন্দোবস্ত করে ফেললেন। মুঙ্গের ফোর্টের ভেতর তিনি হাতিয়ার তৈরির এক বিরাট কারখানা ফেঁদে বসলেন। গুরগিন খাঁর তদারকে মুঙ্গেরে তৈরি বন্দুক পিস্তল কামান বিলেতে তৈরি ঐ সব অস্ত্রকেও টেক্কা দিতে লাগল।

নবাব মীরকাশিম মুঙ্গেরের পুরানো ভাঙ্গা কেল্লাটাকে সারিয়ে সুরিয়ে খানিকটা বাড়িয়ে-চারিয়ে নতুন ঢঙ্গে ঢেলে সাজালেন। সর্বদা হাতের কাছে সেনাপতিকে পাবেন বলে মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ডের গায়ে পীরপাহাড়ের ওপর জেনারেল গুরগিন খাঁয়ের জন্যে নবাবী ধরনের এক বিরাট বাড়িও উঠেছিল।

মুঙ্গেরের কেল্লাকে ঢেলে সাজানো হয়েছে। মধ্যিখানে নবাবের নতুন বাড়ি। পাটবেগম ফতমা-বিবি সে-বাড়ির অধিশ্বরী। তাতে দিল্লীর লালকেল্লার অনুকরণে দেওয়ান-ই-আম, দেওয়ান-ই-খাস, রং-মহল, গোসলখানা ইত্যাদি সবই আছে। সবচেয়ে জরুরী মহল হলো মিলিটারী

ব্যারাক —সেখানে জেনারেল গুরগিন খাঁর তদারকে পনেরো হাজার ঘোড়সওয়ার আর পঁচিশ হাজার পয়দল ফৌজ বিলিতি কেতায় ডিসিপ্লিন্ড হয়ে লড়াইয়ের জন্যে তৈরি হচ্ছে। নবাব স্বয়ং কেল্লায় বসবাস করতে থাকায় কেল্লার বাইরে মুঙ্গের শহরটাও ক্রমশঃ বেড়ে উঠতে লাগলো। ১৭৬২ সালে নভেম্বর মাসের শেষাশেষি ভ্যান্‌সিটার্ট, ওয়ারেন হেস্টিংসকে সঙ্গে করে কলকাতা ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন। তাঁরা মুঙ্গেরের কাছাকাছি এসে পৌঁছতেই মীরকাশিম শহর থেকে খানিকটা পথ এগিয়ে এসে গভর্ণর আর তাঁর লোকেদের প্রচুর আদর যত্ন করে মুঙ্গেরের কেল্লায় নিয়ে গিয়ে তুললেন। ফোর্ট থেকে চার মাইল দূরে পীরপাহাড়ের ওপর জেনারেল গুরগিন খাঁর বাড়িতেই তাঁদের থাকবার স্থান করা হয়েছিল। আদর-আপ্যায়নের পরে তাঁদের সেইখানেই তুলে দিয়ে আসা হলো। গুরগিন খাঁ তাঁদের তদারকে রইলেন। —এর পরে ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করা আমাদের প্রসঙ্গের বাইরে। —মুঙ্গের পীরপাহাড়ের এই ঐতিহাসিক প্রাসাদটি পরে কলকাতার রাজা কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয় কিনে নেন। এ-বাড়ি তাঁর ছেলে প্রফুল্লনাথ ঠাকুর মহাশয়ের আমল পর্যন্ত তাঁদের অধিকারে ছিল। আত্মীয়তা ও বন্ধুত্ব সূত্রে অবনীবাবু ঐ পীরপাহাড়ের বাড়িতে মাঝে মাঝে চেঞ্জে গিয়ে থাকতেন।—

গিরিয়ার যুদ্ধে মীরকাশিমের হার হলো ইংরেজদের কাছে। তখন তিনি স্থির করলেন, উধুয়ানালায় তিনি শেষ লড়াই লড়বেন ইংরেজদের সঙ্গে। এই সংকল্প এঁটে মীরকাশিম মুঙ্গেরের ফোর্ট ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন। কিন্তু বেরোবার আগে তিনি একটা অতি জঘন্য কাণ্ড করে বসলেন। মুঙ্গেরের কেল্লায় যে-সব সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে কয়েদ করে রাখা হয়েছিল তাঁরা সকলেই মীরকাশিমের হাতে একে একে খুন হয়ে গেলেন। রাজা রামনারায়ণের গলায় বালির বস্তা বেঁধে তাঁকে গঙ্গায় ডুবিয়ে মারা হলো। রাজা রাজবল্লভকে আর তাঁর ক'জন ছেলেকে একটা নৌকোয় চড়িয়ে মাঝ-দরিয়ায় নিয়ে গিয়ে নৌকোর তলা ফুটো করে দেওয়া হলো। জলে পড়ে হাবুডুবু খেতে খেতে তাঁরা একে একে দম বন্ধ হয়ে মারা গেলেন। জনশ্রুতি, সেই সময়েই জগৎশেঠ হৌসের

মহাপ্রতাবচাঁদ আর স্বরূপচাঁদের পায়ে পাথর বেঁধে তাঁদের নাকি কেল্লায় প্রাচীর থেকে গঙ্গায় ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়। সপুত্র রায়রায়ান উমিদ রায়, রাজা ফতে সিং, রাজা বুনিয়াদ সিং প্রমুখ আরো অনেকে মীরকাশিমের হাতে পড়ে ঐ সময়ে ভবলীলা সাঙ্গ করলেন। মীরকাশিম কেবল ইংরেজ বন্দীদের তখনও প্রাণে মারলেন না, জিইয়ে রেখে দিলেন। —যাই হোক্, মীরকাশিমের হাতে এই রকম বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ইহজীবনের দুঃখ-কষ্টের নিরাকরণ করেছিলেন পতিতপাবনী মা গঙ্গা —তাঁর 'কষ্টহারিণীর ঘাট' থেকে।

মুঙ্গের-ফোর্টের গেট থেকে এক পোয়া (আধ মাইল) দূরে ডান দিকে 'কষ্টহারিণীর ঘাট'। এই ঘাটে পঁচিশটি ধাপ আছে। বর্ষাকালে বেশির ভাগ ধাপই জলে ডুবে থাকে। সুপ্রাচীন প্রবাদ, এই ঘাটে স্নান করলে কুষ্ঠরোগ আরোগ্য হয়। সেইজন্যে এই ঘাটে স্ত্রী-পুরুষ স্নান করে থাকে সর্ববিধ 'কষ্ট' (মূলতঃ 'কুষ্ঠ' ?) থেকে আরোগ্য-কামনায়। গেটের বাঁ-দিকে 'রাজমাতা ঘাট', 'রাজঘাট' আর 'বাবুঘাট'। 'রাজমাতা' ঘাটে স্নান করে কেবল স্ত্রীলোকেরা, 'রাজঘাটে' স্নান করে কেবল পুরুষ। কিন্তু, 'কষ্টহারিণী'র ঘাটে নির্বিচার। বাবুঘাটের কাছেই ঘূর্ণী। স্থানীয় লোকেরা বলেন, ফোর্টের কাছাকাছি 'রাজমাতা ঘাট', 'রাজঘাট' বা 'বাবুঘাট' থেকে মীরকাশিম ওঁদের হত্যা করেছিলেন। তবে, এই পৈশাচিক কাণ্ড কিঞ্চিৎ অন্তরালে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকলে 'কষ্টহারিণীর ঘাটে' বধ্যদের টেনে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়।

ঐ ঘাটের অদূরে ডুবো-পাহাড় ঘেরে ঘূর্ণী ঘুরছে অনবরত। তাতে সৃষ্টি হয়েছে অতলস্পর্শ দহের। সেই দহে-বাঁধা ঘাট থেকে কারো পা একবার পিছলে গেলে তৎক্ষণাৎ তার জীবলীলার সকল দুঃখকষ্টের হয় চরম অবসান। যাই হোক্, শ্রীনন্দলালের তুলিকাস্পর্শে সেদিনকার সেই ভয়ঙ্কর ঘাট লোকের মনে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে চিরকাল —মহাভারতের মহাপ্রস্থান পর্বের এ হলো যেন স্বর্গদ্বার।

শ্রীনন্দলালের ৭ সংখ্যক স্কেচ্‌বুকে আরও কয়েকটি ঐতিহাসিক স্কেচ্ রয়েছে —গৈবীনাথ আর গৈবীনাথ পাহাড় থেকে সুলতানগঞ্জের

দিকে উঁচু পাহাড়ের ওপর মসজিদের দৃশ্য। নাথপন্থের সাধু গৈবীনাথ একালের শিবঠাকুর ; সন্নিহিত অঞ্চলে সম্প্রতি আবিষ্কৃত সেকালের বিক্রমশীলা বিহারের কোনও বুদ্ধদেবতা হওয়াও অসম্ভব নয়। সুলতানগঞ্জের গঙ্গাগর্ভে মন্দির, —পাহাড়ের চূড়োর মতন দ্বীপের বিহারপ্রদেশের ওপর মন্দির। শ্রীনন্দলালের স্কেচে অসংখ্য ভক্তের ভক্তিনত অপূর্ব চিত্ররূপ। বিক্রমশীলা-নালন্দা-রাজগীরের পরিবেশে পাহাড়ে-জঙ্গলে যত্রতত্র বৌদ্ধমূর্তির নিদর্শন মেলা বিচিত্র নয়। কিন্তু হিন্দুর দেশে হিন্দু-মানসিকতায় বুদ্ধদেবের শিবঠাকুরে রূপান্তরিত হওয়া আরও স্বাভাবিক ব্যাপার। আর আশ্চর্য হলো এই, হিন্দু-সংস্কৃতির বিশ্বগ্রাসী জারকরসের রসায়নে ভারতবর্ষে সর্ব ধর্মই এক হয়ে তার শাশ্বত অখণ্ড রূপ লাভ করে আছে। শ্রীনন্দলালের তুলিকাস্পর্শে সেই অপরূপেরই যেন সজীব রূপায়ন।

॥ খড়্গপুর-গাংটা, ১৯১৭ ॥

'আমরা ঐ-সময়ে মুঙ্গের-টুঙ্গের ঘুরে ফের জামালপুর দিয়ে রতনপুর পেরিয়ে বরিয়ারপুর স্টেশনে এলুম। স্টেশন থেকে খড়্গপুর এগারো-বারো মাইল দূর হবে। রাস্তাটুকু আসার পথে কিছু কিছু স্কেচ্ করেছিলুম। —স্টেশন থেকে, মহুয়া-ডালে সাঁওতাল ছেলে, মুকুল রাস্তার মাঝে বসে স্কেচ করছেন আর মুসলমান-আমলের একটি ব্রীজ। বরিয়ারপুর থেকে খড়্গপুরে শ্বশুরবাড়িতে উঠে দু-এক দিন ছিলুম ওখানে। ওখানে থেকে কিছু স্কেচ্ করেছিলুম। পাঁচকুমারী-টুমারী ওখানে যা যা দেখবার দেখা হলো। লেক-টেক আবার দেখা হলো।

'খড়্গপুর থেকে গেলুম ছ-সাত মাইল দূরে —গাংটায়। গাংটায় গিয়ে থাকা হয়েছিল সাত-আট দিন। ওখানে ঐ সময়ে অনেক স্কেচ্ করা হয়েছিল। সাঁওতাল-টাওতালদের বহু স্কেচ্ করা হয়। ১৯১৭ সালে আমরা গাংটায় গিয়ে উঠেছিলুম ডাকবাঙ্গলোতে। পাহাড়ের ধারেই ডাকবাঙ্গলো। রামাদীন ছিল চাপরাসী। সুরেনের মেজো ভাই

শৈলেন তখন থাকতো ওখানে। সেই সব ব্যবস্থা করে রেখেছিল। রান্না-বান্না করে আহারাদির ব্যবস্থা করতো রামাদীন। আর আমরা সারাদিন আশেপাশের গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে নানা স্কেচ্ করতুম। গাছের ছাল স্টাডি করা হতো। খড়্গপুরে ঐ সময়ে বেশির ভাগই করা হয়েছে গাছের স্টাডি। নিম, আম. পলাশ, কুল, শাল —এই সব গাছের স্টাডি করা আছে ব্ল্যাক্ এণ্ড হোয়াইট্ বা কালি-তুলির কাজে। প্রত্যেকটি গাছের ক্যার‍্যাক্টার্ বা বৈশিষ্ট্য আঁকা আছে। এই স্টাডিগুলি একত্র করে একটা স্বতন্ত্র বই বের করতে পারলে ভালো হয়।

'খড়্গপুর অঞ্চলে গাছের বিশেষ স্টাডি ছাড়া, দেহাতী আর সাঁওতালদের বাড়িতে গরু, ছাগল, মোষ, তাদের উদূখল, খাটিয়া সব স্কেচ্ করা হয়েছে। পথের ধারে 'উচেনাথে'র পাহাড়ী মন্দির। 'উচেনাথ' হলেন বৌদ্ধদেবতা —বুদ্ধের নির্বাণ-মূর্তি। তবে বুদ্ধদেবকে ওখানেও মহাদেব বানিয়ে ফেলা হয়েছে। এই মূর্তিটি মস্ত বড়ো। দেখে. অজন্তার বুদ্ধের কথা মনে আসা অস্বাভাবিক নয়। তা ছাড়া, ঘষা ছোট বড়ো বৌদ্ধ দেব-দেবীর মূর্তি ওখানে আছে অনেক। গাংটায় ঐ সময়ে আমরা ছিলুম প্রায় সাত আট দিন সব মিলিয়ে হপ্তা দুই।

'শ্রীনন্দলাল খড়্গপুর বহুবার গিয়ে যে-সব স্কেচ্ করেছেন তার সংখ্যা অনেক। স্কেচ্‌বুক প্রথম পর্যায় সংখ্যা ৬, ৭, ১২ এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের স্কেচ্‌বুক সংখ্যা ৩, ৪, ১১, ১৭, ১৯, ২৪, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০ থেকে এই সব স্থানের স্কেচ্‌গুলি দেখা যাবে। এ-ছাড়া, তাঁর ডায়েরী সংখ্যা ৪০ থেকেও কিছু কিছু সংবাদ মিলবে। খড়্গপুরে তিনি যে-সব স্কেচ্ করেছেন তার প্রধান হলো এইগুলি : বুড়ো ও তার মেয়ে, মসজিদ, গাছের স্টাডি, মোষের পাল, মায়ের শ্মশান, মণিনদীর ধারে বন্ধু কবিরাজের বাড়ি, লেক, বড়ো মসজিদের হাফিজী, ক্ষিতীশ মিত্রের পোর্ট্রেট্, মায়ের ছবি, কালীর ছবির ড্রয়িং, সাজাহানের সময়ের মসজিদ, কয়েকটি স্কেচ্. কয়েকটি দৃশ্য, সাজাহানের সময়ের মসজিদ, মণিনদী, একটি ব্রীজ, পোস্ট-

অফিস, আমার ইস্কুল, নানা স্কেচ্, উদূখলে পা-ধোওয়া, সাঁওতাল-পরিবার, নানা স্কেচ্ মোষের লাঙ্গল, দৈ-ওয়ালা, নানা স্কেচ্, বাসনের ডিজাইন।

শ্রীনন্দলাল গাংটা গ্রামে থেকে যে-সব স্কেচ করেন তার মধ্যে প্রধান হলো : গরুর পাল, গোধূলির সময়ে, চামচিকি, মাটীর বাড়ি, দৈ-জমানো পাত্র, রিলিফ ওয়ার্কে লঠন, পাহাড় থেকে রাস্তায় মুসলমানদের ভাঙ্গা বাড়ি, গ্রামের বাড়ি, সুরেনের প্রোট্রেট্, গাংটার রাস্তায়, গাংটার রাস্তায় (মুকুলের স্কেচ থেকে করা), নট-নটী, বাথানের গরু আর পথে খুরুনা স্থান।

খড়্গপুর অঞ্চলে গিয়ে ১৯১৭ সালে শ্রীনন্দলাল যে যে ছবি আঁকেন তাঁর স্কেচবুক থেকে তার বিশদ বিবরণ দেওয়া যাচ্ছে। স্কেচবুক সংখ্যা ১ চিত্রসংখ্যা ১ —খড়্গপুরে মোষের পাল —এর চেয়ে বড়ো আকারের ছবি করেছেন। প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের ছেলে প্রসাদদাস ঠাকুর সে-ছবিটি কিনে নেন। চিত্রসংখ্যা ৩ —খড়্গপুর-গাংটার একটি ছবি —গরুর পাল গোধূলির সময়ে। ১৯১৭ সালে করা আর একখানি বড়ো ছবি প্রসাদ-দাসের ঘরে আছে। চিত্রসংখ্যা ৪ —খড়্গপুরের চার-পাঁচ মাইল দূরে গাংটায় চামচিকি। রাত্রে যে ডাকবাঙ্গলোয় শুয়েছিলেন সেখানে সেই চামচিকি ধরে রাত্রেই তার detailed anatomical স্কেচ্ করেন।

স্কেচ্‌বুক সংখ্যা ৬ চিত্রসংখ্যা ২—১৯১৭ : মুঙ্গের ফোর্টের স্কেচ, গাংটা গ্রামে মাটীর বাড়ির নক্সা। চিত্রসংখ্যা ৫ —গাংটাতে স্কেচ্-করা দৈ-জমানোর পাত্র (২৮) ; মুঙ্গের-ফোর্টের ভেতরে কতকগুলি মুসলমানদের কবরের নক্সা (৫৮-৬৫) ; গাংটায় গোয়ালাদের একটি বাড়িতে গোয়ালঘরের থামের গায়ে লণ্ঠনের অনুকরণে একটি রিলিফ ওয়ার্ক (৮০)।

স্কেচ্‌বুক সংখ্যা ৭ —মুকুলের করা স্কেচ্ : শ্রীনন্দলালের মায়ের শ্মশান —মণিনদীর ধারে (খড়্গপুর), মুঙ্গেরের গঙ্গা, গৈবীনাথ থেকে মসজিদ, গৈবীনাথ পাহাড় থেকে মসজিদ, গাংটা গ্রামের পাহাড় থেকে রাজমহলের (?) পাহাড় দেখা যাচ্ছে, গাংটা যাবার রাস্তা। হাভেলী-খড়্গপুরের অন্তর্গত ছিল বাহাত্তরটি পরগণা। এককালের বর্ধিষ্ণু বা ডিহিদার মুসলমানদের ভাঙ্গা বাড়ি

—নদীর ওপাড়ে। খড়্গপুরে বন্ধু উপানন্দ কবিরাজের বাড়ি। গাংটায় গ্রামের বাড়ি, ঐ গ্রামে সুরেনের মেজো ভাইকে খুন করেছিল। জমি কিনেছিলেন ওখানে অনেক। জমিদার আকজে মেরে ফেললে। এই স্কেচ্‌বুকে ১৯২১ সালে শান্তিনিকেতনে করা স্কেচও কয়েকটি আছে।

খড়্গপুরের লেক। মুঙ্গেরের কষ্টহারিণীর ঘাট ও ফোর্টের কিছু অংশ (সংখ্যা ৩৭)। এখান থেকে মীরকাশিম জলে ফেলে হত্যা করেছিলেন অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিকে।

স্কেচ্‌বুক সংখ্যা ১২ —দ্বারভাঙ্গা যাবার সময়ে —সিগারেটের ফটো এ্যালবাম —টিকিট দিলে পাওয়া যেত। সে ১৯১০-১২ সালের কথা।

দ্বিতীয় পর্যায়ের স্কেচ্‌বুক সংখ্যা ৩ : চিত্রসংখ্যা —১ খড়্গপুরের বড়ো মসজিদের হাফিজী —আর তাঁর নিজের হাতে কলমা লেখা আছে (১৯১৭) —জানলায় গিয়ে বসতেন —মণিনদী দেখা যাচ্ছে।

স্কেচ্‌বুক সংখ্যা ৪ —পৃষ্ঠা ৭ —সুরেনের ১৯১৭ সালের পোর্ট্রেট। পোর্ট্রেট ক্ষিতিশ মিত্রের —মামাশ্বশুর। তাঁর বাবা ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্‌ট্রেট। (পৃ. ৮) বেশির ভাগ গাংটা যাবার রাস্তায় খড়্গপুরের স্কেচ্‌ (১৯১৭)। স্কেচ্‌বুক সংখ্যা ১১ —চিত্রসংখ্যা ৮ : (অনুমানে) 'আমার মা খেত্রমণির ছবি' —ইঙ্কে স্কেচ্‌। স্কেচ্‌বুক সংখ্যা ১৭ —কালীর ছবির ড্রয়িং ছাড়া, আর সব গাংটা যাবার রাস্তায় ও গাংটা-খড়্গপুরের (১৯১৭) —১৩ পাতা। মুকুলের কয়েকটি স্কেচ্‌ থেকে স্কেচ্‌ করা।

স্কেচ্‌বুক সংখ্যা —১৯ : খড়্গপুর যাবার পথে —বরিয়ারপুর স্টেশন থেকে (১৯১৭)। —(১) দুটি সাঁওতাল ছেলে একটি মহুয়া-ডালে বসে দোল খাচ্ছে। (২) মুকুল রাস্তার মাঝে বসে স্কেচ করছেন।

স্কেচ্‌বুক সংখ্যা ২৪ : (১) খড়্গপুরের মণিনদীর ওপরে সাজাহানের সময়ে করা মসজিদের স্কেচ্‌ (১৯১৭)। খড়্গপুরের কয়েকটি স্কেচ্‌।

স্কেচ্‌বুক সংখ্যা ২৬ : খড়্গপুরের কয়েকটি দৃশ্য। (১) সাজাহানের সময়ে তৈরি মসজিদ, মণিনদী, একটি ব্রীজ, পোস্ট-অফিস ও 'আমার ইস্কুল' (যেখানে পড়তুম)। মসজিদে ঘুলঘুলি যেখানে বসে নদী দেখতেন,

হাফিজীর সঙ্গে কথা কইতেন —ঘটনার পর ঘটনা। (৩) বরিয়ারপুর স্টেশন থেকে মুঙ্গের যেতে পথে মণি-নদীর ওপর মুসলমান আমলের ব্রীজ। (৭) গাংটাতে নট-নটী —পাহাড়ী রাস্তায় গান করতে করতে যাচ্ছে —এর চেয়ে বড়ো ছবি শ্রীনন্দলাল তাঁদের এটর্ণীকে করে দিয়েছেন। (৮) —মোষ-সওয়ার। গাংটাতে একটা বাথান। —রাত্রে জঙ্গলের ধারে যেখানে এক জায়গায় অনেক গরু বাঁধা থাকে। বাঘ আসে মাঝে মাঝে। গরুকে পাহারা দেয় মোষ। বাঘের ভয়ে পাহারা দেয়। অপূর্ব দৃশ্য। এই সময়কার রাত্রের দৃশ্য দিয়ে আঁকেন। —এই ছবিখানা আরাই সান (১৯১৭) নিয়ে গেছেন।

স্কেচ্‌বুক সংখ্যা ২৭ঃ খড়্গপুরের নানা স্কেচ্ —উদূখলে পা-ধোওয়া (পৃ. ৮), সাঁওতাল-পরিবার —ঠাকুমা, ছেলে, নাতি, গরু, মুরগী।

স্কেচ্‌বুক সংখ্যা ২৮ঃ খড়্গপুর —নানা স্কেচ্।

ঐ ঐ ২৯ঃ খড়্গপুর (১৯১৭), (৬) একজন সাঁওতাল একজোড়া মোষ জুড়ে লাঙ্গল করছে (৭) দৈ-ওয়ালা।

স্কেচ্‌বুক সংখ্যা ৩০ঃ খড়্গপুরের নানা স্কেচ্!

এ-ছাড়া শ্রীনন্দলালের ডায়েরী সংখ্যা ৪০ঃ ১৯০৭ সালে প্রিয়নাথ সিংহের সঙ্গে উত্তরাপথ, খড়্গপুর, গাংটা-ভ্রমণের বিবরণ আছে। (১) কতকগুলি বাসন-পত্রের original source থেকে ডিজাইন খোঁজা, nature থেকে খোঁজা হয়েছে! গাংটার জঙ্গলের পথে বনদেবতার স্থান —গাংটা থেকে জমুই যাবার রাস্তায় পাহাড়ের ওপর 'খুরনা'-স্থান —সেখানটায় পুজো দিতে হয়। নইলে বাঘে খাবার ভয় আছে। বাতাসা, দুধ, যা হয় কিছু দিতে হয়, নইলে ভয় থেকেই যায়।

॥ ফরাসী প্রশস্তি, ১৯১৭ ॥

প্যারিস নগরীতে ১৯১৪ সালে নব্যভারত-চিত্রকলার কলকাতার কলাসমাজের চিত্রকরদের চিত্রপ্রদর্শনী দেখে পরে সারা য়ুরোপে একটা সাড়া পড়ে যায়। 'ভারতে শিল্পকলার পুনরুত্থান' —এই নাম দিয়ে একজন ফরাসী লেখক মঁসিয়ে হল্‌বেক ফ্রান্সের শিল্পকলা সম্পর্কে 'লা আর্‌. দেকোরাতিফ্‌' নামে একটি পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ১৩২৫ সালের অগ্রহায়ণ মাসের প্রবাসীতে প্রবন্ধটির অনুবাদ বের হয়। এই বিদেশী শিল্পরসিকটির রচনায় কিছু ভুল-ত্রুটি আছে। তৎসত্ত্বেও তাঁর মন্তব্যগুলি যেন ভারতের নব্যশিল্পকলা বিষয়ে সেকালের য়ুরোপের কলারসিকদের যথার্থ ধারণা প্রকাশ করেছে। তাঁর বক্তব্যের সংশোধিত সারমর্ম সংক্ষেপে এই :— আমরা মনে করতুম, আমরা সমগ্র ভারতবর্ষের সবটুকু পরিচয়ই পেয়ে গেছি। নানা লেখক নানাভাবে ভারতের কথা ও কাহিনী লিখে রেখে গেছেন —সে হলো তীর্থযাত্রী বলির রক্তে কলুষিত মন্দিরের পূজার্থী অথবা স্বর্গলাভের সহজপথ-প্রলুব্ধ গঙ্গা-সলিলে স্নানার্থীদের। ভারতের একদিকে ঐশ্বর্যময়, চমৎকার রূপ আর অপর দিকে বীভৎস, নগ্ন, প্রাণবান্ অথবা জড —এই পরিচয়, সব সময়ে য়ুরোপীয়দের চোখে ধাঁধাঁ লাগিয়ে তার স্বরূপ রাখে আবৃত করে।

কিন্তু এই চিত্র-প্রদর্শনীর মাধ্যমে ভারত আমাদের কাছে উপস্থিত হয়েছে বিদেশী পর্যটকের কল্পনায় বিকৃতরূপে নয়, ভারতশিল্পীদের রঙ্গিন রচনার রথে চড়ে তার আসল স্বরূপে। ভারতের বাজার-হাট, নাচওয়ালী, বাজিকরদের জবরজঙ্গ উজ্জ্বল ঐশ্বর্যে একদা জুল্ বোয়া বা আঁদ্রে শেভ্রিয়েঁা প্রভৃতি মুগ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু এই চিত্রপ্রদর্শনীর মাধ্যমে যে ভারত আমাদের সমীপে উপস্থিত সে সম্পূর্ণ আলাদা। বিদেশী পর্যটকগণ ব্যস্তভাবে ভারতবর্ষের যে ঐশ্বর্যের পরিচয় বয়ে আনে তাতে থাকে উগ্র আলোর ছটা, খাপছাডা অসামঞ্জস্যের আন্দোলন আর সস্তা ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর রসবিলাস। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর শিষ্যবর্গের সুসঙ্গত সুন্দর ভাবব্যঞ্জক রচনার মধ্যে সেরকম উগ্রতা বা অসঙ্গতি নাই।

[এই শিল্পিগোষ্ঠীতে রয়েছেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তাঁর দাদা গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরীপ্রসাদ, নন্দলাল বসু, সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, শৈলেন্দ্রনাথ দে, অসিতকুমার হালদার, অতুলকৃষ্ণ মিত্র, ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার, সামি-উজ্জমা, দুর্গেশচন্দ্র সিংহ, বেঙ্কটাপ্পা, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, সুরেন্দ্রনাথ কর, মুকুলচন্দ্র দে, রামেশ্বর প্রসাদ, সারদাচরণ উকিল, অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়] —এঁরা সমস্ত জীবন ধ্যান-ধারণায় নিয়োজিত করে আমাদের সামনে স্পষ্ট রূপে এনে ধরেছেন ভারতবর্ষের প্রাচীন প্রথা ও প্রবাদের মর্মকোষের চারদিকে পদ্মের মতো প্রস্ফুটিত সুসঙ্গত একটি সভ্যতার দৃশ্য।

যে জাতিকে আমরা মনে করতুম বন্ধ্যা ও অভিশপ্ত তাদের এই পুনরুত্থানের নাম দেওয়া হয়েছে —পুনর্জন্ম। —এ সত্য আর যথার্থ নামই হয়েছে। কারণ, যুগ-যুগান্তের নিষ্ক্রিয় জড়তা ও মরণাপন্ন অবস্থার পরে নতুন সৃষ্টির বিকাশ সম্ভব হলে —তারই নাম পুনর্জন্ম। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দে য়ুরোপে যে নবজীবনের সূচনা হয়েছিল সেই অর্থে ভারতের এই নবজাগরণ সমার্থক নয়। আজকের ভারত যে-জাতিকে জগতের সামনে তুলে ধরেছে সে জাতি তার আদর্শকে নিঃশেষ করে ফেলেনি, বা তাকে অস্বীকারও করেনি। ভারতীয় এই জাতি তার অন্তরের জীবন্ত শক্তি থেকে এখনও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এবং বিষয়পরম্পরার এমন সব নব নব তত্ত্ব ও ধারণা প্রকাশ করছে, তা বিশ্বের দরবারে আগে কখনও উন্মোচিত হয়নি —এবং সে সম্পূর্ণ নতুন। কলকাতার এই শিল্পিগোষ্ঠী কোনো নতুন কিছু হঠাৎ সৃষ্টি করেননি অথবা পুরাতনকে ভেঙেও ধ্বংস করেননি। ভারতের চিন্তাধারাকে সম্পূর্ণ নতুনের দিকে বইয়ে দেবার প্রয়াসও এঁদের নাই। বহুযুগের তপঃসঞ্চিত ইতিহাস এঁদের গতি নিয়ন্ত্রণ করে এবং এঁদের অতীত বর্তমানে কোথাও ভেদ বা ছেদ ঘটেনি। যে শিকল গিঁটের পর গিঁট কষে কালে কালে দীর্ঘতর হয়ে আসতে আসতে মাঝখানে ছিঁড়ে গিয়েছিল, এঁরা তাকেই আবার জোড়া দিয়েছেন মাত্র।

ভারতবর্ষ তার রাষ্ট্রীয় দুঃখ-দুর্দশা সত্ত্বেও, পরাধীনতার পেষণের মধ্যেও, নিজের চিন্তাধারার ঐক্য আর ধর্মবিশ্বাসের সমতা আশ্চর্য রকমে বজায় রেখে শতাব্দমালার মধ্যে দিয়ে নিজেকে গড়ে চলেছে। প্রাচীন

যুগে যে-সব মহাশক্তিধর গ্রন্থি তার বিচিত্র ও বিবিধ জনসমাজকে একত্র বন্ধন করে রেখেছিল সেই বুদ্ধদেবের দার্শনিক মতবাদও ব্রাহ্মণ্যধর্মকে এখনও কোনো কিছুতে ক্ষীণ বা খণ্ডিত করতে পারেনি।

দীর্ঘ শতাব্দ পরেও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর তাঁর শিষ্যবর্গ সেই ভাবুকতা আর আদর্শপরায়ণতাকেই অনুসরণ করছেন। এবং সেই ভাবুকতা ও আদর্শ হিন্দুধর্মের মর্মস্থলে প্রাণসঞ্চার করে আসছে। সেই ধর্মসূত্রটি হলো এই, —মহামায়া মানুষকে বিভ্রান্ত করবার জন্যে আপনাকে রূপে রূপে জগতে খণ্ড বিচ্ছিন্ন করে রাখলেও সেই রূপ-জগতের প্রেক্ষাপটে বহু রূপের মধ্যে এক অরূপ অপরূপের স্থির অটল সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, আর তিনিই আত্মার জন্ম-জন্মান্তরের আশ্রয় ও আরাম! ফলে দেখা যাচ্ছে, শিল্পের উদ্দেশ্য--বস্তুর সত্তা প্রকাশ নয়। পক্ষান্তরে, বস্তু-রূপের অন্তরালে সে-সত্য গূঢ় ও গুপ্ত হয়ে রয়েছে তারই প্রচার। যে-নিরাকারকে প্রকাশ করবার চেষ্টায় বস্তু অসম্পূর্ণরূপে বিরাজিত, সেই বস্তু-ব্যতিরিক্ত অরূপ অপরূপকে বস্তুর অসম্পূর্ণ রূপের কারাগার থেকে মুক্তিদান।

এই কারণেই প্রত্যহের জীবনযাত্রার দৃশ্য, লোকের যথাযথ আকৃতি, বাজারে লোকের ভিড়, তীর্থস্থানে যাত্রীর জনতা —যে-সব বিষয়ে য়ুরোপীয় চিত্রকরেরা এঁকে আমাদের দেখতে অভ্যস্ত করে তুলেছে, সে সব ঠাকুরমহাশয় আর তাঁর শিষ্যদের রচনার বিষয় নয়।

[এর ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত কিছু আছে। অবনীবাবু, গগনবাবু আর নন্দলাল হিন্দুর জীবনযাত্রার কয়েকখানি চিত্র এঁকেছেন। কিন্তু তারও অনেকগুলির সঙ্গে ধর্মানুষ্ঠানের সম্পর্ক আছে —যেমন 'কাজরী নৃত্য', 'আরতির দীক্ষা'। এবং কতকগুলি রূপক, যেমন 'ছিন্নতন্ত্রী বীণা' —'যাত্রার অবসান', 'পদ্মপত্রে অশ্রুবিন্দু', 'জীবন ও মৃত্যু'। নন্দলালের 'জগাই মাধাই' বা 'যুগল মাতাল' ও গগনেন্দ্রনাথের 'বৃষ্টির দিনে কেরাণীদের আপিস যাত্রা' ছবিতে কিছু বস্তুতন্ত্রতার আমেজ আছে। কিন্তু, এই শেষ ছবিখানি জাপানী রীতিতে আঁকা বলে, এ-ছবি মৌলিক নয়, —নিপুণ কারিকরি।

এঁরা বিশ্বপ্রকৃতির নকল করেন। কিন্তু তাতে প্রাধান্য পায় বিশ্বপ্রকৃতির যথাযথ আলেখ্য অপেক্ষা শিল্পীর ভাবুকতা আর রসবোধ। অর্থাৎ তাঁরা মানস দৃষ্টি দিয়ে বিশ্বপ্রকৃতিকে সৃষ্টি করেন নতুনভাবে। তাঁরা কিন্তু প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার ঘটনায় কোনো মহৎ বা শাশ্বত সত্য খুঁজে পান না, যা শিল্পে অমরত্ব লাভ করবার যোগ্য। দেব-দেবীর মাহাত্ম্য-কথা, পূজা-পার্বণের গোপন রহস্য এবং রূপক-প্রতীক —এই সব হলো শিল্পীর শিল্পসাধনা উদ্দীপ্ত করার একমাত্র উপকরণ। কিন্তু তাঁদের কাছে এ সব বিষয়ও পূর্ণ মূল্য পায় না —এ থেকে পারিপার্শ্বিক আড়ম্বর আর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আতিশয্য বিবর্জিত না হওয়া পর্যন্ত। তাঁদের সেই সূক্ষ্ম ছায়াবৃত সুসঙ্গতি প্রয়োজন হয় যাতে তাঁদের চিত্তকে ধ্যানের অনুকূল করে তোলে, যা আন্তর্জীবনের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে তার অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে।

প্রসঙ্গতঃ অবনীন্দ্রনাথের ক্রমপরিণতি লক্ষণীয়। ইংরেজ শিক্ষকের হাতে প্রথম তালিম পেয়ে তিনি ফিকে হালকা রঙে ছবি আঁকার আনন্দের কাছে ধরা দিলেন।

[লেখকের মতে, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথমে ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের দ্বারা ১৮৫০ সালে প্রতিষ্ঠিত আর্টস্কুলে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন। কিন্তু আমরা জানি, অবনীবাবু কোনোকালেই আর্টস্কুলের ছাত্র ছিলেন না (আগে দেখুন)। আর্টস্কুলের শিক্ষকেরা হিন্দু শিল্প বলে কিছু নাই, এই স্থির সিদ্ধান্ত করে, কুশ্রী ছাঁচ আর ইংরেজী আরেখন পরিকল্পনা থেকে ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন। ১৯০৬ সালে (2) 'Indian Sculpture and Painting' গ্রন্থের রচয়িতা হ্যাভেল সাহেব কতকগুলি পুরানো ছোট ছোট (২) ছবি কিনে, সেই সব পূর্বেকার কুশ্রী মডেলগুলি দূর করে দিলেন। এবং অবনীন্দ্রনাথকে আত্মমোচনের চেষ্টায় উৎসাহ দিলেন।]

য়ুরোপীয় প্রভাব থেকে সরে এসে প্রাচীন হিন্দু-শিল্পের রীতি আয়ত্ত করতে করতে তিনি রং এতো ফিকে আর আবছায়া করে তুললেন যে তাঁর শেষ ছবির রং ফিকে পাঁশুটে থেকে বেগুনী পাঁশুটের তারতম্যেই শেষ হলো। তিনি অস্তগামী সূর্যের রক্তিম রাগ মাত্র একটি রেখায় মেঘের কোলে কাপড়ের পাড়ের মতন এঁকে ছেড়ে দিলেন।

সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ না-করে একনজরে বলতে গেলে কলকাতার শিল্পিগোষ্ঠীর সাধারণ ও সমান বৈশিষ্ট্য হলো তাঁদের রং প্রস্তুত-পদ্ধতির সমতা ; রৌদ্রঝলমল যে-ভারত বাহ্য-দৃষ্টিতে ফুটে ওঠে তাকে এঁকে দেখাবার চেষ্টা এদের মধ্যে কেউ করেননি। তাঁরা সেই ভারতবর্ষের ছবি আমাদের দেখাচ্ছেন যা ছায়াশীতল, চিন্তা-গম্ভীর, ধ্যানস্তব্ধ —যে ভাব তার চরম উন্নত দার্শনিক তত্ত্বে প্রকাশিত হয়ে আসছে। প্রকৃতপক্ষে তাঁদের বাহ্যপ্রকৃতির ছবি তাঁদের আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণারই প্রতিফলন।

এই ফিকে চাপা রঙের প্রতি পক্ষপাতিত্বের কারণ হলো, শিল্পীর ইচ্ছা ছাড়া আরও কিছু। অবনীন্দ্রনাথ আর তাঁর শিষ্যবর্গ স্টুডিওতে পাণ্ডুবর্ণের ছবি বেশি দেখেছেন। এবং যে-সব ওস্তাদ শিল্পী র‍্যাফেল-পূর্ব যুগের শিল্পপদ্ধতি থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন তাঁদের প্রভাব এঁদের ওপর সম্পূর্ণরূপে পড়েছে। যাই হোক, লেখক হলবেকের মতে, এই শিল্পিগোষ্ঠী এখন আত্মবশ হয়ে উঠতে পেরেছেন। অবনীন্দ্রনাথ যখন বিলিতী চিত্র-পদ্ধতির টুল, ইজেল, প্যালেট্ আর ভারী তেল-রং ছেড়ে জল-রং দিয়ে ফুলন্ত চাঁপাগাছের গোড়ায় আসনপিঁড়ি হয়ে বসে ছবি আঁকা শুরু করলেন, তখনই তিনি নিজেকে তাঁর জাতীয় ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করে দিলেন।

[মাদ্‌মোয়াজেল অাঁদ্রে কার্পেলেস্ এমনিভাবে অাঁকা অবনীন্দ্রনাথের একটি সুন্দর প্রতিকৃতি-চিত্র প্রাচ্য চিত্রকরদের চিত্রশালিকায় প্রদর্শন করেছিলেন।]

—হিন্দু-পারসীক ও মোগলশিল্প তিন শতাব্দ ধরে ওস্তাদদের হাতে সৃষ্ট দুর্লভ রচনা প্রকাশ করেছে। সেই সব ওস্তাদের সঙ্গে তিনি এক মেলভুক্ত হলেন। অজন্তা ও সিংহলের সিগিরিয়া বা শ্রীগিরি গুহাগাত্রের চিত্রাবলী আবিষ্কারের পরে তিনি সুপ্রাচীন ভারতশিল্পের সঙ্গেও যুক্ত হলেন।

[অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যদলে কয়েকজন মুসলমান-ছাত্রও আছেন। সামিউজ-জমা —ইনি দিব্যশ্রীমণ্ডিত করে নূরজাহানের জীবন-চিত্র এঁকেছেন। ঈশ্বরীপ্রসাদ —ইনি পারসীক ক্ষুদ্রচিত্রের (miniature) ধরনে সেখ সাদীর কবিতা থেকে লায়লা ও মজনুর বিষয়-চিত্র এঁকেছেন।]

—অবনীন্দ্রনাথ আর তাঁর শিষ্যদের রচনার মধ্যে এই ত্রিবেণী-সঙ্গমের দৃশ্য দেখা যায়। এর মধ্যে কোনো ধারা কখনও প্রবল বেগে বইতে থাকে, এই যা পার্থক্য। অবনীন্দ্রনাথ হিন্দু-পারসীক-পদ্ধতিতে রমণীর মোহিনী-মূর্তি এঁকেছেন। তাঁর 'কবরীবন্ধন' ছবিতে তরুণী সুন্দরী দুই আঙ্গুলের মধ্যে চুল নিয়ে আঁচড়াতে আঁচড়াতে চিন্তার স্বপনে ডুবে স্থির হয়ে আছে। অলিন্দের প্রান্তে বসে তরুণী রূপসী পদ্মপাতায় লেখা 'প্রণয়লিপি'র রসে মগ্ন হয়ে আছে। ঐতিহাসিক চিত্র —সম্রাট আওরঙ্গজেবের সদ্য-নিহত ভ্রাতা দারার মস্তক দেখছেন —এসব একই ধরনে আঁকা। লাল পাগড়ী-পরা, কাটা-মাথা থালার ওপর রাখা —এই দৃশ্য ইটালীর রেনেসাঁ যুগের সেণ্ট জন্ দি ব্যাপটিস্ট-এর কাটা মাথার ছবি মনে করিয়ে দেয়। 'সাজাহান বাদশার তাজমহলের স্বপ্ন' —দেখেছিলেন বাদশা, একদিন সন্ধ্যা আকাশে সাদা মেঘের গম্বুজ দেখে। মনে মনে পরিকল্পনা করে নিয়েছিলেন, —এমনি কবরে তাঁর প্রণয়িনীকে গোর দিতে হবে। —[এই স্মৃতিসৌধ সতেরো শতাব্দে আগ্রার তাজমহল। এই তাজমহল লেখকের মতে, ইসলাম-মোগল-শিল্পের একটি নিখুঁত নমুনা।]

ওমরখৈয়মের কবিতার চিত্রাবলী —সুফী তাঁর নৌকোর গলুইয়ে বসে জলের প্রবাহ দেখতে দেখতে কবিতা রচনা করেছিলেন —

গোলা নাহি বলে কোনো ওজরের কথা,
খেলুড়ের ঠেলা খেয়ে চলে হেথা হোথা।
তেমনি মোদের যিনি ফেলেছেন মাঠে,
সেই জন হালচাল বাঁধে আটেঘাটে ॥

হিন্দুভাবের ছবি —দেবদেবীর পুরাণ কথার চিত্র, সংখ্যায় খুব বেশি। ঠাকুরমহাশয় কৃষ্ণলীলার ছবিতে আকার আর বর্ণের সুষমা যোগ করেছেন যথেষ্ট। তাঁর কৃষ্ণ গীতার কৃষ্ণ নন অর্থাৎ তিনি সর্ব বিষয়ের আদি ও অবসান নন। এঁর কৃষ্ণ হচ্ছেন গীতগোবিন্দের মোহনবেণুধর ব্রজের রাখাল, তাঁর বেণুরবে বিশ্বপ্রকৃতি মুগ্ধ, তাঁর রাসনৃত্যে গোপীরা সঙ্গিনী, তাঁর সঙ্গসুখে গোপীরা মাতাল, তাঁর নৃত্যরত নূপুর ব্রজের গোঠে মাঠে ধ্বনিত হয়। কৃষ্ণলীলার মধ্যে যে ভক্তিতত্ত্ব জড়িয়ে

আছে —কৃষ্ণ-গোপীর প্রেম জীবাত্মার আর পরমাত্মার মিলনের রূপক, অবনীন্দ্রনাথের চিত্রে সে-ভাবের কোনো দ্যোতনা নাই। তবে তিনি কালো ও ঘন রঙ্গে যে-ছবি এঁকেছেন —বনে রাধার কৃষ্ণ-অন্বেষণ —সেই ছবিতে ঐ গভীর ভাব-রস বা তত্ত্বকথা ঈষৎ প্রকাশ পেতে পারে।' এতে রয়েছে বাঙ্গালা কবিতার সেই ভাবপ্রেরণা :

'বেলি অসকালে দেখিনু যে ভালে
পথেতে যাইতে সে।
জুড়ালো কেবল নয়ন যুগল
চিনিতে নারিনু কে॥'

—(চণ্ডীদাস)

'চিত্রপট' নামে ছবিতে অবনীন্দ্রনাথ অতি সুস্পস্ট, চমৎকার ও মনোরমভাবে ভাগবত সত্তার তারুণ্যের জন্যে তরুণী-হিয়ার শাশ্বত চিরন্তন আকৃতি প্রকাশ করেছেন। এ যেন চণ্ডীদাসের বাণীর চিত্ররূপ :

'হাম সে অবলা হৃদয় অখলা
ভাল মন্দ নাহি জানি।
বিরলে বসিয়া পটেতে লিখিয়া
বিশাখা দেখালে আনি॥'

লেখকের মতে, শিব অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তাঁর ছাত্রদের চেয়েও বেশি ভাব জুগিয়েছেন। ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার শিবের তাণ্ডব বেশ রুচিসঙ্গত করে এঁকেছেন ; কিন্তু তিনি রুদ্রদেবতাকে নৃত্যের প্রমত্ত আবেগ ও আগ্রহের অগ্নিজ্বালা দিতে পারেননি। কিন্তু প্রাচীন ভাস্করেরা এই ভাব আশ্চর্য রকমে ফুটিয়ে গেছেন। অবনীন্দ্রনাথ শিব-পার্বতীকে সন্ধ্যায় কুঞ্জবনে আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় বসিয়ে দেবদম্পতির একত্ব বা অদ্বৈত সংকেত করেছেন। [এ জানা কথা যে, যে-দেবতা অর্ধনারীশ্বর, যিনি হরগৌরীমূর্তি, তাঁর এক কায়াতেই নর ও নারীর স্বভাব বিদ্যমান, তিনি একাধারে নারীশ্বর-মূর্তিতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আপনার যুক্ত সম্পূর্ণ প্রভাবও যেমন বিস্তার করতে পারেন, তেমনি আবার নিজের শক্তিকে স্বতন্ত্ররূপে নিজের বাইরে জগদ্‌ব্যাপারে প্রতিভাত করে তুলতেও পারেন।]

এই সব ছবি যতই সুন্দর ও মনোহর হোক্ না কেন. অজন্তার ভিত্তিচিত্রে এই দেবদম্পতির যে পরিকল্পনা আছে (?) তার কাছে এদের হার। অজন্তার সেই ছবি শ্রীনন্দলাল বসু অজন্তার গুহা থেকে নকল করে এনেছেন। শিবের মাথায় বহুমূল্য মুকুট, বাহুতে সন্ন্যাসীর তাগা, হাতে চক্র, অর্ধাঙ্গিনীকে আলিঙ্গনরত, মাথায় চন্দ্রকলার মুকুট আর পদ্মফুল। প্রিয়-স্পর্শের সুখাবেশে তন্ময় পার্বতী লতার চেয়েও নমনীয় কমনীয়. তাঁর তনুলতা প্রিয়তমের দেহের ওপর যেন লতিয়ে দিয়েছেন। কপোলে কপোল, মুখশ্রী ভাবগম্ভীর ও ধ্যানমগ্ন। উভয়েরই দেহসুষমা যেন পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। মানব-দম্পতির দৈহিক ও আধ্যাত্মিক মিলনের যুগল-রহস্যের মহিমার ছবি এ-পর্যন্ত জগতে যা সৃষ্টি হয়েছে তাদের সকলের চেয়ে এই ছবিখানি দর্শক-চিত্তকে সর্বাধিক আলোড়িত, বিক্ষুব্ধ ও ভাবান্বিত করে তোলে।

বৌদ্ধ-কাহিনী কলকাতার শিল্পিগোষ্ঠীর তেমন ভাবোদ্রেক করতে পারেনি ঐ সময় পর্যন্ত। অর্ধেন্দ্র গাঙ্গুলীর 'বুদ্ধের প্রচার' ছবিখানি নিতান্ত আধুনিক ধরনের আর বুদ্ধের মুখে রোমান আদল। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর নির্বাণের রূপক বোঝাবার জন্যে লালাভ সমুদ্র থেকে একটি মাথা উদ্গত করে যে পরিকল্পনা করেছেন. লেখকের মতে, তা নিতান্ত ছেলেমানুষী। গগনেন্দ্রনাথের আঁকা চৈতন্য জীবনের ছবিগুলি উৎকৃষ্টতর। চিত্রকর শ্রীচৈতন্যের প্রশান্ত মহিমময় মূর্তি পরিকল্পনা করেছেন। কিন্তু তাঁর আরেখনে আড়ষ্টতা ও জড়তা থাকা সত্ত্বেও ছবিগুলিতে অজানা রাজ্যের দুয়ারে দাঁড়াবার বেদনা ও আবেগ ফোটাতে পেরেছেন।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান শিষ্য হলেন শ্রীনন্দলাল বসু। হিন্দুর মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারতের প্রধান ঘটনাবলী নিয়ে তিনি বহু ছবি এঁকেছেন। কুরুপাণ্ডব-বিরোধের ছবি কিছু আগে আঁকা। এই ছবিগুলি সিস্টার নিবেদিতার ও আনন্দ কুমারস্বামীর Myths of the Hindus and Buddhists বইয়ের জন্যে আঁকা। অবনীন্দ্রনাথের ও বেঙ্কটাপ্পার ছবিও এই বইয়ে আছে। নন্দলালের এই ছবিগুলি পুরাতন বলে, তাতে ইংরেজী-প্রভাবে সামান্যতা ও খেলো রীতি দেখতে পাওয়া যায়। 'জতুগৃহদাহ' ছবিটি চিত্র-সংস্থানের সুস্পষ্ট বোধ জ্ঞাপন করে। 'যুধিষ্ঠিরের

মহাপ্রস্থান'-ছবিতে কতকটা মহিমা ও গুরুত্ব আছে। রামের জীবন-চিত্র বিবিধ চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতিতে রচিত হয়েছে। য়ুরোপের আর্টের প্রভাব বিমুক্ত হয়ে শ্রীবসু প্রাচীন হিন্দু প্রথাকেই অবলম্বন করেছেন। এই রীতিতে রয়েছে অজন্তার রীতি, বাজারু ছবির পটোদের রীতি, অশিক্ষিতপটু মেয়েরা যে-রীতিতে তাঁদের ঘরের মেঝেতে, দেওয়ালে আলপনায় দেব-দেবীর চিত্র আঁকে —সেই রীতি। এর মধ্যে পারসীক রীতির ন্যাকামি ও আড়ম্বর নাই। কিন্তু আছে জোর, গতি, ঘোরালো রং আর বাস্তবিকতা। নীল প্রেক্ষাপটের ওপর লাল সজ্জার চিত্র বিরুদ্ধতায় সুস্পষ্ট। রাম-জননী কৌশল্যা শিশু রামকে কোলে নিয়ে হিন্দু-নারীর সমস্ত পরিপূর্ণতায় প্রকাশমানা। এই নারী-চিত্রই মহাভারত প্রকাশ করেছেন শকুন্তলা-রূপে —

অভ্যুন্নতা পুরস্তাদ্ অবগাঢ়া জঘনগৌরবাৎ পশ্চাৎ।
দ্বারেঽস্য পাণ্ডুসিকতে পদপঙ্‌ক্তির্‌ দৃশ্যতেঽভিনবা॥

'সমুদ্রতীরে শয়ান রামচন্দ্র' একখানি মহিমান্বিত শ্রেষ্ঠতম ছবি এবং এর মাধ্যমে চিত্র ও কবিতার ঘনিষ্ঠতা ঘটেছে —এ যেন কবিতা ও চিত্রের সেতুবন্ধ, এ থেকে কবিতা ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ হবার সাহায্য পেয়েছে।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ধর্মবিষয় ও রূপক ছেড়ে একবার ব্যঙ্গচিত্র আঁকবারও চেষ্টা করেছেন —সে লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে। তাঁর বিদ্রূপাত্মক চিত্র হলো —'প্রণয়গ্রস্ত রাজকুমার', 'মহাদেবী', 'বন্দীবীর'। এঁরা সব থিয়েটারের পাত্র-পাত্রী, —এঁরা কাগজের ফুল আর রঙ-চঙে রাংতার অলঙ্করণে সং সেজে ইংরেজী কন্‌সার্টের হট্টগোলে বেতাল আগ্রহে উচ্ছ্বসিত প্রশংসমান দর্শকের সামনে পুরাণের দেব-দেবী আর প্রাচীন বীরদের প্রতিনিধি ও প্রতিরূপ হয়ে হাজির হন!

কলকাতার চিত্রকরদের চিত্রকর্ম —সৌন্দর্য, বিশেষত্ব আর ভাবের আধার। এই সব রচনা য়ুরোপের সামনে এই প্রথম উপস্থিত হয়ে প্রমাণ করে দেখাচ্ছে যে, একটি বিশেষ অনুপ্রেরণার চারদিকে সঙ্গত চেষ্টার সমষ্টি কি অসাধ্যসাধন করে তুলতে পারে। এই সব শক্তিমান অকপট শিল্পী তাঁদের নিজস্ব রুচি আর ঝোঁক দমন করে ভারতবর্ষের বিশেষ আদর্শ ও শিল্পরীতিকে উজ্জীবিত করে তুলেছেন। এর জন্যে

তাঁরা রঙের প্রাচুর্য আর উজ্জ্বলতা এবং আকারের স্বাধীন লীলায়িত গতি যদি নষ্ট করে থাকেন, তবু তাঁরা তাঁদের রচনাবলী দিয়ে জীবন্ত হবার ইচ্ছাকে আর উদ্দেশ্যের স্থিরতাকে জোর করে প্রকাশ করেছেন।

উচ্চাঙ্গের সৃষ্টি করতে হলে এই ক্ষুদ্র মণ্ডলীটিকে বিদেশী-প্রভাব থেকে মুক্ত হতে হবে ; এবং কেবলমাত্র হিন্দুর পুরাণের ঘটনাবলী চিত্রিত করা ছাড়া তাদের চিন্তাধারাকে অন্য খাতেও প্রবাহিত করে দিতে হবে। প্রাচীন ভাস্করদের যে-রকম জোর, গতি ও আবেগ ছিল, সেই গতি ও আবেগ এঁদের আঁকা চিত্রাবলীর প্রশান্তি ও সুষমার মধ্যে চাপা পড়ে গেছে। এঁরা আমাদের মতো বিদেশীদের কাছে ভারতের প্রধান বিশেষত্বের রূপক-চিহ্ন উপস্থিত করতে পারেননি। আশ্চর্য স্বপ্ন ও কল্পনার দেশ হলো ভারতবর্ষ এবং প্রাচীনকালে প্রকৃতির সকল প্রকার শক্তিকে অসংখ্য দেব-দেবীরূপে সে প্রকাশ করে ধরেছিল। তারা সহস্রবাহু হয়ে সৃষ্টি করত। আর সহস্রশীর্ষ হয়ে সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে সব-কিছু সম্ভোগ করত। বিপরীত ভাব তাদের মধ্যে মিশে গিয়েছিল —জীবন ও মৃত্যু, সম্ভোগ ও বিরতি, ইন্দ্রিয়বোধ ও ধ্যান-ধারণা। গোলমাল আর পাগলামির চরম সীমায় পৌঁছিয়েও তারা ঝোঁকে শান্তির দিকে, সহজ বুদ্ধির আবগের ভেতর থেকে তারা উৎপন্ন করে থাকে সুচিন্তিত শৃঙ্খলা। যাই হোক, আমরা একদিন দেখতে পাবো, এই বিভিন্ন আর প্রভূত চিন্তা কলকাতার শিল্পিগোষ্ঠীর রচনায় উদ্গত হয়ে উঠছে। অবশ্য ভারতবর্ষ যদি তার সহজবুদ্ধির অবস্থা ও অভিজ্ঞতার জগতে বিচরণ ত্যাগ ক'রে, হঠাৎ রাজা যযাতির মতো পুনর্যৌবন লাভ করে অজ্ঞাতপূর্ব অভিনব শিল্পের সৃষ্টি করে বসে —তবে সে স্বতন্ত্র কথা।

লেখক হল্‌বেক্ সাহেবের মতে, তাঁদের মতো বিদেশীদের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে ভারতের এই নব্যশিল্পজাগরণকে দরদ দিয়ে দেখা। 'দরদ' শব্দটির মধ্যে এর অর্থের যতখানি জোর আছে তার সবটুকু দিয়ে লেখক বোঝাতে চেয়েছেন, 'দরদ' মানে হচ্ছে, পরিচয়ের জ্ঞানের মমতা। তাঁদের মতো বিদেশীরা প্রস্তুত হয়ে এই ধরনের চিত্রকর্মের সম্মুখীন হবেন ; এবং ভারতের নিজস্ব সভ্যতার ক্ষেত্রে তাঁদের প্রতিষ্ঠিত করে দেবেন —তাদের নকল বা অনুকরণ করবেন না। এই রকমের একটা ভুল তাঁর

মতে, কিছু পূর্বে হয়েছিল —তিন বছর ধরে, একজন সজ্জাকার তাঁদের ওপর পারসীক রীতি আরোপ করে একটা বাহ্যিক চটকদার ব্যাপার করে তুলেছিল। কিন্তু সে ধরতে পারেনি যে সেই কাজ তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এবং তার আন্তর জীবন নষ্ট করে দিয়েছিল।

হিন্দু-আর্ট্ হল্‌বেক্ সাহেবের মতো বিদেশীদের কাছে মানস-ক্রীড়ার বিষয় ছাড়া অন্য কিছু হওয়া চাই। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তাঁর শিষ্যেরা হল্‌বেকের মতন বিদেশীদের বিদ্যা-বুদ্ধি দিয়ে, ওঁদের সাম্প্রতিক চিত্রকর্ম বোঝবার সকল রকম চেষ্টার উপযুক্ত পাত্র। এবং তাঁদের মতো বিদেশীরা এঁদের মধ্যে দিয়েই ভারতবর্ষের মহামূল্যবান সভ্যতার পরিচয়ের নাগাল পেতে থাকবেন।

প্যারিস-প্রদর্শনীর পরে দেশে-বিদেশে নব্যভারত-চিত্রকলার আরও যে-সব প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল সংক্ষেপে তার কয়েকটির বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে। এই সব প্রদর্শনীর ফলে, এঁদের যশঃসৌরভ দিকে-দিগন্তরে পরিব্যাপ্ত হয়ে গেল।

১৯১৪ সালের প্যারী-প্রদর্শনীর পরে, লণ্ডনে, বার্লিনে নব্যভারত-চিত্রকলার প্রদর্শনী হয়েছিল। পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে প্রাচ্য-শিল্পকলার সাদর সংবর্ধনার আগে, ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন যে-সব ভারতপ্রেমী মনীষী তাঁদের নাম প্রথমে উল্লেখ করা আবশ্যক। তার মধ্যে বিশেষভাবে দু-জনের কথা বলছি। হ্যাভেল সাহেব কিভাবে ভারতশিল্পে পুনর্জীবন সঞ্চার করেছিলেন, কোনো পাঠক তার বিশদ বিবরণ জানতে ইচ্ছুক হলে, ১৯০৮ সালের জুলাই সংখ্যার 'Studio' (15th July, 1908) —পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রবন্ধটি পাঠ করবেন। তা থেকে কয়েক ছত্র অনুবাদ করে দেওয়া হচ্ছে। এ থেকে বোঝা যাবে ইংরাজ-চরিত্রের কোন্ বাধা প্রথমতঃ তাঁকে ভারতশিল্পের মর্ম-গ্রহণ থেকে, প্যারিস-প্রদর্শনীর আগে পর্যন্ত বঞ্চিত রেখেছিল ঃ—'আমরা ইংরাজ জাতি —আমাদের শিক্ষা-সভ্যতা-মুগ্ধ ভারতীয় প্রজাগণকে মোহমন্ত্রে ভুলিয়ে বিশ্বাস করিয়েছি যে, আর্ট বলে তাদের কোনোকালে কিছু ছিল না। অথচ একটা বিরাট মহাগৌরবময় প্রাচীন কলাশিল্পের অস্তিত্বের অভ্রান্ত প্রমাণ ভারতে চারদিকেই ছড়িয়েছিল ;

এত বেশি প্রমাণ স্বয়ং ইংরেজী আর্টেরও অনুকূলে পাওয়া যায় না। চব্বিশ বৎসর গত হলো আমি ভারতে গিয়ে, মাদ্রাজ থেকে ১৮৯৬ সালে কলকাতার আর্ট-বিদ্যালয়ের শিক্ষকরূপে যোগ দিয়েছিলুম। ভারতে এসে একাধারে শিক্ষক ও ছাত্র হয়ে প্রাণপণে কর্তব্যসাধন করতে ত্রুটি করিনি। আমার যা শেখাবার ছিল শেখালুম, উপরন্তু প্রাচীন ভারতশিল্প থেকে নিজেও যথেষ্ট শিক্ষালাভ করলুম। কর্তব্য-শেষে যখন বাড়ি ফিরি তখন এই কথাটা ভেবে বিস্মিত হলুম যে, ইংরাজ জাতির এমনি সৃষ্টিছাড়া অনুদার চিন্তা-স্বাতন্ত্র্য যে, অন্য জাতির কোথাও কিছু ভালো আছে বা থাকতে পারে তা তারা সহজে বিশ্বাস করতে চায় না। ভারতের যে নিজস্ব একটা গৌরবময় কলাশিল্প ছিল, ভারতবর্ষ যে কলাশাস্ত্রেও পশ্চিমকে যথেষ্ট নতুন তত্ত্ব শেখাতে পারে, এ-কথাটা ধারণা করতে ইংরেজের শতাধিক বৎসর লাগলো।'

প্রসঙ্গতঃ আরও যে-সব সহৃদয় পাশ্চাত্য গুণী-জ্ঞানী কলাক্ষেত্রের বাইরে থেকে ভারতের ভবিষ্যৎ ভাগ্যোদয়ে বিশ্বাস করে ভারতের নব-জাগরণের অরুণিমা দর্শন প্রত্যাশায় প্রাচ্য-আকাশের দিকে তাকিয়েছিলেন তাঁরা সানন্দে আচার্য ম্যাক্সমূলরের এই সুবিখ্যাত উক্তিটি স্মরণ করতে পারেন :—'যদি কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন —কোন্ আকাশের তলে, কোন্ দেশবাসীর মধ্যে মানবাত্মা সর্বপ্রকারে পূর্ণ-পরিণতি লাভ করেছিল, কোন্ জাতির ধীশক্তি মানবজীবনের উচ্চতম ও গভীরতম সমস্যাগুলির সর্বাঙ্গসুন্দর মীমাংসা করতে পেরেছিল —যে-মীমাংসার উৎকর্ষ, সভ্যতা ও গভীরতা এমন-কি প্লেটো-কাণ্ট্-পড়া মনীষীদেরও বিস্ময় উৎপাদন করেছে, —কোন্ সে জাতি? —যদি কেউ আমায় জিজ্ঞাসা করেন কোন্ জাতির সাহিত্য-সম্পদ গ্রীক্-রোম-হিব্রু-ভাবপুষ্ট য়ুরোপীয় আধুনিক জাতিগুলিকে আধ্যাত্মিক জীবনের পুনর্গঠনে বৃহত্তর, পূর্ণতর ও উচ্চতর ভাবে অনুপ্রাণিত করতে পারে, এক কথায় ইহ-পরকাল-ব্যাপক পূর্ণতম মানব-জীবন গড়ে তুলতে পারে, তা হলে আমি বলবো —সে দেশ ভারতবর্ষ —সে জাতি প্রাচীন হিন্দু আর্য!'

য়ুরোপে এই রকম অনুকূল পরিবেশে ১৯১৪ সালে প্যারী-প্রদর্শনীতে দেখানো ভারত-চিত্রকলা কেবল যে পশ্চিমের চোখে একটা নতুন কলাতত্ত্ব

উদ্ঘাটিত করেছিল তা নয়, সুদূর পশ্চিমবাসীকে আশ্চর্যে অভিভূত করে ফেলেছিল। এর পরে ভারতবর্ষে, ইংলণ্ডে, বার্লিনে ভারত-চিত্রকলার অনেক প্রদর্শনী হয়েছিল। য়ুরোপ ও আমেরিকার বহু স্থানে সহৃদয় কলারসিক স্বদেশী-বিদেশীদের দ্বারা এর প্রচার হয়েছিল। তার কিছু কিছু বিবরণ শ্রীঅর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর সাম্প্রতিক স্মৃতিচারণায় লিপিবদ্ধ করেছেন। আমরা আরও কয়েকটি প্রদর্শনীর কথা সংক্ষেপে বলছি।—

॥ কলকাতায় জোড়াসাঁকো-প্রদর্শনী, ১৯১৫ ॥

দেশে-বিদেশে সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নব্যভারত-চিত্রকলার প্রদর্শনী ঘনঘন হতে লাগলো। পূর্বে প্রদর্শনী হতো সরকারী আর্টস্কুলের মাধ্যমে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়। তারপর হতে থাকে ওরিয়েণ্টাল আর্ট-সোসাইটির উদ্যোগে। শ্রীনন্দলালের ১৬ সংখ্যক ডায়েরীতে জোড়াসাঁকো-প্রদর্শনীর একটি বিবরণ লেখা রয়েছে। তাঁর বিবরণ মতে, ১৯১৫ সালের এই প্রদর্শনীতে যে-সব শিল্পীর যে যে ছবি দেখানো হয়েছিল তার বিবরণঃ অবনীন্দ্রনাথের তিনখানি ছবি ছিল এই প্রদর্শনীতে —কলঙ্কের বোঝা, ঝড় আর পূজারিণী। শ্রীনন্দলালের ছবি ছিল Calcutta বা কলিকাতায় পথের দৃশ্য আর ভরত। শিল্পী শৈলেন্দ্রনাথ দে-এর ছিল —গোপিনী আর অন্ধমুনি। মুসলমান-শিল্পী সামি-উজ-জমান-এর ছবি ছিল দু'খানি —জেবউন্নিসা আর মদিনার পথে। চারু রায়ের ছিল —রূপকথা। শিল্পী ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদারের তিনখানি ছবি রাধিকা, দীপশিখা আর শ্রীচৈতন্য। বিপিন [বিহারী গুপ্ত]-এর ছিল দু'খানি ছবি —অন্ধকারে আর বৌ কথা কও। কিরণ [চন্দ্র সিংহ]-এর ছিল —গরুর গাড়ি। সারদাচরণ উকিলের —একলব্য। মুকুলচন্দ্র দে-এর হাটবার আর সরাই। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ করের ছবি ছিল চারখানি —মালিনী, alone, পাঠশাল আর তুলসী। অসিতকুমার হালদারের ছবি ছিল একখানি —সুদাস-মালী।

১৯১৫ সালের এই প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত শ্রীনন্দলালের ১৯১৪ সালে

আঁকা 'ভরতের ভ্রাতৃভক্তি' মূল ছবিখানি আমাদের সম্প্রতি (১৯৬৫) দেখার সুযোগ ঘটেছিল। এই ছবিটি সম্পর্কে, ছবিটির পিছন দিকে তখনকার প্রদর্শনীর যে-পরিচয়-পত্র সাঁটা ছিল, তা দেখে স্বয়ং শ্রীনন্দলালের সঙ্গে আলোচনার পরে, তাঁর এবং আমাদের মন্তব্য ও পরবর্তী বিবরণ আগে বলা হয়েছে।

॥ নব্যচিত্রকলার লাহোর-প্রদর্শনী, ১৯১৫ ॥

বুলেটিন্ থেকে আমরা জানতে পারি, —লাহোরের 'মেয়ো'-আর্টস্কুলের অধ্যক্ষ Lionel Heath ও উপাধ্যক্ষ সমরেন্দ্রনাথ গুপ্তের অক্লান্ত চেষ্টায় বহু বিশিষ্ট চিত্র-সংগ্রহ, দারুশিল্প, রৌপ্যশিল্প এবং অন্যান্য ভারতীয় হস্তশিল্প সমাহৃত হয়ে লাহোর ম্যুজিয়মে ভিক্টোরিয়া জুবিলি হলে প্রদর্শিত হয়েছিল। এই প্রদর্শনীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা আকর্ষণের বিষয় ছিল নব্যবঙ্গের সুন্দর ও শিক্ষামূলক চিত্রসংগ্রহ। এই চিত্রগুলি বাঙ্গালা দেশ থেকে বিশেষ যত্নসহকারে দেখাতে নিয়ে গেসলেন সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত। নব্যবঙ্গের চিত্রের সংখ্যা ছিল এক শতের বেশি। এবং এগুলি সবই নব্য-কলকাতা-কলা-সমাজের কাজের প্রতীক। এই কলা-সমাজের বয়েস তখনও দশ বছরের বেশি হয়নি। এ চিত্র-সংগ্রহের মধ্যে বিশেষ করে কোনো একটি ছবিকে দেখা শক্ত, তবুও বুলেটিন-লেখকের মতে, অসিতকুমার হালদারের আর সমরেন্দ্রনাথ গুপ্তের প্রদর্শিত চিত্র-সম্ভারের মধ্যে দু'টী ছবি ছিল বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই সঙ্গে 'মেয়ো'-স্কুলের ছাত্রদের অঙ্কিত চিত্রও ছিল প্রচুর। সমরেন্দ্রবাবুর ছবিগুলি বিশেষ সমাদৃত হয়েছিল। বিশেষ করে, এই স্কুল-কর্তৃপক্ষ ভারতশিল্পের এইরূপ শ্রেষ্ঠ নিদর্শনসমূহ সমাহরণ করে, এইভাবে প্রদর্শনের জন্যে বিশেষভাবে ধন্যবাদের পাত্র।

এই প্রদর্শনীর বিষয়গুলিকে সংক্ষেপে বিবৃত করতে গিয়ে অধ্যক্ষ Heath সাহেব বলেছিলেন, —নব্য-কলকাতার ভারতশিল্প-সমাজের কাজের এই সংগ্রহগুলি তাঁদেরই অনুগ্রহে ধার পাওয়া গিয়েছে। এবং লাহোরে এনে দেখানো হচ্ছে —কোনো শ্রমস্বীকার বা ব্যয়ভার

বহন না-করে। এই কাজগুলি দেখে, তিনি আশা করেছিলেন যে, সকলেই তাঁর সঙ্গে একমত হয়ে, সপ্রশংস দৃষ্টিতে এই চিত্রকর্ম দেখে, এই প্রদর্শনীর জন্যে কলকাতা-কলা-সমাজের সকল সদস্যকে এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতা আর্টস্কুলে নিযুক্ত হয়েছিলেন যখন তখন হ্যাভেল সাহেব ছিলেন অধ্যক্ষ। এবং এই শিল্প-আন্দোলন অবনীবাবু শুরু করেন ১৯০৫ সালের দিকে। অধ্যক্ষ Heath সাহেবের মতে, এর প্রথম প্রদর্শনী হয় ১৯০৯ সালে। তিনি বলেন, —নব্যবঙ্গ-কলা-সমাজের কাজ চিরস্থায়ী হয়ে বেঁচে থাকবে। পূর্ব প্রদর্শনীর মধ্যে দু'টীতে তিনি উপস্থিত ছিলেন। এবং তখনই তিনি পাঞ্জাবে তাঁদের চিত্রকর্ম প্রদর্শন করবার জন্যে মনস্থ করেছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল, কলকাতার এই আন্দোলন ভারতবর্ষের অপর আর্টস্কুলের যেন চ্যালেঞ্জ-স্বরূপ। এবং তিনি বিশেষ উদগ্রীব ছিলেন, উত্তর ভারতে এই রকম প্রতিভার আবির্ভাব হচ্ছে না বলে। কয়েকমাস আগে তাঁর সুযোগ ঘটায় তিনি সরকারী অনুমোদন লাভ করে, সমরেন্দ্রবাবুকে কলকাতা থেকে লাহোরে নিয়ে গিয়ে, মেয়ো-আর্টস্কুলের উপাধ্যক্ষ নিযুক্ত করে, ঐ স্কুলের চিত্র এবং শিক্ষণ-বিভাগের প্রধান নিযুক্ত করেছিলেন এবং তাঁরই কৃতিত্বের ফলে, কলকাতার কলাসমাজের এই চিত্র-সম্ভার প্রদর্শনীর জন্যে ধার পাওয়া গিয়েছে, সেজন্যে তিনি অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছেন।

কলকাতার এই নব্য-চিত্রাবলীর গুণাগুণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে অধ্যক্ষ Heath বলেছেন, —তিনি এই নব্য-চিত্রগুলিকে ভালোভাবে বুঝবার জন্যে এর পাশাপাশি পুরাতন চিত্রকলা দেখাবার ব্যবস্থা করেছেন। এই সব কাজ অন্য সকল সুকুমার-শিল্পের মতো তাদের অনুপ্রেরণা পেয়েছে —দেশের ধর্ম, পুরাণ, সাহিত্য এবং সমকালীন সমাজ থেকে। এই কাজের মধ্যে যে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ধরা রয়েছে সে হলো এর আদর্শগত গুণ, যে-আদর্শ পুরাতন শ্রেষ্ঠ চিত্র-শিল্পীদের রচনার মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে আছে। এই গুণের ব্যাখ্যা করতে গেলে একে বলতে হয় সরল, সোজা এবং অলঙ্কারবহুল এবং এই অঙ্কনপদ্ধতি-সংস্কারের প্রেরণা পাওয়া গিয়েছে —সুন্দর আদর্শ চাক্ষুষ

করে। উপরন্তু, এই কাজের অন্য দু'টি গুণ আছে এবং সেগুলি আধুনিক চিন্তাসঞ্জাত। অধ্যক্ষ Heath সাহেবের মতে, প্রথম গুণটি হচ্ছে, —আকৃতিগত সৌন্দর্য-প্রকাশের ক্রমোন্নতি এবং অন্যটি হচ্ছে, —পরিবেশ বা সৌন্দর্যের রূপদান-পদ্ধতিতে, বর্ণবিন্যাসে এবং লাবণ্য-যোজনায়। এই সকল গুণ বেশির ভাগ পুরাতন ছবিতেই নাই; অথচ এই নব্য ছবিগুলিতে রয়েছে। তিনি আরও মনে করেন —ছবিগুলি আঁকবার পূর্বে এই প্রেরণা এসেছে শিল্পিমনের সহজ সরল চিন্তার সূত্র থেকে। এই ভারতীয় শিল্পীদের ওপর কোন্ জাতির প্রভাব বেশি পড়েছে —এ-কথা যদি কেউ বিশেষভাবে জানতে চান, তাঁর মতে, জাপানী প্রভাবই এর ওপর কিছু পড়েছে। এর কারণ হলো, কিছুদিন যাবৎ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জাপানী শিল্পীরা একত্র বসে কাজ করেছেন।

অধ্যক্ষ Heath সাহেব পাঞ্জাবে এই ধরনের কাজ হবে আশা করেছিলেন। অবশ্য এটা সম্ভব হবে, তিনি এই রকম আদর্শবাদী শিল্পীদের মতো শিল্পিগোষ্ঠী ওখানে তৈরি করতে পারলে। তিনি চেষ্টা করেছিলেন চিত্রশিল্পীদের এমনভাবে শিক্ষা দেওয়া দরকার যাতে করে তাঁদের সৌন্দর্যানুভূতি বৃদ্ধি পেতে পারে; এবং ভারতীয় চিন্তাধারাকে প্রকাশ করার ক্ষমতা জন্মায়, বা, ভারতীয় বিষয়বস্তুগুলিকে বিশেষ করে অনুধাবন করতে পারে। এবং এটুকু করতে পারলেও অধ্যক্ষ Heath সাহেবের মতে, তার শিক্ষাগত মূল্যমান হবে যথেষ্ট। অধ্যক্ষ সাহেব বলেছিলেন, —গুপ্ত মহাশয়ের এবং তাঁর ছাত্রদের কাজ ওখানে দেখে তাঁর ধারণা, কয়েক মাসের মধ্যে তাঁদের ছাত্রদের শিক্ষাধারা বেশ উন্নত হয়েছে। তাদের কাজ যেন বিশেষ আশার সঞ্চার করে।

পাঞ্জাবের তৎকালীন লেফ্‌টেন্যাণ্ট্ গভর্ণর অধ্যক্ষ সাহেবের এই বক্তৃতার পরে প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন। তাঁর ভাষণে তিনি বলেন, —তাঁর বিশ্বাস নব্যবঙ্গ-কলা-সমাজের এই সকল কাজ পাঞ্জাবের শিল্পের ছাত্রগণকে এগিয়ে যাবার পথ দেখাবে। অবশ্য তারা এ-সবের নকল করবে না। কিন্তু বাঙ্গালা দেশের এই সব কাজ তাদের প্রেরণা দেবে। সমরবাবুর চিত্রাবলীর উল্লেখ করে ছোটলাট বলেছিলেন যে, মেয়ো-আর্টস্কুল

সমরবাবুর মতো একজন গুণী, সুশিক্ষিত লোককে পেয়ে বিশেষ ভাগ্যবান্।

The Punjabee Patrika নব্যবঙ্গ-চিত্রকলা সম্পর্কে এই মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন, —নব্যকলা-সমাজের বেশির ভাগ কাজই আমাদের মনে কোনো প্রভাব বিস্তার করে না। কিন্তু, যে-সকল চিত্রকর্ম প্রত্যক্ষের অতীত অপরোক্ষ বস্তুকে প্রকাশ করবার ক্ষমতা রাখে, —প্রকৃতির সেই বিচিত্র প্রকাশ প্রত্যক্ষ করে যে-সকল চিত্রকর্মে অলিখিত কবিতার ইঙ্গিত পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, সেইসব চিত্রই হচ্ছে আসল বস্তু; নকলমাত্র নয়। নব্যবঙ্গ-কলাসমাজ এখনো তার শৈশব উত্তীর্ণ হয়নি; কিন্তু এইসব ভারতীয় চিত্রকলার মধ্যে উজ্জ্বল সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে; এবং ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাসে নতুন যুগ সৃষ্টি করেছে তার বলিষ্ঠ পদক্ষেপে —এই বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই (The Modern Rev. March, 1915, P. 353)।

ভারতশিল্পকলার ১৯১৫ সালে এই লাহোর-প্রদর্শনীর পূর্বে ভারতশিল্পের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে পাঞ্জাব-বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদানও অগ্রগণ্য। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় ১৯১৩ সালের দিকে ভারতশিল্পের ব্যাখ্যানের উদ্দেশ্যে হিন্দু-স্থাপত্য বিষয়ে বক্তৃতামালার বন্দোবস্ত করেছিলেন। এই বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে পাঞ্জাব-বিশ্ববিদ্যালয় অধিকতর কৃতিত্বের অধিকারী। প্রসঙ্গতঃ ১৩২০ সালের 'প্রবাসী'র বৈশাখ সংখ্যায় সম্পাদক মহাশয়ের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য :—

॥ পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে শিল্পের ব্যাখ্যান ॥

১৯০৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টস্ ফ্যাকাল্‌টির (Arts Faculty) অধিবেশনে শিল্পবিষয়ে বিশেষজ্ঞ ঈ. বী. হ্যাভেল সাহেবের এই প্রস্তাব গৃহীত হয়, —ছাত্রগণের বিদ্যানুশীলন সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ করিবার জন্য, সাহিত্য-দর্শনাদির সঙ্গে সুকুমার-শিল্পের চর্চা হওয়াও বাঞ্ছনীয়। ('That in the interest of general culture, Art should not be excluded from the Arts' courses of the University'.)। ইহার পর সাত বৎসর অতীত হইয়াছে, কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

চিত্র, সঙ্গীত, স্থাপত্য, ভাস্কর্য-আদি কলার চর্চার কোনই বন্দোবস্ত করেন নাই। অন্য কোন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়েও এরূপ বন্দোবস্ত নাই। পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় এ বিষয়ে পরোক্ষভাবে কার্য আরম্ভ করিয়া অগ্রণী হইয়াছেন। ছাত্রগণ যে-সকল বিষয়ে পরীক্ষা দেয় তাহার মধ্যে কোন কলা এখনও সন্নিবিষ্ট হয় নাই বটে, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে এ বিষয়ে, ম্যাজিকলণ্ঠন সহযোগে চিত্র-প্রদর্শন দ্বারা বিশদীকৃত বক্তৃতার বন্দোবস্ত হইয়াছে। গত মার্চ মাসে লাহোরে এইরূপ পাঁচটি বক্তৃতা হইয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে চারটির সহিত ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে ছবি দেখানো হইয়াছিল। বঙ্গের পক্ষে আনন্দ ও গৌরবের বিষয় এই যে তরুণ চিত্রশিল্পী শ্রীমান্ সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত বক্তা নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে বিদ্যানুশীলন-চেষ্টাকে নূতন পথে চালিত করিবার জন্য যে তিনি নিযুক্ত হইয়াছিলেন, ইহা তাঁহার পক্ষে বিশেষ সুযোগ ও সৌভাগ্য। যোগ্যতা ব্যতিরেকে এরূপ সুযোগ মিলে না। চিত্র আঁকিতে এবং চিত্র বুঝিতে ও বুঝাইতে তাঁহার ক্ষমতা আছে। চিত্রবিদ্যায় তিনি শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য। তাঁহার বয়স অল্প; একাগ্র সাধনা দ্বারা সিদ্ধির পথে উত্তরোত্তর অগ্রসর হইবার নিমিত্ত তাঁহার সম্মুখে সমস্ত জীবন পড়িয়া রহিয়াছে।

পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপত্য বিষয়েও বক্তৃতার বন্দোবস্ত করিয়া প্রশংসাভাজন হইয়াছেন।' —১৯১৪ সালে সমরেন্দ্র গুপ্ত লাহোরের 'মেয়ো স্কুল অব্ আর্ট'-এর এ্যাসিস্ট্যান্ট্ প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত হয়েছিলেন।

॥ ভারতচিত্রকলার মাদ্রাজ প্রদর্শনী ১৯১৬ ॥

কোনো দেশের সভ্যতার মাপকাঠির একটি বিশিষ্ট অঙ্গ হচ্ছে সে-দেশের শিল্পকলা। প্রথম দিকে আমাদের দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিরা এই বিষয়ে প্রায় উদাসীন ছিলেন। কিন্তু ভারতশিল্পকলা ক্রমশঃ তাঁদের নিকট আদৃত হতে থাকে। নব্যবঙ্গের চিত্রশিল্পীদের শিল্পকলা কলকাতায় ১৯০৮ সাল থেকে প্রদর্শিত হচ্ছিল। এর পর প্রদর্শনী

হয়েছে —প্যারিসে, লণ্ডনে, লাহোরে। ১৯১৬ সালে এই প্রদর্শনী হয়েছিল মাদ্রাজে। যেখানেই নব্যবঙ্গ-চিত্রকলার প্রদর্শনী আয়োজিত হয়েছে, প্রত্যেক স্থানেই প্রশংসা আর নিন্দা লাভ হয়েছে দুইই। অবশ্য কোনো বিষয়ের সংগঠনের যুগে নিন্দা আর প্রশংসা —প্রয়োজন দুই-এরই। মাদ্রাজেও এই উভয় লাভই মিলেছে। আধুনিক ভারতীয় চিত্রকরদের চিত্রকলার মাধ্যমে যুব-ভারতের প্রতি তাঁদের বাণী প্রসঙ্গে ভাষণ দিতে গিয়ে J. H. Cousins সাহেব বলেছিলেন ঃ—এই নব্যভারতীয় চিত্রকলাকারদের প্রথম লক্ষণীয় গুণ হচ্ছে —তাঁদের 'Indianness' বা ভারতীয়তা। তিনি জানতেন য়ুরোপে এবং জাপানের বিশিষ্ট শিল্পবিচারকগণ প্রদর্শনী দেখে যে-মন্তব্য করেছিলেন সে হলো পদ্ধতিগত বিচার। কাজিন্‌স্‌ সাহেব খোলা চোখে ভারতীয় জীবন ও প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখেছিলেন দীর্ঘদিন ধরে। তিনি ভারতীয় চিন্তাধারার প্রতি প্রীতিবশতঃ এই বিষয়ে বিশেষ অধ্যয়নও করেছিলেন। তিনি কোনো শিল্পীর অবশ্য-পালনীয় কোনো আদর্শ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাননি। ফলে, তিনি দেখেছিলেন —এই চিত্রকলা ভারতীয়-ভাবে পূর্ণ; এবং আসলে, এই তার যথার্থ পথ। ভারতবর্ষ অর্ধসভ্য বানরের যুগকে পিছনে ফেলে বহুদূরে এগিয়ে এসেছে। ভারতীয় শিল্পিগণ পশ্চিমের চিত্রকলার অক্ষম অনুকরণ থেকে বিরত হওয়ার পরে, তাঁদের নিজস্ব ধারা আবিষ্কার করেছেন। ভারতবর্ষ সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে একমাত্র তার স্ব-আদর্শে অবিচল থেকে। আর সে আদর্শ হলো —আধ্যাত্মিক অনুভূতির আদর্শ। এবং আধুনিক চিত্রকররা যেমনটি উপলব্ধি করেছেন, —সেই বৈচিত্র্যের মধ্যে এক মহাজীবনেরই অধিষ্ঠানের অনুভূতি।

W. S. Hadaway ছিলেন তখন মাদ্রাজ আর্টস্কুলের Superintendent. তিনি New India পত্রিকায় নব্যবঙ্গ-চিত্রকলার তীব্র সমালোচনা করেও বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, —আধুনিককালে ভারতবর্ষ চিত্রকলা বিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ যা প্রকাশ করেছেন, সে হলো নিঃসন্দেহে এই বাঙ্গালী শিল্পিগণের কাজ ('The best work in Painting and drawing

which India has produced in modern times is undoubtedly the work of this group of Bengali artists. ') ।

Johan Van Manen সাহেব The Commonweal-পত্রিকায় এই প্রদর্শনীর বিষয়ে একটি সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লিখে, এই বলে সানন্দে তার উপসংহার করেছিলেন, —আমাদের ঘেরে বর্তমান ভারতে একদল নব্য-কলাকার তাঁদের মৃত জাতীয় ঐতিহ্য নিয়ে অতৃপ্ত ; পক্ষান্তরে, বিদেশী আদর্শের দুষ্পাচ্য আদর্শসমূহকে যান্ত্রিকভাবে অনুকরণেরও তাঁরা পক্ষপাতী নন। এঁরা নতুন আদর্শের জন্যে সংগ্রাম চালাচ্ছেন, সৌন্দর্যের প্রকাশের জন্যে নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। এবং চিত্রকর্মের রূপে সত্য-প্রকাশের চেষ্টা করছেন। এঁদের এই সকল কাজ সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের। এ হলো তাঁদের অনুভূতিলব্ধ প্রচেষ্টা। এবং তাঁরা এখনো যা পাননি, সেই অলক্ষ্য ধন পাবার আগ্রহে অধীর। এই সকল চিত্রকর্মে দেখা যাচ্ছে, একটি স্বাস্থ্যপ্রদ অবিচ্ছিন্ন আবেগ —এবং এই হলো সজীবতার লক্ষণ, এবং বিকাশের সম্ভবনায় ভরপুর। মাত্র একটি স্কুল নয়, এই কলাকারদল চিত্রবিদ্যা-শিক্ষার জন্যে একটি নব্য-ভারতীয় বিদ্যা-প্রতিষ্ঠান নির্মাণের সম্ভাবনা জাগাতে পারেন।

নব্যবঙ্গ-চিত্রকলার প্রদর্শনী প্যারিসে আর লণ্ডনে অনুষ্ঠিত হবার পরে, পৃথিবীর শিল্পরসিকদের দৃষ্টি এদিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল। এঁদের প্রদর্শনী দেখবার জন্যে তখন যেন সারা পৃথিবী উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিল। চীনের একজন শিল্পরসিক বান্ধব কলকাতার ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটির কর্তৃপক্ষকে আর রামানন্দবাবুকে এই বিষয়ে পত্র দিয়েছিলেন। চীনের ভদ্রলোকটি অনুরোধ-পত্র পেয়েছিলেন —ইটালীর শিল্পীদের কাছ থেকে ; আর নিউইয়র্কের সাংবাদিক, গ্রন্থকার ও শিল্পসমালোচকদের কাছ থেকে। সে-চিঠির বক্তব্য ছিল এই, —এই শীতকালে বেশ ক'টা exhibition হয়েছে এবং এই exhibition-এ বেশকিছু পুরাতন ও আধুনিক চীনে ও জাপানী ছবি বিক্রী হয়েছে। এই সপ্তাহে পুরানো পারসীক miniature আর রঙ্গিন চিত্রাবলীর মূল বিক্রী হবে। সে-গুলির এখন প্রদর্শনী হচ্ছে। এই সব দেখে, বিশেষভাবে আমার মনে হচ্ছে, ঐ সময়ের ভারতীয় আধুনিক miniature ছবির কথা।

কিছুকাল আগে প্যারিসে ও লণ্ডনে হিন্দু-কলাকারদের ছবিগুলি সার্থকতার সঙ্গে দেখানো হয়েছিল। আপনারা হিন্দু-শিল্পীদের ঐ-সব ছবির প্রদর্শনী করতে আর চেষ্টা করছেন না কেন? আমার মনে হয়, হিন্দু-শিল্পীদের প্রদর্শনীর ছবিগুলি আদৌ য়ুরোপীয় চিত্রশিল্পের অনুকরণ নয়; সেগুলি প্রকৃত দিশী ছবি। যদি আপনি এই রকম প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে চান, আমি আপনাকে স্থান-নির্বাচনের জন্যে সাহায্য করতে পারি। এবং ওখানে এই শিল্পকর্মের প্রদর্শনী হলে সে নিশ্চয়ই সফল হবে, তাতে আমার কিছুমাত্র সংশয় নাই।

রামানন্দবাবু অনুমান করেছিলেন, '—কলকাতার আর্ট-সোসাইটিও আমেরিকার বিভিন্ন স্থান থেকে অনুরূপ অনুরোধজ্ঞাপক আমন্ত্রণ-পত্র পেয়ে থাকবেন। তাঁর ধারণা হয়েছিল, আমাদের জাতীয় শিল্পের নিদর্শনগুলি নিউইয়র্ক, বোস্টন, চিকাগো এবং আমেরিকার যুক্তরাজ্যে প্রগতিপরায়ণ এবং বিশিষ্ট শিল্পরসিকদের সমক্ষে উপস্থাপিত করার এই হলো প্রকৃস্ট মুহূর্ত।

॥ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্ট, ১৯০৭-২০ ॥

হ্যাভেল সাহেবদের একটা সোসাইটি ছিল জনাকয়েক সাহেব-মেম আর্টিস্টকে নিয়ে। আর্টস্কুলেই সন্ধ্যাবেলায় তাঁরা কাজ করতেন ঘণ্টা দুয়েক। আলোচনা-সমালোচনা হতো, খানা-পিনাও চলতো সেখানে —আর্টক্লাবের মতো। মার্টিন কোম্পানীর ইঞ্জিনীয়ার থর্ণটন সাহেব সেই ক্লাবের তদারক করতেন। সব ভারই ছিল তাঁর ওপর।

সে-সময়ে বাঙ্গালাদেশের কয়েকজন জমিদার মিলে একটা সোসাইটি করেন। নাম তার —ল্যাণ্ড্‌হোল্ডার্স অ্যাসোশিয়েশন্। সভাপতি ছিলেন তার লর্ড সিংহ মহাশয়। উড্‌রোফ্ আর ব্লাণ্ট্ সাহেবও যোগ দিলেন ওঁদের সঙ্গে। প্রধান উদ্যোগী ছিলেন —সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনিই প্রথমে চিন্তা করলেন চিত্রকলার একটি এগ্‌জিবিশন্ করতে হবে। অবনীন্দ্রনাথের যত ছবি ছিল, ওকাকুরার আনা কিছু জাপানী প্রিণ্ট্ আর এদিক-সেদিক থেকে আরও কিছু ছবি যোগাড় করে তিনি তৈরি হলেন। ল্যাণ্ড্‌হোল্ডার্স্ অ্যাসোশিয়েশনের মস্ত একটি বাড়ি ছিল। সেই

বাড়ির বিলিয়ার্ড-রুমে সব ছবি সাজানো হলো লর্ড সিংহের অনুমতিক্রমে। এতে কিন্তু আহেলবিলাতী তরুণ বারিস্টারদের কেউ কেউ বিরক্ত হয়েছিলেন —ঘর আটকে রাখা হয়েছে বলে। সেই এগ্‌জিবিশনে উড্‌রোফ্‌, ব্লাণ্ট্‌ এঁদের সঙ্গে অবনীবাবুদের প্রথম আলাপ জমলো। —সেই হলো এঁদের ছবিরও প্রথম এগজিবিশন।

এর দু-তিন বছর পরে হ্যাভেল সাহেবের আগ্রহে তাঁর সেই ছোট্ট আর্ট-ক্লাবটি ভালো করে তৈরি করা হলো। কমিটি গঠন হলো। তাতে অবনীবাবুরা যোগ দিলেন। ল্যাণ্ড্‌হোল্ডার্স্‌দেরও কেউ কেউ এলেন। এলেন উত্তরপাড়ার রাজা প্যারীমোহন। সভাপতি হলেন লর্ড কিচ্‌নার। অবনীবাবু হলেন লর্ড কিচ্‌নারের যুগ্ম-সম্পাদক। গগনেন্দ্রনাথও ছিলেন। অনেক আলোচনার পরে এই সোসাইটির পাকা নাম হলো —'ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট'। —এ প্রতিষ্ঠান কেবল বাঙ্গালীর নয়, এশিয়া ও য়ুরোপ মিললো এতে। স্থায়ী সভ্য হলেন অনেকে। বাড়িভাড়া নেওয়া হলো পার্ক স্ট্রিটে। আর্টিস্টরা কাজ করবেন সেখানে। কেউ ইচ্ছে করলে, সেখানে তাঁর থাকার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। আর্টস্কুলের বড়ো হলে ছবির এগ্‌জিবিশন হলো — দু-তিনটে। উড্‌রোফ সাহেব তাঁর জাপানী প্রিন্টের সংগ্রহ দিলেন। Gesiking নামে এক মেম সাহেব দিশী ধরনে সব ঋতুর ফুল এঁকেছিলেন —তাও দেখানো হলো। দেখতে দেখতে সোসাইটি খুব জমে উঠলো। মার্চেণ্ট্‌ কমিউনিটি, সিভিলিয়ন কমিউনিটি, লাট-বেলাট, জজ ম্যাজিস্ট্রেট, রাজ-রাজড়া সবাই তাতে যোগ দিলেন। সবাই কিছু-না-কিছু কাজ করেছেন। উড্‌রোফ সাহেব ক্যাটালোগ লিখতেন। তখনকার ক্যাটালোগ ছিল সাহিত্যের সমপর্যায়ের। প্রতি ছবির নিচে ছবির কাহিনী লেখা থাকতো। লিখতেন অবনীবাবু আর উড্‌রোফ্‌ সাহেব।

অবনীন্দ্র-রীতির প্রতি অনুরাগবশতঃ সেদিন এগিয়ে এসেছিলেন দিশী-বিদেশী সুরসিক সমঝদার কলাপ্রেমী বিদগ্ধের দল। এই সোসাইটী সৃষ্টির আগে অবনীন্দ্রনাথের আর তাঁর শিষ্যদের রচিত চিত্রাবলীর প্রদর্শনী হতো গভর্ণমেণ্ট আর্টস্কুলে। হ্যাভেল সাহেবের সঙ্গে বন্ধুত্বের আকর্ষণে যে-সব য়ুরোপীয় শিল্পরসিক আর্টস্কুলের আর্টক্লাবে আনাগোনা করতেন

তাঁরা ক্রমশঃ অবনীন্দ্রনাথের চিত্রকলাতে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। এই আকর্ষণের ফলেই 'ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টে'র জন্ম। এই সব বিদেশী শিল্পরসিকের নব্যভারত-চিত্রকলায় আকর্ষণের হেতু সম্পর্কে শ্রীঅর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, —'সেই বিদেশী চিত্রপ্রেমীদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন বিশিষ্ট সমঝদার। তাঁরা ছিলেন জাতিতে ভিন্ন, তাঁদের দেশের শিল্পীরীতিও স্বতন্ত্র। কিন্তু তাঁরা আমাদের দেশের শিল্পকে আমাদের জাতীয় আদর্শ ও দৃষ্টিকোণ দিয়েই বিচার করতেন। এ-ছাড়া তাঁরা ভারতের প্রাচীন শিল্পের ঐতিহ্যধারার সঙ্গে পরিচয় লাভের চেষ্টাও করতেন। ফলে, অবনীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত নতুন শৈলীকে তাঁরা ভারতীয় আদর্শের প্রতীকরূপেই বিচার করেছেন এবং এতে আকৃষ্ট হয়ে প্রভূত প্রশংসা ও পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। তাঁরা আর একটি বিষয় উপলব্ধি করেছিলেন যে, এই নব্যরীতি প্রাচীনের হুবহু জাবরকাটা নয়, অথচ ভারতের মাটিতেই এর মূল আবদ্ধ। প্রাচ্য-শিল্পের নানা ধারাবাহিক অভিব্যক্তি থেকেই রস ও শক্তি আহরণ করে এই শিল্প হয়েছে সঞ্জীবিত। সুতরাং আমাদের পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত রক্ষণশীল এক সম্প্রদায়ের কাছে তা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের বিষয় ও বর্জনীয় হলেও বাস্তবিক শিল্পরসিক দেশী ও বিদেশী মানুষের কাছে তা হয়েছিল বিশেষ আকর্ষণের বস্তু।'

সোসাইটির সভাপতি হলেন সেকালে সেনা-বিভাগের সর্বাধ্যক্ষ লর্ড কিচ্‌নার। চিত্রকলায় তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি স্যার জন উড্‌রোফ্‌ আর মিস্টার র‍্যাম্‌পিনি এর গোড়া থেকেই যুক্ত হয়েছিলেন। এঁদের সঙ্গে পরে এসে যোগ দিলেন বিচারপতি হোম্‌উড্‌ সাহেব। বাঙ্গালী বিচারপতি স্যার আশুতোষ চৌধুরী প্রথম থেকেই যোগ দিয়েছিলেন। সুইডেনবাসী দু'জন ব্যবসায়ী —মিস্টার বুরেনসান আর মিস্টার মোলার সোসাইটির উৎসাহী সভ্য ছিলেন। মার্টিন কোম্পানীর ইঞ্জিনীয়ার থর্ণটন সাহেবও সোসাইটির উৎসাহী সভ্য হলেন। ক'জন সংস্কৃতিবান বাঙ্গালীও এতে যোগ দিলেন —নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়, বর্ধমানের মহারাজা বিজয়চাঁদ মহাতব, ব্যারিস্টার জে. চৌধুরী, স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জী, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ।

সোসাইটির প্রথম সভাপতি হয়েছিলেন লর্ড কিচ্‌নার। প্রথম

সেক্রেটারী হলেন —নর্মান ব্লান্ট্ আর অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পর পর সভাপতি হয়েছিলেন —স্যার জন্ উড্রোফ্, স্যার হার্বার্ট হোম্ উড্, লর্ড কার্মাইকেল, বর্ধমানের মহারাজা বিজয়চাঁদ মহাতব, গভর্ণমেণ্ট সলিসিটার স্যার চার্ল্স কেস্টেভেন্, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জী প্রমুখ।

প্রতি মাসে সোসাইটির কর্মসমিতির অধিবেশন বসতো। সভা হতো কখনো গভর্ণমেণ্ট-আর্টস্কুলে, কখনো এশিয়াটিক্ সোসাইটির বাড়িতে। শিল্পকলার চর্চা, প্রচার আর প্রসারের জন্যে সোসাইটির কর্মধারা ছিল বহুমুখী। দেশ-বিদেশের কলাবিষয়ে নানারকম পত্র-পত্রিকা কিনে সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করা হতো। সোসাইটির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ হয়েছিল বিলেতের ইণ্ডিয়া-সোসাইটির সঙ্গে সহযোগিতা করে অজন্তা-গুহা-চিত্রাবলীর অনুলিপি প্রস্তুত করবার জন্যে সোসাইটির তরফ থেকে তখনকার তরুণ প্রতিভাশীল শিল্পী শ্রীনন্দলাল, অসিতকুমার, সমরেন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতিকে সেখানে পাঠানো (১৯০৯,১৯১১)। সোসাইটির কর্মধারার দুটি ছিল বিশিষ্ট শাখা ; তার একটি হলো —প্রতি বছরে একটি করে বাৎসরিক প্রদর্শনীর আয়োজন করা। এতে অবনীন্দ্রনাথ আর তাঁর শিষ্যদের সারা বছরের রচনাবলী উপস্থাপিত করে সমঝদার ও সমালোচকদের বিচার-বিশ্লেষণ করবার সুযোগ দেওয়া হতো। এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে সমিতির শিল্পী-সদস্যদের সৃষ্টি-কর্মের অগ্রগতি আর পরিণতি জনসাধারণের কাছে পরিস্ফুট হয়ে উঠতো। এদের দ্বিতীয় কর্তব্য ছিল, —ভারতবর্ষ তথা সমগ্র প্রাচ্যদেশের কলাশিল্প সম্পর্কে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের আহ্বান করে শিক্ষামূলক আর চিত্তাকর্ষক বক্তৃতাদির ব্যবস্থা করা। এই সব বক্তৃতার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হয়েছিল উড্রোফ সাহেবের বাড়িতে ডক্টর আনন্দকুমারস্বামীর সচিত্র বক্তৃতা।

সোসাইটির উৎপত্তি ও কেন্দ্র-সংস্থা কলকাতাতে হলেও এর প্রভাব ক্রমশঃ ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। জেমস্ কাজিন্স্ সাহেবের প্রচেষ্টায় মাদ্রাজ-অঞ্চলে বাঙ্গালার শিল্পান্দোলনের প্রভাব বিস্তার হয়েছিল দ্রুত এবং সবচেয়ে বেশি। কলকাতার সেকালের বাৎসরিক চিত্রপ্রদর্শনীর সমালোচনা বের হতে লাগলো মাদ্রাজের New India পত্রিকায়। কাজিন্ সাহেব এই পত্রিকার সহ-সম্পাদক

ছিলেন। তিনি নিজেই সমালোচনা লিখবার ভার নিতেন।

সোসাইটি পত্তন হওয়ার পরে, প্রতি বৎসর প্রদর্শনী হয়েছে নিয়মিত-ভাবে। প্রথম দিকে প্রদর্শনীর রিভিউ লিখতেন উড্রোফ্ সাহেব। তারপর কাজিন্ সাহেব এই কাজে সহায়তা করেছিলেন। প্রদর্শনীর সময়ে তিনি মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় আসতেন। শেষে সমস্ত রিভিউ লেখার ভার পড়েছিল শ্রীঅর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের ওপরে। তখন বেশির ভাগ আলোচনা বের হতো কলকাতার The Statesman-পত্রিকায়।

এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আর একটা নতুন কাজ করা হয়েছিল। সে হলো অবনীবাবুর আর শ্রীনন্দলালের উৎকৃষ্ট কয়েকটি ছবি জাপানে পাঠিয়ে কাঠের ব্লকে প্রতিলিপি করিয়ে আনা। এই ধরনের জাপানী ব্লকে ছবির প্রতিলিপি এতো নিখুঁত হতো যে, আসলের সঙ্গে নকলের পার্থক্য বোঝা যেত না। যে-সব ছবি জাপানে পাঠিয়ে প্রতিলিপি করানো হয়েছিল তার মধ্যে প্রথম ও প্রধান হচ্ছে শ্রীনন্দলালের আঁকা 'সহমরণের সতী'। শ্রীনন্দলালের এই ছবিখানি জাপানের প্রসিদ্ধ কলা-পত্রিকা 'কোক্কা'য় প্রকাশিত হয়েছিল স্যার জন্ উড্রোফের প্রবন্ধ সম্বলিত হয়ে। এইভাবে প্রতিলিপি আর যা করানো হয়েছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে —অবনীবাবুর 'দেওয়ালী' (Feast of lamps') আর সুরেন গাঙ্গুলীর 'কার্ত্তিকেয়'।

সোসাইটির নিয়ম ছিল, এইসব সুন্দর ও সার্থক প্রতিলিপিচিত্র সোসাইটির সভ্যদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা। ফলে, তখনকার শিল্পীদের রচনাবলী-প্রচারে বিশেষ সুবিধা হয়েছিল। যাঁরা প্রদর্শনীতে আসতে পারতেন না, বা. কলকাতার বাইরে থাকতেন তাঁরাও এই প্রতিলিপি-চিত্র সংগ্রহ করে নব্যকলার রস আস্বাদন করার সুযোগ পেতেন।

সোসাইটিতে আলোচনা-পর্ব শুরু হওয়ার পরে ঠিক হয়েছিল, সোসাইটির মুখপত্ররূপে কলা-বিষয়ে একটি উঁচু-দরের পত্রিকা প্রকাশ করতে হবে। এ প্রস্তাব প্রথম এসেছিল লাট সাহেব লর্ড

রোণাল্‌ড্‌শের কাছ থেকে। লাট্‌ সাহেব গগনবাবুর সঙ্গে আর শ্রীঅর্ধেন্দ্রবাবুর সঙ্গে আলোচনা করে সঙ্গে সঙ্গে ফিন্যান্স্‌ ডিপার্ট্‌মেণ্টকে নির্দেশ দিয়ে একটা মোটা অঙ্কের টাকা মঞ্জুর করে দিলেন। অনেক আলোচনার পরে স্থির হলো পত্রিকাটির নাম —'রূপ', 'রূপা' না-হয়ে হবে —'রূপম্‌'। দশ হাজার টাকা বরাদ্দ হয়েছিল 'রূপম্‌' প্রকাশের জন্যে। শ্রীঅর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদনায় 'রূপম্‌' প্রথম সংখ্যা বের হলো ১৯২০ সালের জানুয়ারী মাসে। 'রূপম' চলেছিল একটানা এগারো বছর —'সাড়ম্বরে'। এই কলা-পত্রিকাখানি একদা বিশ্ববিখ্যাত হয়েছিল। ঐ-সময়ে স্যার জন্‌ উড্‌রোফ্‌ ছিলেন সোসাইটির সভাপতি, শ্রীঅর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ছিলেন সম্পাদক। 'রূপম্‌' ছিল ত্রৈমাসিক কলাপত্রিকা। কেবলমাত্র প্রাচ্যের কলাশিল্প ও প্রত্নতত্ত্বের আলোচনাই এতে স্থান পেত। বিশ্বের সেরা পণ্ডিতদের রচনাসমৃদ্ধ হয়ে এই পত্রিকাখানি আত্মপ্রকাশ করতো। 'রূপম্‌' 'ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল্‌ আর্টে'র মুখপত্র হলেও এর কার্যালয় ছিল শ্রীঅর্ধেন্দ্রবাবুর নিজস্ব সলিসিটর-অফিস —৭নং ওল্ড্‌ পোস্ট অফিস স্ট্রিটে। গাঙ্গুলী মহাশয়ের অফিসের কর্মীরাই এর খরচ-খরচার হিসাব-পত্র রাখা, টাইপ করা, জিনিসপত্র কেনা ইত্যাদি সব কাজ করতেন। প্রুফ দেখা, চিঠি-পত্র লেখা, প্রবন্ধ, চিত্রাদি নির্বাচন করা, এবং সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখা সবই একলা করতেন স্বয়ং শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়। —এই বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ তিনি সম্প্রতি প্রকাশ করেছেন। শ্রীনন্দলালের অঙ্কিত চিত্রাবলী ও তাঁর সম্পর্কে আলোচনামূলক প্রবন্ধাদি রূপমে যা প্রকাশিত হয়েছিল সে-সব বিবরণও তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। আমরা যথাসময়ে এই বিষয়ে অবহিত হবো।

॥ সোসাইটির একটি ত্রৈবার্ষিক প্রতিবেদন, ১৯১৩-১৫ ॥

আর্ট সোসাইটির ১৯১৩ থেকে ১৯১৫ সাল পর্যন্ত রিপোর্ট সমালোচনা করেছিলেন রামানন্দবাবু। তাতে দেখা যায়, ফরাসী ও ইংরেজী কাগজ-পত্রে নব্যবঙ্গ-চিত্রকলা সম্পর্কে যে-সব প্রবন্ধ এবং মতামত প্রকাশিত হয়েছিল তার অনুবাদ এবং মূল, এই রিপোর্টের পরিশিষ্টে ছাপা রয়েছে।

ভারতীয় শিল্পাদর্শকে পুনর্জাগরিত করে সেই দিকে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার ব্যাপারে সোসাইটী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আর প্রয়োজনীয় কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ১৯১৬ সালের দিকে তখন শিল্প-পুনর্জাগরণের যেন মধ্যাহ্নকাল। তখন কোনো কোনো নতুন শিল্পী জাপানী শিল্পরীতি অনুকরণ করছিলেন বা জাপানী রীতি থেকে অনুপ্রেরণা পাবার চেষ্টা করছিলেন। অবশ্য এর থেকে সাবধান হওয়া উচিত হলেও, হতাশ হবার কিছু ছিল না। ইংরেজী সাহিত্যে Chauser-এর যুগ থেকে বহু তথ্য, পদ্ধতি ও অনুপ্রেরণা গ্রীক্, ল্যাটিন, ইটালীয়, ফ্রেঞ্চ আর জার্মান সাহিত্য থেকে নেওয়া হয়েছে। তবু ইংরেজী সাহিত্যের মৌলিকতা, মহত্ত্ব ও শক্তি সম্পর্কে মতদ্বৈধের, বা সে অস্বীকারের কোনো উপায় নাই।

সোসাইটীর রিপোর্টে দেখা যায়, কিছু অগৌরবের কথা। বহু সদস্য তাঁদের চাঁদা আদায় দেননি। সোসাইটীর তখন সভ্যসংখ্যা ১২০। এঁদের মধ্যে মাত্র ৪৭ জন ভারতীয় এবং বাকী য়ুরোপীয়। এটা কিন্তু মোটেই স্বাভাবিক ব্যাপার নয়। ইণ্ডিয়ান্ সোসাইটি অব্ ওরিয়েন্টাল আর্টের সদস্য-সংখ্যা ভারতীয়-অভারতীয় মিলে অন্ততঃ আধাআধি হওয়া উচিত। ভারতীয়দের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করবার জন্যে সোসাইটির কর্তৃপক্ষ বিশেষ উদ্যোগী কিনা, রিপোর্টে সে-কথার উল্লেখ নাই। অবশ্য এর সদস্য হওয়া খুবই সহজ ও আনন্দের ব্যাপার, এবং

লাভজনক তো বটেই। এর সভ্য হতে গেলে চাঁদা দিতে হতো —বছরে ২৪ টাকা মাত্র। অবশ্য এই টাকাটাও বেশিরভাগ সদস্যই বাকি ফেলে রাখতেন। কিন্তু, এতো টাকা বাকি পড়লে সোসাইটীর কাজকর্মই বা কিভাবে চলতে পারে। একনজরে ভারতীয় ও য়ুরোপীয় সদস্যদের নাম পড়ে গেলে, এঁদের মধ্যে যে দুঃস্থ কেউ আছেন সে-কথা আদৌ ভাবা যায় না।

সোসাইটীর সদস্য হওয়া বিশেষ করে চাঁদা-না-দেওয়া সদস্য হওয়া অবশ্য দুনো লাভের ব্যাপার। কারণ, সদস্যদের কারো কিছু না-করে, বা কিছু পয়সা না-খসিয়েও বিশেষ সুবিধা মিলে যেত অনেক। কারণ রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে : By the courtesy of the India Society, London, our Society has been able to purchase some copies of Mr. Fox Strangway's 'Music of Hindustan' for sale to the members at a concession price of Rs. 7-14 per copy, the published price of the work being Rs. 15 per copy. By arrangement with the India Society, London, Mrs. Herringham's monograph on Ajanta paintings (15 colour plates and 30 collotypes) will also be available to members at £ 3 per copy, the published price being £ 4·4 per copy.

Mr. Ganguly's monograph on 'South Indian Bronzes' copies of which he has so generously presented to members, is a very interesting study of Indian sculpture based on original sources not utilised by any previous writers, and in its attractive get-up and sumptuous illustrations has met with great appreciation. This work which has been published wholly at Mr. O. C. Ganguly's expense, and Mr. Tagore's 'Notes on Indian Artistic Anatomy' have been issued as free publications to members for 1914 and 1915, respectively. Members requiring additional copies of Mr Ganguly's work procure the same from the secretaries at Rs. 10 per copy,

the published price of the work being Rs. 15 per copy.

গাঙ্গুলী মহাশয়ের কাজ অতি উৎকৃষ্ট এবং মূল্যবান্। এই বই প্রকাশ করবার জন্যে এবং এর ছবি ছাপাবার জন্যে সোসাইটিকে বহু হাজার টাকা খরচ করতে হয়েছিল। আর একটি মৌলিক কাজ অত্যন্ত মূল্যবান্ এবং নতুন আলোকপাত করে। এই বই হলো, —'Notes on Indian Artistic Anatomy'. এই গ্রন্থের প্রকাশেও বহু ব্যয় হয়েছে। কিন্তু সদস্যেরা এই বইও পেয়েছিলেন gratis-এ। এই বইয়ের কতকগুলি ছবির ব্লক 'প্রবাসী'-প্রেস থেকে নিয়ে ব্যবহার করা হয়েছিল। সেই ব্লকগুলি করানোর খরচ পড়েছিল ২০০ টাকার বেশি। কার্যতঃ দেখা যাচ্ছে, তখনকার সোসাইটির সদস্যদের মধ্যে gratis-এর সংস্কারটি যেন প্রবলভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। এই পরিস্থিতিতে সোসাইটির সদস্যদের অচিরে সমগ্র চাঁদা আদায় দেবার জন্যে রামানন্দবাবু আন্তরিক আবেদন জানিয়েছিলেন।

সোসাইটি ভারতীয় সদস্য বেশি পাবার জন্যে উদ্যোগী ছিলেন কিনা জানা না-গেলেও, ভারতীয় সদস্য পাওয়া আদৌ দুরূহ ছিল না। অর্থাভাবে নব্যভারত-চিত্রকলাকে লোকপ্রিয় করবার প্রচেষ্টা ব্যাহত হচ্ছে, এর চেয়ে হাস্যাস্পদ পুঞ্জীভূত অপরাধ আর কিছু হতে পারে না। কিন্তু, তবু আমাদের দেশের লোকেরা এটা ঠিক্ বোঝেন বলে মনে হয় না। কারণ দেখা যায়, ভারত-চিত্রকলার যে-সব নিদর্শন, বিশেষ করে প্রবাসী, মডার্ণ-রিভিউতে বের হতো, সে-গুলি অন্য কোনো কাগজে কেউ উল্লেখমাত্র করেননি। সোসাইটির প্রদর্শনীর সম্পর্কে মন্তব্য প্রবাসী, মডার্ণ-রিভিউ-এ বেরোবার আগেও সাধারণতঃ কেউ করতে চাইতেন না। কেউ করলেও, সেগুলি প্রবাসী, মডার্ণ-রিভিউ-এ ছাপা হবার পরে, বা, প্রদর্শনীর তারিখ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে। মনে হয়, ছবি বুঝবার বেলাতেও অন্য জিনিসের মতো, পূর্ব-সংস্কার বা ধারণা, খেয়াল-খুশি, বা, বড়লোক-ঘেঁষা চালবাজির খেলই প্রধান হয়ে ওঠে।

।। সোসাইটিতে ও শান্তিনিকেতনে শিক্ষক শ্রীনন্দলাল, ১৯১৮ —ফেব্রুয়ারী, ১৯২০ ।।

সোসাইটির অভিজ্ঞতা সম্পর্কে এবারে শ্রীনন্দলালের নিজের কথা বলা হচ্ছে : —

'অবনীবাবুর বাড়িতে কাজ করতে করতেই আমি সোসাইটিতে যাই। সে হলো ১৯১৮ সালের কথা। ১৯১৭ সালে আমার পিসতুতো ভাই সুরেন শান্তিনিকেতনে এসে জয়েন করেছিলেন। আমার পরিবার তখন হাতীবাগানের বাড়ি থেকে শান্তিনিকেতনে আনাগোনা করেন। বড়ো ছেলে বিশ্বরূপ পড়ে শান্তিনিকেতনে ১৯১৮ সালের গোড়ার দিকে। বড়ো মেয়ে গৌরী পড়তো তখন সিস্টার নিবেদিতার স্কুলে। কলকাতায় থাকতে থাকতে এই সময়ে আমার ছোট ছেলে গোরার হলো রক্ত-আমাশয় ১৯১৮ সালের শেষের দিকে। নানাদিক ভেবে তখন আমি আমার পরিবারবর্গকে শান্তিনিকেতনে এনে রাখার চেষ্টা করি ঐ সালে। শান্তিনিকেতনে গুরুদেবকে আমি চিঠি লিখলুম, —আপনার ওখানে আশ্রয় দিলে আমার ছোট ছেলে আর স্ত্রীকে নিয়ে গিয়ে রেখে আসি। আমার চিঠির উত্তরে গুরুদেব শান্তিনিকেতন থেকে সঙ্গে সঙ্গে লিখলেন, —উত্তরায়ণে ওদের এনে রাখ। আমি লিখলুম, —না, উত্তরায়ণে অতো নিকটে যেতে আমার সঙ্কোচ হয়, আমাকে অন্য কোথাও দিন। এর পরে আমি ওদের নিয়ে শান্তিনিকেতনে এলুম। তখন 'নেবুকুঞ্জে' থাকতেন কবির ছোটো মেয়ে মীরা দেবী। ঐ ঘরেরই একটা কামরায় উঠলুম আমরা এসে —দু'তিন দিনের জন্যে। নেবুকুঞ্জ থেকে আমরা উঠে গেলুম 'দেহলী'র পশ্চিমে 'নতুন বাড়ি'তে —নেপালবাবুর অংশে। তৃতীয় দফায় থাকা হয়েছিল —প্রাক্তন ছাত্রদের আস্তানায়। প্রাক্তন ছাত্রদের এই টিনে-ছাওয়া বাড়িটাকে তখন গোছগাছ করতে লাগলো। এই বাড়িটি হলো শিমূলগাছের কাছে। আমি শান্তিনিকেতনে 'নতুন বাড়িতে' সেবারে আমার পরিবারবর্গকে রেখে কলকাতায় ফিরে গেলুম।

'এই সময়ে (১৯১৮ ?) কলকাতায় সমবায় ম্যান্‌সনে (১৯১৩)

আর্ট সোসাইটি উঠে এসে বসল। লর্ড রোনাল্‌ড্‌শের সরকারী অর্থ-সাহায্যের আশ্বাস পেয়ে, ৬নং হগ্‌ স্ট্রিটের হিন্দুস্থান-সমবায়-বীমা-মণ্ডলীর নিজ-সম্পত্তি 'সমবায় সৌধে' একটি বড়ো ফ্ল্যাট্‌ ভাড়া নিয়ে সোসাইটি নানাভাবে তার কর্মপ্রণালী প্রসার করতে শুরু করে দিলে।

[হিন্দুস্থান-বীমা-মণ্ডলী ১৩২০ (১৯১৩) সালে নিজের বাড়িতে উঠে আসেন। এই অট্টালিকা আট লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়। Stephen Wilkinson এই সমবায়-সৌধের স্থপতি। 'ইঞ্জিনীয়ারিং জার্ণেল'-এর মতে, এতো বড়ো অট্টালিকা সমগ্র ভারতে এই প্রথম। এই অট্টালিকা নির্মাণ করেছিলেন বাঙ্গালীর আর একটি স্বদেশী কোম্পানী —'ধর্ম সমবায়'।]

'এই সময়ে আর্ট সোসাইটির কাজ চালাবার জন্যে রোনাল্‌ড্‌শে সাহেব সরকারীভাবে কুড়ি হাজার টাকা বরাদ্দ করেছিলেন। তার মধ্যে অর্ধেক নিতেন ও. সি. গাঙ্গুলী সোসাইটির পত্রিকা 'রূপম্‌' প্রকাশের জন্যে। আর বাকি দশ হাজার টাকা দিয়ে সমবায় ম্যান্‌সনে সোসাইটির খরচ চলতো। গগনবাবুর সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে রোনাল্ডশে সাহেব টাকা দিতেন। এই বাড়িতে কিছুদিনের মধ্যে সোসাইটির পরিচালনায় চিত্রকলা-শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। অবনীবাবু হলেন প্রধান অধ্যক্ষ ও পরিচালক। গগনবাবু ছিলেন তাঁর প্রধান সহযোগী।

'সমবায় ম্যান্‌সনের সোসাইটীতে আমি এ্যাপয়েন্‌টেড্‌ হলুম। বেতন স্থির হলো মাসে দু'শো টাকা করে। এতে হলো কি, তখন সত্যেন দত্তর সেই 'জাপানী হাসির গান-টা —

(রাগিণী রাপ্পা বুশি)

অতি বড় হাবাতে —এই
আমি গো এক্‌টা;
আমিই আবার কুড়িয়ে পেলাম
মনি-ব্যাগটা!
চাঁদেরি আলোতে দেখি —
আরে ছ্যা —এ কী! —
ট্যাম্‌গাড়ী-চাপা-পড়া
ব্যাঙ্‌ চ্যাপ্‌টা।

(কোরাস) আরে ছোঃ ছো —ছোঃ
(বিউগ্‌ল্) তো গো —তোগ্‌গো —তো।

পথে পথে গেয়ে বেড়াবার অবস্থা আমাদের খানিক কেটে গেল।

'এই সময়ে সোসাইটীতে আমার সঙ্গে আরও এ্যাপয়েন্‌টেড্ হলেন —ক্ষিতীন মজুমদার, আর পরে হলেন শৈলেন দে আর ওড়িষ্যার ভাস্কর গিরিধারীলাল মহাপাত্র। গগনবাবু হলেন সোসাইটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক। প্রভাত চট্টোপাধ্যায় ('বাঁটুলবাবু') হলেন সেক্রেটারী। ইনি হচ্ছেন গগনবাবুর জামাই। এর পরে গগনবাবুর ছেলে নবেন্দ্রনাথ সেক্রেটারী হয়েছিলেন। নবেন্দ্রনাথের পরে সেক্রেটারী হলেন সমরেন্দ্রনাথের ছেলে ব্রতীন্দ্রনাথ। হেড্ আর্টিস্ট্ হলুম আমি। অবনীবাবু হলেন আর্ট ডিরেক্টার। আর্ট প্রফেসর হলুম আমরা পাঁচজন —আমি, শৈলেন দে, চঞ্চল ব্যানার্জী, ক্ষিতীন মজুমদার আর গিরিধারী মহাপাত্র। গিরিধারী মহাপাত্র শেখাতেন স্কাল্‌চার। তখন সোসাইটির ছাত্র ছিলেন সাত জন —বাঙ্গালী ছাত্র হলেন কালীপদ, প্রমোদ চাটুজ্জে, দেবপ্রসাদ রায়চৌধুরী; লাহোর থেকে পাঞ্জাবী ছাত্র এলেন রূপকৃষ্ণ; মালাবার থেকে ছাত্র হয়ে এলেন কৃষ্ণ ওয়াড়িয়র আর নটেশম্; অন্ধ্র থেকে এলেন নাগেশ্বর রাও। —এঁদের নিয়েই আরম্ভ হলো সোসাইটির ক্লাস।

'দশটা-পাঁচটা পর্যন্ত ওখানে কাজ করতুম আমরা। সোসাইটিতে আমরা কেউ থাকতুম না। ক্ষিতীন থাকতেন একটা মেসে। শৈলেন যাতায়াত করতেন তাঁর শিমলের বাড়ি থেকে। আমি যাতায়াত করতুম আমাদের হাতীবাগানের বাড়ি থেকে (১৯১৮)। শ্রীসুরেন আগেই (১৯১৭) চলে এসেছিলেন শান্তিনিকেতনে। কলকাতায় থাকতে মাঝে মাঝে যেতেন তিনি সোসাইটিতে।

'অবনীবাবু একটা প্রাইমাস্ স্টোভ্ কিনে দিয়েছিলেন আমাদের ব্যবহারের জন্যে —যদি রান্না-বান্নার দরকার হয় কখনো। সেই স্টোভে আমরা শখ করে অনেক সময়ে মাংস-টাংস রান্না করে খেতুম। মাদুর আর ডেস্ক নিয়ে ওখানে কাজে বসতো ছাত্রেরা। আমরা শান্তিনিকেতন-কলাভবনে এখন (১৯৫৫) যে-ভাবে বসবার ব্যবস্থা করেছি —এই রকম ভাবে। আমাদের কাজ ওখানে চলতে লাগলো। সোসাইটির ত্রৈমাসিক

মুখপত্র 'রূপম্' বের করলেন ও. সি. গাঙ্গুলী ১৯২০ সালের জানুয়ারী মাস থেকে। আমাদের মূল ছবির এদেশে বিদেশে প্রিন্ট্ করিয়ে যে-গুলো 'রূপমে' ছাপা হতো, সেগুলো আবার আলাদা করে বিক্রীও করতেন ওঁরা। সোসাইটির শিল্পীদেরও কিনতে হতো সেই প্রিন্ট্।

'লর্ড কারমাইকেল সাহেব অবসর নিয়ে চলে যাবার পরে, লর্ড রোনাল্ড্শে ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটিকে অর্থ ও উৎসাহ জুগিয়ে নতুনভাবে পরিচালনা করতে লাগলেন। রোনাল্ড্শে সাহেবের বিশেষ আগ্রহের জন্যেই অবনীবাবুর অনুমতি নিয়ে আমি সোসাইটিতে চাকরী নিয়েছিলুম। ওখানে গিয়ে আমি প্রস্তাব করলুম, —ছাত্রদের আমি শেখাব আমার নিজের পদ্ধতিমতে। ওঁদের রুটিন্ পুরোপুরি মানবো না।

'আমাকে নেবার পরে, সোসাইটিতে কাজ চালালুম দেড় বছর (১৯১৮ জানুয়ারী থেকে জুন ১৯১৯)। এই সময়ে গগনবাবু বললেন, —একটা সিস্টেম্ তো দরকার, গভের্ণমেণ্টের ব্যাপার, টাকা-কড়ি আসছে, দান আস্ছে; শেখাবার পদ্ধতি একটা তৈরি করতে হবে। —ব্ল্যাক্বোর্ড চাই, কপি-বুকের মডেল থেকে ড্রইং শেখাতে হবে —এই ধরনের সব কথা বললেন। গগনবাবুই এই সব নিয়ম-টিয়ম আমাকে বুঝিয়ে বলতে লাগলেন। আমি সব শুনে তাঁকে বললুম, —এতো সব বাঁধা-বাঁধির নিয়ম-কানুন আগে তো কৈ ছিল না।

'যাই হোক্, মাঝে মাঝে দেখতুম, একজন অফিসার এসে আমাদের সব কাজ দেখতো, তার নোট বই বের করে কি-যেন সব টুকতো। ওখানে শিক্ষক-ছাত্রেরা অনেকেই দেরি করে আসতো। আমি নিজে হেড্ আর্টিস্ট্ হয়েও ও-সব লক্ষ্য করতুম না। আমি ভাবতুম, —আর্টিস্ট্দের আবার সময়ের অতো বাঁধা-বাঁধি কিসের।

'১৯১৯ সালের গ্রীষ্মের সময়ে আমি আছি শান্তিনিকেতনে। গগনবাবু কলকাতা থেকে আমাকে চিঠি লিখে জানালেন —সোসাটিতে ক্লাস চালাবার জন্যে রুটীন তৈরি করতে হবে। আমি তাঁকে উত্তরে লিখলুম, —অবনীবাবু যেমন করে আমাদের শিখিয়েছিলেন, আমরা সেইভাবেই চলছি। তবে অবনীবাবু যদি এখন আবার নতুন কথা বলেন, তাঁর মতেই আমরা চলবো। কিন্তু, আমার এই চিঠির জবাবে

উত্তর যা এল, সেটা অবশ্য আমার পক্ষে আর মানিয়ে নেবার নয়। সে-চিঠির মোদ্দা কথা হলো এই —আচ্ছা, তাহলে এই গ্রীষ্মের ছুটীর পরে তুমি অব্যাহতি পেতে পারো। এর পরে, মতের মিল হলো না বলে, চাকরী ছেড়ে দিলুম, —এই রকম বয়ান লিখে Resignation letter পাঠিয়ে দিলুম। তখন সুরেন ঠাকুর মশায় আমাকে জানালেন, —এই চিঠির ভাষাটা বড়ো strong হয়ে গেছে। মতের মিল হয়নি, —এ-কথা তুমি সরকারকে বলতে পারো না। এর পরে, স্বয়ং সুরেনবাবুই আমার হয়ে চিঠির একটা ড্রাফট্ করে দিলেন, —আমার টাউন ভালো লাগে না, শরীর অসুস্থ হয়েছে, শরীর সুস্থ হলে আশা করি পুনরায় চাকরীতে যোগ দিতে পারব —এই রকম সব মামুলী গতের কৈফিয়ৎ লিখে।

॥ 'শান্তিনিকেতন'-পত্রিকায় বিশ্বভারতীর কলা-বিভাগের সংবাদ ॥

১৩২৫ সালের ৮ই পৌষ আশ্রমের বার্ষিক উৎসবের দিনে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা হয়। এবং ১৩২৬ সালের ১৮ই আষাঢ়ের নিয়মানুসারে এর কাজ আরম্ভ হয়। ১৩২৬ সালের (১৯১৯) 'শান্তিনিকেতন'-পত্রিকায় (প্রথম বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা) একটি বিজ্ঞপ্তি বের হলো। —বিজ্ঞপ্তি : শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু ও সুরেন্দ্রনাথ কর উপযুক্ত ছাত্রদিগকে চিত্রবিদ্যা শিখাইবেন।

শ্রীযুক্ত C. F. Andrews ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষাদানের ভার লইবেন। এবং শ্রীযুক্ত ভীমরাও ও দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর সঙ্গীত শিখাইতে প্রস্তুত আছেন।

১৩২৬ সালের শ্রাবণ-সংখ্যায় প্রকাশিত সংবাদ : শ্রীমান নন্দলাল বসু ও সুরেন্দ্রনাথ কর চিত্রবিদ্যা শিক্ষা দিতে প্রস্তুত হয়েচেন ; দূরদেশ হতেও তাঁদের ছাত্র এসে জুট্‌চে। ...চিত্রবিদ্যা —অধ্যাপক শ্রীনন্দলাল বসু ও শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর।

সংবাদ। সম্প্রতি চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয় বিশ্বভারতীর কার্যে আশ্রমে আসিয়া যোগদান করিয়াছেন।

ঘণ্টার দোলস্তম্ভটি সারনাথের প্রবেশদ্বারের আদর্শে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ করের পরিকল্পনা অনুসারে প্রস্তুত হইয়াছে।

আশ্বিন ও কার্তিক, ১৩২৬

১৩২৬ আশ্বিন ৬, 'শারদোৎসবের' অভিনয় হইবে। পূজনীয় গুরুদেব 'সন্ন্যাসী'র ভূমিকা গ্রহণ করিবেন।

১৩২৬ সালের অগ্রহায়ন সংখ্যায় গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হলো, বিষয় —'কলাবিদ্যা'।

॥ রবীন্দ্রনাথের 'কলাবিদ্যা'-চিন্তা, ১৯১৯ ॥

'...আমাদের দেশের বিদ্যা অভাবের অনুচর। ইংরেজি শিখিলে চাকুরী হইবে ও রাজসম্মানের সুযোগ ঘটিবে, দরিদ্রের এই মনোরথ আমাদের দেশের বিদ্যাকে চালনা করিতেছে। পাছে সেই লক্ষ্যসাধন হইতে লেশমাত্র চিত্তবিক্ষেপ হয় এই ভাবনায় আমাদের দেশের লোক ব্যাকুল। এই লক্ষ্য সাধনের কাছে দেশের সমস্ত মহত্তর কল্যাণকে বলিদান করিতে আমাদের কিছুমাত্র সঙ্কোচ নাই!

ইংরেজ ত ভাষা ভূগোল ইতিহাস গণিত বিজ্ঞান সবই শিখেতেছে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত চিত্রকলা ও অন্যান্য সকল কলাবিদ্যাই শিখিতেছে। এই সকল ললিত কলাশিক্ষা দ্বারা তাহার পৌরুষ খর্ব হইতেছে এমন প্রমাণ হয় না। সঙ্গীতনিপুণ বলিয়া জর্মান জাতি অস্ত্রচালনায় অলস বা বিজ্ঞানচর্চায় পিছপাও একথা কে বলিবে? বস্তুত আনন্দ প্রকাশ জীবনীশক্তির প্রবলতারই প্রকাশ। এই আনন্দ প্রকাশের পথগুলিকে মারিয়া দিলে জাতির জীবনীশক্তিকেই ক্ষীণ করিয়া দেওয়া হয়। যে লোক কাঠের কারবার লইয়া আছে সে মনে করিতে পারে গাছের পক্ষে ফুল-ফল পাতাগুলো সৌখীনতা মাত্র, উহারা শক্তির অপব্যয়, আসল সারবান জিনিষ হইতেছে গাছের কাষ্ঠ অংশ। একথা ভুলিয়া যায় সে উদ্ভিদরাজ্য হইতে ফুল যদি বিলুপ্ত হয় তবে কাঠও তাহার সহমরণে যাইবে। তেমনি যে জাতি আনন্দ করিতে ভোলে সে জাতি কাজ করিতেও ভোলে। জাপানী কাজ করিতে নিরলস, প্রাণ দিতে নির্ভীক, কিন্তু চেরিফুল ফোটার সৌন্দর্য-সম্ভোগ লইয়া দেশের ছেলে বুড়ো সকলেই উৎসব করে এবং চিত্রকলার পরম মূল্য বোঝে না এমন মূঢ় সে দেশে কেহ নাই। আমাদের দেশেই আনন্দকে বিজ্ঞলোকে ভয় করে, সৌন্দর্যভোগকে তাহারা চাপল্য মনে করে এবং কলাবিদ্যাকে অপবিদ্যা ও কাজের বিঘ্নকর বলিয়া জানে। ইহা কেবলমাত্র আমাদের মজ্জাগত দীনতার লক্ষণ। ইহাতে আমাদের প্রকৃত কর্মশক্তিকেই দুর্বল করিতেছে।

আমাদের দেশের শিক্ষার মধ্যে এই যে দারিদ্র্য তাহার লক্ষণ ও ফল আমাদের শান্তিনিকেতনের বালকদের মধ্যেও দেখিতে পাই। এখানকার বিদ্যালয়ে সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যা শিখাইবার ভাল ব্যবস্থাই আছে। ছেলেদের অনেকেরই গান গাহিবার, ছবি আঁকিবার স্বাভাবিক শক্তি থাকে। যত দিন তাহারা নীচের ক্লাসে পড়ে ততদিন তাহাদিগকে গান গাওয়া বা ছবি আঁকা সেখানো শক্ত হয় না, ইহাতে তাহারা আনন্দই বোধ করে। কিন্তু উপরের ক্লাসে উঠিবামাত্র আমাদের দেশের শিক্ষার লক্ষ্য তাহারা বুঝিতে পারে, ইহার অন্তর্নিহিত দীনতা তাহাদিগকে আক্রমণ করে। তখন হইতে পরীক্ষার পড়ার বাহিরের এই সমস্ত শিক্ষার বিরুদ্ধে তাহাদের মন বাঁকিয়া বসে। অন্য বিদ্যার প্রতি তাহাদের অশ্রদ্ধা জন্মে। ইহার কারণ ‟ সমস্ত সমাজের মধ্যে যে শিক্ষাগুলির প্রতি ঔদাসীন্য আছে একটু বয়স হইলে ছাত্রদের মনেও সেইসব শিক্ষার প্রতি ঔদাসীন্য সঞ্চারিত হয়। এ কেবল আমাদের এই হতভাগ্য দেশের অন্তর-বাহিরের দারিদ্র্যেরই লক্ষণ।

বাল্যকাল হইতেই আমাদের ভদ্রসম্প্রদায়ের লোকেরা এইরূপে কলাবিদ্যার সংস্রব হইতে দূরে থাকেন। ইহাতে দেশের যে কত বড় ক্ষতি হইতেছে তাহা অনুভব করিবার শক্তি পর্যন্ত তাঁহারা হারাইয়া ফেলেন। কিছুদিন হইল য়ুরোপের চিত্রকলার নকল ছাড়িয়া দিয়া আমাদের দেশের একদল চিত্রকর ভারতীয় চিত্রকলার অনুসরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের এই চেষ্টা য়ুরোপীয় গুণীদের নিকট সমাদর পাইয়াছে, আর তাঁহাদের অনেকে বিদেশে রসজ্ঞদের নিকটে খ্যাতি পাইয়াছেন। কিন্তু আমাদের দেশে এতকাল পর্যন্ত তাঁহারা কিরূপ অশ্রদ্ধা ও বিদ্রূপ সহিতেছেন তাহা জানা আছে। ইহার একমাত্র কারণ, আমাদের নিজের দেশের চিত্রকলা বলিয়া কোনো পদার্থ আছে ইহা আমাদের জানাই নাই —সে চিত্রকলার মর্যাদা বুঝিবার মতো কোনো শিক্ষাই হয় নাই। য়ুরোপের নিকৃষ্ট শ্রেণীর চিত্রের শস্তা নমুনা ছাড়া আর কিছু আমরা দেখিতে পাই না ; আর সেখানকার ভাল ছবিও যেমন দেখিনা তেমনি সেখানকার ছবির বিচার আলোচনাও আমরা শুনিতে পাই না। সুতরাং য়ুরোপীয়

চিত্রেরও উৎকর্ষ যাচাই করিবার উপায় আমাদের হাতে নাই।

আর সঙ্গীতের দুর্গতির কথা একবার ভাবিয়া দেখ। কন্সর্ট বলিয়া যে কাংস্যক্রেঙ্কার ঝঙ্কৃত অত্যাচারকে আমরা পাড়ায় পাড়ায় সঙ্গীত বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছি তাহার মত বর্বরতা আর কিছুই নাই। ভারতীয় সঙ্গীতের প্রাণ ইহাতে ত নাইই, তাহার পরে 'ইহাকে যদি আমরা য়ুরোপীয় সঙ্গীতের নকল বলিয়া কল্পনা করি তবে সেও একটা অতি অন্যায় লাইবেল। 'বিবাহসভায় ও শোভাযাত্রায় ব্যাণ্ডের সঙ্গে শানাইয়ের ধাক্কা লাগাইয়া দিয়া সঙ্গীতের যে মহামারী ব্যাপার বাধাইয়া দেওয়াকে উৎসবের অঙ্গ বলিয়া আমরা মনে করি সে কি কোনোমতেই সম্ভবপর হইত যদি সঙ্গীতকলার প্রতি আমাদের কিছুমাত্র দরদ থাকিত?

দেশের উদ্বোধনের কথা আমরা আজকাল সর্বদাই বলিয়া থাকি। মনে করিয়া থাকি সেই উদ্বোধন কেবল রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনসভায়। অর্থাৎ কেবল অভাবের ক্রন্দনে, দরিদ্রের প্রার্থনায়। এই আমাদের মজ্জাগত ভিক্ষুকতায় আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, যেখানে দেশের আপন সম্পদ নিহিত সেইখানেই দেশের আপন গৌরব প্রসুপ্ত আছে। সেই সম্পদ যতই উদ্ঘাটিত হইবে আমাদের গৌরবের ততই উদ্বোধন হইবে। আমাদের নব উদ্বোধনের উৎসব বিলাতী গোরার বাদ্যে অথবা দেশী সঙ্গীতের হাড়গোড় ভাঙ্গা একটা বিরূপ ব্যাপারের দ্বারা সম্পন্ন হইবে না। আর আমাদের দেশের নির্বাসিত লক্ষ্মীকে নতুন আবাহনকালে মন্দিরের দ্বারে যে আলপনা আঁকিতে হইবে তার ডিজাইন কি জর্মানি হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিব?

বিশ্বভারতী যদি প্রতিষ্ঠিত হয় তবে ভারতীয় সঙ্গীত ও চিত্রকলা শিক্ষা তাহার প্রধান অঙ্গ হইবে এই আমাদের সঙ্কল্প হউক।'

॥ অসিতকুমার হালদারের চিত্রলিপি, ১৯১৫-১৯ ॥

ওদিকে কলকাতায় ঠাকুরবাড়ির আর সোসাইটির ইঁট-কাঠের খাঁচায় বসে বসে শ্রীনন্দলালের মনে জেগে উঠতো নিরিবিলি শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্য-আশ্রমের ধ্যানগম্ভীর দিগন্ত-প্রসারিত পরিবেশ! শান্তিনিকেতনের চিত্রবিদ্যার তৎকালীন অধ্যাপক অসিতকুমার মাঝে মাঝে আশ্রমের চিত্রলিপি পাঠিয়ে শ্রীনন্দলালের ঐ ভাবনাটিকে উস্কে দিতেন। শ্রীনন্দলাল যেমন সোসাইটির আলসে থেকে ছিপ ফেলে বঁড়শিতে নোটের তাড়া তোলার ছবি লিখে অসিতকুমারকে পাঠাতেন, তেমনি অসিতকুমারও তাঁকে সেকালের শান্তিনিকেতনের শান্ত আশ্রম পরিবেশের টোপ ধরিয়ে পত্র দিতেন।—

১৯১৪ সালে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ শ্রীনন্দলালের অভ্যর্থনা করেছিলেন। ১৯১৫ সাল থেকে অসিতকুমারের সঙ্গে শ্রীনন্দলালের 'সচিত্র' কার্ড লেখা শুরু হয়। শ্রীনন্দলাল লিখেছিলেন, —'ভাই অসিত, ...তুমি একটি ছবি লেখবার আস্তানা করচ, বেশ হচ্ছে। তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক। আমি পাড়াগেঁয়ে একটু snperstitious তুমি ত জান? যাহাতে কেহ নজর না দেয় সেইজন্য ছেঁড়া জুতো, মুড়ো ঝাঁটা, ভাঙ্গা কুলো (এই তিনটি কর্মধার ও পরম-ত্যাগী, ইঁহাদের সত্য ইত্যাদি করে দেবার গুণ বর্তমান আছে) একটি উচ্চ বাঁশে টাঙ্গাইয়া দিবে এবং নমস্কার করে কার্য আরম্ভ করবে, তাহলে কার্য নির্বিঘ্নে চলবে। ইতি —নন্দ।'

শ্রীনন্দলাল কল্পনার চক্ষে আশ্রম কেমন দেখছেন, তার স্কেচ্ করে অসিতকুমারকে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর কল্পিত আশ্রমে 'ধানের মড়াই' আর 'আশ্রম-মৃগই' ছিল অতিরিক্ত বস্তু; নতুবা শান্তিনিকেতন-আশ্রম তখন সত্যিই একটি তপোবনের মতই দেখতে ছিল। খড়ের চালের ঘরে বাস আর তরুতলে অধ্যয়ন —এই ছিল তার প্রকৃতি।

শ্রীনন্দলালকে লেখা অসিতকুমারের ঐ সময়ের একখানি চিত্রলিপির বয়ান এই রকম:—'ভাই নন্দ, তোকে আশ্রমের একটি চিত্র ঘরে বসে মন থেকে যতটা পারলুম দেখালুম। পরে আরও পাঠাব। এখানে

হরিণ নেই বটে কিন্তু একটা ময়ূর মাঝে মাঝে আমার ঘরে আসে। আমি নিচের লেখা ঘরটির বাঁদিকে থাকি আর রবিদা ঐ ডানদিকের দোতলায় পূর্বে থাক্‌তেন পরে থাকবেন —তোর অসিত।' —

—এই পত্রখানির সঙ্গে অসিতকুমারের অাঁকা দু'টি স্কেচ্‌ আছে। এই স্কেচ্‌ দু'টিতে দেখা যাবে, (১) **সেকালের** (১৯১৫) **শান্তিনিকেতনে ছাত্রদের পাঠ পড়ার চিত্র।** আর (২) **রবীন্দ্রনাথের** মাত্র একটি খাট আর একটি জলচৌকি পাতবার মতন সঙ্কীর্ণতম আবাস —পাকা এক-কুঠুরি দোতলা —খড়ে-ছাওয়া মাঠকোঠা **'দেহলি'**-বাড়ি, আর তার পাশে একতলা **'মধুমালতী কুঞ্জের' একাংশ** —যে-ঘরে অসিতকুমার থাকতেন। —এই ঘরের সামনে ছিল একটি জবাফুলের গাছ। আর তার অন্যদিকে একটি খড়ো ঘরে থাকতেন পিয়ার্সন সাহেব। এই ঘর দু'টির ভেতরের দিকে পূর্ব-পশ্চিমে, লম্বা বেশি-কামরাওয়ালা ঘরটি ছিল অতিথিনিবাস। পিয়ার্সন সাহেবের ঘরটিতে পরে থাকতেন নেপালবাবু। তাঁর পরে, এই নতুন চাতাল-বাড়িটির এই অংশে শ্রীনন্দলালদের আস্তানা হয়েছিল (১৯১৮)। —এ-সব বিবরণ যথাসময়ে সবিস্তার দেওয়া যাবে।

শ্রীনন্দলাল বলেন, —'শান্তিনিকেতনে দ্বিতীয়বার এসে (১৯১৭) আমি অসিতকুমারকে দেখতে পাইনি। সে তখন জয়পুরে গেছে চাকরী নিয়ে। দ্বিতীয়বারে আমি এখানে এসে উঠলুম 'দেহলী'র পাশে নতুন চাতাল-বাড়িতে যে-ঘরে এখন (১৯৫৫) গোপাল বক্‌সী থাকেন। আমি আসার আগে, এই ঘরে থাকতেন নেপালবাবু। এই ঘরে আমার স্ত্রী আর বিশু থাকতো ১৯১৮ সালের শেষের দিক থেকে।

'১৯১৯ সালে আমি এখানে আসতুম প্রায় প্রতি সপ্তাহে। এলুম পুজোর সময়ে। ঐ সময়ে অভিনয় হলো 'শারদোৎসব'। ঐ নতুন 'চাতাল-বাড়ি'টিতেই উঠি এসে। সে হলো চকমিলান বাড়ি। ওখানে থাকতেন নেপালবাবু, ক্ষিতিবাবু আর সুধাকান্ত। নেপালবাবু তখন স্বদেশী করতে চলে গিয়েছিলেন। তাঁর অংশে ছিলুম আমি। খাটা-পায়খানা ছিল ওখানে তিন-বাড়ির একটা। তখন এসে দেখতে পেলুম. —আশ্রমবাস খুবই interesting —খুব মজার ব্যাপার। আমাদের হাট-



সেকালের শান্তিনিকেতনে ছাত্রদের পাঠ পড়ার ছত্র—অসিতকুমার হালদার

বাজার করে দিতো আমাদের লাগাও-পড়শী সুধাকান্ত। এক বাড়িতে যে-তরকারি রান্না হতো, তিন-বাড়ির সবারই পাতে পড়তো এসে সেই একই তরকারি। খেতে বসে দেখতুম, পাতে পাতে তিন-বাড়ির তরকারিই পরিবেশন হচ্ছে। এক বাড়িতে তিন প্রস্থ রান্না হলে, খাওয়া যায় ন' প্রস্থ। রান্না-বান্না, কুটনো-টুটনো সবই হতো একসঙ্গে। নতুন বাড়ির পুব-পাশের দোতলা 'দেহলী'-বাড়িতে ওপর-তলায় থাকতেন গুরুদেব। নগেন গাঙ্গুলী —গুরুদেবের জামাই তখন ছিলেন এখানে। দু-তিন দিন করে এখানে থেকে আমি চলে যেতুম।

'তারপরে এখানে এলুম পাকাপাকি থাকবো বলে, সে হলো ১৯২০ সালের মার্চ মাসের শেষের দিকে। সেবারে সোসাইটি থেকে আমার ছাত্র কৃষ্ণ ওয়াড়িয়র আমার সঙ্গে শান্তিনিকেতনে এলেন। আমার স্ত্রী তখন এখানেই আছেন —'নতুন বাড়ি'তে। গোরাও ছিল। বিশু পড়ছে এখানকার ইস্কুলে। এইবারে (১৯২০, মার্চ) যখন শান্তিনিকেতনে আসি, তখন বোলপুর স্টেশনে নেমে কুলির মাথায় ট্রাঙ্ক্ চাপিয়ে দিয়েছি —শান্তিনিকেতনে আসবো বলে। কুলি কিন্তু ট্রাঙ্ক মাথায় নিয়ে শ্রীনিকেতনের পথ ধরেছে। তখন আমি বললুম, —না হে, ওদিকে নয়, আমি শান্তিনিকেতন যাব। চৈত্র মাসের রোদে, চষা-ক্ষেতের ঢেলা ভেঙে, মাঠের ওপর দিয়ে, হুমৃটো পথে, অনেক ঘুরে শান্তিনিকেতনে এসে পৌঁছনো গেল। শান্তিনিকেতনে আমি সোজা রাস্তায় আসিনি ; এসেছি অনেক ঘুরে। আর জানো, আমার ট্রাঙ্ক সেবারে মাথায় বয়ে নিয়ে এসেছিল ছদ্মবেশী কুলি —আমাদের সুধাকান্ত। যাই হোক্, এখানে এসে পৌঁছনোর পরে, আমাকে যত্ন করে খাওয়ালেন-দাওয়ালেন আমাদের ঠানদি —ক্ষিতিমোহনবাবুর স্ত্রী।

'শান্তিনিকেতনে এসে অসিতকুমারের ছাত্রদের ভার নিলুম আমি। —গুরুদেবের তখন টাকার টানাটানি খুব। আমার দক্ষিণা স্থির হবে অভাস পেলুম সোসাইটির বেতন থেকে অনেক কম। আমার মন তখন বিশ্বভারতীর আদর্শে আর শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক পরিবেশে মশগুল। আমার পরিবারবর্গও এখানে। আমি এখানে এসে থেকে যাই, গুরুদেবেরও এই ইচ্ছা প্রবল। সুতরাং এক্ষেত্রে অর্থের চিন্তাটা যেন অবান্তর বলে

মনে হতে লাগলো। বিশেষ করে, গুরুদেবের মতন স্পর্শমণির যেখানে আবাস, সেখানে আমার মতন লোহা যে অনায়াসে এসে, তাঁর পরশ পাবার জন্যে আকুল হয়ে উঠবে, —সে-কথা বোধ হয়, না-বললেও তোমরা বুঝতে পারবে।'

বিধুশেখর ভট্টাচার্য মহাশয়ের লেখা বিশ্বভারতীর ষাণ্মাসিক বিবরণে (১৮ই আষাঢ় থেকে ৭ই পৌষ, ১৩২৬ সাল) এই সংবাদ পাওয়া যায়। —অধ্যাপক! শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর মহাশয় চিত্রকলা সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়াছেন।

...চিত্রকলা বিভাগে আমরা স্থানান্তর হইতে ৫টি ছাত্র পাইয়াছিলাম —মালাবার হইতে ১, মাদ্রাজ হইতে ১, পাঞ্জাব হইতে ১, ও আসাম হইতে ২। তাহা ছাড়া এখানকার বৃদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া বালক পর্যন্ত অনেকে ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন। মহিলাবর্গেরও ইহাতে বিশেষ উৎসাহ দেখা গিয়াছিল। বলিতে কি, অল্পদিনেই এই চিত্রকলা বিভাগে যেন একটা বস্তুতঃ প্রাণের সঞ্চার অনুভূত হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় যাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া ইহা ঘটিয়া উঠিতেছিল, তাঁহাকে আমরা আর এখানে রাখিতে পারি নাই। আমি আমাদের নন্দলালবাবুর কথা বলিতেছি, তাঁহার ও আমাদের উভয়েরই অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাকে এখানে হইতে স্থানান্তরে যাইতে হইয়াছে। তাঁহার অভাবে, এই বিভাগের ছাত্রসংখ্যা কমিতে আরম্ভ হইয়াছে, হইবারই কথা। তথাপি সুরেন্দ্রবাবুর উপর আমাদের বিশেষ আশা আছে, এবং আমরা ইহাও আশা করিতেছি যে, আরো একজন প্রতিষ্ঠিত চিত্রকরকে আমরা এখানে অধ্যাপকরূপে দেখিতে পারিব।

শান্তিনিকেতনের সর্বাধ্যক্ষ ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের লিখিত ১৩২৬ সালের মাঘ মাসে প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে :—চিত্র —গত বৎসর (১৯১৮।১৯) শ্রীযুক্ত নন্দলালবাবুর ও শ্রীযুক্ত সুরেন কর মহাশয়ের সহায়তায় চিত্রশিক্ষাটি চমৎকার জমিয়া উঠিয়াছিল। গুরুদেবের প্রস্তাবিত চিত্রপ্রদর্শনী মাঝে মাঝে হওয়ায় আশ্রমবাসী ছাত্রছাত্রীগণ চিত্রে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় নন্দলালবাবুকে এখান হইতে চলিয়া যাইতে হইল; তবে তিনি ভরসা দিয়াছেন যে, মাঝে



রবীন্দ্রনাথের দেহলী বাড়ি, মঞ্জু-মালতী কুঞ্জের একাংশ—অসিতকুমার হালদার

মাঝে আসিয়া উপদেশাদি দিবেন। আশা করা যায়, তাঁহার উপদেশ ও সুরেন কর মহাশয়ের চালনায়, চিত্রবিভাগ ভালই চলিবে।

এর পরে শান্তিনিকেতনে শ্রীপ্রমথনাথ বিশি-লিখিত ১৩২৬ সালের ফাল্গুন মাসের 'সংবাদ' এইরূপ ঃ— সংবাদ ১১। প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার বিশ্বভারতীর কার্যে যোগদান করিয়াছেন। তাঁহার সহিত তিনটি ছাত্র আসিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে একজন জৈন। সকলেই বিশ্বভারতীতে চিত্রকলা শিক্ষা করিতেছেন।

১০। ১৫ই ফেব্রুয়ারী [১৯২০] লর্ড রোনাল্ড্‌শের [শান্তিনিকেতনে] আগমন।…

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন-আশ্রম পরিচালনার ব্যাপারে সেকালে অর্থকৃচ্ছ্রতার সংবাদ সুপরিচিত। তখনকার ইংরেজ সরকার ভেবেছিলেন গুরুদেবের এই অনটনের সুযোগ নিয়ে কলকাতার আর্ট সোসাইটির মতন কবির বিদ্যালয়েও প্রভূত অর্থ সাহায্য করে 'পোয়েট্ লরিয়েটে'র মন ভিজিয়ে ফেলবেন। দেশের লোকও এতে কিঞ্চিৎ সন্তুষ্ট হবে; আর প্রথম মহাযুদ্ধের আগে-পরের পরিস্থিতিতে বাঙ্গালী স্বদেশীওয়ালাদের মনও রাজনীতি থেকে বিষয়ান্তরে আকৃষ্ট করা হবে। —সম্ভবতঃ এই রকম গোপন উদ্দেশ্য নিয়ে বঙ্গসরকারের শিল্পপ্রেমিক লাট লর্ড কারমাইকেল শান্তিনিকেতন-আশ্রমে এসেছিলেন ১৯১৫ সালের ২০-এ মার্চ। এর পরে শান্তিনিকেতনে এলেন ছোটলাট লর্ড রোনাল্ড্‌শে ১৯২০ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী।

লর্ড কারমাইকেল কলারসিক ছিলেন এবং গগনবাবু অবনীবাবুদের ছিলেন বিশেষ ভক্ত ও বন্ধু। তিনি অবসর নিয়ে বিলেতে ফেরবার সময়ে নব্যবঙ্গ-চিত্রকলার বহু নিদর্শন সংগ্রহ করে দেশে নিয়ে যাচ্ছিলেন ১৯১৭ সালে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে পারস্য-সাগরে জার্মান ডুবো-জাহাজ 'এম্‌ডেনের' টর্পেডোতে লাটসাহেবের লটবহরবাহী জাহাজখানি ডুবে যায়। তার সঙ্গে বাঙ্গালার রেনেসাঁ স্কুলের বহু

চিত্রকর্মেরও সলিল-সমাধি ঘটে। —শ্রীনন্দলালের চিত্র-বিবরণে এই ঘটনার উল্লেখ পূর্বে করা হয়েছে। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর মহাশয়ের ছবি ছিল ছ'খানি —লাটসাহেবের এই সংগ্রহে।

লর্ড রোনাল্ড্‌শে (Marquess of Zetland) শান্তিনিকেতন-আশ্রম দেখতে এলেন। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ তখন 'দ্বারিকের' ওপর-তলায় 'কলাভবনে' বসে রইলেন। আর লাটসাহেবকে সংবর্ধনা করে, আগবাড়িয়ে সঙ্গে নিয়ে এলেন রথীন্দ্রনাথ, দিনেন্দ্রনাথ, অসিতকুমার প্রভৃতি। 'দ্বারিকে' লাটসাহেবকে অভ্যর্থনা করা হলো মালা-চন্দন দিয়ে। লর্ড রোনাল্ড্‌শে রবীন্দ্রনাথকে একান্তভাবে অনুরোধ জানালেন, —তাঁর কাছ থেকে সরকারী অর্থ-সাহায্য গ্রহণ করবার জন্যে। কিন্তু সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় আশ্রম চালাতে রবীন্দ্রনাথ আদৌ সম্মত হলেন না। অবশ্য, তখন তাঁর টাকার টানাটানি চলছিল খুবই। কারণ, তখন বিশ্বভারতী-স্থাপনের দরুন আশ্রমের কাজ বিশেষ ব্যাপক হয়ে পড়েছিল। তথাপি রবীন্দ্রনাথ সরকারী শিক্ষাবিভাগের অর্থ গ্রহণ করে আশ্রমকে গড্ডালিকা-প্রবাহের মধ্যে ফেলে কোনোক্রমেই তাঁর মৌলিক আদর্শকে বানচাল করতে চাননি। সরকারী শিক্ষা-বিভাগের বাঁধা-নিয়মের বাইরে, বিশ্বভারতীর বিবিধ বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রনাথ আমরণ বজায় রেখে চলেছিলেন —সে-কথা সবাই জানেন।

শ্রীনন্দলাল বলেন, —'লাটসাহেবকে অভ্যর্থনা জানানো হলো মালা-চন্দন দিয়ে। গুরুদেব তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন একে একে। আমি তখন এখানে উপস্থিত। আমার প্রসঙ্গ আসতেই গুরুদেব বললেন —'Here is our artist —Babu Nandalal Bose'. এই কথা শুনেই লাটসাহেব বললেন, —'Oh, no, no, he is our artist। যাই হোক্, আদর-অভ্যর্থনা, বক্তৃতা-টক্তৃতার পরে আশ্রম ঘুরতে বেরনো হলো। আমি শুনতে পেলুম, —ছাতিমতলা পর্যন্ত যেতে যেতে দু-জনের মধ্যে সেই 'our artist'-এর দড়ি-টানাটানির জের চলছে। শেষে, লাটসাহেবের দাবী হলো যেন এই, আপনি poet Tagore, our artist নন্দলালকে নিয়ে এসে, আমাদের সোসাইটির কাজের স্কীম গড়বড় করে দিয়েছেন; তার 'reparation' দিতে হবে। —এ-কথা হলো ১৯২০ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখের। এর আগেই ১৯১৯ সালের গরমের

বন্ধের পর থেকে আমি সোসাইটিতে পদত্যাগ-পত্র পেশ করে দিয়েছিলুম —সুরেন ঠাকুর মহাশয়ের খসড়ামতে বয়ান লিখে।

'এর আগে খুড়ো-ভাইপো অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের মধ্যে অনেক চিঠি লেখালেখি হলো। সবশেষে রবীন্দ্রনাথ অবনীবাবুকে লিখেছিলেন —'সরকারী সাহায্য বিষময়, সরকারের প্রসাদপুষ্ট হয়ে সোসাইটি স্থায়ী হবে না, হতেও পারে না, অথচ এখানে আমি যে সৌধ গড়ে তুলতে চেয়েছি, নন্দলালকে নিয়ে গিয়ে, অবন, তুমি তার চুড়ো ভেঙ্গে দিলে'।

'আমি সোসাইটিতে যাবার পরে একদিন গগনবাবু বললেন, —আজ রোনাল্‌ড্‌শে আসবেন সোসাইটির কাজ দেখতে। তিনি এলে তোমরা সবাই তাঁকে স্যালিউট্‌ করবে। স্যালিউট্‌ করবে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে —এই রকম সব কেতা-দুরস্ত উপদেশ দিলেন গগনবাবু। তাঁর কথা শুনে আমি বললুম, —তা কেন, আমরা এ-সব করতে যাবো কেন। তার চেয়ে আমরা যে-যার নিজের কাজের জায়গায় কাজে থাকবো। সাহেব দেখবেন ঘুরে ঘুরে। আমার কথাটা গগনবাবুর মনঃপূত হলো না। কিন্তু আমি গোঁ ধরে বলতে, অবশেষে আমার জেদটাই বজায় হলো। তবে, বজায় তো হলো ; কিন্তু, তার ফল কি হলো জানো ? লাটসাহেব আমার স্টুডিওতে এসে আমার কাজ দেখে মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল।

'শিমলের শৈলেন আর হাতীবাগানের আমি সোসাইটিতে সারাদিন কাজ করে, ফেরবার পথে আসর জমাতুম মহেন্দ্র দত্তের ঘরে। এই মহিমবাবুর কথা আগে বলা হয়েছে। তাঁর সঙ্গে আলোচনা হতো আধ্যাত্মিক বিষয়ে, আর শিল্পকলা নিয়ে। মহিমবাবু আমাদের সৌন্দর্যতত্ত্ব বোঝাতেন। বলতেন, সৌন্দর্য হবে সিন্‌সীয়ার আর হবে পবিত্র। আমাদের সন্ধ্যায় এই আড্ডার প্রায়ই উপসংহার হতো মাংস ভোজন করে। কতো দেশ-বিদেশের গল্প বলতেন তিনি। তিনি হেঁটে এসেছিলেন বিলেত থেকে ভারতবর্ষে। ফেরবার পথে নানান্‌ দেশ দেখেছিলেন, আর নানান্‌ ভাষা শিখেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দজী তখন বিলেতে। সেখেনে ভাইকে দেখে বিরক্ত হওয়ায়, অভিমানে মহিমবাবু সোজা

হেঁটে এদেশে ফিরে এসেছিলেন। মহিমবাবু এই ঘটনাটিকে ভাবতেন সাঁপে বর হয়ে যাবার মতন।

'সোসাইটির অফিস ছিল প্রভাত চট্টোপাধ্যায় ওরফে বাঁটুলবাবুর তাঁবে। প্রভাত চট্টোপাধ্যায় হলেন গগনবাবুর বড়ো জামাই। এই সময়ে অফিসে এলো বড়ো বড়ো টেবিল, ভালো ভালো চেয়ার, আরো অনেক সব আসবাব। কিন্তু আমাদের সম্বল ছিল মাত্র সেই ভাঙ্গা ডেক্স, মাটীর বাসন আর ছেঁড়া আসন। আমাদের ভাগ্যে সে আর ঘুচলো না। —অফিসের আসবাব দেখে আমরা সবাই বেঁকে বসলুম। আমরাও ওঁদের দেখে requisition করলুম। লিখে পাঠালুম, ঐ রকম ডেক্স, শতরঞ্চি, আলমারি এই সবের জন্যে একটা লিষ্টি করে। তখন গগনবাবু আমাদের এই দাবী সমর্থন করে বললেন, —হাঁ, এ-সব তো চাই।

'আমাদের ছবির প্রিন্ট্ খুব বিক্রী হতো। কিন্তু আমাদিকেও পয়সা দিয়ে পুরো দামে কিনতে হতো আমাদেরই ছবির সেই সব প্রিন্ট্। আমরা তখন বললুম, —আমাদের ছবির প্রিন্ট্ আমরা পয়সা দিয়ে কিনবো কেন। অবশ্য, অমনি না-দিতে পারো কন্‌সেশন্ রেটে দিতে হবে। আর জানো, এ্যাজিটেট্ করলেই কিছু-না-কিছু কাজ হবে। উপরন্তু, আমার মন তো তখন মুক্তি পেতেই আঁকুপাঁকু করছে। আমার সে-সময়কার মনের খবর খুঁটি-নাটি লিখে আমাদের অসিতকুমার লক্ষ্ণৌ থেকে তোমাকে তো জানিয়েছেন (১৯৫৫)। সোসাইটি থেকে অসিতকুমারকে শান্তিনিকেতনে আমি অনেক চিঠি লিখে ছবি এঁকে পাঠিয়েছিলুম। তখন তাঁকে লেখা আমার সেই —বঁড়শিতে নোটের তাড়া-গাঁথা চিত্রলিপিগুলি দেখলেই আমার তখনকার মনের অবস্থাটা ঠিকঠিক্ বুঝতে পারবে।

'এদিকে সোসাইটির অফিস চলছে এলাহি কারখানায়। অফিসে অনাচারও চল্‌তো বৈকি। আমাদের ব্যানার্জী ক্যারিকেচার করতে পারতেন খুব ভালো। তন্ত্রশাস্ত্রে তাঁর দখল না থাকলেও পঞ্চ ম-কারে কিন্তু তাঁর আসক্তি ছিল প্রচণ্ড। গুরুবাড়ির ব্র, আর ন-কেও তিনি ভজিয়েছিলেন। আসতেন তাঁরা মাঝে মাঝে। আপিসটাই শেষ-মেষে

হয়ে উঠলো একটা আড্ডাখানা। তবে জানো তো, আমাদের সেই পুরানো কথা, —অনাচার বেশিদিন গোপন থাকে না। ফলে হলো কি, হঠাৎ একদিন সব বাস্ট্ করলো। যদিও চলতো অনেক, চালাতো অনেকে, এর মূলাধার ছিলেন আমাদের ব্যানার্জী। আমি হেড্ আর্টিস্ট্ ছিলুম বলে আমাকে খবর দিতো গিয়ে —গিরিধারী মহাপাত্র —প্রত্যহ সন্ধ্যার পরে। একদিন ঘটনা চরমে উঠলো। আমাকে খবর দিলে গিরিধারী। আমি ভয়ানক চটে গিয়ে ডাকলুম দারোয়ানকে। তাকে হুকুম দিলুম —ওদের বের করে দিতে। আরও বলে দিলুম, —সন্ধ্যের পরে এখানে ওদের আসতে দেখলে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দেবে। দারোয়ানজী হেড্-আর্টিস্টের হুকুম তামিল করে চলতো নিয়মিত। এই ঘটনায় ওদের ওপর খুব বিরক্ত হয়েছিলেন অবনীবাবু। কিন্তু গগনবাবু কিছু বললেন না।

'আমি সোসাইটি ছেড়ে শান্তিনিকেতনে পাকাপাকিভাবে চলে আসার পরেও, সোসাইটিতে রয়ে গেলেন শৈলেন, ক্ষিতীন আর গিরিধারী। সকালের দিকে ছাত্রেরা শিখতে আসতো ক্লাসে। দুপুরে চলে যেতো খানিক। সেই খানিকের ফাঁকে আমরা একটু আয়েশ করে নিতুম। যেখানে কাজ করতুম সেখানে বসেই তখন খাওয়া হতো সোডা-ওয়াটার আর পান-বিড়ি। পান খাওয়াতো নিয়মিত উড়িষ্যার গিরিধারী মহাপাত্র। সে পান খাওয়াতো —চুয়া দিয়ে সাজা। খুব ভালো কীর্তন করতেন ক্ষিতীন। প্রতি দুপুরে আমাদের ঐ খানিকের আসর এতে জমে উঠতো খুব।

'সোসাইটিতে আমার শেষ-পর্বের কতকগুলি ঘটনার কথা মনে আছে। —মালাবারী ছাত্র ছিলেন আমাদের কৃষ্ণ ওয়াড়িয়র। তখন শান্তিনিকেতনের 'আদি কুটিরে' থাকতেন সদ্ধর্মবাগীশ ধর্মাধার রাজগুরু মহাস্থবির। তিনি পূর্বে ছিলেন সিংহলের আনন্দ-কলেজের অধ্যাপক। এখানে এসে অনাত্মবোধের সাধনা করতেন তিনি। আমাদের কৃষ্ণ সোসাইটি থেকে শান্তিনিকেতনে এসে তাঁর কাছে যৌগিক পদ্ধতি শিখতে লাগলো। শিল্পসাধনার পথ ভুলে যোগকৌশল শিখতে গেল সে। বৌদ্ধতন্ত্রমতে যোগক্রিয়ায় ষট্‌চক্রভেদ করতে করতে আমাদের কৃষ্ণের মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে গেল। আমি

শান্তিনিকেতনে এসে সব দেখে-শুনে ব্যাপারটা খুলে লিখলুম অবনীবাবুকে। উত্তরে তিনি আমাকে কলকাতা থেকে জানালেন, —ওকে পাঠিয়ে দাও এখানে। কৃষ্ণকে এখান থেকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া হলো। তাকে কাছে নিয়ে অবনীবাবু ধম্‌কালেন একচোট। কৃষ্ণের শরীরে অভাব হয়েছে নিউট্রিশনের —স্পষ্ট দেখতে পেলেন তিনি। বললেন তাঁকে, —ও-সব ছেড়ে দাও হে, আমি ওষুধ দেবো তোমাকে। সে-ওষুধ প্রতিদিন এসে খেয়ে যাবে আমার কাছে। কৃষ্ণ ছিল ভেজিটেরিয়ান, সেই ছিল তাঁর ভয়। যাই হোক, কৃষ্ণকে ওষুধ দেওয়া হলো —চিকেন্‌ ব্রথের বোতল —লেবেল-আঁটা। খেতে হবে রোজ দু-তিন ডোজ্‌ করে।

'কিন্তু নেশায় পেয়েছে কৃষ্ণকে ; চিকেন্‌ ব্রথে কি কাজ হবে। আমি ধরলুম একদিন তাকে। দেখি কি, কৃষ্ণ বসে আছে বাথরুমে লণ্ঠন জ্বেলে। বললুম এ-কথা অবনীবাবুকে। সব শুনে অবনীবাবু বিমর্ষ হয়ে বললেন, —'তাই তো হে'।

'মহিমবাবুর ঘরে যাতায়াত করতে লাগলুম কৃষ্ণকে নিয়ে। একদিন কৃষ্ণ মহিমবাবুকে বললে, —আমি সন্ন্যাসী হবো। কথাটা শুনে মহিমবাবুও তাকে ধমকালেন খুব। সে তখন গেল বেলুড়মঠে। প্রেসিডেণ্ট তখন স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজ। কৃষ্ণর কথা শুনে তিনিও ভাগিয়ে দিলেন তাকে। অবশেষে কৃষ্ণ এলো শান্তিনিকেতনে। এর মধ্যে গেরুয়া ধরেছে সে। সারাদিন বসে থাকে একাসনে। …সহসা কৃষ্ণ নিরুদ্দেশ হলো। আমি টেলিগ্রাম করলুম তার দেশের বাড়িতে। ছিল না সেখানে কেউ তার আপন বলতে। দেশের বাড়িতেও যায়নি সে। ১৯২১ সালে তখন বাগগুহা ঘুরে এসেছি আমরা। ওদেশে আমাদের তখন কিছু পরিচয় ছিল। বোম্বের একটা কাগজের কাটিং কে যেন পাঠিয়ে দিলেন আমাদের। তাতে একটা সংবাদ বের হয়েছিল —বাগকেভে শান্তিনিকেতনের একজন আর্টিস্ট্‌ মরে পড়ে আছে।

'নটেশন ছাত্র ছিল সোসাইটিতে। তখন আমি চলে এসেছি শান্তিনিকেতনে। অবনীবাবু আমাকে লিখে পাঠালেন, —নটেশন্‌ বেনারস বেড়াতে গিয়েছিল। বেনারসে গিয়ে তার কলেরা হয়েছে। সেখানে পড়েছিল সে কাশীর পাণ্ডাদের খপ্পরে। ক্রমাগত ডাল রুটি আর অখাদ্য-

কুখাদ্য খেয়ে খেয়ে তাঁকে কলেরায় ধরলো। খবরটা পেয়েই সাত-তাড়াতাড়ি আমি লিখে পাঠালুম —কলকাতার 'উদ্বোধন'-অফিসে। শরৎ মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে 'তার' করে দিলেন —কাশীর রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রমে। তৎ-দণ্ডে নটেশনের সেবার ব্যবস্থা হয়ে গেল —তাকে মিশনের হাসপাতালে এনে। সেরে উঠলো সে। কিন্তু তার কাল ফুরিয়ে এসেছিল। কলেরা থেকে বেঁচেও সেবারেই শেষ হয়ে গেল সে। রাত্রে ঘুমের ঘোরে খাট থেকে পড়ে গিয়ে হার্ট-ফেল করলে।

'নাগেশ রাও। সোসাইটিতে সে ছিল আমার ছাত্র। শেষদিকের ছাত্র। আমার সঙ্গে শান্তিনিকেতনে এলো সে। ভালো ছাত্র ছিল নাগেশ। তার একখানা ভালো ছবি হচ্ছে —অন্ধের স্যাকরা কাজ করছে। ছবিখানি ফিনিশ করে অবনীবাবুকে দেখাতে পাঠালুম। তিনি approve করলে ছবিখানি এগজিবিশনে দেওয়া হবে। ছবিখানি দেখে অবনীবাবু মন্তব্য লিখলেন, —নন্দলালের বিশেষ হাত রয়েছে এতে। এর তিন ভাগ নন্দলালের, আর এক ভাগ হলো নাগেশের। ছবিখানি অবনীবাবুর কাছ থেকে ফেরৎ এলে, তার পাশে আমি মন্তব্য লিখে দিলুম, —না, এর এক ভাগ আমার, আর তিন ভাগ নাগেশের। —সেই নাগেশ রাও শান্তিনিকেতনে আমার ছাত্র হয়ে এলো। তার ছবিতে অবনীবাবুর আর আমার সে-লেখা আছে এখনো —যেন সাক্ষী-সাবুদের জবানবন্দি।

'এই নাগেশ রাও ইয়ালকারের পরে চিত্র-প্রদর্শনী হয়েছিল বিলেতে। সে-সব ছবি আমি আর দেখিনি। শুনেছি, সে নাকি চিত্রকলায় ইণ্ডিয়ান আর ওয়েস্টার্ণ রেণ্ডিং-এর হুজুকে মেতেছিল।

'সোসাইটির ছাত্র রূপকৃষ্ণের কথা আমার খুব মনে আছে। লাহোরে বাড়ি ছিল তার। বই-ব্যবসায়ী লালা রামকৃষ্ণের পুত্র ছিল সে। সে দেখতে ছিল খুব সুপুরুষ, কথা বলতো কম। সোসাইটিতে সমবায় ম্যান্‌শনের একটি ঘরেই থাকতো সে। সে বেশি এঁকেছিল ওমর-খৈয়ামের চিত্রাবলী। আমাদের কাছে পাঠ নিতো। সে-সময়ে স্বদেশী হাঙ্গামা চলছে। কলকাতার অনেক পার্কে তখন সাধারণ লোকের জন্যে ছিল —'প্রবেশ নিষেধ'। কিন্তু, রূপকৃষ্ণ ডালহৌসী স্কোয়ারের নিষিদ্ধ-এলাকায় ঢুকতে যেতো প্রায়ই। পুলিশে তাকে আট্‌কে বলতো —'ভাগ্‌ যাও

বাবু হিঁম্নাসে'। কিন্তু, রূপকৃষ্ণ যেত স্বদেশী মীটিং হতো যেখানেই মহাত্মাজী যে-ফুড্ খেতেন রূপকৃষ্ণও তাই খেতে ধরলে। সেই কটুর খাদ্য দিন দিন খেতে খেতে শেষে হলো কি, তার মাথার ঘিলু শুকিয়ে গেল। সব সময়েই চেয়ে আছে —যেন ছম্ছমে ভাব। খেতে শুতে উঠতে বসতে গেলে সর্বদাই দেখতে পাচ্ছে সে, যেন বাইরে তার পেছনে পেছনে সি. আই. ডি. ঘুরছে।

'অবনীবাবু সব শুনে ডাকলেন তাকে। রূপকৃষ্ণ তখন খুব মোরোজ। তিনি বুঝলেন, না খেয়ে খেয়ে তার ঐ দশা হয়েছে। তিনি বললেন, ওকে ওর দেশের বাড়িতে পাঠিয়ে দাও। দেশে ফিরে গিয়ে সেরে গেল সে। উইক্নেসের জন্যে হচ্ছিল ওরকম। —শিল্পীদের কল্পনা-শক্তি অতি প্রখর হয়ে থাকে; আর মনটা হয় অত্যন্ত স্পর্শকাতর। সেই অনুপাতে অনেকেরই আবার উপযুক্ত নারিশ্মেন্ট্ হয় না। খাবে-দাবে, ফুর্তিতে থাকবে। তবে তো হবে শিল্পস্ফুর্তি। নইলে পাগল হবে: আন্ব্যালেন্স্ড হয়ে যাবে চট্ করে।

'কার্লীপদ সোসাইটিতে আমাদের ছাত্র ছিল বটে; কিন্তু সে ছিল অল্পদিন। তার কথা কিছু মনে নাই।

'দেবীপ্রসাদ এখন হয়েছেন ভারতবর্ষের একজন শ্রেষ্ঠ ভাস্কর। তিনি অবনীবাবুর দ্বিতীয় গ্রূপের এবং আমার প্রথম গ্রূপের প্রতিভাবান্ ছাত্রদলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। চিত্রশিল্প আর ভাস্কর্যে তিনি সমান দক্ষ। বাঁশিতে সুর সৃষ্টি করতে তিনি ওস্তাদ। তিনি পোর্ট্রেট্ও আঁকতে পারেন ভালো। তিনি এখন (১৯৫৫) মাদ্রাজ-আর্টস্কুলের অধ্যক্ষ। দেবীপ্রসাদের মাধ্যমে আমাদের আধুনিক চিত্রশৈলী দক্ষিণভারতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিশেষভাবে।

'শিল্পী প্রমোদকুমারও সোসাইটিতে আমার ছাত্র ছিলেন। তিনি প্রথমে ছিলেন অবনীন্দ্র-রীতির বিরোধী। পরে আবার তাঁর মত পাল্টে যায়। তিনি প্রথমে শিখতেন আর্টস্কুলে পাশ্চাত্য-রীতিতে। কিন্তু, তাঁর যাযাবরী মনোভাব আর ধর্মপ্রবণতা তাঁকে শিল্পসিদ্ধির শেষ সীমায় পৌঁছতে দেয়নি। তিনি শিখতে এসেছিলেন বেশি বয়সে। ফলে, নিজেকে পুরোপুরি শিক্ষার মধ্যে নিবিষ্ট রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তিব্বতে গিয়ে সেখানকার প্রাচীন চিত্রপট আর কারুকলা দেখে তাঁর মন

ফিরে গেল। প্রমোদ আমাদের কাছে এলেও তাঁকে প্রথম শিক্ষার্থীর মতো শেখাইনি। আর্টস্কুলে বিলিতী মতে তাঁর পাঠ এগিয়েছিল অনেকখানি। প্রমোদ সোসাইটিতে ক্লাসে বসে কাজ করতেন। আর মাঝে মাঝে আমাদের কাছে উপদেশ নিতেন।

'প্রমোদ ইণ্ডিয়ান্ আর্টের চর্চা করলেও, তিনি তাঁর একটি নিজস্ব ও স্বতন্ত্র রীতির সৃষ্টি করেছিলেন। আমরা সে-রীতি পছন্দ করতুম না। কিন্তু, কাজিন্‌স্ সাহেব তাঁর একজন গোঁড়া ভক্ত ছিলেন। প্রমোদের অনেক ছবি মাদ্রাজের আদেয়ার-সংগ্রহশালায়, মহীশূরের চিত্রশালায়, আর কোচিনের আর্ট-গ্যালারিতে সংগৃহীত হয়েছে। প্রমোদ খ্যাতিলাভ করার পরে, মসলীপট্টমে অন্ধ্র-জাতীয়-কলাবিভাগের অধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। ফলে, অন্ধ্রদেশে তিনি আধুনিক কলা-শৈলীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কিন্তু, তিনি এখন এই লাইন ছেড়ে দিয়ে পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দের আশ্রমে আছেন।

শ্রীনন্দলালের ১৯২০ সালে লেখা ডায়েরি (সংখ্যা ১২) থেকে দেখা যাচ্ছে, —পাটনার মানুক ছবি কিনেছেন (১৯২০ সালের ২৭-এ জানুয়ারী) একখানা ৮০ টাকা দিয়ে। ছবিটি হলো —ইন্দারার ধারে একটি মেয়ে বসে আছে আর একটি মেয়ে জল তুলছে। [মানুক ছিলেন জাতিতে আর্মেনিয়ান আর পেশায় ব্যারিস্টার। পাটনা হাইকোর্টের জজও হয়েছিলেন। তিনি উইল করে তাঁর শিল্প-সংগ্রহ বিলেতের সাউথ্ কেন্‌সিংটন মৃ্যজিয়মে দান করে গেছেন]।

লাট রোনাল্‌ড্‌শে বোলপুরে এলেন ১৫ই ফেব্রুয়ারী রবিবার ১৯২০। ঐ সময়ে শ্রীনন্দলাল বোলপুরে যাতায়াত করছেন। রামানন্দবাবু এ্যাল্‌বাম বিক্রী করে শ্রীনন্দলালকে ৬০ টাকা দিয়েছেন। বাণীপুরে গিয়ে, ওখান থেকে বোলপুরে মালপত্র পাঠাবার বন্দোবস্ত করেন ১৯২০ সালের মার্চ মাসে। ঐ সময়ে তিনি রামানন্দবাবুর কন্যা শ্রীমতী শান্তা দেবীকে চিত্রবিদ্যা শেখাচ্ছেন। আর সেজন্যে বেতন বাবদ টাকা পাচ্ছেন। সোসাইটি থেকে তখন মাসিক বেতন পাচ্ছেন ২০০ টাকা করে। এই সময়ে যমুনাদাস শ্রীনন্দলালের একখানি রঙ্গিন ছবি কিনেছিলেন

—'কাঁখে কলসী', মূল্য ১৫০ টাকা। এর থেকে কমিশন কাটা হয়েছিল ১৮ টাকা। শ্রীনন্দলালের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী গৌরীর জন্যে এই সময়ে পাত্র দেখা হচ্ছে। সন্ধানও পাওয়া গেছে। পাত্রের খুড়ো রায়বাহাদুর। ছেলে এম্-এ পড়ছে। তখন কলকাতার বাড়ি ভাড়া দেওয়া হলো। তার ভাড়া-আদায়ের হিসাব রয়েছে ঐ ডায়েরিতে। এই সময়ে তাঁর ছোট পিসিমা কাশীবাস যাচ্ছেন।

অসিত হালদার মহাশয়ের বিবৃতি থেকে দেখা যায়, —শ্রীনন্দলাল কলকাতা থেকে তাঁকে যে সব 'সচিত্র পোস্টকার্ড' লিখেছিলেন সেগুলি বর্তমানে (১৯৬৫) কাশী-হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতকলা-পরিষদ্-মুাজিয়মের সম্পত্তি। দৃঢ়চেতন শ্রীনন্দলাল কোনো 'দুর্ভোগের' জন্যে দোটানা মন নিয়ে কোনও 'সচিত্র পোস্টকার্ড' অসিতকুমারকে লেখেননি। সোসাইটির কর্তৃপক্ষকে তিনি থোড়াই কেয়ার করতেন। তাঁর সেই চিত্রলিপিগুলির প্রত্যেকে পাওয়া যাবে বিশুদ্ধ কৌতুক-রস, শান্তিনিকেতন-আশ্রমের প্রতি শিশুসুলভ কৌতূহল আর অহেতুক প্রীতিবোধ। বিশ্বজুড়ে নাম-কেনার অভিসন্ধিতে শান্তিনিকেতনে আসার ব্যপদেশে এ-সব তাঁর 'দূরদৃষ্টির' ভান? —নৈব নৈব চ।

॥ শান্তিনিকেতনে শ্রীনন্দলালের আবাস, ১৯১৮-৩৩ ॥

(শ্রীনন্দলাল যে-সব বাড়িতে বসবাস করেছিলেন তার প্রত্যেকটির plan স্কেচ্‌ করা আছে তাঁর নিজের হাতে।)

নক্সা—সংখ্যা (চ) মীরাদেবীর বাড়ি —'নেবুকুঞ্জ', ১৯১৮ ; এই বাড়িতে ছিলুম দিনকয়েক মাত্র।

১। শোবার ঘর।

২। শোবার ঘর।

৩। মীরাদির থাকার ঘর (মাঝে মাঝে এসে)।

৪। উঠান ও বাথরুম।

৫। পশ্চিমদিকের বারাণ্ডা ও সিঁড়ি।

নক্সা—সংখ্যা (ছ) নূতন বাড়ি ১৯১৮—

'এই বাড়িতে থাকা হয়েছিল ১৯১৮ সালের শেষ পর্যন্ত।

১ | ২ | ৩ শিক্ষকদের থাকার বাড়ি।

৬। শালবীথির দিকে খড় দিয়ে ছাওয়া ছোট বাড়ি যাতে আমি উঠেছিলুম।

৫। মঞ্জুমালতী-ঘেরা গেট। ('মঞ্জু' সুরেন ঠাকুরের মেয়ে, ক্ষিতীশ চাটুজ্যের স্ত্রী, গৌতম চাটুজ্যের মা ; 'মালতী' মালতী চৌধুরী, —উড়িষ্যার নবকুমার চৌধুরীর স্ত্রী। ওঁরা শিশুকালে থাকতেন ঐ ঘরে, তাই ঐ নাম।')

৬। আমার বাথরুম ও বাইরে যাবার রাস্তা।

৮। 'দেহলী' —গুরুদেবের কাজের ঘর, শোবার ঘর ও ছাত।

৭। নতুন বাড়ির মাঝখানে বাঁধানো বেদী।

৭ ক। 'দেহলী'র পাশে খড়ের ঘর। ছোট গেস্ট-হাউস। এ্যাণ্ড্রুজ, স্টেলা ক্রম্‌রিশ প্রভৃতি থাকতেন।

৭ খ। 'বীথিকা'র রাস্তা —শালবীথির রাস্তা।

৮। দোতলা 'দ্বারিক' —কলাভবন ছিল —রোনাল্ড্‌শে, শ্রদ্ধানন্দ প্রভৃতিকে সংবর্ধনা জানানো হয়েছিল এখানে।

নক্সা—সংখ্যা (জ) ক্লাব হাউস, ১৯১৯ :

১। রান্নাঘর।

২। শোবার ঘর।

৩। ভাঁড়ার ঘর।

৪। পায়খানা ও চানের ঘর।

৫। পশ্চিমদিকের বারাণ্ডা।

৬। গুরুপল্লীর সামনের রাস্তা।

'এই টিনে ছাওয়া বাড়িটিতে ছিলুম ১৯১৯ সালে কিছুদিন। এখান থেকেই সোসাইটিতে ফিরে যেতে হয় আমাকে। প্রায় ছ'মাস এখানে আমি অনুপস্থিত ছিলুম। —অবনীবাবুর ও গুরুদেবের অর্থাৎ খুড়ো-ভাইপোর ঝগড়ার ফলে, আমাকে আশ্রম ছেড়ে সোসাইটিতে যেতে হয় আমার গুরু অবনীবাবুর নির্দেশে। বিশু-টিশুর তখন পড়া এখানে বন্ধ ছিল। আমি পরিবারবর্গকে খড়্গপুরে পাঠিয়ে দিলুম। এ-ভাবে কাটলো ছ'মাস। এর পরে, সোসাইটিতে ইস্তফা দিয়ে এখানে যখন ফিরে এলুম, তখন ওঠা হলো এসে 'গুরুপল্লীর ঘরে। ১৯২০ সাল থেকে ৩৩ সাল পর্যন্ত কেটেছে এই বাড়িতে। ১৯১৯ সাল থেকেই শান্তিনিকেতনে রীতিমতো 'কলা-ভবনের' পত্তন হয়। তবে, এর সূত্রপাত হয়েছিল অনেক আগে থেকেই, সে-কথা পরে বলা হচ্ছে।

নক্সা—সংখ্যা (ঙ) শান্তিনিকেতনে গুরুপল্লীর ঘর, ১৯২০-৩৩ —দোতলা ঘর (Imp অনেক ছবি এঁকেছি ওখানে)।

১। দক্ষিণদিকের বারাণ্ডা। এখানে বসে অনেক ছবি এঁকেছিলুম —'নটীর পূজা' ওখানেই আঁকি। প্রথমে সুকুমারী দেবী এসে ছাত্রী হলেন। সকলে এসে আমার কাছে শিখতেন।

২।৩। মাঝের ঘর। দু'টি বিছানা, তার একটি বিছানায় আমার স্ত্রী থাকতেন।

৪। ছেলেরা থাকতো।

৫। রান্নাঘর।

৬। উত্তরের বারাণ্ডা —'ঐ বারাণ্ডায় বসে যখন আমার স্ত্রী কুটনো কুটতেন, তখন গুরুদেব 'দেহলী' থেকে দেখতে পেতেন।

একদিন আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন গুরুদেব, —'তুমি কি কর'? 'আমি কুটনো কুটি' —বললেন আমার স্ত্রী। একবার বিজয়া-দশমীর রাত্রে গুরুদেব গান ধরলেন 'দেহলী' থেকে —আমরা এখান থেকে শুনতে পেলুম —ভান দিয়ে গান —'অন্ধজনে দেহ আলো' ইত্যাদি।

৪ক। উপরতলার ঘর —আমি ছবি আঁকতুম —অনেক ছবি এঁকেছি —বসন্তের ছবি —(টাচে) বসন্ত, শ্রীনিকেতনে গাছের বাড়ি —গুরু:দেব গিয়ে থাকতেন। জানালা দিয়ে রাত্রি দেখা যাচ্ছে, চিঠি-পড়া —এই সব ৫|৬ খানা টাচের ছবি এঁকেছিলুম।

৭। বাথরুম —পায়খানা —কাঠের পায়খানা।

৮। চানের ঘর।

গুরুপল্লীর এই খড়ের বাড়িতে 'দারা' (পার্শী ছেলে) ছিলেন। পাশের বাড়িতে জগদানন্দবাবু থাকতেন।

॥ 'শান্তিনিকেতন'-পত্রিকায় শান্তিনিকেতন-সংবাদ ॥

১৩২৬ সালের চৈত্র সংখ্যায় (১৯২০) ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এই সংবাদ দিয়েছেন: মি. এ্যাণ্ড্রুজ আগামী এপ্রিল মাসে ও মি. পিয়ার্সন আগামী অক্টোবর মাসে আশ্রমে আসিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন। আমাদের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীমান মুকুলচন্দ্র দে চিত্রবিদ্যা শিক্ষার জন্য বিলাত যাত্রা করিয়াছেন।

আলপনা, স্ত্রী-আচার ও 'ঘুমপাড়ানির ছড়া' সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এই সংখ্যায়। ২য় বর্ষের অর্থাৎ ১৩২৭ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা (১৯২০) থেকে এই পত্রিকায় পুনরায় নন্দলাল-প্রসঙ্গ মুদ্রিত হয়েছে:

জ্যৈষ্ঠ (১৩২৭, পৃ ৮০)। আমাদের বাঙ্গালা দেশের চিত্রকরেরা আচার পূজা-পদ্ধতি ও দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপের ছবি এঁকেছেন। নন্দলাল বসুর 'জগাই মাধাই', 'কুমারীপূজা', 'গোকুলব্রত', 'পৌষপার্বণ', উল্লেখযোগ্য।

আষাঢ় ১৩২৭, (পৃ. ২)। আশ্রমের সমবায় ভাণ্ডারের কাজ পূর্ববৎ

উৎসাহের সহিত চলিতেছে। শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর মহাশয় ভাণ্ডারের প্রধান পরিচালকের পদে নির্বাচিত হইয়াছেন।

চিত্রকলা ও সঙ্গীতাদি শিক্ষা করিবার জন্য অনেকগুলি ছাত্রী বোম্বাই প্রভৃতি স্থান হইতে আসিয়াছেন।

ভাদ্র ১৩২৭, (পৃ. ১০-১১)। শ্রীযুক্ত শ্রদ্ধানন্দ স্বামী গত ১৪ই ভাদ্র সোমবারে আশ্রমে আসিয়াছিলেন। সঙ্গে গুরুকুলের কয়েকজন স্নাতক ছাত্র ছিলেন। কলাভবনে তাঁহাকে সংবর্ধনা করা হইয়াছিল। বিচিত্র ভূর্জপত্রে দেবনাগরী অক্ষরে লেখা একখানি অভিনন্দন-পত্র সংবর্ধনার পরে তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছিল। সেইদিন সন্ধ্যার সময়ে আশ্রমের বালক-বালিকারা বাল্মীকিপ্রতিভা' নাটকের কিয়দংশ অভিনয় করিয়াছিল। স্বামীজী কেবল একদিন মাত্র আশ্রমে ছিলেন।

ইহার পরে গত ২৮শে ভাদ্র মহাত্মা গান্ধী মহাশয় আশ্রমে শুভাগমন করিয়াছেন। ...এই সময় শ্রীনন্দলাল এখানে ছিলেন না। শ্রদ্ধানন্দজীর সময়ে ছিলেন।

॥ স্বামী শ্রদ্ধানন্দজী, ১৯২০ ॥

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ সম্পর্কে শ্রীনন্দলাল বলেন, —'স্বামীজী শান্তিনিকেতনে এলেন। প্রায় সাত ফুট লম্বা আর সেই অনুপাতে চওড়া —দীর্ঘাকৃতি বলিষ্ঠ পুরুষ। সন্ন্যাসীর বেশ। গেরুয়া-পরা। 'দ্বারিকে'র দোতলায় মাঝের হলে আমাদের তখন এগ্‌জিবিশন হতো। ঐ হলটা খুব সাজানো হলো ওঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে। নানা ছবি দিয়ে সাজালুম। তখন শরৎকাল। পদ্মফুল আনা হলো অনেক। ফুলে ফুলে ঘর একেবারে ভরতি করে দিলুম। মালাচন্দন দিয়ে অভ্যর্থনা করা হলো। স্বাগত করলেন গুরুদেব স্বয়ং। স্বামীজী চলে যাবার পরে, গুরুদেব আমাকে বললেন, —'তুমি এতো করে সাজিয়েছ 'একজন কঠিন সন্ন্যাসীর জন্যে।' আমি উত্তর দিলুম, —'কঠোর বলেই সাজিয়েছি এতো বেশি

করে'। শুনে গুরুদেব বললেন হাসতে হাসতে, —'তোমার সাহস তো খুব'।

'আমাদের কাজ সব ঘুরে ঘুরে দেখলেন। কাজ দেখে শ্রদ্ধানন্দজী বললেন, —'আমার গুরুকুলের জন্যে এখান থেকে আর্টিস্ট চাই।' আমি বললুম, —না, আপনারা বড়ো কঠোরভাবে থাকেন। তার চেয়ে আপনি ওখান থেকে আমাদের কলাভবনে ছাত্র পাঠান। কঠোর সন্ন্যাসীর লোভ হয়েছিল বোধ হয় আর্ট দেখে। কিন্তু এখান থেকে ফিরে যাবার পরে তিনি খুন হয়ে গেলেন।

'গুরুকুলে মহাত্মাজী গেলেন একবার। ওরা মহাত্মাজীকে জিজ্ঞাসা করলে, —গুরুকুল আর শান্তিনিকেতনের মধ্যে কোন্‌টা ভালো বলে আপনি মনে করেন। মহাত্মা উত্তর দিয়েছিলেন; —'শান্তিনিকেতনে ওরা আর্ট সৃষ্টি করে, তোমরা তা পার না। —এই তফাৎ তোমাদের।'

॥ ভারতশিল্পের মাদ্রাজ-প্রদর্শনী, ১৯২০ ॥

অসিতকুমারের বিবরণ মতে, ১৯২০ সালে কাজিন্‌স্ সাহেব এ্যানি বেসাণ্ট্-এর মাধমে রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করে শান্তিনিকেতন-কলাভবনের ছবির একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন মাদ্রাজে। অসিতকুমার শান্তিনিকেতন-কলাভবনের শিক্ষক আর ছাত্রদের প্রায় একশোখানি ছবির সংগ্রহ নিয়ে মাদ্রাজে গেলেন। এই প্রদর্শনীর জন্যে মাদ্রাজে একটা সাড়া পড়ে গেল। এ্যানি বেসাণ্ট্ চিত্রপ্রদর্শনীর দ্বার উন্মোচন করেছিলেন। বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তিনি ভারতীয় আর্টের রেনেসাঁ, অবনীন্দ্রনাথের অমূল্য দান ও হ্যাভেল, কুমারস্বামীর একনিষ্ঠ আদর্শ ব্যাখ্যা এবং প্রচারের কথা উল্লেখ করেছিলেন। কাজিন্‌স্ সাহেবও ভারতশিল্পের নবযুগের উদ্বোধনে অবনীন্দ্র-রবীন্দ্রের দান সম্পর্কে বলেছিলেন সবিস্তর। অসিতকুমারও ভাষণ দিয়েছিলেন। থিওসফিক্যাল্ সোসাইটির বহু বিদেশী মনীষী সভ্য, হাইকোর্টের জজ প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের সমাগমে প্রদর্শনী সাফল্য-মণ্ডিত হয়েছিল। ছবিও ভালো বিক্রী হয়েছিল।

মাদ্রাজ-হাইকোর্টের জজ তিলং বহু ছবি কিনেছিলেন। কাজিন্‌স্

সাহেবের বন্ধু মাদ্রাজ ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কের গভর্ণর এস্. ভি. রামাস্বামী মুদেলিয়র বহু ছবি কেনেন। সেই থেকে তিনি ভারতশিল্পের নব্যকলাকারদের চিত্রকর্মের বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা করতে থাকেন। মাদ্রাজে তাঁর 'রাম-মন্দিরম্'-প্রাসাদের আর্ট-গ্যালারীতে বহু মৌলিক চিত্র সংগৃহীত হয়েছে। অবনীন্দ্রনাথের, গগনেন্দ্রনাথের, সুরেন গাঙ্গুলীর, শ্রীনন্দলালের, ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদারের, অসিতকুমারের অনেক ছবি এই সংগ্রহে রাখা আছে।

অসিতকুমার আশ্রম থেকে প্রদর্শনীর জন্যে মাদ্রাজে গিয়েছিলেন দু-বার —১৯২০ আর ২১ সালে। পরে থিওসফিক্যাল সোসাইটির স্কুলে শান্তিনিকেতন-কলাভবনের ছাত্র অর্ধেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাঠিয়েছিলেন। কাজিন্‌স্ সাহেব অন্ধ্র-বিশ্ববিদ্যালয়ে চিত্রকলা শিক্ষা দেবার জন্যে অবনীন্দ্রনাথের কাছ থেকে প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়কে আনিয়েছিলেন। মাদ্রাজ-গভর্ণমেন্ট্-আর্টস্কুলের অধ্যক্ষ হ্যাডাওয়ে সাহেব অবসর নেবার পরে, মুদালিয়ার দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীকে ঐ পদে বসিয়েছিলেন —অসিতকুমারের পরামর্শ মতো। বৃটিশ আমলে সরকারী-আর্টস্কুলের অধ্যক্ষের পদ সাহেব-শিল্পীদের ছিল একচেটে। সেইজন্যে হ্যাভেল সাহেবের পরে অবনীন্দ্রনাথকে করা হয়েছিল অস্থায়ী অধ্যক্ষ। অধ্যক্ষের পদে পাকাপাকিভাবে উত্তরপ্রদেশ সরকার প্রথমে নিযুক্ত করেন অসিতকুমারকে। দেবীপ্রসাদ যখন মাদ্রাজের অধ্যক্ষ তখন মুকুল দে কলকাতায় ঐ পদ পেলেন।

।। আশ্রম-সংবাদের অনুবৃত্তি ।।

আশ্বিন ১৩২৭, জগদানন্দ রায়-লিখিত। —গত পূর্ণিমা তিথিতে আশ্রম-সম্মিলনীর বিশেষ অধিবেশন অত্যন্ত সুন্দর হইয়াছিল। সতীশ-কুটীরের পুরোবর্তী প্রাঙ্গণে ঐ সভার অধিবেশন হয়। স্থানটি বেশ ভাল করিয়া পরিষ্কার করা হইয়াছিল এবং তাহার মধ্যস্থলে বৃত্তাকারে বিচিত্র আলপনা অাঁকিয়া তন্মধ্যে একটি পদ্মস্তম্ভ স্থাপন করা হইয়াছিল। আলপনা প্রভৃতির পরিকল্পনা করিয়াছিলেন শ্রীনন্দলাল বসু, শ্রীঅসিতকুমার হালদার ও শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর মহাশয়গণ, আর অাঁকিয়াও ছিলেন তাঁহারা নিজে আর বিশ্বভারতীর ছাত্র ও ছাত্রীরা। চতুর্দিক জ্যোৎস্নালোকে উদ্ভাসিত হইলে আশ্রমে সকলে বৃত্তের চতুর্দিকে আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। নানারূপ বাদ্য সংযোগে প্রায় দেড় ঘন্টা পর্যন্ত শরতের সমস্ত গান একটার পর একটা গীত হইয়াছিল। মাঝে মাঝে ছাত্রগণ শরতের উপযোগী কবিতাও আবৃত্তি করিয়াছিল। গানের পর প্রাঙ্গণেই সকলে আহার করিয়াছিলেন। আহারেরও বিশেষ বন্দোবস্ত ছিল।

পৌষ ১৩২৭, (পৃ ৫১৫)। ১৩২৬ সাল, ৮ই পৌষ হইতে ১৩২৭ সাল, ৭ই পৌষ পর্যন্ত। ১৩২৫ সালের ৮ই পৌষ আশ্রমের বার্ষিক উৎসবের দিন বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা হয়, এবং গত ১৩২৬ সালের ১৮ই আষাঢ়ের নিয়মানুসারে ইহার কার্য আরম্ভ হয়। …

বিভাগ —এবারেও ইহার তিনটি বিভাগ ছিল।—

(ক) সাহিত্য বিভাগ,

(খ) কলা বিভাগ, ও

(গ) সঙ্গীত বিভাগ।

(খ) কলা বিভাগ

১। অঙ্কন ও কল্পনা

অধ্যাপক

১১। (খ) শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার

…আর শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু ও সুরেন্দ্রনাথ কর মহাশয়েরা কলা বিভাগের শিক্ষাদানে অনেক সাহায্য করিয়াছেন।

ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা

(খ) কলা বিভাগে—১২

১। ছাত্র—৬
২। ছাত্রী—৬

…কলাবিভাগে আশ্রমের বিদ্যালয়ের দুইটি বালক ভরতি হইয়াছে। এবং স্থানান্তর হইতে আরও তিনটি বালক ইহাতে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। ছাত্রীরা সকলেই আশ্রমবাসিগণের পরিবারভুক্ত।

কলা বিভাগের কার্য সবিশেষ প্রশংসনীয় ও সন্তোষপ্রদ; ইহা দেখিয়া আমাদের বহু আশা হইয়াছে। এবার চিত্রকলা ও শিল্পকলা আলোচনা করিয়া অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার মহাশয় তিনটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। অধ্যাপক ও ছাত্র উভয়েই এবার কতকগুলি নূতন চিত্র আঁকিয়াছেন। বিশেষ বিবরণ নিম্নলিখিত তালিকায় দেওয়া হইল। এই সমস্ত চিত্র প্রাচ্য শিল্প সমিতিতে প্রদর্শনের জন্য প্রেরিত হইয়াছিল এবং ইহাদের অধিকাংশ প্রশংসিত হইয়াছে। কোনো কোনো চিত্র বহু মূল্যে বিক্রীত হইয়াছে। কংগ্রেসের সময়ে যে চিত্র-প্রদর্শনী হইবে, তাহাতেও কতক চিত্র পাঠান হইয়াছে।

চিত্রের তালিকা

(১) অধ্যাপক

১। শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু

১। কুরুক্ষেত্র
২। আয়োজন

২। শ্রীঅসিতকুমার হালদার

১। কুনাল

২। রাসলীলা (বড়)

৩। ঐ (ছোট)

৪। আপদ বিদায়

৫। উষা

৬। ময়ূর

৭। মত্তসাগর দিল পাড়ি গহন রাত্রিকালে

(২) ছাত্র

১। শ্রীঅর্ধেন্দুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ ১। লক্ষ্মী ২। সে কোন্ বনের হরিণ ৩। কাগজের নৌকা ৪। পর্দায় সন্ধ্যা ৫। দুপুরের আরাম ৬। ওহে নবীন অতিথি তুমি নূতন কি তুমি চিরন্তন ৭। চাঁদের আলো।

২। শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর ঘোষ ঃ ১। নূপুর ২। ভজন ৩। পুষ্পচয়ন ৪। রাখাল বালক ৫। প্রতীক্ষায়।

৩। শ্রীহীরাচাঁদ দুগার ঃ ১। চাহনি ২। সঙ্গীতের সম্মোহনী ৩। দিবস রজনী আমি যেন কার আশায় থাকি ৪। জননী ৫। পদ্মাবতী।

৪। শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মা ঃ ১। গোধূলি ২। পদ্মচয়ন ৩। সারঙ্গী ৪। শারদশ্রী ৫। অবলম্বন।

কলাবিভাগের পুস্তকাগারে কতকগুলি নূতন নূতন পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে এবং হইতেছে। এই পুস্তকশালায় নন্দলালবাবু, অসিতবাবু ও সুরেনবাবু কিছু কিছু পুস্তক উপহার দিয়াছেন।

কলাবিভাগের চিত্রশালায় নন্দবাবু, সুরেনবাবু, শৈলেন্দ্রনাথ দে আমাদের পূর্বছাত্র ওয়াড়িয়ার, বর্তমান ছাত্র হীরাচাঁদ এক একখানি চিত্র উপহার দিয়াছেন।

···গত বৎসর (১৯১৯) শ্রীযুক্ত নন্দলালবাবুর স্থানান্তরে গমন হেতু বিয়োগের কথা জানাইয়াছিলাম, আজ (১৯২০) আবার আপনাদিগকে জানাইতে আনন্দিত হইতেছি যে তিনি পূর্বে যেমন আমাদেরই ছিলেন,

এখনও আবার সেইরূপই হইয়াছেন। (পৃ ৫২৪)

…আশ্বিন মাসে ক্ষিতিমোহনবাবু সর্বাধ্যক্ষতার পদত্যাগ করিলে শ্রীযুক্ত এ্যাণ্ড্রুজ ও সুরেন্দ্রনাথ কর মহাশয় দক্ষতার সহিত কার্য-নির্বাহ-সভার কাজ করিয়াছেন। (পৃ ৫২৭)

…আমাদের দেশের অন্যতম প্রধান চিত্রকর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর মহাশয় আশ্রমের চিত্রাঙ্কন শিক্ষা দিয়াছেন। তা'ছাড়া বিখ্যাত শিল্পী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু ও শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার মহাশয়েরাও গত বৎসর নিয়মিতভাবে চিত্রবিভাগের পরিচালনায় সাহায্য করিয়াছেন। ইঁহাদের চেষ্টায় চিত্রবিভাগ সুন্দররূপে চলিয়াছিল। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কয়েকজন চিত্রে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। (পৃ ৫৩০)

শ্রীনন্দলাল বলেন, —'তখন শান্তিনিকেতনে কলাভবনের ক্লাস বসতো দ্বারিকে'র ওপর-তলায়। ছাত্রছাত্রী যখন বাড়লো তখন কলাভবনের ক্লাস হতো এখনকারের 'শিশুবিভাগে'। লাইব্রেরীর ওপরের হলঘরটা তখন তৈরি হচ্ছে। তৈরি হবার পরে, নিচের শিশুবিভাগ থেকে একলম্ফে আমরা উঠে এলুম লাইব্রেরীর মাথায় এখন (১৯৫৫) বিদ্যাভবনের অধ্যাপক তোমরা যেখানে বসে কাজ কর।

'শান্তিনিকেতনে এসে অসিতকুমারের ছাত্রদের ভার নিলুম আমি। ধীরেন দেববর্মণ, বিনোদ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণকিঙ্কর ঘোষ, হীরাচাঁদ দুগার — এঁদের সব ভার নিলুম। বার থেকে এলো মাসোজী। সোসাইটীর ছাত্র একজন এখানে এলো মালাবারী ছাত্র —সেই কৃষ্ণ ওয়ারিয়র। লাইব্রেরীর ওপরতলায় বসে কাজ আরম্ভ করে দেওয়া হলো। ক্রমশঃ অর্ধেন্দুপ্রসাদ ব্যানার্জী, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এঁরা এলেন। মাসোজীর পরে এলেন মণি গুপ্ত। ঢাকায় বি. এ. পর্যন্ত পড়ে মণি গুপ্ত এসে জয়েন করলেন। সবিতা দেবী এলেন। ইনি হলেন কৃতীন্দ্রনাথের স্ত্রী —আমাদের অজিনের কাকীমা। এই সময়ে পি. হরিহরণ এলেন, এলেন বীরভদ্র চিত্রা। চিত্রা এখন (১৯৫৫) আছেন ইরাকে। অন্ধ্র থেকে এলেন কেশব রাও। আর দুটী মেয়ে এলেন —দুই বোন তাঁরা। ১৯২১ সালে কলাভবনে আরও ছাত্র এলেন সত্যেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, সুকুমার দেউস্কর, হরিপদ রায়, অন্নদা মজুমদার। কলাবিভাগের কাজ

চলতে লাগলো লাইব্রেরীর ওপর-তলায়।

সেকালের 'শান্তিনিকেতন'-পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ থেকেও আমরা জানতে পারছি, সোসাইটিতে শিক্ষকতা করতে করতে মাঝে মাঝে শ্রীনন্দলাল আসতেন শান্তিনিকেতন-আশ্রমবিদ্যালয়ে। তাঁর পরিবারবর্গ তো শান্তিনিকেতনেরই তখন বাসিন্দা। তাঁদের জন্যেও তো মাঝে মাঝে মন টানে। ফলতঃ, এই আনাগোনায় ক্রমে ক্রমে শান্তিনিকেতনের সঙ্গে তাঁর কাজের যোগ আর প্রাণের যোগ এক হয়ে, শান্তিনিকেতন তাঁকে আটকে রাখলো —কলাভবনের পরিচিত, গুরু বা তার প্রাণপুরুষ-স্বরূপে। ক্রমে ক্রমে আচার্য শ্রীনন্দলালের জীবন-সাধনার মহিমান্বিত উত্তর-পর্ব উদ্ঘাটিত হতে লাগল —শান্তিনিকেতনের এই, আশ্রমিক পরিবেশে স্থায়িভাবে আসার ফলে।

শান্তিনিকেতনে স্থায়িভাবে আসার আগে ১৯১৪ সালে কবিগুরুর দেওয়া অভিনন্দনের পর থেকে অনেকবার শ্রীনন্দলাল এখানে এসেছেন। এসে থাকতেন দু-চার দিন ধরে, চিত্রবিদ্যা বিষয়ে তত্ত্বাবধান করতেন, আবার চলে যেতেন কলকাতায় অথবা বাণীপুরে। ক্রমশঃ আশ্রমে কবির কলাবিদ্যা-শিক্ষা দেওয়ার স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নিতে লাগলো ১৯১৭ সালে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর মহাশয় এখানে আসার পর থেকে। ফলে, যথার্থ কলাভবন-সৃষ্টির সম্ভাবনাও এগিয়ে এলো। গুরু অবনীন্দ্রনাথের আহ্বানে কলকাতায় বা সোসাইটিতে, আবার গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে শান্তিনিকেতনে আনাগোনার টানা-পোড়েনের পরিস্থিতিতে, অবশেষে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের একান্ত আহ্বানের নিকটে অবনীন্দ্রনাথ নতিস্বীকার করে, শ্রীনন্দলালকে তাঁর বন্ধন থেকে ছেড়ে দিলেন বিশ্বভারতীর উন্মুক্ত প্রান্তরে; আর এর প্রতীক হিসেবে শ্রীনন্দলালকে এখানে পাকা হয়ে আসবার সময়ে উপহার দিয়েছিলেন —সেই জোর করে বামন-করা পাকুড় গাছটি। জাপানী শিল্পী কাসাহারার সহযোগে অবনীন্দ্রনাথ যে স্বদেশী মহীরুহটিকে সরকারী খাতিরে পড়ে, খাঁচায় পুরে; হয়তো তাঁর অজ্ঞাতসারেই বামন করতে চেয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন। —এ হলো ১৯২০ সালের মার্চ মাসের কথা।

॥ শ্রীনন্দলালের অঙ্কিত চিত্রপঞ্জী, ১৯১৬-২১ ॥

(জের) ১৯১৩ : The Home, The Hero (Crescent Moon, 1913),
(ঐ) ১৯১৪ : বৈরাগী (প্রবাসীর প্রচ্ছদ)
(ঐ) ১৯১৫ : জলে পদ্ম, গাছে খাঁচা (প্রবাসীর প্রচ্ছদ)
(ঐ) ১৯১৬ : প্রবাসীর প্রচ্ছদ

১৯১৬ : শিব (Gitanjali etc. 1918), *হত্যাকারী, কলিকাতায় পথের দৃশ্য। ১৯১৭ : ঝড়-বৃষ্টিতে কোণারক, কনে সাজানো, কৃষ্ণ ও অর্জুন, *তাঁতী, শ্রীচৈতন্যের জন্ম, গৃহহারা, (১৯১৮ সালে Gitanjali etc গ্রন্থে সঙ্কলিত) --বৈরাগী, My song has put off her adornments ('আমার এ গান ছেড়েছে'), Leave this chanting and singing ('ভজন পূজন সাধন আরাধন'), The song that I came to sing ('হেথা যে গান গাইতে আসা'), Art Thou abroad on this stormy night ? ('আজি ঝড়ের রাতে'), I asked nothing from Thee ('তোমার কাছে চাইনি কিছু'), When I bring to you coloured toys ('রঙিন খেলেনা দিলে'), Thou art the sky and thou art the nest as well ('একাধারে তুমি আকাশ তুমি নীড়'), I am like a remnant of a cloud ('আমি শরৎ শেষের মেঘের মতো'), Make me Thy poet O Night veiled Night ('মোরে কর সভাকবি'), I cling to this living raft, my body ('এই দেহটির ভেলা নিয়ে'), She is still a child ('ওগো বর ওগো বঁধু'), The waves, the sky devouring waves ('বিপুল-তরঙ্গ রে'), গীতাঞ্জলির ছবি করার পূর্বে কতকগুলি কল্পনা-চিত্রণ, কলিকাতায় বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের প্যানেল :—পার্থসারথি, পাশাখেলা, কৌরবের মন্ত্রণা, পাণ্ডবগণের বিষাদ, দুর্যোধন যুদ্ধ করছেন —কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের শেষপর্ব, যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ, উদয়সবিতা, সিস্টার নিবেদিতার লো-রিলিফের মূর্তি, জ্ঞান ও কল্পনা।

১৯১৮ ঃ অরণ্যে পথহারা (গরু), পুরীর সমুদ্রে জাল টেনে তুলিয়া জেলেদের মাছধরা, শান্তিনিকেতনের পথে —রাত্রে, রাখাল, শরৎ, নটী,—স্নানের পরে, শারদশ্রী. জেলে, 'ঝরছে জগৎ ঝরণা ধারা', সাঁওতাল নৃত্য, হরিণ, হাতী, গণপতি, ঘোড়া।

১৯১৯ ঃ সাঁওতাল বালিকা, *শিব ও পার্বতী, হাট থেকে ফেরা. *শরৎ-প্রভাত, পুষ্পিত তৃণ. সহচরী. আলপনা. দিনশেষে. খেলার সময়, গ্রামের মেয়ে. অন্ধের নড়ি, বুদ্ধের প্রত্যাবর্তন, সুদামা ও কৃষ্ণ, বকের পাঁতি (পাখীর ঝাঁক), আবাস. শবরী —যৌবনে. ঐ —প্রৌঢ়ে, ঐ —বার্ধক্যে, পুস্তকচিত্রণ —Tagore's The Centre of Indian Culture etc. *1919.

১৯২০ ঃ মৃগশিশু, মধ্যাহ্নের কাজ, গিরীশ, আমার গুরু অবনীন্দ্রনাথ, কুরুক্ষেত্র, আয়োজন, কাশীর ঘাট, শ্রমিক, গজ-উদ্ধার, ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর কুরুক্ষেত্র-দর্শন।

১৯২১ ঃ উমার প্রত্যাখ্যান. বর্ষার রূপ, মজুরদল. নৃত্যরতা কালী, বসন্তের পদক্ষেপ. আনমনা।

।। চিত্র-পরিচয়, ১৯১৬-২১ ।।

(জের) ১৯১৩ ঃ The Home, মায়ের কাঁধে শিশু —পুতুল খেলনা, রঙ্গিন, ওয়শ, কলাভবন-সংগ্রহ, রবীন্দ্রনাথের Crescent Moon গ্রন্থে সঙ্কলিত।

The Hero খোকা ও খেলনা —কাঠের ঘোড়া পালকীর ধারে বাধা। খোকার হাতে চাবুক। রঙ্গিন. ওয়শ. কলাভবন-সংগ্রহ। Crescent Moon-গ্রন্থে সঙ্কলিত।

জলে পদ্ম. গাছে খাঁচা. রঙ্গিন, টেম্পেরা। [illegible] জলে পদ্ম, তীরে গাছে খাঁচা ঝোলানো (প্রবাসীর প্রচ্ছদ, ভাদ্র, ১৩২০)।

(ঐ) ১৯১৪ ঃ বৈরাগী, ৮½ × ৫½, রঙ্গিন. ওয়শ। প্রথম প্রকাশ 'প্রবাসী' আশ্বিন. ১৩২১, 'মুখপাতের ছবিখানি শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর অঙ্কিত বাউলের ছবি'।

(ঐ) ১৯১৫ ঃ প্রবাসীর প্রচ্ছদ, রঙ্গিন।

১৯১৬ : শিব, যোগাসনে বসে আছেন, Gitanjali গ্রন্থে সঙ্কলিত —Make me Thy Poet O Night, Veiled Night —'মোরে কর সভাকবি' —এই পরিচয়ে, রঙিন।

*হত্যাকারী।

কলিকাতায় পথের দৃশ্য, আ. ৬"×৫", সাদা কাগজ, লালরঙের লাইনে অ*াঁকা। হাতীবাগানের মোড়ে মদের দোকানের সামনে ফুটপাতের ধারে একজন কাবুলিওয়ালা বসে আছে। আরাই সানকে উপহার দিয়েছিলুম।

১৯১৭ : **ঝড়-বৃষ্টিতে কোণারক**, ৬০"×২৬", কার্টিজ পেপার, ওয়শ, প্রফুল্লনাথ ঠাকুর-সংগ্রহ। কোণারকে বেড়াতে গেসলুম। মন্দির আর স্ট্যাচুর ওপর থেকে বৃষ্টির জল ঝরছিল, আর ঝড় হচ্ছিল। ('ঝরছে জগৎ ঝরণা ধারা' ?)। এর থেকে একটি লিথো-প্রিন্টিং করা হয় (আগে দেখুন)।

কনে সাজানো, (১৯১১ ?) আ. ৯"×৮", কার্টিজ পেপার, ওয়শ, চিত্রাধিকারী ছিলেন রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শাশুড়ী কনে-বউকে নিয়ে ঘরে তুলছে। ও. সি. গাঙ্গুলী ছবিখানা আমেরিকায় exhibition-এ পাঠালেন। আর ফিরে এলো না। চ্যাটার্জীর এ্যালবাম বা প্রবাসীতে প্রিণ্ট্ থাকতে পারে।

কৃষ্ণ ও অর্জুন, রঙিন, ওয়শ। কৃষ্ণ বসে আছেন, তাঁর নিচে পায়ের তলায় অর্জুন বসে আছেন।

*তাঁতী।

শ্রীচৈতন্যের জন্ম, ৫৭"×৪২", এ. এন্. মুখার্জী-সংগ্রহে ছিল। এ থেকে পরে জয়পুরী ফ্রেস্কো করা হয় লাইব্রেরীর বারাণ্ডায়।

গৃহহারা, রঙিন, ওয়শ। গাছের তলায় একজন গরীব মেয়ে বসে আছে।

[ইংরেজী Gitanjali and Fruit-Gathering গ্রন্থে কবির ইচ্ছায় শ্রীনন্দলালের নিম্নলিখিত এই তেরোখানি চিত্র ব্যতীত ইহাতে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর মহাশয়ের অ*াঁকা তিনখানি, অসিতকুমার হালদারের একখানি, নবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দু-খানি এবং অবনীন্দ্রনাথের বারোখানি চিত্র সঙ্কলিত হয়েছিল। ইংরেজী গ্রন্থখানির শিরোনাম এই : Gitianjali and Fruit-Gathering by Sir Rabindranath

Tagore with illustrations by Nandalal Bose, Surendranath Kar, Abanindranath Tagore and Nabendranath Tagore, The Macmillan Company, New-york, New illustrated Edition, Copyright, 1918.]

Gitanjali and Fruit-Gathering :

মুখপত্র —'অন্তরে মোর বৈরাগী গায় তাইরে নাইরে নাইরে নাইরে না' —বৈরাগী একতারা হাতে, তার আর-একটি হাত উপরে তোলা, গাছের ডালে উত্তরীয় ঝুলছে, ৮১/২"×৫১/২", ওয়াশ।

My song has put off her adornments —'আমার এ গান ছেড়েছে' —গীতাঞ্জলি ১২৫ একজন —নিরাভরণ রাখাল ছেলে বাঁশী বাজাচ্ছে। রেখাঙ্কন, ওয়াসলি, ৮"×৬"। অবনীবাবুর সংগ্রহ। পাথারপুরীতে থাকতে গীতাঞ্জলির জন্যে অাঁকা।

Leave this chanting and singing —'ভজন পূজন সাধন আরাধন' —গীতাঞ্জলি ১১৯ —পুরীর সমুদ্রে জাল টেনে নুলিয়া জেলের মাছধরা, (পরে দেখুন)।

The song that I came to sing —'হেথা যে গান গাইতে আসা' —গীতাঞ্জলি ৩৯ —একতারা-হাতে বাউল। পাথারপুরীতে থাকতে গীতাঞ্জলির জন্যে অাঁকা। অবনীবাবুর সংগ্রহ। ৮"×৬", ওয়াসলি, লাইনে অাঁকা।

Art Thou abroad on this stormy night ? —'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার' —গীতাঞ্জলি ২০ —একটি মেয়ে গালে হাত দিয়ে বসে ভাবছে —খোলা জানালায় বসে বাইরে ঝড় দেখতে দেখতে। পাথারপুরীতে থাকার সময়ে গীতাঞ্জলির জন্যে এঁকেছিলুম। অবনীবাবুর সংগ্রহে ছিল। ৮"×৬", ওয়াসলি, টেম্পেরা।

I asked nothing from Thee —'তোমার কাছে চাইনি কিছু' —'কুয়ার ধারে' —খেয়া। কুয়োর ধারে একটি মেয়ে বসে ভাবছে। রেখাঙ্কন।

When I bring to you coloured toys —'রঙিন খেলেনা দিলে'

—'কেন মধুর' —শিশু। মা ও মেয়ে মুখোমুখি বসে আছে।

Thou art the sky and Thou art the nest as well —'একাধারে তুমি আকাশ তুমি নীড়' —'নৈবেদ্য' ৮১। একটি গাছে এক ঝাঁক পাখী বসে আছে, আর অনেক পাখী চারদিক থেকে উড়ে আসছে —বসবে বলে।

I am like a remnant of a cloud —'আমি শরৎ শেষের মেঘের মতো' —'লীলা' —খেয়া। মেঘের প্রেক্ষাপটে একজন বিধবা মেয়ে ফুলের সাজি হাতে।

Make me Thy poet O Night, veiled Night —'মোরে কর সভাকবি' —'রাত্রি' —কল্পনা। (আগে দেখুন)।

I cling to this living raft, my body —'এই দেহটির ভেলা নিয়ে' – বলাকা ৩০। ভেলায় বসে রবি-বাউল এস্‌রাজ বাজাচ্ছেন। রঙ্গিন।

She is still a child —'ওগো বর ওগো বঁধু' —'বালিকা বধূ' —খেয়া। একটি মেয়ে বসে প্রসাধন করছে। রঙ্গিন।

The Waves. the sky devouring waves —'বিপুল-তরঙ্গ রে' —'গান' —গীতবিতান। মেঘের পরিমণ্ডলে স্ত্রী ও পুরুষের ছবি। পুরুষের হাতে-ধরা অর্ধচন্দ্র —সম্ভবতঃ শিব-দুর্গার প্রতীকে 'জীবন ও মৃত্যু'র পরিকল্পনা (আগে —১৯১১ দেখুন). রঙ্গিন, টেম্পেরা।

[শ্রীনন্দলালের ২২সংখ্যক ডায়েরিতে আছে : 'গীতাঞ্জলির যখন ছবি করি সেই সময়কার কতকগুলি কল্পনা'।]

কলিকাতায় বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের প্যানেল :

পার্থসারথি

পাশাখেলা, পাশাখেলা হচ্ছে। যে দানগুলো জিতেছে সেগুলো এক দিকে রাখা আছে, আর অন্য দিক থেকে পাশা নিয়ে আসছে। পঞ্চপাণ্ডব রেগে বসে আছেন। শকুনির চেহারাটা কাবেলের মতন দেখতে। এই ছবিটি থেকে ১৪"×৯" কাঠের ওপর টেম্পেরায় এঁকেছিলুম। কিনেছিলেন মি. খাণ্ডেলওয়ালা।

কৌরবের মন্ত্রণা

পাণ্ডবগণের বিষাদ

দুর্যোধন যুদ্ধ করছেন —কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের শেষ পর্ব —জনশূন্য মাঠ, মাঝে মাঝে চিতা জ্বলছে, কৃপাচার্যেরা সবাই পালাচ্ছেন, মাঝে যুধিষ্ঠির।

যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ —(এই প্যানেলের পরিচয় আগে দেখুন)।

উদয়সবিতা (ঐ)

সিস্টার নিবেদিতার লো-রিলিফের মূর্তি (ঐ)

অসি ও বাঁশী — জ্ঞান ও কল্পনা (ঐ)

১৯১৮ ঃ **অরণ্যে পথহারা (গরু)**, ১৮"×৮", দেশী কাগজ, ওয়শ পেনটিং, প্রফুল্লনাথ ঠাকুর সংগ্রহ। গাংটার ডাকবাঙ্গলো থেকে সন্ধ্যায় বনের দিকে বেড়াতে গিয়ে দেখি, একটি রাখাল তার হারানো গরুকে সাড়া দিয়ে খুঁজছে। আর গরুটি বনের ভেতর থেকে সাড়া দিচ্ছে। ঘরে এসে বিষয়টি reverse করে দেখলুম, —গরুটি পথ হারিয়ে রাখালের ডাক শুনে সাড়া দিচ্ছে। ছবি আঁকার পরে, আমি গরুটিকে রেখে, জঙ্গলটা কেটে দিয়েছিলুম। অবনীবাবু বলতে, আবার আমার জিনিসই হলো —জঙ্গল। অবনীবাবু বলেছিলেন —জঙ্গলটা বাদ দিয়েছ কেন? তাই কেটে আবার জুড়ে, মাউন্ট্ করা হলো। প্রবাসীতে প্রিন্ট্ হয়েছিল।

পুরীর সমুদ্রে জাল টেনে নুলিয়া জেলের মাছধরা — ৭"×৫½", নেপালী কাগজ, ইঙ্কে টাচের, লাইনের কাজ, নিজ-সংগ্রহ। পুরীর সমুদ্রে দু-জন নুলিয়া জেলে (স্বামী-স্ত্রী) জাল টানছে। পুরীতে অবনীবাবুর বাড়ি 'পাথারপুরী'তে গিয়ে আঁকা হয়েছিল ১৯১৭ সালে। গুরুদেবের ইংরেজী Gitanjali and Fruit-Gathering বই-এ ছাপা আছে।

শান্তিনিকেতনের পথে —রাত্রে, আ. ৩৬"×৩০", মোটা কার্টিজ পেপার, ওয়শ, ইঙ্কে টাচের কাজ, কলাভবন-সংগ্রহ। মূল্য ১২৫ টাকা। রাত্রে গরুর গাড়ীতে করে জ্যোৎস্নার আলোতে যাচ্ছি —ট্রেন ধরবো বলে — শশী চাকর গাড়োয়ান —গরুর গাড়ীর নিচে লণ্ঠন ঝুলছে।

রাখাল, ৪৬"×২৬", নেপালী কাগজ, টেম্পেরা, মূল্য ৬০ টাকা। এই ছবিখানি থেকে পরে লাইব্রেরী-বারাণ্ডার নিচেতলায় ফ্রেস্‌কো করা হয়েছে।

শরৎ, ১৬½"×১১", কার্টিজ পেপার, কালো লাইনে আঁকা, নিজ-সংগ্রহ, মূল্য ১৫০ টাকা। এই ছবিখানির একখানি কপি চৌ-এন্‌-লাইকে উপহার দেওয়া হয়। পরে, বড়ো করে সিল্কের ওপরেও এঁকেছিলুম। এই ছবিখানির পরে নাম দেওয়া হয়েছে —শালুকসহ বালিকা।

নটী, ওয়শ মূল্য ১২৫ টাকা।

স্নানের পরে —একটি মেয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে। ১৪"×৯", ওয়শ, মূল্য ৫০০ টাকা।

শারদশ্রী, ৩৬"×১৮", কাঠের পাটার ওপর আঁকা, এগ্‌-টেম্পেরা, গগনবাবুর ছেলে নবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিবাহে উপহার দিয়েছিলুম। ছবির মূর্তিটি সরস্বতীর মতন দেখতে। পরে লাইন-ড্রয়িং-এ এর থেকে যে-ছবি করেছিলুম তার নাম হয় —'বীণাবাদিনী'।

জেলে ৭"×৫½", নেপালী কাগজ, ইঙ্কে টাচের কাজ, নিজ-সংগ্রহ। একজন জেলে হাতে জাল নিয়ে যাচ্ছে —পুরীতে সমুদ্রে মাছ ধরবার জন্যে।

'ঝরছে জগৎ ঝরণাধারা', টেম্পেরা। (আগে দেখুন)।

সাঁওতাল নৃত্য, ১৭"×১১", কালো লিথো প্রিণ্ট্‌। রাঁচিতে এঁকেছিলুম। (পরিচয় আগে দেখুন)।

হরিণ, ২৪"×২০", কন্‌টিনিউয়াস কার্টিজ পেপার, গেরির লাইনের কাজ, নিজ-সংগ্রহ। কোণারকের মূর্তি থেকে করা। মূল্য ২৫০ টাকা।

হাতী, (ঐ সিরিজ)।

গণপতি, জাভার গণেশ-মূর্তি থেকে ড্রয়িং, (ঐ)।

ঘোড়া, (ঐ সিরিজ)।

১৯১৯ : সাঁওতাল বালিকা, ৫১"×২৬½", কার্টিজ পেপার, ওয়শ, প্রফুল্লনাথ ঠাকুর-সংগ্রহ। একজন সাঁওতাল মেয়ে খোয়াই-এর মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে।

***শিব ও পার্বতী**, অজন্তার কপি (১৯১৭ ?)।

হাট থেকে ফেরা, ওয়শ।

* শরৎপ্রভাত

পুষ্পিত তৃণ. ওয়শ।

সহচরী. ওয়শ, মূল্য ২৫০ টাকা।

আলপনা, ২৭"×১৮", নেপালী কাগজ, টেম্পেরা, মূল্য ৩৫০ টাকা। একটি মেয়ে আলপনা দিচ্ছে ঝুঁকে পড়ে। নানা রঙের রেখা দিয়ে করা। করেছিলুম সোসাইটিতে। ওদেরই সম্পত্তি। মূলার সাহেবের খুব পছন্দ হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, —ভারতীয় পদ্ধতিতে খুব ভালো হয়েছে।

দিনশেষে, ওয়শ। শালবনের মধ্যে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আম্বালাল সারাভাই-সংগ্রহ।

খেলার সময়, ওয়শ।

গ্রামের মেয়ে —কলসী কাঁখে, ১২"×৮", কার্টিজ পেপার, ওয়াটার কালার, মূল্য ২৫০ টাকা। কলিকাতার একজনের জন্যে আঁকা। (আগে দেখুন)। নিজ-সংগ্রহে ১৯৪৮ সালে করা কপি আছে। এই কপিটা কিন্তু অরিজিন্যালের মতো সুন্দর হয়নি।

অন্ধের নড়ি. ওয়শ।

বুদ্ধের প্রত্যাবর্তন, আ. ১৪"×১১", ওয়শ। গোপা, যশোধারা প্রভৃতি পুরনারী-পরিবৃত বুদ্ধ। বারাণসীর রায় কৃষ্ণদাসের সংগ্রহ।

সুদামা ও কৃষ্ণ, ১২"×৮", ওয়াট্‌ম্যান পেপার, ওয়শ, রঙিন লাইন ও শেডের কাজ, নিজ-সংগ্রহ। (পরিচয় আগে দেখুন)।

বকের পাঁতি. পাখীর ঝাঁক, (মৃদাক্ষিয়র-সংগ্রহ?), লাইন-ড্রয়িং।

আবাস, ৪২"×৫$\frac{১}{২}$" *কার্টুন।

শবরী —যৌবনে ১২"×৯", ওয়শ। নীলরতনবাবুর মেয়েদের উপহার দেওয়া হয় (আগে দেখুন)। দ্বিতীয় দফায় করা হয় ১৯৪১ সালে। ১৪$\frac{১}{২}$"×৯$\frac{১}{২}$". কাঠের ওপর করা, এগ্‌-টেম্পেরা ও টাচের কাজ, নিজ-সংগ্রহ, মূল্য ১০০০ টাকা।

ঐ —প্রৌঢ়ে. ঐ ঐ ঐ

ঐ —বার্ধক্যে, ঐ ঐ ঐ

পুস্তকচিত্রণ, —Tegore's The Centre of Indian Culture : Essays

—With Vignettes by Nandalal Bose. Published by the Society for the Promotion of National Education, Adyar, Madras —আশ্রমের আদর্শে শিক্ষাদানকল্পে বৃক্ষতলে কুটীর, ছাত্রাবাসাদির রেখাঙ্কন।

১৯২০ মৃগশিশু, ৭"×৫", পোস্টকার্ড, ওয়শ।

মধ্যাহ্নের কাজ, ওয়শ, মূল্য ১৭৫ টাকা।

গিরীশ, ৯"×৬", ওয়শ, রামকৃষ্ণ-মিশন-সংগ্রহ। Modern Review, Sept. 1920-তে সিস্টার নিবেদিতার মন্তব্য-সমেত মুদ্রিত (আগে দেখুন)।

আমার গুরু অবনীন্দ্রনাথ—যেমনটি দেখেছি, আ. ১২"×৮", দেশী কাগজ, ওয়াসলী, ওয়শ, টেম্পেরা। যত রকম সাদা রং ভারতীয় পদ্ধতিতে ব্যবহার করি তার সব দিয়ে আঁকা। সাদা মোটা রং দিয়ে উঁচু করে করে আঁকা। মুখটা, হাত দু'টি গোল্ড্ দিয়ে রিলিফের মতো করা হয়েছে। গুরুর ছবি বলে সাদা রং দিয়ে করেছি। কোঁচা দিয়ে কাপড়-পরা —লম্বা ফুল-কোঁচা। এই ছবিখানি ফিনিশ করা হয় ১৯২৬ সালে। অবনীবাবুকে দিয়েছিলুম। তাঁর কাছ থেকে এখন (১৯৫৬) অলকেন্দ্রনাথের সংগ্রহে আছে।

কুরুক্ষেত্র, ৩০"×২১", কার্টিজ পেপার, টেম্পেরা, প্রফুল্লনাথ ঠাকুর-সংগ্রহ। অর্জুন ঘোড়ার রাশ ধরে আছেন। ছবির back-ground-টা টকটকে লাল —সন্ধ্যে হয়ে গেলে যেমন হয়।

আয়োজন

কাশীর ঘাট, পোস্টকার্ড থেকে করা দশাশ্বমেধ ঘাটের দৃশ্য।

শ্রমিক

গজ-উদ্ধার, ১৮"×১০", গোল্ড্-লাগানো কাগজের ওপর আঁকা। ওয়শ, টেম্পেরা। ও. সি. গাঙ্গুলীর কাছে আছে। বিষ্ণু দাঁড়িয়ে আছেন শঙ্খ-চক্র নিয়ে। তলায় গজ-কচ্ছপে যুদ্ধ হচ্ছে। গজকে অক্টোপাশে জড়িয়ে ধরেছে। গজটা সাদা রং-এর। ছবিখানি বোধহয় তখন কিনেছিলেন ও. সি. গাঙ্গুলী।

ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর কুরুক্ষেত্র-দর্শন, আ. ২৪"×১৮", মাউন্টেড্ নেপালী কাগজ, ওয়শ আর টেম্পেরা মিশিয়ে আঁকা। আম্বালাল

সারাভাই কিনেছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র আর গান্ধারী দু'জনের পা শুধু দেখা যাচ্ছে। কুরুক্ষেত্রের মধ্যে দিয়ে ওঁরা যখন যাচ্ছিলেন গান্ধারীর পায়ে একটা তীরের ফলা লেগে গেছে। পায়ে ফলা লেগে যাওয়ায় গান্ধারী পা-টাকে উঁচু করে তুলে আছেন। চারদিকে রক্ত থৈ থৈ করছে। ছবিখানির fine finish করা হয়েছিল। ব্লান্ট্ সাহেব ওরিয়েণ্টাল সোসাইটির তখনকার সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি ১০০ টাকা দিয়ে ছবিখানি কিনেছিলেন। পরে, তিনি আমাকে বললেন, —গান্ধারীর পা-টা দেখলে রাত্রে আমার ঘুম হয় না। তুমি তোমার ছবিটা তোমার বাড়িতে নিয়ে যাও।

১৯২১ ঃ **উমার প্রত্যাখ্যান**, ৫৩"×২১", কার্টিজ পেপার, টেম্পেরা, ওয়শ মেশানো। মূল্য ৭৫০ টাকা। প্রফুল্লনাথ ঠাকুর-সংগ্রহ। কালিদাসের কুমারসম্ভবের বর্ণনা থেকে আঁকা। উমা শিবকে পদ্মবীজের মালা দিতে এলে, তাঁকে দেখে শিবের মনে বিকার ঘটলো। ফলে, শিব সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে চলে গেলেন। শেষে পিতা হিমালয় এসে নিয়ে গেলেন উমাকে। গাছপালাতেও বসন্তের পরে আবার এক সময় শীত এসে থাকে। আমার ছবিতেও তাই আছে। পদ্মবীজের ছেঁড়া মালা মাটিতে পড়ে আছে। পদ্মের পাপড়ি খসে খসে যাচ্ছে। চারদিকে বরফ জমে গেছে। উমা একজন সখীর হাতের ওপর ভর দিয়ে মাথা নিচু করে কোনও রকমে দাঁড়িয়ে আছেন। —প্রকৃতির মধ্যেও অধ্যাত্ম রূপ দেওয়া হয়েছে।

বর্ষার রূপ ১১"×৮", টেম্পেরা।

মজুর দল —মাটি কাটছে, ৪৬"×১৪", টেম্পেরা।

নৃত্যরতা কালী, ১৩½"×৯½", জাপানী মাউণ্টেট পেপার, টেম্পেরা। কালী হাতে পদ্মফুল নিয়ে আছেন ও নৃত্য করছেন —আগুনের শিখার মধ্যে। অবনীবাবু কিনেছিলেন ৩০০ টাকা দিয়ে। তিরিশ টাকা সিরিজের ছবি (আগে দেখুন)।

বসন্তের পদক্ষেপ, ওয়শ। মূল্য ১৮০ টাকা।

আনমনা, ৯"×৭", কার্টিজ পেপার, ওয়াশ। একটি মেয়ে রান্না করছে, আর একটি বিড়াল পিছন দিক থেকে হামাগুড়ি দিয়ে আসছে —রান্না-মাছ খেতে, —মেয়েটি টের পায়নি। ছবিখানির রং-টা খুব ভালো হয়েছিল। কিন্তু অবনীবাবুর পছন্দ হয়নি। তখন ছবি হলেই অবনীবাবুকে দেখাতে নিয়ে যেতুম। সে-সময়ে সোসাইটি থেকে শান্তিনিকেতনে চলে আসায় আমার মনটা খুব টেগুার ছিল। শান্তিনিকেতনে আমার আসা নিয়ে ওঁদের খুড়ো-ভাইপোয় ঝগড়াও হয়ে গিয়েছিল কিছু আগে। খুড়োকে যুক্তিতে অাঁটতে না-পেরে, ভাইপো একান্ত অনিচ্ছায় আমাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। তিনি আমার ওপরেও ঐ সময়ে অপ্রসন্ন হয়েছিলেন। —এখন এই ছবিখানায় হেঁয়ালির গন্ধ পেয়ে অবনীবাবু আমাকে তিরস্কার করলেন। বলেছিলেন, —'এ কিছু হয়নি। নন্দলাল শান্তিনিকেতনে গিয়ে সব ভুলে-টুলে গেল।' —তাঁর এই কথা শুনে আমি বললুম, —সোসাইটিতে আমি এ-ছবি বিক্রী করবো না। বিক্রীর জন্যে দিয়েও ছবিখানা আমি ফেরৎ আনালুম। পরে, এই ছবিটি সমরেন্দ্রবাবু কিনে নিলেন। সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংগ্রহ থেকে কিনেছিলেন অজিত ঘোষ। ১৩২৮ সালের আশ্বিনের 'প্রবাসী'তে ছাপা হয়েছিল। আর ঐ সময়ে করা আমার 'উমার প্রত্যাখ্যান' কিনেছিলেন পি. এন্. ঠাকুর।

মধ্যপর্ব

(১৯২০-৫১)

প্রথম স্তবক (১৯২০-৩৫)

॥ শান্তিনিকেতনে 'কলাভবন'-এর সূত্রপাত, ১৯০৪-১৯ ॥

১৯০৪ খৃস্টাব্দে (বঙ্গাব্দ ১৩১১) পূজার ছুটির আগে, আন্দাজ তিন-চার মাস ধরে গোপালচন্দ্র কবিকুসুম শান্তিনিকেতনে ছাত্রদের ড্রয়িং শিক্ষা দিতেন। তিনি খুব সুরসিক লোক ছিলেন। যশোর জেলার মনোখালি গ্রামে তাঁর বাড়ি ছিল।

তাঁর পরে এলেন শ্রীনগেন্দ্রনাথ আইচ। রবীন্দ্রনাথের মাতুল ও শ্বশুর-বাড়ি —খুলনা জেলার দক্ষিণডিহি গ্রামে ১২৮৫ বঙ্গাব্দে তাঁর জন্ম। ১৯০১ সালে আইচ মহাশয় কলকাতা ট্রেনিং স্কুল থেকে ফ্রী-হ্যাণ্ড্ ও মডেল-ড্রয়িং-এর প্রাথমিক পরীক্ষায় পাশ করে গভর্নমেন্ট আর্টস্কুলের প্রিন্সিপ্যাল হ্যাভেল সাহেবের সার্টিফিকেট লাভ করে, ভার্নাকুলার মাস্টারশিপ পরীক্ষার ক্লাস পর্যন্ত ড্রয়িং-শিক্ষাদানের অধিকারী হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে ১৯০৫ সালের (বঙ্গাব্দ ১৩১১) মাঘ মাসের প্রথম দিকে তিনি শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে যান ড্রয়িংমাস্টার হয়ে। ওখানে তখন শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্য-বিদ্যালয় সাময়িকভাবে স্থানান্তরিত হয়েছিল। শিলাইদহে সে-সময়ে প্রায় চল্লিশজন ছাত্রকে তিনি মডেল-ড্রয়িং শিক্ষা দিতেন। শিলাইদহে ছিলেন তিনি মাত্র তিন মাস —মাঘ থেকে চৈত্র পর্যন্ত। ফিরে এলেন ইস্কুল ফিরে এলে, তিন মাস পরে —পাঁচ সালে। অতঃপর, তিন মাস গরমের ছুটির পরে, ১৩১২ বঙ্গাব্দে আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে আইচ মহাশয় শান্তিনিকেতনে আসেন —গোপালচন্দ্র কবিকুসুমের জায়গায়। মোহিত সেন মহাশয় তখন এখানকার শিক্ষক। প্রায় দেড় বৎসরকাল অন্য অধ্যাপনা কাজের সঙ্গে আইচ মহাশয় এখানে ড্রয়িং-শিক্ষা দিয়েছিলেন। ড্রয়িং-এর ক্লাসে শান্তিনিকেতনে তখন পঁচিশ-ছাব্বিশ জন ছাত্র ছিল। শচীন সেন, শ্রীসুধীরঞ্জন দাস, শ্রীঅপূর্বকুমার চন্দ, ব্রহ্মবিহারী সরকার, গৌরগোপাল ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রভৃতি সেকালে তাঁর ছাত্রগোষ্ঠীর অন্যতম ছিলেন।

শমীন্দ্রনাথ ও মুকুলচন্দ্র দে-ও তাঁর ছাত্র ছিলেন। তিনি ক্লাসে বাঙ্গালাও পড়াতেন। সে-সময়ে আশ্রমে মোট জনা-তিরিশ ছাত্র ছিলেন। আইচ মহাশয় ওঁদের তখন প্রাথমিক ড্রয়িং, আর পূর্ণ বাগচী মহাশয় মাপজোখ—বিশেষ করে 'বেণুকুঞ্জে'র বাঁশের বেড়ার ক্ষেত্রের মাপজোখ শেখাতেন। পূর্ণ বাগচী রবীন্দ্রনাথের জমিদারিতে আমিন ছিলেন, জরিপের কাজে। নিবাস ছিল ফরিদপুর জেলায়।

পরে আইচ মহাশয় অন্য বিষয় পড়াতে নিযুক্ত হলে, এলেন —'ওঙ্কারানন্দ'। তাঁর আসল নাম —পাঁচুগোপাল রায়। তিনি কিছুকাল এখানে আর্ট ও পেন্‌টিং শিক্ষক ছিলেন। তাঁর ছাত্রধারার অন্যতম হলেন শ্রীমুকুলচন্দ্র দে। 'পাঁচুবাবু' —পাঁচুগোপাল রায় ওরফে 'ওঙ্কারানন্দ' খুব ভালো ড্রয়িং-শিক্ষা দিতেন। নিজেও তিনি ভালো আঁকতে পারতেন। তিনি ছিলেন কৃষ্ণনগরের লোক। বৃন্দাবনে গিয়ে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন। ১৯০৮-৯ সালে মাত্র এক বছর ছিলেন তিনি শান্তিনিকেতনে। তিনি নিজে ছিলেন গেরুয়াধারী এবং গেরুয়া-পরায় ও ইঁট মাথায় দিয়ে শোয়ার কৃচ্ছ্র-সাধনায় ছাত্রদের উৎসাহ দিতেন বলে তাঁকে 'ওঙ্কারানন্দ' বলা হতো। শ্রীমুকুলচন্দ্র তাঁর কথা 'best drawing teacher' হিসাবে এখনও (১৯৬৬) বিশেষভাবে মনে রেখেছেন।

ওঙ্কারানন্দের এক বছর পরে, শ্রীসন্তোষকুমার মিত্র ড্রয়িং-শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৯১০ সালের আষাঢ়মাসের প্রথম দিকে শ্রীসন্তোষকুমার মিত্রকে অবনীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে পাঠালেন। এঁর বাড়ি হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার নতিবপুর গ্রামে। ইনি আর্টস্কুলে দু'বছর শিক্ষালাভ করেছিলেন। তৃতীয় বর্ষে পড়বার সময়ে, রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে অবনীবাবু এঁকে শান্তিনিকেতন পাঠিয়েছিলেন। তিনি ড্রয়িং শিক্ষা দিতেন। চতুর্থ শ্রেণীতে ছাত্র ছিল কুড়ি জন। আশ্রমে মোট ছাত্রসংখ্যা তখন প্রায় এক শত। বর্তমান লাইব্রেরীর নিচের তলায় পশ্চিম দিকের বাড়ি 'গুরুকুল'-এ, 'আদিকুটিরে'র বারাণ্ডায় ও তার লাগাও 'নাট্যঘরে' তখন ক্লাস্ বসতো। সন্তোষকুমার মিত্র মডেল-ড্রয়িং ও হ্যাভেলসাহেবের ড্রয়িংবুক থেকে ফ্রী-হ্যাণ্ড্ মডেলিং ছাত্রদের শেখাতেন। কাঠের ওপর গাছ-পালা, ফল-ফুল আঁকতে শেখাতেন ড্রয়িংবুক থেকে। মাটির মডেলিং করে হাতি-টাতি গড়া হতো। শ্রীধীরেন দেববর্মণ, শ্রীবিনোদ মুখোপাধ্যায়,

শ্রীমণি গুপ্ত তাঁর ছাত্র ছিলেন।

মন্দির সাজাবার জন্যে মিত্র মহাশয় ছাত্রদের নিয়ে কাছাকাছি গ্রাম আদিত্যপুর থেকে ফুল আনতে যেতেন। মন্দির-অলঙ্করণে সেই সময় থেকে আলপনা দেওয়া শুরু হলো। ক্ষিতিমোহনবাবু বৈদিক বেদী রচনার জন্যে শ্রীমণি গুপ্ত প্রভৃতিকে দিয়ে বৈদিক আলপনা আঁকাতেন।

মুকুল দে, সন্তোষ মিত্র সকলে পাল্লা দিয়ে ছবি আঁকতেন। এঁকে, অবনীবাবু, গগনবাবুর কাছে পাঠিয়ে দিতেন। অবনীবাবুর উত্তর আসতো, —'আমার ছবির চেয়ে ভালো হয়েছে'। রবীন্দ্রনাথ গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে স্কেচ্ করতে আদেশ করতেন ওঁদের। বলতেন, —'বই পড়ে জ্ঞানলাভের মতো, গ্রামে গিয়ে প্রকৃতি-পাঠ করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় কর-গে।' সন্তোষকুমার ছাত্রদের লাইন-ড্রয়িং শিক্ষা দিতেন; কিন্তু ছবি আঁকায় ওদের 'inspire' করতে পারতেন না। স্বয়ং কবির মস্ত প্রেরণা সামনে থাকা সত্ত্বেও সন্তোষকুমারের মন উদাসীন হয়ে রইলো। তিনি কার্যান্তরে নিযুক্ত হলেন।

আশ্রমের শিশুবিভাগের কর্তৃত্বভার তাঁর ওপর বিশেষ করে দেওয়া হলো। ১৯১৫ সালে গান্ধীজী প্রথমে আশ্রমে এলেন। সন্তোষ মিত্র তার পরেও দু'বছর —মোট ছ'বছর এইভাবে এখানে শিক্ষকতা করেন। সেকালের শান্তিনিকেতনের যে-সব হাতে-লেখা পত্রিকা 'প্রভাত', 'বাগান' ইত্যাদি বের হতো তাতে সন্তোষকুমারের দান আছে কিছু কিছু।

১৩২৬ সালের আষাঢ় সংখ্যার 'শান্তিনিকেতন'-সংবাদ এই: 'আমাদের কৃষি ও বাগিচা বিভাগ ক্রমেই ধীরে ধীরে উন্নতি লাভ করিতেছে। সুরুলের বাড়িতে কৃষিকার্য দেখিবার জন্য শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার মিত্র নিযুক্ত হইয়াছেন। গোশালাও সেখানে স্থানান্তরিত হইয়াছে।' —আর সেই থেকে মিত্র মহাশয় চিত্রকর্ম ছেড়ে কৃষিকর্মে আর গো-পালনে পরে পরে পোক্ত হয়ে উঠলেন। কলাবিদ্যা ত্যাগ করে বর্তমানেও (১৩৭৩) তিনি এই পেশাতেই মন-প্রাণ লাগিয়ে রেখেছেন।

সন্তোষবাবু আশ্রমে থাকতে থাকতেই অসিতকুমার হালদার ১৯১১ সালে শান্তিনিকেতনে আসেন। তিনি উপর-ক্লাসে রং-টং দিয়ে ছবি আঁকা শেখাতেন। অসিতকুমার আসার পরে, আশ্রমে ড্রয়িং-শিক্ষায় উন্নতি

দেখা দিল। রঙের বিশেষ ব্যবহারে এখানকার ড্রয়িং-শিক্ষা মোড় ফিরিয়ে চিত্রবিদ্যার প্রশস্ততর পথ গ্রহণ করল। ১৯১২ সালে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে রীতিমতো কলাবিদ্যা-বিতরণের কেন্দ্র স্থাপন করেন। অবনীবাবুর পরামর্শমতো অসিতকুমার আশ্রমে তখন আর্ট-গ্যালারী পত্তন করেছিলেন।

॥ কলাভবনের আদিপর্বে অসিতকুমারের যোগাযোগ, ১৯১১-২৩ ॥

ঠাকুর-পরিবারের আত্মীয়, জগদ্দলের বিখ্যাত হালদার-বংশের সন্তান অসিতকুমার হালদার মহাশয় ১৯১১ সালে কলকাতার গভর্নমেণ্ট আর্টস্কুলে অবনীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর শিক্ষা সমাপ্ত করেন। এর পরেই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ডেকে নিলেন শান্তিনিকেতনে। কবির মতে, অসিতকুমারের তখন 'হাত তৈরি' হয়েছে, কিন্তু 'দৃষ্টি তৈরি' হয়নি। দৃষ্টি তৈরি হলে, তৈরি হাত দিয়ে অসিতকুমার আশ্রমের কাজ চালাতে পারবেন —কবি সেই আশা করেছিলেন। সে-সময়ে তিনি জোড়াসাঁকোর বাড়িতে অসিতকুমারের কাছে শান্তিনিকেতনের একটা চমৎকার ছবির বর্ণনা করলেন —সেখানকার ঋতু-পরিবর্তনের মধ্যে বিচিত্র নৈসর্গিক লীলা, আর দিগন্তপ্রসারিত তরঙ্গায়িত উষর মাঠের ওপর সকাল, সন্ধ্যা ও মধ্যাহ্নের অপূর্ব রূপ রস যা সর্বদা আশ্রম-পরিবেশে সুলভ তার লোভনীয় বিবরণ দিয়ে।

অসিতকুমার আশ্রমে আসার আগেই, কবি আশ্রমের অধ্যাপকমণ্ডলীকে ডেকে বলে দিয়েছিলেন, তিনি আশ্রমে একজন sensitive শিল্পীকে আনছেন, তাঁকে যেন টিকিয়ে রাখা যায়, অর্থাৎ যেন তাঁর মন এখানে বসে। কবি নিজে সেই সময়ে পেনসিলে অসিতকুমারের প্রতিকৃতি এঁকে তাঁর আনন্দের ব্যঞ্জনা প্রকাশ করেছিলেন। কবি অসিতকুমারকে ভার দিলেন আশ্রমে শিশুদের নিয়ে একটি শিল্পকেন্দ্র গড়ে তোলবার জন্যে। তখন লাহোর ছাড়া প্রায় আর কোথাও ইস্কুল-কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকার মধ্যে আর্টশিক্ষা স্থান পায়নি। রবীন্দ্রনাথ আশ্রমে অসিতকুমারকে নিয়ে পরবর্তী কালের 'কলাভবনে'র গোড়াপত্তন করলেন। আশ্রম-বিদ্যালয়ে যে-সব 'শিশু'র ছবি আঁকবার শখ ছিল তারা এলো অসিতকুমারের কাছে। প্রথমে এলেন

মুকুল দে, তারপরে এলেন ধীরেন দেববর্মণ, মণিভূষণ গুপ্ত, অন্নদাপ্রসাদ মজুমদার প্রভৃতি। সেই সময়ে অবনীন্দ্রনাথ তাঁকে একটি পত্র লেখেন ১৯১১ সালের ১লা জুলাই ঃ —'প্রিয় অসিত, —বোলপুরে যদি ছোট-খাট একটি gallery করে তুলতে পার তো মন্দ হয় না। আমি এখন ষড়ঙ্গ লিখতে ব্যস্ত আছি সুতরাং আর কোনো বিষয়ে মন দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েচে। বোলপুরে শিক্ষা দেওয়ার সম্বন্ধে সব কথা খুলে তোমায় লিখতে সময় নেই, এইটুকু মনে রেখো যে নিজেকে সেখানে গুরু মহাশয়ের জায়গায় বসিয়ে ছেলেদের ভয় খাইয়ে দিওনা —মনে রেখো যে, পাখি পড়াতে হলে পাখির সঙ্গে নিজেও পাখি হতে হয়।'

যাই হোক্, গুরু অবনীন্দ্রনাথের বাক্য শিরোধার্য করে আশ্রমে রবীন্দ্রনাথের অতি কাছে থেকে অসিতকুমার শান্তিনিকেতনে কলাভবনের সূত্রপাত করলেন। ঐ সময়ে নানুর, বড়নগর ইত্যাদি স্থান থেকে মন্দিরের টেরাকোটার ছাঁচ তুলে এনে এখানে তিনি সাজিয়ে রাখলেন। রবীন্দ্রনাথ ১৯১২ সালে অসিতকুমারকে আশ্রমে রেখে বিলেত ও আমেরিকা যাত্রা করেন। ১৩১৯ সালের ২৪শে পৌষ, (১৯১৩) রবীন্দ্রনাথ অসিতকুমারকে লেখেন :—'আমার অনেক দিনের ইচ্ছে বোলপুরে চিত্রবিদ্যাটা বেশ একটু ভালো করেই শেখানো হয়। ঐ সঙ্গে সঙ্গীতটাও চলে। কিন্তু আজ পর্যন্ত লক্ষ্মী সদয় হলেন না —টাকার টানাটানি কিছুতেই ঘুচল না —মনের সাধ মনেই রয়ে গেল।'

১৯১২ সাল থেকে ১৯১৫ সাল পর্যন্ত একটানা চার বছর অসিতকুমার শিশুবিভাগে ছাত্রদের চিত্রবিদ্যা শিক্ষা দিয়েছিলেন। ১৯৪৭ সালে লক্ষ্ণৌ থেকে এই গ্রন্থের লেখককে লেখা আঠারো পৃষ্ঠাব্যাপী একখানি দীর্ঘ পত্রে অসিতকুমার নানা তথ্য জানিয়েছিলেন।

…'তখন শিশু-বিভাগের ছাত্রদের মধ্যে প্রমথ বিশি, যাদব [ধোলে] প্রভৃতি অনেকে ছিলেন। কিন্তু চিত্রানুরাগী ছাত্রদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মণি গুপ্ত, ধীরেন দেববর্মণ, কৃষ্ণকিঙ্কর ঘোষ, অন্নদা মজুমদার ও সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়। তখন মুকুল দে-ও আমার ছাত্রশ্রেণীতে ভর্তি হন। রাঁচিতেও আমার কাছে চিত্রবিদ্যা শেখবার জন্যে অবন-মামা মুকুলকে আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন। …শান্তিনিকেতনে আমার সময়ে যত অভিনয় হয়ে-

ছিল তার সবগুলিতেই আমি অভিনয় করেছিলুম রবিদাদার আদেশে। ঐ সময়ে স্টেজসজ্জা আর অভিনেতাদের সজ্জার জন্যে দায়ী থাকতুম আমি।'...

১৯১১ সালে অসিতকুমার পাকাপাকিভাবে থাকবার জন্যে যখন আশ্রমে এলেন সেই সময়ে আশ্রমের ছেলেরা অভিনয় করেছিল —'শারদোৎসব' (১৯০৮)। অভিনয়ে আর গানে তাদের তৈরি করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ আর দিনেন্দ্রনাথ। এর অল্পদিন পরেই লেখা হলো —'অচলায়তন' (১৯১২)। এই সময়ে 'অচলায়তনে'র অভিনয়ে দিনেন্দ্রনাথ, জগদানন্দবাবু, স্বয়ং কবি, ক্ষিতিমোহনবাবু, পিয়ার্সন সাহেবদের সঙ্গে অসিতকুমারও অভিনয় করেছিলেন। তিনি সেজেছিলেন —উপাধ্যায়। এই সময়ে স্টেজ-বাঁধা, অভিনেতাদের সাজানো ইত্যাদি সব কাজের দায়িত্ব নিতে হতো অসিতকুমারকে। ১৯১৬ সালে 'ফাল্গুনী' রচনা এবং অভিনয় হয়। অসিতকুমার এর জন্যেও স্টেজ-বাঁধার ভার পেয়েছিলেন এবং এতে অভিনয়ও করেছিলেন। 'ফাল্গুনী'র জন্যে স্টেজ বাঁধা হয়েছিল 'আদিকুটীরে'র পাশে 'নাট্যগৃহে'। শান্তিনিকেতনে অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে কবির বন্ধুগণ অনুরোধ করেন 'ফাল্গুনী'র পুনরভিনয় করতে কলকাতায়। ১৯১৬ সালের জানুয়ারী মাসে কলকাতায় 'ফাল্গুনী' পুনরভিনীত হলো। এর কিছু পরে শ্রীনন্দলালেরা শিলাইদহে গিয়েছিলেন। অসিতকুমার পরে 'কলাভবনে'র ছাত্রদের নিয়ে আশ্রমে রবীন্দ্রনাথের 'হাস্যকৌতুক' (১৯০৭), 'ব্যঙ্গকৌতুক' (১৯০৭) অভিনয় করিয়েছিলেন।

১৯১৬ সালে 'বিচিত্রা'র সময়ে অসিতকুমার আশ্রমের কাজে ইস্তফা দিয়ে কলকাতার সরকারী আর্টস্কুলে অধ্যাপনা করেছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের Advanced Design Class-এ ঈশ্বরীপ্রসাদ তখনও শিক্ষক, অসিতকুমার তাঁরই সহকর্মী হলেন। তখন ওঁদের ছাত্র ছিলেন হীরাচাঁদ দুগার, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, নটেশন, সর্বাধিকারী, মহাবীর প্রসাদ, অর্ধেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

১৯১৬-১৭ সালের দিকে রবীন্দ্রনাথ অসিতকুমারের এই অনুপস্থিতিতে আন্তরিকভাবে চেয়েছিলেন 'বিচিত্রা' থেকে শ্রীনন্দলালকে আশ্রমে আনবার জন্যে। ১৯১৭ সালে নন্দলাল শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন, কিন্তু থাকতে পারেননি। তাঁর থাকা সম্ভবপর না-হওয়ায় তাঁর 'বাহন' শ্রীসুরেন্দ্রনাথকে কবি আশ্রমে নিয়ে এলেন ১৯১৭ সালের জুলাই মাসে। এর পরে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে শ্রীনন্দলালকে 'পেয়েও পাচ্ছেন না', সে

অসিতকুমারের আশ্রমের সঙ্গে যোগাযোগের জন্যে নয়, অবনীন্দ্রনাথের অনিচ্ছাই এর মূলগত কারণ। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর মহাশয়কে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে আনার পরে, অসিতকুমার শান্তিনিকেতন-কলাভবনে ফিরে আসেননি। ১৯১৮ সালের গোড়ার দিক থেকে শ্রীনন্দলাল সোসাইটিতে যোগ দিয়েছিলেন —হেড্ আর্টিস্ট হিসেবে —সে তাঁর গুরু অবনীন্দ্রনাথেরই ইচ্ছামূলে।

এই সময়ের দিকে রবীন্দ্রনাথ আহমেদাবাদ বোম্বাই ভ্রমণ করেন। ওখানকার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কন্যাদের তখন আন্তরিক ইচ্ছা, তাঁরা এসে শান্তিনিকেতন-কলাভবনে যোগ দেবেন ভারতশিল্পে পাঠ নেবার জন্যে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথকেও শান্তিনিকেতন-কলাভবন ভালো করে গড়ে তোলবার জন্যে নতুন করে ভাবতে হয়। ফলে, শ্রীনন্দলালকে শান্তিনিকেতনে আনা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। আশ্রমে যাঁর থাকা-না-থাকায় ছাত্র সংখ্যা বাড়ে কমে, তাঁকে 'আমাদের করে' এখানে রাখতে না-পারায় কবির ও আশ্রম-সমাজের মন তখন আশাহত। কিন্তু বাধা আসে অবনীন্দ্রনাথের কাছ থেকে; কারণ, তাঁর আশঙ্কা নন্দলালকে ছাড়লে তাঁদের সোসাইটি ভেঙ্গে পড়বে। এদিকে কবির শান্তিনিকেতন-কলাভবনের 'চুড়ো'ও শ্রীনন্দলাল-বিহনে ভেঙ্গে পড়ছে।

১৯১৫ সালের গোড়া থেকেই শ্রীনন্দলালের সঙ্গে অসিতকুমারের 'সচিত্র কার্ড' লেখা শুরু হয়েছিল —সে-কথা আগে বলা হয়েছে। ১৯১৫ সালের ২০-এ মার্চ ছোটলাট লর্ড কারমাইকেল শান্তিনিকেতন-আশ্রম-পরিদর্শনে আসেন। ১৯১৫ সালের গরমের মধ্যে গান্ধীজী আসেন সপরিবারে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে শান্তিনিকেতন-আশ্রমে। এর আগে, ১৯১৪ সালের ১লা মে শান্তিনিকেতনে স্বয়ং কবি সংবর্ধনা জানিয়েছিলেন শ্রীনন্দলালকে। এঁদের প্রত্যেককেই অভ্যর্থনা করা হয়েছিল আলপনা দিয়ে আর ফুল সাজিয়ে —অসিতকুমারের নেতৃত্বে তাঁর কলাবিভাগের ছাত্রদের নিয়ে। সব শেষে তাঁর গুরুবরণ।

১৯২২ সালে অবনীন্দ্রনাথকে আশ্রমে আনা হয়। শ্রীনন্দলাল তখন কলকাতা থেকে এসে এখানে যুক্ত হয়েছেন। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর তখন আশ্রমে স্থাপত্যকর্মে মন দিয়েছেন। অসিতকুমার কবিতা লিখে অবনীবাবুকে

আশ্রমে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ শিশুবিভাগে কলাভবনের 'অঙ্কুর-উদ্‌গম' পর্ব দেখে গেলেন।

১৯১৪ সালে শীতকালে আশ্রম থেকে অসিতকুমার লাহোর-গভর্নমেণ্ট-আর্টস্কুলের উপাধ্যক্ষ সমরেন্দ্রনাথ গুপ্তের সঙ্গে সরগুজা এস্টেটের এলাকায় রামগড়ে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি সরকারী প্রত্নতত্ত্ববিভাগের ডাইরেক্টার জেনারেল স্যার জন মার্শালের নির্দেশে খৃস্টপূর্বযুগের যোগিমারা-গুহার পুরাতন ফ্রেস্‌কোর নকল নিতে গিয়েছিলেন। ১৯১৭ সালে আশ্রম থেকে অসিতকুমার কেন্দ্রীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগের কাজে গোয়ালিয়র স্টেটের বাগগুহায় গিয়েছিলেন —সেখানকার প্রাচীন ফ্রেস্‌কোর অবস্থা দেখে রিপোর্ট দেবার জন্যে।

১৯১৮ সালে রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী গীতাঞ্জলি চিত্রভূষিত হয়ে প্রকাশিত হয়। এই বিষয়ে অসিতকুমার ও অবনীন্দ্রনাথের মধ্যে যে পত্র বিনিময় হয় সে ওঁদের ভাষায়ঃ 'দেখলুম ইংরাজি সচিত্র গীতাঞ্জলি যখন বেরুলো তাতে আমার রবিদাদাকে জন্মদিনে উপহার দেওয়া একটি ছবিও বেরিয়েছে। ছবিটিতে ছিল একটি শিশু পদ্মের গোছা নিয়ে চলেছে, পিছনে সূর্য উদয় হচ্ছে (Crescent Moon)। আমি তখন ব্যাপার কিছুই জানি না —অবনমামাকে লিখলুম, সেই ছবিটির জন্যে Royalty পাব কিনা। তার উত্তরে অবনমামা লিখলেন ঃ

'প্রিয় অসিত, তোমার চিঠি পেয়ে আমি অবাক হলেম। রবিকাকার বইটার সমস্ত টাকা নন্দলালের এবং তারি সাহায্যের জন্যে Macmillan-দের কাছ থেকে এই order রবিকাকা বন্দোবস্ত করেছিলেন, আমার ছবির জন্যে আমি কিছুই পাইনি —পাবও না। তুমি ভুলে গেছ বোধ হয় আমি তোমার ছবি select করিনি, মুকুলেরও নয়। তোমাদের গুলো রবিকাকা বাড়ারভাগ নিজের ইচ্ছায় America-তে বসে ছাপিয়েছেন। আমার সঙ্গে যে contract, তার ছবি নন্দলাল ও আমি পূর্ণ করে দিয়ে যা টাকা তা সমস্ত নন্দলালকে আমি দিয়েছি। নন্দলাল কিংবা আমি তোমার ছবির জন্যে দায়ী নয় —টাকার জন্যেও নয়।'

'এরপর আর আমি রবিদাদার কোনো বইয়ের illustration করার কথা দুঃস্বপনেও ভাবিনি।'

১৯১৯ সালে শ্রীনন্দলালকে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসেন 'কলাভবন' সচল করবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু তাঁকে সোসাইটিতে ফিরে যেতে হয় অবনীবাবুর নির্দেশে। অনন্যোপায় হয়ে রবীন্দ্রনাথ ১৯২০ সালের ২রা জানুয়ারী এলা চট্টোপাধ্যায়ের মার্ফৎ অসিতকুমারকে আশ্রমে আসার জন্যে খবর দিলেন একটি জরুরী ব্যাপারে। উপরন্তু, ১৯২০ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী কবি শান্তিনিকেতন থেকে 'তার' করে অসিতকুমারকে আশ্রমের কাজে যোগ দিতে বলেন। ১৯২০ সালে অসিতকুমার পুনরায় এখানে এসে যোগ দেন। পর পর তাঁর ছাত্ররূপে এলেন, মণি গুপ্ত, হীরাচাঁদ দুগার, অর্ধেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বিনোদ মুখোপাধ্যায়, মুকুল দে, ধীরেন দেববর্মণ, সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনায়ক মাসোজী, ভি. আর. চিত্রা, শ্রীমূর্তি হাতী সিং, রমেশ বসু মজুমদার, সুকুমারী দেবী, সবিতা দেবী, প্রতিমা দেবী প্রভৃতি। ১৯২০ সালের অধ্যাপক ও ছাত্রদের রচনাবলী নিয়ে আশ্রম থেকে মাদ্রাজে ও সোসাইটিতে চিত্রপ্রদর্শনীর আয়োজনের কথা আমরা আগে বলেছি।

এই সময়ে শ্রীনন্দলাল আশ্রমে আসবার জন্যে বিশেষ উদগ্রীব ছিলেন। এবং প্রতি সপ্তাহে তখন থেকেই তিনি আশ্রমে যাতায়াত শুরু করেছিলেন কলকাতা থেকে। তখনই তাঁকে আশ্রমে অধ্যাপক হিসাবে ধরা হতো।

১৯২০ সালের গোড়া থেকে অসিতকুমার নানা টানা-পোড়েনের মধ্যে শান্তিনিকেতন-আশ্রমে এসে থেকে গেলেন —কলকাতার আর্ট-স্কুলের কাজ থেকে ছুটি নিয়ে। ঐ সময়ে তিনি আশ্রমে এসেছিলেন সস্ত্রীক। ১৩২৬ সালের ফাল্গুন সংখ্যার শান্তিনিকেতন-পত্রিকায় আশ্রম-সংবাদ :

'প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী শ্রীঅসিতকুমার হালদার বিশ্বভারতীর কার্যে যোগদান করিয়াছেন। তাঁহার সহিত তিনটি ছাত্র আসিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে একজন জৈন। সকলেই বিশ্বভারতীতে চিত্রকলা শিক্ষা করিতেছেন। এই সময়ের কিছু আগে ১৯২০ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী লর্ড রোনাল্ডশে শান্তিনিকেতন পরিদর্শনে আসেন (এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ অসিতকুমারকে

লিখেছিলেন, —'আসচে শনিবারে এখানে গভর্ণর আসছে। তার আগে তোর আসা চাই। যখন গভর্ণর কলাভবন দেখতে আসবে তখন কলানাথকে খাড়া করতে না পারলে সে দেখবে কি? এই বেলা তুই এসে কলাভবনটা ভালো করে সাজিয়ে নে —শীঘ্র আয়, একটুও দেরী করিসনে —এখানে কুইনাইনের আয়োজন রাখবো।' —শান্তিনিকেতনে লর্ড রোনাল্ড্‌শের আগমনের কথা আমরা আগে বলেছি।

ঐ সময়ে কলাভবন বসতো 'দ্বারিকে'র ওপর তলায়। নাটকের জন্যে এই কলাভবনের হলঘরে একবার রঙ্গমঞ্চের ব্যবস্থা করা হয়েছিল ছাত্রদের দিয়ে। তখনকার শান্তিনিকেতনের অধ্যাপকদের স্ত্রী আর মেয়েদের নিয়ে শ্রীমতী প্রতিমা দেবী একটি সভা করেছিলেন, তার নাম ছিল —'আলাপিনী সভা'। এই রঙ্গমঞ্চে 'আলাপিনী-সভা'র সভ্যারা অবরোধ-প্রথা ত্যাগ করে পুরুষদের সামনে অভিনয় করার মতো জড়তামুক্ত হতে পারেননি। ফলে, সন্তোষ মজুমদার মহাশয়ের কথায় অসিতকুমার ছাত্রদের নিয়ে অন্যত্র চলে গেলে তবেই মেয়েদের পক্ষে অভিনয় করা সম্ভবপর হয়েছিল। আশ্রমে নৃত্যকলার চর্চাও সেই সময় থেকে শুরু হলো। —মণিপুর থেকে নৃত্যনিপুণ বুদ্ধিমন্ত সিং এলেন আশ্রমে নৃত্যশিক্ষার অধ্যাপক হয়ে।

১৯২১ সালে অসিতকুমার রবীন্দ্রনাথকে 'পাকা' বেতনের ব্যবস্থা করার বিষয়ে লিখলেন আলমোড়াতে। উত্তরে কবি আলমোড়ার রামগড় পাহাড়চুড়ো থেকে জানালেন, —'কল্যাণীয়েষু, —অসিত, তোর চিঠি পেয়েছি, বিদ্যালয়ের খরচ বেড়ে যাচ্ছে। এইবার আরো অনেক বাড়বে। ওখানে তোর কাজ খুব লঘু, বলতে গেলে কিছুই নেই। বোলপুরে তুই বিনা ব্যাঘাতে নিজের কাজ ও মনের উন্নতি করতে পারবি —এই লক্ষ্য করেই আমি ওখানে তোকে টেনেছি। বস্তুতঃ ওখানে তুই নিজের কাজ করছিস, যদি তোকে মোটা মাইনে দিই তাহলে সেটা যে কেবল বিদ্যালয়ের উপর ভার চাপানো হবে তা নয় সমস্ত শিক্ষকদেরই কাছে সেটা অসঙ্গত ঠেকবে। সকলে মনে করবে আত্মীয় বলে তোকে আমি বিদ্যালয় থেকে পালন করছি। তাদেরও দাবী যখন বাড়বে আমি তার জবাব দিতে পারব না। তাই বলছি ওখানে যা

পাচ্ছিস সেটা ঠিক কাজের বেতন মনে করিস নে —ওটা ভাতার মত। তারপর ওখানে তুই অখণ্ড অবসরে যে সব ছবি আঁকবি নিশ্চয় ক্রমশঃ তার দ্বারা তোর আর্থিক অবস্থার উন্নতি হতে পারবে।'

—এ চিঠির নির্গলিতার্থ : রতনে রতন চেনে। একটা আস্ত আদর্শ কলাভবন গড়ে তোলার মতো দৃঢ়চিত্ততা ও প্রতিভা অসিতকুমারের মধ্যে কবি দেখতে পাননি। সুতরাং এর জন্যে যদি 'মোটা মাইনে' কাকেও দিতেই হয়, তবে আশ্রমে সেই দারুন অর্থকৃচ্ছ্রতার দিনে সে-দক্ষিণা রবীন্দ্রনাথের মতে, দেবার একমাত্র যোগ্য পাত্র —শ্রীনন্দলাল। কিন্তু হায়, তাঁকে আগলে বসে আছেন ভাইপো অবনীন্দ্রনাথ সোসাইটীর খাঁচার দ্বারের কাছে।

১৯২১ সালের ২৬-এ সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রনাথ অসিতকুমারকে স্বদেশী চিত্রকলা সম্পর্কে একখানি পত্র লিখেছিলেন। তার বয়ান এই : 'কল্যাণীয়েষু অসিত, …আমাদের ছাত্ররা ইংলণ্ডের বিদ্যালয়ে গিয়ে ছাপমারা হয়ে আসে, এ আমার কিছুতেই ভাল লাগে না। তার ফল হবে এই যে, তাদের যদি স্বকীয় প্রতিভা থাকে, সেটার ওপর দাগ দিয়ে দেবে বৃটিশ সাম্রাজ্য। আমাদের আর্ট রোদেনস্টাইনের ধামাধরা না হলে যদি প্রতিষ্ঠা না পায় তবে সে আর্ট মহাকালের ঝাঁটার তাডনায় বৃটিশ সাম্রাজ্যের আঁস্তাকুড়েই স্থান পাবার যোগ্য। বৃটিশ ইস্কুল মাস্টারের ছাত্রগিরি তো করেচিই …সেই স্কুলের বাইরে একটা বড়ো আঙ্গিনা আছে যেখানে আমাদের ছুটি —সেখানেই আমাদের ভারতীয় দরবার, সেখানে তিনি যার ললাটে জয়তিলক পরিয়ে দেন সেই হয় ধন্য। সাউথকেনসিংটন স্কুল-অফ-আর্টসের ফোঁটায় গৌরব নেই —বরং তাতে আমাদের সরস্বতীর অমর্যাদা করা হয়।

এই সব ছাত্রদের খুব সম্ভব নিজের শক্তি আছে। কিন্তু ইতিহাসে চিরদিনের মতো লেখা থাকবে যে তারা ইংরাজ গুরুমহাশয়ের চেলা —এই ঘোষণায় আমাদের দেশের অগৌরব। অর্থের লোভে আর্টিস্ট যদি নিজের দৈবী শক্তির অসম্মান করতে সম্মত হয় তাহলে তার উপর কখনো ভারতীর প্রসন্ন আশীর্বাদ পড়বে না। তার প্রমাণ আমাদের ঘরের কাছেই আছে।' —এই পত্রখানিও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

১৯১৭ ও ২০ সালে যথাক্রমে হায়দ্রাবাদ-সরকারী-ম্যুজিয়মে অধ্যক্ষের পদ ও বরোদার মহারাজের আর্ট-গ্যালারীর কিউরেটরের পদের জন্যে অসিতকুমারের ডাক এসেছিল। কিন্তু দু-বারই কবি তাঁকে যেতে দেননি।

১৯১৭ সালে অসিতকুমারের বাগগুহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার রিপোর্ট দেওয়ার ফলে সরকার থেকে আবার তাঁকে ডাকলে —বাগগুহার ছবির অনুলিপি করবার জন্যে ১৯২১ সালে। অসিতকুমারের এস্টিমেট্ মতো আরো দু-জন শিল্পী ওখানে গেলেন —শ্রীনন্দলাল বসু আর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর। ১৩২৭ সালের ফাল্গুন সংখ্যার 'শান্তিনিকেতন'-পত্রিকায় আশ্রম-সংবাদ এই: 'শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু, শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর মহাশয়গণ দুই মাসের জন্য গোয়ালিয়রের রাজার আমন্ত্রণে 'বাঘ' গুহার ভিতরকার চিত্রের নকল লইবার জন্য গিয়াছিলেন (পৃ ৬২৭)।

...শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত 'বাঘ' গুহার ও সেই প্রদেশের তাঁহাদের অঙ্কিত বিবিধ চিত্র প্রদর্শন করিয়া সকলকে প্রীত করিয়াছিলেন (পৃ ৬২৮)'।

১৯২৩ সালে অসিতকুমারের মাতৃবিয়োগ হয়। এই ঘটনার ঠিক আগেই পিয়ার্সন সাহেবের পিতামহী মারা যান। তখন তাঁর সঙ্গে তিনি বিলেতে রওনা হলেন। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু অসিতকুমারের এই বিলাত-যাত্রায় বিশেষ উৎসাহ দেখাননি। বিলেতে অসিতকুমার বাস থেকে পড়ে পা ভেঙে ফিরে এলেন ছ-মাসের মধ্যে। ফিরে এসে বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে একটি ছাড়পত্র রাঁচিতে গিয়ে তাঁর পিতার কাছে পেলেন। সেই থেকে শান্তিনিকেতনের সঙ্গে অসিতকুমারের সংস্রব তাঁর মতে, চিরদিনের জন্যে চুকে গেল।

আশ্রম ছেড়ে ১৯২৪ সালে অসিতকুমার জয়পুরে রাজকীয় আর্টস্কুলে অধ্যক্ষ হয়ে গেলেন। জয়পুরে যাবার পরে ১৯২৪ সালের ১০ই জানুয়ারী রবীন্দ্রনাথ অসিতকুমারকে লিখলেন: 'কল্যাণীয়েষু —কাঠিয়াড় থেকে ফিরে এসে নানা হাঙ্গামায় ব্যস্ত ছিলুম তাই তোকে চিঠি লিখতে পারিনি। ওখানে বেশ জমিয়ে বসেছিস্ শুনে খুব খুসি আছি। তোর দরবারে সশরীরে একবার হাজির হব মনে সঙ্কল্প ছিল কিন্তু ঘুরে

ঘুরে হয়রান হয়ে পড়েছিলুম বলে এ যাত্রায় সে আর ঘটে উঠ্‌ল না। আর কোনো এক সময় দেখা যাবে।

কলাভবনের আদর্শ তৈরী করবার প্রস্তাব করেছিস্ সে ত ভালই ঠেকচে। কিন্তু আমরা খুব বেশি ব্যয়সাধ্য ইমারত তৈরি করিয়ে endowment-এর টাকা নষ্ট করতে ইচ্ছা করিনে। যে টাকাটা পাওয়া যাবে তাতে আমাদের কলাভবনকে চিরস্থায়ী করতে পারব এইটেই আনন্দের বিষয়। তার পরে ক্রমে ক্রমে building এবং অন্যান্য আসবাব্ বাড়ানো যাবে। ইতিমধ্যে তোর Architect-কে দিয়ে একটা খসড়া তৈরি করিয়ে যদি পাঠাস তো বেশ হয়।

তোদের ওখানে crafts শেখাবার জন্যে কাউকে পাঠাবার প্রস্তাব করে দেখবো। আমার মনে হয় যারা craftsman তাদেরই ঘরের ছাত্র পাঠালে বেশি কাজ হবে। যারা artist তাদের এরকম কাজে সহজে মন বসে না।

কনকলক্ষ্মীকে* আমি বোধ হয় জানি। তাঁকে পেলে ভালই হয়। কিন্তু আমাদের আর্থিক অবস্থা তো ভাল নয়। বছরে বিশ হাজার টাকার 'নাজাই' হয় —কোনোমতে ভিক্ষা প্রভৃতির দ্বারা পুরিয়ে আসচি, কিন্তু আমি তো আর পারিনে। বড় মাইনে দেওয়া কিছুতেই আমাদের সাধ্যায়ত্ত হবে না।

তোদের বোধ হয় গ্রীষ্মাবকাশ বলে পদার্থ আছে। সেই সময়টা এখানে একবার করে এসে তোদের কলাসম্মেলন করে যাস —ক্রমে যেন দূরে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়িসনে।'

এরপর অসিতকুমার জয়পুর থেকে ১৯২৫ সালের গোড়ার দিকে লক্ষ্ণৌ সরকারী আর্টস্ এ্যাণ্ড ক্রাফ্‌ট্‌স্ স্কুলের অধ্যক্ষ মনোনীত হয়ে যোগ দিলেন। খবর পেয়ে রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্ণৌএ অসিতকুমারকে লিখলেন, —'কল্যাণীয়েষু —অসিত, জানতাম তোর একটা ভালো রকমের কিছু হবে। তা হলো। তোকে কিছুতেই চেপে রাখতে পারলে না। ...যাই হোক বলে রাখছি যখন লখনউ জেলায় আম পেকে উঠ্‌বে তখন তোর এই ফললোলুপ দাদাকে স্মরণ করিস।'

শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার মহাশয়ের ২৩-৪-৪৭ তারিখে লেখা চিঠির পূর্ণ বয়ান এই ঃ

[তাঁর প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত তথ্যাবলির মধ্যে কিছু কিছু অমিল দেখা যায়।]

A. K. Haldar
T. G. Givil Lines
Lucknow. U P.

Sj. Panchanan Mandal
Bidya Vaban
Santiniketan
Birbhum
E. I. Rly. Loop.

প্রীতিভাজনীয়েষু,

আজ ২৩শে এপ্রিল, ২৯শের মধ্যে শান্তিনিকেতন কলাভবন প্রসঙ্গে ভারতীয় শিল্পধারার ইতিহাস সম্পর্কে সকলকথা আমি যা' জানি তা' কি ক'রে ব্যক্ত করব ? ১৯১২ সালে পূজনীয় রবিদাদা মহাশয় (আমার মায়ের মাতুল) শান্তিনিকেতনে কলাশিক্ষার কেন্দ্র সুরু করেছিলেন। আমি চিঠিপত্র থেকেই যতটা পারি তার কথা লিখে পাঠাচ্চি। ঝরা পাতার মত জীবনের অনেক কিছু ঘটনা ও কথা বিস্মৃতির গর্ভে গেছে। কখন কখন তলিয়েও ওঠে কিন্তু সময় অভাবে লেখা হয়না। "রবীন্দ্রসঙ্গ" নাম দিয়ে উত্তরাতে (আশ্বিন. ১৩৪৮) আমি যে একটি প্রবন্ধ লিখেচি সেটিও পাঠালুম তা' থেকে অনেক কথা জানতে পারবেন।

১৯১১ সালে কলিকাতা শিল্পবিদ্যালয়ের পাঠ গুরুদেব অবনীন্দ্রনাথের কাছে যখন শেষ করলাম তখন পূজনীয় রবিদাদা আমার বাকি শিক্ষার ভার গ্রহণ করলেন।

সেই সময় আমার ছোটকাকা স্বর্গীয় নির্মলচন্দ্র হালদার (তখন Traffic Supdt. N. W. Ryতে ছিলেন, পরে Secretary Ry. Board হয়ে ৩৯ বৎসর বয়সে ১৯১৮ সালের War influenzaতে মারা যান।) ১৬-৮-১১ তারিখের চিঠিতে লিখেছিলেন রবিদাদার কাছে থাকার বিষয় ঃ—

"রবিবাবুর সংস্রবে তোর একটা এ জীবনের মস্ত উপকার হ'বে,

সে বিষয় সন্দেহ নেই। ...তিনি হলেন একজন মস্ত artist, আর সেইজন্যে তোর artএর তারেতে তিনি যা' যা' বাজাবেন এতে আমার বিশ্বাস যে অতি সুন্দর ফল হবে। আর এই ফলেতে আমাদের দেশের একটা অভাবনীয় উপকার সাধন হবে।" ইত্যাদি ...

সেই সময় অর্থাৎ ১লা জুলাই ১৯১১ তারিখে আমার গুরু অবনীন্দ্রনাথের পত্র যা' তিনি শান্তিনিকেতনে শিক্ষা দেওয়ার বিষয় উপদেশ দিয়ে লিখেছিলেন তার নকল নীচে দিলাম। আমি তাঁর উপদেশ মত "মাষ্টার মশাই" পদবী না-নিয়ে সেখানে "অসিতদা" নামেই পরিচিত রইলাম।

"বোলপুরে যদি একটি gallery করে তুলতে পার তো মন্দ হয়না।

আমি এখন চিত্রের ষড়ঙ্গ লিখতে ব্যস্ত আছি সুতরাং আর কোনো বিষয়ে মন দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েচে। বোলপুরে শিক্ষা দেওয়ার সম্বন্ধে সব কথা খুলে তোমায় লিখতে সময় নেই, এইটুকু মনে রেখো যে নিজেকে সেখানে গুরুমশায়ের জায়গায় বসিয়ে ছেলেদের ভয় খাইয়ে দিও না। মনে রেখো যে পাখী পড়াতে হ'লে পাখীর সঙ্গে নিজেও পাখী হ'তে হয়।"

আমি তাঁর উপদেশ মত আশ্রমে তখন art galleryর সূত্রপাত করেছিলাম এবং নান্নুর বরনগর প্রভৃতি স্থানে গিয়ে কিছু মৃৎফলকের চিত্রের ছাঁচও তৈরী করে এনে রেখেছিলাম।

আর সতীর্থসুহৃদ নন্দলাল বসু তাঁর ৮ই জানুয়ারী ১৯১৪ সালে আমাকে একটি সচিত্রপত্রে লিখলেন ঃ

"ভাই অসিত, তুমি আজ ঋষির আশ্রমে আছ। রবিবাবু তোমায় কি বলেন একটু টুকে রেখো। তোমার চিঠি পড়ে আমি আশ্রমের কল্পনা কত রকম ক'রে মনে আঁকচি তার নমুনা দুএকটা দিলাম।" ইত্যাদি...

আমি পরে সতীর্থসুহৃদ নন্দবাবু ও সুরেন করকে আশ্রমে আহ্বান করেছিলুম এবং পূজনীয় রবিদাদা একটি সুন্দর কবিতায় তাঁকে বরণ করে গ্রহণ করেছিলেন। সেই কবিতাটি পরে প্রবাসীতে বেরিয়েছিল।

পূজনীয় রবিদাদা ১৯১২ সালে যখন আমাকে আশ্রমে রেখে

বিলাত ও আমেরিকা যান তখন ২৪শে পৌষ ১৩১৯ সালের পত্রে লেখেন : (508 W. High st. Urbana. Illinois)

"কল্যাণীয়েষু

তোর দইওয়ালার ছবি পেয়ে খুসি হলুম। ডাকঘরের ইংরাজি তর্জ্জমা ছাপা হবে তখন এটা কাজে লাগতে পারবে।

তুই বোলপুরে থাকতে পারলে আমি ত খুবই খুসি হই। মুস্কিল হয়েচে এই আমি বিলাত চলে এসেছি, তাতে আমার খরচ যথেষ্ট হচ্চে। ওদিকে বোলপুরের বিদ্যালয়ের খরচ কুলিয়ে উঠ্‌চেনা —সেখানে আর্থিক টানাটানি খুব হচ্চে।—আমি ফিরে না গেলে সে টানাটানি ঘুচবেনা। এখানে তোকে ৫০। ৬০ টাকা মাসিক দিয়ে বিদ্যালয়ে রাখা একেবারেই তার পক্ষে সাধ্যাতীত। আমার পক্ষেও এখন ততোধিক। এই ত আমার অবস্থা দেখতে পাচ্চিস্। আমার অনেক দিনের ইচ্ছে, বোলপুরে চিত্রাবিদ্যাটা বেশ একটু ভাল করেই শেখানো হয়। ঐ সঙ্গে সঙ্গীতটাও চলে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত লক্ষ্মী সদয় হলেন না —টাকার টানাটানি কিছুতেই ঘুচলনা —মনের সাধ মনেই রয়ে গেল। অবশ্য তুই যদি ওখানে কিছুদিন গিয়ে বড়দাদার চেলা হয়ে থাকতে চাস্ সে ত পড়েই রয়েছে —তোর যখন খুসি যাবি, যতদিন খুসি থাকবি। বড়দাদা ত তোকে পেলে খুবই আনন্দিত হবেন। বসন্তকালটা না হয় বোলপুরেই কাটিয়ে আয়না। বিরহ যদি নিতান্ত নিদারুণ হয়ে ওঠে তখন আবার রাঁচিতে ফিরে যাস।··· তোর ছবি আঁকার চর্চ্চা কি রকম চল্‌চে। কুঁড়েমি করিসনে। নিয়ত সাধনা না হ'লে সরস্বতী সদয় হননা। বড়দাদার স্বপ্নপ্রয়াণ যদি illustrate করিস ত ভালই হয়— ওতে ছবি আঁকার বিষয় অসংখ্য আছে। গগন আমার বইয়ের ছবি আঁকচেন সকলেই তার প্রচুর প্রশংসা করচেন।

তোরা আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিস। ইতি ২৪ পৌষ ১৩১৯

রবিদাদা"

১৯১২ থেকে একটানা ভাবে ১৯১৫ পর্য্যন্ত শিশুবিভাগে ছেলেদের চিত্রবিদ্যা শিক্ষা আমি দিয়েছিলাম। তখন শিশুবিভাগের ছাত্রদের মধ্যে প্রমথ বিশি, যাদব প্রভৃতি অনেকে ছিলেন কিন্তু চিত্রানুরাগী ছাত্রদের মধ্যে নাম করা যায়, মণি গুপ্ত, ধীরেন দেববর্ম্মা, কৃষ্ণকিঙ্কর ঘোষ, অন্নদা মজুমদার, এবং সুশীল বন্দ্যো ; এবং এঁরাই মন দিয়ে ছবি আঁকা তখন শিখেছিলেন। এখন এঁদের মধ্যে মণি গুপ্ত ও ধীরেন দেববর্ম্মা চিত্র জগতে বিশেষ পরিচিত। এঁদের সঙ্গেই মুকুল দেকেও আমি ছাত্ররূপে পাই এবং মুকুলকে পূজনীয় অবনীন্দ্রনাথ আমার কাছে রাঁচিতেও চিত্রশিক্ষার জন্যে পাঠিয়েছিলেন। পরে অবনীন্দ্রজয়ন্তীসংখ্যায় "অলকা" পত্রিকায় চিঠিখানির photo বেরিয়েছিল।

১৯১৭ সালে রবিদাদা আমাকে কলকাতায় নিয়ে গেলেন এবং Bichitra Studio for artist of the neo-Bengal School তাঁর জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে স্থাপনা করলেন এবং বাড়ীর সেই অংশের নাম রাখলেন "বিচিত্রা"। তার Schemeটি পূজনীয় রথীন্দ্রনাথ এবং সুরেন্দ্রনাথ তৈরী করলেন। নন্দলাল, অসিত ও মুকুল হলেন Foundation member, পূজনীয় অবনীন্দ্রনাথ হলেন First master, গগনেন্দ্রনাথ হলেন Director এবং Sir John Woodroff আর messrs Blount আর Muller হলেন visitors, রথীন্দ্রনাথ হলেন Secretary এবং Treasurer এবং এঁদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য Schemeটিতে সবিশেষ ভাবে নির্দ্ধারিত হ'ল। পূজনীয় অবনীন্দ্রনাথের প্রেরীত Schemeটি এখনো আমার নিকট আছে। এই বিচিত্রার মজলিসে রবিদাদার নব নব রচনা সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, চারু বন্দ্যো, সৌরীন মুখো, মণিলাল গঙ্গো, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুরেশ বন্দ্যো, প্রভৃতি তখনকার যাবতীয় মুখ্য লেখক ও কবি তাঁর মুখে শুনতে পেতেন। তাছাড়া, 'ডাকঘর', 'বৈকুণ্ঠের খাতা' এবং 'ফাল্গুনী' অভিনয়ও এই বিচিত্রাসভার মারফৎ কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বিচিত্রার তিনটি মুখ্য শিল্পী stage রচনা এবং অভিনয়সজ্জার সকল ভার বহন করেছিলেন। সেই সকল অভিনয়েতে অভিনেতা হিসাবেও রবিদাদা আমাকে নিযুক্ত করতে ছাড়েননি। 'ডাকঘরে' দইওয়ালা বৈকুণ্ঠখাতায়

পাঁচকড়ি এবং ফাল্গুনীর কোটালের পার্টে আমাকে অভিনয় করতে হয়েছিল। এর পূর্ব্বে শান্তিনিকেতনে যত অভিনয় হয়েছিল আমার থাকার কালে সবেতেই আমাকে অভিনয়ে যোগ দিতে হয়েছিল রবিদাদার আদেশে। অভিনয় কালে সর্ব্বদা আমাকে দিনুদাদাকে (দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর) বলতেন : 'নাটকের জন্য আমি দায়ী, গানের জন্য দিনু এবং stage সজ্জা ও অভিনেতাদের সজ্জার জন্য অসিত তুই দায়ী।' অবশ্য কলকাতা থেকে তখন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি অসংখ্য লোক অভিনয় দেখে প্রশংসা না করে থাকতে পারেননি।

১৯১৭ সালে ফাল্গুনীর অভিনয় শেষ হবার কিছুদিন পরেই আমার ডাক পড়েছিল কলকাতার School of artsএর Principal Mr. Percy Brownএর নিকট থেকে চাকরীর জন্য। পিতার আদেশে এবং পূজনীয় রবিদাদার অনুমতিক্রমে আমি ১৯১৮ সাল পর্য্যন্ত কলকাতার গভর্মেণ্ট আর্টস্কুলের Indian Painting classএ মাষ্টারী করেছিলাম। ১৯১৯ সালে নন্দলাল বসুকে রবিদাদা নিয়ে যান শান্তিনিকেতনে কলাভবন পত্তন করার জন্য। কিন্তু 'The Indian Society of Oriental art,' কলকাতায় তাঁকে ২০০৲ বেতনের চাকরীর ভরসা দেওয়ায় তিনি আশ্রম থেকে ফিরে এলেন। সেই সময় রবিদাদা আমার এক ভগ্নী এলা চট্টোপাধ্যায়ের মারফৎ ২রা জানু ১৯২০ আমাকে খবর পাঠালেন শান্তিনিকেতনে যাবার জন্য। তাছাড়া ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯২০তে তার পেলাম শান্তিনিকেতন থেকে :

"Come and join work
Robidada"

তাছাড়া একটি পত্র তার আগে যা তাঁর নিকট পেয়েছিলাম তার নকলও দিচ্ছি :—

কল্যাণীয়েষু, বিশ্বভারতীতে কাজ করা স্থির করেছিস শুনে খুব খুসি হলুম। বিশ্বভারতীর জন্যে মাসে আমি প্রায় পাঁচ শো টাকা খরচ করচি কিন্তু এর আয় কেবলমাত্র মাসিক ৪৫ টাকা। তাই তুই যে ৮০ টাকা দাবী করেচিস তা দেবার সাধ্য আমার নেই—নন্দলালকে মাসিক যে ষাট টাকা করে দিচ্ছিলুম তোকেও তাই দিতে পারি।

'তুই এখানে কাজে যোগ দেবার পূর্ব্বে বাঘগুহায় যাচ্ছিস, সে

কাজটা ভালই। কেননা তাতে তোর নিজেরও কিছু study হবে অথচ অর্থও পাবি। আর আড়াই মাসের পরেই আমাদের বিদ্যালয়ের ছুটি হবে। তার আগে তোর কাজ শেষ হবে না। হলেও ছুটির হয়ত সপ্তাহ কয়েক পূর্ব্বে মাত্র যোগ দিতে পারিস্। অথচ তার পূর্ব্বেই তিন মাসের ছুটি। অতএব এখন থেকে প্রায় ছয় মাস পরে তোর কাজে যোগ দেওয়া সম্ভবপর হবে। ইতিমধ্যে এতকাল নাতবৌকে রাখব কোথায়? ছুটিতে মীরা ত এখানে থাকবেই না—মাঝেও যদি কখনো ওর কোথাও ডাক পড়ে তাহলে কি কর্ত্তব্য? ছয়মাস পরে যখন তুই কাজে যোগ দিবি তখন এখন থেকে এখানে ঘরকরনার ব্যবস্থা করা কি ঠিক হবে? ভাল করে ভেবে দেখিস।

(এই চিঠিতে তারিখ নেই) রবিদাদা"

১৯২০ জানুয়ারীতে রবিদাদার নিকট তার পেয়ে আমি আশ্রমের কাজে এসে যোগ দিলাম। মণি গুপ্ত বি. এ পড়া শেষ না করেই তখন আমার নিকট কলাভবনে যোগ দিলেন। আর কলকাতা Govt. art School থেকে আমার সঙ্গে শান্তিনিকেতনে আমার ছাত্র শ্রীমান হীরাচাঁদ দুগাড়, অর্দ্ধেন্দু বন্দ্যো রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী কলকাতা থেকে এসে যোগ দিলেন। তারপর বিনোদ মুখোপাধ্যায়, মুকুল দে, ধীরেন দেববর্মা, সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যো, বিনায়ক মাসোজি, ভি. আর. চিত্রা, শ্রীমতী হাতিসিং রমেশ বসু মজুমদার, শ্রীমতী সুকুমারী দেবী, শ্রীমতী সবিতা দেবী এবং শ্রীমতী প্রতিমা দেবী প্রভৃতি। (এ বিষয় মৎপ্রণীত Art and Tradition পুস্তকের "Twentyfive Years of Contemporary Indian Painting অধ্যায়ের তালিকাটি দ্রষ্টব্য।)

এই সময় নন্দলাল বসু পুনরায় আশ্রমে আসার জন্য যে কত উদ্বিগ্ন ছিলেন তার প্রতীক স্বরূপ তাঁর সচিত্র পোঃ কার্ড গুলিতে যে সব ইঙ্গিত দিয়ে তিনি আমায় কলকাতা থেকে লিখেছিলেন তা' আজও আমার নিকট রাখা আছে। একটি ছবিতে নাকে কানে মুখে ঠুলি গোঁজা একটি মুখ এঁকে লিখেছেন —"সাক্ষাতে সব বলব।" আর একটিতে The Indian Society of Oriental artএর (Samavaya mansionএর) গরাদে দেওয়া জানালা দিয়ে artistরা যেন ছিপ ফেলে মাছ খেলিয়ে টাকার নোটের তোড়া,

তোলবার চেষ্টা করচে এইরূপ ইঙ্গিত দেওয়া আছে। অর্থাৎ তাঁর তখন অধিক অঙ্কের অর্থ সেখানে পেয়ে থাকতে হচ্চে এবং আশ্রমে যেতে পারচেন না এই কষ্টবোধ স্পস্টতর করে ছবিগুলিতে দেখিয়েচেন। তবে আশ্রমে তিনি প্রতি সপ্তাহ তখন থেকেই যাতায়াত সুরু করেছিলেন কলকাতা থেকে এবং আশ্রমে তাঁকে অধ্যাপক হিসাবে তখনও ধরা হ'ত।

১৯২৩ সালে নন্দলাল বসুর সুযোগ হল আশ্রমে আসা, কেননা আমি তখন আমার বন্ধু স্বর্গীয় উইলি পিয়ার্সেনের এবং আমার মেশো নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং তাঁর পুত্র নিতুর সঙ্গে বিলাতের অভিমুখে ৬মাসের জন্য রওনা হলাম।

ছমাস পরে রাঁচিতে পিতার নিকট ফিরে এসে বিশ্বভারতীর আশ্রম সচিবের নিকট কর্ম্মসমিতির আদেশ পেলাম যে আমার আর আশ্রমে কাজ করার স্থান নেই। সুতরাং আমি জয়পুররাজ্যে রাজপুতানায় Art Schoolএর Principalএর পদে নিযুক্ত হলাম। ১৯২৫ সালের গোড়ায় অর্থাৎ ২রা ফেব্রুয়ারী আমি পুনরায় লক্ষ্ণৌ গভর্মেণ্ট স্কুল অব আর্টের Principal পদে এলাম। দেশী লোক এ পর্য্যন্ত পাকাপাকি ভাবে এ পদে কেহই তখনো পর্য্যন্ত কাজ করেন নি। পূজনীয় রবিদাদা আমাকে ৬ই মার্চ্চ ১৯২৫ যে চিঠি দেন সেটি ঘরওয়া হলেও তার দু এক লাইন তুলে দিচ্চি।

"কল্যাণীয়েষু অসিত, জানতুম তোর একটা ভালরকমের কিছু হবে। তা হল। তোকে কিছুতেই চেপে রাখতে পারলে না। ···তোকে একটা ছবির বিষয় দিচ্চি। এঁকে শীঘ্র পাঠিয়ে দিস। অন্ধকার পথ—একটি মেয়ে চলছিল। বিপরীত দিক থেকে মশাল হাতে পুরুষ এসে তার সামনে দাঁড়িয়েচে —মেয়েটি তার অবগুণ্ঠন দুই হাতে তুলে ধরেচে —পুরুষ মশালের আলোয় তার মুখের দিকে তাকিয়ে। আকাশে ধ্রুব তারা। ভালো করে এঁকে দিস—দরকার আছে। দাম চাস্ দাম দেব।

ইতি ৬ মার্চ্চ ১৯২৫ রবিদাদা"

এই ছবি উপলক্ষে তাঁর কাছ থেকে ১১ই এপ্রিল ১৯২৫ যে চিঠিটি পাই তা থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করে দিলুম :

কল্যাণীয়েষু ······ সেই ছবিটার আয়তন কি হবে জিজ্ঞাসা করেচিস। ছোট হোক বড় হোক কিছুই আসে যায় না—কিন্তু বেশি দেরি করিসনে। তুই ত শুধু চিত্রী নোস্ তুই কবিও—সেই জন্যে তোর তুলি দিয়ে দুই রসই ঝরে. তাই কবি যখন ছবি চায় তখন তোরই শরণাগত হতে হয়। সেদিন চিঠিতে যে বর্ণনা করেছিলুম সেই অনুসারে আঁকতে পারিস কিম্বা পথের মধ্যে রাত্রি শেষ হয়ে যেতেই মেয়েটির পিছনে সূর্য্য উঠ্‌ল, আর পুরুষ পথিক তার মশালটা ফেলে দিলে, এমনও করতে পারিস্—আঁকবার পক্ষে যেটা ভালো হয়, সেইটেই অবলম্বন করিস।

রবিদাদা"

পরে পূজনীয় রবিদাদার নিকট জানতে পেরেছিলাম যে ছবিটি Mr. Elmherstএর বিবাহ-যৌতুক হিসাবে তাঁকে পাঠাবার জন্য আমাকে দিয়ে আঁকিয়েছিলেন। এ বিষয় সেই সময় আর একটি পত্র লেখেন তারও দু-একস্থান থেকে তুলে দিচ্চি :—

কল্যাণীয়েষু —তোর ছবির অপেক্ষায় ছিলুম, রচনা শেষ হয়ে গেছে শুনে খুসি হলুম। এ ছবি আমি তোর প্রণামী বলেই গ্রহণ করব কিন্তু এর গতি হবে পশ্চিম মহাদেশে —সেখানে এর নিশ্চয় আদর হবে সেজন্যে চিন্তা করিসনে। কলা-সরস্বতী তাঁর চরণরাগরক্তিমায় তোর সকল ভাবনা সকল কল্পনাকে চিরদিন রঞ্জিত করে রাখুন এই আমার আশীর্ব্বাদ। ছবিটি শান্তিনিকেতনেই পাঠিয়ে দিস। ...ইতি ১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২

রবিদাদা"

চিঠিপত্রে রবিদাদা মহাশয় আমাকে কিভাবে শিল্পকলায় উৎসাহিত করতেন এইবার তার উদাহরণস্বরূপে কয়েকটি তাঁর চিঠির নকল তুলে দিচ্চি। ১৯২৬ শালের চিঠিতে তিনি লিখেচেন :—

"কল্যাণীয়েষু —তোর ছবিখানি পেয়ে খুব খুসী হয়েচি। যখন হাতে এল তখন Cousins আমার কাছে বসেছিলেন, তাঁরও ভালো লেগেছে। তোর তুলির টানে যে একটি সৌকুমার্য্য আছে, এই ছবিতে তা প্রকাশ পেয়েচে। য়ুরোপে এটি নিয়ে যাব।

রবিদাদা"

১৯৩৫এ আমার সচিত্র ওমারখৈয়াম পেয়ে তিনি লিখেছিলেন :—
কল্যাণীয়েষু —তোর প্রেরিত সচিত্র ওমরখৈয়াম পেয়ে খুসি হলুম। ছবিগুলিতে রেখার সুনিপুণ সৌকুমার্য্য ও ভাবের ওমরখৈয়ামী আবহাওয়া মনোরম হয়েছে। বইখানি গুণীসমাজে সমাদর লাভ করবে। ইতি ১৫ নভেম্বর ১৯৩৫

রবিদাদা

১৯৩১ সালে আমার প্রেরীত রবিদাদার রৌপ্য ফলক-মূর্ত্তি এবং একটি Portfolioতে কতকগুলি drawing পেয়ে তিনি আমাকে লেখেন :

কল্যাণীয়েষু —অসিত, তোর হাতেগড়া শুভ্র পদকমূর্ত্তি কিছুদিন হলো আমার হাতে এসে পৌঁছেচে। খুব সুন্দর হয়েছে। অন্য জিনিষটা আসবার অপেক্ষায় তোকে খবর দিইনি। কাল যথাসময়ে সেটি পেয়েছি —এও বিচিত্র হয়েচে। অর্থাৎ এটিতে নতুন ধারা দেখা দিয়েচে। খাল কাটা চলে এক দীর্ঘ সোজা রেখা ধরে —কিন্তু নদী চলে বাঁক বদল করতে করতে। চিত্র নির্ঝ'রিণীধারাও ক্ষণে ক্ষণে নতুন নতুন বাঁক নিতে থাকে, নইলে বুঝতে হবে তার মধ্যে চিত্তের বেগ নেই কেবল আছে অভ্যাস। তোর এই রেখাবর্ণ সঙ্গমে দেখা গেল নতুনের আবির্ভাব হয়েচে। তার পথ অবারিত ও দূর প্রসারিত হোক। ইতি ২৬ বৈশাখ ১৩৩৮ রবিদাদা

ঐ বছরেই একটি পত্রে আমার প্রেরীত লাক্ষাচিত্র পেয়ে তিনি লিখেছিলেন :—
"কল্যাণীয়েষু অসিত, তোর লাক্ষাচিত্র খুব ভালো লাগল। অনভ্যস্ত চোখে যারা দেখবে তাদের ধাঁধা লাগবে। রেখার অন্তরে অন্তরে যে বেগটা যে ঝোঁকটা আছে সেটা অনুভব করবার বোধশক্তি এবং অভিজ্ঞতা চাই।...

ইতি ২৪ আশ্বিন ১৩৩৮ রবিদাদা"

পূজনীয় রবিদাদা আমাকে ছেলেবেলা থেকেই ছবি আঁকা, প্রবন্ধ ও কবিতা লেখায় উৎসাহিত করতেন। আশ্রমে আমি তাঁরই কাছে থাকতুম এবং তাঁর উপদেশ অহঃরহ শুনতে পেতুম। নাতি হিসাবে মধুর রসিকতা থেকেও বঞ্চিত হতাম না। প্রত্যেকটি গান ও কবিতা যা' তিনি আমার থাকার কালে লিখেছিলেন আজ যখন পড়ি তখন সেই সব দিনের কথা জাগ্রত হয়ে ওঠে মনের মধ্যে। আমার কয়েকটি ছবির উপরেও তিনি গান রচনা করেছিলেন। তার মধ্যে 'সুরের আগুন'' গানটি আমার অগ্নীময়ী সরস্বতী ছবিটির উপর যে লেখা তা তৎকালের আশ্রমবাসীরা মাত্রেই অবগত আছেন। রবিদাদার সঙ্গে আর্ট নিয়ে তর্ক করতেও ছাড়িনি। বহু পূর্ব্বেকার কথা তিনি তখন বলতেন যে আর্ট—যা Graphic art তা Static এবং music, poetry প্রভৃতি dynamic কেননা তার রণণ শেষ হলেও থামে না মনের মধ্যে ধ্বনি চলতে থাকে। কিন্তু পরে এই মত তাঁর বদলে গিয়েছিল। রেখার বেগের মধ্যেও যে সচল ভাব আছে তা' তিনি প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করেছিলেন এবং বলাকার কবিতায় লিখেছিলেন।

কবি ছোটদের অর্বাচীন মূর্খ বলে অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখতেন না। তিনি সকলের সঙ্গে সমান ভাবে মিশতেন—আত্মম্ভরিতার স্থান তাঁর মধ্যে ছিল না। তাঁর চাকর বনমালীর সুখ দুঃখের কথা শুনতেন এবং অসুখ হলে নিজে হমিওপ্যাথি ঔষধ দিতেন।

শিল্পীদের মর্য্যাদা দিতে তিনিই শিখিয়েছিলেন—বিশেষ ভাবে নন্দলাল বসুকে যখন আমি আশ্রমে আহ্বান করে আনি তখন তাঁকে তিনি নিজে অভ্যর্থিত করেন।

আমার ১৯৩৯এর জন্মদিন উপলক্ষ্যে তাঁকে প্রণাম জানিয়ে পত্র লেখায় আমাকে তিনি লিখেছিলেন দার্জিলিং থেকে "কল্যাণীয়েষু—৪৯টা বেজোড় বৎসর—তোরা ৫০ বছরের জন্যে অপেক্ষা করিসনে কেন—আশীর্ব্বাদ পেকে ওঠে জুবিলি বৎসরে উপযুক্ত সময়ে ঝুড়ি নিয়ে আশীর্ব্বাদের কল্পবৃক্ষমূলে হাজির হোস পরিপক্ক ফল থেকে বঞ্চিত হবিনে।

ইতি ১৫।৯।৩৯ রবিদাদা"

একে দারুণ গরম, তাতে এই অল্প সময়ের মধ্যে এর বেশী লিখে পাঠাতে পারলুম না। 'রবীন্দ্র-সঙ্গ' প্রবন্ধে অনেক কথা পাবেন।

ইতি

প্রাপ্তিকা
T. G. Civil Lines
Lucknow. 23-4-47

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীঅসিতকুমার হালদার

পুঃ— পূজনীয় কবি রবিদাদা মহাশয় আমার প্রেরীত তাঁর মূর্ত্তিফলক পেয়ে যে একটি কবিতা লিখে পাঠিয়েছিলেন এবং অপর একটি কবিতা যা আমার খাতায় লিখে দিয়েছিলেন আপনাকে পাঠাচ্চি।

কল্যাণীয় শ্রীমান অসিতকুমার হালদার

আমার মূর্ত্তি পূর্ণ করি
মুক্তি পেল তোমার শক্তি;
রেখায় রেখায় নিত্য-শিখায়
দীপ্তি পেল তোমার ভক্তি।
চক্ষে তোমার প্রাণের মন্ত্র,
তাই তো তোমার ধ্যানের দৃষ্টি
তোমার রসে আমার রূপে
রচিল এই নূতন সৃষ্টি।

২৫ বৈশাখ
১৩৩৪

আশীর্ব্বাদক
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উক্ত কবিতার কবি নিজে তর্জ্জমা করে পাঠিয়েছিলেন

"It is a freedom for your spirit to conjure up a vision from the inert, to illumine its line with the flame of your devotion.

You have the magic of life's touch in your eyes and therefore your dream has come out in a creation in which are made one my form and your delight.

Sd/- Rabindranath Tagore

শ্রীমান অসিতকুমার হালদার

কল্যাণীয়েষু—

কলা-বিদ্যা কুঞ্জে কুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে ফল
ভুঞ্জ তুমি রাত্রি দিন আনন্দে চঞ্চল।
কীর্ত্তিতে রবিরে তুমি কর সমাচ্ছন্ন,
লোমশ তুলিকা তব হোক ধন্য ধন্য।
সিন্ধুপারে দ্বীপতটে উচ্চ জয়নাদে
খ্যাতি যাক এক লম্ফে বায়ুর প্রসাদে।
রবি করে আশীর্ব্বাদ, চির আয়ুষ্মান,
রবিসুত তোমারে না দিক্ দৃষ্টিদান।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১লা বৈশাখ শান্তিনিকেতন।
১৩২২

নন্দবাবু ১৯২০ সালে কলকাতায় ফিরে গিয়ে Oriental Society-তে যোগ দিলেও আশ্রমের যোগ তিনি ছাড়েননি। পৌষ ১৩২৭ শান্তিনিকেতন পত্রিকার ৫২১ পৃষ্ঠা দেখলেই এ বিষয় বেশ বোঝা যাবে।

অসিতকুমার হালদার

॥ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ করের কৃতি, ১৯১৭-২০ ॥

রবীন্দ্রনাথের আগ্রহে শ্রীনন্দলালের অনুমোদন পেয়ে,[১] শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ১৯১৭ সালে শান্তিনিকেতনে এলেন। 'বিচিত্রা'-পর্ব চুকিয়ে আর বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের ফ্রেসকো সমাপ্ত করে আশ্রমে এলেন তিনি গরমের ছুটির পরে বিদ্যালয় যখন খুলল। বয়স তখন তাঁর চব্বিশ। শান্তিনিকেতনে এসে উঠলেন তিনি 'বটতলার বাড়ি'তে। সুরেন্দ্রনাথকে পেয়ে কবি বললেন, —'এখানে তুমি ছোট ছেলেদের শেখাবার ব্যবস্থা করো। বড়োদের মন ঘন ঘন বদলায় —তাড়াতাড়ি কপি করতে চায়, তাদের শেখাতে গেলে খুব বেশি কাজ হবে না।' —কবির এই আদেশ পেয়ে তিনি শান্তিনিকেতনে ছোট ছেলেদের ড্রয়িং শেখাতে আরম্ভ করে দিলেন। কবি তাঁকে কাজ শেখাতে বললেন দু-রকম ভাবে। প্রথমে বললেন, —টীম্ ওয়ার্ক করাও —ফ্রেসকো করাও। এইভাবে তিনি কাজ শুরু করে দিলেন 'সতীশ কুটিরে'। গুরুদেব তাঁকে আর বললেন, —কাঠের ওপর আঁকা শেখাও। কাগজ তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়। পারমানেন্ট্ কাজের জন্যে কাঠই উপযুক্ত।' —এ-ছাড়া, নবাগত এই শিল্প-শিক্ষকটিকে কবি নির্দেশ দিলেন, —'আশ্রমের ফুল-ফল সব, গাছ-টাচের সঙ্গে ছেলেদের পরিচয় করিয়ে দাও, যেন ছোটরা এদের পার্থক্যটা ধরতে পারে। —আমগাছ-বটগাছের তফাৎটা যেন তাদের কাছে স্পষ্ট হয়, তারা এ-সব আলাদা করে আঁকতে শেখে।' —এই হলো সুরেন্দ্রনাথের কাছে কবির কলাবিদ্যা-শিক্ষণ-প্রণালীর সুস্পষ্ট নির্দেশ।

১৯১৭ সালে শান্তিনিকেতনে আসার আগে, সুরেন্দ্রনাথকে ১৯১৬ সালে অবনীবাবুর কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে নিয়ে গিয়েছিলেন। বোটে আর কুঠিবাড়িতে মিলিয়ে শিলাইদহে সেবারে তিনি ছিলেন দিন দশেক। সেই সময়েই রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছে প্রথম প্রস্তাব উত্থাপন করেন শান্তিনিকেতনে আসার জন্যে। আর এই প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে কবি শান্তিনিকেতনের আশ্রম-পরিবেশ সম্পর্কে একটি মনোরম

চিত্র তাঁর কাছে বর্ণনা করেছিলেন। —'শান্তিনিকেতনে গেলে গাছপালা, লোকজন, সাঁওতাল-টাঁওতাল সব দেখতে পাবে।' —এই বলে তিনি তাঁকে আরও বললেন, —'আমি তোমার কথা অবনকে বলবো। —তোমার বাবাকেও লিখতে পারি।' কবির এই কথা শুনে সুরেন্দ্রনাথ বললেন, —'আমার বাবাকে আর লিখতে হবে না, আমি যাবো'।

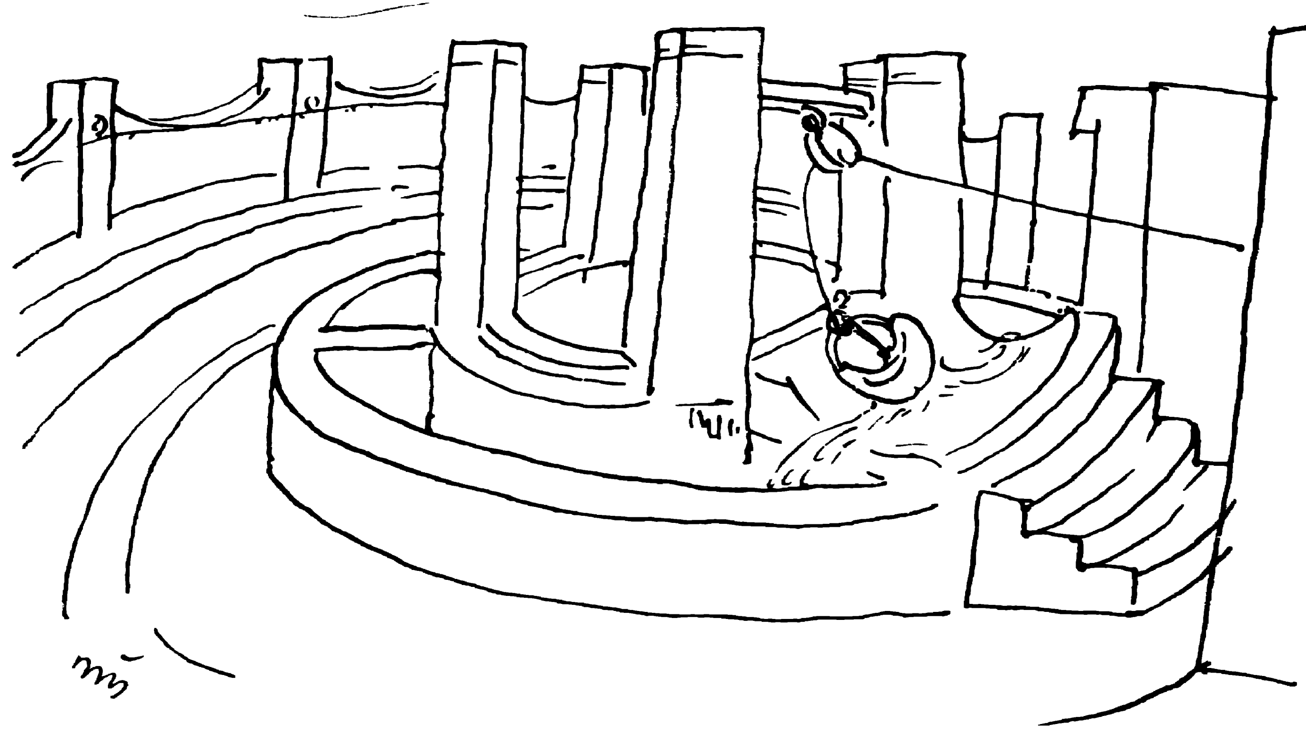
এর পরে ১৯১৬ সালে 'বিচিত্রা'-পর্ব শেষ করে, আর শেষ দিকে বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের ফ্রেসকোর কাজ চুকিয়ে ১৯১৭ সালের জুলাই মাসে তাঁর শান্তিনিকেতনে আসা হলো পাকাপাকিভাবে। এখানে এসে তিনি যে-সব ছাত্র পেলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন —শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মণ, শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। সেই সময়ে 'সতীশ-কুটিরে'র দরজার ওপরে কিছু ফ্রেসকো করালেন। এলা, গেরি, কালো আর সাদা —এই চার রকমের মৌলিক রং ব্যবহার করেছিলেন। আঁকা হলো আসিরীয়ান সিংহ, ইজিপ্‌সীয়ান বীণা-বাদন আর মা ও শিশু। কাঠের ওপরেও আঁকা শেখালেন। বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের ফ্রেসকো করার সময়ে সেগুন কাঠের তক্তার ওপর তিনি অজন্তার পদ্ধতিতে ছবি করেছিলেন। এখানে করালেন আমকাঠের তক্তির ওপর। সেই তক্তির একদিকে ছেলেরা লিখতো আর অপর দিকে ছবি আঁকতো।

শান্তিনিকেতনে তখন অত্যন্ত জলাভাব। জলের জন্যে কুয়ো কাটা হয়েছে, কিন্তু সে ধ্বসে ধ্বসে যায়, ঠিকমতো জল পাওয়া যায় না। জলের কষ্ট অত্যন্ত। কুয়ো থেকে জল তোলা হতো মোটে করে। জল তুলতো সহবৎ গাড়োয়ান। সে টপ্পর গাড়ি চালাতো আর জলও তুলতো। বড়ো ছেলেরা গরমের সময়ে স্নান করতে যেতো কোপাই নদীতে। গাবগাছের তলায় কুয়ো থেকে বড়ো ছেলেরা জল তুলে মগে করে মেপে মেপে জল দিতো ছোটদের স্নান করবার জন্যে। কবির মনে বিশেষ উদ্বেগ, কি করে আশ্রমে জলকষ্ট নিবারণ করা যায়। —'খরচ হচ্ছে প্রচুর, কিন্তু কাজ কিছু হচ্ছে না।' —সেই টানাটানির অবস্থায় সুরেন্দ্রনাথ বললেন, —'কুয়ো-কাটার অনেক মিস্ত্রী আছে পশ্চিমে।' কথাটা শুনে কবি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, —'তুমি তাদের আনো না, নিয়ে এসো না।' কবির আগ্রহে সুরেন্দ্রনাথ তাঁর

বাবাকে মুঙ্গেরে পত্র লিখলেন (১৯১৮)। তখন গয়ায় সাব-ডেপুটি ছিলেন তারকনাথ রায়। সুরেন্দ্রনাথের পিতা দীননাথ করের সঙ্গে তাঁর বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। তাঁরা উভয়ে যোগাযোগ করে কুয়ো-কাটার মিস্ত্রী পাঠিয়ে দিলেন শান্তিনিকেতনে। সুরেন্দ্রনাথ স্বয়ং তদারক করে শান্তিনিকেতনে বড়ো কুয়ো কাটিয়ে জলের উৎস স্থায়ী করে দিলেন। স্বয়ং কবিও খানিক নিশ্চিন্ত বোধ করতে লাগলেন। আর এদিকে সেই থেকেই স্থাপত্য-কর্মের দিকে শিল্পী সুরেন্দ্রনাথের তরুণ প্রতিভা ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হলো।

১৩২৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের (১৯১৯) শান্তিনিকেতন-সংবাদে দেখা যায়, —আশ্রমে শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু আর সুরেন্দ্রনাথ কর উপযুক্ত ছাত্রদের চিত্রবিদ্যা শিক্ষা দিবেন। শ্রাবণ মাসের সংবাদ থেকে জানতে পারা যায়, —শ্রীমান নন্দলাল বসু ও সুরেন্দ্রনাথ কর শান্তিনিকেতনে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা দিতে প্রস্তুত হয়েছেন; দূর দেশ থেকেও তাঁদের ছাত্র এসে জুট্‌ছে। এখানে এই সময়ে চিত্রবিদ্যার অধ্যাপক হলেন এঁরা দু-জন। সোসাইটি থেকে এই সময়ে শ্রীনন্দলাল বিশ্বভারতীর কাজে আশ্রমে এসে যোগদান করেছেন। কিন্তু সোসাইটির তাগিদে বেশি দিন আশ্রমে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। ফলে, আশ্রমে কলাবিদ্যা-চর্চার কাজ বিশেষ ব্যাহত হয়ে পড়ে। ১৩২৬ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে (১৯২০, জানুয়ারী) এই সংবাদ বিশেষভাবে পরিবেশিত হয়েছেঃ 'গত বৎসর শ্রীযুক্ত নন্দলালবাবুর ও শ্রীযুক্ত সুরেন কর মহাশয়ের সহায়তায় চিত্রশিক্ষাটি চমৎকার জমিয়া উঠিয়াছিল। গুরুদেবের প্রস্তাবিত চিত্র-প্রদর্শনী মাঝে মাঝে হওয়ায় আশ্রমবাসী ছাত্র-ছাত্রীগণ চিত্রে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় নন্দলালবাবুকে এখান হইতে চলিয়া যাইতে হইল; তবে তিনি ভরসা দিয়াছেন যে, মাঝে মাঝে আসিয়া উপদেশাদি দিবেন। আশা করা যায়, তাঁহার উপদেশ ও সুরেন কর মহাশয়ের চালনায়, চিত্রবিভাগ ভালই চলিবে।'

—এই রকম দো-টানার অবস্থায় শান্তিনিকেতনে তখন চিত্র-বিভাগের কর্মধারা অব্যাহত থাকলেও কবির আগ্রহে আর কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথের সহযোগে সুরেন্দ্রনাথকে অধিক সময় ব্যস্ত থাকতে হতো আশ্রমে



শান্তিনিকেতনে স্নানের কুয়ো – নন্দলাল

নানা গৃহনির্মাণকল্পে। ফলে, চিত্রশিল্পী সুরেন্দ্রনাথের শিল্পপ্রতিভা ধীরে ধীরে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হতে শুরু করে। ক্রমশঃ চিত্রশিল্পের পথ প্রায় ত্যাগ করে তিনি স্থাপত্যকর্মে নিবিষ্ট হয়ে পড়েন।

১৯২০ সালের জানুয়ারী মাসের মধ্যেই তিনি (১) পুরাতন প্রেস-ঘরের উত্তরে স্নানের বড়ো কুয়ো (১৯১৮) (২) শমীন্দ্র-কুটির (১৯১৮) (৩) সত্যকুটির (১৯১৮) (৪) সন্তোষালয়' বা শিশুবিভাগ (১৯১৮) (৫) 'দ্বারিক' ভবনের দোতলা (১৯১৯) (৬) নেবুকুঞ্জের বাড়ি (১৯১৯) আর (৭) 'কোণার্ক' (১৯১৯) তৈরি করলেন। আশ্রমের সর্বজনের আকর্ষণীয় আর একটি শিল্প-কীর্তি তিনি সে-সময়ে স্থাপন করলেন —ঘণ্টার দোলস্তম্ভটী সারনাথের প্রবেশদ্বারের আদর্শের অনুসারে প্রস্তুত করে। 'শান্তিনিকেতন'-পত্রিকার সেকালের আশ্রম-সংবাদে সুরেন্দ্রনাথের বিশিষ্ট কীর্তির এই সংবাদটি সগৌরবে পরিবেশন করা হয়েছিল। ১৩২৬ সালের মাঘ মাসে প্রকাশিত ঐ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে ব্যয়ের হিসাবে দেখা যাচ্ছেঃ 'পূর্তবিভাগ ……গত বৎসর ইমারতে তিন হাজার সাত শত চৌদ্দ টাকা, ঘর মেরামতে সাত শত চৌষট্টী টাকা, নেবুবাগানে পাঁচ শত ছিয়ানব্বই টাকা দুই আনা এক পয়সা, আশ্রমের রাস্তায় দুই শত ছাব্বিশ টাকা সাড়ে সাত আনা, ইন্দারার ওপর বাঁধাইতে সাত শত সাড়ে চৌদ্দ আনা ব্যয় হইয়াছে।

এই বিভাগ রথীন্দ্রবাবুর ও সুরেন কর মহাশয়ের সাহায্যেই সুচারু-রূপে চালিত হইয়াছে।'

সুরেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে প্রথম বাড়ি তৈরি করলেন 'শমীন্দ্র কুটীর'। রেলের স্লীপার সস্তায় কিনে কিনে এনে ঐ ঘরের কাঠামোয় লাগানো হয়েছিল। তখন গুরুদেবের টাকার টানাটানি অত্যন্ত। তবুও কিছু টাকা তাঁর হাতে এলেই তিনি তাঁকে বলতেন, বাড়ি তৈরি করবার জন্যে। লেখা বাবদ পাওনা টাকা বাজে খরচ হয়ে যাবার আশঙ্কায় কবি তাঁকে বাড়ি তৈরি করে টাকার সদ্ব্যবহার করতে বলতেন। আর বলতেন, —'মাটীর বাড়িই আমি চাই; পাকা বাড়ি-টাড়ি এ-সব আমার ভালো লাগে না।' ১৯১৯ সালের শেষের দিকে কবি শান্তিনিকেতনে এসে পাকাবাড়ি 'দেহলী'তে ওঠেননি। আশ্রমের উত্তর সীমানায় তাঁর জন্যে তখন দু'খানি কুটির তৈরি করা হয়েছিল, তার একটিতে উঠলেন।

কবির খেয়ালমতো সুরেন্দ্রনাথ করলেন —মাটির ঘর, খড়ের চাল, দরজা-জানালায় দরমার কপাট। ঘরের মেঝে মাটির ওপর কাঁকর-পেটানো। মাত্র স্নানের ঘরটির মেঝে পাকা —এই বাড়ির নাম —'কোণার্ক'। এর রূপান্তরের ইতিহাস যথাসময়ে বলা যাবে।

১৯১৬ সালে 'বিচিত্রা'র গোড়ার দিকে অবনীবাবু সুরেন্দ্রনাথকে আর মুকুলচন্দ্রকে কাশীতে পাঠিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল ওখানকার শিল্পসমঝদার রায় কৃষ্ণদাস এঁদের কোনো ছবি কেনেন কিনা দেখে আসার। সেই সূত্রে ওঁদের কাশী আর সারনাথ প্রথম দেখা হলো। এর পরে ১৯১৯ সালে পুজোর ছুটির সময়ে শ্রীনন্দলালের সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ রাজগীর, নালন্দা, পাটনা, গয়া, বুদ্ধগয়া —এ-সব স্থান ঘুরেছিলেন। ১৯২০ সালে শ্রীনন্দলালের পিসিমা যখন কাশীবাস করতে যান সেই সময়ে ওঁরা পুনরায় কাশী গিয়েছিলেন। ১৯১৮ সালের অক্টোবর মাসে সুরেন্দ্রনাথ কবির সঙ্গে মাদ্রাজ গিয়েছিলেন। কিন্তু পথে ট্রেন বিগড়ানোর জন্যে তাঁরা নামলেন পিঠাপুরমে। সেবারে বীণকার সঙ্গমেশ্বর শাস্ত্রীকে শান্তিনিকেতনে আনার যোগাযোগ করা হলো। এই ভ্রমণে শান্তিনিকেতন থেকে ভীমরাও শাস্ত্রীও ওঁদের সঙ্গে গিয়েছিলেন। ১৯১৯ সালের জানুয়ারী মাসে কবি দক্ষিণভারত ভ্রমণের সঙ্গী স্বরূপে আবার নিয়ে গেলেন সুরেন্দ্রনাথকে। শান্তিনিকেতনে আসার পর থেকে তিনি তাঁর 'বুদ্ধিপ্রাখর্যে' আর 'চরিত্রমাধুর্যে' কবির আর আশ্রমবাসী সকলেরই প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। এঁকে নিয়ে কবি মহীশূরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে চললেন বাঙ্গালোর। গত বৎসর কবি অন্ধ্রপ্রদেশের পিঠাপুরম্ (কোকোনদ) পর্যন্ত এসেছিলেন —তার দক্ষিণে যাওয়া হয়নি।

১৩২৬ সালের ৮ই আষাঢ় থেকে ৭ই পৌষের শান্তিনিকেতন-সংবাদে দেখা যাচ্ছে যে, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর মহাশয় চিত্রকলা সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়াছেন। এই সময়ে আশ্রমে শ্রীনন্দলালের অধ্যাপনার ফলে, চিত্রকলা-বিভাগে মালাবার, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব, আসাম অর্থাৎ সারা ভারতবর্ষ থেকেই ভারতশিল্প শেখবার জন্যে ছাত্রবৃন্দ সমাগত হয়েছিল। আশ্রমবাসী বৃদ্ধ, বালক, মহিলাবর্গও শ্রীনন্দলালের ক্লাসে উৎসাহভরে যোগ দিয়েছিলেন। শ্রীনন্দলালের উপস্থিতিতে অল্পদিনের

মধ্যেই এই বিভাগে প্রাণচাঞ্চল্য অনুভূত হয়েছিল। কিন্তু অবনীবাবুর নির্বন্ধে শ্রীনন্দলালকে সোসাইটিতে ফিরে যেতে হয়। ফলে, আশ্রমের কলাবিভাগে ছাত্র-সংখ্যা কমতে থাকে। তবে সেকালের আশ্রমকর্তৃপক্ষ সুরেন্দ্রনাথের ওপর বিশেষ আশা পোষণ করেছিলেন। উপরন্তু, এই সময়ে অসিতকুমারও আশ্রমে এসে কলাবিভাগের অধ্যাপকরূপে যোগ দিলেন। ইনি ১৯১৫ সালের পর থেকে আশ্রমে অনুপস্থিত থাকার পরে ১৯১৯ সালের জুন মাসে পুনরায় এখানে এসে যোগ দেন। কলাবিভাগের ক্লাস হতো তখন 'দ্বারিকে'র দোতলায়। কিছুদিন পরে হয়েছিল 'সন্তোষালয়ে'।

সুরেন্দ্রনাথ আর্টস্কুলে পড়েননি। তিনি ছিলেন অবনীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ-শিষ্য, 'বিচিত্রা'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। 'বিচিত্রা' উঠে যাবার পরে বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের কাজ শেষ করে তিনি শান্তিনিকেতনে আসেন আশ্রম-বালকদের চিত্রবিদ্যা-শিক্ষা দেবার ভার নিয়ে। বলা বাহুল্য, সুরেন্দ্রনাথের চিত্রবিদ্যা-শিক্ষা যেমন হয়েছিল অবনীন্দ্রনাথের কাছে; এই বিষয়ে তাঁর 'নতুন-দা' শ্রীনন্দলালের নিকট তাঁর ঋণও কম নয়। সুরেন্দ্রনাথের বহু ছবির 'ফিনিশে' রয়েছে শ্রীনন্দলালের হাত।

শান্তিনিকেতনে আসার আগে ও ঠিক পরে আঁকা যে-সব চিত্র সুরেন্দ্রনাথকে চিত্রশিল্পী হিসাবে চিরস্মরণীয় করে রাখবে তার কয়েকটি এই: সরস্বতী, মালিনী, একাকী, পাঠশাল, তুলসী, ননীচোর শ্রীকৃষ্ণ, বিদ্যারম্ভ, রথতলাতে রাধারাণী, হিরন্ময়ীর নিকট পুরন্দরের বিদায়গ্রহণ, বহিন, পথের সাথী ইত্যাদি। এ ছাড়া, লর্ড কারমাইকেল-সংগ্রহে তাঁর ছ'খানি উৎকৃষ্ট ছবির সলিল-সমাধি ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর Gitanjali-গ্রন্থে সুরেন্দ্রনাথের তিনখানি চিত্র স্থান দিয়েছেন এই পরিচয়ে: Here is Thy foot stool (বুদ্ধের পদতলে প্রণতা নারী), On the slope of the desolate river (একটি মেয়ে নদীর জলে প্রদীপ ভাসাতে যাচ্ছে) আর The Spring with its leaves and flowers has come with my body (পুষ্পিত লতায় আলিঙ্গিত নারী)।

সুরেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে প্রথম দিকে থাকার সময়ে পিয়ার্সন, এ্যাণ্ড্রুজ আশ্রমে আনাগোনা করছেন। বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়, হরিচরণ

বন্দ্যোপাধ্যায়, নেপালচন্দ্র রায়, জগদানন্দ রায়, কালীমোহন ঘোষ, কালীপদ বসু, নগেন্দ্রনাথ আইচ, ক্ষিতিমোহন সেন, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, তেজেশচন্দ্র সেন, প্রমোদারঞ্জন ঘোষ, ভীমরাও শাস্ত্রী, গৌরগোপাল ঘোষ, সন্তোষচন্দ্র মজুমদার, অক্ষয়কুমার রায়, সরোজকুমার রায়চৌধুরী প্রমুখ কর্মীদের নিয়ে সেকালের আশ্রম-সমাজ আর তাঁদের সাহচর্যের স্মৃতি তাঁর মনে স্থায়িভাবে আঁকা হয়ে আছে।

চিত্রশিল্পী সুরেন্দ্রনাথ প্রাগ্-বিশ্বভারতী পর্বে (১৯১৭) আশ্রমে এসে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত কলাভবনের অধ্যাপক ছিলেন। আর ছিলেন কবির বহু ভ্রমণের অন্তরঙ্গ সঙ্গী। অতঃপর, ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন শান্তিনিকেতন-সচিব ; এর পরে তিন বৎসরকাল নবপ্রতিষ্ঠিত বিনয়-ভবনের পরিচালক। তারপরে, কলাভবনের অধ্যক্ষ হয়ে পাঁচ বছর পরে ১৯৫৫ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি অবসর গ্রহণ করেছেন। শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠিত নানা উৎসবে, অভিনয়ে, মঞ্চসজ্জায় তাঁর দানও প্রভূত। চিত্রশিল্প থেকে তাঁর প্রতিভা ধীরে ধীরে কিভাবে স্থাপত্যশিল্পে রূপান্তরিত হলো সে ইতিহাস আমরা যথাসময়ে আলোচনা করবো। শান্তিনিকেতনে থাকার সময়ে প্রথম দিকে শ্রীনন্দলালের সহযাত্রী হয়ে তিনি রাজগীর, নালন্দা, পাটনা, গয়া, বুদ্ধগয়া, কাশী, সারনাথ বেড়িয়ে এসেছিলেন। তাঁরা ভ্রমণে বের হতেন বিশেষ করে পুজোর ছুটিতে। পরে পরে ভারতের প্রায় সর্বত্র ভ্রমণ করে বিভিন্ন স্থানের স্থাপত্য-রীতি দেখে দেখে আইডিয়া সংগ্রহ করে তিলে তিলে তিনি শান্তিনিকেতনকে বিচিত্র-রীতির ঘর-বাড়িতে ভূষিত করেছেন। জাতীয় অধ্যাপক ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সুরেন্দ্রনাথের নির্মিত শান্তিনিকেতনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এই স্থাপত্যরীতির নামকরণ করেছেন —'সৌরীন্দ্রিক রীতি'। তাঁর এই অনন্য রীতির খ্যাতি ক্রমে ক্রমে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে। স্থাপত্য-শিল্পে 'সিদ্ধপুরুষ' সুরেন্দ্রনাথের এই বিশিষ্ট রীতির অবদানের প্রসঙ্গ ক্রমান্বয়ে বিবৃত করা যাবে।

শান্তিনিকেতন-আশ্রম-বিদ্যালয়ে 'কলাভবন'-প্রতিষ্ঠার সূত্রপাতে গোপালচন্দ্র কবিকুসুম, নগেন্দ্রনাথ আইচ, পাঁচুগোপাল রায় ওরফে 'ওঙ্কারানন্দ', শ্রীসন্তোষ কুমার মিত্র, অসিতকুমার হালদার, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ করের ভিত্তির ওপর শ্রীনন্দলাল

১৯১৯ সালের গ্রীষ্মাবকাশের পর থেকে ক্রমশঃ কলাবিদ্যার 'সৌধ' নির্মাণ করেছিলেন। ১৯১৯ সালে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার পর বৎসরে অসিতকুমার, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ আর শ্রীনন্দলাল এই ত্রয়ীর যোগাযোগে এখানে কলাভবনের পত্তন হয়েছিল। 'বাহন' সুরেন্দ্রনাথ আর 'দেবতা' নন্দলালে ভর করে যেন দেবশিল্পী স্বয়ং বিশ্বকর্মা শান্তিনিকেতনে এসে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। প্রথম যুগের ব্রহ্মচর্যাশ্রমে শিল্প-প্রচেষ্টায় যে-জোনাকির আলো জ্বলেছিল তার মহিমা কিছুমাত্র খর্ব না করে বলা যায়, সে ছিল যেন অরুণোদয়ের সঙ্কেত, —বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাপর্বে অসিতকুমারে আর সুরেন্দ্রনাথে হলো চিত্রবিদ্যার অরুণোদয়। আর সবশেষে, অরুণ-সারথির রথে চড়ে এসে উদয় হলেন শিল্পিভাস্কর শ্রীনন্দলাল।

॥ বিশ্বভারতীতে আচার্য নন্দলালের প্রাথমিক শিল্পশিক্ষণ পদ্ধতি ১৯১৯-৫১ ॥

বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানে কলাবিদ্যা কিভাবে শিক্ষা দেওয়া হবে সে-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বহুদিন আগে থেকেই চিন্তা করেছিলেন। তিনি পর্যায়ক্রমে সেকালের কলাবিদ্যার অধ্যাপক শ্রীসন্তোষকুমার মিত্র, অসিতকুমার হালদার, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ করের কাছে এই বিষয়ে একই পদ্ধতির পুনরুক্তি করেছেন দেখা যাচ্ছে। পরে, নন্দলাল যখন এখানে অধ্যাপক হয়ে এসে কাজ শুরু করে দিলেন, তিনি অভিজ্ঞ ব্যক্তি হলেও, তাঁর সঙ্গেও কবি এই পদ্ধতি সম্পর্কে প্রভূত আলোচনা করেছিলেন। সেই আলোচনার সূত্র ধরে ধরে নন্দলালও এখানে তাঁর নতুন কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হতে মনস্থ করেন। কবিগুরুর চিন্তার আলোকে নন্দলাল যে-পদ্ধতি স্থির করে এখানে কলাবিদ্যা-চর্চার সূত্রপাত করেছিলেন, এবং বরাবর যে-পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন (১৯৫১ সাল পর্যন্ত) —এই অধ্যায়ে তাঁরই ভাষা অনুসরণ করে কিছু বলা হচ্ছে।—

প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ বা Nature Study :

ছেলেদের প্রত্যেকের একখানা করে খাতা থাকবে; তাতে লিখা হবে।—

ফুল ঃ —ঋতু অনুসারে ফুলের তালিকা করবে। সেইসব ফুল দেখে দেখে আঁকতে হবে। ফুলের নাম ও কোন্ মাসে ফোটে —নোট করতে হবে।

গাছ —তাল, খেজুর, নারকেল, কলা, শিমুল, ঝাউ, বট, অশ্বত্থ, আম, শাল, হিমঝুরি, ইউক্যালিপ্টাস্ —এদের পাতা ও ফুল ছেলেরা list করে ঐ নোটে যোগ করবে।—

পাখি —ঋতু অনুযায়ী পাখি ও আশ্রমের সাধারণ পাখি, —তার list করবে।

জন্তু —আশ্রমে যা দেখা যায় —তার list করবে। ও অন্যত্র যা' তারা দেখেছে তারও list করবে। এক-একটা রং-এর জন্তুর পৃথক্ পৃথক্, list করবে ও কোথায় কোথায় ঐসব জন্তু দেখা যায়।

কার্ড-সাইজ কার্ডবোর্ডের ওপর রং-pastel দিয়ে এঁকে, এক-একটি ছোট কাগজের বাক্সে, প্রত্যেক রং-এর বাছাই করা (sort করে) জিনিস রাখবে। ক্রমশঃ ঐসব সংগ্রহ করে, ছেলেরা তাতে নতুন নতুন জিনিসের নাম যোগ করতে থাকবে। ঐ রং-এর কার্ডের বাক্সটি শিক্ষক নিজের কাছে রাখবেন। শিক্ষক কার্ডের ওপর ছবি যথাসম্ভব ছেলেদের দিয়ে আঁকাবেন। তিনি ইচ্ছা করলে নিজেরও একটি বাক্স আলাদা রাখবেন। তাতে তাঁর নিজেরও শিক্ষা চলবে।

ঋতু অনুযায়ী ফুল ও পাখি।—

ফুল ঃ বর্ষার ফুল —কদম, পদ্ম, কেয়া, হেনা, টগর, সেঁউতি, কলকে, ফুরুস (আষাঢ়ী), গন্ধরাজ (ইন্দ্রকমল), রজনীগন্ধা ইত্যাদি। (বারমেসে ফুল) জবা, কলকে, সাগরি, গোলাপ, রঙ্গন ইত্যাদি।

বর্ষার পাখি —পাপিয়া, ডাহুক, বক, কাদা-খোঁচা, হাঁস, শামুকখোল ইত্যাদি। (বারমেসে পাখি) —কাক, শালিক, বক, হাঁড়িচাঁচা, চড়াই, পেঁচা, চিল, বাজ ইত্যাদি। ক্রমশঃ ঐসব ফুল, ফল, পাখি card-এ রং দিয়ে আঁকতে হবে এবং রং-এর বাক্স যথাস্থানে গুছিয়ে রেখে দিতে হবে।

Model Drawing :

(১) (Cylindrical) টিনের কৌটা, বোয়েম, রং-এর ড্রাম, বড় লোহার পাইপ-টুকরা, বোতল, গেলাস, পিপে বালতি ইত্যাদি।

(২) (Cubical) টিনের ক্যানেস্তারা, প্যাক্-বাক্স, বিস্কুটের টিন ইত্যাদি।

(৩) (Rectangular) বই, চৌকি, আলমারি ইত্যাদি। •

(৪) (Conical) ঠোঙ্গা (গাধার টুপির মতো), মোচার ডগা, মোড়া, ধুতরা ফুল, গ্রামোফোনের চোঙ্গা ইত্যাদি।

(৫) (Roundish) কলসী, হাঁড়ি, মালসা, হোলা, কুঁজো, ফুটবল, আলু, বেল, কদম, কমলালেবু ইত্যাদি।

(৬) (Oblongish) তাকিয়া, নোড়া, ফুটি, কুমড়ো, ছাঁচি-কুমড়ো, তরমুজ ইত্যাদি।

(৭) নানা রকম —আম, পটল, শসা, লাউ, পেঁয়াজ, ঝিঙে, কুমড়ো, তাল, টম্যাটো, ঢেঁড়স, মোচা, ডিম, কাজুবাদাম, নারকোল, ডাব, বেল, আনারস ইত্যাদি।

(৮) উপরোক্ত নানারূপ model-এর ছায়া, এবং চেপ্টা-গড়নও শিক্ষা দরকার। (কোনো আলোর সামনে কোনো একটা model রেখে একটা বোর্ডের ওপর তার ছায়া ফেললে চলবে)। এবং কতকগুলি চেপ্টা জিনিসেরও ড্রইং করানো আবশ্যক। চেপ্টা জিনিস যেমন —আসন পিঁড়া, আঁকার বোর্ড, মাদুর, কপাট ইত্যাদি। চেপ্টা গোল জিনিস —চাকা, থালা, হাতে-গড়া-রুটি ইত্যাদি।

(৯) (ক) Cylindrical ও Conical—মোড়া

(খ) Eggform ও Conical—ডাব

(গ) Roundish ও Conical—তাল ইত্যাদি

—এই রকম নানা জিনিস, উপরে-লেখা ক'টা একক বা মিশ্র form-এর ভেতর ফেলে, শিক্ষক এঁকে বুঝিয়ে দেবেন। V, VI, VII, VIII group-এ সব জিনিসই আঁকাবার চেষ্টা করবেন। III, IV group-এর জন্যে মোটামুটি form-গুলি, আর তার ভেতর সব জিনিস কি ক'রে fit করে, দেখাবেন। খুব ছোটদের বেলায় উপরোক্ত ঐ সব ফল মূল ও নানা রকম জিনিস তাদের সামনে রাখা থাকলেই যথেষ্ট। ঐসব জিনিসের প্রতি শিক্ষক তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন মাত্র। জোর করে বা নিয়ম করে আঁকাবার চেষ্টা করবেন না।

1st ও 2nd GROUP উপস্থিত শিক্ষা-ব্যবস্থার দোষে বাদ পড়েছে।

GROUP	WORKS
(আন্দাজ ছেলের সংখ্যা দিতে হবে) 3rd GROUP	Model drawing, Black board drawing, Original, Linocut or Wood cut, Illustrations, Nature study.
GROUP 4th GROUP	Model drawing, Copy on paper, Original, Linocut, Illustrations, Nature study.
5th GROUP, 6th ,, 7th ,,	Original, Linocut, Copy on paper, Nature study.
8th & 9th GROUP	Original, Nature—outdoor

PERIODS OF CLASS IN

GROUPS	WEEK	MONTHS	9 MONTHS
3rd	2 Periods	8 Periods	72 Periods
4th	2 ,,	8 ,,	72 ,,
5th	3 ,,	12 ,,	108 ,,
6th	3 ,,	12 ,,	108 ,,
7th	3 ,,	12 ,,	108 ,,
8th	6 ,,	24 ,,	216 ,,
9th	4 ,,	16 ,,	144 ,,

॥ শিক্ষাপদ্ধতি —শিশুদের উপযোগী ॥

(শিল্পবিষয়ক আলোচনা ও সংগ্রহ)

…'তোমার ১৪ তারিখের পত্র পেলাম। যদুপতির সিলেবাস তৈয়ারি হলেই তোমায় পাঠাবো। তুমি কাজে সাহস করে লেগে যাবে। চিন্তা করলেই সব সমাধান করতে পারবে। এখানকার কাজ যারা ঠিকভাবে শিখেছে তারা স্বভাবতঃ চিন্তা করতে ও উদ্ভাবন করতে শিখে যায়। এই হচ্ছে এখানকার শিক্ষাপদ্ধতির মূল ভিত্তি।

দৃষ্টি রাখবে, যখনি যে রুটিন বা শিক্ষার ব্যবস্থা ছাত্রদের জন্যে (ছোট ও বড়) করবে তখন —(১) Original (মৌলিক) (২) Natural (প্রাকৃতিক) ও (৩) Traditional (পারম্পরিক) —এই তিন বিষয়ে সব সময় পর্যায়ক্রমে (Consecutively) শিখাবে। কোনো একটা বিষয়ে বেশী দিন শিক্ষা ভালো নয়। খুব কমপক্ষে প্রত্যেক বিষয়ে সপ্তাহে ২ ঘণ্টা পর পর —অর্থাৎ Original কাজ দু-দিন পর পর করা হলেই Nature Study ধরাবে। •তারপর Traditional কাজ করাবে। তাও ছেলেদের বয়স অনুযায়ী ব্যবস্থা করতে হবে। খুব ছোট ছেলে এগারো-বারো বৎসরের কম হলে তাকে বেশী কপি ও drawing-এর টেকনিকের নিয়ম (Composition. Perspective, রং-এর harmony) ইত্যাদি নিয়মমতো না-করিয়ে ইঙ্গিতে বুঝানো দরকার।

তাদের Original ছবি করার জন্যে উৎসাহ বাড়াবার ও ভালো লাগার জন্যে সুবিধা হলে, ভালো ছবি দেখাবে। (অভাবে ভালো ছবির ফটো বা প্রিন্ট্ দেখাবে)। Nature থেকে ভালো ভালো সুন্দর দৃশ্য (যা তোমাদের ইস্কুলের নিকটে আছে) মাঝে মাঝে দেখাবে। আর চতুর্দিকে নানা রকম বস্তুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে ও তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাবে।

নানারূপ প্রাকৃতিক দৃশ্যের একটি তালিকা দিলাম, —পাহাড়, জঙ্গল, মেঘ, নদী, ঝর্ণা, হ্রদ, বিস্তীর্ণ মাঠ, সমুদ্র, আকাশ ইত্যাদি। বস্তু

—জীবজন্তু যথা —মানুষ, পশুপক্ষী, ফুলপাতা, গাছপালা বেশভূষা, যানবাহন, যন্ত্রপাতি, গ্রাম, শহর, ঘটিবাটি ইত্যাদি যে বস্তুই দেখাও না কেন সঙ্গে সঙ্গে তার উদ্দেশ্য ও গুণ বুঝিয়ে দেবে। —যথা গরুর গাড়ীর উদ্দেশ্য ভার বওয়া, তার ওপর চড়ে যাওয়া ইত্যাদি। গুণ হ'ল —ধীরে বা দ্রুত চলছে, ভারি জিনিস বোঝাই করেছে ইত্যাদি। মাঝে মাঝে ছাত্রদের প্রকৃতির বিষয় ভালো গান শোনাবে ও কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি পড়াবে। (গুরুদেবের গানে ঐ সব গুণ ও উদ্দেশ্যের বর্ণনা খুব আছে।) খুব ছোটদের কাছে এইসব গুণ ও উদ্দেশ্যের কথার উল্লেখ ও তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেই চলবে। তা' থেকেই তারা original ছবি করবার প্রেরণা পাবে। বড়দের বেলাও তাই, তবে মাঝে মাঝে ঐ সব জিনিস করবার জন্যে ফরমাস করবে। বড়দের কিছু কিছু কপি, ক্লে-মডেলিং, মডেল দেখে মডেল-ড্রইং, Perspective ইত্যাদি শিখান দরকার। যাতে তারা ক্রমশঃ ড্রইং-এর language শিখতে পারে। বড়ো হ'লে ঐ ড্রইং-এর language বিশেষ কাজে লাগবে। ছোটরাও এই language শেখে। কিন্তু original ছবি ক'রে ক'রে খেলার ছলে শেখে। ঠিক drawing-এর নিয়ম-কানুন শিখবার উপযুক্ত সময় হল —যখন তারা নিজে ছবির বস্তুর গড়ন ও মাপ-জোকের ভুল ধরতে শেখে। এইরূপ নিজের কাজের প্রতি বিচার-বুদ্ধি তের-চোদ্দ বছর বয়স থেকেই হয়। টেকনিক ও নিয়ম ছাত্রদের খুব সাবধান হয়ে শেখানো দরকার। এ বড় কঠিন কাজ। নিয়মমতো ও রুটিন-মতো, ছাত্রদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঐ সব drawing-এর নিয়ম তাড়াতাড়ি গেলানো যায় বটে, এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তার ফলও পাওয়া যায় —কিন্তু এটা খুব দোষের। এতে সৃষ্টি করার ইচ্ছা মূলেই নষ্ট হয়ে যায়।

এইখানেই ভালো বা মন্দ অর্থাৎ পটু বা অপটু শিক্ষকের তফাৎ। ভালো শিক্ষক ছেলেদের মন বোঝে ও তাদের কাজের ও বুদ্ধির প্রতি শ্রদ্ধা রাখে। ছোট ছেলেদের সৃষ্টি করার ও স্বভাব দেখার ধরন শিক্ষক খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করবেন। তাতে তিনি নিজের কিছু কিছু নতুন শিক্ষা ও চিন্তা করতে পারবেন। শিল্প হল সাধনার বস্তু। কাজের প্রতি ছেলেদের গোছানে-স্বভাব আর শ্রদ্ধা-জাগানো ভালো শিক্ষকের প্রাথমিক কর্তব্য।

অশ্রদ্ধার ভাব নিয়ে কখনো শিখা বা শিখানো যায় না। এবং আপনি আচরি ধর্ম অপরকে শিখাবার ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষককে সর্বদাই মনে রাখতে হবে, চোখ রাঙিয়ে 'গুরুদেব' হওয়া যায় না। যুক্তিও সব সময় কাজে লাগে না। বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর। হাতে-নাতে কাজ ক'রে আদর্শ দেখানো— সেই আসল কথা। সেই আদর্শ উপলব্ধি করতে শেখানোই হচ্ছে যথার্থ শিক্ষাদান। আর সব সময়েই মনে রাখতে হবে, আমরা শিল্পী। সেই সঙ্গে আত্মিক শক্তির স্ফুরণ অতি আবশ্যক। এতেই শিক্ষক নির্ভরযোগ্য হয়ে থাকেন। এইভাবে চললে ছেলেদের শ্রদ্ধা ও প্রীতি সহজেই শিক্ষক আকর্ষণ করতে পারবেন। বিশেষ ক'রে প্রত্যেক শিক্ষকের creative instinct থাকা বাঞ্ছনীয়। মূল কথা হ'ল, ছেলেদের কিসে সৃষ্টি করার ইচ্ছা জাগে তার চিন্তা করা ও নানা উপায় উদ্ভাবন করা। যে সৃষ্টি করে সেই ঠিক বেঁচে আছে ও খুশী আছে। আর সে-ই অপরকে বাঁচাতে ও খুশী করতে পারে। সে-রকম শিক্ষকই ছেলেদের জীবনের প্রতি অংশকে সার্থক ক'রে তুলতে পারেন—এ কথাটা ভালো শিক্ষকের সর্বদা মনে রাখতে হবে। মন্দ শিক্ষকের লক্ষণ দেখা যায় চতুর্দিকে। প্রকৃতির সঙ্গে তার পরিচয় হয়নি বা সে উদাসীন; তাকে অন্তর থেকে ভালোবাসতে শেখেনি। এইরূপ শিক্ষককে ছেলেরা খুব ভয়ের চক্ষে দেখে ও আপন বন্ধু হিসাবে নিতে পারে না। যে সৃষ্টি করে সে চলন্ত জলের ধারার মতো, তাতে সব জিনিসই তাজা থাকে। চলন্ত জল শুদ্ধ ও তাজা থাকে। বদ্ধ জল শীঘ্রই পচে যায়; তাতে যা পড়ে সব পচে উঠে। জলও বিষাক্ত হয়ে যায়। মন্দ শিক্ষক এই বদ্ধজলের মতো। উপস্থিত ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায়, অনেক শিক্ষকের স্বভাবের প্রতি ভালোবাসা আর তার সঙ্গে পরিচয় না-থাকলেও শিখানোর কাজ তিনি বেশ চালিয়ে যান। কেবলমাত্র বই-এ লেখা জ্ঞান-অর্জন করেই তিনি কাজ চালান। এটা খুব শুষ্ক ও প্রাণহীন হয়।

শিখানোর ক্ষেত্রে সব বিষয়েই খেলার ছলে সরস ক'রে শিখানো যায়, আর শিখবার নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করা যায় (পূজনীয় গুরুদেব এইরূপ শিক্ষা-বিষয়ে অনেক গবেষণা করেছেন, সে-সব ওঁর লেখা থেকে সংগ্রহ করা যায়)। তবে উপরোক্ত শিক্ষকের খুবই

অভাব। প্রত্যেক শিক্ষায়তনে কিছু চিন্তাশীল ও সৃষ্টি করছেন এমন শিক্ষক পাওয়া যেতে পারে। তাঁদের দিয়ে অপর শিক্ষকদের ঐসব বিষয়ে চিন্তা জাগাবার ব্যবস্থা করতে পারা যায়।

॥ কোন একটী নতুন শিল্পশিক্ষা-প্রতিষ্ঠান-স্থাপনের জন্যে লিখা ॥

সর্বাগ্রে চিত্র-শিখার কেন্দ্র নির্বাচনের জন্যে বিশেষ স্থান দরকার। কোনো শহরের নিকটে হলেই ভালো। প্রথমে Middle Class লেখাপড়া-করা ছাত্রদের নিয়ে কাজ আরম্ভ করা উচিত। ক্রমশঃ ঐ আদর্শে ছোট্ট ছোট্ট শিক্ষায়তন ক'রে গ্রামে শিখানোর ব্যবস্থা ভবিষ্যতে করা চলতে পারে। শিখাবার জন্যে বাড়িঃ প্রথমে পাঁচ ছ' কুঠুরীর বাড়িতে কাজ আরম্ভ ভালোভাবে করতে পারা যায়। ভালো দামী বাড়ির জন্যে প্রথমে না-ভাবাই ভালো। শিক্ষায়তনটি মনোমতো আকার (shape) নিলেই তার জন্যে ভালো বাড়ি তৈরি করা যাবে।

শিক্ষক।—প্রথমে ভিন্ন ভিন্ন branch-এর জন্যে চার-পাঁচটি শিক্ষক নিয়ে কাজ আরম্ভ করা চলবে। নিম্নলিখিত বিষয় ভালো শিখানোর ব্যবস্থা রাখতে হবেঃ— (১) Painting ও তার শিখার উপায় (Drawing, Perspective, Modelling)। (২) Decorative work (ornamental আলপনা, বাটিক, চামড়ার কাজ ইত্যাদি)। (৩) Advanced বা বড়ো ছাত্রদের অনুকরণ ক'রে আঁকা শিখানোর ব্যবস্থা। এতে কোন বস্তু দেখে আঁকার কৌশল ও মন থেকে কোনো জিনিস কল্পনা ক'রে আঁকা শিখানো হবে। Visualize ক'রে আঁকাঃ—এই রকম শিক্ষা সমস্ত বিদ্যা শিক্ষা করতে language-এর মতো দরকার হয়। —যেমন ডাক্তারী, বোটানী ইত্যাদি। পরে, ঐ প্রতিষ্ঠানে portrait শিখানোর ব্যবস্থা করতেও পারেন। Library এবং Museum-এ ছবির জন্যে গ্যালারী; প্রথমে দেশী ছবির print ও photo রাখতে হবে। ক্রমশঃ দেশী ছবি সংগ্রহ করতে হবে। একটি জায়গায় গ্যালারী-ঘর থাকবে। মাঝে মাঝে স্থানীয় কারিগর আনিয়ে কিছু কাজ করানো দরকার। বিদেশী মিউজিয়ম থেকে দেশী ছবির print জোগাড় ক'রে এনে রাখতে হবে। General Syllebus-এর সঙ্গে,

কলাভবনের ধ্রুব উদ্দেশ্যের উল্লেখ থাকলে ভালো হয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দু'রকম উদ্দেশ্য থাকতে পারে। একটা চারুশিল্পের জন্যে, আর একটা কারুশিল্পের জন্যে। চারুশিল্পে হবে সুকুমার কলার সৃষ্টি, আর ঐ বিষয়ে জ্ঞান-অর্জন। কারুশিল্পে হবে ব্যবহারিক শিল্প-সৃষ্টির কৌশল-শিক্ষা ও ঐ বিষয়ে জ্ঞান-অর্জন।

চারুশিল্প—(ক) চারুশিল্পের জ্ঞান অর্জন করতে গেলে সৌন্দর্যের ধ্যান, আর কল্পনা সহযোগে সৃষ্টি—তার অঙ্গ হবে। সৌন্দর্যের মধ্যে সত্যের অনুসন্ধান তার মুখ্য উদ্দেশ্য। (খ) সৌন্দর্যের সমালোচনা, যুক্তির দ্বারা বিচার আর তার চর্চা।

কারুশিল্প—(ক) এর দ্বারা জীবিকা-অর্জন, উদরান্নের সংস্থান, অর্থোপার্জন। (খ) কেবলমাত্র ছবি-আঁকার ও কারিগরির কৌশল আয়ত্ত করানো হলে শিক্ষকের প্রতিষ্ঠা বা খ্যাতি হবে না; তার উদ্দেশ্য ছাত্রদের পরিষ্কার করে জানাতে না-পারলে শিক্ষা ক্রমশঃ নীরস হয়ে পড়ে। সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে ঐসব কৌশল নতুন নতুন শিল্পের সৃষ্টি করে কাজে লাগানো দরকার। কিন্তু, এ দিয়ে কেবল Diploma পাবার চেষ্টা করা হ'লে অনেক mediocre অপটু শিক্ষক তোয়ের হবে। শিল্পী ও ভালো কারিগর ক্রমশঃ কমে যাবে। চারুশিল্পের শিক্ষায়তনে চারুশিল্পী তোয়ের করার উদ্দেশ্য মুখ্য থাকবে। ছাত্রদের সৌন্দর্যবোধ-বৃদ্ধি ও শিল্প-সৃষ্টির দিকে বেশী ঝোঁক দিতে হবে; তার সঙ্গে কিছু হাতের কাজ, কারিগরী কাজ অর্থ-উপার্জনের জন্যে রাখতে হবে। এতে করে বিশেষ অভাবের সময় ঐ রকম creative শিল্পীর কিছু অর্থের সাহায্য হবে। ভিন্ন material-এ কাজ করলে শিল্পীর সৃষ্টির কাজে উৎসাহ বৃদ্ধি হবে; এবং ভিন্ন craft-ও ভালো শিল্পীর দ্বারা তৈরি হলে তাতে আবার originality দেখা যাবে। উপস্থিত এদেশে কম শিল্পীই কেবল চারুশিল্পের দ্বারা জীবিকা অর্জন করতে পেরেছেন। পৃথিবীর ভিন্ন দেশেও এর যে বিশেষ সমাধান হয়েছে, এরূপ বলতে পারি না। তথাপি চারুশিল্পের সম্পর্কে আয়োজন সব দেশেই আছে। কারণ, যদি ঐ রকম প্রতিষ্ঠান থেকে বৎসরে দু-একটি Creative artist-ও তৈরি হয় তো সেই যথেষ্ট। তাহলে দেশের শিল্পের ক্রমশঃ উন্নতি হবে; এবং

দেশের গৌরব বৃদ্ধি হবে। অন্ততঃ যাদের অর্থের বিশেষ অভাব নাই বা অন্য উপায়ে অর্থোপার্জনের সংস্থান আছে তাঁরা এর অনুশীলন নির্বিবাদে চালাতে পারেন ; এতে দেশ ভালো স্রষ্টা শিল্পীর মুখ দেখতে পাবে। অনেকে অন্য Vocation-এর সংগে সঙ্গীতবিদ্যার চর্চা যেমন করেন, শিল্প-ক্ষেত্রেও ঐরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়। এতে দেশের শিল্পের সংহতি বাড়বে।

প্রশ্ন হতে পারে, দু-একজন শিল্পী তোয়ের করতে এতো ঘটা ও আয়োজনের প্রয়োজন নাই। যে-কোনো উপায়ে তাঁরা সে শিখে নেবেন। কিন্তু ঠিক্ ঐ রকম creative instincts-ওয়ালা ছাত্র চট্ করে খুঁজে নেওয়া শক্ত। শতকের মধ্যে একটি পাওয়া গেলে যথেষ্ট। ওদের দ্বারাই ভবিষ্যতে শিল্পের ধারা বজায় থাকবে, এবং নানারূপ কারিগরী শিল্পেরও Standard বজায় থাকবে। আমার মতে, চারুশিল্পের প্রতিষ্ঠান খুলে, তার সঙ্গে অর্থকরী কারিগরী কাজ থাকলে, ক্রমশঃ এর সমাধান হবে। যদি পাঁচ বৎসরের course হয়, তিন বৎসর পর্যন্ত চারুশিল্পের ওপর ঝোঁক দিয়ে বাকি দু-বৎসর যাদের চারুশিল্প-সৃষ্টির ক্ষমতা নাই, তাদের কারিগরীর কাজের দিকে ঝোঁক দেওয়া চলতে পারে।

চারুশিল্প-শিক্ষা তিন বৎসরে বেশ বুঝা যাবে, কার এদিকে ঝোঁক (test) আছে। যাদের সৃষ্টি করার দিকে বিশেষ ঝোঁক আছে তাদিকে ঐ বাকি দু-বৎসর বিশেষভাবে চারুশিল্প-সৃষ্টির অনুশীলন দেওয়াই ভালো। আর যখন যেখানে ভালো নাম-করা শিল্পী আছেন খবর পাওয়া যাবে, সেখানে ওদের পাঠানো দরকার। সঙ্গে সঙ্গে তিন বৎসর ধ'রে কিছু কিছু হাতের কাজ অবশ্যই করানো চাই। তখন প্রত্যেকেই কিছু-না-কিছু চারুশিল্পের বিদ্যা ও কারুশিল্পের বিদ্যা একসংগে আয়ত্ত করতে পারবে। তিন বৎসরের পরে ওদের Specialised করতে দিলে ভালো হয়। যারা artist হতে পারবে বলে মনে হবে, তাদিকে বিশেষ বৃত্তি দিয়ে অন্য কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠানে, পূর্বের শিক্ষায়তনে চারুশিল্পের বিশেষ শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকলে সেখানে, অথবা নিকটে বা দূরে, কোনো ভালো শিল্পী থাকলে তাঁর কাছে কিছু দিন রাখলে ভালো হয়। বাদ বাকী যাঁরা diploma নিয়ে বেরিয়ে যাবেন তাঁরা সাধারণ শিল্পায়তনে কাজ করতে পারবেন। যাঁরা পাঁচ বৎসর পরেও বিশেষ শিক্ষা লাভ

করে ঐ প্রতিষ্ঠানে বা ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানে গিয়ে কাজ করবেন, তাঁদের বিশেষ diploma দিয়ে বড়ো প্রতিষ্ঠান চালানোর ভার দিতে পারা যায়।

কেবল সুকুমার-কলার অনুশীলন করা ঠিক নয়। আবার কারিগরী কাজের সঙ্গে সঙ্গে সুকুমার-কলার শিক্ষা না-থাকলে কারুশিল্প ক্রমশঃ crude হয়ে পড়বে। নানারূপ কারুশিল্পের ভিতর দিয়ে ও ভিন্ন material-এর ভিতর দিয়ে কারুশিল্পের প্রকাশ করতে থাকলে চারুশিল্পের উন্নতি স্বাভাবিক এবং জোরালো হবে। এতে চারুশিল্প ও কারুশিল্পের স্বাভাবিক যোগ হবে। জীবনযাত্রায় সৌন্দর্যবোধ বাড়বে, সমাজে আনন্দ ও জীবনের সামঞ্জস্য আসবে। উপরন্তু চারুশিল্পী ও কারুশিল্পী উভয়েরই অর্থাগমের পথ সহজ হবে।

॥ শিল্প-শিক্ষায়তনে শেখানর চক্র-পদ্ধতি ও তার সুবিধা-অসুবিধা ॥

(শিল্পশিক্ষার মূল ভিত্তি)

(1)
Original

(2)
Nature Study

(3)
Traditional Copy

শিল্প-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা খুব কার্যকর হবে। এর পরীক্ষা আমরা শান্তিনিকেতন-কলাভবনে করে অনেকটা কৃতকার্য হয়েছি। ছাত্রেরা কিছুদিন একজন শিক্ষকের কাছে শিখার পর, কিছুদিন অপর শিক্ষকের কাছে শিখবেন। একজন শিক্ষকের বিশেষ বিষয় ভালো জানারই সম্ভাবনা অনেক। সেস্থলে সেই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে অপর ছাত্ররা যদি তাঁর কাছে না-আসে তবে তাঁর বিদ্যা ছাত্রদের আয়ত্ত হয় না। এমন হতেই পারে না যে, একজন শিক্ষকই সব বিষয়ে সবজান্তা। এইরূপ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শিক্ষাতে প্রাথমিক ছাত্রদের প্রভূত উপকার হবে।

(1) Original, (2) Nature study, (3) Traditional copy-এর শিক্ষা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে (পনের দিন থেকে একমাস পর পর) শিখানোর ব্যবস্থা শান্তিনিকেতন-কলাভবনে প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতিতে হয়। বিলিতী পদ্ধতিতে

(কলকাতা, মাদ্রাজ, বম্বে এবং অপরাপর গভর্ণমেণ্ট-শিল্পশিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ইংলণ্ডের একাডেমির অনুকরণে যেমন হয়েছে) উপরোক্ত ঐ তিন প্রকার শিক্ষণীয় বিষয় পরপর ক্রমশঃ শিখান হয় বটে, তবে পাঁচ ছয় বৎসর ধ'রে। এক-একটা বিষয় এক এক বৎসর ধ'রে শিখান হয়। অর্থাৎ একটা বিষয় পুরো শিখা হ'লে আর একটা শিখা আরম্ভ করে। এতে শিক্ষা হয় বটে, কিন্তু, Original ছবি সৃষ্টি-করার তত সুবিধা হয় না, বা উৎসাহ থাকে না।

পাঁচ-ছয় বৎসর original ছবিতে হাত দিবার অধিকার থাকে না—পূর্বেকার technic আয়ত্ত না-করা পর্যন্ত। এর ফলে, original ছবির জন্যে চিন্তাশক্তির ক্রমশঃ স্ফুরণ না-হয়ে, শেষে পাঁচ বৎসর পরে ছাত্র original ছবি করবার সময় বড়ো ভীত হয়ে পড়েন। এবং imagination ক্রমশঃ grow করায় ছবি ও ছবির বস্তুর form ঠিক হলেও, character-এর অভাব হয়। ফলে, ছাত্র বড়ো শুষ্ক ও আড়ষ্ট ভাবাপন্ন হয়ে পড়েন। তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত ভাব আর থাকে না।

অবশ্য Senior student (চার বৎসর পর) যাঁদের মোটামুটি শিক্ষার ধারা ও ছবির বিষয়ে প্রাথমিক general knowledge হয়েছে তাঁরা ইচ্ছা করলে ও সুবিধা পেলে ভালো নাম-করা বিশেষ শিল্পীর studio-তে তাঁর ধারা ও style শিক্ষার জন্যে যেতে পারেন। অবশ্য একজন নামজাদা শিল্পীর স্টুডিও-তে গোড়া থেকে শিখাতে খুবই উপকার হ'তে পারে, এবং এতে গুরুর বিদ্যা খুব ভালোভাবেই গুরুর মতোই আয়ত্ত করতে পারে—অবশ্য যদি সেই ছাত্রের গুরুর শিক্ষার বিষয়ে অনুরাগ ও taste থাকে। তা না-হলে, সে পরে শিক্ষা ছেড়েও দিতে পারে; এবং শিখলেও, ভালো না-লাগার দরুণ mediocre artist হ'য়ে যায়। নতুন নতুন শিক্ষকের নিকট ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শিখলে ছাত্র ও শিক্ষক দু-জনারই সুবিধা হয়, অর্থাৎ ছাত্র নিজ temperament-উপযোগী শিক্ষক, এবং শিক্ষকও নিজ মনোমতো ছাত্র পাওয়ায় শিখানোর কাজ সহজভাবে অগ্রসর হয়। Institution-এ (শিক্ষাকেন্দ্র) ঐ রকম ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শিক্ষা করার ফলে, ছাত্র ও শিক্ষক উভয়েরই উপকার হয়। যেমন একজন ছাত্র clay-modelling কিছুদিন শিখার পরে, painting শিখলে, তার মনের rest হয় ও freshness আসে। শিক্ষকও নতুন নতুন শিক্ষায় উৎসুক ছাত্রদের সঙ্গে পরিচিত হ'লে শিখানোর কাজে উৎসাহ বাড়ে।

এবং শিক্ষার লেনদেনের দ্বারা ছাত্র ও শিক্ষকের ভেতর ঘনিষ্ঠতার সুযোগ হয়। তখনই শিক্ষাকেন্দ্র একযোগে সুচারুভাবে চলে। তা না হ'লে একই শিক্ষাকেন্দ্রে যদি প্রত্যেক শিক্ষক নিজ নিজ ছাত্রের group নিয়ে নিজে studio চালান, তা'হলে একই কেন্দ্রে ভিন্ন ভিন্ন মতের সৃষ্টি হয়, ও পরে কেন্দ্রটি ভেঙ্গে যেতে পারে। ঐরূপ individual studio কেবল independent artist নিজ-ঘরে করতে পারেন। কিন্তু, একটি শিক্ষাকেন্দ্রে কেবলমাত্র একজনই প্রধান শিক্ষা-পরিচালক হওয়া দরকার ও তাঁর অধীনে ভিন্ন ভিন্ন specialist artist থাকবেন। অবশ্য শিক্ষকেরা নিজ-ঘরে নিজ নিজ রুচি-অনুযায়ী শিল্পসৃষ্টি করতে থাকবেন। এবং শিক্ষক-শিল্পী নিজ নিজ শিল্প-সৃষ্টি শিক্ষায়তনে exhibit করতে থাকবেন। ভিন্ন শিল্পীর ভিন্ন ভিন্ন style-এর কাজ দেখার জন্যে ছাত্রদের ভয়ের কোনো কারণ নাই, বরং এতে শিক্ষায়তনে পরপর সমালোচনা ও বুঝার চেষ্টা থাকাতে, শিল্পীর চিন্তাধারা ক্রমশঃ উৎকর্ষ লাভ করবে। Institution-এ কিন্তু শিক্ষাধারার একটি মতই চলবে। এবং সেই মতোই শিক্ষাকেন্দ্রের সব ব্যবস্থা হবে। তা'হলে কোনো confusion হবে না। এরূপ system-এ শিক্ষক-দের নিজ নিজ মত না-চালাতে পারায় ও নিজ নিজ group-এ ছাত্র না-পাওয়ায় দুঃখ হ'তে পারে ; কিন্তু উপায় নাই —যত দিন তাঁরা বিশেষ institution-এর অধীনে আছেন। ভিন্ন-মত-অবলম্বী ও ভিন্ন-style-ওয়ালা genious artist-কে মাঝে মাঝে আমন্ত্রণ করা চলবে —কেবল নতুন হাওয়া বদলাবার জন্যে ; কিন্তু নিজের institution-এর মূল ধারা যাতে না-ভেঙ্গে যায়, তার দিকে শিক্ষা-পরিচালকের খুব সজাগ দৃষ্টি থাকা চাই। অবশ্য নতুন style বা পদ্ধতির influence আসাও দরকার। কিন্তু ঐ influence কেবল fashion-এর খাতিরে এনে, কিছু হঠাৎ-পরিবর্তন না-করা ভালো। সে রকম influence হলে, খাল কেটে কুমীর আনার মতো ব্যাপার হবে। বরং সে-influence ধীরে ধীরে মূল শিল্পধারার অঙ্গ পুষ্ট করতে পারবে মাত্র। তার জন্যে ব্যস্ত হওয়া উচিত নয়। শিক্ষক নতুন পদ্ধতির সম্মুখীন হলে, নিজ আদর্শের ও নতুন আদর্শের মূল spirit-এর কথা ছাত্রদের কাছে বুঝবার চেষ্টা করবেন। তাহলে ভুল বুঝে নিজ আদর্শের প্রতি অবজ্ঞা হবে না ; ও নতুন আদর্শ থেকে assimilate করারও সুবিধা হবে। বিশেষ কোনো শিল্প-সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে শিক্ষা দিলে শিখানো প্রাণবান্ হবে। শিক্ষক মাঝে মাঝে ইচ্ছা

করে ঐরূপ উদ্দেশ্য সৃষ্টি করবেন। যেমন কোনো গৃহের শোভার জন্যে দেয়াল বা ভিত্তিচিত্র, বা মূর্তিগঠনের কাজ। যখন ঐ কাজ দক্ষ শিল্পীরা করতে থাকবেন, নতুন ছাত্ররা তাঁদের সাহায্য করবেন, শিক্ষকরাও সুবিধা বুঝে ছাত্রদের শিক্ষা ও উপদেশ দিতে থাকবেন। কোনো মঠ, মন্দির, বড়ো ধনীর গৃহ, বিদ্যায়তন বা দেশের রাষ্ট্র-গৃহ এই রকম বড়ো স্থানে শিল্পসৃষ্টির কাজ আরম্ভ করলে, এক-একটি জীবন্ত শিল্পশিক্ষায়তন তার সঙ্গে গড়ে উঠতে পারে। উদ্দেশ্যহীন শিল্প (art for art's sake) ব্যক্তিগত রসিক-সাধকের বেলা সত্য হতে পারে, কিন্তু সমাজে যেখানে শিল্প জীবনযাত্রার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সমাজের বা সংস্কৃতির প্রাণস্বরূপ হয়ে আছে, সেখানে শিল্প কোনো একটা মহৎ উদ্দেশ্যের সঙ্গে যুক্ত থাকলেই ভালো হয়।

॥ শিল্প-সৃষ্টির বিষয়ে কয়েকটি কথা ॥

রস-আস্বাদনে আনন্দিত, শ্রদ্ধায় নম্র ও বিগলিত মনেই সৃষ্টি করার প্রেরণা জাগে ও পুষ্ট হয়। বিচার করে, বিশ্লেষণ করে, composition এবং experiment করে science-এর problem solve হতে পারে, কিন্তু, শিল্পসৃষ্টি হতে পারে না। শিল্পসৃষ্টি করতে গেলে নানা উপায় (technique) ও করণ-কৌশল লাগে। এ হলো শিল্পসৃষ্টি করার Science। এর উৎকর্ষ হলে, সৃষ্টি সুষমা-মণ্ডিত, সরল ও নির্ভীক হয়। ঠিক প্রেরণা জাগলে সৃষ্টি করার উপায় ও কৌশল সহজেই আয়ত্ত হয়ে যায়। আগে inspiration বা প্রেরণা চাই, তারপর করার কৌশল। অনেকের মত হ'ল —শিল্পায়তনে সৃষ্টিকাজে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া দরকার। তাতে কাজে স্বতঃস্ফূর্ত ভাব ও মৌলিকতা আসবে। অর্থাৎ কোন পরম্পরা-পদ্ধতি না-শিখা, বা শিখানোর কোনো নিয়ম না-রাখা। কথাটায় একটা সত্য আছে বটে, কিন্তু, বোঝবার বা বোঝাবার ভুলে একটা গোলমালের সৃষ্টি হয়েছে। এইভাবে শিল্পসৃষ্টি করার experiment করে দেখা গেছে, তাতে কেবল পাগলের প্রলাপ ও যথেচ্ছাচার ঘটে গেছে। তাতে মনের উৎশৃঙ্খলতাই প্রকাশ পেয়েছে। বয়স্ক ছাত্রদের শিখার বেলায় পরপর —(১) প্রথমে মৌলিক ছবি আরম্ভ করতে হবে। তারপর (২) স্বভাব-পর্যবেক্ষণ। সবশেষে (৩) পারম্পরিক (Traditional) ছবি নকল।

অর্থাৎ যে-সব মৌলিক ছবি করা হয়েছে, সেই ধরনের ছবি দেখলে, বা নকল করলে, ছবি করায় শিল্পীর ক্রমশঃ উন্নতি হবে, এবং তাঁর অাঁকা ছবিতে লাবণ্য আসবে। তিন ধরনের শিক্ষাই ছাত্রদের বেলা সর্বদাই হওয়া চাই, —ঠিক্ শরীর-ধারণের উপযোগী নিত্যকার পুষ্টিকর খাদ্য-গ্রহণের মতো। এর মধ্যে কোনোটা শিখা বেশী দিন বাদ রাখলে চলবে না। ঠিক্ শরীরের পক্ষে যেমন কয়েকটি খাদ্য নিত্য দরকার —সেই রকম। ঐরূপ অবাধ সৃষ্টি করার অধিকার শিশুদের পাঁচ-ছ বৎসর থেকে নয় দশ বৎসর পর্যন্ত দেওয়া উচিত। ঐ সময় ঐ শিশুদের চারদিকে শিল্পসৃষ্টির একটা পরিবেশ থাকা আবশ্যক। ঐ পরিবেশের মধ্যে থেকেই শিশুরা নিজ খুশীমত করণ-কৌশল সহজেই আয়ত্ত করে নেবে। পরিবেশ বলতে বুঝতে হবে, —যেখানে শিল্পীরা নিজ নিজ কাজ করছেন, ও সৃষ্টি করছেন। এইরূপ তিন চার বৎসর ধরে শিশুরা নিজ খেয়াল-খুশীতে ছবি করে, পরে তাদের একটু বোধ জন্মালে ছবি করার নিয়ম-কানুন নিজেরাই অধ্যবসায়ের সঙ্গে আরম্ভ করবে। ঐ তিন-চার বৎসর সময় ব্যর্থ যাবে না, তাতে শিশুর মনে চিরকাল একটা সৃষ্টি করার নেশা লেগে থাকবে; আর পরবর্তী-জীবনে চিন্তা করার ধারাও মনের মধ্যে খুলে যাবে। বয়স্ক ছাত্র —যাঁদের মন পাকা হয়েছে মনে জটিলতা এসেছে তাঁদের কোনো ভালো শিল্পীর অধীনে তাঁর কথামতো শিক্ষা করা দরকার। শিক্ষকদের অধীনে থাকার সময় খেয়াল-খুশীতে ছবি করা তাঁদের পক্ষে ক্ষতিকর হবে। ঐরূপ ছবি করলে সৃষ্টিতে একটা বিশৃঙ্খলা ও উদ্দামতা প্রকাশ পাবে। শিক্ষায় সংযমের অভাবে সৃষ্টি বড়ো পীড়াদায়ক হবে।

ছবি সৃষ্টি হয় মনের ক্ষেত্রে। মন অশুদ্ধ থাকলে, উৎ-শৃঙ্খল থাকলে, ছবিতেও ঐ সব ভাব প্রকাশ পাবে। ছবিতে শুধু আমরা মনের ভাব, ভালো মন্দ যা ভাবি তাই প্রকাশ ক'রে খালাস পেতে পারি না। তাতে শিক্ষার কৌশল—অর্থাৎ শিল্পীর character—সংযম ও সুষমা থাকা চাই। তা' না-হলে, শিল্প-সৃষ্টি হবে না। ভারতবর্ষে শিল্প-সৃষ্টির সম্পর্কে একটা সুনির্দিষ্ট নিয়ম আর তার ছ'টি অঙ্গের উল্লেখ আছে। সেই ষড়ঙ্গ শিল্পীদের অনিবার্যরূপে পালনীয় সত্য।

অবনীবাবুর শিক্ষণ-পদ্ধতি তাঁর ষড়ঙ্গের বই-এ উত্তমরূপে বলা আছে। সেই বই শিল্পীদের অবশ্যপাঠ্য হওয়া উচিত। তাঁর সেই শিক্ষাপদ্ধতি আমরা

মেনে এসেছি। আমাদের এই ধারা পাশ্চাত্য দেশ এখন ঘুরিয়ে গ্রহণ করেছে।

॥ রবীন্দ্র-ভাবনায় আদর্শ বিদ্যালয় 'বিশ্বভারতী', ১৯১৯ ॥

১৩২৬ সালের বৈশাখ-সংখ্যার 'শান্তিনিকেতন'-পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ 'বিশ্বভারতী'তে শিক্ষাদানের আদর্শ ব্যাখ্যা ক'রে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লিখেছিলেন। কবির এই রচনাটি পাঠ করলে পরিষ্কার বোঝা যাবে, কেন তিনি 'এহো বাহ্য' নীতি অবলম্বন ক'রে, শিল্পীর পরে শিল্পী আনার পালা শেষ ক'রে, অবশেষে নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভাধর ধ্যানী শিল্পী নন্দলালকে বিশ্বভারতীতে এনে, প্রতিষ্ঠিত ক'রে, দেশের চিত্তক্ষেত্রের সঙ্গে শিল্পি-মনের সংযোগ সাধন করতে এতো আগ্রহী হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই স্বল্পবাক, স্নেহপ্রবণ, স্মিতমুখ, আত্মস্থ অথচ একান্তভাবে সামাজিক, ছাত্রবৎসল, স্বদেশী মাটির মানুষটির পরিচয় পূর্বেই পেয়েছিলেন। ফলে, বিশ্বভারতীতে কলাবিদ্যার সৌধ-নির্মাণ-কল্পে যে-কোন মূল্যে চিন্তাশীল এই আদর্শ ভারতশিল্প-শিক্ষকটিকে শান্তিনিকেতনে আনতে না-পারা পর্যন্ত তাঁর মনে স্বস্তি ছিল না। রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্বভারতী' নন্দলাল-বিহনে কতখানি সফল হ'ত, সেও আজ পরিমাপ করার সময় এসেছে।

১৯১৯ সালে রবীন্দ্রনাথ 'বিশ্বভারতী'র প্রতিষ্ঠাপর্বে যা' ভেবেছিলেন:— 'আমাদের দেশে শিক্ষার আদর্শ কী হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে আমার প্রবন্ধ আমি কলিকাতায় এবং অন্য অনেক শহরে পাঠ করিয়াছি। সংক্ষেপে তাহার মর্মটুকু এখানে বলি।

মানব-সংসারে জ্ঞানালোকের দিয়ালী-উৎসব চলিতেছে। প্রত্যেক জাতি আপনার আলোটিকে বড়ো করিয়া জ্বালাইলে তবে সকলে মিলিয়া এই উৎসব সমাধা হইবে। কোনো জাতির নিজের বিশেষ প্রদীপখানি যদি ভাঙ্গিয়া দেওয়া যায়, অথবা তাহার অস্তিত্ব ভুলাইয়া দেওয়া যায় তবে তাহাতে সমস্ত জগতের ক্ষতি করা হয়।

এ কথা প্রমাণ হইয়া গেছে যে, ভারতবর্ষ নিজেরই মানসশক্তি দিয়া বিশ্বসমস্যা গভীরভাবে চিন্তা করিয়াছে এবং আপন বুদ্ধিতে তাহার সমাধানের চেষ্টা

পাইয়াছে। সেই শিক্ষাই আমাদের দেশের পক্ষে সত্য শিক্ষা যাহাতে করিয়া আমাদের দেশের নিজের মনটিকে সত্য আহরণ করিতে এবং সত্যকে নিজের শক্তির দ্বারা প্রকাশ করিতে সক্ষম করে। পুনরাবৃত্তি করিবার শিক্ষা, মনের শিক্ষা নহে. তাহা কলের দ্বারাও ঘটিতে পারে।

ভারতবর্ষ যখন নিজের শক্তিতে মনন করিয়াছে তখন তাহার মনের ঐক্য ছিল —এখন সেই মন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেছে। এখন তাহার মনের বড়ো বড়ো শাখাগুলি একটি কাণ্ডের মধ্যে নিজেদের বৃহৎ যোগ অনুভব করিতে ভুলিয়া গেছে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে এক-চেতনাসূত্রের বিচ্ছেদই সমস্ত দেহের পক্ষে সাংঘাতিক। সেইরূপ, ভারতবর্ষের যে মন আজ হিন্দু বৌদ্ধ জৈন শিখ মুসলমান খৃস্টানের মধ্যে বিভক্ত ও বিশ্লিষ্ট হইয়া আছে সে মন আপনার করিয়া কিছু গ্রহণ করিতে বা আপনার করিয়া কিছু দান করিতে পারিতেছে না। দশ আঙুলকে যুক্ত করিয়া অঞ্জলি বাঁধিতে হয় —নেবার বেলাও তাহার প্রয়োজন, দেবার বেলাও। অতএব ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থায় বৈদিক পৌরাণিক বৌদ্ধ জৈন মুসলমান প্রভৃতির সমস্ত চিত্তকে সম্মিলিত ও চিত্ত-সম্পদকে সংগৃহীত করিতে হইবে। এই নানা ধারা দিয়া ভারতবর্ষের মন কেমন করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে তাহা জানিতে হইবে। এইরূপ উপায়েই ভারতবর্ষ আপনার নানা বিভাগের মধ্য দিয়া আপনার সমগ্রতা উপলব্ধি করিতে পারিবে। তেমনি করিয়া আপনাকে বিস্তীর্ণ এবং সংশ্লিষ্ট করিয়া না জানিলে যে শিক্ষা সে গ্রহণ করিবে তাহা ভিক্ষার মতো গ্রহণ করিবে। সেরূপ ভিক্ষাজীবিকায় কখনও কোনো জাতি সম্পদশালী হইতে পারে না।

দ্বিতীয় কথা এই যে, শিক্ষার প্রকৃত ক্ষেত্র সেইখানেই যেখানে বিদ্যার উদ্ভাবনা চলিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য কাজ বিদ্যার উৎপাদন তাহার গৌণ কাজ সেই বিদ্যাকে দান করা। বিদ্যার ক্ষেত্রে সেই সকল মনীষীদিগকে আহ্বান করিতে হইবে যাঁহারা নিজের শক্তি ও সাধনা দ্বারা অনুসন্ধান আবিষ্কার ও সৃষ্টির কার্যে নিবিষ্ট আছেন। তাঁহারা যেখানেই নিজের কাজে একত্র মিলিত হইবেন সেইখানে স্বভাবতই জ্ঞানের উৎস উৎসারিত হইবে, সেই উৎসধারার নির্ঝরিণীতটেই দেশের সত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইবে। বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের নকল করিয়া হইবে না।

তৃতীয় কথা এই যে, সকল দেশেই শিক্ষার সর্বাঙ্গীণ জীবনযাত্রার যোগ আছে। আমাদের দেশে কেবলমাত্র কেরানীগিরি ওকালতী ডাক্তারি ডেপুটিগিরি দারোগাগিরি মুন্সেফি প্রভৃতি ভদ্রসমাজে প্রচলিত কয়েকটি ব্যবসায়ের সঙ্গেই আমাদের আধুনিক শিক্ষার প্রত্যক্ষ যোগ। যেখানে চাষ হইতেছে, কলুর ঘানি কুমারের চাক ঘুরিতেছে সেখানে, এ শিক্ষার কোনো স্পর্শও পৌছায় নাই। অন্য কোনো শিক্ষিত দেশে এমন দুর্যোগ ঘটিতে দেখা যায় না। তাহার কারণ, আমাদের নূতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দেশের মাটির উপরে নাই, তাহা পরগাছার মতো পরদেশীয় বনস্পতির শাখায় ঝুলিতেছে। ভারতবর্ষে যদি সত্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তবে গোড়া হইতেই সে বিদ্যালয় তাহার অর্থশাস্ত্র, তাহার কৃষিতত্ত্ব, তাহার স্বাস্থ্যবিদ্যা, তাহার সমস্ত ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে আপন প্রতিষ্ঠাস্থানের চতুর্দিকবর্তী পল্লীর মধ্যে প্রয়োগ করিয়া দেশের জীবনযাত্রার কেন্দ্রস্থান অধিকার করিবে।

এই বিদ্যালয় উৎকৃষ্ট আদর্শে চাষ করিবে, গো-পালন করিবে, কাপড় বুনিবে এবং নিজের আর্থিক সম্বল-লাভের জন্য সমবায়-প্রণালী অবলম্বন করিয়া ছাত্র শিক্ষক ও চারিদিকের অধিবাসীদের সঙ্গে জীবিকার যোগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইবে।

এইরূপ আদর্শ বিদ্যালয়কে আমি 'বিশ্বভারতী' নাম দিবার প্রস্তাব করিয়াছি।'—

১৩২৬ সালে বৈশাখ মাসে রবীন্দ্রনাথের এই প্রস্তাবের পরে, ১৮ই আষাঢ় (৩রা জুলাই, ১৯১৯) বিশ্বভারতীর কাজ শুরু হলো। 'বিশ্বভারতী' বলতে তখন উচ্চতর শিক্ষার এই নতুন বিভাগটিকে বোঝাত। পরে, এই অংশ 'উত্তর-বিভাগ' আর স্কুল-অংশ 'পূর্ব-বিভাগ' নামে পরিচিত হয়। কবি মনে করতেন, বাইরের সাময়িক ছাত্র দিয়ে বিদ্যাচর্চার স্থায়ী কেন্দ্র গড়া সম্ভবপর নয়। তিনি বিশ্বাস করতেন, আশ্রমের শিক্ষক, আশ্রম-বাসী আর বাসীনীদের মধ্যে জ্ঞান-চেতনা উদ্বুদ্ধ করতে পারলে তবেই বিদ্যা স্থায়ী ফলপ্রসূ হবে। আশ্রমের শিক্ষকদের কেবলমাত্র স্কুল-মাস্টার হলে চলবে না; তাঁরা হবেন জ্ঞানতপস্বী। শান্তিনিকেতনে প্রত্যেকেই আপন সাধ্যমতো এক-একটি বিষয় নির্বাচন করে অধ্যয়ন ও গবেষণা-

কার্যে ব্রতী হবেন —এই ছিল বিশ্বভারতীর আদি পরিকল্পনা।

সে-সময় সারা ভারতবর্ষে প্রচলিত বিদ্যাশিক্ষার ওপর লোকের একটা বীতরাগ এসেছিল। তার ফলে, দেশে নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা আর জাতীয় বিদ্যাশালা প্রতিষ্ঠার প্রয়াস দেখা দিয়েছিল। গত দু'-বছরের মধ্যে পাটনা, মহীশূর, কাশী-হিন্দু, ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। আদেয়ারে ন্যাশনাল য়ুনিভার্সিটির সঙ্গে কবি স্বয়ং যুক্ত ছিলেন। তার আদর্শ ব্যাখ্যা করে কবি যে-বই লিখেছিলেন সে-বই নন্দলালের চিত্রভূষিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। তখন সকলেই যেন নতুন আদর্শের সন্ধানে ব্যস্ত, শিক্ষাদানের নতুন পথ আবিষ্কারের জন্যে ব্যগ্র। তাই প্রণালী বদল করবার জন্যে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীতে 'নূতনের ঢালাই' করছিলেন 'সেই পুরাতনের ছাঁচে'। —এই আদর্শের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করে কবি 'শান্তিনিকেতন'-পত্রিকায় 'অসন্তোষের কারণ'। 'বিদ্যার যাচাই', 'বিদ্যাসমবায়' ইত্যাদি প্রবন্ধ লিখলেন একই বছরে —১৩২৬ সালে।

বিশ্বভারতীতে অধ্যয়ন-অধ্যাপনা শুরু হলে রবীন্দ্রনাথ নিজে ইংরেজী-সাহিত্য পড়াতে লাগলেন। এ্যাণ্ড্রুজসাহেব পড়াতেন ইংরেজী সমালোচনা-সাহিত্য। বিধুশেখর শাস্ত্রী পড়াতেন হিন্দুদর্শন। ধর্মাধার রাজগুরু মহাস্থবির উপদেশ দিতেন বৌদ্ধদর্শন। রথীন্দ্রনাথ বক্তৃতা দেন জীবতত্ত্ব-সম্পর্কে। কপিলেশ্বর মিশ্র পড়ান পাণিনির ব্যাকরণ। ছাত্রদের মনে সংস্কৃতের বুনিয়াদ গেঁথে দেবার জন্যে কবির আগ্রহ ছিল সর্বাধিক।

বিশ্বভারতীতে অধ্যয়ন-অধ্যাপনার কাজ আরম্ভ হয়েছে ১৩২৬ সালের আষাঢ় মাস থেকে। কবি ভালোভাবেই জানতেন, জ্ঞানের সঙ্গে রসের চর্চা বা art-education-এর সমাবেশ না-হলে, মানুষের জ্ঞান হয়ে উঠবে একটা বোঝার মতো। তাই বিশ্বভারতীতে জ্ঞানানুশীলনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কলাবিদ্যা-চর্চার বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছিল। শিক্ষায়তনে কলা-চর্চা অর্থাৎ চিত্র আর সঙ্গীত-শিক্ষা যে বিদ্যার্থীর চিত্তবৃত্তির ও হৃদয়বৃত্তির অনুশীলনের জন্যে আবশ্যিক এ-কথা এদেশে তখনো কেউ স্বীকার করেননি। এই বিষয়ে কবির ভাবনা 'কলাবিদ্যা'-নামে প্রবন্ধে লিখে ১৩২৬ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যার 'শান্তিনিকেতন'-পত্রিকার

প্রকাশ করেন। আমরা সে-প্রসঙ্গ পূর্বেই আলোচনা করেছি। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হলে, তাতে ভারতীয় সঙ্গীত ও [ভারতীয়] চিত্রকলা শিক্ষা তার প্রধান অঙ্গ হবে, সে-সংকল্প কবি পূর্বেই গ্রহণ করেছিলেন। এবং কিভাবে শান্তিনিকেতনে কলাবিদ্যার সূত্রপাত হয়, সে ধারাবাহিক ইতিহাস আমরা পূর্বে বিবৃত করেছি। কলাবিদ্যার অঙ্গ-স্বরূপে এখানে সঙ্গীত ও নৃত্যকলার প্রবর্তনের ইতিহাসও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কবি বিশ্বভারতীতে সঙ্গীতভবন সুপ্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছিলেন। আদর করে কবি নিজে তার নামকরণ করেছিলেন—'গন্ধর্ব-ভবন'।

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ছাত্ররা প্রথমে সঙ্গীত শিখত অজিতকুমার চক্রবর্তী আর দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে। শেখানো হতো কেবল রবীন্দ্র-সঙ্গীত। পরে, হিন্দুস্থানী-সঙ্গীত শেখাবার আবশ্যক হওয়ায় দু-জন হিন্দুস্থানী মুসলমান ওস্তাদ আনানো হয়। সেই থেকেই এখানে মার্গ-সঙ্গীতের প্রবর্তনা। ১৯১৪ সালের প্রথম দিকে এলেন মহারাষ্ট্রীয় শিক্ষক ভীমরাও হসুরকর। হিন্দুস্থানী-সঙ্গীত ছাড়া, তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীত আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন। এ-ছাড়া, সঙ্গমেশ্বর শাস্ত্রীর কাছে তিনি শিক্ষা করেন দক্ষিণী রুদ্রবীণ। ১৯১৯ সালের দিকে এলেন নকুলেশ্বর গোস্বামী। ইনি হলেন মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর সভাসঙ্গীতকার রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর ভ্রাতা। বাঙ্গালাদেশের বিষ্ণুপুরী ওস্তাদী গানের ধারা মিললো উত্তর ভারতের মার্গসঙ্গীতের সঙ্গে। —১৩২৬ সালের আষাঢ় সংখ্যার শান্তিনিকেতন পত্রিকায় সংবাদঃ— 'কেবল সঙ্গীত শিক্ষার জন্য ছাত্রেরা আশ্রমে আসিলে, দুই বৎসর বা তাহারো অল্প সময়ে রবীন্দ্রনাথের সকল প্রকার সঙ্গীতে তাহাদিগকে পারদর্শী করা যাইতে পারিবে।'

—এইভাবে এখানে ভাবী সঙ্গীতভবনের সূত্রপাত হলো।—

সঙ্গীতের সঙ্গে নৃত্য হচ্ছে প্রায় অচ্ছেদ্য। শান্তিনিকেতন-ব্রহ্মচর্যাশ্রমে যে-সব নাট্যাভিনয় হতো তার মধ্যে বাউল-সঙ্গীতে আর জনতার সমবেত সঙ্গীতে অপটু নৃত্যচ্ছন্দ এসে পড়তো সহজেই। তার জন্যে বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন হতো না। কবি তাঁর নাটক-অভিনয়ে সে সময় যে নৃত্য করতেন, সে-রীতি তাঁর নিজস্ব। এই সময় থেকে (১৯১৯) শান্তিনিকেতনে মণিপুরী নৃত্য প্রবর্তনের চেষ্টা হয়েছিল। ত্রিপুরা থেকে এলেন

বুদ্ধিমন্ত সিং। তিনি আসলে ছিলেন কারুশিল্পী। হাতের কাজের প্রসঙ্গে এসেছিলেন তিনি গগনবাবুদের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। মণিপুরী নৃত্য-কলা তাঁর জানা ছিল বলে কবি তাঁকে শান্তিনিকেতনে আনলেন। আশ্রমের ছাত্রেরা বুদ্ধিমন্তের খোলের বোলের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যশিক্ষা শুরু করে দিলে (অগ্রহায়ণ, ১৩২৬)। সে-নৃত্য হলো ব্যায়াম আর নাচের সমবায়ে ছান্দসিক নৃত্য। কবির ইচ্ছা ছিল, বাঙ্গালী-ছেলেদের আড়ষ্ট দেহ নৃত্য ও ব্যায়ামের যুগ্ম সাধনায় সুন্দর, সুদৃঢ় আর সাবলীল হয়ে উঠুক। সেই কারণেই মণিপুরী বা ঐ ধরনের কোনো তালবদ্ধ সঙ্ঘনৃত্য ছাত্রদের মধ্যে প্রবর্তন করবার ইচ্ছা তাঁর মনে জেগেছিল। কিন্তু, এই ধারা শান্তিনিকেতন-আশ্রমে বেশী দিন চলেনি।

॥ নন্দলালের আগমন-পর্বে আশ্রম-পরিস্থিতি, ১৯১৯-২২ ॥

আলোচ্য পর্বে শান্তিনিকেতন-আশ্রমের 'সর্বাধ্যক্ষ' ছিলেন জগদানন্দ রায়। অর্থসংগ্রহের ভার ছিল এ্যাণ্ড্রুজ সাহেবের ওপর। আশ্রমে 'জলসত্র' প্রবর্তিত হয়েছে (বৈশাখ, ১৩২৬ / ১৯১৯)। আমেরিকা থেকে একটি বায়ুচক্র (Wind mill) আনা হয়েছে। একটি ইঁন্দারায় সেটি লাগিয়ে পাম্প্ চালিয়ে রান্নাঘরে জল তোলবার কাজে যথেষ্ট সুবিধে পাওয়া যাচ্ছে (জ্যৈষ্ঠ)। যন্ত্রশালার উত্তরে নতুন কুয়ার চারদিকে গোল করে দেওয়াল দিয়ে স্নানাগার করা হয়েছে। সেখানে এককালে পঁচিশ জন বেশ আরামে স্নান করতে পাচ্ছে (অগ্রহায়ণ)। নন্দলাল বসু আর সুরেন্দ্রনাথ কর উপযুক্ত ছাত্রদের চিত্রবিদ্যা শিক্ষা দিচ্ছেন আষাঢ় মাস (১৩২৬) থেকে। এই সময়ে আশ্রমে বিশিষ্ট অতিথি এলেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দজী, গান্ধীজী আর মৌলনা সৌকত আলী।

গান্ধীজীর প্রবর্তিত অসহযোগ-আন্দোলন তখন প্রবলভাবে চলছে। শান্তিনিকেতনকে রাজনীতির আবর্তের মধ্যে টেনে আনা হয় রবীন্দ্রনাথ কখনো তা চাননি। অথচ বিধির বিপাকে ঘটে যাচ্ছিল তাই। গান্ধীজী দ্বিতীয়বার আশ্রমে এলেন ১৯২০ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর। সেই সময়ে কবির বড়োদাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ বর্তমান আশ্রমের দক্ষিণাংশ ভুবনডাঙ্গার 'নীচু বাঙ্গালায়' বা নীচের

বাঙ্গালার বাড়িতে বাস করতেন। আশ্রম-বিদ্যালয় পরিচালনায় তাঁর প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না। নিভৃত আবাসে বাস করে তাপস দ্বিজেন্দ্রনাথ দর্শন, গণিত আলোচনার মধ্যে একান্তভাবে আত্মমগ্ন হয়ে থাকতেন। তিনি ছিলেন গান্ধীজীর অসহযোগ-আন্দোলনের সমর্থক। সমর্থক-অসমর্থকভেদে আশ্রমে তখন দু'টি দল। এই পরিবেশে গান্ধীজী শান্তিকেতনে এলেন। ঐ সময়ে তাঁর সঙ্গে এখানে দেখা করতে আসেন মৌলনা সৌকত আলী। সৌকত আলীর শান্তিনিকেতন-আগমন একটি স্মরণীয় ঘটনা। তাঁর আসার ফলে, আশ্রমে কর্মীদের মধ্যে জাতিভেদের সংস্কার সহসা ভেঙ্গে গেল। বিধুশেখর ভট্টাচার্য মহাশয় স্বয়ং সৌকত আলীকে আশ্রম-কিচেনে নিয়ে গিয়ে খাবার জায়গায় খেতে বসালেন। ফলে, আশ্রমে একটা স্থায়ী নতুন কাজ হলো। পূর্বে কোনো মুসলমান ছাত্রকে আশ্রমে এক-পঙ্‌ক্তিতে বসে খাবার এই অধিকার দেওয়া হয়নি। এ-বি·য়ে রবীন্দ্রনাথের উপদেশও এতদিন কার্যকর হয়নি। পক্ষান্তরে, আশ্রমে জাতিভেদ তুলে দেওয়ার ফলে, ক'জন অভিভাবক দৃঢ় সংস্কার বশে তাঁদের ছাত্রদের নাম কাটিয়ে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন।

১৯২১ সালের গোড়া থেকেই অসহযোগ-আন্দোলন চলছিল সবেগে। অধ্যাপক নেপালচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে শান্তিনিকেতনের বাইরের একদল কলেজী ছাত্র গ্রাম-উন্নয়নের কাজ করবার জন্যে বোলপুরে এলেন। তাঁদের কর্মকেন্দ্র হলো সুরুলের কুঠিবাড়িতে। কবির বিশ্বভারতীর বিস্তার এই সময়ে বিশেষ কিছু হয়নি। কবি তখন আমেরিকায়। অসহযোগ-আন্দোলনে তাঁর পূর্ণ সমর্থন নাই। বেসুরো হয়ে যাবার আশঙ্কায় তিনি দেশে ফিরতে ভয় পাচ্ছেন। বিশ্বভারতীতে তিনি Nationalism-এর ভৌগোলিক ভূত তাড়িয়ে Inter-Nationalism-এর দেবতাকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে আগ্রহী।

এই সময়ে (১৯২০ ২১) শান্তিনিকেতনে অনেক বদল হয়েছে। নতুন শিক্ষা-ব্যবস্থা বিশ্বভারতীর 'উত্তর-বিভাগ' নামে পরিচিত হচ্ছে। হিরজীভাই পোস্তানূজী মরিস নামে এক পারসী যুবক এখানে এসেছেন। ইনি ফরাসী ভাষা ভালো জানতেন। উত্তর-বিভাগে ইনি ফরাসী পড়াচ্ছেন। গুরুদয়াল মল্লিকজী এলেন পঞ্জাব থেকে। সিন্ধুদেশের

সূফীদের সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ছিল গভীর। হাসপাতালের ডাক্তার এলেন চিমনলাল নামে এক সিন্ধী যুবক। জার্মান পূর্ব-আফ্রিকা থেকে এলেন সপরিবারে নরসিংভাই প্যাটেল। বিশ্বভারতীতে তিনি জার্মান পড়াতেন। এ ছাড়া, তিনি গুজরাটিও পড়াতেন। এই সময়ে আশ্রম-বিদ্যালয়ের ক'জন পুরাতন ছাত্র এলেন শিক্ষক হয়ে; বিভূতিভূষণ গুপ্ত, সুহৃৎকুমার মুখোপাধ্যায়, ভুবনেশ্বর নাগ আর নরেন্দ্রনাথ নন্দী। এর আগে ছিলেন গৌরগোপাল ঘোষ, ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। পুরাতন শিক্ষকদের মধ্যে শ্রীপ্রমোদারঞ্জন ঘোষ কোচবিহারে চলে গেলেন চাকরী নিয়ে। দেশের কাজ করবার জন্যে নেপালচন্দ্র রায় আর কালীমোহন ঘোষ কিছুকালের জন্যে আশ্রম থেকে দূরে চলে যান। —এই আশ্রম-পরিবেশে নন্দলাল শান্তিনিকেতন এসে 'নতুন বাড়ি'তে পাকা হয়ে বসছেন।

॥ বিশ্বভারতী-প্রতিষ্ঠা, ১৯২১ ॥

১৯২১ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত কবি ছিলেন শান্তিনিকেতনে। এই পর্বে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৯ সালের জুলাই মাসে বিশ্বভারতীর মহৎ আদর্শ প্রচারিত হবার পর থেকে গত আড়াই বৎসরের মধ্যে নানা শ্রেণীর লোক নানা উদ্দেশ্য নিয়ে আশ্রমে এসেছিলেন। এই সময়ে পিয়ার্সন সাহেব শান্তিনিকেতনে ফিরে এলেন দীর্ঘ দিন পরে। এঁর পরেই এলেন লেনার্ড এল্‌মহার্স্ট। নিউইয়র্কের মিসেস স্ট্রেটের কাছ থেকে বার্ষিক পঞ্চাশ হাজার টাকা বিশ্বভারতীর জন্যে দানের প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছিলেন তিনি। এই টাকায় সুরুলের কুঠিবাড়িতে গ্রামোন্নয়নের কেন্দ্র স্থাপিত হবে। নেপালবাবুর ছাত্রদের নিয়ে ওখানে কাজ শুরু হলো।

১৯২১ সালের ১০ই নভেম্বর সিলভ্যাঁ লেভি আশ্রমে এলেন সস্ত্রীক। ইনি বিশ্বভারতীর প্রথম ভিজিটিং প্রফেসর। অধ্যাপক লেভি ভারত ও বহির্ভারত এবং আর্য-অনার্য সম্পর্কের বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করলেন। তাছাড়া, চীনা ও তিব্বতী ভাষা শিক্ষাদানের ক্লাস খুললেন। লেভি-দম্পতি থাকতেন 'সুরপুরী'তে। ['রতনকুঠি'র পিছন

দিকের এই বাড়িখানি তৈরি করান সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পরে, কিনে নেন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর মৃত্যুর পরে এই বাড়ির মালিক হয়েছেন তাঁর ভাগ্নে শ্রীসঞ্জীব চৌধুরী।]

রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে উত্তর-বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের 'বলাকা' কাব্য পড়াতেন। সেই সব বক্তৃতার সারমর্ম 'শান্তিনিকেতন'-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

১৯২১ সালের শেষে পৌষ-উৎসব এসে গেল। বিশ্বভারতীকে সর্বসাধারণের হাতে সমর্পণ করার আয়োজন চলছে। ব্রহ্মচর্য-আশ্রমের বিশ বৎসর পূর্ণ হলো। বিশ্বভারতীতে নানা বিষয় অধ্যয়ন-অধ্যাপনার পরিকল্পনা রয়েছে। বিদেশ থেকে জ্ঞানী-গুণীদের আসার সম্ভাবনা। কবির অন্তরের বিশ্বাস, —আন্তর্জাতিকতার মনোশিক্ষা না-পেলে ভাবীকালের সভ্যতা টিকবে না। কবি জোরের সঙ্গে বলেছিলেন, —'এই কথাটি বিশ্বাস কর যে এই institution-টার প্রসার সমস্ত সভ্য পৃথিবীতে।' পৌষ-উৎসবের 'দীক্ষা' নামক ভাষণে বললেন, —'এ বৎসর আমাদের শান্তিনিকেতনে নূতন যুগের আবির্ভাব প্রকাশমান হল। এখানে আমাদের নবযুগের অতিথিশালা খুলেছে।'

৮ই পৌষ সকালে আম্রকুঞ্জে বিশ্বভারতীর উদ্বোধন-সভা হলো। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল সভাপতি। এই সভায় 'বিশ্বভারতী পরিষদ্' গঠিত হলো। ডাক্তার নীলরতন সরকার মহাশয় প্রথম প্রস্তাবটি সভায় উপস্থিত করেন। প্রস্তাবটি এই: 'স্থির হইল যে বিশ্বভারতী পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হউক এবং নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ইহার প্রথম সদস্যরূপে গণ্য হউন:— ১। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, ২। আচার্য সিলভ্যাঁ লেভি, ৩। ডাক্তার শিশিরকুমার মৈত্র, ৪। প্রিন্সিপ্যাল সুশীলকুমার রুদ্র, ৫। ধর্মাধার রাজগুরু মহাস্থবির শ্রীযুক্ত, ৬। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৭। বিধুশেখর শাস্ত্রী, ৮। জগদানন্দ রায়, ৯। ক্ষিতিমোহন সেন, ১০। নন্দলাল বসু, ১১। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, ১২। নেপালচন্দ্র রায়, ১৩। ফণিভূষণ অধিকারী, ১৪। ভীমরাও শাস্ত্রী, ১৫। অসিতকুমার হালদার, ১৬। উইলিয়ম পিয়ার্সন, ১৭। সি. এফ্. এ্যাণ্ড্রুজ, ১৮। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯। সন্তোষচন্দ্র মজুমদার, ২০। সুরেন্দ্রনাথ কর, ২১। গৌরগোপাল ঘোষ, ২২। প্রভাতকুমার

মুখোপাধ্যায়, ২৩। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ২৪। তেজেশচন্দ্র সেন, ২৫। নগেন্দ্রনাথ আইচ, ২৬। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভৃতি। নন্দলাল এই সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং এই সময় তিনি বিশ্বভারতী-পরিষদের অঙ্গীভূত হয়ে গেলেন। এই সভায় বিশ্বভারতীর জন্যে যে বিধান (constitution) প্রণীত হয়েছিল সে-ও গৃহীত হলো। নন্দলালের মনে এই সব বিধি-বিধান বিশেষ চিন্তার বিষয় হলো।

কয়েক বৎসর পূর্বে বিধুশেখর ভট্টাচার্য মহাশয় আমাদের দেশের সংস্কৃত শিক্ষার প্রসার আর তার মধ্যে দিয়ে নতুন যুগের আহ্বান প্রকাশ করবার সংকল্প নিয়ে তাঁর স্বগ্রামে চলে গিয়েছিলেন টোল-চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা করবার উদ্দেশ্যে। কবি তাঁর অনুপস্থিতিতে খুব দুঃখ পেয়েছিলেন। তখন কবি তাঁকে আশ্বাস দেন এই বলে যে, তাঁর ইচ্ছা পূরণ হবে শান্তিনিকেতনেই। এর আগে ১৯১৯ সালের জুলাই মাস থেকে বিশ্বভারতীতে পঠন-পাঠন শুরু হয়েছিল।

কবি বলেছিলেন, —'স্বজাতির অচল সীমানার মধ্যে আপনাকে সঙ্কীর্ণভাবে উপলব্ধি করা সব চেয়ে বড়ো গৌরবের কথা নয়। —'এই বিশ্বভারতী ভারতবর্ষের জিনিস হলেও একে সমস্ত মানুষের তপস্যার ক্ষেত্র করতে হবে। ...এইজন্যই ভারতের ক্ষেত্রে বিশ্বভারতীকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই।'

১৯১৮ সালে কবি ভারতীয় সংস্কৃতি-চর্চার কেন্দ্ররূপে বিশ্বভারতীকে গড়তে চেয়েছিলেন। তারপরে ১৯২০-২১ সালে পাশ্চাত্য সফর সেরে দেশে ফিরে এসে, গান্ধীজীর অসহযোগ-আন্দোলনের স্বরূপ দেখে আবার বিষয়টি নতুন করে ভাবতে লাগলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে, দেশের ও বিশ্বের নবতর পরিস্থিতিতে শিক্ষাদর্শের নব-রূপায়নের প্রয়োজন হলো। সেইজন্যে 'বিশ্বভারতী' উৎসর্গ করবার সময়ে রবীন্দ্রনাথ যে, 'মেমোরেণ্ডাম্ অব্ আসোসিয়েশন' রচনা করেন, তাতে শিক্ষা ও জীবনের সমবায়ে সর্বাত্মক শিক্ষা তথা জীবন-দর্শনের সূত্রটী রচনা করেছিলেন। এই সূত্রটিতে কবি যেন মহর্ষির ট্রাস্ট্‌ডীড্‌ আর রাজা রামমোহনের আদিব্রাহ্মসমাজের স্থাস-পত্রে উল্লিখিত তাঁদের প্রদর্শিত পথকেই প্রশস্ততর ও সুন্দরতর করে

রচনা করেছিলেন।

নন্দলালও কলাবিদ্যা-বিতরণের ক্ষেত্রে বিশ্বভারতীতে তাঁর উদার উর্বর-কারিণী শিল্পজাহ্নবী নানা খাতে প্রবাহিত করে দিতে লাগলেন আপন অটল কৈলাসের মানস-সরোবর থেকে। এই বৎসরের ৭ই পৌষের বার্ষিক উৎসবে বিশ্বভারতীর উত্তর-বিভাগের চিত্রশিল্পী ও পূর্তবিভাগের ছাত্রছাত্রীদের অঙ্কিত চিত্রাবলী মেলায় প্রদর্শনীতে প্রদর্শন করা হয়েছিল। এই প্রদর্শনীর ফলে, অনেক উদীয়মান অজ্ঞাত নবীন চিত্রশিল্পীর পরিচয়লাভ করা গিয়েছিল।

॥ বর্ধমানের রাজপ্রাসাদে মহর্ষির 'সত্যসন্ধানিনী সভা' ও বোলপুর-ভুবনডাঙ্গার নির্জন প্রান্তরে 'শান্তিনিকেতন-আশ্রম' প্রতিষ্ঠা ॥

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সত্যাত্মবোধের সাধনা, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববোধের কল্যাণ সাধনা আর শিল্পাচার্য নন্দলালের সুন্দরের রূপ-সাধনা —নবযুগের এই মুক্ত-ত্রিবেণী সাধনার নবতীর্থ হলো শান্তিনিকেতন। মহর্ষির তপস্যার ধারাটি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথেও সঞ্চারিত হয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথ-নন্দলাল প্রসঙ্গে সে-কথা বলা হবে।—

১৮৪৮ সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে সঙ্গে নিয়ে দামোদরের প্রবাহপথ ধরে বর্ধমানে আগমন করেছিলেন। তিনি গুস্করাতে রমনার আম্রকাননে এসেছিলেন বর্ধমানরাজের পত্তনিদার চোঙ্গদার-বংশের ব্যবস্থাপনায়। ১৮৫৮ সালে মহর্ষি রায়পুরে সম্ভবতঃ প্রথম আসেন। ১৮৫৯ সালে এদিকে লুপে ভেদিয়া-সাঁইথিয়া লাইন পাতা হয়েছিল। রায়পুরের শ্রীকণ্ঠ সিংহের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল অন্ততঃ ১৮৪২ সাল থেকে। ভুবনমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রতাপনারায়ণ মহর্ষির নিকট দীক্ষিত ও শিক্ষিত হয়েছিলেন। মহর্ষি রায়পুরে আগমন করেছিলেন সিংহপরিবারের সশ্রদ্ধ আমন্ত্রণে। মহর্ষি গুস্করা থেকে রায়পুরে এসে থাকলে, পুরাতন হুসেনশাহী সড়ক ধরে পালকি করে এসেছিলেন। আর কলকাতা থেকে সোজা রায়পুরে এলে, বজরা চালিয়ে গঙ্গা-অজয়ের উজান পথে ইন্দ্রাণীর কাটোয়া-শাঁখাই ঘাট হয়ে, সুপুর বন্দর দিয়ে রায়পুরে এসে থাকবেন।

১৮৬৩ সালের (বঙ্গাব্দ ১২৬৯) ১৮ই ফাল্গুন তারিখে মহর্ষি ভুবনমোহনের পুত্রদের কাছ থেকে কুড়ি বিঘা জমি বার্ষিক পাঁচ টাকা খাজানা ধার্য করে মৌরসী পাট্টা গ্রহণ করেন। এ জমি বোলপুরের ভুবনডাঙ্গা গ্রামের উত্তর দিকে অবস্থিত বিশাল প্রান্তর, খোয়াই, 'আমানি-ডোবা' আর বৃক্ষসম্পদের মধ্যে ইতস্তত বুনো-জাম, বুনো-খেজুর ঝোপ আর দুটি ছাতিম গাছ। —তান্ত্রিক সাধকদের মতো নিস্তব্ধ নির্জন প্রদেশে তপঃসাধনে নিযুক্ত হবার উপযুক্ত এই প্রান্তর শ্রীকণ্ঠসিংহ বা মহর্ষিশিষ্য প্রতাপনারায়ণ মহর্ষিকে দেখিয়ে থাকবেন। —শান্তিনিকেতন-আশ্রম-সৃষ্টির প্রেক্ষাপট পর পর বিশদ বলছি।—

বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ মহ্‌তাব্‌ চন্দ্‌ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিষ্য এবং প্রায় সমবয়সী বান্ধবের মতো ছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় ১৯১৪ সালে এই সম্পর্কে 'বর্ধমান-রাজবংশানুচরিত'কার সম্পূর্ণ নীরব। কিন্তু মহর্ষি তাঁর আত্মজীবনীতে অনেক কথা লিখে রেখে গেছেন। সে লেখা ১৮৯৪ সালের আগে।

১৭৭০ শকাব্দের আশ্বিন মাসে (খৃস্টাব্দ ১৮৪৮ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) কয়েকজন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ দামোদর 'নদী'তে বেড়াতে বের হয়েছিলেন। সাত দিন দামোদরের বাঁক ঘুরে ঘুরে একদিন বেলা চারটের সময় দামোদর-তীরের সদর-ঘাটের একটা চড়ায় এসে 'নৌকা' [বজরা] লাগালেন। সেখানে এসে শুনলেন যে, শহর বর্ধমান এর খুব নিকটে মাত্র 'দু-ক্রোশ' [এক ক্রোশ] দূরে। অমনি তাঁর বর্ধমান দেখতে কৌতূহল হলো। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই নৌকা থেকে নেমে দু-ক্রোশ চড়া ভেঙ্গে বর্ধমানে চললেন। রাজনারায়ণ বসু আর দু-একজন তাঁর সঙ্গে ছিলেন। শহরে পৌঁছলেন। তখন সন্ধ্যার দীপ ঘরে ঘরে, দোকানে দোকানে আলো জ্বলছে। তাঁরা এদিক সেদিক বেড়িয়ে বেড়িয়ে শহর দেখলেন, বাজার দেখলেন, রাজবাড়ি দেখলেন। রাজ-বাড়ির মধ্যে বাতির আলোকে আলোকিত একটা ঘরে রাজা যেন বসে আছেন, সার্সীর বা'র থেকে তাঁদের এমনি বোধ হলো। তাঁদের কৌতূহল পূর্ণ করে আবার তাঁরা দামোদরের সেই চড়াভূমি দিয়ে নৌকোতে ফিরে এলেন। তখন রাত্রি অনেক হয়েছে। রাজনারায়ণবাবু এত পর্যটন বোধ হয় কখনও করেননি। তাঁদের সঙ্গে তিনি আর চলে উঠতে পারেন না। অনেক কষ্টে নৌকোয় ফিরে এসে তিনি শুয়ে পড়লেন। মহর্ষি দেখলেন, ত াঁর জ্বর হয়েছে।

পরদিন বেলা প্রথম প্রহরে তরুণসূর্যরশ্মিবিধৌত দামোদরের পুণ্যস্রোতে স্নান সমাপন করে মহর্ষি নীল পট্টবস্ত্র পরিধান করলেন এবং নিয়মিত উপাসনা করে পবিত্র হলেন। এমন সময় দেখলেন, সেই চড়া ভেঙ্গে একখানা সুন্দর ফিটন্‌ গাড়ি চারদিকে বালির মেঘ তুলে আসছে। যেখানে উটের পথ সেখানে ভালো গাড়ি চলতে পারে না ; ঘোড়া দৌড়তে পারে না। মহর্ষি বুঝতে পারলেন না যে, এমন স্থান দিয়ে এরা কোথায় যাচ্ছে।

অবশেষে দেখলেন কি, সে গাড়ি তাঁর বোটের সামনে এসে দাঁড়ালো। কোচবাক্স থেকে একজন লাফিয়ে পড়লো, সে মহর্ষির সঙ্গে দেখা করতে চায়। মহর্ষি তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, সে কি চায়। সে হাত জোড় করে মহর্ষিকে বললে, বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে নিতান্ত ইচ্ছুক হয়ে সেই গাড়ি পাঠিয়েছেন। তিনি যেন অনুগ্রহ করে তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করেন। শুনে মহর্ষি বললেন, তিনি নদী বন পাহাড় পর্বত দেখতে বের হয়েছেন; তখন তিনি রাজদর্শন করতে যেতে পারবেন না। তিনি যে নদী দিয়ে এসেছেন, সেই নদী দিয়েই ফিরে যাবেন। তিনি আর ডাঙ্গায় উঠবেন না। শুনে লোকটি বললে, সে তাঁকে নিয়ে যেতে না পারলে মহারাজের কাছে অত্যন্ত অপরাধী হবে। মহর্ষি যেন তার প্রতি সদয় হন। একবার রাজাকে দর্শন দেন। মহর্ষির প্রতি রাজার অনুরাগ দেখলে মহর্ষি অবশ্যই পরিতৃপ্ত হবেন। সে মহর্ষিকে না নিয়ে যাবে না। তার এত কাতরতা আর মিনতি দেখে মহর্ষি যেতে স্বীকৃত হলেন।

মহর্ষি ভোজন সেরে দুপুরের পর বর্ধমানে চললেন। যখন সেখানে পৌঁছুলেন তখন বেলা পড়ে এসেছে। নানা উপকরণে সাজানো একটি বাসস্থান তাঁর জন্যে নির্ধারিত হয়ে রয়েছে। সেখানে রাজার প্রধান প্রধান অমাত্যেরা মহর্ষিকে ঘিরে বসলেন; রাজার গোবিন্দ বাড়ুয্যে, কীর্তি চাটুজ্যে সবাই মহর্ষির কাছে হাজির। মহর্ষির বাসা থেকে রাজবাড়ি পর্যন্ত, মহর্ষি কি করছেন, কি বলছেন, মুহূর্তে মুহূর্তে সেই সংবাদ নেবার জন্যে ডাক বসে গেল।

পরের দিন সকালে তিন চারখানা গরুর গাড়ি করে চাল, ডাল, ময়দা, সুজী ইত্যাদি খাদ্য-সামগ্রী তাঁর বাসাতে এসে হাজির হলো। মহর্ষি লোকেদের জিজ্ঞাসা করলেন, — এত জিনিস কিসের জন্যে। তারা বললে, রাজগুরুর জন্যে যে সিধা নির্দিষ্ট আছে সে সিধা তাঁকে মহারাজ পাঠিয়েছেন। তারপর দুপুরের সময়ে জুড়ি গাড়ি মহর্ষির দরজায় এসে দাঁড়ালো। মহর্ষি সেই গাড়িতে চড়ে রাজবাড়িতে গেলেন। রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো, রাজা মহর্ষিকে বহু সমাদরে গ্রহণ করলেন। তখন রাজা বিলিয়ার্ড খেলছিলেন, সবাই তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। মহর্ষিও তাঁর বিলিয়ার্ড খেলার আমোদে যোগ দিলেন।

রাজা মহর্ষিকে ধরে একটা উঁচু আসনে বসিয়ে দিলেন। রাজার নম্রতা বিনয় আর অনুরাগ দেখে মহর্ষিরও অনুরাগ রাজার প্রতি ধাবিত হলো।

মহর্ষির সঙ্গে এইভাবে রাজার সম্মিলন হলো, এবং ক্রমে ব্রাহ্ম-ধর্মে রাজার উৎসাহ বাড়তে লাগলো। রাজা মহর্ষির পরামর্শে রাজবাড়ির মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করলেন। এই ব্রাহ্মসমাজের বেদীর কাজ চালাবার উদ্দেশ্যে আর ব্রাহ্মধর্মে রাজাকে উপদেশ দেবার জন্যে মহর্ষি শ্যামাচরণ ভট্টাচার্যকে আর তারকনাথ ভট্টাচার্যকে রাজার কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

মহর্ষির ভাষায়, —'ইহার পর আমি সর্বদাই বর্ধমানে গিয়া তাঁহাকে উৎসাহ দিতাম, এবং তাঁহার সহিত ধর্মালোচনা করিতাম। তিনিও আমাকে পাইয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইতেন। তাঁহার জন্মোৎসবে, তাঁহার বনভোজনে, যখন যে উপলক্ষে সেখানে যাইতাম, আমার সঙ্গে তাঁহার ব্রহ্মোপাসনা হইতই হইত।'

রাজার হৃদয়ে ভক্তিও ছিল, শ্রদ্ধাও ছিল। এক রাত্রিতে ব্রহ্মোপাসনার সময়ে রাজা বক্তৃতা করলেন। (প্রকাশ্য স্থানে যা কিছু বলা হতো, —তা নিবেদন, উপদেশ, ব্যাখ্যান, কি বিচার-বিতর্ক যাই হোক্, —সে সমস্তকেই সে যুগে 'বক্তৃতা' বলা হতো।) —'আমি কি অকৃতজ্ঞ! তিনি আমাকে এত সম্পদ দিয়াছেন, আমি তাহার জন্য তাঁহার কাছে যথোচিত কৃতজ্ঞ হইনা, তাঁহাকে স্মরণ করি না। কিন্তু কত কত দীন দরিদ্র তাঁহার নিকট হইতে অতি অল্প পাইয়াও তাঁহার কাছে কতই কৃতজ্ঞ হয়, তাঁহাকে পূজা করে। আমি কি অকৃতজ্ঞ! কি অধম!' —এই বলে রাজা কাঁদতে লাগলেন। একদিন রাজা মহর্ষিকে তাঁর অন্তঃপুরেই নিয়ে গেলেন। সেখানে একটি পুকুর আছে, মহর্ষিকে সেই পুকুর দেখিয়ে বললেন, —'আমরা এখানে বসে মাছ ধরি।' ওপরে দোতলায় নিয়ে গেলেন। মহর্ষি দেখলেন, সেখানে জরির মছনদ পাতা বিয়েবাড়ির সজ্জার মতন সব সাজানো। রাজা বললেন, —'এখানে আমরা বসি।' আর একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে বললেন, —'এখান থেকে রাণী আমার বিলিয়ার্ড খেলা দেখতে পান।' রাজার অন্তঃপুরে গিয়ে সব দেখে শুনে মহর্ষির বোধ হলো, রাজা যেমন রাণীর প্রতি সন্তুষ্ট, রাণীও তেমনি রাজার প্রতি সন্তুষ্ট; মহর্ষি ভাবলেন, —'সন্তুষ্টো ভার্যয়া ভর্তা, ভর্তা ভার্যা তথৈব

চ' (মনু ৩।৬০) । একদিন রাজা মহর্ষিকে বললেন, —মহর্ষির কাছে তাঁর প্রার্থনা আছে। তা মহর্ষিকে পূর্ণ করতেই হবে। মহর্ষি ভাবলেন, —'না জানি রাজা কি-ই বা বলবেন। মহর্ষি জিজ্ঞাসা করলেন, —'কি প্রার্থনা'। রাজা বললেন, —'আপনাকে একটু পরিশ্রম স্বীকার করে বসতে হবে ; আপনার একটি ছবি নেব।' রাজার বাড়িতে তখন একজন ভালো কারু ইংরেজ এসেছিল, সে মহর্ষির ছবি নিলে। মহর্ষির তখনকার সে ছবি রাজার ঘরে বরাবর ছিল।

রাজা মহ্‌তাব্‌ চন্দ্‌ আর নাই (১৮৭৯), তাঁর দত্তক পুত্র আফ্‌তাব চন্দ্‌ও অল্প বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করেছেন (১৮৮৫) ; কিন্তু তাঁর ব্রাহ্মসমাজ এখনও (১৮৯৪) আছে। সেখানে আজ পর্যন্ত একজন উপাচার্য প্রতিনিয়ত ব্রহ্মনাম ধ্বনিত করেন। কিন্তু তার কেউ শ্রোতা নাই ; সেই শূন্য সমাজ-গৃহের অধিষ্ঠাতৃ দেবতাই তার একমাত্র দীপ।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বন্ধু ও ভ্রমণসঙ্গী রাজনারায়ণ বসু তাঁর আত্ম-চরিতে বর্ধমান-যাত্রা বর্ণনা করেছেন (আ. ১৮৯৯) এইভাবে, —এই ভ্রমণের সময়ে আমাদের সর্বদা ধর্মচর্চা হত। ...আমরা যখন বর্ধমানে গিয়ে পৌঁছি, 'তখন দেখি, মহারাজ মহ্‌তাব্‌ চন্দ্‌ বাহাদুর তাঁর বডিগার্ডের নায়ক কর্ণেল গোলানি বা গোমানী সিংহকে আমাদের আহ্বানের জন্যে পাঠিয়ে দিয়েছেন। ইনি আমাদের সঙ্গে করে বর্ধমানে নিয়ে যান। দেওয়ান তারাচাঁদবাবুর বাড়িতে আমাদের বাস হয়। [তারাচাঁদ চক্রবর্তী ডেভিড হেয়ার ও রাজা রামমোহনের একান্ত ভক্ত ছিলেন।] রাজা প্রত্যহ গরুর গাড়ি করে আমাদের জন্যে অতি বৃহৎ সিধা পাঠাতেন।

এই ঘটনার সাত বৎসর পরে ১৮৫৬ খৃস্টাব্দে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আবার বর্ধমানে গিয়েছিলেন। গিয়ে ঐ প্রথম বর্ধমান-যাত্রার কথা স্মরণ করে রাজনারায়ণ বসুকে পত্রে লিখেছিলেন, —'এখানে আইলেই, তোমার সহিত সদালাপ করতঃ দামোদর নদী দিয়া যে প্রথমবার অত্র স্থলে সুখে আগমন হইয়াছিল, তাহা এত দিন বিলম্বেও স্মরণের পথে জাজ্বল্যমান প্রকাশ পায়। সেই সন্ধ্যার সময় বর্ধমান প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে নৌকা হইতে অবতরণ, বহুদূর পর্যটন, পরে বাজারে আগমন, সেই দ্বার মধ্যে প্রবেশ করিতে দ্বারী কর্তৃক নিবারণ, মনোহর চন্দ্রমার কিরণ দ্বারা বর্ধমানপুরীদর্শন, দামোদর নদীতীরে

দ্বিপ্রহর রজনীতে পুনর্বার প্রত্যাগমন, শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া তোমার সেই নৌকাতে শয়ন ও পরদিবস গোমানীর আগমন এবং রাজার আতিথ্য-গ্রহণ, এ সকল যেন সেদিনের কথা মত বোধ হইতেছে।' —'দ্বার মধ্যে প্রবেশ করিতে দ্বারী কর্তৃক নিবারণ" কথাটি পড়ে মনে হয়, বিনা সংবাদে অপরিচিতের মতো, বর্ধমান নগরে নৈশভ্রমণ করতে গিয়ে মহর্ষি কিছু কিছু কৌতুকাবহ ঘটনা ঘটিয়েছিলেন।

রাজনারায়ণবাবু বলেন,—মহারাজ মহ্‌তাব্‌ চন্দ্‌ এর কিছু দিন পরে বর্ধমানে এক ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন। ঐ সময়ে ব্রাহ্মধর্ম 'বৈদান্তিক ধর্ম' ছিল। যে প্রণালীতে তখনকার কলকাতা-সমাজের কাজ সম্পাদিত হতো ঠিক সেই প্রণালীতে এর কাজও সম্পাদিত হতো। ....বর্ধমানের এই সমাজ তখন (১৮৯৯) ছিল কিনা তিনি জানতেন না। সেই দিন থেকে (১৮৫১) মহ্‌তাব্‌ চন্দের দত্তক পুত্র আফতাব্‌ চন্দের সময় পর্যন্ত (১৮৮৫) বর্তমান ছিল।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে বর্ধমানে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার এই বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল, —'গত ৩০শে আষাঢ়, (১৭৭৩ শক) রবিবারে বর্ধমানাধিপতি শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ মহাতাব চাঁদ বাহাদুর নিজ বাটীতে এক ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ......যাহাতে তাহার কার্য সুচারুরূপে সম্পাদিত হয় তদর্থে তিনজন উপাচার্য নিযুক্ত হইয়াছেন,—শ্রীযুক্ত শ্রীধর বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশ এবং শ্রীযুক্ত তারকনাথ তত্ত্বরত্ন। যদিও মহারাজ স্বয়ং পারিষদবর্গের সহিত একত্র হইয়া পরব্রহ্মের উপাসনা করণার্থে এই সমাজ সংস্থাপন করিয়াছেন, তথাপি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বা অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের তথায় গমন করিবার নিতান্ত নিষেধ নাই; কেবল প্রথম বারে তাঁহাদিগকে উপাচার্যের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবেক। মহারাজের এক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করিবারও মানস আছে। তাহা হইলে বর্ধমানের সর্বসাধারণ লোকে সমাজস্থ হইয়া পরব্রহ্মের শ্রবণ মনন করিতে পারিবেন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার এই উদ্‌ধৃত অংশে লক্ষ্য করবার বিষয় দু-টি। প্রথম হলো, এই ব্রাহ্মসমাজ বর্ধমানাধিপতির রাজসভার ব্রাহ্মসমাজ। দ্বিতীয়তঃ সাধারণের জন্যে ব্রাহ্মসমাজ —এই অর্থে 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ'

প্রতিষ্ঠিত হয় এর বহু বৎসর পরে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, তার প্রতিষ্ঠাতাগণ নতুন সমাজের নামকরণ করবার সময়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন। —অর্থাৎ কলকাতায় 'সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ'-এর ভ্রূণরূপ হলো বর্ধমানের এই 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ'।

১৮৫১ সালের ১৩ই জুলাই বর্ধমানে রাজবাড়িতে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আর ১৮৮০ সালে এখানে স্থাপিত হয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।

শান্তিনিকেতন-আশ্রমের প্রথম 'আশ্রমধারী' বর্ধমানের অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর 'শান্তিনিকেতন স্মৃতি' গ্রন্থে লিখেছেন—১৮৬৩ সালের ১৮ই ফাল্গুন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বীরভূম জেলার রায়পুর গ্রামের ভুবনমোহন সিংহের পুত্রদের কাছ থেকে কুড়ি বিঘে জমির বার্ষিক পাঁচ টাকা খাজনা ধার্য করে মৌরুসী পাট্টা গ্রহণ করেন। এ ডাঙ্গা জমি বোলপুর রেলস্টেশনের উত্তর দিকে প্রায় এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

১৮৮৮ সালে এখানে শান্তিনিকেতন-'আশ্রম' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৯০ সালে মহর্ষি এখানে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতবর্ষের বহু তীর্থস্থানে যেমন নানা সম্প্রদায়ের মঠ বা আশ্রম প্রতিষ্ঠিত আছে, মহর্ষির ইচ্ছা ছিল, তাঁর নবপ্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন-আশ্রমে এই উপাসনা-মন্দিরকে ঘেরে নিরাকার ব্রহ্মোপাসকদের সেই রকম মঠ স্থাপিত হবে। এর পূর্বে সাধনপরায়ণ ব্রহ্মবাদীদের জন্যে নির্জনে ভজন-সাধনের উপযোগী কোনো নির্দিষ্ট আশ্রম ছিল না। মহর্ষি ধর্মপিপাসু সাধকদের এই মহা অভাব অনুভব করে তা মোচন করতে চাইলেন। সকল মঠেই 'মঠধারী' বা 'আশ্রমধারী' থাকেন। এখানেও একজন থাকবেন। স্থির হলো, বর্ধমানের সাধুবাবাজী শ্রীযুক্ত দেবপ্রতিপালক বাবাজী শান্তিনিকেতন-আশ্রমের প্রথম 'আশ্রমধারী' হবেন। তিনি এখানে ঐ সময়ে উপস্থিত হলেন।

১৮৮৮ সালের ২৬শে ফাল্গুন শান্তিনিকেতন-আশ্রমে 'ধ্বজা উড্ডীন' করবার জন্যে আয়োজন হয়। দু-একদিন পরে বর্ধমান-রাজবাড়ি থেকে দেবপ্রতিপালক বাবাজী আর প্রিয়নাথ শাস্ত্রী শান্তিনিকেতনে আসেন। শান্তিনিকেতন-আশ্রমের প্রতিষ্ঠা জানাবার জন্যে ওরা চৈত্র সন্ধ্যার সময়ে বোলপুর-'ধর্মসভাগৃহে' শাস্ত্রীমহাশয় আর দেবপ্রতিপালক বাবাজী

ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

দেবপ্রতিপালক বাবাজী বা বর্ধমানের সাধুবাবাজী ছিলেন বর্ধমান-রাজের স্বপ্রদেশ পাঞ্জাবের অধিবাসী। ১৮৫১ সালের আগে বেদান্ত পড়বার জন্যে তিনি বর্ধমানে আসেন। রাজ-চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক পণ্ডিত তারকনাথ তত্ত্বরত্নের কাছে তিনি বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যে চার জন অধ্যাপক পণ্ডিতকে চার বেদ অধ্যয়ন করবার জন্যে কাশীধামে পাঠিয়েছিলেন তারকনাথ তাঁদের অন্যতম। পরে. ১৮৫১ সালে বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ মহ্‌তাব্‌ চন্দ্‌ বাহাদুর মহর্ষিদেবের পরামর্শ মতো রাজবাড়ির মধ্যে 'সত্য-সন্ধায়িনী সভা' নামে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করলে. ঐ সমাজের কাজ চালাবার জন্যে মহর্ষি পণ্ডিত শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য আর তারকনাথ তত্ত্বরত্নকে বর্ধমানে পাঠিয়েছিলেন। তারকনাথ তত্ত্বরত্নের ছাত্র ছিলেন দেবপ্রতিপালক বাবাজী। তিনি ছিলেন বৈদান্তিক সন্ন্যাসী. প্রখর বুদ্ধিমান আর সুবক্তা. মজলিসী লোক। নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করে তিনি সভার লোককে মুগ্ধ করতে পারতেন। এক স্থানে আট্‌কে থাকা এ রকম লোকের পক্ষে অসম্ভব। সেই জন্যেই বোধ হয় ১৮৮৮ সালে তিনি শান্তিনিকেতনের ফাঁকা মাঠে দিন কয়েক অবস্থিতি করেই অন্যত্র চলে গেলেন। তিনি শান্তিনিকেতন থেকে চলে যাওয়ার পরে শান্তিনিকেতন-আশ্রমের আশ্রমধারী নিযুক্ত হলেন বর্ধমানের শক্তিগড়ের কাছে বাকলসা গ্রামের অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়।

মহারাজাধিরাজ মহ্‌তাব্‌ চন্দের রাজবাড়িতে 'সত্যসন্ধায়িনী সভা'র অনুষ্ঠান-পত্র আর উপাসনা-প্রণালীর বিবরণ-সম্বলিত, শতবর্ষ আগে মুদ্রিত একখানি পুস্তিকা (১৮৬৫) শান্তিনিকেতনের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। বইটিতে রয়েছে 'শান্তিনিকেতন আশ্রম বোলপুর' মোহর-মারা। তাতে ব্রহ্মোপাসনার বৈদিক মন্ত্র আর মহানির্বাণ তন্ত্রোক্ত 'নমস্তে সতে তে' স্তোত্র অবিকল উদ্‌ধৃত আছে। পুস্তকপরিচয় ও গ্রন্থশেষে প্রতিজ্ঞাপত্র উদ্‌ধৃত করে দিচ্ছি। ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকাভেদে এতে সত্যসন্ধদের দশ প্রস্থ ও সত্যসন্ধায়িনীদের নয় প্রস্থ 'প্রতিজ্ঞা' গ্রহণের বিধান রয়েছে এইভাবে:

ওঁ তৎসৎ। / সত্য-সন্ধগণের / ব্রহ্মোপাসনা / পদ্ধতি। / সত্যসন্ধায়িনী

সভা / হইতে / প্রকাশিতা। / বৰ্দ্ধমান / সত্যপ্রকাশ যন্ত্রে / ১৭৮৭ শকাব্দে অগ্রহায়ণে / মুদ্রিতা ।

[পৃষ্ঠা ১] ওঁ তৎসৎ / ব্রহ্মোপাসনা / প্রথম প্রকরণ। / [থেকে] দ্বাদশ প্রকরণ ব্রহ্মোপাসনা / সমাপ্তা । / [পৃষ্ঠা ১২৫]

সত্যসন্ধদিগের প্রতিজ্ঞা [পৃষ্ঠা] এক আনা

জগদীশ্বরকে প্রত্যক্ষ জানিয়া প্রতিজ্ঞাপূর্বক সত্যধর্ম গ্রহণ করিতেছি।

[১] 'সচ্চিদেকং ব্রহ্ম' এই মন্ত্র দ্বারা পরব্রহ্মের মনন করিব।

[২] পরমেশ্বর জ্ঞান করিয়া প্রস্তর, কাষ্ঠ, ধাতু অথবা মৃত্তিকাদি দ্বারা নির্মিত বিগ্রহ এবং মনুষ্য কর্তৃক নির্মিত বস্তুর আরাধনা না করিয়া সত্য-স্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ, অনন্ত-স্বরূপ, অদ্বিতীয়, নিরবয়ব, পরব্রহ্মেরই উপাসনাতে নিযুক্ত থাকিব ।

[৩] জ্ঞানপূর্বক কাহারও অনিষ্ট চেষ্টা করিব না।

[৪] চুরি অথবা ছল করিয়া ধন সংগ্রহের প্রত্যাশা করিব না।

[৫] মিথ্যা কথা কহিব না।

[৬] প্রাণপণে কুকর্ম হইতে নিবৃত্ত থাকিব।

[৭] সাধ্য অনুসারে পরোপকারে যত্নশীল থাকিব।

[পৃষ্ঠা] দুই আনা

[৮] আমি আমার পত্নীর প্রিয় ও হিতকার্যে নিযুক্ত থাকিব, সদাচার ও সংযতেন্দ্রিয় হইব, ব্যভিচার করিব না।

[৯] ভার্যা মহারোগ-গ্রস্তা বা আজন্ম পীড়িতা অথবা ব্যভিচার দূষিতা না হইলে পত্নী বর্তমান থাকিতে ভার্য্যান্তর গ্রহণ করিব না।

[১০] এই মতাবলম্বী সকলকে ভ্রাতা ও ভগিনী সমান জ্ঞান করিব ।

হে পরমেশ্বর! সম্যক্‌রূপে এই পরম ধর্ম প্রতিপালনের প্রতিজ্ঞা হইতে আমার মন কখন যেন বিচলিত না হয়।

সত্যসন্ধায়িনীগণের প্রতিজ্ঞা [পৃষ্ঠা] তিন আনা

জগদীশ্বরকে প্রত্যক্ষ জানিয়া প্রতিজ্ঞাপূর্বক সত্যধর্ম গ্রহণ করিতেছি।

[১] 'সচ্চিদেকং ব্রহ্ম' এই মন্ত্রদ্বারা পরব্রহ্মের মনন করিব।

[২] পরমেশ্বর জ্ঞান করিয়া প্রস্তর, কাষ্ঠ, ধাতু অথবা মৃত্তিকাদি নির্মিত বিগ্রহ এবং মনুষ্য কর্তৃক নির্মিত বস্তুর আরাধনা না করিয়া সত্য-স্বরূপ,

জ্ঞান-স্বরূপ, অনন্ত-স্বরূপ, অদ্বিতীয়, নিরবয়ব, পরব্রহ্মেরই উপাসনাতে নিযুক্তা থাকিব।

[৩] জ্ঞানপূর্বক কাহারও অনিষ্ট চেষ্টা করিব না।

[৪] চুরি অথবা ছল করিয়া ধন সংগ্রহের প্রত্যাশা করিব না।

[৫] মিথ্যা কথা কহিব না।

[৬] প্রাণপণে কু-কর্ম হইতে নিবৃত্তা থাকিব।

[৭] সাধ্য-অনুসারে পরোপকারে যত্নশীলা থাকিব।

[পৃষ্ঠা] চার আনা

[৮] আমি আমার স্বামীর প্রিয় ও হিতকার্যে নিযুক্তা থাকিব, সদাচারা ও সংযতেন্দ্রিয়া হইব, ব্যভিচার করিব না।

[৯] এই মতাবলম্বী সকলকে ভ্রাতা ও ভগিনী সমান জ্ঞান করিব। হে পরমেশ্বর! সম্যক্‌রূপে এই পরম ধর্ম প্রতিপালনের প্রতিজ্ঞা হইতে আমার মন কখন যেন বিচলিত না হয়।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

১৮৮৪ সালে শান্তিনিকেতন থেকে 'আশ্রমধারী' অঘোর বাবু তাঁর ক'জন বন্ধুকে নিয়ে একদিন সন্ধ্যার পরে বর্ধমানের রাজবাড়িতে এই ব্রাহ্মসমাজে উপাসনায় যোগ দিয়েছিলেন। তখন মহ্‌তাব্‌ চন্দ্‌ পরলোকে (১৮৭৮); মহারাজ আফ্‌তাব চন্দ্‌ বাহাদুরের আমল (মৃত্যু ১৮৮৫)। রাজবাড়ির উত্তর ফটক দিয়ে প্রবেশ করে পশ্চিম দিকের একটি দোতলা বাড়িতে ওঁরা গিয়ে হাজির হলেন। গৃহের নানা স্থানে, এমন-কি টানা-পাখাতেও ওঁরা দেখলেন, সোনার জলে 'ওঁ তৎসৎ' লেখা ছিল। পণ্ডিত অঘোরনাথ তত্ত্বনিধি মহাশয় আচার্যের কাজ করেছিলেন। খুব সম্ভব উপাসনা হয়েছিল —শুক্রবারে। পরে কোন্নগরের পণ্ডিত দয়ালচন্দ্র শিরোমণি এই সমাজের আচার্য নিযুক্ত হন। ১৯২৯ সালে স্মৃতিকথা লেখার সময়ে এই উপাসনা-সভার অস্তিত্ব ছিল কিনা অঘোরবাবু জানতেন না।

১৮৪৮ সালে মহর্ষির সঙ্গে বর্ধমানাধিপতির মিলন হয় এবং ১৮৫১ সালে বর্ধমান-রাজবাটীতে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়। রাজবাড়ির সমাজ ছাড়া 'বর্ধমান ব্রাহ্মসমাজ' নামে আর একটি সমাজ বর্ধমানে

প্রতিষ্ঠিত ছিল। এর উল্লেখ আমরা আগে করেছি। দ্বারভাঙ্গা মহারাজের ভূতপূর্ব দেওয়ান, বেদান্তাদি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত চন্দ্রশেখর বসু (রাজশেখর বসুর পিতা) প্রমুখের চেষ্টায় ১৭৮২ শকাব্দে (১২৬৭ সালে, ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে) এই সমাজ স্থাপিত হয়। এই সমাজবাড়ি কলকাতার আদিব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের নামে কেনা হয়। তখন থেকে বর্ধমানের এই সমাজ কলকাতার আদিব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পরিচালিত হচ্ছিল। বর্ধমান-রাজবাড়ির সঙ্গে এর কোনো সংস্রব ছিল না।

১৮৫৮ সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ হিমালয় থেকে কলকাতায় ফিরে আসেন। এ সময় নির্জনবাসের আশায় তিনি বহুস্থানে ভ্রমণ করেছিলেন। ১৮৬১ সালে মহর্ষি বর্ধমান জেলার অন্তর্গত গুসকরা রেলওয়ে স্টেশনের নিকটবর্তী একটি আম্রকাননে তাঁবুতে বাস করছিলেন। মহর্ষি বলেছেন,— 'আমি কোন নির্জন প্রান্তরে একটা সাধনাশ্রম নির্মাণ করিবার জন্য স্থান অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে একদা গুসকরার একটা আম্রকাননে বাস করিতেছিলাম।'

অনুমান হয়, এই স্থলে এই সময়ে, বা এর কিছু আগে বীরভূম জেলার বোলপুর রেল-স্টেশনের দক্ষিণ-পশ্চিমে পাঁচ মাইল দূরের গ্রাম রায়পুরের জমিদার বাবু ভুবনমোহন সিংহ ও তাঁর পুত্রদের সঙ্গে মহর্ষির পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়। মহর্ষির পত্র থেকে জানা যায়,—১৮৫৮ সালের কিছু আগে ভুবনবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রতাপনারায়ণ সিংহ 'ব্রহ্মরস আস্বাদন পাইয়া তাহাতে অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়াছেন।' ভুবনবাবুর আমন্ত্রণে মহর্ষি ১৮৬১ সালে মাসখানেকের ব্যবধানে দু'বার রায়পুরে আসেন। ১৮৫৯ সালে এদিকে ট্রেন লাইন পাতা হয়। এর আগে এলে, মহর্ষি এসেছিলেন, গুসকরা থেকে পাল্কিতে চড়ে, চীপ সাহেবের সংস্কার-করা পুরাতন হুসেনশাহী সড়ক ধরে। আর পরে এলে, ট্রেনে চড়ে বোলপুর দিয়ে এসেছিলেন। এবং নির্জন স্থান পছন্দ করে পরের বছর (১৮৬৩) শান্তিনিকেতনের এই জমির পাট্টা নেন। পাট্টার তারিখ ১৮ই ফাল্গুন, ১২৬৯ (১৮৬৩) সাল।

রায়পুরে আসার আগে-পরে মহর্ষি গুসকরা-তাঁবুতে বাস করে

গিয়েছিলেন। তখন তিনি তান্ত্রিক সাধকদের মতন সাধনার উপযুক্ত 'নির্জন প্রান্তর' খুঁজছিলেন। এবং বলা যেতে পারে, এই সময় থেকেই শান্তিনিকেতন-আশ্রম রচনার সূত্রপাত ঘটে। এ ছাড়া, মহর্ষি যখন তাঁর শান্তিনিকেতন-আশ্রমে বাগান পত্তন করেন সেইসময়ে ভালো ভালো আমের কলম পাঠিয়েছিলেন বর্ধমানের মহ্‌তাব্‌ চন্দ্‌। শুধু তাই নয়। বাগানের যথাযোগ্য পরিচর্যা করবার জন্যে মহর্ষির আদেশে শান্তিনিকেতনে তিনি মালী পাঠিয়েছিলেন রামহরি দাসকে। এই রামহরি দাস ছিল রাজা রামমোহনের ভৃত্য ও বিলেতে গিয়েছিল তাঁরই সঙ্গে। কিন্তু বিলেত থেকে ফিরে আসার পরে তার জাতিচ্যুতি ঘটে। সেই অসময়ে রামহরিকে আশ্রয় দিয়েছিলেন মহ্‌তাব্‌ চন্দ্‌। মহ্‌তাব্‌ চন্দের সেই খাস মালী রামহরি দাসই হলো মহর্ষির প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন-বাগান আর বর্তমান 'আম্রকুঞ্জে'র প্রথম পরিচারক। ১৮৬১ সালের দিকে মহর্ষির গুসকরা-বাসে বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ —তাঁর শিষ্য ও বান্ধব মহ্‌তাব্‌ চন্দের পরামর্শ ও সহায়তা কিছুতেই অস্বীকার করা চলে না। শান্তিনিকেতনে আশ্রম ও ব্রহ্ম-মন্দির প্রতিষ্ঠার আগে থেকে বর্ধমানের সঙ্গে যোগাযোগের কথা আমরা আগেই বলেছি।

বর্ধমানের রাজপ্রাসাদে মহর্ষি 'সত্যসন্ধায়িনী সভা'র যে-দীপ জ্বেলেছিলেন, রায়পুরে যে-দীপ জ্বালাবার চেষ্টা করেছিলেন, শান্তিনিকেতন-আশ্রমে সেই দীপ দীপ্তশিখায় জ্বলে উঠলো।

॥ ভুবনডাঙ্গায় 'বাবু' দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরে'র আবাসে অতিথি-সমাগম, ১৮৬৬ ॥

১৮৬৩ সালে ভুবনডাঙ্গার মাঠের পাট্টা গ্রহণ করবার অনেক আগেই মহর্ষি ভুবনডাঙ্গায় নিজ বাড়ি তৈরি করিয়েছিলেন। সে-বাড়ি 'পরম রমণীয় উদ্যানবাটিকা' 'শান্তিনিকেতন' নয়; সে-বাড়ি হলো বর্তমান 'নিচু বাঙ্গালা'র আদি রূপ। 'শান্তিনিকেতন' ইমারত তৈরির পূর্বে মহর্ষি 'নিচু বাঙ্গালা'র বাড়ি তৈরি করান। শাল, মহুয়া, আম, আমলকী, হরিতকী, বট, অশ্বত্থ, নিম বৃক্ষরাজি আর মুচুকুন্দ, চাঁপা, নাগকেশর, গোলাপ ইত্যাদি নানা পুষ্প-শোভিত এই স্থানটি সেকালে তার শান্ত পরিবেশের

জন্যে প্রাচীনকালের তপোবনের অনুরূপ হয়েছিল। এই জমিরই উত্তরাংশে বাঙ্গালা ১২৭১ সালে (খৃ ১৮৬৪) একতলা বাড়ি তৈরি সম্পূর্ণ হয় ৬৮২ টাকা ব্যয়ে। এই বাড়িটিই ১২৮৪ বঙ্গাব্দ বা ১৮৭৭ সালের দিকে দোতলা হয় ১৩০১৫ টাকা ৬ পাই ব্যয়ে। আর 'শান্তিনিকেতন' —এই নামে পরিচিত হয়। নিচু বাঙ্গালার পুরানো অংশে দ্বিজেন্দ্রনাথ বাস করতেন; এখন নাম হয়েছে —'দ্বিজবিরাম'। কিশোরী চাটুয্যের বেনামে জায়গাটি নিয়ে মহর্ষি এখানে বাড়ি তৈরি করান। বাড়ির মাথায় তখন খড়ের চাল। বাড়িটি 'শান্তিনিকেতন' একতলা বাড়ির কিছু আগের। ১৮৬৪ সালে 'শান্তিনিকেতন'-বাড়ি যখন উঠছিল তখন তার তদারকির জন্যে তদ্বিরকারক এই বাড়িতে বাস করতেন। মহর্ষিও এই বাড়িতে বা এই এলাকায় তাঁবুতে থাকতেন। শান্তিনিকেতন'-বাড়ির একতলা তৈরি সম্পূর্ণ হলে মহর্ষি সেখানে বাস করেছিলেন। দোতলায় তিনি বাস করেছিলেন কিনা বলা যায় না। তবে, প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে মনে হয়, মহর্ষি অন্ততঃ শেষবারে (খৃ ১৮৮৩ : বঙ্গাব্দ ১২৯০) 'প্রকাণ্ড প্রাসাদ শান্তিনিকেতনে'র দোতলায় বাস করে গেছেন। ১৮৮৩ সালের পরে মহর্ষি শান্তিনিকেতনে আর আসেননি। ১৯০৫ সালে তাঁর দেহান্ত হয়।

মহর্ষির মৃত্যুর পরে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ কলকাতার আবাস ত্যাগ করে রায়পুরে প্রতাপনারায়ণের কনিষ্ঠ পুত্র তাঁর বন্ধু রবীন্দ্রনাথ সিংহের বাড়িতে এসে থাকতেন। ঠাকুরবাড়ির এজমালি-সম্পত্তির অংশ, মাসহারা প্রাপ্তির শর্তে, সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের কাছে ইজারা দিয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের নিচু বাঙ্গালার পোড়ো বাড়ি মেরামত করিয়ে, সেখানে চলে এলেন (১৯০৬)। দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথ এসে (১৯০৬) 'শান্তিনিকেতন'-ভবনের নিচের তলায় বাস করতে লাগলেন। এর আগে ১৮৮৮ সালে 'শান্তিনিকেতন আশ্রম' প্রতিষ্ঠা হয়। এই উপলক্ষে সভার অধিবেশন ও ব্রহ্মোপাসনার আয়োজনের উদ্দেশ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ, দ্বিপেন্দ্রনাথ প্রমুখ আশ্রমে এসেছিলেন। তার আগে 'শান্তিনিকেতন'-সৌধের সংস্কারকার্য সমাধা হয়নি ও এখানে অতিথি অভ্যাগতের অবস্থানের কোনও ব্যবস্থা ছিল না।

১৮৬৬ সালের দিকে মহর্ষির ভুবনডাঙ্গার বাসভবনে কোনও অতিথি

এলে তাঁর খাওয়া-দাওয়ার জন্যে তাঁকে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করতে হতো। সন্নিহিত সুরুল-গ্রামের সরকার-বাড়ি থেকেও তার বিশেষ ব্যবস্থা করা হতো। বিশ্বভারতীর সম্প্রতি-সংগৃহীত সরকার-বাড়ির একখানি পুরাতন পত্রে দেখছি :

Bengal Office

The 7th March 1966

My dear Hurry Mohun.

Last week I wrote to you to say that my father-in-law goes to Baboo Debendra Nath Tagore's House at Bhoobun Dangah at Bhulpore He has started this morning. The bearer who will deliver this to you accompanies my father-in-law. Now as he is now in your part of the country, I hope you will do him the Hospitable ; That is, kindly make arrangement for getting him milk and fish regularly and some Bael and other Morobba. রোজ করিয়া দিবেন— He is an invalid and may require the aid of Doctor. When you can get him Kadar from Rampore Hat. Kadar, will be happy to attend on him. I shall try to get up to you by Saturday next.

Hoping you are quite well.

I am

Yours affly

Nilmoney Dey

Baboo

Hurrymohun Sorkar.

—শতবর্ষ পূর্বে লেখা এই গুরুত্বপূর্ণ পত্রখানির বিশদ আলোচনা আমরা অন্যত্র করেছি। এখানে বলে রাখা ভালো, নীলমণি দে-এর বা তাঁর শ্বশুরের পরিচয় এখনও আমরা পাইনি। তবে, উক্ত হরিমোহন

সরকারের উত্তরপুরুষ কার্ত্তিকচন্দ্র সরকারের সঙ্গে দ্বিপেন্দ্রনাথের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল। সুরুলের কর্ত্তিকবাবুর রচিত 'গায়ত্রী'-নাটকখানি শ্রীনন্দলাল চিত্রভূষিত করেছিলেন। বইখানি মুদ্রণ করেছিলেন শান্তিনিকেতন-প্রেস থেকে শ্রীজগদানন্দ রায়, সন ১৩২৯ সালে।

মহর্ষির শান্তিনিকেতনে'র প্রথম 'আশ্রমধারী' বা কর্মকর্তা অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথায় দেখা যায়, —শান্তিনিকেতন-সীমানার পূর্ব-দক্ষিণ কোণাংশ থেকে প্রায় ২ রশি দূরে বাঁধের কাছে ১ বিঘা জমির ওপর একটি খড়ের বাঙ্গালা ছিল, তারই নাম 'নিচু বাঙ্গালা'। এই ঢালু বা নিচের বাঙ্গালার জমি মহর্ষিদেব তাঁর হিমালয়-ভ্রমণের অনুচর কিশোরীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নামে বার্ষিক চার আনা খাজনায় বন্দোবস্ত নিয়েছিলেন। এই জমি ও বাড়ি শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট্ সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত হয়নি। এখানে আমিষ আহার নিষিদ্ধ ছিল না [পত্রোক্ত নীলমণি দে-এর শ্বশুর এখানে 'রোজ' করে মাছ খেতেন।] 'শান্তিনিকেতনে'র পরবর্তী বাসিন্দা কারো মাছ খাবার একান্ত ইচ্ছা হলে, এখানে এসে তা খেতে পারতেন। এই বাঙ্গালার চারদিকে কোনো প্রাচীর বা বেড়া ছিল না। সুমুখে কতকগুলি আমলকী, অশ্বত্থ ইত্যাদি গাছ থাকায় এই স্থানটিও আশ্রম-কাননের মতো শোভিত ছিল। পরবর্তিকালে খড়ের বাঙ্গালার বদলে, লাল টালির চালযুক্ত সুন্দর গৃহ নির্মিত হয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এইস্থানে তাঁর শেষজীবন অতিবাহিত করেন ১৯২৬ সাল পর্যন্ত কুড়ি বৎসর।

শান্তিনিকেতনের ইমারত প্রস্তুত হবার আগে মহর্ষিদেব 'নিচু বাঙ্গালা'য় বাস করতেন। মহর্ষি এখানে এসে অনেক সময় এই বাড়িতে বা আম্রকাননে তাম্বুতে বাস করতেন। এই বাঙ্গালাটি বড়ো ছিল না। শান্তিনিকেতনের কুয়া কাটার আগে জলের সুবিধার জন্যে বাঁধের কাছে প্রস্তুত হয়েছিল। ছোট হলেও মহর্ষিদেব এখানে কিছু দিনের জন্যে বাস করেছিলেন সে ঠিক। নীলমণি দে-এর ঐ চিঠি পড়ে মনে হচ্ছে, ব্রাহ্মধর্মে বিশ্বাসী নয় এমন সাধারণ অতিথিদের সাময়িক বসবাসের উদ্দেশ্যেই মহর্ষি ভুবনডাঙ্গার এই স্থানটি শান্তিনিকেতনের অন্তর্ভুক্ত না-করে কিশোরীবাবুর

নামে পাট্টা নিয়ে এখানে 'নিচের বাঙ্গালা' তৈরি করিয়েছিলেন। ১৮৮৩ সালের পরে মহর্ষি শান্তিনিকেতনে আসেননি। ১২৯০ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে 'শান্তিনিকেতনে'-ইমারতে তাঁর শেষ আগমন।

॥ ছাতিমতলা ॥

'শান্তিনিকেতন'-ইমারতের পশ্চিমদিকে কিছু দূরে পুরানো কালের এক্জোড়া ছাতিম গাছ ছিল। তারই একটির পাদমূলে ছায়াতলে শান্ত-সমাহিত-চিত্তে আনন্দরূপমমৃতং ব্রহ্মের উপাসনার জন্যে মহর্ষি শ্বেতপাথরের একটি বেদী নির্মাণ করালেন। এই বাগানবাড়ি সাধনাশ্রমে পরিণত হলো। বেদী-প্রস্তুতের জন্যে এই স্থান খোঁড়বার সময়ে অনেকগুলি মড়ার মাথার খুলি পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু কঙ্কালের অন্য কোনো অংশ পাওয়া যায়নি। ছাতিম গাছ এ-অঞ্চলে দুষ্প্রাপ্য। সাঁওতালবহুল বীরভূম জেলা তান্ত্রিক-সাধনার জন্যে বিশেষভাবে পরিচিত। শ্যামা-ধর্ম আচরণেরও রবরবা ছিল এই অঞ্চলে। শান্তিনিকেতন থেকে কয়েক মাইলের মধ্যেই সুপুর, কঙ্কালীতলা, লাভপুরের তান্ত্রিকপীঠ বিখ্যাত। এই সমস্ত বিবেচনা করে কেউ কেউ মনে করেন, তান্ত্রিকেরাই এখানে ছাতিম গাছ এনেছিল আর এই নির্জন প্রান্তরে করোটি এনে শামা-সাধনার উদ্দেশ্যে 'পঞ্চমুণ্ডী'র আসন রচনা করেছিল। এখানকার করোটিগুলির সঙ্গে বহুপ্রচারিত গল্প —ডাকাতি কিংবা রাহাজানিতে খুন-জখমের কোনও সম্পর্ক নাই। আশ্চর্য এই, মহর্ষি বীরভূম জেলার একটি নির্জন প্রান্তরের নামহীন এক শ্রমণ তান্ত্রিকপীঠে উপবিষ্ট হয়ে সম্ভবতঃ জ্ঞাতসারেই নিরাকার একব্রহ্মের সাধনা করেছিলেন, এবং অনুরূপ সাধনার জন্যে এখানেই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে গেছেন।

১৮৬৪ সালের দিকে 'শান্তিনিকেতন'-বাড়ি করবার সময়ে একটা পুকুর খোঁড়বার চেষ্টা করে অত্যন্ত কঠিন-মাটি বলে ছেড়ে দেওয়া হয়। সেই গর্তের মাটি তুলে পূর্ব ও দক্ষিণ ধারে পাহাড়ের অনুকরণে একটা উঁচু স্তূপ তৈরি করা হয়েছিল। সেখানে প্রভাতে মহর্ষি চৌকি নিয়ে উপাসনায় বসতেন। তাঁর সামনে পূবের প্রান্তরসীমায় সূর্যোদয় হতো।

প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ মতে, ছাতিমতলায় প্রথমে যে-বেদী প্রস্তুত হয়, তা ছিল



মহর্ষির ছাতিমতলা - নন্দলাল

চুন বালি দিয়ে ইটের তৈরি, সামান্য উঁচু আসনের ওপরে মার্বেল-পাথর বসানো। পরবর্তী কালে নন্দলালের মুখে আমি শুনেছি, রঙিন বাথ-টাইল্ দিয়ে দ্বিপেন্দ্রনাথ সেই বেদীর চার পাশ আর চত্বর সাজিয়েছিলেন।—এর ফটোচিত্র সুপরিচিত।

১৮৬৩ সালে মৌরুসী স্বত্বের জায়গা কেনার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ১৮৬৪ সালে একতলা, ও কিছু পরে দোতলা ইমারত এবং বাগান তৈরি করার সময়ে সম্ভবতঃ সর্বপ্রথম এই বেদী তৈরি করা হয়েছিল। এই সাধনা-বেদীটির প্রতি মহর্ষিদেবের প্রাণের টান ছিল অতি গভীর। ১৯০৫ সালের ৬ই মাঘ মহর্ষি পরলোকগমন করেন। ১৯০৪ সালের ফাল্গুন মাসে তাঁর কম্পজ্বর হয়। এর দু-দিন পরে তিনি পৌত্র দ্বিপেন্দ্রনাথ আর প্রিয়নাথ শাস্ত্রীর কাছে শান্তিনিকেতনে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করে বলেন, —'আহা! এই সময়ে যদি আমি ছাতিমতলার বেদীতে শয়ন করিয়া সংসার হইতে মুক্ত হইতে পারিতাম তবে আমার বড়ই আনন্দ হইত।' দ্বিপেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন, শান্তিনিকেতন থেকে ছাতিম গাছের একটি চারা আনিয়ে দিতে। সেখানে না-যাওয়া হলে, ঐ চারা দেখে তিনি মনে করতে পারবেন, তাঁর আশ্রমের ছাতিমতলাতেই আছেন। ঐ বেদীতে বসে দীর্ঘকাল তিনি উপাসনা না-করে থাকলে এই 'বোধিবৃক্ষে'র প্রতি তাঁর প্রাণের টান অতো হতো না।

ছাতিমতলা নানা প্রকারে সাজাবার নির্দেশ আসতো মহর্ষির কাছ থেকে। তাঁরই আদেশে একটা বড় দোকান থেকে লোক এসে শ্বেতপাথরের ওপর মন্ত্র খোদাই-করা একটি ছোট তোরণ বসিয়ে দিয়ে যায়। সে তোরণ টেকেনি। ঝড়ে পড়ে গিয়েছিল। একটি অনুচ্চ দেওয়াল গেঁথে তাতে ঐ শ্বেতপাথরের তোরণ লাগিয়ে দেওয়া হয়। আরও একটি অনুরূপ তোরণ ঐ স্থানের জন্যে আসে। এই বেদী এখান থেকে সরানো যায় না। এই স্থানটি মহর্ষিদেবের সাধনক্ষেত্র; এই বেদীটি তাঁর ব্যবহৃত। পরবর্তিকালে শ্রীনন্দলাল চেয়েছিলেন, ছাতিমতলার এই বেদীটিকে শ্রীলঙ্কার অনুরাধাপুরে অবস্থিত সংঘমিত্রার বোধিবৃক্ষের বেদীর অনুরূপভাবে সাজাবেন।

১৯১৪ সালে লাটসাহেব কারমাইকেল যখন আশ্রমে আসেন তখন

আম্রকুঞ্জে উচ্চ মঞ্চ প্রস্তুত করা হয়, এবং ছাতিমতলা থেকে শ্বেতপাথরের একটি তোরণ তুলে এনে সেখানে লাগানো হয়। এই মঞ্চ 'কারমাইকেল বেদী' নামে পরিচিত হয়েছিল। সে তোরণ আর সেখানে নাই। ঐ সালে নন্দলালকে এই 'কারমাইকেল বেদী'তেই অভ্যর্থনা জানানো হয়। যাই হোক, ছাতিমতলায় মহর্ষির উপাসনাবেদীর সম্মুখে শ্বেতপাথরের তোরণের গায়ে উৎকীর্ণ ছিল তাঁর জীবনের ও শান্তিনিকেতন-আশ্রমের মূলমন্ত্র —'শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্' ঃ তিনি আমার প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি।

রবীন্দ্রনাথ এই মন্ত্রটিকে তাঁর জীবনের মূলমন্ত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মন্দিরের নানা ভাষণে এই মন্ত্রটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল। আশ্রম-জীবনে যতদিন 'শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্' মন্ত্রটি কার্যকর থাকবে ততদিন শান্তম্ এর শান্তির, শিবম্-এর মঙ্গলকর্মের আর অদ্বৈতম্-এর ঐক্য ও প্রেমের আদর্শ শান্তিনিকেতনে অক্ষয় থাকবে, 'শান্তিনিকেতন' অন্বর্থনামা হয়ে শান্তির নিকেতন বা আনন্দধামরূপে বিরাজ করবে।

মহর্ষির ব্রহ্ম-সাধনার পরিপ্রেক্ষিতে শান্তিনিকেতন-আশ্রম-বিদ্যালয়ের আদর্শ অজিতকুমারের ভাষায়ঃ 'এখানে সকল বিচিত্র সাধনার স্থান হইবে, এবং সকল সাধনার উপরে থাকিবে ব্রহ্মের সাধনা, ভূমার সাধনা। এখানে জ্ঞানী আসিবেন, বৈজ্ঞানিক আসিবেন, শিল্পী আসিবেন, কর্মী আসিবেন —ক্রমে ক্রমে হয়ত এ একটা বিশ্ববিদ্যালয় হইয়া উঠিবে। কিন্তু সেই বিদ্যালয়ের বিচিত্র সাধনা এই আশ্রমে ভূমার সাধনার অঙ্গীভূত হইবে। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয় এখানে একটা বিশ্বতীর্থের মতনই হইয়া উঠিবে।'

॥ আশ্রমের মন্দির ॥

আশ্রমের মন্দিরটির ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল ১৮৯০ সালের ২২-এ অগ্রহায়ণ। 'শান্তিনিকেতনের কথা'য় দেখা যাচ্ছে, মহর্ষিদেব চেয়েছিলেন, সূর্যাস্তের সময়ে ছাতিমতলার বেদী থেকে তিনি পশ্চিমাকাশে যেমন বিচিত্র বর্ণের লীলা দেখতেন আর এখানকার প্রান্তরে আলোকধারাকে

যেমন বাধা দেবার কিছুই ছিল না, তাঁর ব্রহ্মমন্দিরেও তেমনি রঙের খেলা থাকবে, —আলোক সেখানে বাধা পাবে না। সেইজন্যেই এখানকার ব্রহ্মমন্দির নানা রঙের কাঁচে-সাজানো কাঁচের দেওয়াল দিয়ে তৈরি। সেকালের প্রসিদ্ধ শিকদার কোম্পানীর প্রসন্নকুমার শিকদার ছিলেন এই মন্দিরের ইঞ্জিনীয়ার। মন্দিরের মার্বেল-পাথরের মেঝে আর বাইরের বালি-পাথরের পৈঠাগুলি বিদেশী কোম্পানীর কাজ হতে পারে। নন্দলাল বলেন, মন্দির তৈরি হয়েছিল দ্বিপেন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে।

মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেন মহর্ষির জ্যেষ্ঠ পুত্র দার্শনিকপ্রবর দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি ঐ সময়ে উপাসনা করেছিলেন, তাঁর মেজ ভাই সত্যেন্দ্রনাথ বক্তৃতা করেন, আর গান করেছিলেন ঊনত্রিশ বৎসরের যুবক রবীন্দ্রনাথ। একটি তাম্রফলকে তারিখাদি খোদাই করা ছিল। সেই ফলক, সেই দিনের Statesman পত্রিকা, সেই মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, পঞ্চরত্ন আর প্রচলিত মুদ্রা ভিত্তিমূলে পোঁতা হয়। তাম্রফলকে লেখা ছিল, —'ওঁ তৎসৎ। ঠক্কুর বংশাবতংসেন পরমর্ষিণা শ্রীমতা দেবেন্দ্রনাথ শর্মণা ধর্মোপচয়ার্থং শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠাপিতমিদং ব্রহ্মমন্দিরং। শুভমস্তু ১৮১২ শক, ১৯৪৮ সম্বৎ, ৪৯৯১ কল্যব্দ, অগ্রহায়ণ ২২, রবিবাসর।'

মন্দিরটি ঢালাই-লোহায় তৈরি, কলকাতায় নানা অংশে প্রস্তুত করে এখানে আনা হয়। নির্জন আশ্রমে বহু কর্মী; পাথর কাটা হচ্ছে, রং-এর কাজ হচ্ছে; টিন-টিন রং এসেছে, মেয়ে মজুররা সে-সব রং শিলে বাঁটছে, ছাঁকছে, তারপরে মিস্ত্রিরা লাগাচ্ছে। বহু রং-এর কাঁচ কাটা হয়ে লাগানো হলো। বাদামী কাগজের ছোট-ছোট খাতা এল, তার মধ্যে সোনার পাত, —একেবারে খাঁটি সোনা, —তাই মন্দিরের স্থানে-স্থানে লাগিয়ে চিত্রিত করা হলো। মন্দিরের গায়ে সেই সোনার কাজ এখনও (১৯৬৬) দেখা যায়।

তারপরে পাথরের কাজ। মার্বেল-পাথর লাগানো হলো। মিস্ত্রিরা তারপর ঘষতে আরম্ভ করলো নানা রকমের পাথর দিয়ে, আর তারপর একটা মশলা ছড়িয়ে, মখমলে মোড়া এক-একটা পিণ্ডের মতো নরম জিনিস দিয়ে। ফলে ওগুলো আয়নার মতন দেখতে হয়েছিল। পরে, সাদা ও কালো মার্বেল-পাথরের ভাঙা টুকরো দিয়ে আশ্রমের বাগান

সাজানো হলো।

পর বৎসর ৭ই পৌষ তারিখে মহাসমারোহে মন্দির-প্রতিষ্ঠা হয়।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠা-পত্র পাঠ করে মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত করেন। প্রতিষ্ঠা-পত্রের পাঠ এই: 'অদ্য সর্বসাক্ষী পরম মঙ্গলালয় পরমেশ্বরের কৃপা স্মরণপূর্বক এই শান্তিনিকেতন-আশ্রমস্থ নূতন ব্রহ্মমন্দিরের দ্বার জাতি ধর্ম অবস্থা নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর ও সকল সম্প্রদায়ের মনুষ্যগণের ব্রহ্মোপাসনার জন্য উন্মুক্ত হইল। এই শান্তিনিকেতনে অপর সাধারণের একজন অথবা অনেকে একত্র হইয়া নিরাকার একব্রহ্মের উপাসনা করিতে পারিবেন। নিরাকার একব্রহ্মের উপাসনা ব্যতীত কোন সম্প্রদায়বিশেষের অভীষ্ট দেবতা বা পশু, পক্ষী, মনুষ্যের বা মূর্তির বা চিত্রের বা কোন চিহ্নের পূজা বা হোম যজ্ঞাদি এই শান্তিনিকেতনে হইতে পারিবে না। কোন ধর্ম বা মনুষ্যের উপাস্য দেবতার কোন প্রকার নিন্দা বা অবমাননা এইস্থানে হইবে না। এরূপ উপদেশাদি হইবে যাহা বিশ্বের স্রষ্টা ও পাতা ঈশ্বরের পূজা, বন্দনা ও ধ্যানধারণাদির উপযোগী হয় এবং যদ্দারা নীতি ধর্ম উপচিকীর্ষা এবং সার্বজনীন ভ্রাতৃভাব বর্ধিত হয়।...' এই প্রতিষ্ঠা-পত্র ১৮৮৮ সালে মহর্ষির সম্পাদিত শান্তিনিকেতন-আশ্রমের ট্রাস্ট্‌ডীডের অনুরূপ। এই ট্রাস্ট্‌ডীডের অন্যতম ট্রাস্টী ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথ —মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্রের জ্যেষ্ঠসন্তান। —এ ব্যবস্থা হলো একেবারে এদেশের প্রাচীন রাজকীয় উত্তরাধিকার নির্ণয়ের পরম্পরানুসারী।

এই মন্দিরের নাটমন্দিরটি ছিল 'পঞ্চরত্ন'-রথের অনুরূপ। তার ওঁ-কার-লেখা সেই চুড়ো সরিয়ে ফেলে কখন যেন চৌকো ছাত করা হয়েছে। কিন্তু সেই চুড়ো যেখানেই থাকুক, আচার্য নন্দলালের মতে, সেটি যথাস্থানে সংলগ্ন না-করে দিলে আশ্রমের মহিমা খর্ব হবার আশঙ্কা। কারণ, মহর্ষি লিখে রেখে গেছেন: 'দর্শনস্য দর্শনেন নো মনোহি নির্মলং ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম্। ঈশ্বর কৃপা করিয়া আমার অন্তরে আসীন হইয়া মৃদুস্বরে বলিয়াছেন যে 'অহং ব্রহ্মাস্মীতি' অতএব আমি তাঁহার অস্তিত্বের সাক্ষী। কিন্তু আমি তো আর চিরদিন এই সাক্ষী দিতে বাঁচিয়া থাকিব না। অতএব শান্তিনিকেতনে একটি মন্দির স্থাপন

করিয়া গেলাম। এই লৌহনির্মিত মন্দিরের চূড়ায় লিখিত ওঁ-কারই আমার প্রতিনিধি হইয়া চিরদিন সাক্ষী দিবে —একং ব্রহ্মাস্তীতি।'

মহর্ষিদেব যে-কিছু ধর্মবীজাদি মন্দিরের চূড়ায়, প্রবেশপথে ও আশ্রমের তোরণগুলিতে লিখিয়েছিলেন, সে-সকলেরও সংস্কার হওয়া ও বিশেষভাবে প্রদর্শিত হওয়া আবশ্যক। আচার্য নন্দলাল ভাবছেন, রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট বিভিন্ন বাণীও ঐভাবে পাথরে পাথরে খোদাই করে আশ্রমের ইতস্ততঃ সাজিয়ে রাখা প্রয়োজন।

॥ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয় ও ব্রহ্মচর্যাশ্রম ॥

১৮৮৮ সালের (বঙ্গাব্দ ১২৯৪) ২৬-এ ফাল্গুন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ট্রাস্ট্-ডীড্ সম্পাদন করে শান্তিনিকেতন' ইমারত, তার সংলগ্ন বাগান ও জমি উৎসর্গ করেন। এই জমি বারবকসিং ('সেনভূম' ?) পরগণার ভুবনডাঙ্গা ('ভুবননগর' ?) গ্রামের মধ্যে বাঁধের উত্তরাংশে বিশ বিঘা-পরিমাণ। নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনার জন্যে একটি আশ্রম সংস্থাপন করার অভিপ্রায়ে মহর্ষি 'শান্তিনিকেতন' সম্পত্তি ট্রাস্টী দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায় ও প্রিয়নাথ শাস্ত্রীর নামে অর্পণ করেছিলেন। শান্তিনিকেতনের ব্যয় নির্বাহের জন্যে তিনি নিজ জমিদারির কিয়দংশ দেবত্র করে দেন। ট্রাস্ট্-ডীড্ মতে, সেখানে কোনো মূর্তি, প্রতিমা বা প্রতীক-পূজা হতে পারে না। কোনো ধর্মের নিন্দা করা, মদ্যপান, মৎস্য-মাংস-ভোজন ও জীবহত্যা নিষিদ্ধ। নিন্দাহ্ আমোদ-আহ্লাদও হতে পারবে না। প্রথম 'আশ্রমধারী' নিযুক্ত হয়েছিলেন বর্ধমানের অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়।

মহর্ষির আশা ছিল, শান্তিনিকেতন নির্জন সাধনকামীদের আশ্রম হবে। তাঁদের উপাসনার জন্যে ১৮৯০ সালে এখানে মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল —এ-কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। ১৮৪৩ সালের ৭ই পৌষ তাঁর 'ব্রাহ্মধর্মব্রত' গ্রহণ করার দিনটি স্মরণীয় করে রাখার জন্যে ৭ই পৌষে মন্দির প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করেন। তখনই আশ্রমের বার্ষিক উৎসবের জন্যেও এই দিনটি নির্দিষ্ট হয় এবং পরে মেলা প্রবর্তিত হয়। মহর্ষির অভিপ্রেত উপাসনা, স্বাধ্যায়, পাঠ, ব্রহ্মসঙ্গীতাদি-মুখরিত আশ্রম এখানে প্রায় দশ বৎসর চলেছিল। কিন্তু 'শান্তিনিকেতন'

যে উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়েছিল নানা কারণে সে সফল হলো না। ব্রহ্মনামকীর্তনে মুখর, সন্ধ্যাদীপসজ্জার আলোকোৎসবের ঔজ্জ্বল্য ক্রমে ম্লান হয়ে এলো।—

মাঝে মাঝে মহর্ষি'র পুত্র কন্যা জামাতা পৌত্র দৌহিত্রের মধ্যে কেউ কেউ 'শান্তিনিকেতনে' এসে স্থান পরিবর্তন করে যেতেন। এর মধ্যে ১৮৯৭ সনে মহর্ষি'র পৌত্র বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনে একটি 'ব্রহ্মবিদ্যালয়' স্থাপনের পরিকল্পনা করেন। পাঠকের স্মরণ থাকতে পারে, বলেন্দ্রনাথ একদা 'দিল্লীর চিত্রশালিকা', 'হিন্দুর দেবদেবী' ইত্যাদি প্রবন্ধ লিখে অবনীন্দ্রনাথ ও পরে নন্দলালদের ভারতশিল্প-সৃষ্টির প্রেরণার উৎস খুলে দিয়েছিলেন। মহর্ষি বলেন্দ্রনাথকে তাঁর মহৎ পরিকল্পনা কার্যকর করার জন্যে অনুমতি দান করেন। একেশ্বরবাদ দেশে প্রচার করতে হলে তার শিক্ষার জন্যে উপযুক্ত কেন্দ্র স্থাপনের প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্যে বলেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে 'ব্রহ্মবিদ্যালয়' স্থাপনের ব্যবস্থা করলেন। নিয়মাবলীর খসড়া প্রস্তুত হলো। ব্রাহ্মধর্মানুমোদিত শিক্ষাপ্রণালী অনুসারে বিদ্যালয়ের কাজ চলবে। অবশ্যপাঠ্য পুস্তক ছিল 'পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম', মূল 'ব্রাহ্মধর্ম' আর 'ব্রাহ্মধর্মে'র ব্যাখ্যান'। বিদ্যালয়ের জন্যে বলেন্দ্রনাথ একতলা ঘর তৈরি করালেন, —সেটি বর্তমানে শান্তিনিকেতনে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের অন্তর্গত সামনের তিনখানি ঘর আর বারান্দা। 'রবীন্দ্রজীবনী'কারের মতে, বলেন্দ্রনাথের এই 'ব্রহ্মবিদ্যালয়'-পরিকল্পনায় রবীন্দ্রনাথের কোনো যোগ ছিল না। ১৮৯৯ সালে বলেন্দ্রনাথের অকালমৃত্যু ঘটায় তাঁর আশা কার্যকর হয়নি।

এই ঘটনার দু'বছর পরে, ১৯০১ সালে মহর্ষির কনিষ্ঠ পুত্র কবি রবীন্দ্রনাথ বলেন্দ্রনাথের 'ব্রহ্মবিদ্যালয়ে'র পরিকল্পনাকে 'ব্রহ্মচর্যাশ্রমে' পরিণত করে, তাঁর আরব্ধ কাজটি ব্যাপকতর ক্ষেত্রে সফল করে তুললেন। ১৮৭০ সাল থেকে এই সময় পর্যন্ত কবি রবীন্দ্রনাথ বহুবার শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। ১৯০০ সালে আশ্রমের দশম বার্ষিক পৌষ উৎসবে মহর্ষির ইচ্ছানুসারে রবীন্দ্রনাথ আচার্যের কাজ করেন। ১৮৯৯ সালেও মন্দিরের আচার্যরূপে তিনি বেদী গ্রহণ করেছিলেন। তখন তাঁর ভাষণে যথাক্রমে 'ব্রহ্মোপনিষদ', 'ব্রহ্মমন্ত্র'ই প্রাধান্য লাভ করেছিল। এখানে 'বোর্ডিং স্কুল' বা আশ্রমবিদ্যালয় স্থাপনের

কথা তখনও কবি চিন্তা করেননি।

১৯০১ সালের গোড়ার দিকে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহের বাস তুলে দিয়ে কলকাতায় চলে আসেন। শিলাইদহের চেয়ে ভালো নির্জন জায়গায় বাস করার ইচ্ছা তখনই তাঁর জেগেছিল। এর মধ্যে শান্তিনিকেতনে এসে বাস করার বাসনা আর সেখানে আশ্রম-বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার সংকল্প তাঁর পিতাকে তিনি জানিয়ে থাকবেন। এই সময়ে প্রকাশিত তাঁর নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থ পিতাকে উৎসর্গ করেন। মহর্ষিও বুঝতে পারলেন, রবীন্দ্রই তাঁর আরব্ধ কাজ সম্পন্ন করবেন। মহর্ষির উৎসাহ ও আশীর্বাদ বহন করে রবীন্দ্রনাথ আশ্রম-বিদ্যালয় স্থাপনে উদ্যোগী হলেন। তখন তাঁর আর্থিক অবস্থা সচ্ছল নয়। তিনি জমিদারির মালিক নন। অপর শরিকদের মতো এস্টেট থেকে দু শো টাকা মাসহারা পেয়ে থাকেন মাত্র। কুষ্টিয়ার ব্যবসা নষ্ট হওয়ায় কাঁধে তাঁর প্রভূত ঋণের বোঝা। কবির খেয়ালে সকলেই বিরূপ। যাই হোক, মহর্ষির প্রতিষ্ঠিত আশ্রমে বলেন্দ্রনাথ 'ব্রহ্মবিদ্যালয়' স্থাপনের সংকল্প করেছিলেন; অবশেষে রবীন্দ্রনাথ উভয়ের মিলনে গড়লেন 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম'।

এই সময়ে আশ্রম-বিদ্যালয়ের আদর্শ সম্পর্কে বন্ধু জগদীশচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: 'শান্তিনিকেতনে আমি একটি বিদ্যালয় খুলিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছি। সেখানে ঠিক প্রাচীনকালের গুরুগৃহ-বাসের মত সমস্ত নিয়ম। বিলাসিতার নামগন্ধ থাকিবে না। —ধনী দরিদ্র সকলেই কঠিন ব্রহ্মচর্য না শিখিলে আমরা প্রকৃত হিন্দু হইতে পারিব না। অসংযত প্রবৃত্তি এবং বিলাসিতায় আমাদিগকে ভ্রষ্ট করিতেছে —দারিদ্র্যকে সহজে গ্রহণ করিতে পারিতেছি না বলিয়াই সকল প্রকার দৈন্যে আমাদিগকে পরাভূত করিতেছে।' সমকালে ত্রিপুরার মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেবমাণিক্যকে লিখেছিলেন: 'আমি ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মচর্যের প্রাচীন আদর্শে আমার ছাত্রদিগকে নির্জনে নিরুদ্বেগে পবিত্র নির্মলভাবে মানুষ করিয়া তুলিতে চাই —তাহাদিগকে সর্বপ্রকার বিলাতী বিলাস ও বিলাতের অন্ধমোহ হইতে দূরে রাখিয়া ভারতবর্ষের গ্লানিহীন পবিত্র দারিদ্র্যে দীক্ষিত করিতে চাই। তুমিও বাহিরে না হৌক অন্তরে সেই দীক্ষা গ্রহণ কর। মনে দৃঢ়রূপে জান যে, দারিদ্র্যে অপমান নাই, কৌপিনেও লজ্জা নাই, চৌকি টেবিল প্রভৃতি

আসবাবের অভাবে লেশমাত্র অসভ্যতা নাই। যাহারা ধনসম্পদ বাণিজ্য ব্যবসায় আসবাব আয়োজনের প্রাচুর্য যে সভ্যতার লক্ষণ বলিয়া প্রচার করে তাহারা বর্বরতাকেই সভ্যতা বলিয়া স্পর্ধা করে। শান্তিতে সন্তোষে মঙ্গলে ক্ষমায় জ্ঞানে ধ্যানেই সভ্যতা; সহিষ্ণু হইয়া, সংযত হইয়া, পবিত্র হইয়া, আপনার মধ্যে আপনি সমাহিত হইয়া বাহিরের সমস্ত কলরব ও আকর্ষণকে তুচ্ছ করিয়া দিয়া পরিপূর্ণ শ্রদ্ধার সহিত একাগ্র সাধনার দ্বারা পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীনতম দেশের সন্তান হইতে, প্রথমতম সভ্যতার অধিকারী হইতে, পরমতম বন্ধন-মুক্তির আনন্দ লাভ করিতে প্রস্তুত হও।······বিদেশী ম্লেচ্ছতাকে বরণ করা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয় ইহা হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিয়ো। 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয় পরধর্ম ভয়াবহ'।' —কবি রবীন্দ্রনাথের মনে ছিল: বর্ণাশ্রমের আদর্শে সমস্ত জীবনকে ধর্মলাভের উপায়স্বরূপ করে তোলা যায় —বাল্যে গুরু-গৃহবাস আর ব্রহ্মচর্যপালনের দ্বারা জীবনের সুর বাঁধা, সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে একান্তভাবে মিলে বেড়ে ওঠা,···যৌবনে সংসারে প্রবেশ ও মঙ্গলসাধন, বার্ধক্যে সংসারবন্ধনকে মোচন করে অধ্যাত্মলোকের জন্যে প্রস্তুত হওয়া, বনবাস ও শিক্ষাদান। —এইভাবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর আশ্রমবিদ্যালয় গড়ে তোলবার জন্যে প্রাচীন ভারতের আদর্শে রূপকল্পনায় এবং তদনুরূপ রূপদানে মগ্ন হলেন।

শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপিত হলে রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীদের যে উপদেশ দিয়েছিলেন তাতে তাঁর সেই সময়ের সামাজিক ও ধর্মীয় মনোভাব সুস্পষ্ট: 'গুরুকে সর্বতোভাবে শ্রদ্ধা করবে, মনে বাক্যে কাজে তাঁকে লেশমাত্র অবজ্ঞা করবে না। শরীরকে পবিত্র করে রাখবে।··· 'আজ থেকে তোমাদের ব্রহ্মব্রত। এক ব্রহ্ম তোমাদের অন্তরে বাহিরে সর্বদা সকল স্থানেই আছেন।···প্রত্যহ অন্তত একবার তাঁকে চিন্তা করবে। তাঁকে চিন্তা করবার মন্ত্র আমাদের বেদে আছে। এই মন্ত্র আমাদের ঋষিরা দ্বিজেরা প্রত্যহ উচ্চারণ করে জগদীশ্বরের সম্মুখে দণ্ডায়মান হতেন। সেই মন্ত্র, হে সৌম্য, তুমিও আমার সঙ্গে সঙ্গে একবার উচ্চারণ কর।' —এর পরে তিনি গায়ত্রী-মন্ত্রের ব্যাখ্যা করেছিলেন। ধর্মসাধনার জন্যে গায়ত্রী-মন্ত্রের ওপর কবির শ্রদ্ধা অপরিসীম। এই বিষয়ে তিনি রামমোহন ও মহর্ষির আধ্যাত্মিক সাধনার

উত্তরাধিকারী। তাঁর স্থাপিত আশ্রম-বিদ্যালয়ে তিনি যে আদর্শে শিক্ষাদান করতে চেয়েছিলেন সে হলো, প্রাচীন ভারতের সঙ্গে বর্তমানকে সংযুক্ত করে দেশকে বড়ো করে তোলা।

ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আদর্শে সকালে ও সন্ধ্যায় ছাত্রদিগকে গায়ত্রী-মন্ত্র ব্যাখ্যা করে ধ্যানের জন্যে দেওয়া হতো। উপাসনার সময়ে কাষায় বস্ত্র পরে, দেহে মনে শুচি হয়ে একান্তে বসতে হতো। উপাসনার শেষে, এখনকার কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের মধ্যে বলেন্দ্রনাথের নির্মিত হল-ঘরটিতে ছাত্রেরা সমবেত হয়ে বেদমন্ত্র গাইত। এই সমবেত উপাসনা-প্রথা এখনও (১৯৬৬) চলছে। উপাসনার পরে ছাত্রেরা অধ্যাপকদের পদধূলি নিয়ে প্রণাম করে বনছায়াতলে গিয়ে পাঠ আরম্ভ করতো। —এইভাবে ১৯০১ সালে পূজার ছুটির পরে, বর্তমান বিশ্বভারতীর বীজ উপ্ত হলো। —অতঃপর এর ক্রমবিকাশের ও রূপান্তরের ইতিহাস আমাদের আলোচনার এক্তিয়ারভুক্ত নয়।

॥ নন্দলালের দৃষ্টিতে নিচু বাঙ্গালায় দ্বিজেন্দ্রনাথ, ১৯১৪-২৬ ॥

'শান্তিনিকেতনে এসে আমি যখন তাঁকে দেখি তখন তিনি খুব বৃদ্ধ। তাঁকে প্রথমে দেখেছি ১৯১৪ সালে এখানে আমার অভিনন্দনের সময়ে। তখন নিচু-বাঙ্গালায় গিয়ে আমি তাঁকে প্রণাম জানিয়ে এসেছিলুম। সতের থেকে কুড়ি সাল পর্যন্ত আমি শান্তিনিকেতনে আনাগোনা করেছি কলকাতা থেকে। তার আগে তিনি আশ্রমে বেড়াতেন পায়ে হেঁটে। ১৯২৬ সালে তাঁর মৃত্যুর দু'তিন বছর আগে পর্যন্ত বেড়াতে বের হতেন তিনি। তবে, আমি এসে যখন দেখলুম, তখন তিনি রিক্‌শয় করে বেড়াতেন। সে রিক্‌শ টানতো একজন লোক। পুরাতন ভৃত্য মুনীশ্বর সব সময়ে থাকতো তাঁর কাছে কাছে।

'বৈকালের দিকে 'দেহলী'র নিচে-তলায় প্রায়ই এসে বসতেন তিনি। 'দেহলী'বাড়ির ওপর-তলায় থাকতেন গুরুদেব। দিনুবাবুর বাড়িতে আমাদের চা-চক্রেও মাঝে মাঝে তিনি এসে বসতেন। একদিন তাঁর চা-চক্রে এসে বসার কথা আমার মনে আছে। রিক্‌শয় চড়ে আস্তে

আস্তে এলেন তিনি। ধরে ধরে ধীরে ধীরে তঁাকে নামালে মুনীশ্বর। বসতে চেয়ার দেওয়া হলো। তিনি স্থির হয়ে বসলেন। তখন বৈশাখ মাস। আগের দিন কালবৈশাখী হয়ে গেছে। ঝড়ে নানা ক্ষতি করেছে আশ্রমের। আশ্রমের 'সর্বাধ্যক্ষ' তখন জগদানন্দবাবু। সেই সময়ে তিনিও উপস্থিত আমাদের সেই চায়ের মজলিসে। কথায় কথায় আশ্রমের ক্ষতির কথা উঠলো। সব শুনে 'বড়োবাবুমশায়' বললেন, —দেখ জগদানন্দ, একটা কাজ কর। আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে। —আশ্রমে ঝড় হয়ে সব নষ্ট করে দিচ্ছে; আর জলেরও বড়ো অভাব। আশ্রমের চারদিকে একটা 'ডিচ্' খেঁাড়। তাতে জল থাকবে আর মাটির উঁচু পাড়ে ঝড়ও আটক হবে। —এই বলেই তিনি হো হো করে খুব জোরে হাসতে লাগলেন। কত টাকা যে লাগবে সেই ডিচ্ খুঁড়তে আর চীনের পাঁচীর তৈরি করতে, তা বোধহয় তঁার খেয়ালই হয়নি। আর সে টাকাই বা আসবে কোথা থেকে। সে সব তুচ্ছ ব্যাপার তাঁর মনেই আসেনি। তাছাড়া, খোয়াইএ খেঁাড়া ডিচে জল থাকবে কিনা, ডিচের মাটীর পাড়ে সত্যিই ঝড় আটকানো সম্ভব কিনা —সে কথাই বা তাঁকে বুঝিয়ে বলবে কে। তাঁর আইডিয়াই যে অনন্য।

'একদিন বড়োবাবু আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। আমি গেলুম। যেতেই তিনি বললেন, —'এই একটা এঁকেছি, দ্যাখ।' ব্যাপারটা হচ্ছে এই: ইলেকট্রিক আলোর বাল্ব্ জ্বলে। তা থেকে আলো আর হীট্ দুই-ই পাওয়া যায়। অথচ, আমরা মাত্র আলোটা ব্যবহার করছি; আর হীট্-টা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। —এখন বড়োবাবুমশায়ের আইডিয়া হচ্ছে এই: একটা রিং-এর ডঁাটি দেওয়ালে গাড়া থাকবে। আংটাটা থাকবে একটা বাল্বের ঠিক ওপরে। সেই আংটায় কেটলি বসিয়ে চা-এর জল গরম করা যাবে। —এই আইডিয়া থেকে এরই ছবি তিনি এঁকেছেন। —দেখালেন আমাকে। তাঁর অঁাকা স্কেচ্ আমি দেখলুম। দেখে, আরও ভালো করে এঁকে দিলুম। আমার স্কেচটি দেখেই তিনি বলে উঠলেন, —'এই দ্যাখ, ঠিক হয়েছে। আর্টিস্ট না-হলে এমন অঁাকা হয়।' —এই বলে তিনি খুব আনন্দ করতে লাগলেন।

'নিচু-বাঙ্গলা বাড়ির সামনের বারাণ্ডায় বসে থাকতেন হেলানো

চেয়ারে। আমরা গেলেই ডাক দিতেন মুনীশ্বরকে। 'আসছি' বলে সাড়া দিতো মুনীশ্বর। 'আমার খাতাটা দাও' বলতেন তাকে বড়োবাবু। ঠিক্ খাতাটি এসে পৌঁছতো হাতে। কখন্ কোন্ খাতার দরকার সে-সব জানতো মুনীশ্বর।

'বড়োবাবুর পায়ে আঁটা থাকতো মোটা মোজা। ইজেরের শেষপ্রান্ত ঢুকিয়ে দিতেন মোজার ভেতর। আর জোড়-মুখটায় থাকতো ন্যাকড়ার ফালি বাঁধা। জামার হাতাতেও ফালি জড়িয়ে টেনে বাঁধা থাকতো। মলিদার জোব্বা পরতেন —শালের মতো কাজ করা। পা দু'টি তুলে ইজিচেয়ারে শুয়ে থাকতেন। সাদা ধবধবে রং, সাদা গোঁফ দাড়ি আর বার্ধক্যের স্থিতপ্রজ্ঞ প্রশান্তিতে তাঁকে দেখে মনে হতো, এই তো তপোবনের ঋষি।

'যখন খেতে বসতেন, ডাকতেন মুনীশ্বরের ছেলেদের। ওদের নিয়ে খেতেন তিনি এক-পাতেই। খাবার তুলে দিতেন ওদের মুখে। সাহস পেয়ে কাঠবেরালি, পাক-পোকালিও অসঙ্কোচে ঘেঁষে এসে ঠোকর মারতো তাঁর গায়ে। —এমনি মহাপুরুষের ভাব হয়ে গিয়েছিল মহামতি দ্বিজেন্দ্রনাথের।

'আমি প্রত্যহ সকালে বিকেলে যেতুম নিচুবাঙ্গালায় তাঁকে প্রণাম করে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। তাঁকে দেখলে, মন্দিরে ঠাকুর দেখার মতন ভাব হতো আমার। দ্বিজেন্দ্রনাথকে ছেড়ে আমি তখন শান্তিনিকেতন-আশ্রমের কথা ভাবতে পারতুম না। আর আমাকে দেখলেই তিনি হুকুম করতেন: 'দাও মুনীশ্বর, এঁকে বাদামের শরবত দাও।' কোনও দিন বা হুকুম হতো: 'বেদানার শরবত দাও'।

'একদিন সহসা খোঁজ পড়লো, ফাউন্‌টেন্‌পেন্‌টা হারিয়ে গেছে। অস্থির হয়ে পড়লেন তিনি ছেলেমানুষের মতন, —'কি করে লিখবো।' ঘরে কোথাও রাখা আছে ঠিক্, আমি বললুম। অনেক খোঁজাখুঁজি করা হলো। কোথাও পাওয়া গেল না। শেষে হঠাৎ মুনীশ্বর বললে, —'আরে, কলম যে আপনার কানে গোঁজা।' 'ও, তাই, ভুলে গেছি।' —বললেন তিনি হাসতে হাসতে। এমনি ভোলামহেশ্বর ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ।

'একদিন আমি বড়োবাবুর কাছে বসে আছি। তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন, —'আচ্ছা', লুচি কেন জলে ভাজা যাবে না।' —তাঁর কথা

শুনে আমি চিন্তিত হয়ে ভাবতে লাগলুম। দ্বিপুবাবু তখন নিচুবাঙ্গালায় থাকতেন। তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী শ্রীমতী হেমলতা দেবী তখন শ্বশুর-মশায়ের দেখাশোনা করতেন। তাঁকে সামনে দেখতে পেয়ে বড়োবাবু বললেন, —'বউমা, তুমি জলেতে লুচি ভাজো দেখি।' কথাটা শুনে বউমাও চিন্তিত। তাঁর রকম-সকম দেখে শ্বশুরমশায় বললেন, —'তুমি ভেজেই দ্যাখ না; এক্স্‌পেরিমেণ্ট্‌ করতে ভয় পাও কেন। বাঙ্গালীরা নতুন এক্স্‌পেরিমেণ্ট্‌ করতেই ভয় পায়।' ...এর পরে কিছু দিন যায়। একদিন বড়োবাবু বাথরুম থেকে সোজা উঠোন পার হয়ে সহসা রান্নাঘরে গিয়ে হাজির। 'ভাজছো? —ভালো।' —বলেই শিশুর মতন তিনি উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। রান্নায় ব্যস্ত বউমা তাঁর, অবাক হয়ে দেখলেন, তাঁর আপনভোলা শ্বশুরমশায় একান্ত ঔৎসুক্যবশতঃ রান্নাঘরে এসে পড়েছেন সোজা বাথরুম থেকে। তাঁর স্নান সারা হয়েছে। জোব্বাটা প'রে আছেন। ইজেরটা তখনও পরা হয়নি।

'জলে লুচি সত্যিই ভাজা যায়। কবিরাজী লুচি। সে রোগীর পথ্য। কড়াইয়ে খুব ফুটন্ত জলে বেলা-লুচি ছেড়ে দিয়ে খানিক বাদে ফুলে উঠলেই ছানতায় করে সেটা তুলে নিতে হবে। বউমাকে বলে ভাজিয়ে দেখে নিয়ো।

'নগেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী ছিলেন রথীন্দ্রনাথের মামা। একদিন নগেনবাবু আমাকে বললেন, তিনি বড়োবাবুর সঙ্গে দেখা করবেন, আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। আমার সঙ্কোচ দেখে 'মামাবাবু' বললেন, —না, আপনাকে নিয়ে যেতেই হবে; আমাকে তিনি আত্মীয় বলে চিনতেই পারবেন না; আপনি সঙ্গে চলুন।' নিয়ে গেলুম তাঁকে। পরিচয় দিলুম ওঁদের আত্মীয়তার। —'রথীবাবুর মামা? সে আবার কে?' —পাল্টা প্রশ্ন হলো শিশুর ঔৎসুক্যে। আমি বললুম, —ইনি আপনাদের শিলাইদয়ে জমিদারিতে কাজ করতেন। —'ও, হাঁ, হাঁ, তাই বলো। এবার মনে পড়েছে।'—কিন্তু আসল আত্মীয়-সম্পর্কের কথাটা তাঁর মনেই পড়লো না। শিলাইদহের জমিদারিতে কাজ করতেন, বলতে, তবেই তিনি 'মামাবাবু'কে খানিকটা চিনতে পারলেন।

'শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক মৌলনা জিয়াউদ্দীন বড়ো প্রিয় ছিলেন

বড়োবাবুর। জিয়াউদ্দীন সাহেব দেখা করতে গেলে ওঁরা বসে বসে অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করতেন। বড়োবাবু তাঁকে অনেক শিক্ষা আর উপদেশ দিতেন অন্তরঙ্গভাবে। ওঁদের মধ্যে মুসলমানদের সম্পর্কেও নানা কথা হতো। একদিন কোরান সম্পর্কে কথা হচ্ছে। জিয়াউদ্দীন বললেন, —'আমি ও-সব জানি'। বড়োবাবু শুনে অবাক্ হয়ে বললেন, —'তুমি? তুমি এ-সব জানলে কি করে?' —'আমি যে মুসলমান'। —'তুমি মুসলমান? তা', আমাকে তো বলোনি এতোদিন।' —এ হলো বড়োবাবুর সঙ্গে প্রথম আলাপের দু-বছর পরের ঘটনা। জিয়াউদ্দীন আমাকে বলেন আর হাসেন।

'এ্যাণ্ড্রুজ সাহেব শান্তিনিকেতনে থাকলে প্রত্যহ প্রণাম করে আসতেন 'বড়োদাদা'কে। ওদিকে বৃটিশের ওপর বড়োদাদার মনে ছিল বেজায় রাগ। কারণ, ঐ সময়ে রাজা-প্রজার সম্পর্কে বৃটিশের ব্যবহারে অনেক গোলযোগ প্রকাশ পেয়েছিল। ফলে, 'বড়োদাদা' করতেন কি, এ্যাণ্ড্রুজ সাহেবকে সামনে দেখলেই এক চোট্ বকে নিতেন, —যেন তিনিই বৃটিশের প্রতীক, এই ভেবে। এ্যাণ্ড্রুজ সাহেব বড়োবাবুর এই কাণ্ড আমাদের কাছে বলতেন আর হাসতেন খুব, —'আমি যেন বৃটিশ রিপ্রেজেণ্ট্ করছি।' বড়োবাবু খুব ভালোবাসতেন এ্যাণ্ড্রুজ সাহেবকে।

'সিলভাঁ লেভী এলেন (১৯২১) শান্তিনিকেতনে। বিশ্বভারতীর দ্বিতীয় বর্ষে (১৯২২) এসেছিলেন উইন্টারনিট্জ্, লেসনী ও আরো অনেকে। বিদেশী সংস্কৃত পণ্ডিত এলেন এখানে তখন সেই প্রথম। বড়োবাবুর কানে গেল এঁদের কথা। শুনে তিনি বললেন, —'এই দ্যাখ, রবির কী কাণ্ড, নিজের দেশের বড়ো বড়ো সংস্কৃত পণ্ডিত থাকতে, সংস্কৃত শেখাবার জন্যে বিদেশ থেকে সংস্কৃত পণ্ডিত আনা হলো—।' এই ভুলের জন্যে রবিকে ডেকে বকলেন বড়োদাদা। যখন বকুনি দিচ্ছেন, চুপ করে ঘাড় হেঁট করে শুনছেন ছোটভাই রবি। বড়োদাদা বলছেন, —'রবি, তুমি ভুল করেছ এটা।' আর রবি শান্ত খোকাটির মতন চুপটি করে সে বকুনি শুনেছিলেন মাত্র। কোন প্রতিবাদ করেননি বড়োদাদার কোনও কথার। কোনও যুক্তিও দেখাতে চেষ্টা করেননি: ওরা সায়েন্টিফিক্ ওয়েতে শেখাবে; এঁরা জানেন অনেক, তবে শেখাবার

পদ্ধতি জানেন না। —এই রকম সব তর্কের কথা অতো বড়ো ক্ল্যাসিক্যাল্ মনের সামনে বলতে সাহস হলো না রবির।

'জার্মান অধ্যাপক উইন্‌টার্‌নিট্‌জের চেক্ শিষ্য ছিলেন অধ্যাপক লেস্‌নী। উভয়েই প্রাচ্যবিদ্যায় সুপণ্ডিত আর প্রগাঢ় রবীন্দ্রভক্ত। লেস্‌নী প্রাগ্ থেকে শান্তিনিকেতনে এসে (১৯২২) বাঙ্গালা শিখে ফেললেন দু-মাসে। গুরুদেবের অনেক বই অনুবাদ করে ফেললেন হাঙ্গেরীয়ান ভাষায়। ঋষিতুল্য লোক ছিলেন তিনি। কী সমীহ করতেন আমাদের! সে রকম সব লোক আর যেন হবে না।

'একবার শান্তিনিকেতনে একজন দার্শনিক এলেন। পাশ্চাত্য দর্শনে তিনি পণ্ডিত। বড়োবাবু দার্শনিক বলে তিনি দেখা করবেন ওঁর সঙ্গে। আমাকে ধরলেন, পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। আমি সঙ্গে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দিলুম। —'তুমি দার্শনিক? কি দর্শন পড়েছ?' প্রশ্ন করলেন বড়োবাবু। 'হেগেল পড়েছি, কাণ্ট্ পড়েছি।' —বললেন দার্শনিক। 'ভারতীয় দর্শন কি কি পড়েছ?' —জিজ্ঞাসা করলেন তিনি। উত্তরে দার্শনিক বললেন, —'না, ভারতীয় দর্শন এখনও কিছু পড়া হয়নি। তবে, ও-সব এইবারে পড়বো।' এ-কথা শুনে বড়োবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, —'এটাই বুঝলে না, তো ওটার কি বুঝবে? ভারতীয় দর্শন পড়ে তবে এসো আমার কাছে। আর দ্যাখ, এ-সব বই পড়ে হয় না, গুরুর কাছে শেখ গে।'

'একদিনের ঘটনা বেশ মনে আছে। আমি গেছি। তিনি কি একটা লিখেছেন রূপক দিয়ে। রূপকে লিখা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'আখ্যানমঞ্জরী'র মতন। দিলেন আমার হাতে, —'পড়ে দ্যাখ।' —পড়ছি বটে, কিন্তু কিছুই বুঝছি না। প্রত্যেকটাই রূপক আখ্যায়িকা। নৌকো, মানুষ —এই সবের ওপর লিখা। খাতার পাতা যতই ওল্টাই ততই আমি বিব্রত হয়ে পড়ি। ঘামে ভেতরের ফতুয়াটা শীতকালেও ভিজে উঠেছে। মাথা ঘুরছে বন্‌বন্ করে। বারান্দার এদিক্ ওদিক্ খানিক ঘুরে আমি গলা পরিষ্কার করে নিয়ে ঢোঁক গিলে বললুম, —আজ্ঞে, পরে পড়ে বুঝে দেখবো। তখনও আমার মাথা ঘুরছে। —হঠাৎ হুকুম হলো, —'দাও মুনীশ্বর, এঁকে এক গ্লাস শরবত

দাও।' —এই কথা শুনে, ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো তখন আমার।

'কাগজের বাক্স তৈরি করছেন তখন। তাঁর সেই বিদ্যে মুনীশ্বরও শিখেছিল। কাগজ না-জুড়ে, না-সেলাই করে, কেবল ভাঁজ করে করে বাক্স তৈরি করতেন তিনি। আমাদের অসিতকে তিনি কাগজের কলমদান তৈরি করে দিয়েছিলেন। আঁকের বুদ্ধি ঢের আছে ওর মধ্যে। বড়োবাবুর করা কাগজের বাক্স পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল বিলেতে। ওরা দেখে বলেছিল, —এই প্রোসেস্‌টা ঠিক্। তবে বহুৎ কষ্টসাধ্য। আমি বলি কি, আটা আর সেলাই-এ তো খরচা হয়ে যায় অনেক; সে-ক্ষেত্রে বড়োবাবুর এই প্রোসেস্‌টিকে "impractical বলে কাজে না-লাগানোর কোনও কারণ অন্ততঃ আমাদের দেশে থাকতে পারে না। —তাঁর তৈরি-করা কাগজের বাক্সের নমুনা রাখা আছে আমাদের কলাভবনে, দেখো। কাগজের বাক্স সম্পর্কে লেখাও আছে তাঁর। বাঙ্গালা শর্ট্‌হ্যাণ্ডের ওপরেও লেখা বই আছে তাঁর। বাঙ্গালা ভাষায় দ্বিত্ব-বর্জনের চেষ্টা তিনিই প্রথম করেছিলেন। বাঙ্গালায় গানের স্বরলিপি প্রথম তিনিই রচনা করেন [১৮৬৯]।

'সেকালের শান্তিনিকেতনের শিক্ষকদের নামে নামে মজার মজার কবিতা লিখে স্লিপ্‌ পাঠাতেন তিনি। যাঁকে যখন মনে পড়তো, তাঁকেই পাঠাতেন। আমাদের তেজুবাবু, দিনুবাবু, জগদানন্দবাবু প্রভৃতি অনেকের নামেই ছড়া কবিতা লেখা আছে তাঁর। আমাকে কিন্তু ছড়া লিখে পাঠাননি কখনও।

'বড়োবাবু শান্তিনিকেতনে থাকতে থাকতেই আমরা এখান থেকে গিয়ে বাগগুহার ছবির কপির কাজ সেরে ফিরে এলুম (১৯২১)। দ্বিপেন্দ্রনাথের ছেলে দিনেন্দ্রনাথও তখন থাকতেন এখানে। দিনুবাবু ছিলেন আমার সমবয়সী বন্ধুর মতন। তাঁকে আমাদের করা বাগগুহার ছবির কপি সব দেখাচ্ছিলুম। সে-সব হলো বৌদ্ধযুগের পেন্‌টিং। দিনুবাবু উৎসাহ করে সেই সব ছবি আবার দেখাতে লাগলেন তাঁর ঠাকুর্দা দ্বিজেন্দ্রনাথকে বড়োবাবু সে-সব ছবি দেখামাত্র বলে উঠলেন, —হাঁ, এই তো ভারতীয়

আর্ট। এই রকম সব ছবি করবে তোমরা।' —একটু থেমে আমাকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, —'আচ্ছা, আমাদের অবন কি করছে এখন?' —অবনবাবু তখন পাথরে কেটে বা মোমে ঢেলে ব্রোঞ্জে কাস্ট্ করছিলেন। তাঁর করা পাথরে কাটা ব্রোঞ্জের মূর্তি —দ্বিজেন্দ্রনাথের, আছে কলাভবনে। ঐ কাস্ট্ করার কথা বলতেই বড়োবাবু বললেন, —'ঐ দ্যাখ, আমাদের দেশের এই দোষ। ভালো আর্টিস্ট হতে-না-হতে আর-একটা ধরবে। অবন পেন্টিংটাই ভালো করে না-করে, না-শিখেই আবার স্কাল্প্চার করতে গেল। অবনের হয়ে গেছে। ইটালীয়ান্দের মতো মাস্টারপীস্ করো! তবে তো বুঝবো, হঁা।' —ইটালীয়ান্ পুরাতন কাল্চারের ওপর তাঁর ছিল অগাধ শ্রদ্ধা। জার্মান-সংস্কৃতির ওপরেও তাই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানী যখন লড়াইএ হেরে গেল, সে-সংবাদ শুনে বড়োবাবুর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়েছিল।

'আমার আঁকা ছবি আছে নেপালী কাগজের ওপর টেম্পেরা টাচের কাজ —'আশ্রমের দৃশ্য —নিচুবাঙ্গালায় দ্বিজেন্দ্রনাথ':— সামনের রাঙ্গামাটির রাস্তা থেকে যেমনটি দেখা যেত সেইভাবেই এঁকেছি। বোলপুরের রাস্তী লোক দূর থেকে তাঁকে নমস্কার জানিয়ে যেত। গাঁয়ের লোক তাঁকে নমস্কার জানাতো নানা কামনা পূরণ হবার আশায়। পরীক্ষায় পাশ, অসুখ-বিসুখ ভালো হওয়া, মামলা-মকদ্দমায় জয়লাভ করার বিশেষ আশায় তারা গাঁয়ের ঠাকুরতলায় যেমনভাবে প্রণাম জানিয়ে থাকে, ঠিক্ সেইভাবে।—ভাবতে আমার অবাক্ লাগে, বাঙ্গালাদেশের মাটির মানুষের হৃদয়-মন্দিরে আধুনিক তপোবনের মহাতাপস, সংসার-অনভিজ্ঞ, ঈশ্বরপরায়ণ এই নরদেবতাটির প্রকৃত স্বরূপ কি করে প্রতিষ্ঠিত হলো!

'ছবি এঁকে আমি ওঁকে দেখাইনি কখনও সাহস করে। আমার গুরু অবনীবাবুর সম্পর্কেই যখন বললেন,—'হয়ে গেছে ওর', তখন আমাদের আর কি ভরসা।

॥ দ্বিজেন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে শান্তিনিকেতন-সমাজ, ১৯১৯-২০ ॥

সেকালের শান্তিনিকেতন। মহৎ চরিত্রের আলোকে আকীর্ণ আশ্রম-সমাজ; যে-পরিবেশে আসতে পেরে শিল্পী নন্দলাল আন্তরিক আনন্দিত। আশ্রম-বিদ্যালয়ের সেই আদর্শ শিক্ষকদের চরিত্রগাথা দ্বিজেন্দ্রনাথের ভাষায় :—

শান্তিনিকেতন।
[সর্বস্থানসার]

শান্তি-নিকেতন যদি না-দেখিলে,
নয়ন তবে কী-কারণ ?
দেখিবার যত-যা আছে নিখিলে—
সবা'র শির-আভরণ ॥

[ভুবনডাঙ্গার উত্তরে সাহিত্যসাধক
দ্বিজেন্দ্রনাথের অবস্থিতি]

ডাঙ্গার রাজা গো ভুবন ডাঙ্গা
ধরে যারে শিখরে নিজ।
ভারতী-জননীর চরণে রাঙা
মজিয়া রহে যেথা দ্বিজ ॥

[অতন্দ্রনয়ন বিধুশেখর শাস্ত্রী,
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নেপালচন্দ্র রায়]

যেথায় বিধু রবি না জানি অস্ত,
জাগি থাকি জাগা'ন্ লোক।
নৃপাল, রাজকাজে স'পিয়া হস্ত
সব দিকে রাখেন চোখ ॥

[সন্ত-সাহিত্যের গোপালনন্দন
ক্ষিতিমোহন সেন]

অ্যাকা-নবরতন ক্ষিতি-মোহন,
ভকতি-রসের রসিক।
কবীর কাম-ধেনু করি দোহন
তোষেন তৃষিত পথিক ॥

[আদর্শ শিক্ষক বৈজ্ঞানিক
জগদানন্দ রায়]

জগদানন্দ বিলা'ন্ জ্ঞান,
গিলা'ন্ পুঁথি ঘর-জোড়া।
কাঁটাল গুলান্ কিলিয়ে পাকান্,
গাধা পিটি করেন ঘোড়া ॥

[রবীন্দ্রনাথের কর্মকর্তা অক্লান্তকর্মী
রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

রবিরথের কী-যে সারথি, রথী
যেমন্ বীর, তেম্নি ধীর।
কোন কাজেই তাঁর নাহি বিরতি,
ভারতীর কিবা লক্ষীর ॥

[মধুকণ্ঠ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর]

দিনু দাদাজি'র কী কব কাহিনী—
বীণাপাণির সে যে শিষ্য !
উথলী উঠে যবে রাগ-রাগিণী,
পুথলী বনি' যায় বিশ্ব ॥

[সভাসদ্-পরিবৃত দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর]

করয়ে যেমতি দ্বিপযূথ-পতি
গহন বনে ঘোরা-ফেরা ;
সভায় দ্বিপ নৃপ রাজে তেমনি
বন্ধুবান্ধবে ঘেরা ॥

['বঙ্গীয় শব্দকোষ'কার হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়]

কোথা গো ডুব মেরে র'য়েছ তলে
হরিচরণ ! কোন্ গরজে ?
বুঝেছি ! শব্দ-অব্ধি-জলে
খুঁজিছ খুব্ অরথে !

[নির্মলচরিত্র, সদাসন্তুষ্ট সন্তোষচন্দ্র মজুমদার]

সন্তোষে নেহারিলে জুড়ায় আঁখি—
শিশু-সমান নিরদোষ !
কটু-ই বা কী মধুর-ই বা কী
সবতাতেই তাঁর তোষ !

[অশেষগুণসম্পন্ন দীন-দরদী কালীমোহন ঘোষ]

কালী-মোহনের অশেষ গুণ !
যে তাঁরে জানে —সেই জানে।
দীনদুখে হৃদয়ে জ্বলে আগুন !
অবিচার সহে না প্রাণে ॥

[পোকা-মাকড়ের গবেষক শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী]

সুধাকান্ত-টি পোকা'র কীট্ !
কীটানন্দ গো তিনি !
লোকে বলে আছয়ে বায়ুর ছীট—
আমি কিন্তু তাঁরে চিনি ॥

[সঙ্গীতের অধ্যাপক ভীমরাও শাস্ত্রী]

মহারাষ্ট্রীয় গুণী যুবক
'ভীমরাও' ধরেন নাম ।
সঙ্গীতের তিনি অধ্যাপক,
সরলমতি শুভকাম ॥

[তিনি দার্শনিক পণ্ডিতও বটেন]

বিশারদ নহেন গানে কেবল—
জ্ঞানেও দ্যান ডুব সাঁতার ।
বেদান্ত সাংখ্য পাতঞ্জল
নখদরপণে তাঁহার ॥

[দ্বিজেন্দ্রনাথের একান্তসচিব
শ্রীঅনিলকুমার মিত্র]

অনিল'কে এখনো পাওনি টের—
বাজারে বাজা'ব না ঢাক।
ডান-হাত বাঁ-হাত দ্বিজরাজের—
এই অবধি এবে থাক ॥

[আদর্শশিক্ষক শ্রীপ্রমোদারঞ্জন
ঘোষ]

শ্রীপ্রমদারঞ্জন থাকেন আড়ালে,
ইংরাজিতে সুনিপুণ।
পড়া'ন্ ছাত্র সকালে বিকালে,
কা'রো নহেন তিনি ন্যূন ॥

[গ্রন্থাগারিক শ্রীপ্রভাতকুমার
মুখোপাধ্যায়]

প্রভাতের মুখ সদা প্রফুল্ল,
পুঁথিশালার অধ্যক্ষ।
আগুলান্ নানান্ পুঁথি অমূল্য—
পোতা ধন যেমতি যক্ষ ॥

[আদর্শশিক্ষক ক্ষীণকায় নগেন্দ্রনাথ
আইচ]

নগেন্দ্র আইচ্ শান্ত শিষ্ট,
শিক্ষাদানে মজবুত।
দেহটার তরে —হায় অদৃষ্ট—
মন করে খুঁৎ খুঁৎ ॥

[শিক্ষক ও প্রেস-পতি উপেন্দ্রনাথ
দত্ত]

উপেন সঁপেন বিদ্যা-অন্ন
কচি-ছেলেদের মুখে
ছাপাখানার হ'য়ে পতি অনন্য
বিহরেন মনের সুখে ॥

[শিক্ষক ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
ঐ গৌরগোপাল ঘোষ
,, ঐ তেজেশচন্দ্র সেন
শিল্পী শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর ।]

ধী-মু গোরাচাঁদ বয়স কাঁচা,
সুরেন কর তেজেশ,
সবাই একেক্‌টি রতন সাঁচা ;
বাখানিয়া কে করে শেষ ॥

[দ্বিজ কবির বিনয় বচন]

দ্বিজের লেখনী আর-তো চলে না
বড্ড সে গো পরাধীনা।
চসিলে শুখা ভূমি ধান্য ফলে-না
দেবতার বরিষণ বিনা ॥

ইতি প্রথম স্তবক সমাপ্ত।

॥ শান্তিনিকেতন-আশ্রমের ট্রাস্টী দ্বিপেন্দ্রনাথ —নন্দলালের দৃষ্টিতে, ১৯১৯-২২ ॥

একব্রহ্মের উপাসনার উদ্দেশ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন-আশ্রম ট্রাস্ট্-ডীড্ করে উৎসর্গ করেছিলেন (খৃ. ১৮৮৮) যে তিন জনের নিকট, তাঁর জ্যেষ্ঠ পৌত্র দ্বিপেন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁদের অন্যতম। মহর্ষির অল্পায়ু আর-এক পৌত্র বলেন্দ্রনাথ মহর্ষির অনুমতি নিয়ে ১৮৯৭ সালে শান্তিনিকেতন-আশ্রমে 'ব্রহ্মবিদ্যালয়' চালাতে চেয়েছিলেন। বলেন্দ্রনাথের অকালমৃত্যুর পরে, ১৯০১ সালে মহর্ষির কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন-আশ্রমের ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ভিত্তিতে 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম' স্থাপন করলেন। তাঁর এই 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম' হলো 'বোর্ডিং স্কুল' বা আশ্রমবিদ্যালয়। কবির এই আশ্রমবিদ্যালয় কেবল একব্রহ্মের উপাসনার জন্যে স্থাপিত হয়নি; তিনি এখানে গায়ত্রী-মন্ত্রের নির্যাস বিশ্ববোধের সাধনা প্রচার করতে চেয়েছিলেন। এখানে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সর্বধর্মসার-বিদ্যার বীজ বপন করবার। ফলতঃ কবি তাঁর পূর্বগামীদের 'একব্রহ্ম'-চিন্তার গণ্ডী প্রসারিত করে, জাতিধর্মনির্বিশেষে বিশ্ববাসীর জন্যে তাঁর বিদ্যালয়ের দ্বার উন্মুক্ত রাখতে চেয়েছিলেন। মহর্ষির বা বলেন্দ্রনাথের 'ব্রাহ্ম'-মার্গ থেকে বিচ্যুত হওয়ার ফলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নবপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের নাম 'শান্তিনিকেতন' মূল আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত রাখতে পারেননি। তাঁর বিদ্যালয়ের নাম দিতে হয়েছিল 'বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রম'। 'শান্তিনিকেতন-আশ্রমে'র চেয়ে প্রাচীনতর ও প্রসিদ্ধতর স্থানীয় গ্রাম 'বোলপুরে'র নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কবির বিদ্যালয় তখন পরিচিত হয়েছিল। পরে, ক্রমে ক্রমে বোলপুরের দূরত্ব ও শান্তিনিকেতনের স্থানীয় মাহাত্ম্য হেতু কবির বিদ্যালয় 'শান্তিনিকেতন'-আশ্রমবিদ্যালয় রূপে খ্যাত হতে থাকে ১৯১৯-২১ সালে 'বিশ্বভারতী' প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত। এর পর থেকে হলো 'বিশ্বভারতী', শান্তিনিকেতন। আশ্রম-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবার পরে, প্রথম দিকে আর্থিক দুর্দিনে কোষাধ্যক্ষ দ্বিপেন্দ্রনাথের শক্ত হাতে পরিচালনার নানা ভার ছিল বহুকাল। সকলেই সম্ভ্রম করতেন তাঁকে।

দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথকে শান্তিনিকেতন-আশ্রমের রাজা ('দ্বিপ নৃপ') বলেছিলেন। এ তাঁর যথার্থ উক্তি। মহর্ষি দেহরক্ষা করেন ১৯০৫ সালে। ১৯০৬ সালে দ্বিজেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে নিচুবাঙ্গালায় এসে বাস করতে লাগলেন। ঐ একই সালে দ্বিপেন্দ্রনাথ 'শান্তিনিকেতন'-ইমারতের একতলা অধিকার করে বসবাস শুরু করে দিলেন। পরে তিনি অশক্ত হয়ে পড়লে, নিচুবাঙ্গালায় তাঁর পিতার ও তাঁর স্ত্রীর কাছে এসে থাকেন ১৯২০ সালে। ১৯২২ সালে তাঁর জীবনান্ত হয় নিচুবাঙ্গালাতেই।

নন্দলাল বলেন, —'দ্বিজেন্দ্রনাথের অর্থাৎ বড়োবাবুমশায়ের বড়ো ছেলে হলেন দ্বিপেন্দ্রনাথ বা দ্বিপুবাবু। তিনি আগে থাকতেন 'শান্তিনিকেতন'-বাড়ির একতলায়; এখন (১৯৪৭) সব বাড়িটাই গেস্ট-হাউস হয়েছে। উত্তর দিকের উঠোন থেকে উঠেই নিচে-তলায় সামনে যে-ঘরটা সেই ঘরের বারান্দায় আমি তাঁকে প্রথম দেখেছিলুম। চাকর-বাকর ছিল তাঁর পাঁচ-ছ জন। তবে, তারা ঠিক্ 'চাকর' পর্যায়ে পড়ে না; হুজুর মালিকের আজ্ঞাবাহী মোসাহেব। আমাদের বিমলের বাবা শ্যাম ভট্টাচার্য-টট্টাচার্যের মতন কাছাকাছি গাঁয়ের লোক ছিল ঐ দলে। সব সময়ে থাকতো তারা চার পাশে। ফাই-ফরমাশ খাটতো। আর নেপাল বাবু, ক্ষিতি বাবু, জগদানন্দবাবুর মতন বিদ্যালয়ের দু-তিন জন শিক্ষক ছাড়া, প্রায় তাদের নিয়েই সারাদিন তাঁর মজলিস জমতো। কাছাকাছি বোলপুরের দেবরাজ মুখোপাধ্যায়, হরিপ্রসাদ বসু, হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র সেনগুপ্ত এই রকম বিশিষ্ট ব্যক্তি দু চার জন বাদে, বাইরের লোকের সঙ্গে বেশি মিশতেন না দ্বিপুবাবু। সুরুলের কার্তিক সরকারমশায়ের সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল তাঁর। সেই সূত্রে কার্তিকবাবুর সঙ্গে আমারও পরিচয় হয়। কার্তিকবাবু দ্বিপুবাবুর মার্ফৎ তাঁর 'গায়ত্রী' নাটকের জন্যে ছবি করে দিতে আমাকে অনুরোধ করেন। আমি এঁকে দিয়েছিলুম 'ধূলায় লুণ্ঠিতা অবস্থায়, শক্তি দেবীর মূর্ছা', 'হরিমতি সমাধিমগ্না' (১৯২১); 'শান্তিনিকেতন প্রেস' থেকে সে বই জগদানন্দ বাবু ছাপিয়েছিলেন ১৩২৯ সালে।

'বিরাট চেহারা ছিল দ্বিপুবাবুর। সেই শরীর তাঁর পুত্র

দিনুবাবুও পেয়েছিলেন। দ্বিপুবাবু তাঁর আস্তানায় বসে আলবোলায় অম্বুরী তামাক খেতে খেতে তাস খেলাতেন ঐ মোসাহেবদের সঙ্গেই। সেকালের অভিজাত জমিদারি দস্তুরমতো অন্য অনুপানও চলতো। তাঁর জুড়িগাড়িতে চড়ে বোলপুরে উকীলপট্টিতে প্রত্যহ যেতেন বৈকালে। ওখানেও জোর বৈঠক বসতো। আমাদের গুরুদেব যখন কলকাতা যেতেন অনেক সময়ে তাঁকে দ্বিপুবাবুর জুড়িগাড়িতে সঙ্গী হতে হতো অনিচ্ছাসত্ত্বেও। দ্বিপুবাবুর 'uncle' রবীন্দ্রনাথ বয়সে তাঁর চেয়ে মাত্র এক বছরের বড়ো ছিলেন।

'চাকরে দ্বিপুবাবুর খাবার আনতো নিচুবাঙ্গালার বাড়ি থেকে। সে খাবার তৈরি করে দিতেন তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী শ্রীমতী হেমলতা দেবী। ইনি হচ্ছেন আবার দ্বিপুবাবুর সহোদরা সরোজা-দেবীর আপন ননদ। সরোজা দেবী হলেন মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী। বদল-সম্বন্ধে ওঁদের বিবাহ হয়েছিল। সরোজা দেবী আমাদের তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের মা।

'দ্বিপুবাবুর খাবার নিয়ে আসতো নিচুবাঙ্গালা থেকে তাঁর 'বয়' চাকর রামেশ্বর ; পরে, দিনুবাবুর চাকর —কেদার। খাবার আনতে আনতে রাস্তায় কেদার দেদার বরবাদ করে ফেলতো, নানা মিষ্ট সুগন্ধে আকৃষ্ট হয়ে লোভ সামলাতে না পেরে। বাবুদের ঐ রকম সব পেয়ারের চাকরেরা প্রভুর প্রসাদ পেয়ে থাকে প্রচুর। অথচ. চুষে, খেয়ে প্রভুদের খাবার খতম্ করে দেয় নিবেদনের আগেই। 'জন, জামাই, ভাগনা, তিন নয় আপনা' —বাঙ্গালীর গেরস্তঘরে এই প্রবচনটা এসেছে বোধহয় এই সব কীর্তি দেখেই, কি বলো ?

'শেষদিকে 'শান্তিনিকেতন'-বাড়ির একতলার আবাস ছাড়তে হয় দ্বিপুবাবুকে। অবশ্য গুরুদেব তাঁকে পারতপক্ষে এ-বিষয়ে কিছু বলেননি। যাই হোক্, দ্বিপুবাবু নিচুবাঙ্গালার বাড়িতে এলেন। তখন তিনি অসুস্থ। তখনও আমার খোঁজ করতেন প্রায়ই। মাঝে মাঝে ডেকেও পাঠাতেন। সকলের খোঁজ নিতেন। আমার বাড়ির প্রত্যেকে কে কেমন আছে সমস্ত ঘরোয়া খবর নিতেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ! আমার বাড়িতে কার যেন অসুখ করেছে শুনে, একবার এক হাঁড়ি মাগুর মাছ পাঠিয়ে দিলেন রোগীর

পথ্যের জন্যে। এ ছাড়া, সরভাজা, পায়েস, ক্ষীর —এই রকম সব খাবারও আমার বাড়িতে পাঠিয়ে দিতেন মাঝে মাঝে। ডাব, ডালিম —এ সব পাঠাতেন অসুখে-বিসুখে। খুবই সামাজিক লোক ছিলেন তিনি —তাঁদের বংশ-মর্যাদার পরম্পরায়।

'আমাদের গৌরীর বিবাহের যখন সম্বন্ধের কথা হচ্ছে সে সময়কার ঘটনা বেশ মনে আছে। দ্বিপুবাবু একদিন জিজ্ঞাসা করলেন, —ক'ছেলে, ক'মেয়ে তোমার? ··তা', বড়ো মেয়েটির বিয়ে থা তো দিতে হবে এবার। ···সম্বন্ধ দেখছো? তা' তুমি দেখো, আমিও দেখবো।' ···দ্বিপুবাবু মারা গেলেন ১৯২২ সালে। তিনি বেঁচে থাকলে গৌরীর বিয়ের সময়ে (১৯২৭) আমাকে অনেক সাহায্য করতেন।

'দ্বিপুবাবু যখন মারা গেলেন, দ্বিজেন্দ্রনাথ তখনো বেঁচে। ওঁকে খবর দেওয়া হলো। শুনলেন চুপ করে। চঞ্চল তিনি হতেন না কোনো-কিছুতে। পুত্রশোকে কিন্তু তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো।

'দ্বিপুবাবুকে দাহ করা হলো আশ্রমের উত্তর দিকের খোয়াইয়ে। তাঁর চিতাভস্ম এনে রাখা হলো তাঁর হাতের আংটি আর পাঁচটি কাঁচা টাকা সমেত নিচুবাঙ্গালা-বাড়ির সামনেকার যে-অংশে দ্বিজেন্দ্রনাথ থাকতেন তার কাছেই দক্ষিণ দিকে 'আমানি ডোবার' কান্দরের ধারে —একটি পুরাতন বটগাছের তলায়। ওঁদের বাড়ির সকলের অনুরোধে আমি ডিজাইন করে তাঁর চিতার ওপরে একটি 'চৈত্য' তৈরি করে দিলুম। [সে চৈত্য আজও অটুট, কিন্তু অবহেলিত। 'বড়ো-মা' শান্তিনিকেতনে এলে এখনও সেখানে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালিয়ে দেন প্রত্যহ ভক্তিভরে। ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত এই চৈত্যটির প্রতি আচার্য নন্দলালের গভীর শ্রদ্ধা ও অসীম মমতা লক্ষ্য করেছি।]

'শান্তিনিকেতনে দ্বিপুবাবুর প্রধান কীর্তি হলো, মহর্ষির নির্দেশে উপাসনার জন্যে মন্দির-নির্মাণ, আর ছাতিমতলার বেদীর নবকলেবর দান। মন্দিরের সামনের নাটমন্দিরটি ছিল রথের বিমানের মতন। সেটি পরে সরিয়ে দেওয়া হয়। মন্দির ঢোকার দরজার দু'পাশে ছাতা-জুতো

রাখবার জন্যে, দুটো ঘর ছিল। তার সামনে দুটো থামে 'ব্রাহ্মধর্মের বীজ' লেখা ছিল। সে ঘর আর থাম ভেঙে, পাথরের ফলক দুটী গেটের সামনে দু'পাশে বসানো হয়। আর পরে ছাতিমতলার রূপান্তর করতে চাওয়া হয়েছিল বোধিবৃক্ষের বেদীর অনুকরণে। সে হয়েছে; তবে, সম্পূর্ণ হয়নি।

॥ নন্দলালের দৃষ্টিতে দিনেন্দ্রনাথ, ১৯১৪-৩৫ ॥

'দিনুবাবু হচ্ছেন দ্বিপুবাবুর প্রথম পক্ষের সন্তান। এঁর মা সুশীলা দেবী। দিনুবাবু ছিলেন আমাদের চ'-চক্রের অধিপতি। ১৯১৪ সালে আমি যখন শান্তিনিকেতনে আসি তিনি তখন থাকতেন 'প্রাক্‌কুটিরে'। আঠারো সালে এসে দেখলুম, তিনি আছেন 'দ্বারিকে'। গুরুদেবের গানের ইনি ছিলেন ভাণ্ডারী। তখন সঙ্গীতভবনের অধ্যক্ষ-টধ্যক্ষ —এই সব পদ ছিল না। রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখাতেন তিনিই। তাঁর শিক্ষণ-পদ্ধতি ছিল অন্যরকম। গুরুদেবের গানের স্বরলিপি করবার, আর নতুন গানের সুর মনে রাখবার সম্পূর্ণ ভার ছিল দিনুবাবুর ওপর। গুরুদেব কোনও গান লিখলেই তক্ষুণি তিনি ডেকে পাঠাতেন দিনুবাবুকে। সুরের দিক্ থেকে সংশোধন করবার শক্তি ধরতেন তিনি। গুরুদেব জেদ ধরলে দিনুবাবু বলতেন, —'তুমি বলছো বটে, কিন্তু ঠিক্ হচ্ছে না।' শ্রুতিধর ছিলেন দিনুবাবু। গুরুদেব কোনো গান দ্বিতীয়বার গাইতে গাইতে ভুল করলে, ঠিক্ করে দিতেন তিনি। গানের ব্যাপারে আমরা মনে করতুম গুরুদেবের পরেই তাঁর স্থান। দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর 'দিনু দাদাজি'র সম্পর্কে যে-ছড়া লিখেছেন তা' একেবারে অক্ষরে অক্ষরে সত্য। আর তাঁর হৃদয় ছিল সুরেন ঠাকুরের হৃদয়ের মতো বিশাল।

'খরচে খরচে শেষটায় এমন হলো, টাকায় ওঁদের টান পড়তে লাগলো। খরচের টাকা যখন শেষ হয়ে যায়, মাস তখনও শেষ হ'তে অনেক দেরি। মাস কাবারের আগেই সেজন্যে হাঙ্গামা পোহাতে হতো কমলা বউমাকে।

'এই অবস্থায় আবার তিনি 'হোয়াইট্-ওয়ে-লেড্‌ল' থেকে নানা

খেলনা-টেলনা, ছুরি-কাঁচি ইত্যাদি সব কিনে এনে বিতরণ করতেন আশ্রমের ছেলেদের মধ্যে। তাঁর মেজাজ ছিল দিলদরিয়া। ছেলেমানুষী স্বভাবও ছিল খুব। তাঁর কোনও জিনিস কারো পছন্দ হওয়া মাত্র, বা তাঁর কোনো জিনিসের কেউ প্রশংসা করামাত্র তক্ষুণি তাকে সেটা দিয়ে দিতেন।

'আমি, তেজুবাবু, অক্ষয়বাবু, দিনুবাবু —এই চার মূর্তি তেজুবাবুর 'তাল-ধ্বজে' বসে গল্প জমাতুম। একসঙ্গে আমাদের বেড়ানোও হতো খুব। শান্তিনিকেতনে চা-চক্রের গোড়া থেকেই দিনুবাবু। আমরা এই ক'জন মিলে একবার খড়্গপুরে গিয়েছিলুম। দিনকতক ছিলুম ওখানে। একসঙ্গে থাকতুম, বেড়াতুম। ওখানে দিনুবাবুর শরীর খারাপ হলো। তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে এলুম শান্তিনিকেতনে।

আর একবার জিয়াগঞ্জে গেলুম। হীরাচাঁদ দুগারের বাড়ি। জিয়াগঞ্জে দুগারদের বাস সেই জগৎশেঠের সময় থেকে। সেই সময়েই শেঠেরা ওদের আনিয়েছিল। এরাও ব্যাঙ্কার। রাজপুতনার লোক। সেবারে সুরেন-টুরেন, দিনুবাবু অনেকে সঙ্গে ছিলেন। হীরাচাঁদ আমাদের থাকার, খাওয়ার, দেখার সব ব্যবস্থা করলেন। খুব তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারতেন দিনুবাবু। ট্রেন থেকে নেমে গঙ্গার ধার পর্যন্ত যেতেই সেবারে কিন্তু দিনুবাবু হাঁফিয়ে পড়লেন। রক্তের চাপ তখন থেকেই শুরু হয়ে গেছে। —জিয়াগঞ্জে গেছি মোট দু'বার। শেষবারে আমাদের সঙ্গে ছিলেন দিনুবাবু। ১৯২৪ সালে চীন-জাপানে যাবার আগেই জিয়াগঞ্জে গেছি।

'দিনুবাবু, আমি, সুরেন, অসিত রাজসাহী গেলুম (১৯২৮) একবার। আমাদের দলপতি হয়ে নিয়ে গেছলেন ক্ষিতিমোহনবাবু। আমাদের সেবকের (কেশব) বাবা মধুসূদন সেন তখন ওখানে ইঞ্জিনীয়র। আত্রাই স্টেশনের কাছে পাকশী-ব্রিজ তখন তৈরি হচ্ছিল; তারই চীফ ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন মধুসূদন বাবু। রাজসাহীতে আত্রাইয়ের ওপর গভর্ণমেণ্ট কোয়াটার্সেই ছিলুম আমরা দু-তিন দিন। পাকা বাঁধের ওপর দিয়ে আমরা বেড়িয়ে বেড়াতুম। অসিতের, আমার আর দিনুবাবুর —আমাদের তিনজনেরই চেহারা ছিল খাপছাড়া। বাঁধের ওপর দিয়ে

আমাদের বেড়ানোর সময়ে আশ-পাশের ছেলেরা টিপ্পনী কাটতো —'বাঁধ টিকলে হয়।'

'দিনুবাবুর বিশাল বপুর যদি স্কেচ্ করতে চেষ্টা করতুম কোনও দিন —তাতে তিনি ভারী চটে যেতেন। তবে. আমার ছবির তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট সমঝদার। উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছিলেন তিনি আমার 'নটীর পূজা'র ছবি দেখে, —'কী সুন্দর হাত আপনার; ইচ্ছে হয় কেটে রাখি।'

'দিনুবাবু যতদিন শান্তিনিকেতনে ছিলেন ততদিন গানে গানে সর্বদা মুখরিত থাকতো আশ্রম। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নাটক অভিনয় করাতেন তিনি। 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র বেশ কিছুদিন ধরে রিহার্সাল দিইয়েছিলেন। অবশ্য নাটক অভিনয়ও সার্থক হয়েছিল। 'নটীর পূজা', 'শ্যামা', 'চিত্রাঙ্গদা' অভিনয়ে তিনি সাহায্য করেছিলেন অনেক। ফাল্গুনী, 'শাপমোচন', চণ্ডালিকা' —এই সব নাটকের গানে রিহার্সাল দিয়ে তিনি অভিনয়ে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতেন! কতক ব্যাপারে আবার তিনি স্বয়ং গুরুদেবকেও সহায়তা করতেন। —'ফাল্গুনী' নাটকে ঠাকুর্দা সেজে ছেলেদের নিয়ে তিনি নেচেছিলেন। মায়ার খেলা' অভিনয় করলেন। আমি ওঁদের সাজিয়ে দিয়েছিলুম। গান করবার সময়ে বড়ো একটা এস্রাজ নিয়ে তিনি বসতেন। দিনুবাবু তাঁর এস্রাজ উপহার দিয়েছিলেন আমাদের মাসোজীকে। মাসোজীর সেই এস্রাজ বাদন —আমি স্কেচ্ করে রেখেছি। (দ্র. ২।৬-৮ সংখ্যক স্কেচ্ বুক)।

'আশ্রম ঝঙ্কারিত তখন গানে আর নাটকে। আর দিনবাবু একাই একশো। সঙ্গীতজ্ঞান ছিল তাঁর অসাধারণ। গুরুদেবের রাগ-রাগিণীতে ভুল হলে সে-সব শুধরে দিতেন দিনুবাবু। ওস্তাদী গানে তিনি পোক্ত ছিলেন বলে এটা সম্ভব হতো। গুরুদেব তাঁকে তাঁর 'সকল নাটের কাণ্ডারী, সকল গানের ভাণ্ডারী' বলেছেন।

'আমার জ্বর হলো একবার। পাহাড়ে গিয়ে জীবনে সেই আমার প্রথম ম্যালেরিয়া জ্বর হলো। অসিত, আমি তখন দিনুবাবুর সঙ্গে দার্জিলিং-এ ছিলুম। দিন দশ পনেরো থাকা হয়েছিল ওখানে। সহসা চলে এলুম ওখানে থেকে। দিনুবাবু ওখানে একটু বেতরো হলেন।

সঙ্গে ছিলেন কমলা বৌমা। তিনি সাম্‌লাতে পারলেন না। একদিন বেঠিক্ হয়ে আমাদের রূঢ় কথা বলেছিলেন। সেটা অবশ্য আমাদের বন্ধুত্বের কষ্ঠিপাথর হলেও, আমরা কমলা বৌমাকে বলে,* ভোরের দিকে সহসা চলে এলুম।

'দিনুবাবু ছবি ভালবাসতেন খুবই। ছবি হলেই তাঁকে দেখাতুম। ছবির ভালোমন্দ বলে দেবার ক্ষমতা ছিল তাঁর। 'নটীর পূজা' যখন অভিনয় হলো (১৯২৬) রিহার্সেল চলেছিল একমাস ধরে। 'কেমন লাগলো' —একদিন জিজ্ঞাসা করলুম দিনুবাবুকে। তিনি বিহ্বল হয়ে বললেন, —'নটী সেজে গৌরী যখন নাচে, আমার চোখ জলে ভাসতে থাকে, নন্দবাবু।' 'নটীর পূজা'র পূরো ছবি আঁকলুম আমি। সে সেট্ কিনে নিলেন কমলা চট্টোপাধ্যায়।

'জন্তু-জানোয়ার দিনুবাবু ভালবাসতেন খুব। মুরগী পালতেন, হরিণ পুষতেন। জিয়াগঞ্জে শেষবারে যখন যাই, উঠেছিলুম গিয়ে হীরাচাঁদ দুগারের মামার বাড়ি —নাহারদের বাড়ি। পয়সাওয়ালা লোক। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ভালোই হলো। ওঁদের ঘরে ছিল একটা কালসার হরিণ। দিনুবাবু চেয়ে বসলেন সে হরিণটাকে। দিয়েও দিলেন তাঁরা সহজভাবেই। সেই হরিণ নিয়ে আসা হলো আশ্রমে। থাকতো সে দেহলীর পাশের বাগানে! ওখানে আগে থেকেই হরিণী ছিল একটা। হরিণীর শিং গজায় না। কিছুকাল পরে হরিণীর উদ্দীপনা হলো। কিন্তু এক মেলের নয় বলে ওদের মিল হলো না। বাঁধন খোলা পেতেই কালসার ওটাকে গুঁতিয়ে আধমরা করে ফেললে। তারপরে সে পালালো বেড়া টপ্‌কে। প্রতি ঋতুকালেই ওদের ঐ ভাব হতো। একবার ছুটেছিল ইলামবাজারের দিকে। টের পেয়ে ধরে আনা হলো। আর একবার যখন পালালো সাঁওতালরা মেরে দিলে বুনো হরিণ ভেবে।

'এই হরিণটার আগেও (১৯১৭) দিনুবাবুর হরিণ ছিল। তখন এখানে থাকিনি আমি। গলায় দড়ি বেধে মরেছিল সে। গুরুদেবের গান আছে তার ওপর, —'সে কোন্ বনের হরিণ···'। নাতবৌ কমলা দেবীকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে লিখেছিলেন। —গোর দেওয়া হয়েছিল

তাঁকে দেহলীর সামনের বাগানে।

'একবার খড়্গপুর থেকে একটা বাচ্চা হরিণ আনিয়ে দিয়েছিলুম আমি। দু-মাসের শিশু ছিল সে তখন। তার জন্ম খড়্গপুরেই। এখানে এনে তার নাম দিলেন —'গৌরী'। আশ্রমে চরে বেড়াতো সেই শিশু হরিণী। মারা গেল সাপের কামড়ে। পুরাতন হাসপাতাল ছিল 'গৈরিক' ভবনে। তার পাশের জাম-বনের ছায়ায় থাকতো সে। সাপের বিষ সহ্য করতে না পেরে হরিণী মারা গেল —তড়াক্ করে লাফ দিয়ে।

'সেই শিশু-হরিণীর স্কেচ্ করে দিয়েছিলুম দিনুবাবুকে প্যাস্টেল রং দিয়ে। দেখে খুব পছন্দ হয়েছিল তাঁর। দিনুবাবু ছবি ভালবাসতেন বলে আমরা এখানকার সব আর্টিস্ট মিলে একখানা একখানা করে ছবি তাঁকে উপহার দিয়েছিলুম। সেই হলো তাঁর বিদায়-উপহার।

'শান্তিনিকেতনে রথীবাবুর সঙ্গে তাঁর মতের মিল হতো না। বৈষয়িক ব্যাপারে মনের অমিলের ফলেই শেষ-মেশ চলে গেলেন তিনি এখেন থেকে। কলকাতায় গিয়ে থাকতেন জোড়াসাঁকোর 'বিচিত্রা'-হলে —ওপর-তলায়। মারা গেলেন সেখানেই। —ব্লাড্-প্রেসার বেড়ে গিয়েছিল তাঁর। সেই অবস্থায় হোটেলের খাবার যথেচ্ছ খেয়ে মারা গেলেন শেষটায়।

'ঠাকুরবাড়ির এস্টেট থেকে মাসহারা পেতেন নিয়মিত। আরও টাকার দরকার। রথীবাবুর আপত্তি হয়। হেতু, এস্টেটের টাকার টানাটানি। সব শুনে গুরুদেব বললেন, —'আমার তহবিল থেকে দেড় হাজার টাকা দিয়ে দাও।' তবে সেই টাকাটা পেয়েই দিনুবাবুর কাল হলো। আচারে বেপরোয়া হয়ে উঠলেন। ...সে সময়ে কলকাতায় তাঁর সঙ্গে আমি দেখা করতে গেলে, কথায় কথায় তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়তো। ...দিনুবাবুর মৃত্যুর পরে শান্তিনিকেতনের সঙ্গে ওঁদের তিন পুরুষের সম্পর্কের শেষ হলো।

॥ মুনীশ্বর গৌড় ॥

'বড়োবাবুর চাকর হয়ে, গুরুদেবের আশ্রমে থেকে, একটা মানুষের মতন মানুষ হলেন মুনীশ্বর। যে-কোনো ভদ্রলোকের চেয়ে আচারে-ব্যবহারে শ্রেষ্ঠ উনি। নিরহঙ্কারী মিষ্টভাষী —এই সব হলো ওঁর প্রধান সদ্‌গুণ। আর এই সবেরই মূলে বড়োবাবু দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গগুণ। মুনীশ্বরকে রাগতে দেখিনি কখনও। এই রকম রাগ জয় করা আশ্চর্য। দ্বেষও নাই কারও ওপর। এইসব ভালো গুণ পেয়েছেন উনি বড়োবাবু মশায়ের কাছ থেকে। দেখা হলেই আমি মুনীশ্বরকে আগে প্রণাম করি। মল্লিকজীও তাই করতেন। যেন আশ্রমের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। 'এখন (১৯৪৮) কাজ করেন হিন্দীভবনে। আগে কোথাও যেন ছিলেন। [১৯৬৬ সালে তাঁর বয়েস হলো ছিয়াশী।]

'বড়োবাবু' মারা যাওয়ার পরে, মুনীশ্বর বড়ো-মাকে সাহায্য করতেন। বড়ো বাবু ওঁর একটা পেনশনের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। সেটা উনি পেতেন কিনা জানি না। এস্টেটের আয় নাই —কোথা থেকে দেওয়া হবে, —এই কারণে সেটা বন্ধ হয়ে গেল। বড়োবাবুর সেক্রেটারী ছিলেন —অনিলবাবু। তাঁকেও পেনশন দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি। তাঁর জন্যেও আলাদা টাকা ছিল। সে-ও দেওয়া সম্ভব হয়নি।

'এখনও দ্বিপুবাবুর স্ত্রী —আশ্রমের 'বড়ো-মা' বেঁচে আছেন। তিনি অথর্ব হয়ে পড়েছেন। এখনও তিনি এখানে এলে তাঁর খোঁজ-খবর নেওয়া, দেখাশুনা করা, মুনীশ্বরই সব করে থাকেন। বড়ো-মা এসে দেহলীর ওপরে থাকেন। তাঁর নামেও সব ব্যবস্থা করা আছে। যাই হোক, সঙ্গগুণে রং-ধরা কথাটা সার্থক। মুনীশ্বরের যা হয়েছে আমরা তা' চোখে দেখলুম। [বড়োবাবুর কথা তুললে, মুনীশ্বরজী আজও বিহ্বল হয়ে তৃপ্তির মিষ্টি হাসি হেসে দু'হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে পুরাতন প্রভুর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে থাকেন।]

॥ ছাত্রমহল, ১৯২১ ॥

বিশ্বভারতীতে প্রথম যুগের ছাত্রধারার সম্পর্কে নন্দলালের অভিজ্ঞতার কথা এবারে একটু বলি।—

সেকালের বোলপুর-ব্রহ্মচর্য-আশ্রমের দুর্ধর্ষ ছাত্রদলের নানা অভিনব কাহিনী নানা সূত্র থেকে শোনা গেছে। বড়োদাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ, কবি রবীন্দ্রনাথ ও শিক্ষকদের মহৎ আদর্শ সামনে থাকলেও তাঁদের প্রভাবে, এখানে আগত সকল ছাত্রই যে আদর্শপরায়ণ হয়ে উঠতো তা নয়। তাদের সকলেই যে গভীর অনুভূতিসম্পন্ন ও ধ্যানযোগে আশ্রমিক পরিবেশের সঙ্গে সমরস উপলব্ধি করে জীবনের জটিল তত্ত্বসমূহের সমাধানে লেগে যেত —সে ধারণা করাও ঠিক হবে না। সে-রকম হলে, বড়োদাদা ইচড় কিলিয়ে কাঁঠাল পাকানো, বা গাধা পিটিয়ে ঘোড়া তৈরি করার ব্যর্থতার ইঙ্গিত করতেন না। তবে লাখ বা হাজারের পরিসংখ্যানে না-গিয়ে, স্বচ্ছন্দে বলা যেতে পারে, শতকরা অন্ততঃ একজন আদর্শ ছাত্র কবিগুরুর আশ্রম থেকে বের হয়ে, সুস্থ সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, আপন বৈশিষ্ট্যসহ খ্যাতিমান্ হয়ে উঠেছেন। এবং বলা বাহুল্য, এইখানেই কবির আদর্শ-বিদ্যালয় স্থাপনের সার্থকতা।

যাই হোক্, বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা-পর্বে নন্দলালের ছাত্রদলের সম্পর্কে অভিজ্ঞতার কথা তাঁর ভাষাতেই শুনুন :—

'শান্তিনিকেতনে স্থায়িভাবে এসে, কলাবিভাগে অসিতের ছাত্রদের ভার নিলুম আমি। বার থেকেও ছাত্রছাত্রী আসতে লাগলো। ছাত্র সে-যুগে যারা সব এসেছিল, তারা যেন এক-একটা ক্যারেক্টর। গুরুদেবের ব্রহ্মচর্য-আশ্রম —মুনি-ঋষিদের তপোবনের আদর্শে গড়া। গেরুয়া পরতো ছাত্রেরা। ওঙ্কারানন্দ' ছাত্রদের গেরুয়া পড়তে আর ইঁট মাথায় দিয়ে শুয়ে থাকার ব্যাপারে উৎসাহ দিতেন, সে-কথা তো তোমাকে মুকুল বলেছেন। ফলে, সন্ন্যাস-জীবনের ছোটখাটো দু'একটা অন্য অনুষঙ্গ যদি আশ্রমে এসে কিশোর ছাত্রদের পেয়ে বসে, তাতে অবাক্ হবার কিছু নাই। কিন্তু আর্টের লাইনে আমি এ-সব পছন্দ করতুম না। অতি কঠোর হলে,

বা একেবারে বয়ে গেলে আর্ট হয় না।

'তারপর ধরো, এই যে সহশিক্ষার প্রবর্তন হলো আশ্রমে, এ নিয়েও সেকালে যথেষ্ট ভাববার ছিল। মহাস্থবির ধর্মাধার ক্লাসে যখন বৌদ্ধদর্শন পড়াতেন, তিনি হাতপাখা দিয়ে মেয়েদের মুখ আড়াল করে রেখে বক্তৃতা দিতেন। আশ্রমের অধ্যাপক হলেও তিনি বৌদ্ধ মহাগুরু। স্ত্রীলোকের মুখদর্শন তাঁর পক্ষে নিষিদ্ধ ব্যাপার। কিন্তু, এ-সব কি সহশিক্ষার কোনো বিদ্যালয়ে চলে? বিশেষ করে আমাদের শিল্পিজীবনে তো নয়ই। শিল্পজগতে মেয়েরাই তো কলালক্ষ্মী। আদ্যিকাল থেকে দেখো, অজন্তায়, বাগে, নানা স্থানে যত পুরাতন ছবির প্যানেল, তাতে মেয়েদের ভূমিকা দেখবে যেন অলঙ্করণের মতন। স্ত্রীচরিত্রবর্জিত হলে এসব চিত্র একবগ্গা হয়ে যেতো।

'শিল্পীদের মন বিশেষভাবে sensitive হয়ে থাকে। তার ভোগের ব্যাপারে জোর করে বাধার সৃষ্টি করলে, শিল্পী পাগল হয়ে যাবে। অন্ততঃ, শিল্পীদের পক্ষে পাগল হবার এ-ও একটা কারণ বটে। সহশিক্ষার সহজতা প্রসঙ্গে ক্ষিতিমোহন বাবু বলতেন, 'শস্য আর ক্ষেত্র একত্র করে জল ছিটিয়ে দিচ্ছ, আর বলছো, অঙ্কুর হয়ো না। তা-ও কি কখনো সম্ভব হয়।' জোর করে কিছু চেপে রাখতে গেলে বিকৃত হবে। এখনকার যুগে অবশ্য অনেকটা সহজ হয়ে আসছে। তখন সাম্‌লাতুম আমি। বেশি অগ্রসর হলেই বিয়ে থা দিয়ে দিয়েছি।

'একজন ছাত্র এলো —বঙ্গদেশীয়, রিজিড্, কাঠখোট্টা। এখানে এসে পাগল হলো। বছরে সে পাগল হয় দু'বার করে। কঠোর পিউরিটান্ ছিল সে। আমাদের ধীরেনকে, বিনোদকে বললুম, —ওকে বিড়ি সিগরেট খাওয়াও। নইলে রস জমবে না। বইয়ে দাও ওকে। অতো রিজিড্ হলে আর্ট হবে না। আর্ট-এ চাই মধ্যপথ।

'হীরাচাঁদ দুগার এসেছিলেন অসিতের সঙ্গে। ধর্মে তিনি জৈন। বাড়ি মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জে। এখানে পলাশ গাছের পাশের বাড়িতে তাঁর থাকার জায়গা হলো। আগুন লেগে পুড়ে গেল সে-ঘরখানা। সেটা ছিল বড্ড অপয়া ঘর। নানা কাহিনী তার।—

'ব্রহ্মচর্য-আশ্রমের ছাত্রেরা তখন গেরুয়া ছেড়েছে। কিন্তু মাঝে মাঝে সারা সন্ধ্যে ধরে সিদ্ধি ঘুঁটতো সেই পলাশ-বাড়িতে বসে বসে। এখনকার (১৯৪৮) কলেজ-হস্টেল. তখনকার কলাভবন 'দ্বারিকের' ছাদে বসে রাত্রে সেই সিদ্ধি খেতো। সিদ্ধি খেয়ে inspiration পেত; আর লণ্ঠন জ্বালিয়ে ছবি আঁকতো। আমার ছাত্রদেরও কেউ কেউ ছিল সেই দলে। ওদের সে-inspiration কেমন জানো? একজন বললে, —এই দেখা যাচ্ছে —কলকাতার রাস্তা। অমনি ওরা সবাই একসঙ্গে নোট করতে লাগলো —কলকাতার রাস্তা। খানিক বাদে একজন বললে, —এই মোটর-চাপা পড়লো একটা ছেলে। আর অমনি সবাই 'আহা-হা' করে উঠলো, আর নোট করে রাখলো। একজন বললে, —এই ফুটপাতে ফেরিওয়ালা যাচ্ছে। —আর অমনি নোট। —এই রকম সব কলকাতার ছবি দেখতো ওরা শান্তিনিকেতনে বসে।

'সিদ্ধি খেয়ে ওদের ঐরকম বাস্তব দেখার এক্স্‌পেরিমেণ্ট্‌ আমি বন্ধ করে দিলুম। বললুম, —ও-সব ভালো নয় হে। এ-বিষয়ে আমার নিজের অভিজ্ঞতা কিছু আছে। সেই কাহিনী স্মরণ করে ওদের ও-সব আমি বন্ধ করে দিলুম। কিন্তু, আজ ভাবি, ভবের হাটে ভাঙের নেশারও বোধহয় একটা দাম আছে।

'খড়্গপুরে থাকতে আমি সিদ্ধি খেয়েছিলুম একবার। সে অভিজ্ঞতা বড়ো সাংঘাতিক। সিদ্ধির নেশায় অদৃশ্য বা দূরের বস্তু সশরীরে চোখে দেখা যায়। সেইজন্যেই হয়তো সাধু-সন্ন্যাসীরা ধ্যানে বসেন সিদ্ধি খেয়ে।—

'খড়্গপুরে দাদাশ্বশুরের শ্রাদ্ধ। খাওন-দাওন হচ্ছে। সেজো ভায়রা নরেন চৌধুরী সিদ্ধি ঘুঁটে রেখেছেন। ধুতরো-টুতরো বিষাক্ত দ্রব্য কি সব যেন তার সঙ্গে উপরন্তু মিশিয়ে দিয়েছেন।—

সেই সিদ্ধি এক পাত্রি করে খেয়ে আমরা সবাই নেশায় ভোম্‌ হয়ে আছি। এদিকে, দুপুরে শাশুড়ী ঠাকরুন আমাদের খাবার জন্যে জল জায়গা করে খেতে ডাকছেন। —তাঁর ডাক শুনে আমি বললুম, —ভীষণ নেশা, মা ঠাকরুন। —ওদিকে দেখি, —মূল খামি সেজো ভায়রা স্বয়ং দাওয়ার নিচে ওলতলায় ওলতলায় ঘুরছেন চোখ বুজে অতি সন্তর্পণে।

আমার অবস্থা তখন বেজায় কাহিল। —খাটিয়ায় দিনের বেলায় শুয়ে আছি। কখন যেন এর মধ্যে লণ্ঠন জ্বালিয়ে শৌচে গেছি। আবার শৌচে ঠিক্ গেছি কি না, সেটাও ঠিক্ মনে আসছে না। —শুয়ে আছি খাটিয়ায়। গায়ের প্রত্যেকটা জয়েণ্ট যেন ফেটে যাচ্ছে। আর বাইরে যেন তুবড়ি ফাটছে; অগ্নিবৃষ্টি হচ্ছে। —হঠাৎ আমার মনে হলো, আমি যেন পদ্মার চরের ওপর শুয়ে আছি। আর অমনি জলের লহর ঠিক্ দেখতে পাচ্ছি। —আরে না, না, ওটা তো পদ্মা নয়, —গঙ্গা। —গঙ্গা দেখা যাচ্ছে; আর অমনি জলের ওপর দিয়ে পালতোলা নৌকা সন্ সন্ করে চলে যাচ্ছে।

॥ বাগ-তীর্থে ভারতশিল্পের প্রতিলিপি-সংগ্রহকল্পে, ১৯২১ ॥

১৯১৭ সালে বাগগুহার সঙ্গে ভারতশিল্পীদের মধ্যে প্রথম যোগাযোগ হয় অসিতকুমারের। তাঁর প্রত্যক্ষ দর্শন, আর বিবরণ পেশের ফলে, সরকারের তরফ থেকে আবার ডাক এলো বাগগুহার ছবির অনুলিপি করবার জন্যে ১৯২০-২১ সালে। এবারে তাঁরই 'এসৃটিমেট্ মতো' আরও দু'জন শিল্পী বাগগুহায় গেলেন —নন্দলাল আর সুরেন্দ্রনাথ। বাগগুহার অভিজ্ঞতার কথা অসিতকুমার আর নন্দলাল প্রকাশ করেছিলেন। এ-ছাড়া নন্দলালের প্রথম পর্যায়ের স্কেচ্‌বইএ (সংখ্যা ৭, ৮, ৯,) এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের ২২সংখ্যক স্কেচ্-বইএ বাগগুহার অনেক স্কেচ্ করা আছে। তিন নম্বরের ডায়েরিতেও কিছু সংবাদ আছে। তাঁদের দৃষ্টি অনুসরণ করে এই অধ্যায় রচনা করা যাচ্ছে।

বাগগুহা মালব জেলায় গোয়ালিয়র রাজ্যে। অজন্তা থেকে আড়াই-শো মাইল উত্তরে 'বাগ'। গ্রামটি সমতল ক্ষেত্রের ওপরে। গ্রামের কাছেই 'বাগমতী নদী। তার চারদিক পাহাড় আর গাছপালায় ঘেরা। 'বাগ'-নদীতে জল থাকে প্রায় ন' মাস —বাকি তিন মাস শুকনো। সর্দারপুর থেকে 'বাগ' গ্রাম পর্যন্ত রাস্তা পাকা, কিন্তু গ্রাম থেকে গুহায় যাবার তিন মাইল পথ খারাপ খুব। 'বাগ' গ্রামের কাছেই পাহাড়ের ধারে বাগীশ্বরীর মন্দির। তার কাছে কতকগুলি পুরাতন ঘরের ভিত্তিচিহ্নের অবশেষ। বাগনদীর তীরে গঙ্গামহাদেও আর গমতী মহাকালেশ্বরের পাথরের মন্দির। গঙ্গামহাদেও-এর মন্দিরটির চুড়োর অংশ গাঁথা ইঁট দিয়ে। নিচের অংশ পাথরের। গঙ্গামহাদেবের লিঙ্গমূর্তি। এ-ছাড়া, হাল আর পুরানো মূর্তিও রয়েছে —মন্দিরের মধ্যে। গঙ্গামহাদেবের মন্দিরের কাছে একটি খাড়া-পাহাড়ের গায়ে ক'টি গুহাঘরের দরজার চিহ্ন। ধ্বসে পড়েছে সেগুলি। মহাকালেশ্বরের মন্দিরটি পাথরের তৈরি, ছোট। এর গড়ন আর কারুকার্য ছিল খুবই সুন্দর। প্রকাণ্ড বড়ো একটি হনুমানজীর মূর্তি আর ছোট একটি বিষ্ণু-মূর্তি। স্থানটি চারধারে পাহাড় দিয়ে ঘেরা ছোট, উঁচু উপত্যকার মতো। কাছেই একটি ঝরণা। নাম তার —'পাতালগঙ্গা'।

লোকে বলে, সমুদ্র শুকলেও এই ঝরণার জল শুকবে না। আর এই জলে স্নান করলে গঙ্গাস্নানের পুণ্য। তিথি ধরে এখানে স্নান করতে লোক আসে বহুদূর থেকে। বাগে যাবার পথে ধানক্ষেত্রের ধারে পাথরের অনেক মূর্তি —দাঁড়ানো আর সুডৌল। তার একটি হলো, মা ছেলে-কোলে করে দাঁড়িয়ে। এই মাতৃমূর্তিটির ভাবভঙ্গি ভারী সুন্দর। মূর্তিটির সর্বাঙ্গে কলা-কৌশলের নিদর্শন। তবে, খোলা জায়গায় পড়ে থেকে ক্রমশঃ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই মূর্তিগুলি দেখে মনে হয়, আরও পুরাতন কোনো মন্দিরের দেবতা বা আবরণ-দেবতা। আর এগুলি যে-পাথরে খোদাই-করা, সে-রকম শক্ত পাথর বাগের পাহাড়ে নাই। বাগ-গুহার সঙ্গে মূলে বোধ হয় এ-সব মূর্তির কোনো সম্পর্ক ছিল না।—

'বাগ'-গ্রামের কাছাকাছি এই বাগীশ্বরী অর্থাৎ বাক্ বা সরস্বতী দেবীর প্রাচীনতর মন্দিরটির নাম থেকে নাম এসেছে 'বাগ'গ্রাম, 'বাগমতী' নদী। গুহাঘর-গুলিরও নামকরণ হয়েছিল মনে হয় এই সূত্র ধরেই। পরে, লোকবিশ্বাসে, 'বাক্' থেকে 'বাগ' আর 'বাগ' থেকে 'বাঘ' হয়ে গিয়েছিল সহজভাবে। আসলে এই অঞ্চলের নামকরণের গোড়ায় পশু 'বাঘ' নয়, দেবী 'বাক্'। প্রাচীনতর হিন্দু বাগতীর্থের পাশাপাশি স্থাপিত হয়েছিল বৌদ্ধতীর্থ বাগগুহা —গয়ার পাশে বুদ্ধগয়া বা কাশীর পাশে সারনাথের মতো। ভারতীয় ঐতিহ্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, বিরোধ পাশাপাশি থেকে, ক্রমশঃ মিলে যাওয়া।

বাগে গুহামন্দির মোট আছে ন'টি। তার মধ্যে বড়ো ছ'টি, ছোট তিনটি। স্থানটির চারধার পাহাড়ে ঘেরা, আর মধ্যিখানে বিস্তীর্ণ একটি সমতল ভূমি। তার ওপর চাষবাস করে থাকে ওখানকার আদিবাসী ভীলেরা।

বিন্ধ্যপাহাড়-এলাকায় সবচেয়ে অপকৃষ্ট নরম বেলে-পাথরের পাহাড়ে এই গুহাগুলি খোদাই করা হয়েছিল। ফলে, ভারতের অন্য স্থানের গুহাঘরের চেয়ে এগুলির বেশির ভাগ ধ্বংস হয়ে গেছে। প্রথম গুহা থেকে দ্বিতীয় গুহার দূরত্ব হলো সাড়ে ন'শ ফুট। তার ঠিক মাঝখানের সমস্ত পাহাড়টাই ধ্বসে পড়েছে। সে-পাহাড়ে গুহা-টুহা ছিল কিনা বলা যায় না। গুহাগুলির সবই প্রায় উত্তর-পশ্চিম দিকে মুখ-করা। নরম বালি-পাথরে

তৈরি গুহাপ্রাসাদগুলি। বায়ুকোণ-মুখো হওয়ার ফলে, ঐ দিকের ঝড়-ঝাপটায় এদের সমূহ ক্ষতি করছে। বাগগুহার বৈশিষ্ট্য হলো, অজন্তার মতো ভজন-পূজনের জন্যে আলাদা চৈত্য-মন্দির, বা বসবাসের উদ্দেশ্যে বিহার-গুহা নাই। অজন্তায় বিহার-গুহার ভেতরে গম্ভীরায় ধ্যানী-বুদ্ধের বিরাট্‌ মূর্তি আছে। বাগে তার বদলে রয়েছে চৈত্য-গুহার মতন প্রকাণ্ড একটি স্তূপ। আবার সেই গুহারই আশে-পাশে ছোট ছোট কামরায় ভিক্ষুদের বসবাসের উপযোগী ঘর। এ-ছাড়া, ভিক্ষুদের বাসের জন্যে তৈরি একটি আলাদা গুহাও রয়েছে। এই গুহাগুলিকে গ্রামের লোকে বলে, —'পঞ্চপাণ্ডবের গুম্ফা', আর তাদের ধারণা, —এই হলো বিরাট রাজার বাড়ি। এক নম্বর গুহাটির নাম 'গৃহগুম্ফা', দ্বিতীয়টির নাম 'গোসাঞী গুম্ফা.' তৃতীয়টি বিহার, আর চতুর্থটি হলো — রং-মহল'।

প্রথম গুহাটির আয়তন ২৩´×১৪´, সাজানো ছিল চারটি থামে। থামগুলির নিচের দিক্‌টা চারকোণা, ওপরের খানিকটা আটকোণা, আর মাথার ওপরে কিছু কিছু কারুকাজ। সব থামই ধ্বসে পড়ে গেছে। গুহার বাইরের দালানের চিহ্ন-মাত্র নাই। এই গুহাটির একটু ওপরে একজায়গায় পাহাড়ের গায়ে গুহা-খোদাই-এর চিহ্ন রয়েছে।

দ্বিতীয় গুহাটিতে কিছুকাল আগে একজন সাধু বাস করতেন। তাঁরই নামে গুহাটির নাম হয়েছে —'গোসাঞী গুম্ফা'। গোসাঞীজীর হাতে পড়ে এই গুহার শিল্প-কলাবলীর অনেক নাস্তানাবুদ হয়েছে। গুহায় যেখানে যত পাথরের ওপর কারুকাজ-করা ভাঙ্গা স্তূপ ছিল, তার ওপর গোবরমাটি লেপে গোসাঞীজী পুরানো কীর্তিগুলি চাপা দিয়েছিলেন। গুহার বাইরের একটি কামরায় তিনি বুদ্ধমূর্তির গায়ে গোবর-মাটি আর তেল-সিন্দূর লেপে, তাতে হাতির শুঁড় বসিয়ে আস্ত একটি গণেশ ঠাকুর বানিয়েছিলেন। তীর্থযাত্রীরা বাগতীর্থ দেখতে এসে, এই গণেশঠাকুরের পদতলে প্রণাম জানিয়ে যেতো —সাধ্যমতো দক্ষিণান্ত করে। এই গুহার ভেতরে বুদ্ধ আর তাঁর মুখ্যশিষ্যদলের খোদাই-মূর্তি রয়েছে। তার সংখ্যা আট। কিন্তু লোকে বলে, —'পঞ্চ পাণ্ডব'। গুহার হল-ঘরটি হলো ৮৬½´×৮৬´। হলঘরটির প্রথম সারিতে চারধারে চৌকভাবে মোট

থাম। তার মাঝখানে দশ ফুটের ব্যবধানে আবার চারটি থাম।

গুহার গম্ভীরায় চৈত্য-প্রকোষ্ঠ স্তূপ আছে। তার সামনে থাম-লাগানো একটি ঘরের ডান দিকে তিনটি, আর বাঁদিকে তিনটি খোদাই-করা মূর্তি, দরজার দু-পাশেও দুটি স্বতন্ত্র মূর্তি। তিনটি মূর্তির মধ্যে মাঝখানেরটি হলো বুদ্ধের—তিনি দাঁড়িয়ে ধর্মপ্রচার করছেন। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে দু'জন ভক্ত; একজনের হাতে পদ্ম, অন্যজনের হাতে ফল—সব খোদাই-করা। বাঁ-দিকের মূর্তিগুলির মধ্যে বুদ্ধের মুখের ভাবটি খুবই ব্যঞ্জনাময়। চৈত্যপ্রকোষ্ঠের প্রবেশদ্বারের দেওয়ালে দাঁড়ানো মূর্তি দু'টী। তার মধ্যে একটি সজ্জিত রাজবেশে—শোভিত অলঙ্কারে, কুণ্ডলে, মাথার মুকুট-ঘেরে জ্যোতির ছটা। সেকালের বুদ্ধভক্ত কোনো রাজার মূর্তি হতে পারে এটি। অন্য দাঁড়ানো-মূর্তিটিরও মাথায় মুকুট; কিন্তু অলঙ্কারের বা আভরণের পারিপাট্য নাই মোটেই; তার ডান হাতে পদ্ম, বাঁ হাতে মঙ্গলঘট দেখে মনে হয়, বুদ্ধেরই কোনো ভক্তপ্রবরের মূর্তি। দু-নম্বরের গুহায় বুদ্ধের মূর্তি রয়েছে; আর কোথাও প্রায় নাই। এর কোনো কোনো স্থানে আগে ছবি আঁকা হয়েছিল; ছাদের নিচের দিকে যথাতথা চিত্রকলার আর কারুকাজের নিদর্শন এখনও রয়ে গেছে। তা'ছাড়া চিত্রপট আঁকার জন্যে মাটীর তৈরি জমিও রয়েছে কোথাও কোথাও।

তিন নম্বর গুহাঘরটি তৈরি হয়েছিল বিশিষ্ট ভিক্ষুদের বসবাসের জন্যে। সামনে প্রকাণ্ড একটি নিম গাছ। গুহার সামনে অনেকগুলি বাঘের মুখ খোদাই করা আছে। ছাদের নিচে পদ্ম, হাঁস ইত্যাদির ছবি খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করে আঁকা। এ-সব দেখলেই মনে পড়ে, অজন্তা-গুহার ছাদের নিচের কারুকাজের আর ছবির কথা। এমন-কি, ছাদের ঠিক্ মধ্যিখানে শালের চাঁদোয়ার মতো একটি প্যানেলে পদ্ম আর তার চারপাশে নানা রকম কারুকার্য ঠিক্ অজন্তার মতন এখানেও ছিল—তার নিদর্শন আছে। এই গুহাটির গম্ভীরায় বুদ্ধের কোনো মূর্তি বা স্তূপ নাই, বা তার জন্যে কোনো বিশেষ প্রকোষ্ঠও নাই। একেবারে ভেতরে একটি হল-ঘর, আটটি মোটা মোটা চারকোণা থামের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে। তার আশে-পাশে কোনো ছোট কুঠুরি নাই। এই হল-ঘরের বাইরে গুহায় ঢোকার পথে ছ'টি থাম

-দেওয়া একটি হলঘর। তারই আশে-পাশে বারান্দা আর ঘরের ভেতরে ঘর খোদাই করা। এই সব ছোট ঘরের ছাদে আর দেওয়ালে চিত্রকলার নিদর্শন রয়েছে এখনো। একটি ঘরে অতি অস্পষ্টভাবে আঁকা রয়েছে—হাতীর পিঠে সিংহ। সেই ঘরেরই দু-পাশের দেওয়ালে একটি বুদ্ধমূর্তির বড়ো বড়ো দু-টি পায়ের অংশটুকু পদ্মের ওপর রাখা. বাকি ওপরের অংশ নাই। অবশিষ্ট এই পাদপীঠটুকু দেখে, বাগের শিল্পীদের উত্তম কলানৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কামরাগুলির বাইরে একটি ছোট কুঠ্‌রীর দরজার এক পাশে একটি লোকের ছবি আঁকা—লম্বা জামা পরে' সে যেন পথ থেকে কিছু কুড়িয়ে নিচ্ছে। তিন নম্বর গুহাঘরের আয়তন হলো ৮০´×৪০´×১৫´।

গুহাগুলি খুবই অন্ধকার। অজন্তার বা বাগের এই রকম সব অন্ধকার গুহাঘরের মধ্যে শিল্পীরা কী করে যে এমন সুন্দর সব ছবি এঁকেছিলেন তা' বলা শক্ত। পাথরের চাকাওয়ালা গাড়ীর নমুনা রয়েছে বাগগুহাতে। সে-গাড়ী পাহাড়ে ওঠার উপযুক্ত। সে-যুগে সেই গাড়ীতে চড়েই ওরা ওপরে উঠে মালপত্তর বোধহয় সরবরাহ করত। সে-গাড়ীর স্কেচ্ করা আছে নন্দলালের (স্কেচ্‌বুক সং ১।৮-২৮)।

চার নম্বর গুহাটিকে লোকে বলে —'রং-মহল'। কেন বলে. জানা যায় না। সম্ভবতঃ, রঙিন ছবি এই ঘরেই বেশি আছে বলে এই নাম। তিন নম্বরের গুহা থেকে এর দূরত্ব দু-শো ফিট্। এই চার নম্বরের গুহার পাথরের থামে কারুকাজ আর ছবি প্রচুর; আর সেগুলি সবচেয়ে সুন্দর। চার, পাঁচ ও ছয়—এই গুহাগুলি পাশাপাশি। চার-এর আর পাঁচের গুহা দুটী বাইরের দিক থেকে একটি প্রকাণ্ড বারান্দা দিয়ে জোড়া ছিল। সে-বারান্দা ২২৪´ ফুট লম্বা, ১৪´ ফুট উঁচু. আর ১০´ ফুট চওড়া। এই দীর্ঘ বারান্দার পাথরের দেওয়ালে ৫১´ ফুট মাটী-লেপা জমির ওপর এখনো ছবির নিদর্শন রয়েছে। এই বড়ো বারান্দার থাম একটিও নাই। সেজন্যে সামনের অংশের পাহাড়ের খানিকটা ওপর থেকে ধ্বসে পড়েছে। খানিকটা দেওয়ালের ছবি চাপা পড়ে আছে এই পাথরের মধ্যেই। এই খোলা দেওয়ালের ছবিগুলি অংশতঃ এতকাল ধরে এখনো ঝড় বৃষ্টি ধুলোতে কি করে যে টিকে আছে, সে আশ্চর্য ব্যাপার। এই গুহাটিতে ভাস্কর্যের মধ্যে একটি

দেওয়ালে কুবেরের আর অপর দেওয়ালে নাগেশ আর নাগরাণীর মূর্তি রয়েছে। এ থেকে আমাদের মনে হয়, বাগের শিল্পীরা জাতিতে ছিলেন নাগবংশী। তারই জের আমরা দেখি যেন বাঙ্গালী-শিল্পী ধীমান, বীতপালের মধ্যে। এই রকম নাগেশের মূর্তি অজন্তার ১৯ নম্বর গুহার বাইরে একস্থানে আছে। তবে, অজন্তার মতো বাগের মূর্তিতে নাগেশ ও নাগরাণীর মূর্তির সঙ্গে সখীর মূর্তি খোদাই করা নাই। যাই হোক্, নাগেশ ও নাগরাণীর মূর্তি থেকে অজন্তার শিল্পীদেরও নাগবংশীয় অনুমান করলে খুব বেশি ভুল করা হবে না। এঁরা নিশ্চয়ই শিল্পীদের জাতীয় দেবতা।

বাগের মূর্তিগুলি কালে কালে হতশ্রী হয়ে পড়েছে, চেনা যায় অতি কষ্টে। বাইরের দালানের গুহার প্রবেশদ্বারের ওপর কতকগুলি লোক কথোপকথন করছে, আঁকা আছে। লোকগুলির গায়ের রং কালো; কিন্তু গড়ন ভারী চমৎকার। এই ছবিগুলির আগের দেওয়ালে আরো কতকগুলি ছবি আছে। কিন্তু অত্যন্ত অস্পষ্ট হয়ে গেছে। অবশিষ্ট আছে —কতকগুলি হলদে, লাল, কালো রঙের চিহ্নমাত্র। অন্যদিকের দেওয়ালে একদল মেয়ে নাচ গান করছে। পরনে তাদের সাদা, নীল, হলদে রঙের ডুরে কাপড়, খোঁপায় তাদের ওড়না, আর ফুলের মালা জড়ানো। একজন পুরুষ সেই মেয়েদের দলে গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে হাতের ওপর হাত রেখে কি যেন ভাবছেন। দৃষ্টি তাঁর এই নর্তকীদের ছাড়িয়ে যেন কোন্ সুদূরে চলে গেছে। অনুমান করা যায়, এই ছবিটির বিষয় হলো, সিদ্ধার্থের ‘বুদ্ধ’ হওয়ার আগে, রাজপুরীর বাগানে সখীদের সঙ্গে নাচ-গান আমোদ-আহ্লাদের মধ্যে বসবাস। এর পাশেই একজন অশ্বারোহী রাজপুত্রের লোক-লস্কর নিয়ে শোভাযাত্রার ছবি। এটিও সিদ্ধার্থের জীবন থেকে নেওয়া আলেখ্যবিশেষ বলে মনে হয়। এগুলির পাশে আরো কিছু কিছু ছবি আছে; সেগুলি অস্পষ্ট। এই ছবিগুলি খোলা জায়গায় বহু যুগ ধরে পড়ে থাকার ফলে, ধুলো বালি জমে জমে আর ঝড় বৃষ্টিতে মলিন ও নষ্ট হয়ে গেছে। জল দিয়ে ভিজিয়ে রাখলে, অল্পক্ষণের জন্যে কোনো রকমে নজরে পড়ে। আবার অদৃশ্য হয়ে যায় জল শুকিয়ে গেলেই। এই খোলা জায়গার

ছবিগুলি ছাড়া, বাগগুহায় উল্লেখ করার মতন ভালো অন্য কোনো ছবির নমুনা এখন আর দেখা যায় না। এই সব ছবির ওপর মহাকালের আক্রমণ ছাড়া. সাধারণ লোকেও আক্রমণ কম করেনি। তারা ছুরি দিয়ে কেটে কেটে নিজেদের নাম ধাম লিখে লিখে ক্রমশঃ ছবিগুলিকে আরো নষ্ট করে ফেলেছে। এই ছবিগুলি অজন্তার শৈলীতে আঁকা হলেও, এগুলির ভাবে ও ধরনে স্বতন্ত্র একটি বৈশিষ্ট্য আছে। অজন্তার শ্রেষ্ঠ চিত্রগুলির সঙ্গে এদের তুলনা হতে পারে। বর্ণবিন্যাসে, রেখাঙ্কনে আর পরিমিতিবোধে বাগের শিল্পীরা বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। রঙের মধ্যে নীল আর সাদা রং এখন পর্যন্ত অটুট আছে। 'বাগ' বা অজন্তার শিল্পীরা কি রং যে ব্যবহার করতেন সে বলা শক্ত।

চার নম্বর গুহার হলঘরটি ৯৩½´×৯২´ ফুট, চারকোণা। এই হলঘরের ডানদিকে পাঁচটি আর বাঁ-দিকে আটটি বসবাসের কুঠরি। সবচেয়ে ভেতরের চৈত্য প্রকোষ্ঠের দু-পাশে তিনটি করে ছ'টি শয়ন-ঘর। হলটি প্রথম সারে চৌকোভাবে মোট আঠাশটি থামের সারিতে, পরে, চারপাশে দু'টী করে আটটি গোল, আর ঠিক মাঝখানে পুনরায় চারটি বড়ো বড়ো পাথরের থামে সাজানো ছিল। মাঝের চৌকো, মোটা, বড়ো চারটে থাম, বড়ো বড়ো পাথরের টুকরো দিয়ে গাঁথা। এই গুহার হলের থাম প্রায় সব ধসে পড়েছে। হলটির মাঝখানের উচ্চতা হলো ১৫½´ ফুট। হলের চার পাশের দেওয়ালে এখন ছবি আছে অল্প-বিস্তর। অজন্তার মতন হলঘরের ভেতরের দেওয়ালে মূর্তিচিত্র বা figure drawing বেশি নাই। হলঘরের দেওয়ালের নিচের দিকে কুঠরিগুলির দরজার মাঝখানে একটি করে দাঁড়ানো বুদ্ধমূর্তি, আর তার আশে-পাশে এবং ওপরের অংশগুলিতে লতাপাতা এঁকে ভরানো। এ-ছাড়া, একটি সুন্দর লতাপাতার আলঙ্কারিক চিত্র সমস্ত হলঘরটির দেওয়ালের মাথার দিকে বরাবর আঁকা আছে। লতার এই পরিকল্পনাটি অজন্তা থেকে আলাদা। অজন্তায় এ-রকম পাড়ের মতন নক্সা কোথাও আঁকা নাই। থামগুলিতে আর ছাদের নিচে আলঙ্কারিক চিত্রের নমুনা এখনও কোনো কোনো স্থানে রয়েছে। গুহাটির বাইরের দিকের একটি কুঠরিতে আট সারি ছোট ছোট বুদ্ধমূর্তি আঁকা। এগুলির রং প্রায়ই নষ্ট হয়ে গেছে। অন্য চিত্রাবলীর মধ্যে অনেকগুলি নিখুঁত, কিন্তু অসম্পূর্ণ। প্রাচীন ভারতের বিস্তৃত

নানা কথা-কাহিনী এদের বিষয়বস্তু। এর মধ্যে বৌদ্ধবিহারে সুপরিচিত আঁকার একটি বিশিষ্ট কাহিনী হলো, ভারতীয় রাজসভায় পারস্যের অতিথি। একদল সুন্দরী, অর্ধনগ্না, নৃত্যরতা রঙ্গিনী-পরিবৃত। এ-ছাড়া, চিন্তামগ্না রানী দাসী-পরিবৃতা হয়ে প্রাসাদকক্ষে বসে আছেন। দুটি নীল পায়রা ছাতের ওপর কূজনরত। রাজা ভিক্ষু ও সন্ন্যাসীদের সঙ্গে আলোচনায় ব্যাপৃত। অন্যত্র, হাতীর শোভাযাত্রা তোরণ দিয়ে নির্গত হয়ে শহরের দিকে যাচ্ছে। নদীতীরে অরণ্যছায়ায় উটজগুলি ভারতীয় অতীত সভ্যতার বিবরণ প্রকাশ করছে। রঙ্গের মধ্যে গেরি, এলা আর কালো —চিত্রকর্মের বিভিন্ন স্তরে উজ্জ্বলতম আলো আর গাঢ়তম ছায়াসহযোগে ব্যবহার করা হয়েছে।

গুহাগুলি স্তূপাকারে ভেঙ্গে পড়ার জন্যে অনেক জিনিসই নষ্ট হয়ে গেছে; কিংবা আবিষ্কৃত হয়নি। এখানে এখন শিল্পকলার নিদর্শনের চেয়ে পেঁচা-বাদুড়েরই প্রাদুর্ভাব বেশি। অন্ধকার গুহাগুলির পাথরের প্রকাণ্ড বড়ো বড়ো থাম আর ছাদের বিরাট অংশগুলি এ তার ঘাড়ে এমনভাবে পড়ে আছে যে সহসা সেখানে ঢুকতে ভয় হয়।

ছ'নম্বরের গুহাটি লম্বা-ধরনের একটি হল-ঘর, দু-সারিতে মোট ষোলটি থামে সাজানো। হলটির আয়তন ৯৭½´×৪৩½´ ফুট আর উঁচু হলো ১৪´৭″ ইঞ্চি। পাঁচ নম্বরের গুহাটিতে চারকোণা একটি হলঘরের দু-সারিতে চারটি থাম, আর পাঁচটি আলাদা শয়ন-ঘর আছে। সাত নম্বরের গুহাটি ঠিক ছ'নম্বরের গুহার মতন কুড়িটি থামের সারিতে সাজানো, চারকোণা, আয়তন ৮৮´×৮৬´। এই গুহাটিতে ভাস্কর্যনিদর্শন বিশেষ কিছু নাই। তবে এখানে ছবি ছিল; কারণ, দু'এক স্থানে ছবির জন্যে মাটির জমির চিহ্ন রয়েছে। এই গুহাটি এত বেশি ভেঙ্গে-চুরে পড়েছে যে, ভেতরে ঢোকা যায় না। এখন বাঘের আড্ডা। আট নম্বরের গুহাটিতে কুড়িটি থাম-দেওয়া একটি চারকোণা দালান ছিল। ন' নম্বরের গুহাটির পরিচয় দেওয়া শক্ত; কারণ সবটাই পাথরে চাপা পড়ে আছে। নরম বালি-পাথর আর বিদেশী আক্রমণ বাগগুহার অসম্পূর্ণতা আর ধ্বংসের কারণ।

বাগগুহা আবিষ্কৃত হয়েছে প্রায় দেড় শো বছর আগে। এই গুহার বিষয়ে মোগল আমলের কোনো দলিল-দস্তে উল্লেখ নাই। গুহাগুলির গায়ে

বা ছবিতে পুরাতন কোনো লিপিও পাওয়া যায়নি। বাগগুহা ঘুরে এসে সেখানকার অভিজ্ঞতার বিবরণ অসিতকুমার তখন প্রকাশ করেছিলেন 'প্রবাসী'তে, 'মডার্ণ রিভিউ'তে। এ-ছাড়া, ১৩২৮ সালে তিনি বই বের করেন —'বাগগুহা ও রামগড়'। সে বইয়ের ভূমিকা লেখেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।

১৩২৭ সালে ফাল্গুন সংখ্যার 'শান্তিনিকেতন'-পত্রিকায় আশ্রম-সংবাদে আছে: শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত 'বাঘ' গুহার ও সেই প্রদেশের তাঁহাদের অঙ্কিত বিবিধ চিত্র প্রদর্শন করিয়া সকলকে প্রীত করিয়াছিলেন। সভা সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। আশা করা যায় এই সভা দ্বারা বিশ্বভারতীর সমগ্র অধ্যাপক ও ছাত্রগণের মধ্যে প্রীতির যোগসূত্র গ্রথিত হইবে। —(পৃ ৬২৮)। প্রসঙ্গতঃ, অসিতকুমার লিখেছেন, —'রবিদাদা এই চিত্রপ্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন করেন শান্তিনিকেতনে। বাগগুহায় থাকার কালে রাত্রি জেগে বহু কষ্টে প্রত্যেক ছবির duplicate তৈরি করে ডাকযোগে আমরা আশ্রমে জগদানন্দবাবুর নামে পাঠাতুম। ৪০′×৪½′ ফুট বিরাট চিত্র তৈরি করে আমরা কলাভবনে উপহার দিয়েছিলুম। এরই অনুরূপ একটি রেখাঙ্কনের নকল এলাহাবাদ যাদুঘরে আছে আর এর রঙে সম্পূর্ণভাবে আঁকা নকল লখনউ আর্ট-কলেজের যাদুঘরের সংগ্রহে উপহার দিয়েছিলুম। আসল নকলগুলি আমরা যা' করেছিলুম, এখন গোয়ালিয়ার প্রত্নবিভাগের সম্পত্তি।'

অসিতকুমারের 'বাগগুহা ও রামগড়' বইখানির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশের প্রাচীন কালের চিত্রকলার বিষয়ে যা বলেছেন তার কিছুটা উদ্ধৃত করে দিচ্ছি:

'চিত্রকলাকে আধুনিক ভারত অনেকদিন থেকে অবজ্ঞা করে এসেছে। এ সম্বন্ধে আমাদের চিত্তের অসাড়তা এতদূর এগিয়েছে যে, আমরা যে কেবলমাত্র চিত্র-সৃষ্টি করতে পারছিনে তা' নয়, প্রাচীন ভারতের চিত্র-রচনারীতি আমরা বুঝতেই পারিনে, তাকে আমরা ব্যঙ্গ করতে ছাড়িনে। আমরা যখন স্বাদেশিকতার অভিমানে উন্মত্ত হয়ে উঠি তখনো এই কথাটি বুঝতে পারিনে যে, যে জাতি কলাবিদ্যায় আপন চিত্তের পরিচয় দেয়নি, সে জাতি মহাপ্রাণ জাতি নয়। তা-ছাড়া এ-কথা আমরা মনের দৈন্যবশতই

ভুলেছি যে, একটুকরো কাগজে একটুখানি ছোট ছবি যদি সত্য করে আঁকতে পারি তার দ্বারা নিত্যকালের কাছে দেশের যে পরিচয় প্রকাশ হবে তা' রাষ্ট্রপতির ক্ষেত্রে খবরের কাগজের ধ্বজা আস্ফালন করেও হবে না। অজন্তার সময়কার রাষ্ট্রীয় ঐশ্বর্যের একটি ক্ষুদ-কুঁড়োও আজ ভারতের ভাগ্যে বাকি নেই কিন্তু অজন্তাগুহার ভিত্তিচিত্রে তখনকার ভারত যে লিপিখানি লিখে গেছে সেই লিপি যুগ হতে যুগান্তরে আপন বাণীকে প্রচার করে চলেছে।'

১৯২০ সালের জানুয়ারী মাসে শ্রীমুকুলচন্দ্র দে-ও বাগগুহায় গিয়েছিলেন। তাঁর অভিজ্ঞতার বিস্তৃত বিবরণ 'My Pilgrimages to Ajanta & Bagh' গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন ১৯২৫ সালে। হিন্দু বৌদ্ধ নানা তীর্থযাত্রী কালেকালে দেশ-বিদেশ থেকে বাগ-তীর্থে আনাগোনা করেছেন। ধর্ম, দর্শন, শিল্পাদির বিশেষ দিক্ ছিল এখানে তাঁদের জানবার বিষয়। বাগের চিত্রসম্ভার ও ভাস্কর্য অজন্তার চেয়ে কম হলেও অনুরূপ সুন্দর। বাগ-চিত্রাবলীর প্রাচীন শ্রেষ্ঠশিল্পকর্মসমূহ এখনও অটুট; টিকে আছে যেন যুগে যুগে ভারতশিল্পীদের অনুপ্রেরণার আদর্শ হয়ে। বিভিন্ন নিদর্শন দেখে মনে হয়. এই শিল্পকর্ম বৌদ্ধধর্মের চরম উন্নতির সময়ে চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শতাব্দের মধ্যে মূলতঃ আদিবাসী কোল-গোষ্ঠীর নাগবংশীদের কৃতি। পরে হুণ, ইসলাম ইত্যাদি নানা বিদেশী আক্রমণে এদের ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে গিয়েছে। খৃস্টীয় চতুর্থ থেকে সপ্তম শতাব্দ পর্যন্ত পশ্চিম ভারতে বৌদ্ধধর্মের বিশেষ স্ফুরণের যুগ। এর পর সপ্তম থেকে অষ্টম শতাব্দের মধ্যে এ-সব ধ্বংস হয়েছিল। ফলে, দশম শতাব্দের মধ্যেই বৌদ্ধধর্মের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে বাগগুহাও পরিত্যক্ত হয়ে যায়। প্রাগ্-বৌদ্ধযুগে হিন্দু, আবার পর-বৌদ্ধযুগে হিন্দু ব্রাহ্মণদেরই প্রাধান্য বাক্-অঞ্চল জুড়ে। আঠারো শতাব্দ থেকে এখানে সিন্ধিয়ার মহারাজদের অধিকার, পরে গোয়ালিয়ার স্টেটের। রাজপুতদের আসার আগে পশ্চিম ভারতে কোল-গোষ্ঠীই ছিল প্রধান। কালে সব বদল হয়েছে। কিন্তু, হিন্দু ও বৌদ্ধ শিল্পকর্মকে ছাপিয়ে এখনও গ্রামের লোকের মনে টিকে রয়েছে তাদের মৃৎশিল্প আর লাক্ষাশিল্পের গৌরব।

অজন্তা, বাক্, শ্রীগিরির ভাস্কর্য আর দেওয়ালচিত্র ভারতবর্ষের

জাতীয় মহান্ ঐতিহ্য ; ভারতের অতীত সভ্যতার মূল্যবান্ দলিল এবং আপন শিল্পগুণে অনন্য। মানুষের অবহেলা আর বিশ্বপ্রকৃতির বিরূপতা সত্ত্বেও এ সব আজও টিকে আছে, এই আশ্চর্য। তবে, হাজার হাজার বছরের অতুল ঔজ্জ্বল্য ফিকে হয়ে আসছে দিনে দিনে। এখনও সময় আছে অবশিষ্টগুলিকে টিকিয়ে রাখার। বিভিন্ন গুহাচিত্রের রঙিন এ্যাল্‌বাম্ তৈরি করলে জগতে সে এক অমূল্য কাজ হবে। তা'থেকে আবার দেখা যাবে, মানবজীবনের পরিপূর্ণ প্রকাশের নিপুণতম স্মৃতিরেখা'।

॥ নন্দলাল-কথিত বাগগুহার অভিজ্ঞতা ॥

এই কাহিনীটি শ্রীমতী রাণী চন্দ আচার্য নন্দলালের মুখে অনেকবার শুনে, ১৩৪৮ সালের আশ্বিন সংখ্যার প্রবাসীতে প্রকাশ করেন। আমরাও আচার্য নন্দলালের মুখে এই কাহিনীটি শুনেছি। বর্তমানে প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত দু'টী পাঠ থেকে সংকলন করে দেওয়া গেল।—

'গোয়ালিয়র রাজ্য থেকে হঠাৎ একদিন নেমন্তন্ন এলো —মালবদেশের বাগগুহায় যেতে হবে ; গুহার দেওয়ালে যে ছবি আছে তার অনুলিপি করতে হবে। ওরা দেবে আমাদের টি. এ. আর হল্‌টিং বাদে মাথা-পিছু দু'শো টাকা করে মাসে। টাকার লোভটা অস্বীকার না করে, বাগগুহার ফ্রেস্কো দেখা, আর তার কপি করবার লোভ, এর সঙ্গে জুড়ে দিয়ে রাজী হয়ে গেলুম।

'আমি, অসিত আর সুরেন রওনা হলুম তিন জনে শুভ দিনক্ষণ দেখে —১৯২১ সালের ১লা জানুয়ারী। সঙ্গে গেল কলকাতা থেকে একটি ভৃত্য —নাম তার ইন্দ্র, বাস তার ওড়ে, যুদ্ধ-ফেরৎ মেসোপটেমিয়া থেকে ; ফলে, চটপটে খুব আর চৌকোস তো বটেই।

'ট্রেনে উঠলুম হাওড়া স্টেশন থেকে। বাঙ্গালী সাজ—মাথায় চড়ানো গান্ধী টুপি। ট্রেনে ভিড় ছিল না, হাত পা ছড়িয়ে দিব্যি আরাম করে বসার মতো জায়গা পেয়েছি। কিন্তু কপালে এ-আরাম সহ্য হলো না বেশিক্ষণ ; ভিড় বাড়তে লাগলো ক্রমশঃ আর সঙ্গে সঙ্গে পাগড়ির বহর।

ট্রেন যত এগিয়ে চলছে, পাগড়ির পর পাগড়ি উঠে আমাদের ঠেসে চলেছে। ক্রমে ২রা তারিখে ট্রেন যখন এসে পৌঁছলো মির্জাপুরে, তখন দেখি কি, পাগড়ির চাপে চাপে আমাদের গান্ধী-টুপি কোথায় যেন হারিয়ে গেছে —ফুট-কড়াইয়ের মতন। ট্রেন থেকে দূরে দেখা গেল, বাজরে ক্ষেতের ওপর মাচা বেঁধে চাষীরা পাখী তাড়াচ্ছে। দড়িতে ঢিল বেঁধে বেঁধে ছুঁড়ে দিচ্ছে। সেই ঢিল খেয়ে পাখী মরে যায় (দ্র স্কেচ্ বুক ২।২২)। ট্রেন থামলো এসে সকাল ন'টা নাগাদ ক্যাণ্টন মাউতে। মাউ থেকে ধার স্টেশন —যেতে হবে মোটর-বাসে চল্লিশ মাইল। ধার থেকে আবার যেতে হবে গরুর গাড়িতে ষাট মাইল, —তবে মিলবে 'বাগ'-গ্রাম। বাগ-গ্রাম থেকে বাগগুহা হলো তিন মাইল। আমাদের জন্যে সব বন্দোবস্ত ঠিক্ করে রেখেছিল স্টেট থেকে। বাসে ওঠা গেল তল্পি-তল্পা নিয়ে। বেলা তিনটের সময়ে পৌঁছলুম ধার স্টেশনে। এর মধ্যে রাস্তায় খাবার খেয়ে নিলুম সঙ্গে যা আনা হয়েছিল। ধারে পৌঁছে রাত্রের খাবার জন্যে দোকান থেকে কিছু খাবার করিয়ে নিলুম। খাবার পরে একটু বিশ্রাম করে গরুর গাড়িতে উঠতে যাবো, এমন সময় দেখি কি, আমাদের অসিত আর নড়তে পারে না। পায়ে তার হাঁটুর কাছে ফুলে রয়েছে আর দারুণ ব্যথা, পথে ঠাণ্ডা লেগে থাকবে। চিন্তিত হলুম। ওকে বললুম, কোনো রকমে গরুর গাড়িতে উঠে যেতে পারবে কিনা, নইলে বাধ্য হয়ে এখানেই অপেক্ষা করা যাবে কিছুদিন। যত তাড়াতাড়ি করে পারা যায়, তখন বাগগুহায় পৌঁছবার জন্যে আমাদের সবারই মন ব্যাকুল, অসিতেরও আর দেরি সইছে না। সে বললে, —গরুর গাড়িতে যেতে পারবো দাদা, তবে একটি কাজ করতে হবে। তুলোর প্যাডে প্যাক-করা আঙুরের মতন করে আমাকে নিয়ে চলো।

'গরুর গাড়ি মোতায়েন ছিল খানতিনেক। তার একটাতে আমাদের সঙ্গের সব লেপ-তোশক পেতে নরম গদি বানিয়ে অসিতকে ধরাধরি করে তার ওপরে শুইয়ে দিলুম। আর একটা গাড়িতে উঠলুম আমি আর সুরেন। তিন নম্বরে উঠলো মালপত্র নিয়ে আমাদের ইন্দ্র। এক-সারিতে তিন খানা গরুর গাড়ি সমানে চললো চার দিন। রাস্তায় স্নানাহার সেরে নিতুম ডাকবাঙলোতে নেমে নেমে। ডাকবাঙলোগুলি খুব ভালো, আর তার ব্যবস্থাও উত্তম ; ফলে, বিশেষ কোনো অসুবিধা হয়নি। জনমানবহীন

পথ বেয়ে ছোট ছোট নদী পেরিয়ে যেন ছবির রাজ্যের রাস্তা ধরে চলেছি। অচেনা দেশ. গরুর গাড়ি চলছে বন-বাদাড়ের ভেতর দিয়ে —ভয় ভয় করতো বইকি রাত্রিবেলা। গাড়ির সামনে আর পিছনে লম্বা কাঠের আর টিনের চোঙ —এতে ছিল আমাদের কাগজ, ক্যানভাস —গোটানো। সেই চোঙগুলো সাজিয়ে রাখতুম আর আমরা এমনভাবে বলাবলি করতুম, যেন গাঁয়ের লোকেরা ভেবে নেয় সেগুলো আসল বন্দুক বলে। নির্জন পথে লোক-চলাচল প্রায় চোখে পড়ে না —দূরে দেখা যায় মাঝে মাঝে ছোটো ছোটো গ্রাম গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে।

'চারদিনের দিন এসে পৌঁছলুম বাগগুহাতে। পৌঁছলুম সন্ধ্যাবেলায়। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে, ছোটো ছোটো টিলা চলে গেছে পরের পর; তার ওপর দাঁড়িয়ে চীৎকার করছে কুকুরের দল —নতুন লোকের সাড়া পেয়ে। নিচে দেখা যাচ্ছে. সাদা সাদা ক'টি তাঁবুর মাথা, আরো দূরে দেখা গেল বাগগুহার বড়ো পাহাড়ের চুড়ো। কাছ এসে দেখি, পাহাড়ের নিচে তাঁবু খাটানো পাশাপাশি তিন-চারটে। তার একটি নিলুম আমরা তিন জনে; আর-একটি নিলে ওখানকার প্রত্নতত্ত্ববিভাগের কর্তা। নাম বোধ হয় তাঁর গারদে সাহেব। আর একটিতে এক ওভারসীয়র, জাতিতে মারাঠী ব্রাহ্মণ। কাজ করেন তিনি গারদে সাহেবের সঙ্গে; আর ছিলেন তাঁদের কর্মচারী দু-একজন। আর একটি তাঁবু দখল করে নিলে আমাদের ইন্দ্র তার রান্না-বান্নার জিনিসপত্র নিয়ে। তাঁবুর সামনে আগুন জ্বালাবার ব্যবস্থা সারারাত ধরে। এদিকে আমাদের অসিতের পায়ের ব্যথাটাও সেরে গেছে অনেকটা।

'গত ক'দিনের পথশ্রমে সবাই আমরা অবসন্ন। তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুয়ে, মালপত্র কোনোরকমে একটু গোছগাছ করে নিয়ে, সামান্য কিছু খেয়েদেয়ে, শোবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। দু-দিকে বিছানা, আমার আর অসিতের; সুরেনের হলো মাঝখানটিতে। বিছানা পাতা হচ্ছে, এমন সময়ে সহসা তাঁবুর একদিকের খোঁচ্-দড়িটা নড়ে উঠলো জোরে ধাক্কা লাগার ফলে। সঙ্গে সঙ্গে লোকজনদের চীৎকার, কুকুরের ঘেউ ঘেউ, ভীলদের টিন-কানেস্তারা পিটুনির শব্দে চারদিকে হৈ চৈ। তাঁবুর বাইরে এলুম ব্যাপার জানতে। আমাদের যুদ্ধ-ক্ষেত্রে বীর ইন্দ্র হাউমাউ করে এসে আছড়ে পড়লো আমার সামনে। ব্যাপার কি? —একটা বাঘ ইন্দ্রের আর আমাদের তাঁবুর মাঝখানের খালি রাস্তাটা

দিয়ে সদর্পে চলে গেল এই মাত্র! বুঝলুম তারই ধাক্কা লেগেছিল আমাদের তাঁবুর দড়িতে। মুখ শুকিয়ে গেল আমাদের। কি করে থাকবো এখন এখানে প্রাণটি হাতে নিয়ে —বাঘের পেটে যাবার ভয়ে জড়সড় হয়ে। গলা দিয়ে কারো আর রা বেরুচ্ছে না। বিছানায় তো শুলুম, ঘুম আসে না, পড়ে আছি পাথরের মতন। আবার বাঘের গর্জন মাঝরাত্রে। 'সাপের লেখা' ছিল বটে ছেলেবেলায়; কিন্তু, 'বাঘের দেখা' এখানে এসে এভাবে পাবো সে ভাবিনি কখনও!

'পরে অবশ্য সয়ে গেল অনেকটা। পাহাড়ের গা বেয়ে ছোট একটি নদী আমাদের তাঁবুর পাশ দিয়ে নেমে গেছে নিচে। বাঘেরা নির্জন পথে যাওয়া-আসা করত এই দিক্ দিয়েই। তাদের আনাগোনার সাড়া-শব্দ প্রায়ই কানে আসত। আশে-পাশে থাবার দাগ নজরে পড়ত হামেশাই। সে-রাত্রে অসিত কিন্তু কিছুতেই রাজি হলো না পাশের বিছানায় ঘুমুতে। অগত্যা তার শোবার ব্যবস্থা করা হলো আমার আর সুরেনের বিছানার মাঝখানে। এর পর থেকে আমরা ওখানে যতদিন ছিলুম অসিত এই ব্যবস্থার আর নড়চড় হতে দেয়নি।

'পর দিন সকাল হতেই সবাই মিলে গেলুম বাগগুহাতে। আমাদের তাঁবু থেকে গুহার দূরত্ব আধ মাইলেরও কম। সঙ্গে আমাদের গারদে সাহেব আর সেই ওভারসীয়র ভদ্রলোক। গুহার সামনে বারান্দা —তার ছাদ ভেঙ্গে গেছে কবে তার ঠিক নাই। বৃষ্টির জল পড়ে চুইয়ে চুইয়ে দেওয়ালের গায়ে ছবির ওপর দিয়ে। দেওয়ালে ছবি দেখা যায় না কিছুই —একাকার হয়ে গেছে সব কালচিটে রং ধরে। গারদে সাহেব হুকুম দিলেন, আর ওখানকার চৌকিদার এসে ঘড়ায় জল ভরে এনে ছবির গায়ে ছিটিয়ে দিতে লাগলো। দেওয়ালের গায়ে জল লাগার ফলে ছবিগুলো একটু একটু করে ফুটে উঠছে, আর সেই সঙ্গে দেখা গেল জল লাগার ফলে, দেওয়ালের আস্তরও ঝরে পড়ছে ঝুরঝুর করে। কি করা যায় ভাবছি। ছবি দেখতে চাইলে জল ছিটোতে হয়, আর জল লাগলে দেওয়ালের মাটি ঝরে পড়ে ছবি সুদ্ধ। কিন্তু, এ অন্যায় আর্টিস্ট্ হয়ে বরদাস্ত করা যায়

না। সেদিনকার মতো ওদের জল ঢালা থামিয়ে দিলুম।

স্পঞ্জের টুকরো সঙ্গে ছিল আমাদের। পরদিন সেই স্পঞ্জ এক একটা লম্বা সুতোর ডগায় বেঁধে নিয়ে গেলুম পাহাড়ে ছবির ট্রেস্ করতে। আমরা এক-এক জন এক-একটি স্পঞ্জ নিয়ে তার সুতো দাঁতে কামড়ে ধরে ঝুলিয়ে দিলুম। তারপরে ভিজে স্পঞ্জ অল্প অল্প করে দেওয়ালে বুলোতে ছবি বেশ দেখতে পাওয়া গেল। কিন্তু তার ওপর ট্রেসিং-পেপার চাপাতে ছবির যেটুকু চোখে দেখা যাচ্ছিল, কাগজের ভেতর দিয়ে তা গেল না। বড়ো বিপদে পড়া গেল। অসিতকুমার বললেন, —উপায় বাতলাও দাদা, এ রকম করে তো চলবে না।

'সহসা আমার মনে পড়লো —আরাইসানের কথা। তাঁকে একবার দেখেছিলুম একভাবে ট্রেস করতে। (দ্রষ্টব্য ডায়েরি সংখ্যা ৩)। আমিও ধরলুম সেই পন্থা। ট্রেসিং-কাগজ বাঁ হাতে গুটিয়ে নিয়ে একটু একটু করে বারবার তুলে ছবি দেখে নিই আর ট্রেস্ করি। এমনি করে বেশ কাজ চলে যেতে লাগলো। এখন নতুন সমস্যা হলো আমাদের তিন জনের মধ্যে কে কোন্ দিক্‌টা আঁকবে। কিছুই বুঝতে পারছি না, দেওয়ালে কি ছবি আছে, আর তার কতখানিই-বা দেখতে পাবো। লটারি করলুম। আমি পেলুম মাঝখানটা —তাতে ছিল নাচের গ্রুপ; অবশ্য তখন কিছুই জানতে পারিনি। অসিত পেলেন ডান দিক্‌টা —তাতে ছিল হাতী-ঘোড়ার শোভাযাত্রা। সুরেন পেলেন বাঁ দিক্‌টে —সেখানে রাণী গালে হাত দিয়ে বসে ভাবছেন।

'এবারে কাজ শুরু করে দেওয়া গেল পুরো দমে। গারুদে সাহেব প্রথম থেকেই আমাদের প্রতি যেন বিরূপ। আমরা যখন কাজ করতুম তখন প্রায়ই দেখা যেতো তিনি মুখ টিপে টিপে হাসছেন আর থেকে থেকে প্রশ্ন করছেন, —আজ ক্যা মিলা ? হৃদিস মিলা কুচ ? বলতুম তাঁকে —হ্যাঁ, আজ পেলুম একটা হাত, আজ জামার খানিকটা, আজ একটা নাক, আজ পদ্মপাতা —এই সব। অবনীবাবুকেও আমরা চিঠি দিয়ে জানাতুম, —ভারী মজা লাগছে আমাদের। রোজই ছবি থেকে নতুন কিছু-না-কিছু আবিষ্কার করছি আমরা। উত্তরে তিনি লিখলেন, —'নতুন জিনিষ দেখছ বটে কিন্তু যাঁকে দেখে তাঁরা ঐ সব ছবি এঁকে গিয়েছেন

তিনি তোমাদের পিছনে দাঁড়িয়ে —তাঁর দিকেও ফিরে ফিরে দেখো।' —এই রকম গভীর ইঙ্গিত দিয়ে গুরু আমার, আমার জীবনে কতবার যে চোখ ফুটিয়ে দিয়েছেন তার ইয়ত্তা নাই! যা ভুলে থাকতুম, মনে করিয়ে দিতেন তিনি।

'কিছুদিন পরে যখন ছবির সবটা প্রায় ট্রেস্ করে এনেছি, একদিন গারুদে সাহেব এসে বললেন, —দেখিয়ে জী, হমারা পাশ ইস্ ভিত্তিচিত্রকা তস্‌বিরকে আলোকচিত্র হৈ। অনেক আগেকারের তোলা এই ফটো —তখন ছবিগুলো দেখা যেতো পরিষ্কারভাবে। যাই হোক্, খুব রাগ হলো গারুদে সাহেবের ওপরে। ভদ্রলোক কি আমাদের কাজের পরীক্ষা করছিলেন! এই ফটোটা আগে পেলে মুশকিল আসান হতো আগেই। অন্ধকারে হাতড়ে চলতে হতো না আমাদের।

'যাই হোক্, এর পরে ছবিতে রং দিতে শুরু করলুম। আমাদের সঙ্গে কথা ছিল, আমরা যে যে ছবি কপি করবো তার এক সেট্ আমাদের শান্তিনিকেতনের কলাভবনের জন্যে আনতে পারা যাবে। কিন্তু সে-কাজ আমরা শুরুই করতে পারছি না। গারুদে সাহেব দিনই বলেন, অনুমতি চেয়ে লেখা হয়েছে, অনুমতি-পত্র আসামাত্র আপনারা duplicate copy করতে পারবেন। এদিকে আর এক আপদ: লুকিয়ে যে অন্ততঃ একটু ট্রেস্ করে রাখবো তারও উপায় নাই। গারুদে সাহেব সারাক্ষণ পাহারা তো দিচ্ছেনই, উপরন্তু, সেই ওভারসীয়র ভদ্রলোকটি!

'রোজ সকালে চা খেয়েই আমরা চলে যেতুম গুহাতে। দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সারা হতো ওখানেই —নিয়ে আসতো ইন্দ্র নিয়মিত। তাঁবুতে ফিরতুম একেবারে সন্ধ্যের সময়। প্রথম প্রথম গারুদে সাহেব বলতেন, —আপনারা তো নিয়ম-মাফিক দশটা-চারটে খাটলেই পারেন। এতো বেশি খাটবার দরকার কি। কিন্তু, আমাদের লক্ষ্য ছিল অন্যরকম! আমরা ভেবেছিলুম, —তাড়াতাড়ি ছবিগুলো শেষ করে দিতে পারলে, কলাভবনের জন্যে কপিগুলো ওখান থেকেই করে আনতে পারা যাবে।

'আমাদের রান্না করতো ইন্দ্র। আশে-পাশে ছিল ভীলদের গ্রাম।

সেই গ্রাম থেকে আসতো দুধ ডিম মুরগী —এই সব। প্রথম দিকে এ-সব পেতে বড়ো অসুবিধে হতো। স্টেটের চাপরাসীকে দিয়ে হাটবাজার আনালে খরচ পড়তো প্রায় দুনো। নতুন দেশ, হালচাল জানা নেই, চিনিও না কাউকে। যে দাম চায় ওরা দিতে হয় তাই। কিন্তু, এমনি করে তো চলা মুশকিল। একটা যুক্তি আঁটা হলো। সঙ্গে আমাদের ওষুধপত্র ছিল কিছু, আর বটকৃষ্ণ পালের দোকানে লিখতে পেটেন্ট ওষুধ যত ছিল ওঁরা পাঠিয়ে দিলেন। আমাদের সেই ডিস্‌পেন্‌সারি থেকে কাছাকাছি গাঁয়ের লোকেদের ছোটখাটো রোগের চিকিৎসা শুরু করে দিলুম আমরা। রোজ সন্ধ্যার পরে আমাদের তাঁবুর সামনে ভিড় জমতো ভীলদের। ওষুধ বিলি করতুম আমরা। তাদের উপকার হতো আর আমাদের সন্ধ্যেটাও কাটতো ভালো। শেষে তারাই দুধ, ডিম, মুরগী-টুরগী সস্তায় দিয়ে যেতো আমাদের। এভাবে মুরগী জমতে জমতে আমাদের সে-একটা দস্তুর মতো পোল্‌ট্রি হয়ে গিয়েছিল। কুকুরও পুষেছিলুম দু-টো। গুহাতে গিয়ে একদিন দেখি কি, বড়ো একটা পাথরের পাশে দুটো কুকুরছানা কেঁউ কেঁউ করছে। সঙ্গে ছিল ভীল চাকর, ফাইফরমাশ খাটতো সে। রং, কাগজ বয়ে আনা, এই রকম সব টুকিটাকি খাটুনি খাটতো। তার কাছ থেকে জানলুম, প্রায়ই নাকি এমনি পথে-ঘাটে ওরা কুকুরের ছানা ফেলে দিয়ে যায় বাহুল্য বোধ করলে। পরে, যথাসময়ে বাঘে শেয়ালে খেয়ে নিলে বালাই বিদায় হয়। যাই হোক, আমরা ছানা-দুটীকে নিয়ে এলুম আমাদের তাঁবুতে। ইন্দ্র স্বয়ং তাদের খাইয়ে-দাইয়ে নানা রকম খেলার প্যাঁচ শিখিয়ে মনের আনন্দে দিন গুজরান করতো।

'কাছাকাছি গাঁয়ের লোকেরা কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের যেন নিজের লোকের মতন হয়ে গেল। তাদের শরীর কি সুন্দর। কুচকুচে কালো রং —যেন কষ্টিপাথরে খোদাই-করা মূর্তি সব। ছেলেদের বুকের ছাতি চওড়া যেমন, সেই অনুপাতে সাহসও তেমনি। বেশভূষার নেই কোন বাহুল্য —নেংটি একটি সেরেফ আর আভিজাত্য রক্ষার জন্যে কারো সেই নেংটিতে আবার সূচী-কর্ম করা। আর গায়ে জড়ানো বড়ো চাদর একখানি। মেয়েদের পরনে ঘাগরা, বুকে কাঁচুলি আর গায়ে ওড়না। শান্তিনিকেতনে যখন ফিরে এলুম সেই ঘাগরা কাঁচুলির নমুনা এনেছিলুম

সঙ্গে করে। সেবারে বসন্ত-উৎসবে সে-সব কাজে লেগেছিল। দোলের সময়ে শান্তিনিকেতনের অক্ষয়বাবু, তেজুবাবু সেই ঘাগরা কাঁচুলি পরে নেচেছিলেন —দিনুবাবুর গানের সুরে তালে তাল মিলিয়ে।

'ভীলদের বাড়িগুলি খুব মজার। এক-একটা টিলার ওপর তিন-চার বাড়ির বসতি। চারপাশে তার বেড়া-বাঁধা ঘন কুল-কাঁটার; উঁচু সে প্রায় দু'মানুষ-ভোর। বাঘের উপদ্রব ঠেকাতে এই প্রতিরক্ষা। পেতেনের ওপর-নিচে করে, গরু-ছাগল নিয়ে, থাকে ওরা একঘরেই। শিকার করতে ভালোবাসে খুব; চাষবাস তো করেই। ভুট্টা হলো এদের প্রধান খাদ্য। আমাদের ভাতের মতন এদের নিত্যকার খাদ্য হচ্ছে —'রেউড়ি'। প্রথমে ভেবেছিলুম, কথাটা আসলে বোধহয় —'রাবড়ি'। রাবড়ির আভাস পেয়েই মনটা খুশ্ হয়ে উঠেছিল! খুব মজা করে রোজই রাবড়ি খাওয়া যাবে। একদিন বললুম ওদের, —আনো তোমাদের 'রেউড়ি'। সন্ধ্যের সময়ে একজন ভীল ভারি যত্ন করে নিয়ে এলো পাতার ঠোঙ্গাতে করে। ও হরি, এ যে ভুট্টাসিদ্ধ! —আমরা তিন জনে হতাশ হয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করি।

'ভুট্টা কুটে সেদ্ধ করে মাটির হাঁড়িসুদ্ধ নিয়ে বসে ঘরের গিন্নি, আর তৈজস একটা কাঁসার বাটি। চারদিকে তার ঘিরে বসে ঘরের ছানা-পোনারা। পাতার ঠোঙ্গা সবার হাতে। গিন্নি সেই বাটি করে 'রেউড়ি' তুলে দেয় সবাইকে, যে-যেমন —বেঁটে বেঁটে। লবণ ওদের কচিৎ মেলে; সেটা হলো বিলাস-ব্যসন, মেলে বটে বরাত জোরে। গ্রামের লোকের সঙ্গে মেশায় গার্দে সাহেব বিরূপ হতেন, লাগতো আঘাত তাঁর প্রেস্টিজে। কিন্তু তাঁর সে পছন্দে কি এসে যায় শিল্পী আমাদের। ভীলদের সঙ্গে মিলে মিশে খুব খুশিতেই দিন কাটাতুম। সারাদিন চলতো কাজ গার্দে সাহেবের কড়া পাহারায়, আর সন্ধ্যে কাটতো ভীলদের দলে শান্ত সরল পরিবেশে।

'মন করতো উড়্ উড়্ শান্তিনিকেতনের কথা ভেবে। সেখানকার সব বন্ধু সুজন, গাছপালা আর খোয়াই মাঠ —সব কিছুরই অভাব-বোধে মনটা হতো বেজায় ফাঁক। চাঙ্গা হয়ে উঠতুম বসে শান্তিনিকেতনের চিঠি পেলে,

খামের ভেতর মোড়ক খুলে পেতুম রসের অগাধ পাথার চক্ষু মেলে। দিনুবাবু একবার ছাড়লেন :

ভো ভো শিল্পীত্রয়
লেখনীর তীর জুড়ি কর ধনুখান,
ছাড়িল তিনেরে লখি শব্দভেদী বাণ।
সে বাণ বিঁধিল কারে পথ মাঝখানে ?
কে সে জন নিল হরি' খোদা-তাল্লা জানে।
তিন তিন মহাবীর এক হেথা দীন,
তুলি রঙে মারে টান ছোটে 'গয়া' 'চীন'।
শব্দেরে আটকি' জব্দ কর রেখা টানে
এ ভোঁতা কলম তাই লাজে হার মানে।
কলাভবনের কালা বঁধু নন্দলাল
ভীলেদের মথুরায় ? —হায় রে কপাল !
ইন্দ্রপুরী আধা রচি শচীশূন্য সুর
থ্রি-কাসেল ধোঁয়া —স্বর্গে ভাবরসে চুর।
হলধর অসিত সে বলরাম সম
বয়সে কালার ছোট উচ্চে দাদাতম—
উড়ায় বিরহ-তাপ হাসির দাপটে,
সে রসে বঞ্চিত —তবু চাতাল তো বটে।
অসহযোগিতা চিঁড়ে ভেজে না কথায়,
অসহ বিরহ জ্বালা সহিয়া হোথায়
যোগীত্রয় গুহামাঝে করিতেছ বাস—
এরাই গাঁধীর চেলা, সাবাস সাবাস।
বুরোক্রাসি বুড়খাসি করিতে জবাই
ছেলে —বুড়া, বাবা, খুড়া লেগেছে সবাই।
কলিকাতা এলো রাজা জারজের খুড়ো,
খেয়ে গেল ঝাঁটা, তাও একেবারে মুড়ো।
কেন মিছে আছ পড়ি গুহার গরতে
মরতের জীব ফিরে এস গো মরতে ॥

—এই ধরনের চিঠি আবার সব আমাদের বরাবরে এসে পৌঁছত না। যাই হোক্, কোনওরকমে এসে পড়লে, 'তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম' আরাম —সে-কথা না-বললেও বুঝবে।

'কাজ তো চলছে। কিন্তু আমাদের জন্যে ছবি আঁকার অনুমতি আর কিছুতেই মিলছে না। গার্‌দে সাহেব নিত্যি নিত্যি ভাঁওতা দেয়, —এ-দিকের কাজ শেষ করুন, অনুমতি-পত্র ঠিক্ এসে যাবে। কিন্তু, বুঝছি, ব্যাপার সুবিধের নয়। অসিতের সঙ্গে যুক্তি আঁটতে লাগলুম, কি করা যায়। গার্‌দে সাহেব আশা দিয়েই রাখবেন; ফিরতে হবে খালি হাতে। লুকিয়ে কিছু করার জো নাই —ওদের লোক দিনরাত তাক্ করে ঘুরছে।

'এর মধ্যে একদিন সুখবর এলো, গার্‌দে সাহেব বাইরে যাচ্ছেন কিছুদিনের মতন। শুনে মনটা নেচে উঠলো। এবারে সুযোগ মিলবে— আমরা যা' চাইছি। কিন্তু কপাল মন্দ। গার্‌দে সাহেব তাঁর ওভারসীয়রকে এমন তালিম দিয়ে গেছেন যে তিনি আবার 'দাদার বাবা'। খুব রাগ হলো আমাদের। এদিকে কিন্তু ওভারসীয়রের কাজ দেখার ভার ছিল আমার ওপর। মনে মনে দুষ্টুবুদ্ধি এঁটে নিলুম। —পঁচিশ-তিরিশ ফুট ওপরে এক কোণায় ছাতের সীলিং-এ একটা চৌকো ডিজাইন ছিল। তাঁকে বললুম,—আঁকতে হবে ওটা। কথাটা শুনে ভড়কে গেলেন তিনি। বললেন, অতো উঁচুতে উঠবো কি করে! পারা সম্ভব নয়। আমি বললুম,—সে ব্যবস্থা করা হচ্ছে।—লোক লাগিয়ে ঐ উঁচুতে ভারা বেঁধে একটা দড়ির খাটিয়া ঝুলিয়ে দেওয়া হলো। বললুম,—আঁকুন এবারে। বেচারার মুশকিল তখন। চামচিকে, বাদুরের উৎকট গন্ধ ওখানে। তিন দিনের দিন 'কলিক'-ব্যথায় মর-মর অবস্থা তাঁর। সাত-তাড়াতাড়ি তাঁকে তাঁবুতে এনে সেবা করতে লাগলুম আমরা সবাই মিলে। সঙ্গে ওষুধ ছিল; আমাদের সেবাযত্নে ক'দিনের মধ্যেই তিনি বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। আর অসুখে সেবা পেয়ে আমাদের ওপর মনটাও তাঁর খুব নরম হয়ে গিয়েছিল। একদিন বলেই ফেললেন, গার্‌দে সাহেবের পেটের কথা। তিনি সাবধান করে

দিয়ে গেছেন ওঁকে, যেন কিছুতেই আমরা ট্রেসিং করতে, বা কপি করতে না-পারি। আরও বলে গেছেন, তিনি আসবেন ৬ই; কিন্তু, প্রকাশ থাকবে ১০ই। তিনি আসবেন উল্টো পথে, পথের হদিস অপ্রকাশ থাকবে। সহসা এসে দেখবেন তিনি, চুরি কোথাও হচ্ছে কিনা। —এদিকে ওভারসীয়রেরও রাগ ছিল সাহেবের ওপর নানা কারণে। তিনি বললেন,—এই ফাঁকে আপনারা কাজ সেরে নিন। আমি কাকেও কিছু বলবো না। —আর আমাদের পায় কে? দিন-রাত ধরে তাঁবুর ভেতর বসে বসে তিন জনে মিলে আগের ট্রেসিং থেকে ট্রেস্ করছি। ওভারসীয়রবাবুও আমাদের কাজে যেন সাহায্য করতে লাগলেন। ইন্দ্রকে বসিয়ে রেখেছি এমন জায়গায়, যেখান থেকে রাস্তা আর আশ-পাশের চারদিক অনেক দূর দেখা যায়। উদ্দেশ্য হলো, গারুদে সাহেবকে লক্ষ্য করা। খবর পাওয়ামাত্র সব সামলে ফেলবো আমরা। সব ব্যবস্থা ঠিক্। তিন জনে উপুড় হয়ে বসে বসে ছবি ট্রেস্ করছি, অর্ধেকের বেশি শেষ হয়েছে—হঠাৎ দেখি, গারুদে সাহেব, —একেবারে তাঁবুর ভেতরে! —এ কী ব্যাপার! অসিত হকচকিয়ে তুলি রং ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছে। আমি তাড়াতাড়ি তার হাত চেপে ধরে বসিয়ে দিলুম। গার্দে সাহেব তো রেগে টং। বললেন, —আবার কেন ট্রেসিং করা হচ্ছে? উত্তরে বললুম, —দেওয়ালের যা অবস্থা —জল লাগলেই তো ঝরে যাচ্ছে। কবে কি হয় বলা যায় না। ছবি তো আমাদের শেষ করতে হবে; একটা ট্রেসিং-এর ওপর ভরসা কি? দেওয়ালের যদি কিছু হয়, তা'হলে এদিক-ওদিক দু-দিক যাবে। এতো পুরানো জিনিস, এর একটা কেন, তিন-তিনটে করে ট্রেসিং হাতের কাছে আগে রাখা দরকার। কাজেই ওঁদের ছবির জন্যেই আমরা খেটে ট্রেসিং করছি, আর কী কথা। গট্‌গট্ করে গারুদে সাহেব নিজের তাঁবুতে চলে গেলেন। অসিত জোরে স্বস্তির একটা নিঃশ্বেস ফেলে বললে, কী বাঁচানোই এবারে বাঁচালে তুমি দাদা।

'ভীলদের এক বাড়িতে বিয়ে ছিল সেদিন। জীবনে আমাকে পুরোহিতের কাজও করতে হয়েছে ক'বার। প্রথম হাতেখড়ি হলো ঐ ভীলদের বিয়েতে। ওদের গোষ্ঠীতে বিয়েটা খুব মজার আর সহজ।

এতে প্রথম আর প্রধান কাজ হচ্ছে, একদিনের ভেতর বরের জন্যে একখানা ঘর তুলে দিতে হবে। অবশ্য ব্যাপারটা তেমন শক্ত কিছু নয়। সকালের দিকে জনাকয়েক মিলে একটা চালের কাঠামো তৈরি করে, ধরাধরি করে এনে, একটা জায়গায় কতকগুলো খুঁটি গেড়ে বসিয়ে দেয়; আর চালের বাতা থেকে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দেয় দড়ির কটা খাটিয়া। বৃষ্টি-বাদলের বালাই নাই। ফলে, চালের ওপরে কিছু শুকনো ডালপালা চড়িয়ে দিলেই কাজ চলে। তার সামনে ছোট ছোট চার-পাইতে বসে পাঁচ জন সর্দার। আমি সেবারে সেই সর্দারপঞ্চকের এক জন। এলো আগে বরের বাবা। পাঁচ মোড়লের হাতে হাতে দিলে খানিক গুড় খেতে। পরে আসে কনের বাবা, সে-ও দিলে গুড় খেতে। মিষ্টিমুখ করার পরে, শেষে এলো বর-কনে। পাঁচজনকে প্রণাম করে চলে গেল হাত ধরে। এইখানেতেই বিয়ের পাট হয়ে গেল এখন ইতি। এর পরেতে হই-হুল্লোড় নাচ-গানের, আর মদের মাসের, চললো উৎসব তিন দিন সমানে। মদ পেলে ওরা আর চায় না কিছু; নেশায় ভোঁ হয়ে থাকে, খুন-জখমও হয় হরদম, কে কার আর খোঁজ রাখে! 'প্যাটেল বাবা'ও পায় না ছাড়া, শির পড়ে তার মাটির পরে। আদালতে খালাস পায়, হয় না কিছু বিচারে।

'অসহযোগের যুগ ছিল সে। মহাত্মার বাণী তখন ওখানে গিয়ে পৌঁছেচে। গান্ধীজীর সেই বাণীর ঠেলায়, ভীলেরা সব ছেড়ে দিলে আদ্যিকালের মদ খাওয়া। আবকারী-আয় স্টেটের কমে, স্টেট্ থেকে তাই মদের পিপে খুলে দিলে ওদের জন্যে। আর কোথা যায় উল্লাসে, মহৎ বাক্য গেল ভেসে, মদের তোড়ে দিনের দিন, রইলো না তার কোনো চিহ্ন।

'ভয় কাকে বলে ওরা তা জানে না। বাঘ-ভালুককে তাড়া করে থাকে সুযোগ পাওয়ামাত্র। একদিন শুনি, হৈ হৈ করে সবাই ছুটচে বনের দিকে। জানলুম, একটা বাঘ গাঁয়ে ঢুকে একটা ছাগল নিয়ে গেছে। খানিক বাদে দেখি, ছাড়িয়ে এনেছে ছাগলটাকে বাঘের মুখ থেকে। বাঘটা বোধ হয় সবে খেতে শুরু করেছিল —শেষ করতে

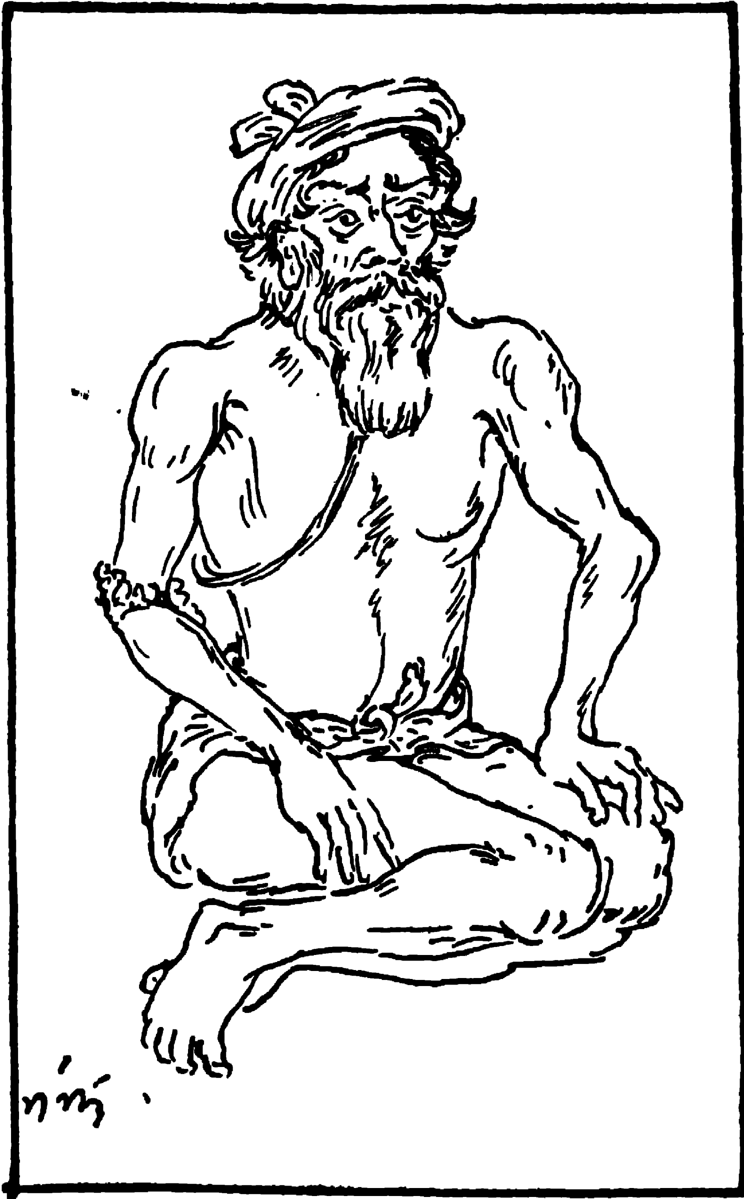
পারেনি তখনও। সেই রাত্রে সেই বাঘে-ধরা ছাগলটা রান্না করে উৎসব চলল সারা রাত —মদে মাংসে নাচে গানে।

'দিন কাটছে সুখেই। আমাদের ট্রেসিংটাও শেষ করে এনেছি। গারুদে সাহেব রোজ সকালে গীতাপাঠ করতেন ঘণ্টা দুয়েক ধরে। আর সেই সুযোগে আমরা ট্রেসিং-এর ওপর রঙের নমুনা কিছু কিছু দিয়ে নিতুম, যাতে শান্তিনিকেতনে ফিরে গিয়ে তা থেকেই ছবি করা যায়। গারুদে সাহেবের তাঁবুতে তাঁর অজান্তে একটা ছ্যাঁদা করে দিয়েছিলুম। সেই ফুটো দিয়ে চেয়ে থাকতো একজন —গারুদে সাহেবের পানে। তাঁর গীতাপাঠের ফাঁকে আমাদের কাজ হাসিল করে নিতুম। এইভাবে আমাদের ছবির জন্যে ট্রেসিং আর রঙের নমুনা মোটামুটি শেষ করে ফেললুম। কিন্তু পাঠানো যায় কী করে? যাবে সেই শান্তিনিকেতনে। দু'মাইল দূরে পোস্টাফিস। পোস্টমাস্টার হলেন মারাঠী ব্রাহ্মণ, ভদ্রলোক। আমাদের সাহায্য করেছিলেন যথেষ্ট। বললেন তিনি, উটের ডাকে পাঠালে পৌঁছবে তাড়াতাড়ি। রাত্রে বসে সীলমোহর আঁটা হলো। ছবির পার্শেল যাচ্ছে। সকালে গারুদে সাহেব মগ্ন গীতার জ্ঞান-কর্মযোগে; এদিকে আমরা 'মাল' পাচার করে দিলুম 'আপনা শান্তিধামে'র উদ্দেশ্যে —মারফৎ স্বয়ং ইন্দ্র।

'পাঠানো তো গেল, এখন প্রাপ্তি-সংবাদ না-পাওয়া পর্যন্ত মন সুস্থির হচ্ছে না। প্রত্যহ প্রতীক্ষায় থাকি শান্তিনিকেতন-সংবাদের, —নিরাপদে পৌঁছে গেছে সব। অন্যথায়, সব শ্রম পণ্ড হবে। প্রতীক্ষার দিনগুলো বড়ো দীর্ঘ হয়ে থাকে। যে-প্রেরণায় প্রাণান্ত পরিশ্রম, আসল সে-কাজ হাসিল; ওদের কাজও প্রায় শেষ করে এনেছি।

'কবে সেই ঘর ছেড়ে এসেছি জানুয়ারীর গোড়ায়। শীত শেষ হয়ে এলো। বসন্তের স্পর্শ দিকে দিকে। গাছে গাছে পলাশ ফুটতে শুরু হয়েছে। আমের ডালে ধরেছে বোল। আনন্দে নেচে উঠলো মন। আমের মুকুল, পলাশের কুঁড়ি অতি পরিচিত প্রিয়জনের মতন ভুলিয়ে দিলে আমাদের প্রবাসের দুঃখ।

'ভীল বান্ধবদের নেমন্তন্ন করলুম একদিন। এতো দিন তো সুখেই ছিলুম ওদের নিয়ে। এবার পালা ছেড়ে আসার। গারুদে সাহেবের মন খুঁৎ খুঁৎ মাথা টনটন্। তবুও বাসনা আমাদের ওদের নিয়ে একটু হৈ হৈ করার।



“রামজী জো দেঁতে হৈঁ রামজী খা লেতেঁ হৈঁ” - নন্দলাল

খাসী কাটা হলো চার-পাঁচটা। যোগাড় করে আনলে ওরাই। মেয়েরা আনলে মাটীর বড়ো বড়ো হাঁড়ি। —তাদের নিজেদের হাতের তৈরি; পুরু হবে প্রায় ইঞ্চি দেড়েক করে; ঝকঝকে বাহার তার মেজে রাখে দুবেলা। এতো ... সে হাঁড়িগুলো, চলে ওদের দু-তিন পুরুষ। আমাদের সুরেন হলেন রান্নার ওস্তাদ। দেখিয়ে দিলেন বসে বসে আর রান্না করলো ওরা এসে। আমরা যা নিমন্ত্রণ করেছিলুম সে সংখ্যা পেরিয়ে গেল; তার দু'গুণ লোক প্রায় বেশি এলো। আমরা ভাবছি, খাবারে টান পড়বেই। কিন্তু সে ওরা হতে দিলে না। নিজেরাই হিসেব করে সবাই তারা বেঁটে খেলে। সমানভাবে পাতার ঠোঙ্গায় ভাগ করে সবার হাতে দিলে। কারো মুখে কথাটি নাই। সেদিন ওদের ব্যবহার, গেঁথে গেল মনে আমার। ওদের বিনয় আচরণ, সইভ্য' লোকের লাজের কারণ।

'এই ঘটনার দু'দিন বাদে চিঠি পেলুম শান্তিনিকেতন থেকে। সর্বাধ্যক্ষ জগদানন্দবাবু লিখেছেন, —'জিনিস নিরাপদে পৌঁছেচে।' —এই ছিল আমাদের সঙ্কেত। উল্লাসে সবাই মিলে চেঁচিয়ে উঠলুম, —বন্দে মাতরম্। —গার্দে সাহেব দৌড়ে এলেন। —'ব্যাপার কি?' আমি বললুম, —এ কিছু নয়, এই একটু স্বদেশী-আন্দোলন করছিলুম। মাঝে মাঝে আমরা এ-রকম করেই থাকি। সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলুম, —আমাদের অনুমতি-পত্রের কি হলো? তিনি বললেন, —এই এলো বলে, বেশি দেরি নাই আর। উত্তরে বললুম, —আর আমাদের দরকারও নাই। যা পাঠাবার তা আমরা পাঠিয়ে দিয়েছি, মাল সেখানে পৌঁছে গেছে। আজকের এই উল্লাস সেই কারণেই। গার্দে সাহেব দাঁড়িয়ে রইলেন হতভম্ব হয়ে।

'সাধু গোসাঞী থাকতেন একজন বাগগুহায়। তিনি ছিলেন বাক্-গ্রামের- অছি-দেবতা। প্রায় দিবারাত্র থাকতেন তিনি একাসনে। বলতেন, —খেলেই কিছু খেতে দিতে হয়। আমি তাঁর কাছে গেলে, খেতে দিতেন গঁদ আর মেতির লাড্ডু। খেতে দ্বিধা করলে বলতেন, রামজী জো দেঁতে হৈঁ, রামজী খাঁ লেতে হৈঁ (স্কেচ্‌বুক, প্রথম অধ্যায়, সংখ্যা ৯।২৪)। তাঁর শিষ্যদের দেওয়া খাবার বেশির ভাগই খেয়ে যেত পাখীতে, বাঁদরে।

'তিন মাস কেটে গেল দেখতে দেখতে। চুক্তি-মাফিক ওদের কাজ শেষ করে দিয়েছি। এবারে এখানকার পাট তুলতে হবে। —ভীলদের পাড়ায় পাড়ায় দোলের উৎসব এসে গেছে। আমরা চলে আসব বলে, ওরা কুড়ি দিন এগিয়ে দিলে দোলপরব। সে-উৎসবে আমাদের করলে মাননীয় অতিথি। যথাসময়ে বসতে দিলে বিশেষ আসনে। একধারে মেয়েরা দাঁড়ালো সার বেঁধে। অন্য ধারে ছেলেরা মাদল নিয়ে। রান্নার আয়োজন আর এক দিকে। গোড়াতেই আমাদের নাম জেনে নিলে মেয়েরা। শুরু হয়ে গেল উৎসব। আমাদের নাম ধরে ধরে বাপ-ঠাকুর্দা তুলে গালাগালি দিতে শুরু করলে মেয়েরা অকথ্য ভাষায়। আমরা তো অবাক্। এতো দিন মিলে মিশে সুখে দুঃখে এদের সঙ্গে দিন কাটালুম, শেষে এই ছিল ললাটে লেখা! সর্দার বললে, — এই হলো ওদের উৎসবের স্বস্তিবাচন। আমরা মাননীয় অতিথি। তাই অঝোরে এই মন্ত্রবর্ষণ আমাদের উদ্দেশ্যেই। কি আর করা যায়, আদরে অত্যাচার সহ্য করা গেল।

'পরের দিন চলে আসবো। বনের ভীলদের চোখে জল। এ ওদের 'তামাসা' 'জাতরা'-র জল নয়। অন্তরের কান্নার জল। আমাদের চোখও ভিজে ভিজে। মোট-পুটুলি বেঁধে তৈরি। আবার সেই গরুর গাড়ি প্রস্তুত। আগের গাড়িতে আমরা ; পিছনে ইন্দ্র আর-একটা গাড়িতে মালপত্রসমেত। দূরে দেখি, ভীলেরা তখনও দাঁড়িয়ে। আড়াল না-হওয়া পর্যন্ত তারা আমাদের যেন শেষ দেখা দেখতে চায়। দিক্‌প্রান্তে গ্রাম মিলিয়ে এলো। ক্রোশের পর ক্রোশ পথের দু'পাশে লম্বা লম্বা সোনালী ঘাস। সহসা দেখা গেল, ঘাসের ভেতর থেকে আগুনের ফুল্‌কি ছিট্‌কে বের হয়ে আসছে। আর পুরপুর করে ঘাস পুড়ে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো, আর ছড়িয়ে পড়লো আশে-পাশে। এই ঘাস হলো গ্রামের লোকের প্রাণস্বরূপ। সযত্নে রক্ষা করে ; গরু ছাগল তাদের বাঁচে এই খেয়েই। পাশের গাঁয়ের লোকেরা আগুন দেখে দৌড়ে এলো —বড়ো বড়ো লাঠি আর কোদাল হাতে নিয়ে। ইন্দ্র ভয় পেয়ে ছুটে আসে আমাদের গাড়ির পাশে। এই কাণ্ডটি বাধিয়েছে সে-ই। অজস্র জ্বালানি দেখে দেশালাই-কাঠি জ্বেলে সেই ছুঁড়ে দিয়েছিল। আমরাও ভীত হলুম বৈকি। মারেই বুঝি-বা ওরা আমাদের। কিন্তু গাঁয়ের লোকেরা এসেই, আগে জ্বলন্ত ঘাসের দু'ধারে হাত তিনেক



(সদা) জপো সীতারাম - নন্দলাল

চওড়া করে কেটে-ছুঁপে পরিষ্কার করে দিলে। তারপরে লাঠি পিটে পিটে আগুন নেবাতে লাগলো। কে-যে সে-আগুন লাগালে, কেনই-বা লাগালে, সে-খোঁজ করে সময় নষ্ট কবার কোনও প্রয়োজনই বোধ করলে না। আর একবার অবাক্ হলুম। আশ্চর্য হলুম। গরুর গাড়ি বাঁক নিলে। দু'ধারে পলাশ-বন। পলাশের রঙে রঙে রাঙা নেশা তখন দিকে দিকে। সুখে-দুঃখে জড়ানো কতো স্মৃতি-সে মনের মণিকোঠায় !

'মাঝ-রাস্তায় এসে খবর পেলুম, রেলপথে অসহযোগ চলছে। স্ট্রাইকে বন্ধ সব। এতোখানি এসে এবারে মাঝপথে আটক থাকতে হবে, —তবে উপায় ? আমাদের অসিত বললেন, —দাদা, এক কাজ করা যাক্। এসো, তিন জনে আমরা সন্ন্যাসীর বেশ ধরি। তাহলে আর ভাবনা থাকে না। এই বলেই সে গান ধরলে,—

(সুর চরকগাছ —তাল বেতালা)
রেলগাড়িকি হরতাল হুয়া
অব্ লেও রামনাম
বাগ তীরথ্ সে লৌটো সাধু
আপনা শান্তিধাম।
(সদা) জপো সীতারাম ॥

—[প্রথম খণ্ড সমাপ্ত]—

॥ অভিমত ॥

এই পত্রে [৪-৩-১৯৬১] শ্রীমান পঞ্চানন মণ্ডল যাহা লিখিয়াছেন তাহা আমারও অভিমত। এই গ্রন্থের মুদ্রণকার্য্য শীঘ্র আরম্ভ হইলে আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারি।

৪. ৩. ৬১ — নন্দলাল বসু

সত্যেন, বইখানার প্রত্যেকটি ছত্রে মধু। —এই পুস্তকের প্রকাশন অত্যন্ত আবশ্যক এবং বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করি, এবং আশা করি বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে যথাসম্ভব শীঘ্র ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইবেন।

২৪. ৪. ১৯৬১ — শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

তোমার প্রেরিত "ভারতশিল্পী নন্দলাল" বইটির ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিতরূপে চার সংখ্যা পেয়েছি। পড়েছি। খুব ভাল লেগেছে। আশা করি তুমি এই কাজ অমন্দগতিতে চালিয়ে যাবে। তোমার এ বইটিও শিল্পাচার্য নন্দলালের এক কীর্তি বলে ভবিষ্যতে গণ্য হবে। তোমার নামও সেই সঙ্গে গাঁথা হয়ে থাকবে। এই ভবিষ্যদ্‌বাণী করলুম।

কলিকাতা,
৭. ৩. ৬৫ — শ্রীসুকুমার সেন

...সবিতা পত্রিকায় প্রকাশিত ভারতশিল্পী নন্দলাল প্রত্যেক মাসে আগ্রহ সহকারে পড়েছি। বলা বাহুল্য খুব ভালো লাগে। নন্দলাল বাবুর জীবনের একটা অংশ আমার চোখের উপরে ঘটেছে। তাঁর প্রথম অভ্যর্থনা সভায় বালক শ্রোতারূপে আমি উপস্থিত ছিলাম। প্রত্যক্ষভাবে আমি তাঁর ছাত্র না হলেও ছাত্রসম ও স্নেহভাজন ছিলাম। শান্তিনিকেতন পত্র বন্ধ হওয়ার কারণ আমার আশ্রম ত্যাগ। সিন্ধু শকুন নামটি বোধহয় আমার প্রদত্ত —সমুদ্র থেকে লেখা চিঠি —তাই Sea-gull বা সিন্ধু শকুন। নন্দলাল বাবুদের দলে আমি কখনো ভ্রমণে যাইনি, তাই কে কে ছিলেন বলতে পারবো না। আমার ছোট একটি দল ছিল তাদের নিয়ে যেতাম।

আপনার বইখানি প্রকাশিত হবে শুনে সুখী হলাম। নন্দলাল বাবুর যোগ্য জীবনী হবে। আপনি আমাদের সকলকে ঋণী করলেন।

আশা করি কুশল। ইতি
অনুরক্ত
শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

162/36, Lake Gardens
Calcutta - 45
30. 1. 67

॥ গ্রন্থকারের অন্যান্য বই ॥

। ১৯৩৭ রবীন্দ্রসাহিত্যে মৃত্যু ও জীবনের রূপ ও অন্যান্য প্রবন্ধ
(প্রবাসী ১৩৪৫) (রবীন্দ্রনাথের সাধুবাদ প্রাপ্ত)

। ১৯৪৪ রূপরামের ধর্মমঙ্গল প্রথম খণ্ড (১৩৫১)
(আচার্য সুকুমার সেন মহাশয়ের সহযোগিতায়)

। ১৯৪৯ গোর্খ-বিজয় (নন্দলালের চিত্রভূষিত)

। ১৯৫১ পুঁথি-পরিচয় প্রথম খণ্ড
(বিশ্বভারতীর ১ - ৫০০ পুঁথির পরিচয় সম্বলিত)

। ১৯৫৩ চিঠিপত্রে সমাজচিত্র দ্বিতীয় খণ্ড
(৬৩২ খানি চিঠিপত্র ও দলিল-দস্তাবেজ সঙ্কলন)

। ১৯৫৬ রসময়দাসের শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লী
(দুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগিতায়)

। ১৯৫৮ পুঁথি-পরিচয় দ্বিতীয় খণ্ড
(বিশ্বভারতীর ৫০১ - ১০০০ পুঁথির পরিচয়যুক্ত)

। ১৯৫৮ যাদুনাথের ধর্মপুরাণ, রামাঞী পণ্ডিতের অনাদ্যের পুথি
(লীলা রায় ও শেফালী সরকারের সহযোগিতায়)

৯। ১৯৬০ হরিদেবের রায়মঙ্গল ও শীতলামঙ্গল
(নন্দলালের চিত্র ও মানচিত্র সম্বলিত)

০। ১৯৬৩ পুঁথি-পরিচয় তৃতীয় খণ্ড
(বিশ্বভারতীর ১০০১ - ১৫০০ পুঁথির পরিচয়)

১। ১৯৬৬ দ্বাদশমঙ্গল
(বারোখানি বিভিন্ন চরিত্রের মঙ্গলকাব্যের সঙ্কলন)

২। ১৯৬৮ চিঠিপত্রে সমাজচিত্র প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধ
(আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বলিত)

১৩। ১৯৮০ পুঁথি-পরিচয় চতুর্থ খণ্ড
(বিশ্বভারতীর ১৫০১ - ২০০০ পুঁথির পরিচয়যুক্ত)

১৪। ১৯৮০ Rabindranath and Oriental Studies in Visva-Bharati
(V. B. News, July, 1980)

১৫। ১৯৮২ দ্বিজ মাধবের শ্রীপদমেরুগ্রন্থ
(ভূদেব চৌধুরী, সুখময় মুখোপাধ্যায় ও সুমঙ্গল রাণার সহযোগিতায়)

১৬। ১৯৮২ ভারতশিল্পী নন্দলাল প্রথম খণ্ড

১৭। সুরুল নথিতে সেকালের কথা (ভবতোষ দত্ত, সুখময় মুখোপাধ্যায় ও বুদ্ধদেব আচার্যের সহযোগিতায়) (যন্ত্রস্থ)

১৮। সংক্ষিপ্ত পুঁথি-পরিচয় (সমগ্র বাঙ্গালা পুঁথিসংগ্রহের সংক্ষিপ্ত তালিকা)
(গৌরহরি সাহা ও বুদ্ধদেব আচার্যের সহযোগিতায়) (যন্ত্রস্থ)

১৯। পুঁথি-পরিচয় পঞ্চম খণ্ড (বিশ্বভারতীর ২০০১ - ২৫০০ পুঁথির পরিচয়যুক্ত)
(বুদ্ধদেব আচার্যের সহযোগিতায়) (যন্ত্রস্থ)

২০। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের অভয়ামঙ্গল (ভারবী, কলিকাতা)

২১। চিঠিপত্রে সমাজচিত্র প্রথম খণ্ড, অপরার্ধ (যন্ত্রস্থ)
(আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদারের ভূমিকা সম্বলিত)

২২। ভারতশিল্পী নন্দলাল জীবন ও চিত্রপঞ্জী (যন্ত্রস্থ)

২৩। ভারতশিল্পী নন্দলাল দ্বিতীয় খণ্ড (যন্ত্রস্থ, শ্রীদুর্গা প্রেস, বোলপুর)

২৪। ভারতশিল্পী নন্দলাল তৃতীয় খণ্ড

২৫। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের দিনলিপি (১৯৩৬-৩৮)

২৬। বিচিত্র সাহিত্য : রাঢ়-গবেষণা-প্রবন্ধাবলী
(তিন শতাধিক প্রবন্ধের সঙ্কলন)

রাঢ়-গবেষণা পর্ষদ প্রকাশিত : শ্রীঅজিতকুমার দাস লিখিত

১। জয়দেব-কেন্দুলীর নিম্বার্ক-অস্থল / আশ্রম (১৯৭৮, ১৯৮০)

২। জয়দেব-মেলা—সেকালের ও একালের (১৯৮০)

৩। কেন্দুলির বাউল আমরা (১৩৮৮)